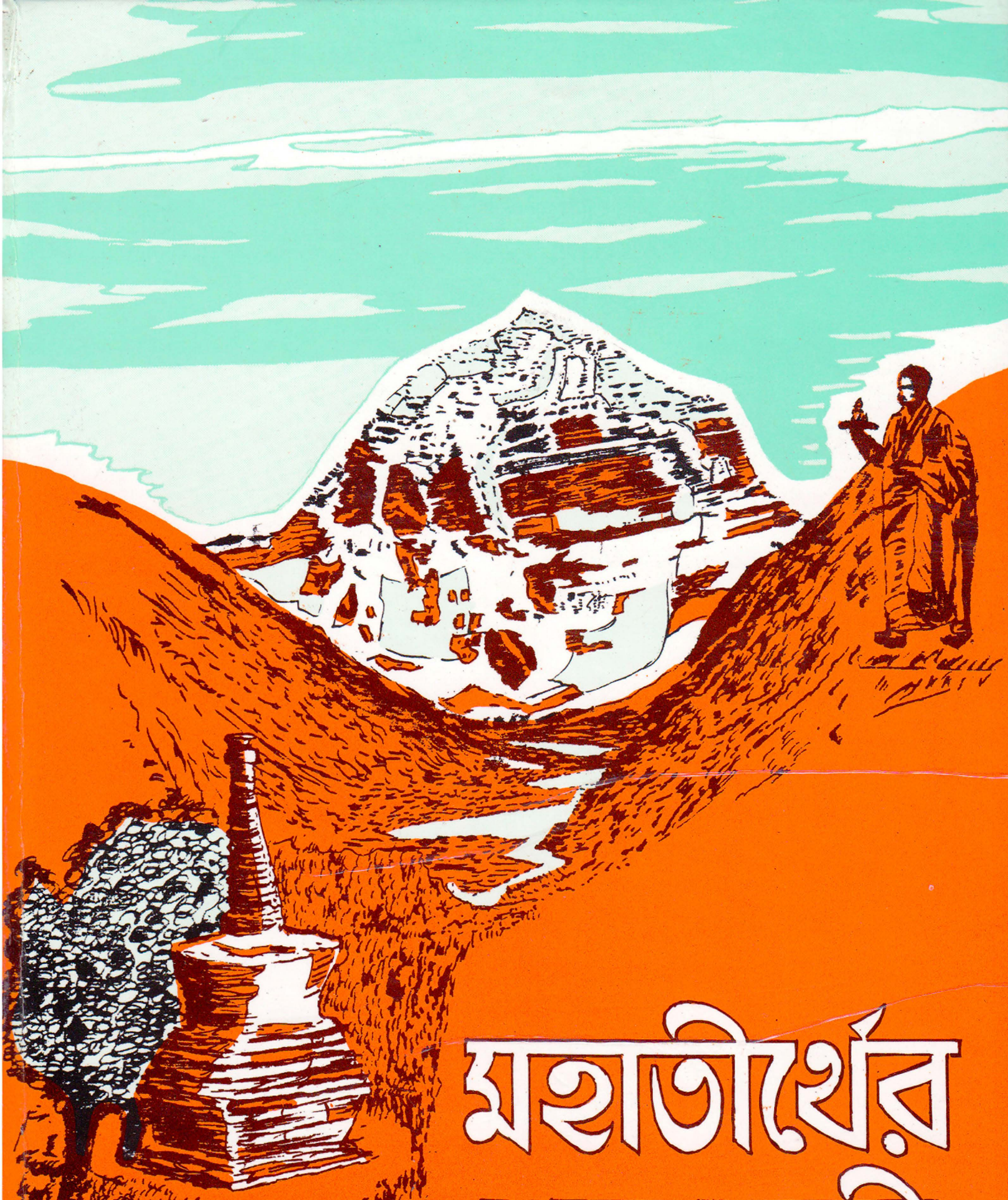

মহাতীর্থের শেষ যাত্রী

(তিব্বত)

ভূ-পর্যটক বিমল দে

তিব্বতী-মণ্ডলায় "ওম্"

ডাকিনী : স্ত্রী শক্তি যিনি দীক্ষার দ্বারা জ্ঞান দান করেন।

— তিব্বত ।। সপ্তদশ শতাব্দী ।।

মহাতীর্থের শেষ যাত্রী

(লাসা—কৈলাসনাথ—মানস সরোবর)

ভূ-পর্যটক

বিমল দে

প্রধান পরিবেশক

দে বুক স্টোর্স

১৩ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ
শ্রীপঞ্চমী ১৩৮৮
জানুয়ারী ১৯৮২

দ্বিতীয় প্রকাশ
শ্রীপঞ্চমী ১৩৯১
ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪

তৃতীয় প্রকাশ
শ্রীপঞ্চমী ১৩৯৪
জানুয়ারী ১৯৮৮

চতুর্থ প্রকাশ
জানুয়ারী ১৯৯২

পঞ্চম প্রকাশ
শ্রীপঞ্চমী ১৪০৮
ফেব্রুয়ারী ২০০২

ষষ্ঠ প্রকাশ
শ্রীপঞ্চমী ১৪১৬
জানুয়ারী ২০১০

প্রকাশক
পরিব্রাজক প্রকাশনী
এ্যান্ড্রুজ পল্লী, শান্তিনিকেতন
বীরভূম

© শ্রীমতী দেবী দে

প্রচ্ছদপট
শ্রীমতী দেবী দে

মুদ্রক
নবপ্রেস প্রাঃ লিঃ
৬৬ গ্রে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৬
মূল্য ঃ ২৩০.০০ টাকা

Mahatirther Shesh Jatri

(LHASA–KAILASHNATH–MANAS SAROBAR)

Globe-Trotter Bimal dey

MAHATIRTHER SHESH JATRI

Pilgrimage
To Lhasa, Kailashnath and Manas Sarobar
Language : Bengali

© Devi Dey, 1982

First Edition
January 1982

Second Edition
February 1984

Third Edition
January 1988

Fourth Edition
January 1992

Fifth Edition
February 2002

Sixth Edition
January 2010

Publisher :
Paribrajak Prakashani
Andrews Palli, Santiniketan
Birbhum

Distributor :
DEY BOOK STORES
13 Bankim Chatterjee Street
Kolkata-700 073

Printed at :
Nabapress Pvt. Ltd.
66 Grey Street
Kolkata-700 006

Price : Rs.230.00

ভূমিকা

'মহাতীর্থের শেষ যাত্রী' বইটির ভূমিকা লিখতে গিয়ে এখন বারবার আমার কলম থেমে যাচ্ছে, ভিখারী জীবনের সেই দিনগুলো এখন ভাবতেও আশ্চর্য লাগছে। সেই সময়কার ডায়েরিটাকে ঠিক ডায়েরি বললে ভুল হবে। শুরু করেছিলাম কয়েকটা ভাঁজ করা খসখসে সাদা কাগজে, তারপর কোন কোন সময় খাতা পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই এদিক ওদিক থেকে চেয়ে পাওয়া টুকরো কাগজের উপর সংক্ষেপে টীকা লেখা মাত্র। সেইগুলো জড়ো করে গুছিয়ে লিখতে গিয়ে নিজেই আপন মনে হেসে উঠেছিলাম। সেটাই ছিল আমার প্রধান সমস্যা। তা সত্ত্বেও আজ তাকে সাজিয়ে তুলতে পেরেছি। যাঁদের আশীর্বাদে আমার এ প্রচেষ্টা সফল হয়েছে, এই কৃতিত্ব তাঁদেরই প্রাপ্য।

১৯৫৬ সাল। বিদেশীদের জন্য তিব্বতের দরজা তখন প্রায় বন্ধ; ভারতীয়দের জন্য তো বটেই। নেপাল সরকার কোনরকমে সেই বছর তীর্থ-যাত্রীদের জন্য কাঠমাণ্ডুর চীনা দূতাবাস থেকে অনুমতিপত্র সংগ্রহ করেন। পরে শুনেছি যে, সেটাই ছিল মহাতীর্থের শেষ তীর্থযাত্রীর দল। ১৯৫১ সালের ২৩শে মে, চীনের 'সেন্ট্রাল পিপল্স্ গভর্ণমেন্টে'র এক চুক্তি অনুসারে পিকিং সরকারের 'পীস্‌ফুল লিবারেসন আর্মি' আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে তিব্বতের বিভিন্ন অংশে। সে ঘটনা আজ কারুরই অজানা নেই। রাজনৈতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হবার পরও তীর্থযাত্রীদের জন্য কিছু কিছু পথঘাট খোলা ছিল। আমার তিব্বতযাত্রা সে কারণেই সম্ভব হয়েছিল।

তারপর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। মৌনীবাবা ওরফে সেই ভিখারী ছেলেটির জীবনের বহু পরিবর্তন ঘটেছে। ঘরপালানো ছেলেটা এরপর কোন এক অজানা আকর্ষণে ঘুরে বেড়িয়েছে ভারতের দিকে দিকে। তিব্বতের শুদ্ধাত্মার সেই প্রেরণায় তারপর সে বেরিয়ে পড়েছে জগৎকে দেখার জন্য।

১৯৬৭ সালে আমি বেরিয়ে পড়লাম ভূ-পর্যটনে, একটা পুরোনো সাইকেল আর পকেটে ছিল মাত্র আঠারো টাকা। কৈলাসের সেই প্রেরণাই ছিল আমার মূলধন। এসিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া ঘুরে বাড়ী ফিরলাম ১৯৭২ সালে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, রেডিও আর প্রেসের মাধ্যমে আমি পেলাম বাহবা। কেউ ভাবলো আমি একজন বিরাট পর্যটক, কেউ ভাবলো অভিযাত্রী, কেউ ভাবলো অসম-সাহসিক, আবার কেউ ভাবলো

আমার অভিজ্ঞতার ঝুলির কথা। কিন্তু তাদের মধ্যে ক'জনই বা জিজ্ঞাসা করল—তুমি কি পেলে ?

আমি ইতিমধ্যে অনেক দেখেছি—হিমালয়, আল্পস্, রকি পাহাড়, করদিয়ার, কিন্তু সবার শ্রেষ্ঠ হচ্ছে আমাদের হিমালয়। অনেক হ্রদ আমি দেখেছি, জেনেভার হ্রদ থেকে শুরু করে তিতিকাকা পর্যন্ত—কিন্তু সবার সেরা হচ্ছে মানস সরোবর। সুন্দর দৃশ্য বার বার দেখেছি—ভৌগোলিক কারণে বিভিন্ন স্থানের সাথে অনেক মিলও দেখেছি। জেনেভার হ্রদের সাথে মানস সরোবরের তুলনা করা চলে। ইটালী থেকে মঁ ব্লাঁকে দেখতে অনেকটা কৈলাস শিখরের মতো। দৃশ্যতঃ এক হলেও দেবতাত্মা হিমালয়ের সাথে তাদের তুলনাই চলে না। ইউরোপীয় পাহাড়ের উপর যেখান থেকে দেখা যায় সুন্দর দৃশ্য, সেখানেই গড়ে উঠেছে 'বার'। আমেরিকায় দেখেছি 'সুভ্যনিঅ্যার স্টল', কিন্তু ভারতের কথাই আলাদা। সনাতন যুগ থেকেই ভারত জানে যেখানে সুন্দর সেখানেই ঈশ্বর। তাই হিমালয়ের প্রত্যেকটি সুন্দর এলাকায় গড়ে উঠেছে মন্দির, গুম্ফা আর চৈত্য। সর্বসুন্দরের যিনি মূল তিনিই দেবতা, তিনিই আমাদের আরাধ্য। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।

হিমালয়ের প্রতিটি মানুষে দেখেছি দেবতাত্মার মূর্ত প্রকাশ। লাসা ও কৈলাসের পথে অতি গরীব গ্রামবাসীদের মধ্যে লক্ষ্য করেছি শিবভাব। প্রায় চব্বিশ বছর আগেকার আমার সেই ছেঁড়া পাতার ডায়েরিতে সে কথাগুলোই লুকিয়ে ছিল। পারলাম কি সেই ভাবটাকে প্রকাশ করতে ? হারানো দিনের সেই পাতাগুলোকে সংগ্রহ করে বার বার স্মৃতির রোমন্থন করেছি, কিন্তু কোনদিনই ভাবিনি যে সেটা একদিন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে।

মহামহোপাধ্যায় পরমারাধ্য পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় আমার ভূ-পর্যটনের সময় আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'যদি সম্ভব হয় তোমার সেই তিব্বতের কথাগুলো লিখে রেখো ...।' হায় ! আজ তিনি আমাদের মধ্যে নেই, তবুও তাঁর আশীর্বাদ আমার লেখনীর উপর বর্ষিত হয়েছে।

১৯৭৫ সালে আধুনিক যুগের ধন্বন্তরী, কামাখ্যা উমাচল আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় স্বামী শিবানন্দজী মহারাজও আমাকে আমার তিব্বতের ভ্রমণ কাহিনী পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য বিশেষ উৎসাহিত করেন। তিনিও আজ আমাদের মায়া ত্যাগ করে উর্ধ্বলোকে গমন করেছেন। কিন্তু তাঁর উৎসাহে আজ আমি উৎসাহিত হয়েছি। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করি।

তারপর অনেকগুলো ঘটনা পর পর ঘটে গেল, ধর্মশালায় সাক্ষাৎ হল মহামান্য দালাই লামার সাথে। সেই বছরই সোনাদায় দর্শন পেলাম কালু রিম্‌চের। পরের বছর মঁ পেলব্লাতে দেখা হল গেসে রেপ্‌তেনের সাথে—তারপর রুমটেকে দেখা পেলাম লামা কারমাপার সাথে। বর্তমানে তাঁরা সবাই তিব্বতী রিফিউজি হয়ে আছেন।

যদিও বহুদিনের ঘটনা, তবুও লুপ্ত স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলবার জন্য এটাই যথেষ্ট। কিন্তু চারিদিকের কাজ বজায় রেখে সময় হয়ে উঠছিল না। তারপর আরও এক অলৌকিক ঘটনা

ঘটল। গ্যাংটকে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল মানস ও কৈলাসের গাইড দোংগলদাদার সাথে। কি আশ্চর্য যোগাযোগ!

১৯৭৯ সালে আমার বিশেষ বন্ধু (শান্তিনিকেতনের) শ্রীগোরা সর্বাধিকারী আমাকে নিয়ে আসে এক পরম যোগীর সান্নিধ্যে। প্রথমে তাঁকে দেখেই আমার অন্তরাত্মা আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিল—ভেবেছিলাম তিনিই আমার সেই হারিয়ে যাওয়া সাধুবাবা। দেখতে-শুনতে অনেকটা সেই রকম আর স্বভাবটাও ঠিক তেমনি। হঠাৎ দেখলে মনে হবে বৃদ্ধের বেশে একটি নাবালক। তাঁরও নাম সাধুবাবা। তাঁকে আমার সাধুবাবা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই করিনি, কিন্তু মনে মনে তাঁকেই ধরে নিয়েছি আমার জীবনে প্রথম পাওয়া সেই জ্ঞানী গুরু হিসেবে। তাঁকে সামনে রেখেই আরম্ভ করেছি আমার এই বইটি। তাঁর আশীর্বাদ আর করুণাই আমার সম্বল। বইটি লেখার জন্য আমার দরকার ছিল সাধুবাবার, নয়তো সেই পুরোনো দিনগুলোকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হতো কি না জানি না। তাঁকে এ সম্পর্কে কিছুই বলিনি ; আমি জানি তিনি অর্ন্তযামী।

বাজারে ভ্রমণকাহিনীমূলক বইয়ের অভাব নেই। সেই পর্যায়ের হলেও এই বইটি কিন্তু একটু অন্য ধরনের। আমার তিব্বতে যাওয়ার কোনরকম পরিকল্পনাই ছিল না, তিব্বত সম্পর্কে সেই সময় আমার কোন ধারণাই ছিল না। এককথায় বলা চলে, ভাগ্যে ছিল তাই ঘটেছে। বাড়ী থেকে পালানোই ছিল আমার মূল উদ্দেশ্য ; বাকিটা ঘটেছে করুণাময়ীর অশেষ করুণার ফলে। আমি সাহিত্যিক নই, পরিব্রাজকের সফরও এটাকে বলবো না, অভিযানতো কিছুতেই নয়। নেহাতই একটা ভিখারীর ডায়েরি। নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের একটা ছেলের বাড়ী থেকে পালিয়ে যাওয়ার আর একটা ঘটনা মাত্র। এ ধরনের ঘটনা আমাদের দেশে বিরল নয়। তবুও লিখলাম কারণ প্রেরণা যখন এসেছে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবেই।

১৯৫৮ সালের পর তিব্বতের দরজা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। তার কারণ ও ফলাফল নিয়ে এ ভূমিকার কলেবর বৃদ্ধি করবো না। চীনারা তিব্বতে এসে কি করল বা কি করছে সে বিচারের স্পর্ধা আমার নেই। তবে একজন সাধারণ তীর্থযাত্রী হিসেবে বার বার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি এ দরজা যেন খুলে যায়। স্বর্গের দরজা কিছুতেই বন্ধ করা চলবে না—মানুষমাত্রেই কৈলাস তীর্থের অধিকারী। স্বয়ম্ভু কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। সমস্ত মানব জাতির পবিত্র তীর্থক্ষেত্র এই কৈলাস খণ্ড।

এই বইটি লিখবার সময় আমার বর্তমান জীবনের যাবতীয় অভিজ্ঞতা ও প্রেরণাকে অতি সাবধানে দূরে সরিয়ে রেখে পনেরো বছর বয়সের সেই মৌনীবাবা তীর্থযাত্রীটিকেই তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। তাই তিব্বতের রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক তথ্য এর মধ্যে নেই। চলবার পথে একটি তীর্থযাত্রীর চোখে যা পড়েছিল সেটাই এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে।

অবশেষে শিবানন্দ যোগাশ্রমের সম্পাদক স্বামী যোগেশ্বরানন্দ সরস্বতী মহারাজের কথা উল্লেখ করতেই হবে। যদিও তিনি আমার ব্যক্তিগত বন্ধু, তবুও তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। তিনিই 'মহাতীর্থের শেষ যাত্রী'র প্রকাশনায় সাহায্য করে আমাকে বিপন্মুক্ত করলেন। শিবানন্দ যোগাশ্রম সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী দেবানন্দ সরস্বতী মহারাজের

কাছেও আমি এই একই কারণে কৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ হলাম। তাঁরা উভয়েই নিঃস্বার্থ কর্মযোগী ; তাঁরা আমার কৃতজ্ঞতা চান না—তাই জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা।

বইটি অতি সাধারণ, কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে কৈলাসের এক আকর্ষণীয় প্রাণ। সেখানে যে শিব-জ্যোতি আমি উপলব্ধি করেছিলাম তারই কিছুটা বহন করে এনেছি প্রসাদ হিসেবে সকলের সাথে ভাগ করে নেবার জন্য। এটা আমার স্মৃতি-অঞ্জলি। হরি ওম্ তৎ সৎ।

আল্পস্ অত্ সাভোয়া, ফ্রান্স
৩রা কার্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৮৮

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

মহাতীর্থের শেষ যাত্রীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হবার পর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে বিলম্বের কারণে আমি আন্তরিক দুঃখিত।

গুণীজনদের অনুরোধে তিব্বতের মহাগুরু মহাকবি মিলারেপার সম্বন্ধে কিছু লিখতে বাধ্য হলাম। তিব্বতের প্রাণপুরুষ 'মিলারেপা' বইয়ের শেষে সংযোজিত হল। মহাকবি মিলারেপা গুরু পরম্পরায় ছিলেন ভারতীয় দর্শন ও সাধনার ধারক ও বাহকস্বরূপ, যাঁর প্রধান পরিবেশক ও প্রচারক ছিলেন বাঙালী সাধক অতীশ দীপঙ্কর। পরিশেষে যোগ করলাম সেই মহাগুরুর প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি।

বর্তমান সংস্করণের কলেবর বৃদ্ধি ও দ্রব্যমূল্যের অত্যধিক বৃদ্ধির কারণে দ্বিতীয় সংস্কণের মূল্য বৃদ্ধিতে আমি দুঃখিত। আশা করি সুধী পাঠক সমাজের কাছে বইটি অধিকতর আকর্ষণীয় হবে।

শ্রীপঞ্চমী ১৩৯১ **লেখক**

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

অগণিত পাঠক পাঠিকাদের শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ নিয়ে প্রকাশিত হল 'মহাতীর্থেরশেষ যাত্রী'র তৃতীয় সংস্করণ। বইটি পাঠক-পাঠিকামহলে সাড়া তুলেছে জেনে নিজেকে ধন্য মনে করছি। হাজার হাজার চিঠিপত্রের মাধ্যমে যারা আমাকে উৎসাহিত করেছেন তাদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

চাহিদা মেটাবার জন্য ও যুগের সাথে ছন্দ বজায় রাখবার জন্য এই সংস্করণটি Off-Set এ ছাপাতে বাধ্য হলাম। কিন্তু দামের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছি মূল্য যতটা না হলেই নয় সেরকমই রাখলাম। আপনারা যারা পড়বেন বা পড়ছেন তাদের কাছ থেকে যদি উপদেশ পাই তাহলে ভবিষ্যতে উপকৃত হ'ব। চেষ্টা সত্ত্বেও যদি ভুল ত্রুটি থাকে তার জন্য মার্জনা চাইছি। এই প্রসঙ্গে আমি আবার বলছি যে এই বইটির প্রত্যেকটি ঘটনা ও চরিত্র সত্য, তিব্বতের ধর্মগুরু দালাই লামাকে এই বইটির ইংরেজী তর্জ্জমা করে শোনানো হয়েছে এবং তিনি এই বইটিকে তার নিজের রেফারেন্স বুক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিব্বতের বহু ঘটনা এবং বহু জিনিস বিভিন্ন লেখকের দ্বারা ভুল ব্যাখ্যাও হয়েছে কাজেই আমার এই বইটিতে কিছু তত্ব সত্যকে প্রকাশ করেছে। ঘরে বসে যারা ভ্রমন কাহিনী লেখেন আমি তাদের মধ্যে পড়িনা—আমি তাই বারবার বলি যে—আমি সাহিত্যিক নই আমি সাধারণ এক পর্যটক মাত্র। আপনাদের সকলকে প্রীতি ও শ্রদ্ধা জানিয়ে তৃতীয় সংস্করণটি নিবেদন করলাম।

শান্তিনিকেতন— **বিমল দে**

মার্চ ১৯৮৮

ষষ্ঠ সংস্করণের উপক্রমণিকা

অগণিত পাঠক পাঠিকাদের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ নিয়ে প্রকাশিত হল মহাতীর্থের শেষ যাত্রী ষষ্ঠ সংস্করণ। আমার লেখা সার্থক। কৈলাসনাথ ও মানস সরোবর শ্রেষ্ঠ তীর্থ বহুবছরের বন্ধ দরজা আবার খুলেছে, আজকাল নিয়মিতভাবে তীর্থযাত্রীদের আনাগোনা। কৈলাসনাথ ও মানস সরোবর শুধু হিন্দু তীর্থ নয়, এ ক্ষেত্র সার্বজনীন। জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসছে অগণিত অভিযাত্রী ও কৌতূহলী পর্যটকের দল। কৈলাস পরিক্রমার পর তারা সবাই একমত, "কিছু পেলাম, অনুভব করলাম।" এর বেশী কিছু নয়, এখানেই থেমে গেছে ভাষা। সত্য নিজেই প্রকাশিত। যুগ যুগান্তরের আকর্ষণ আজও বিদ্যমান।

প্রতি বছর অগণিত চিঠিপত্র ও যোগাযোগের মাধ্যমে বারবার যারা আমাকে উৎসাহিত করছেন তাদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। অনেক সাধারণ প্রশ্ন বার বার এসেছে। এলাহাবাদ ও নাসিকের কুম্ভ মেলায় জ্ঞানী মহল ও পণ্ডিতসভার আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে তাদের নিরুৎসাহ করেছি কিন্তু তাদের আশীর্বাদ থেকে আমি বঞ্চিত হইনি। সাধু বা সন্ন্যাসী বেশে তারা আমাকে পাননি।

মহাতীর্থের শেষ যাত্রীর সেই মৌনী বাবা, গৃহপলাতক সেই বালকটির বয়স আজ সত্তরের কোঠায়। বই পড়তে পড়তে অনেকেই সেই পুরনো ঘটনাকে বর্তমানে এনেছেন, এটা পাঠক-পাঠিকাদের গুণ। অনেকে ভেবেছেন সেই মৌনী বাবা আজ একজন বিরাট যোগীপুরুষ। শারীরিক অবস্থা ও পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে তাকিয়ে তারাও নিজেদের ভ্রান্তি স্বীকার করেছেন।

আমি গৃহী, সাধারণ মানুষ, ভূ-পর্যটক। অধিকাংশ সময়ে থাকি ভারতের বাইরে। আমি মনেপ্রাণে স্বীকার করি শ্রীশংকরাচার্যের উক্তি — "বান্ধবাঃ শিব ভক্তাশ্চ স্বদেশো ভূবন ত্রয়ম্।" অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তাকে যারা ভক্তি করে তারাই আমার বন্ধু আর এই ত্রিভূবনই আমার দেশ। সব ধর্মেই লেখা আছে যে, সৃষ্টিকর্তা সেই একই। চিরসত্য সর্বজনগ্রাহ্য তিনি সর্বজনপূজ্য।

১৯৫৬ সালে আমি গুরুজীর সঙ্গে গ্যাংটক লাসা হয়ে কৈলাসনাথ ও মানস সরোবরে গিয়েছিলাম, ওটা ছিল পথহারা এক পথিকের পথ। ভারত থেকে কৈলাসে যাওয়ার পথ ওটা নয়। কৈলাসনাথ ও মানস সরোবর থেকে ফিরে আসার পথ একই।

বর্তমান পথের কয়েকটা সম্ভাবনা উল্লেখ করছি :

ভারত ও চিন সরকারের অনুমোদিত কৈলাসনাথ ও মানস সরোবরের পথ: দিল্লী থেকে হালদোয়ানি— নৈনিতাল থেকেও দলে যোগ দেওয়া যায়। হালদোয়ানি—কৌসানি —বাগেশ্বর—ধরচুলা—পাংগু—বুধি—গুন্‌জি—লিপুলেখ্ পাশ—তাকলাকোট। সেখান থেকে মানস সরোবর ও রাক্ষসতালের মধ্য দিয়ে এগিয়ে তারপর পারখা। পারখা থেকে

আরও উত্তরে তারচেন। তাকলাকোট থেকে তারচেন পর্যন্ত আজকাল জীপ সার্ভিস হয়েছে। তারচেন থেকে কৈলাসনাথ পরিক্রমা। পুরনো রীতি অনুযায়ী পায়ে হেঁটে। ধার্মিক তিব্বতীরা দণ্ডি কেটে প্রদক্ষিণ করে। পারখা থেকে লাসা যাওয়ার ভাল রাস্তা আছে। কৈলাসনাথ ও মানস সরোবরের তীর্থ যাত্রীদের ঐ একই পথে ফিরে আসতে হবে।

কাঠমাণ্ডু থেকে যেতে হলে ভারতীয়দের বিশেষ করে নিম্নলিখিত পথটাই সবচেয়ে কম কষ্টসাধ্য :

কাঠমাণ্ডু থেকে সীমান্ত কোডারী তারপর পায়ে হেঁটে 'ফ্রেন্ডশিপ ব্রীজ' পার হতে হবে, তারপর জীপে চেকপোস্ট ঝাংসু। ঝাংসু থেকে নিয়ালম-সাগা পারিয়াং-তারচেন পর্যন্ত গাড়ি যায়। তারপর পরিক্রমা পুজো স্নান মনস্কামনা প্রার্থনা, সব একদিনের মধ্যেই শেষ করতে হবে তারপর একই পথে ফেরা।

বিদেশি যারা কৈলাসনাথ ও মানস সরোবর ট্রেকিং করতে যান তাদের জন্য অনেক পথ ও ব্যবস্থা আছে। অধিকাংশই আজকাল কাঠমাণ্ডু থেকে লাসা প্লেনে, লাসা এয়ারপোর্ট কিন্তু লাসা থেকে অনেক দূরে কৈলাসের পথে। তারপর লাসা থেকে গাড়িতে ব্রহ্মপুত্রের ধার ধরে অর্থাৎ হাইওয়ে ধরে সরাসরি কৈলাসের পথ। চিন বা তিব্বত থেকে এভারেস্ট অভিযানের অনেক সুবন্দোবস্ত হয়েছে, সবাইকেই লাসা বা কাঠমাণ্ডু থেকে অনুমতি পত্র নিতে হবে।

যদিও মহাতীর্থের শেষ যাত্রী আমার পুরনো অভিজ্ঞতার ঝুলি, তবুও বার বার প্রশ্ন এসেছে— "তিব্বতের ওপর আপনার কি ধারণা?" স্বীকার করতেই হবে যে, কৈলাসনাথ প্রসঙ্গ এলে তিব্বত প্রশ্ন আসবেই। তিব্বত আমার জীবনের প্রথম বহির্ভারতের অভিজ্ঞতা, এক ঝলক ভবিষ্যতের আলো। সেই সময় থেকেই তিব্বত ও তিব্বতিরা আমার মনকে ঘিরে রেখেছে। তিব্বত আমার তীর্থ। তিব্বতের রহস্য আমার রহস্য, তিব্বতের ভবিষ্যৎ আমার ভবিষ্যৎ। ভগবান ভক্তের অধীন। প্রার্থনা তিনি শোনেন তবে ধৈর্য্য ধরে থাকতে হবে তাঁর উত্তরের জন্য।

চিনা কর্তৃপক্ষ যখন নাথু লা ও অন্যান্য কৈলাসের পথ তীর্থযাত্রীদের জন্য বন্ধ করে দেন তখন ভারতীয় পরিব্রাজক ও সাধু সন্ন্যাসীরা বার বার প্রার্থনা করেন কৈলাসনাথকে বাঁচানোর জন্য। বহু ধ্যান-পূজা-যজ্ঞের মাধ্যমে সাধু, যোগী, জ্ঞানী ও গুণীজনেরা তাদের মনের কথা পৌঁছে দেন সেই পরম শিবের শ্রীচরণে। আজ কৈলাসনাথ ও মানস সরোবরের পথে আবার চলেছে শত সহস্র তীর্থযাত্রী। ভগবান শুনেছেন ভক্তের প্রার্থনা।

আজ তিব্বতের নতুন রূপ। সম্প্রতি বেশ কয়েকবার তিব্বত ঘুরে এসেছি। এই পুস্তকের শেষের অধ্যায়ে সে কথা জানালাম। ১৯৫৬ সালের পর তিব্বতের অভাবনীয় পরিবর্তন পর্যটক মাত্রেই চোখে পড়বে। কৈলাসনাথ ও মানস সরোবর আগের মতই আছে, তবে ভ্রমণ-পরিক্রমার ব্যবস্থা আরও সহজ হয়েছে। পরিবহন ব্যবস্থারও অনেক উন্নতি হয়েছে।

পোতালা প্রাসাদ যেমন ছিল তেমনই আছে, তবে রাজশূন্য রাজপ্রাসাদ। আগে পোতালা থেকে জোখাং মন্দির সহজেই দেখা যেত, আজকাল নতুন নতুন প্রচুর ঘর বাড়ি গড়ে উঠেছে তাই জোখাং মন্দির দূর থেকে দেখা প্রায় অসম্ভব। প্রতি বছর ১লা অক্টোবর চিনের 'জাতীয় উৎসব' উপলক্ষে পোতালা প্রাসাদের সম্মুখ প্রাঙ্গণে চিনা সৈন্যদের কুচকাওয়াজ ও পতাকা উত্তোলনের সমারোহ দেখলে মনেই হবে না যে এটা তিব্বতের রাজধানী লাসা। লাসা একনজরে একটি চিনা শহর। নিত্যনতুন চিনা ব্যবসায়ীদের দোকান, হোটেলে চিনা খাবার, নাইট ক্লাব, নারীজগতের ব্যবসা, চিনা ভাষায় কথাবার্তা সব কিছুর মধ্যে বার বার একটা প্রশ্ন মনে জাগে, সেটা হল 'তিব্বত কোথায়?'

২০০৬ সালে সবাইকে অবাক করে দিল। গোলমুদ্-লাসা রেলপথ ইউরোপ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে দিয়েছে। পৃথিবীর সর্বোচ্চ রেলপথ। গোলমুদ থেকে ট্রেন লাসা আসার পথে এই বিরাট অত্যাধুনিক হাই-স্পিড এক্সপ্রেস কোনও কোনও সময় চার হাজার চারশ পঞ্চাশ মিঃ (Wankum 4485 m.), চার হাজার পাঁচশ সাতচল্লিশ মিঃ (Tuotuo 4547 m.), চার হাজার আটশ তেইশ মিঃ (Queqiao 4823 m.), সর্বোচ্চতায় উঠেছে পাঁচ হাজার তিরিশ মিঃ (Xiudonggu 5030 m.)। দার্জিলিং ও সিমলায় টয় ট্রেন দেখে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই আর এখানকার এই দৈত্যাকৃতি অভাবনীয় ট্রেনের কথা ভাবলে আমাদের ভাষা থেমে যায়। বরফে ঢাকা দেশে কি করে সম্ভব হল! আজকাল মূল চিন দেশ থেকে দৈনিক আটটা ট্রেন ঢুকছে লাসায়, আনছে সামগ্রী, সামরিক বাহিনী, চিনা নাগরিক। চিনের রাজধানী বেইজিং থেকে লাসায় আসতে লাগছে মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা। ট্রেনপথের সম্পূর্ণ পরিকল্পনায় ব্যয় হয়েছে (33.9 milliards Yuans), চার মিলিয়ার্ড ইউরো (4 milliards Euro)।

এই বিরাট অঙ্ক তিব্বতকে বাঁচাবার জন্য নিশ্চয় নয়, তিব্বতের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের জন্যও নয়, আসলে এর পেছনে রয়েছে বিরাট ভবিষ্যৎ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক পরিকল্পনা। চিন সরকার বলছে, 'তিব্বতের উন্নতি মানেই চিনের উন্নতি।'

মহাতীর্থের শেষ যাত্রীর চোখে ভাসা লাসা আর কৈলাসনাথ ও মানস সরোবরের দৃশ্য আজ অবিশ্বাস্য স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। স্বাধীন তিব্বতের কথা আমি ভাবিনা, মহামান্য দালাই লামাও সে আশা ত্যাগ করেছেন। আমি পর্যটক। দর্শন আমার ধর্ম। শুধু ভাবি তিব্বতের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে কি বাঁচানো যাবে? কয়েক বছর আগে মেকং-এর উৎস থেকে সংগম ভ্রমণ-অভিযানের সময় একটা উৎসাহজনক দৃষ্টান্ত দেখেছি, সেটা হচ্ছে গানসু (Gansu), সিচুয়ান (Sichuan) ও ইউনান (Yunan) প্রদেশের অনেক উপজাতি এখনও তাদের ধর্ম ও ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। তাদের মতে

সরকার তাদের ভাষা, নাচ-গান, পোশাক, খাদ্য, ধর্ম ইত্যাদির ওপর স্বাধীনতা দিয়েছে —সুখের বিষয়, তবে প্রহরীর সজাগ দৃষ্টি সদা বিদ্যমান।

ভাগ্যক্রমে এবং কর্মফলে পরিব্রাজক হিসেবে আমার নাম চিনা দূতাবাসে পরিচিত। ওদের ফাইলে আছে যে আমি ইন্দাস ও সাংপো (ব্রহ্মপুত্র) দেখেছি। মেকং নদীর উৎসও আমার পরিচিত এখন বাকি চিনের আরও তিনটে প্রধান নদী যার উৎস এই তিব্বতেই। মেকং নদীর উৎস থেকে সংগম ভ্রমণ-অভিযান সমাপ্তির পর একটা দরখাস্ত জমা দিয়েছিলাম তাতে আবেদন করেছিলাম— "আমার পরবর্তী ভ্রমণ-অভিযান আম্‌দো ও খাম্ এলাকায় অবস্থিত তিনটি নদীর উৎস। হোয়াং হো বা ইয়েলো রিভার, ইয়াংসি জিয়াং, সালুয়েন জিয়াং। ২০০৭ সালের অক্টোবরে আমাদের সম্মতি পত্র এল, ভিসা পেলাম। মহাতীর্থের শেষ যাত্রীর ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকায় আমি এই তিন নদীর উৎস ভ্রমণের কথা লিপিবদ্ধ করতে চাই না, সেটা আমার উদ্দেশ্যও নয়। আসলে তিব্বতের আর একটা নতুন দিক নজরে পড়ল। তিব্বতের বর্তমান ধর্ম রক্ষার আর একটা দিক, অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। তিব্বতে বুদ্ধ ধর্ম্ম ও প্রাচীন ঐতিহ্যকে উচ্ছেদ করার বহু ঘটনা শুনেছি— তাই অবাক হয়ে গেলাম। মনকে সান্ত্বনা দিলাম সব কিছুই যে খারাপ তা নয়।

অত্যধিক পর্বতসঙ্কুল এলাকা খাম্ অঞ্চল, প্রায়ই নদীর খাত। চেংদু থেকে বাসে পশ্চিমের বাতাং দুদিনের পথ, তারপর বাতাং থেকে উত্তরে জীপে আরও কুড়ি ঘণ্টা পর গানসি (Ganzi) শহর। গান্‌সি ও কান্‌সি একই শহরের দুই নাম, একটা তিব্বতি ভাষায় অপরটি চিনা ভাষায়। গান্‌সি থেকে জীপে পাঁচ হাজার মিটার উচ্চতায় চোলা পাহাড়ের তুষারশুভ্র চোলা শৃঙ্গ (Chola)। প্রায় চার হাজার মিটার উচ্চতায় পাস্ (Chola Pass)। পাহাড়ের এদিকে আসতেই চোখে পড়ল নয়নাভিরাম দৃশ্য। পাহাড়ি উপত্যকায় সুন্দর একটি নদী, দূরে বরফে ঢাকা পাহাড় অনেকটা গীয়াৎসের কাছে ব্রহ্মপুত্রের মত, চোলা পাহাড়ের এই অংশটা। হঠাৎ খাড়া পাঁচিল হয়ে নীচে প্রায় পঁচিশ মিটার নেমে এসেছে। আমার গাইড্ সামনে নদীর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। শত শত পিপড়ের সারির মত ঘন লাল বর্ণের পদার্থগুলো এগিয়ে চলেছে। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কি ব্যাপার, ওরা কারা?" উত্তরে গাইড্ বলল— "বিকেল বেলা সন্ন্যাসিনীরা ঘরে ফিরে যাচ্ছে"। ভীষণভাবে মনকে নাড়া দিল, এরা কারা? পাহাড়ের এই অজ্ঞাত স্থানে কারা বাস করছে? পাহাড়ের আরও কিনারায় এসে দেখলাম আর এক দৃশ্য। দূরে দুটো প্যাগোডা ধরনের বাড়ি আর তার সামনে কয়েক শ নয়, হাজার হাজার ছোট ছোট কাঠের ঝুপড়ি ঘর। দূরে মনেস্ট্রিতে থাকেন মহান টুল্‌কু রিম্‌পোচে। আর কাঠের ঘরগুলোতে থাকে সন্ন্যাসিনীরা। সকাল বেলা প্রার্থনা শেষে খাওয়া দাওয়া, তারপর যে যার চলে যায় পাহাড়ে জঙ্গলে। সেখানে সারাদিন ধরে নির্জনে ধ্যান উপাসনা, তারপর সূর্যাস্তের আগেই ফিরে আসে আশ্রমে। পাহাড়ের

নীচে নদীর ওপর একটাই সেতু সকলকেই পার হতে হয়। সেতুর ওপারেই বাঁ দিকে হাজার হাজার ডেরা ঘর, আর দূরে দেখা যাচ্ছে মনেস্ট্রি। নীচের নদীটা সম্ভবত ইয়াংসির অন্যতম উৎস। সে রাতে আমরা গ্রামীণ চটিতে থেকে পরের দিন খুব ভোরে পাহাড় থেকে নেমে সেতু পার হয়ে মহামান্য টুল্‌কু রিম্‌পোচের মন্দিরে ঢুকলাম।

ভোরের প্রার্থনা ও ধ্যান শেষে টুল্‌কু রিম্‌পোচে আমাদের ডাকলেন। প্রণাম করে আমার পরিচয় দিতেই তিনি খুব আনন্দিত হয়ে আমাকে পাশে বসালেন। দোভাষীর মাধ্যমেই আমাদের আলোচনা শুরু হল। আমি ভারতীয় সেটাই প্রথম পরিচয় তারপর যখন তিনি শুনলেন আমি কলকাতার তখন আরও খুশি, তারপর খুশির মাত্রা বেড়েই চলল— যখন শুনলেন যে আমি কৈলাসনাথ ও মানস সরোবর ঘুরেছি আর তিব্বতের ওপর বইও লিখেছি, তখন তাঁর আনন্দ আর ধরে রাখতে পারলেন না, তাঁর গাম্ভীর্য্যকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বাচ্চা ছেলের মত আমাকে জড়িয়ে ধরলেন যেন স্বয়ং বোধিসত্তের দর্শন পেয়েছেন। আমাদের আলোচনা আস্তে আস্তে গভীরে পৌঁছল। বেলা দশটার সময় সাম্পার জন্য পাশের ঘরে এসে বসলাম। ঘরে তাঁর অতি আপন পাঁচজন শিষ্যা ছিলেন তারা আমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল আমিও তাদের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলাম।

প্রায় দুঘণ্টা ধরে আমাদের আলোচনা চলল। তারপর তিনি হঠাৎ উঠে পড়লেন। আমরা তাঁকে অনুসরণ করলাম। পাশের আর একটি বাড়িতে ঢুকলাম, সেখানে বিরাট গ্রন্থাগার সারি সারি ছোট ছোট কুলুঙ্গি, প্রত্যেকটি খোপই পুস্তকে ভর্তি। তিনি একটা মই টেনে উপরে উঠে অতি সাবধানে কাপড়ে জড়ানো একটা বই নিয়ে নামলেন তারপর নীচে নেমে ছোট হাত-টেবিলে বসে অতি ভক্তি সহকারে বার বার প্রণাম করে একের পর এক কাপড়ের ভাঁজ খুলে বার করলেন একটা বই, আমি অবাক হয়ে গেলাম বাংলা হরফে লেখা 'ধম্মপদ'। আমার মুখ থেকে ধম্মপদ কথাটা শুনেই তিনি সপ্রশংস দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকালেন— 'আপনি পালি ভাষা জানেন?' আমি বললাম, 'পালি ও বাঙলা একই অক্ষর আর খুবই মিল বুঝতে বা পড়তে অসুবিধা হয় না।' এবার মহামান্য টুল্‌কু রিম্‌পোচে উঠলেন আর একটা বই আনলেন তিব্বতি অক্ষরে ধম্মপদ। যেমন আমরা ভগবদ্‌গীতা পড়ি বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত শব্দ। আমরা দুজনে ধম্মপদের একটা শ্লোক একসঙ্গে পাঠ করলাম। আমার পরীক্ষা হয়ে গেল, প্রশংসাপত্র পেয়ে গেলাম।

তিনি এবারে ভাবে গদগদ হয়ে বললেন,— 'এই বইটা আমার গুরুজি পাঠ করতেন, এই অমূল্য সম্পত্তিটা এখন আমার হাতে। এই গ্রন্থটি রক্ষা করার গুরু দায়িত্ব আমার ওপর'। বিকেল বেলা মহান টুল্‌কু রিম্‌পোচের মুখ থেকে বিস্তারিত শুনলাম। তিব্বতে পুরনো গুম্ফা আশ্রম বা মনেস্ট্রিগুলোতে উপযুক্ত গুরুর অভাবে শিষ্য বা ভক্তের সংখ্যা দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে, তারা উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ছে। চিনা কর্তৃপক্ষের নজর ও শাসন তিব্বতিদের ধর্মে নিরুৎসাহ করছে। বহু গুম্ফা পরিত্যক্ত ও ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। চোখে দেখা বহু ঘটনা থেকে ভেবেছিলাম, ব্যবসা

বাণিজ্য সম্প্রসারণ, অর্থনৈতিক উন্নতি, সড়ক ও পরিবহণ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বিশেষ করে চিন সরকারের জাতীয়তাবাদের প্রসার ও প্রচার ছাড়া অন্য দিকে তাদের মন নেই, কিন্তু এই মনেস্ট্রিটা দেখে আমার ধারণাটা পাল্টে গেল, বুঝলাম এখনও আছে সব শেষ হয়নি।

আমার গাইড বলেছে, এই বিরাট ইয়াচেন মনেস্ট্রির প্রধান, মহান টুল্‌কু রিম্‌পোচে। বর্তমান তিব্বতে বিশেষ করে চোলা পাহাড়ে হারিয়ে যাওয়া লোকচক্ষুর আড়ালে গড়ে উঠেছে ইয়াচেন গুম্ফা। এখানে চিনা, তিব্বতি ও স্থানীয় পাহাড়ি ভাষার এক অপূর্ব মিশ্রণ। টুল্‌কু কথাটার অর্থ পুনর্জন্ম। টুল্‌কু রিম্‌পোচে মানে গুরুজীর পুনর্জন্ম। টুল্‌কু রিম্‌পোচের আসল নাম আচুক। চিনা সরকারি খাতায় লেখা আচুক রিম্‌পোচে। পুরো নাম জামিরাং লুংডক গীয়াল্‌ট্‌সেন আচুক্‌ রিম্‌পোচে (Jamyang Lungdok Gyaltsen Achuk Rimpoche)। ইনি চল্লিশ বছর নির্জনে সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর এখানে ছোট একটা কুড়েঘর করে তাঁর আখড়া স্থাপন করেন।

তিব্বতের এই নির্জন অজ্ঞাত এবং প্রকৃতির রুক্ষ আবহাওয়ায় একমাত্র সত্যিকারের সাধক ছাড়া কেউ থাকতে পারবে না, কাজেই অহেতুক আগন্তুক ও কৌতূহলী ভক্তের ভিড় হবেনা। ধ্যান ও সাধনার মাধ্যমে মুক্তি ও নির্বাণ লাভের উপযুক্ত ক্ষেত্র। তপস্যার জন্য অজ্ঞাত বাস।

আচুক রিম্‌পোচে বা আচুক লামা সতেরো শতাব্দীর বিখ্যাত গুরু লংসেল নীইংপো (Longsel Nyingpo)-র আত্মাধারী, পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছেন। গুরু লংসেল নীইংপোর আদি গুরু ছিলেন ভারতীয় গুরু রিম্‌পোচে সম্ভবত অষ্টম শতাব্দীর তান্ত্রিক গুরু অতীশ দীপঙ্করের শিষ্য। তিব্বতের অন্যতম প্রাচীন নীইংমা সম্প্রদায়ভুক্ত এই পরম্পরা। ইয়াচেন গুম্ফা নবনির্মিত সংস্থা।

১৯৮০ সালে তিনি এই নয়নাভিরাম পাহাড় ও নদীর কোলে তাঁর আশ্রম স্থাপন করার পর কি করে ভক্তদের এখানে আকর্ষণ করলেন তিনি নিজেও জানেন না, শুধু বলেন গুরু কৃপা। তিনি কারও কাছ থেকে একটা পয়সাও নেন না, তবে খাবার জন্য আটা, চাল, ডাল, আলু, গাজর গ্রহণ করেন। ভক্ত শিষ্যরাই স্থানীয় পাথর আর পিঠে করে নিয়ে এসেছে কাঠ, সিমেন্ট, লোহা। কোন কোন সময় দশ পনেরোদিনের পথ পায়ে হেঁটে। কারণ এখানে আসার কোনও রাস্তা নেই। আশ্রমে যাওয়ার জন্য যে সেতুটা সেটাও ভক্তদেরই দান। নদী পার হওয়ার একমাত্র উপায়। শীতের সময় নদীর জল জমে যায়, তখন অনায়াসে যাতায়াত করা যায়, কিন্তু অত্যধিক ঠাণ্ডা। দশ বছরের (১৯৯০) মধ্যেই আচুক রিম্‌পোচের ভক্তের সংখ্যা দাঁড়াল পাঁচ হাজারে। ভক্তেরা আচুক রিম্‌পোচের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে তারপর দীক্ষা। দীক্ষার পর তারা বাড়ি ফিরে না গিয়ে ওখানেই থেকে যায় ধ্যানের বিভিন্ন প্রণালী প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার জন্য। তারাই তৈরি করেছে কাঠ ও প্লাস্টিকের ছোট ছোট ঘর। শুধু থাকার জন্যই গড়ে উঠেছে কয়েক হাজার কুড়ে ঘর। দিনে মাত্র একবেলা খিচুড়ি বা ছাতু বা সাম্পা মনেস্ট্রি

থেকে দেওয়া হয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে মহিলারা যারা আসে দু-একদিনের জন্য তারা থেকে যায় একমাস-দুমাস-তিনমাস-বছর, বছরের পর বছর। মেয়েদের সংখ্যাই বেশি— প্রায় আট হাজার মহিলা, তারা যতদিন খুশি এই অস্থায়ী গ্রামে থাকতে পারে। পুরুষদের মাত্র মাসখানেক থাকার বন্দোবস্ত। পুরুষদের চলে যেতে হবে, নিজস্ব সংসার চাকরী বজায় রাখতে হবে, আর ভগবান বুদ্ধের অমর বাণী প্রচার করতে হবে। এখানে যারা আছে বা আসে তারা অধিকাংশই চিনা বা স্থানীয় উপজাতি, তিব্বতিদের সংখ্যা কম। ইয়াচেন অঞ্চলটা আগে তিব্বতের মধ্যেই ছিল আজকাল চিন ও তিব্বতের সীমানা এই অঞ্চলের ওপর দিয়েই গেছে।

নতুনাকারে পুরনো ধর্মের আবির্ভাব অবিশ্বাস্য অথচ সত্য।

আচুক রিম্‌পোচের কত বয়স জানিনা, আন্দাজে মনে হল একশ বছরের কাছাকাছি। কথায় বলে যোগীপুরুষদের বয়স জিজ্ঞাসা করাটাই পাপ। বিকেল বেলা উনি আমাদের মনেস্ট্রিতেই থাকতে বললেন। ব্রিজের কাছেই একটা পুলিশ স্টেশন, সেখানে গুরুজীর সঙ্গেই গেলাম থাকার জন্য অনুমতি নিতে হবে চিনা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। আমার ব্যাপারটা সোজা, হোয়াংহো ও ইয়াংসি জিয়াং নদীর উৎস সন্ধানের অভিযাত্রী এখানে কোনও হোটেল নেই, থাকার জন্য এসেছি কাজেই অনুমতি পাওয়া গেল। আমার ভাগ্য ভাল আচুক রিম্‌পোচের পাশের ঘরেই আমার থাকার বন্দোবস্ত হল। গুরুজী মনে হয় বহু বছর পর কথা বলার মত লোক পেয়েছেন। উপযুক্ত সময় ও সুযোগ পেয়ে আমার মনের কথাটা বলে ফেললাম—

—'আপনার ধর্মপ্রচার ও ভক্তের আনাগোনায় সরকার কোনও বাধা দিচ্ছে না? শুনেছি সরকার তিব্বতি ধর্ম বিরোধী।'

তিনি আমাকে থামিয়ে দিলেন— 'ও সব প্রশ্ন আমাকে করে লাভ নেই।' বলেই তিনি দোভাষীর দিকে তাকালেন, দোভাষী কি বলল জানিনা। রিম্‌পোচে আমার দিকে ঝুঁকে খুব অন্তরঙ্গভাবে বললেন,— 'সরকারের কাজ সরকার করছে, আমি করছি আমার কাজ। ভগবান তথাগত সবার উপরে, তাঁর ইচ্ছায়ই জগৎ চলছে।'

শোওয়ার আগে তিনি আবার প্রসঙ্গটা তুললেন। দোভাষি খুব খুশী।

"২০০০ সালে ইয়াচেন গুম্ফা লোকে লোকারণ্য সবাই চায় আমার দর্শন মানেই আদিগুরুর দর্শন। চারপাশে প্রচার হয়ে গেল এই গুম্ফার কথা। সরকার এল পরীক্ষা করতে। সরকার দেখল নাম না জানা হাজার লোকের ভিড়। এই ভিড় সামলানো সরকারের কাজ। যাদের নামে কোনও পরিচয়পত্র নেই, যারা এই অঞ্চলে থাকে না, তাদের আশ্রম থেকে বের করে দেওয়া হল। হাজার হাজার কুড়েঘর ভেঙ্গে দেওয়া হল, মর্মান্তিক দৃশ্য কিন্তু সুখের বিষয় তাদের কোনও দৈহিক অত্যাচার বা কারাদন্ড দেওয়া হয়নি। শুধু বিজ্ঞাপন দেওয়া হল অজানা ও অচেনা লোকদের প্রবেশ নিষেধ। সবই তাঁর ইচ্ছা, ভগবান তথাগত সর্বদ্রষ্টা। ২০০১ সালে ভক্তের সংখ্যা পাঁচহাজার থেকে কমে তিনশোতে দাঁড়িয়েছিল। তারপর আবার শুরু হল ভক্তের আগমন। আজ

এখানকার স্থায়ী সন্ন্যাসিনীদের সংখ্যা দশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। তার একমাত্র কারণ আমরা তিব্বতের আদি ধর্ম নীইংমা সম্প্রদায়ভুক্ত। আমরা কোনওদিন রাজনীতি বা সরকারি আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকিনি। মানুষকে চিন্তামুক্ত আর দোষমুক্ত করে নির্বাণের পথ দেখানোই আমাদের ব্রত।"

পরম গুরু আচুক রিম্‌পোচের কথা শুনে আশ্বস্ত হলাম, দেখলাম তিব্বতের আর এক রূপ।

পাঠকদের অবগতির জন্য আমার ২০০৭ সালের ডায়েরি থেকে এই অংশটি তুলে ধরলাম।

মহাতীর্থের শেষ যাত্রীর ষষ্ঠ সংস্করণে বর্তমান তিব্বতের একটা রূপ এবং তিব্বত ও চিন সীমান্ত এলাকার ইয়াচেন গুম্ফার কিছু তথ্য যুক্ত হল। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে পুস্তকটির মূল্য বৃদ্ধি করতে বাধ্য হলাম, আশা করি আমার শুভানুধ্যায়ী পাঠক পাঠিকাগণ আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি আবার বলছি যে, আমি সাহিত্যিক নই, এক সাধারণ পর্যটক মাত্র। পরিব্রাজকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই বইটা পড়ুন। আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে এই সংস্করণটি নিবেদন করলাম।

শান্তিনিকেতন
শ্রীপঞ্চমী ১৪১৬ — বিমল দে
জানুয়ারি ২০১০

ভূ-পর্যটক বিমল দে রচিত গ্রন্থাবলী

তিব্বতের ওপর ভারতীয় ভাষায় শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ কাহিনী

মহাতীর্থের শেষ যাত্রী—২৩০.০০

ইংরাজি অনুবাদ : The last time I saw Tibet
Translated by Malobika Chaudhuri
Penguin Books, New Delhi Rs. 325.00

হিন্দী অনুবাদ : **महातीर्थ के अंतिम यात्री**
ल्हासा–कैलासनाथ–मानसरोवर
अनुवाद : दिलीप कुमार बनर्जी मूल्य : Rs. 275.00
लोकभारती, इलाहाबाद,
राजकमल, नई दिल्ली

⌘

জাপান-পেরু ও বলিভিয়ার আধ্যাত্মিক রহস্যভরা

সূর্য প্রণাম—১৮০.০০

⌘

পৃথিবীর বুকে সাইকেলে চলাকালীন বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলী

সুদূরের পিয়াসী—৫০০.০০

⌘

পৃথিবীর অন্যতম বিরল পর্যটক যিনি একই বছরে
উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু ভ্রমণ করেছেন

উত্তর মেরু - দক্ষিণ মেরু—২৬০.০০

সূচীপত্র

বাড়ি থেকে পালিয়ে	১
যাত্রা	২৬
একটি তিব্বতী পরিবার	৪১
ইয়াটুং শহর ও দুংকার গুম্ফা	৪৭
ফারি	৫৫
চলার কৌশল	৬২
কিয়াংফু গুম্ফা ও লামা শেরিং জোং	৭১
গীয়াৎসের পথে	৭৪
মহাতীর্থের পথ	৮৬
তীর্থযাত্রীর প্রথম অঞ্জলি	৮৯
আর্য তারার ধ্যান	১০৬
গীয়াৎসে থেকে সামদিং গুম্ফা	১১৯
দোরজে পামো	১৩২
ভাষা	১৩৭
প্রথম সাংপো দর্শন	১৩৯
চাক্সাম গুম্ফা	১৪১
পুণ্যতীর্থের দুয়ারে	১৫১
দ্রেপুং গুম্ফা	১৫৫
লামা ও শিক্ষাব্যবস্থা	১৬১
তিব্বতের ধর্ম ও ইতিহাস	১৬৪
লাসা ও মূল মন্দির জোখাং	১৭১
লাসা	১৮৩
রাজ প্রাসাদ পোতালা	১৮৭
লামা লামদুপ্	১৯৯
নরবুলিংকা	২০৩
দালাইলামা	২০৯
লাসায় শেষের কয়েকদিন	২১৬
কৈলাস যাত্রার প্রস্তুতি	২২২
কৈলাসের পথ সন্ধানে	২২৭
সাংপোর ওঝা	২২৯
ভয়ংকর রাত	২৪১
অচেনা আপনজন	২৪৫
সীগাৎসে	২৫০
পাঞ্চেন লামা	২৫৬
শুরু হল কৈলাসের পথ	২৬০
পাসাগুকের জ্ঞানী গুরু	২৬৬
ত্রাদুম্	২৭৮
দুর্গম পথ	২৮৮
মহাতীর্থের দরজায়	২৯১
মহাতীর্থ	২৯৯
মানসতীর্থে প্রথম রাত্রি	৩০৬
কৈলাসনাথ	৩১৬
কৈলাসবাবা	৩২৯
মিলারেপা	৩৪৭
মিলেনিয়ামে লাসা	৩৬৪

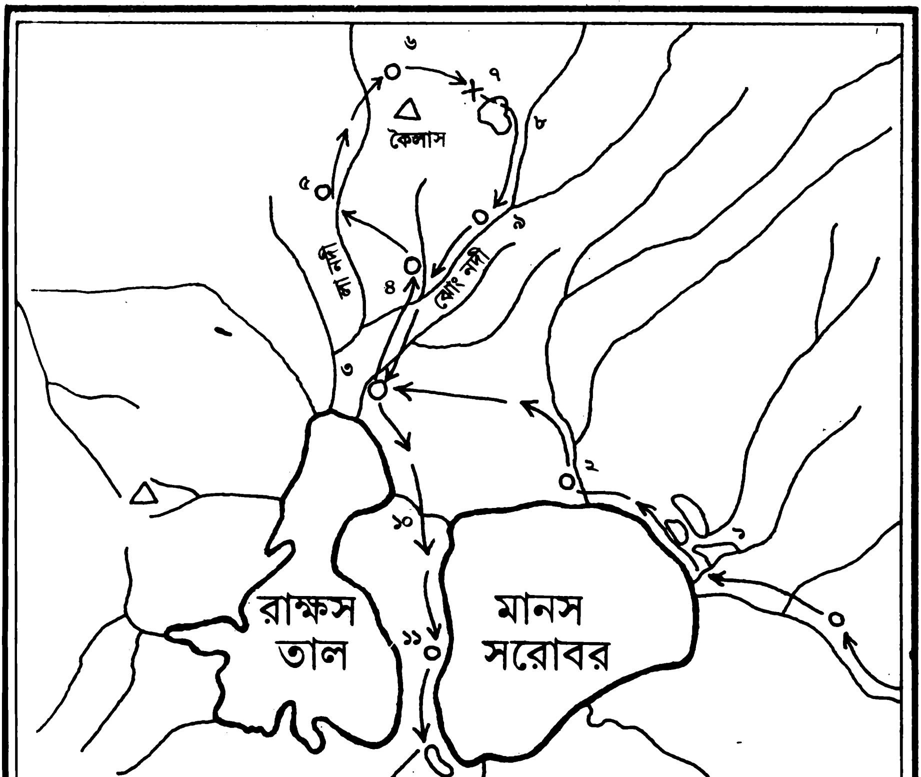

১.দিং তাসো, ২.লাং বোনা গুম্ফা, ৩.পারখা, ৪.তারচেন, ৫.নীয়াং-রী গুম্ফা, ৬.দীরাফুক গুম্ফা,
৭.দোলমা-লা, ৮. গৌরী কুণ্ড, ৯.জুফুলফুক গুম্ফা, ১০.গঙ্গা-চু, ১১.গুসুল-ফুক গুম্ফা,
১২.সুস্পাত তাসো, ১৩.গুরলা-লা, ১৪.শিমবিলিং গুম্ফা

মানস সরোবর পরিক্রমা—১০৩ কি.মি.
ও
কৈলাস পরিক্রমা—৫২ কি.মি.

এই পরিক্রমার সময় রাক্ষসতাল পরিক্রমা হয় না। রাক্ষসতাল ও মানস সরোবরের যোগাযোগ ঘটেছে উত্তরে গঙ্গা-চু নদীর মাধ্যমে। হিন্দুরা গঙ্গা-চুর পূণ্য সঙ্গমে তর্পনের পর শুরু করেন মানস পরিক্রমা। লামারা তাদের পরিক্রমা শুরু করেন সাধারণত সেরালুং গুম্ফা থেকে।

বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, কাশী ইত্যাদি তীর্থক্ষেত্রের সাথে কৈলাসনাথ বা মানস সরোবরের কোন তুলনা চলে না। অত্যাধিক শীত ও বরফের দেশ এই কৈলাসনাথ। এখানে স্থায়ী বাসিন্দা কেউ নেই, কোন মন্দিরও নেই। এখানকার প্রধান বৈশিষ্ট হল স্থান মাহাত্ম্য। দর্শন, স্পর্শ, অবগাহন, জপ, ধ্যান, প্রার্থনা, সাধুসঙ্গ,—এইগুলিই জীবন্মুক্তির পথ দেখিয়ে দেয়। ছোট ছোট তিব্বতী ধর্মশালা গুম্ফার আকারে এই অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে।

বাড়ী থেকে পালিয়ে

গুরুর পাল্লায় আমি পড়িনি, মনে হয় গুরুই আমার পাল্লায় পড়েছেন। ভদ্রলোক রাস্তার ধারে অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন, আমিই উপযাচক হয়ে তাঁর সেবায় লেগেছি। এখনি তিনি সুস্থ, আর বার-বারই আমাকে বলছেন—"বাড়ী ফিরে যা"। তাঁর কথায় আমি মোটেই কান দিই না শুধু মনে মনে হাসি আর বলি, বাড়ী ফিরে যাবার জন্যই কি আমি বাড়ী ছেড়েছি?

আমি গয়াতে এসেছি বেড়াতে, কোন রকমে ইছাপুর থেকে গয়াতে এসে পৌঁছেছি, ট্রেনে—বিনা টিকিটে আর এখানে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি মনের আনন্দে। হাতে যা পয়সা ছিল তা ট্রেনেই ঝাল-মুড়ি খেয়ে ফুরিয়েছি। যখন আমার করার কিছুই ছিল না ঠিক সেই সময়ই পেলাম এই সাধুবাবাকে।

গয়া, শহর হিসেবে খুব সুন্দর না হলেও এর একটি নিজস্ব আকর্ষণীয় ক্ষমতা আছে, ইহকালের পুণ্য আর পরলোকের প্রায়শ্চিত্ত এ-দুইয়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে গয়া। স্বর্গ আর নরকের সংগম। আমার খুব ভাল লাগছে এই জায়গাটায় থাকতে। কখনও বৌদ্ধ ও হিন্দু সাধুদের সাথে সৎসঙ্গে দিন কাটাই।

লোকে বলে সৎসঙ্গে মানসিক উন্নতি হয়, আমি বলবো শুধু মানসিক নয় শারীরিক উন্নতিও প্রচুর। আমার খোরাক যোগাচ্ছে এই সাধু-সঙ্গ।

গয়ার আকর্ষণ অনেক। যাঁরা অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাঁরা আসেন আলোর সন্ধানে, আর অনেকে আসেন আত্মার মুক্তির আশায়। আমি কেন এসেছি? আমি জানি না, আমি না চাই আলো না চাই মুক্তি। আমি যা দেখছি যা পাচ্ছি তাতেই আমার আনন্দ, এখানকার ধূলোতে পাচ্ছি স্বাধীনতার গন্ধ।

গয়ার সাধুবাবা, আমাকে আজকাল খুব বেশী পাত্তা দিচ্ছেন না। তাঁর মতে আমার বয়স অল্প এখনো সতেরো বছর পুরো হয়নি, সামনে আমার বিরাট ভবিষ্যত, লেখাপড়া শিখে মানুষ হওয়া দরকার। ভণ্ডামী করে মানুষ হওয়া যায় না। কাজেই তিনি রোজই বলেন—বাড়ী ফিরে যা বেটা। কিন্তু আমি যা পেয়েছি তা কি করে ছাড়ব? সাধুবাবাই আমার আকর্ষণ, কিন্তু মুখ ফুটে তাঁকে সে কথা বলিনি। সাধুবাবা কলকাতার মাড়োয়ারীদের মতো বাংলা বলেন, মনে হয় হিন্দীটাই তাঁর মাতৃভাষা, নেপালী ও ভূটিয়া ভাষাটাও তাঁর আয়ত্তে। পোশাকে তিনি তিব্বতী লামা, কথায় কথায় তিনি বেদ-বাক্য আওড়ান, গৌতমের হিতবাণী তাঁর কণ্ঠস্থ, হিন্দু ধর্মে তাঁর অগাধ জ্ঞান।

যতদূর জেনেছি, সারনাথের কোন এক মন্যাস্‌ত্রিতে তিনি অনেক বছর ছিলেন। তাঁর নিজের কোন আখড়া বা ডেরা নেই, বয়েস সত্তর বছরের কমতো নয়ই—এটা আমার আন্দাজ মাত্র। তাঁর সাথে আমার যোগাযোগ ধর্মশালায়, প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল রাস্তায়। আমার সম্পর্কে তাঁকে সব খুলেই বলেছি—অর্থাৎ বাপ-মা নেই, ছোট ভাই-বোন নেই। বাঁধন নেই, শিক্ষা দীক্ষা নেই, পকেটে পয়সা নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাধুবাবাকে কখনো ডাকি বাবা বলে, কখনও ডাকি সাধুবাবা বলে, আর যদি মন মেজাজ খুব ভাল থাকে তাহলে গুরুজী বলে সম্বোধন করি। আমাদের কথাবার্তা চলে বাংলা ও হিন্দীর সংমিশ্রণে। সাধুবাবার সঙ্গে আমার আলোচনা খুব বেশী হয় না। ধর্মশালার একটা ঘরে তিনি থাকেন, রাস্তার ধারে তিন ইঁটের উনোনে তিনি শুধু সবজি সেদ্ধ খান, খরচ প্রায় নেইই বলতে হবে, শুধু লখ্‌ড়ির বাণ্ডিলটাই কিনতে হয়। মাটির হাঁড়ি আর সরা তিনি পেয়েছিলেন বিনা পয়সায়। আমার প্রধান কাজ ছিল রোজ সকালবেলা বাজার করা।

বিনা পয়সায় বাজার করা, বড় অদ্ভুত কাজ, সব্‌জিওয়ালাদের কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে নিতে হয়, সহজ কথায় যাকে বলে ভিক্ষে করা। কোন কোন সময় একটা করলা পাবার জন্য সম্পূর্ণ সকালটাই ঘুরতে হত। বাজারের মধ্যে আলু আর আটা পাওয়াটাই ছিল সবচেয়ে সহজ, এই দায়িত্বটা আমি নিজের হাতেই নিয়েছিলাম। গুরুজীকে যদি বলতাম ভিক্ষে করতে যাচ্ছি তাহলেই তিনি ভয়ংকর ক্ষেপে যেতেন। তাঁর মতে এটা ভিক্ষে নয়, বিনয় ও নম্রতার অভ্যাস করা মাত্র। আমি মনে মনে বলতাম—যার নাম চালভাজা তাকেই বলে মুড়ি।

বাইশদিন পর, দুপুরবেলা বাজার করে গলদঘর্ম হয়ে ফিরেছি, ঘরে ঢুকতেই দেখি আরও তিনজন লামার সাথে সাধুবাবা খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় মগ্ন। আমি তাঁকে কোন রকম বিরক্ত না করে রান্নার আয়োজন করতে লাগলাম আর বারবার ঘরের মধ্যে তাকাতে লাগলাম। লামা তিনজনকে দেখে মনে হয় তারা সবাই পাহাড়ি অর্থাৎ শেরপা বা নেপালীদের মতো হবে। অনেকটা সাধুবাবার মতোই দেখতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের রান্না হল। পাঁচটা রুটি, চারটে আলু সেদ্ধ, একটা ভুট্টা আর কিছু পালংপাতা সেদ্ধ হয়ে গেল। তার মানে বাজার থেকে যা এনেছিলাম তার সবটাই কাজে লাগানো হয়েছে। সাধুবাবা একাহারী। বাজার থেকে যা পাওয়া যায় তার সবটাই রান্না করতে হবে। এটাই ছিল তাঁর নির্দেশ। প্রয়োজনের বেশী থাকলে তিনি রাস্তায় কাউকে ডেকে দিয়ে দিতেন, পরের দিনের জন্য তিনি কোনদিনই কিছু রাখতেন না।

লামা তিনজন আমাদের সাথেই খেলেন, এটা বলাই বাহুল্য গুরুজী বা আমার খাওয়া আর সেদিন হল না।

খাওয়া দাওয়ার পরই গুরুজী তিনজন লামার সাথে উঠে পড়লেন। তারপর তাঁর কাঁধের ছোট্ট থলিটা নিয়ে আমার মাথায় ছুঁইয়ে বললেন—জিতে রহ বেটা ভগবান তেরা ভালা করে।

তাঁর এই হঠাৎ আশীর্বাদে আমি চমকে উঠলাম, বুকের ভেতরটা ধরাস করে উঠল। জিজ্ঞেস করলাম—তার মানে? তিনি নির্লিপ্তভাবে জবাব দিলেন—তার মানে 'বিদায়'।

আমি হতবাক হয়ে গেছি, হঠাৎ তিনি ঘোষণা করলেন 'বিদায়', দু'মিনিট আগেও তিনি কিছু বলেননি। আমি এই সংবাদের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। তাঁর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েই রইলাম। তিনি আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বেরিয়ে গেলেন। আমার অবস্থা তখন খুবই সাংঘাতিক, রাগ আর অভিমানে আমার মেজাজ চরমে। রাগটাকে সামলাতে পারলাম না, দাঁতে দাঁত চেপে সাধুবাবাকে উদ্দেশ্য করে মাটির হাঁড়িটাকে তুলে আছড়ে ফেললাম রাস্তার ওপর, তারপর আশপাশের লোকেদের দিকে তাকিয়ে বললাম—ব্যাটা সাধুর নিকুচী করেচে। ভণ্ড নিমকহারাম, বেইমান, বাতে কষ্ট পাচ্ছিল সেবা দিয়ে সারিয়ে তুললাম, এখন দেখলেন তো নিজের দেশের লোক পেয়ে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে গেল ভুলে। মায়া মমতা বলে ওঁর মধ্যে কিছু নেই। ভাঙা হাঁড়িটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলাম আমার আনন্দের গয়া আজ চুরমার হয়ে গেল। আগের দিনও পেট ভরে খাওয়া হয়নি, আজকের রান্নাটাতো লামারাই খেয়ে গেলো, তার ওপর সাধুবাবার বিচ্ছেদ! আমার মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল, পা দুটো অসাড় হয়ে এল। আমার এই ছোট্ট দেহটাকে নিয়ে বসে পড়লাম ভাঙা হাঁড়িটার পাশে, পিতৃহারা শ্মশানযাত্রীর মতো। সেবা করার কি এই ফল? যাই হোক কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিজেকে সংযত করে নিলাম, আমি জানি এখানে আমাকে সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই, তাই ছুটে গেলাম সাধুবাবা যেই পথে গেছেন সেদিকেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই নজরে পড়ল চারজন লামাকে। সাধুবাবার পেছনে গিয়ে তাঁর ঝুলিটা টেনে ধরলাম। মনে হয় তিনি আমার অপেক্ষাতেই ছিলেন। তাঁর হাসিটা বড় চমৎকার, সহজ আর অভয় এই দুইয়ের অপূর্ব সমন্বয়। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—আমি জানি তোর কষ্ট হবে, কিন্তু এ জগতের সবই মায়াময়, কাজেই এর মধ্যে জড়িয়ে পড়িসনি। আমি অনেক দূর যাচ্ছি, কাছে হলে তোকে সঙ্গে নিতাম।

আমি আমার অভিমান ভুলে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় সেই অনেক দূর?

উত্তরে বললেন—গ্যাংটক।

আমি আপনাকে ভুল বুঝেছি, আমাকে ক্ষমা করুন। এই বলে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম, তারপর চেয়ে রইলাম তাঁর পথের দিকে। তিনি স্টেশনের দিকে গেলেন আর আমি ধরলাম ফল্গুর দিকের পথ।

তারপর আরও দুদিন কেটে গেছে।

সাধুবাবা যাবার পর থেকেই বার বার মনে হচ্ছে একটা শব্দ 'গ্যাংটক'। শিলিগুড়ি, দার্জিলিং আমি অনেকবার গিয়েছি, তাই আমি জানতাম যে শিলিগুড়ি হয়েই যেতে হয় সিকিমে, গ্যাংটক সিকিমের রাজধানী। রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ মনে হল,

তাইতো সেখানে গেলে কেমন হয়? ব্যস্ যেমনি মনে হওয়া, তেমনি চলা। মনের সুপ্ত আনন্দটাকে হঠাৎ যেন খুঁজে পেলাম এইতো পেলাম পথ।

তিনদিন পর আমি এসে গেলাম শিলিগুড়িতে, তারপর সেখান থেকে ট্রাকের মাথায় চড়ে এসে উপস্থিত হলাম ভারতের শেষ সীমানায় হিমালয়ের পাদদেশে, জায়গাটার নাম তিস্তা বাজার। মিলিটারী আর হাটবাজারের মালবাহী ট্রাকে বোঝাই একটা ছোট্ট কর্মব্যস্ত শহর। তারই পাশে গম্ভীরভাবে বয়ে চলেছে তিস্তা। সীমান্ত পার হতে মোটেই অসুবিধা হয়নি। মিলিটারী বা পুলিশ কেউ কিছুই জিজ্ঞাসা করল না। দেখে মনে হয় তাদের দৃষ্টি পণ্য আর বিদেশী নাগরিকদের ওপর। ভারতীয়রা তাদের মতে বিদেশী পর্যায়ভুক্ত নয়। হেঁটে সেতুর ওপর দিয়ে তিস্তা নদী পার হলাম। ওপারের মাটি ছুঁয়েই আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম—আমি এখন বিদেশে, জয় মা কালী!

তিস্তার এদিকে অর্থাৎ সিকিমের দিকেও রাস্তার দু'পাশে রয়েছে প্রচুর ট্রাক, বাস, জীপ আর ল্যাণ্ডরোভার; তাদের মধ্যে কেউ যাচ্ছে ভারতের দিকে আর কেউ যাচ্ছে উপরের দিকে। দু'পাশে লেপ্চা, ভুটিয়া আর সিকিমি লোকজনে ভর্তি। আশপাশে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে এই রাস্তাটাই সোজা উপরের দিকে উঠে গেছে—গ্যাংটকে যাবার এটাই প্রধান সড়ক; তবে ইচ্ছে করলে হেঁটেও যাওয়া যায়। হাঁটা পথে কারও মতে তিনদিন লাগে, কেউ বলল চারদিন লাগে, আবার কারও কারও মতে আরও বেশী। সঠিক করে কেউ কিছু বলতে পারে না, মাইলের হিসাব সাধারণ লোকেরা বোঝে না।

গয়াতে শেষের কয়েকদিন একটা হোটেলে বাসন মাজা ও ঘরে ঘরে চা পৌঁছে দেবার কাজ পেয়েছিলাম, তার থেকেই হাতে এসেছিল তিন টাকার মতো। এ পর্যন্ত আমার গাড়ীভাড়া লাগেনি, শুধু খাওয়া খরচা লেগেছে; হাতে এখনও আছে তেরো আনা। একটা চায়ের দোকানে ঢুকে দুটো আটা-চাপাটি ও এক গ্লাস গরম চা খেয়ে ধরলাম গ্যাংটকের পথ।

আহা! কি চমৎকার রাস্তা, এখানকার পাহাড়ী গাছের গন্ধ, জঙ্গল, আর পাহাড়ের সৌন্দর্য—মনে হয় এমন রাস্তা দিয়ে অনন্তকাল ধরে চললেও দেহে ক্লান্তি আসবে না। বাঁ দিকেই তিস্তা, ঠিক পাহাড়ের নীচে। পাহাড়ের কোলে দেখা যাচ্ছে তার দিগন্ত, পাথর আর বালির ওপর দিয়ে যেন আনন্দে সে বয়ে যাচ্ছে নীচের দিকে। দেখে কিছুতেই যেন মনে হয় না যে এই তিস্তাই ভয়ংকরী হয়ে গ্রাস করে শহর-গ্রাম আর শত-শত জীবন। শিবের এখানে যেন তাঁর শব মূর্তি, আর নীচে ধারণ করেন তাঁর তাণ্ডব মূর্তি।

ইংরেজি এপ্রিল মাস। এখানে শীতটা এখন বেশ গায়ে লাগছে। আমার পোশাক বলতে হাফ প্যান্ট, গেঞ্জি ও সার্ট, এখানকার ঠাণ্ডা আটকাবার মতো মোটেই নয়। এদিকটা কিছুই ভাবিনি, তবুও ওপরের দিকে ওঠার জন্য শীতটা এখনও লাগছে না।

চলতে চলতে প্রায়ই লরি বা ট্রাক থেকে ড্রাইভাররা মুখ বের করে জিজ্ঞেস করছে আমি যাবো নাকি তাদের সাথে, বারবারই আমি হেসে জবাব দিচ্ছি—না। লরির ছাদে

চড়ে গেলে ভাড়াটা খুবই নামমাত্র লাগে সে কথা শুনেছি, কিন্তু সেই নামমাত্র পয়সাও যে আমার কাছে নেই, কাজেই 'না' বলতে বাধ্য।

হিমালয়ের আছে সৌন্দর্য আর রাস্তার আছে আকর্ষণ। ঘণ্টা চারেক চলার পরই বুঝতে পারলাম যে এ কাজ যতটা সহজ ভেবেছিলাম ততটা নয়। তবে ভাগ্য ভাল যে রাস্তায় জলের অভাব নেই, একটু খুঁজলেই পাওয়া যায় ঝিরঝিরে ঝরণা, পাহাড়ের বুক চিরে সে আত্মপ্রকাশ করেছে পথিকদের বাঁচাবার জন্য। এখন বুঝলাম যে রাস্তাটা সত্যিই কষ্টকর। চলছি, হাঁপাচ্ছি আর বসছি, এইভাবেই এগিয়ে চলেছি; এমন সময় ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হলেন—একটা লরি এসে দাঁড়ালো, ড্রাইভারকে দেখেই মনে হলো বিহারী। আমাকে দেখেই সে জিজ্ঞাসা করলো—কোথায় যাবে? উত্তরে বললাম—গ্যাংটক। সে সঙ্গে সঙ্গে বলল—উঠে পড়। আমি তাকে বললাম— পকেটে একদম পয়সা নেই; সে হেসে উত্তর দিল—সে তো দেখেই বুঝতে পারছি। বুঝলাম সে দয়াপরবশ হয়ে আমার উপকার করতে প্রস্তুত। সে বুঝিয়ে বললো লরির ভেতরে নয় ছাদে উঠতে হবে। ত্রিপলের দড়িটা একটু কাটা মতো আছে, যে কোন মুহূর্তে ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। আমার কাজ হল সেটার দিকে নজর রাখা। যদি দড়িটা ছিঁড়ে যায় তাহলে লরির ছাদে শব্দ করে তাকে জানাতে হবে। তাতে দু'পক্ষেরই লাভ, ড্রাইভার নিশ্চিন্ত মনে চালাতে পারবে আর আমার বিনা খরচায় গ্যাংটক যাওয়া হবে। লরিতে সাধারণতঃ একজন সহকারী থাকে এক বিশেষ কাজে এই লরির সহকারী তিস্তা পুলে আটকা পড়ে গেছে, তাই সে একজন সহকারীর প্রয়োজনেই আমাকে নিতে বাধ্য হল।

লরি চলতে শুরু করলো, পাহাড়ী রাস্তা, কাজেই আস্তে আস্তে লরি চলতে লাগলো। কিন্তু রাস্তাটাকে যেখানে সোজা পেয়েছে সেখানেই সে গীয়ার চড়াচ্ছে, আর গাড়ীর ছাদে আমার অবস্থা কাহিল। কানের পাশ দিয়ে হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগলো। তারপর এমন অবস্থায় পৌঁছলাম যে গাড়ী আস্তে আস্তে গেলেও ঠাণ্ডা বাতাস আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটাবার পর আমি লরির ছাদে ঠক্ ঠক্ শব্দ করে গাড়ীটাকে থামাতে বাধ্য করলাম। লরিটা থামলে ড্রাইভারকে কাতর স্বরে বললাম যে আমি আর ওপরের ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য করতে পারছি না, আমাকে নামিয়ে দাও, আমি হেঁটেই যাবো। ড্রাইভার বুঝতে পারলো, হেসে বললো—ঠিক আছে। তবে আমরা অর্ধেকের বেশী পথ চলে এসেছি, বাকি পথটা লরির ভেতরে বসেই যেতে পারবো। রাস্তার ধারে একটা ভুটিয়া চায়ের দোকানে ঢুকে আমরা এক গ্লাস গরম চা খেয়ে আবার রওনা দিলাম গ্যাংটকের দিকে। বিকেল চারটের সময় আমরা গ্যাংটকে এসে পৌঁছলাম। গাড়ীতে তিস্তা বাজার থেকে সাধারণতঃ তিন ঘণ্টার পথ। ড্রাইভারকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে আমি নামলাম গ্যাংটক বড় বাজারের কাছে।

মাসখানেক আগে যখন বাড়ী ছেড়েছিলাম তখন কিছুতেই ভাবিনি যে আমি গ্যাংটক আসবো। এটা একটা সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশ। দোকান হাট মানুষ সব কিছু মিলিয়ে মনে হচ্ছে আমি অনেক অ-নেক দূরে এসে পৌঁছেছি। হিন্দী আমার যতদূর আয়ত্তে আছে

তাতে মনে হয় চলে যাবে, তবে আশপাশের সিকিমদের দেখে মনে হয় এরা হিন্দীর খুব একটা ধার ধারে না।

আমার প্রথম কাজ হচ্ছে সাধুবাবাকে খুঁজে বার করা। কাজটা যতটা সোজা ভেবেছিলাম কার্যক্ষেত্রে দেখছি তার বিপরীত। গ্যাংটক শহরে কোন এক সাধুবাবাকে খুঁজে বার করা অনেকটা রাস্তার কাদায় ছুঁচ খুঁজে বের করার মতো অবস্থা। রাত ঘনিয়ে এল, পাহাড়ের গায়ে আস্তে আস্তে জোনাকির মতো জ্বলে উঠল আলো। ইতিমধ্যে বাজারে কম করেও পঞ্চাশ জনকে জিজ্ঞেস করেছি সাধুবাবার কথা, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন খোঁজই পাইনি। সাধুবাবা তো আর নাম নয়, আসল নামটা জানা দরকার নইলে এই গ্যাংটক শহরে কয়েক শ' লামা থাকেন তাদের মধ্য থেকে সেই সাধুবাবাকে খুঁজে পাওয়া দুরূহ।

সিকিমের বাজার অনেকটা দার্জিলিং-এর বাজারের মতো। সবই পাহাড়িয়া লোক, এখানে বাঙালী খুঁজে পাওয়া মুশকিল। সেদিন রাতে দেওয়ালি বাজারে ড্রাইভারদের আস্তানায় আগুনের পাশে রাত কাটালাম। ওখানকারই একজন লেপ্‌চা ভদ্রলোক আমাকে চা ও রুটি খাওয়ালেন।

পরের দিন ভোর বেলা আরম্ভ করলাম আবার সাধুবাবার খোঁজ। সিকিমে হিন্দু মন্দির কেউ চেনে না, বলাই বাহুল্য যে বৌদ্ধ ধর্মই এখানকার ধর্ম। চারদিকে ছোট বড় স্তূপ ও মন্যাস্ত্রি অর্থাৎ বুদ্ধ মন্দির ও বৌদ্ধ চৈত্যতে ভরা। সাধুবাবা না বলে এখানে সবাইকে বলতে লাগলাম যে, আমি আমার গুরু-লামাকে খুঁজছি।

সিকিমিরা হাসিখুশী ও সহজ সরল জাতি। সাধারণ সিকিমিরা আমাকে সবাই সাহায্য করতে প্রস্তুত, ওদের ভাষা আমি জানি না কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন অসুবিধা হচ্ছে না। কারণ হিন্দী বোঝে বা বলতে পারে এমন কাউকে সব সময়ই বাজারে খুঁজে পাওয়া যায়। পরিচিত হলাম আন্‌চুর সাথে, অতি সরল ও পরোপকারী আমারই বয়সের। সে বাজারেই থাকে। বাস বা লরির ও মুদিখানা দোকানের মালপত্র নামানো ওঠানো করে, আর কিছু করার না থাকলে বাজারের মোড়ের রেলিং-এর ওপর বসে বসে লোক দেখে। বাজারের সবাইকে ও চেনে। গ্যাংটকে কোন বিদেশী এলে আন্‌চুর নজর এড়ানো মুশকিল। কিছু কিছু হিন্দী শব্দের সাথে লেপ্‌চা ও নেপালী শব্দ মিশিয়ে ও আমার সাথে কথা বলে, ভারি মিষ্টি লাগে ওর কথাগুলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গেলো। আমি কলকাতার ছেলে সেটাই আমার বড় পরিচয়। আন্‌চু আমাকে সব রকমের সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল। আন্‌চুর সাথেই চা ও রুটি খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাজার থেকে। বাজারের ঠিক পেছনে একটা সরু পাহাড়ী রাস্তা ধরলাম, তারপর উঠতে লাগলাম উপরের দিকে।

বাজার থেকে বেশ কিছু উপরে উঠেই দেখলাম গ্যাংটক ও পাহাড়ের সুন্দর দৃশ্য। এই প্রথম নয়ন ভরে দেখছি পাহাড়ী সৌন্দর্য, পাহাড়ের দৃশ্যেশুধু যে নয়ন ভরে তা নয়, তা হৃদয়কেও ভরপূর করে। দার্জিলিং-এর ম্যাল থেকে হিমালয়ের এক রূপ আর গ্যাংটক থেকে হিমালয়ের রূপ অন্য। গ্যাংটক পাহাড়ের উপরে একটি শহর নয়,

পাহাড়ের গায়েই তৈরী হয়েছে এই শহর। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এগিয়ে গেছে এই শহরটা লম্বালম্বিভাবে। সমতল রাস্তা এখানে নেই।

গ্যাংটকের প্রধান আকর্ষণ কাঞ্চনজঙ্ঘা। কি অপরূপ সৌন্দর্য, মনে হচ্ছে একটা সবুজ পাহাড়ের সারির উপর সাদা তুলো দিয়ে তৈরী আর একটি পাহাড়। সবুজ পাহাড়ের সারিটার ঠিক পেছনেই তুষার ধবল কাঞ্চনজঙ্ঘা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার পবিত্রতার স্পর্শ লেগেছে সিকিমবাসীদের অন্তরে। অভয় ও শান্তির এক চরম রূপ। নিরাকার, নির্বিকার, অব্যক্ত ব্রহ্ম হঠাৎ যেন তাঁর ব্যক্তরূপে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছেন। মনে হচ্ছে এ এক নতুন রাজ্য।

আমরা আস্তে আস্তে আরও উপরে উঠে এলাম। পাহাড়ের ঠিক উপরে, পাহাড়ের একটা চূড়ো কেটে তাকে সমতল করা হয়েছে। এখান থেকে সিকিমের রূপটা আরও সুন্দর, ঠিক চারিদিকের দৃশ্যটাই এখান থেকে দেখা যায়। আমরা এসে হাজির হলাম একটা সুন্দর কারুকার্য করা কাঠের বাড়ীর সামনে। বিভিন্ন ধরনের উজ্জ্বল রঙে রঞ্জিত, আর কাঠের খোদাই কাজগুলোও চোখের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, দেখেই মনে হয় রাজপ্রাসাদ। আনচু আমাকে বলল—এটাই সিকিমের রাজবাড়ী। কাঠের এই প্রাসাদটা পাহাড়ের উপর সুন্দরভাবে তৈরী হয়েছে। উপরের মেঘলা আকাশ, দূরের কাঞ্চনজঙ্ঘা, মনে হচ্ছে যেন এটাই স্বর্গভূমি। আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম, মনে মনে ভাবলাম আমার গ্যাংটকে আসা সার্থক হয়েছে। আনচু আমার হাত ধরে দূরের আর একটা সুন্দর কাঠের বাড়ীর দিকে নিয়ে গেল।

আনচু এখানে পরিচিত, গেটের কাছে পাহারাদার ওকে দেখেই কিছু জিজ্ঞেস করল, আনচু হেসে তার কথায় জবাব দিল, তারপর আমরা ছোট মাঠটা পেরিয়ে এসে হাজির হলাম সরাসরি বাড়ীটার সামনে। দরজা দিয়ে ভেতরে তাকাতেই নজরে পড়ল বিরাট বুদ্ধ মূর্তি, বুঝলাম যে এটি একটি বুদ্ধ মন্দির। আনচু মন্দিরে নমস্কার করে বলল—এই মন্দিরটার নাম সুলাখাঙ্, এটা রাজপ্রাসাদের মন্দির, রাজা এখানে আসেন প্রার্থনা করতে। আমরা ভেতরে ঢুকলাম, সরাসরি বুদ্ধদেবের মূর্তির কাছে গিয়ে প্রদীপ স্পর্শ করলাম। ভগবান বুদ্ধের মুখশ্রী থেকে প্রতিভাত হচ্ছে জগতের আলো। কাঠের ওপর লাল হলুদ ও সোণালী রঙের অতি সুন্দর কারুকার্য চোখকে সার্থক করে। মূর্তির দু'পাশে ছোট ছোট খোপে রাখা হয়েছে প্রচুর বৌদ্ধ লিপি, দেয়ালে টাঙানো তাংখা, প্রদীপের আলোগুলি মিটমিট করে জ্বলছে, মন্দিরে ঢুকতেই মনে হল—আমার সব পরিশ্রম যেন সার্থক হয়েছে। মনে কোন রকম ক্লান্তিই নেই, শরীর ও মন দুইই খুব হালকা মনে হচ্ছে।

আমরা মন্দির থেকে বেরিয়ে কয়েক পা এগিয়ে কাঠের একটা নাটমন্দিরে এসে হাজির হলাম। আনচু সেদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো—এই নাটমন্দিরে দেশ-বিদেশ থেকে অনেক লামা আসেন ও যান, সম্ভবতঃ তোমার গুরুকে এখানে দেখতে পাবে। খুশীতে আমি আনচুর হাতটা জড়িয়ে ধরলাম, বললাম—তুমি আমার সত্যিকারের বন্ধু। আনচুর সাথে আমি নাটমন্দিরে ঢুকলাম। নাটমন্দিরটাকে দেখেই

মনে হয় যে, এটা একটা ধর্মশালা, অন্ততঃ লামারা এটাকে সেভাবেই দখল করেছে। কেউ বসে জপের মালা জপছে, কেউ দণ্ডি ঘোরাচ্ছে, কেউ উচ্চস্বরে মন্ত্র পড়ছে, কেউ খাচ্ছে, কেউ তার থলির মালপত্র গোছাচ্ছে, আবার কোণের দিকে অনেকে বসে মাথার উকুন খুঁজছে—ছোটখাটো একটা লামার মেলা বলা যেতে পারে। আমি একে একে প্রত্যেকটি লামার মুখের দিকে তাকিয়ে ভালভাবে নজর দিয়ে খুঁজতে লাগলাম আমার প্রিয় লামাজীকে। একটা সুবিধা হচ্ছে যে তিব্বতী লামাদের দাড়ি, গোঁফ প্রায় নেই বললেই চলে। নেপালী, লেপ্চা, ভূটানী লামাদের দাড়ি গোঁফ হাল্কা, আবার থাকলেও গোষ্ঠী বিশেষে তা কামানো আর অধিকাংশ বৃদ্ধ লামাদের মস্তক মুণ্ডিত। কাজেই গয়ার সাধুদের মতো দাড়ি গোঁফের মধ্যে মুখ লুকোনো নেই। এখানে কম করেও দেড়শ লামা আছে আর তারই মধ্যে চলতে লাগলো আমার অনুসন্ধান। তবে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, আমার গুরু যদি এর মধ্যে থেকে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনিও আমাকে দেখতে পাবেন। আনচুকে বললাম চলে যেতে, আমি ইতিমধ্যে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখবো যদি না পাই তাহলে বিকেলে ওর সাথে বাজারের চৌরাস্তায় গিয়ে দেখা করবো, আর পেলেও তাকে জানাবো। আনচু আমাকে থাকতে উপদেশ দিল, কারণ দুপুর বেলা রাজা এসব লামাদের তরকারী ও রুটি খাওয়ান আর সেই সাথে সাথে গরীব ভিখিরিরাও খেতে পারে। আনচুর পরামর্শে আমি রাজী হলাম। আমাকে রাজবাড়ীর মন্দির চত্বরে রেখে ও চলে গেল।

ভারতীয় তীর্থক্ষেত্রগুলোতে ইট-সিমেন্ট ও পাথরের মন্দির দেখে দেখে আমি অভ্যস্ত। রাজবাড়ীর এই বুদ্ধ মন্দিরটা তাই আমার চোখে খুব অদ্ভুত লাগছে। কাঠের তৈরী প্যাগোডা ধরনের। কলকাতার জৈন মন্দির অনেকটা এই ধরনের। এখানকার কাঠের সূক্ষ্ম কাজ ও রঙের বাহার প্রশংসার যোগ্য।

লামাদের মধ্যে দু'তিনজন হিন্দী জানা লোক পেলাম, তাদের কাছে আমি আমার সমস্যাটা জানালাম। তারা প্রত্যেকেই আমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত, কিন্তু কি ভাবে? লামাদের মধ্যে কথাটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ল, কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই জেনে গেল যে আমি আমার গুরুকে খুঁজছি। আমার মনে হয় আধঘণ্টার মধ্যেই সম্পূর্ণ নাটমন্দিরের প্রায় দু'শ লামা আমার সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তুত। চুপচাপ বসে বসে নাম জপ করা নিয়ে ব্যস্ত লামাদের দেখে আমি কিছুতেই ভাবতে পারিনি যে এরা আমার সমস্যাটাকে নিয়ে বিচলিত হয়ে পড়বে, ওদের আন্তরিকতা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—

তোমার গুরুজীর নাম কি? কোথায় থাকেন? বয়স কত? কোন্ ধর্ম? বৌদ্ধ ধর্মের কোন্ শাখা? কোন্ গুম্ফাতে তিনি থাকতেন? তিনি কোন্ যানের পথিক? তিনি কি লেপ্চা, না ভূটিয়া, না নেপালী?—তাদের এসব প্রশ্নের কোনটারই আমি জবাব দিতে পারলাম না। গয়াতে তাকে সাধুবাবা বলে ডাকতাম অথবা গুরুজী বলে, পোশাকে তিনি ছিলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মতো, দেখতে পাহাড়িয়াদের মতোই, গয়া যখন ছাড়েন তখন তাঁর সঙ্গে আরও তিনজন লামা ছিলেন। ব্যস্! এর বেশী কিছু জানি না।

অতএব হতাশ হতে হল তবুও সকলেই আমাকে আশ্বাস দিল যে এটা একটা সৎ ইচ্ছা, কাজেই পূরণ হবেই। হঠাৎ তিব্বতী চোঙা শঙ্খ বেজে উঠল, চমকে সেদিকে তাকালাম গম্ভীর আর ভীষণ তার শব্দে সবাই যেন কেঁপে উঠল। শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় আর হিমালয়ের গায়ে। একবার মাত্র বেজেই থেমে গেল কিন্তু তার রেশ ঢেউয়ের মতো পাহাড়ের গায়ে গায়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। সেই শব্দ শুনে লামাদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল, সকলেই থালা বাটি প্রস্তুত করে মাঠের দিকে ছুটল, বুঝলাম এদের খাবার সাড়া পড়েছে। একজন লামা আমাকে জিজ্ঞাসা করল তুমি খাবে না নিশ্চয়ই। আর একজন লামা তাদের সাথে আমাকেও মাঠের মধ্যে বসতে বলল, কিন্তু সমস্যা দেখা দিল থালা নিয়ে। খাবারের জন্য প্রত্যেকেই যে যার থালা নিয়ে আসে, এখাম থেকে শালপাতা বা কলাপাতা কিছু দেওয়া হয় না।

একজন সাধু আমার হাতখানি দেখে বললেন—তোমার কাছে কিছু নেই?

—আজ্ঞে না আমার কাছে কিছু নেই।

—কিছুই যদি না থাকে তাহলে নেবে কি করে? দিয়ে তারপর নিতে হয়, কিছু না দিলে তুমি নেবে কি করে?

মনে হল তার কথায় এক গূঢ় সত্য লুকোনো আছে কিন্তু সেটাকে যাচাই করার ক্ষমতা আমার এখন নেই।

আমার অবস্থা দেখে ওদের মধ্য থেকে একজন একটা অ্যালুমিনিয়মের বাটি এগিয়ে দিল, ইসারায় বললে—কাজ চলবে। বাটিটার দিকে তাকালাম, হ্যাঁ, কাজ চলবে বটে কিন্তু বড্ড নোংরা। বাটিটার মধ্যে একবার আঙ্গুল বোলাতেই সম্পূর্ণ আঙ্গুলটা কালো হয়ে উঠল। স্বাভাবিক অবস্থায় হলে নিশ্চয়ই তাতে হাত দিতাম না, আস্তাকুঁড়ে যে সব ভাঙাবাসন পাওয়া যায় সেগুলোও মনে হয় এর থেকে অনেক পরিষ্কার। কিন্তু এই অবস্থায় আমার বিচার করা ঠিক নয়, আর বিশেষ করে খিদেয় আমার পেট জ্বলছে, কাজেই লামাকে ধন্যবাদ দিয়ে বসে পড়ালম তাদের সাথে। লামা বললেন বাটি পেতে দাও আর পেট ভরে খাও। লাবরা গোছের একটা তরকারী আর তার সাথে ভাত যা দিল তাতেই সবাই সন্তুষ্ট, বিনা পয়সার ভোজ এর বেশী কিছু আশা করাটাই অন্যায়, সবাই দেখলাম চেটে পুটে খেল—আরও অবাক হলাম যখন দেখলাম যে এরা খাওয়ার পর বাসন মাজার কোন প্রশ্নই তুলল না। খাওয়ার পর সেটাকে আবার তাদের ঝুলিতে ভরে রাখল। শুনেছি তিব্বতীরা খুব নোংরা, এখন স্বচক্ষেই তা দেখছি। সামনেই দৃশ্যমান তুষার শুভ্র পরিষ্কার হিমালয় আর আমার ঠিক পাশেই নোংরা অপরিচ্ছন্ন লামা। আমার কাছে এটা একটা বিরাট ছন্দপতন। নিজেকে আশ্বাস দিয়ে মনে মনে ভাবলাম এটাই জগৎ, ভাল মন্দ নিয়েই তো এর সৃষ্টি! এই অপরিচ্ছন্ন লামাদের হৃদয়গুলো মনে হয় এই কাঞ্চনজঙ্ঘার মতোই সহজ ও সুন্দর।

বিকেলের দিকে মনটা অনেক হাল্কা হয়ে উঠল, নিজেকে আরও সংযত করে তুললাম। মনকে সান্ত্বনা দিলাম—নাইবা পেলাম সাধু-বাবাকে, তাতে ক্ষতি কি?

অন্ততঃ তাঁরই কারণে আমার গ্যাংটক দেখা হল। গয়া থেকে এই গ্যাংটকে আসার যে বিরাট অভিজ্ঞতা সেটা নেবে কে! এই যে সুন্দর হিমালয়, রঙচঙে সাজানো রাজবাড়ী, বুদ্ধ মন্দিরের পবিত্রভাব, সব কিছু মিলিয়ে মনে হয় আমার লাভ ছাড়া লোকসান হয়নি। হয়তো সাধুবাবা ইচ্ছে করেই আমাকে গ্যাংটকের কথা বলেছেন, তিনি আসলে হয়তো এখান থেকে অনেক দূরে। এখানে আমাকে আনাবার জন্যই হয়তো তিনি চালাকি করে বলেছেন যে তিনি গ্যাংটকে আসছেন। হয়তো তিনি গ্যাংটকে কোনদিনই আসবেন না।

যে কোন কারণেই হোক না কেন, আমি গ্যাংটকে এসেছি সেটাই আমার বিরাট লাভ। এবারের বাড়ী থেকে পালানোটা অন্যান্য বারের চেয়ে অ-নেক অ-নেক বেশী সার্থক হয়েছে।

বাড়ী থেকে না পালিয়ে উপায় ছিল না, প্রত্যেক দিন ছ'ঘন্টা ইস্কুলের গণ্ডীর মধ্যে আটকে থাকা আমার কাছে একটা অসহ্য ব্যাপার। বাড়ীতে দাদাদের বারবার জিজ্ঞেস করেছি লেখাপড়া শিখে কি হবে? উত্তরটাও পেয়েছি সেই একঘেয়েমি—মানুষ হতে হবে। মানুষ হওয়ার জন্য, এই উত্তরটা আমার কাছে শুধু যে একঘেয়েমি ছিল তাই নয় মনে হয় এটা একটা প্রাণহীন শব্দ। মানুষ হওয়ার জন্য কি চারটে দেওয়াল দরকার? মাস্টারমশাইদের পারিবারিক আর মানসিক সমস্যার সমাধান করবার জন্যই যেন তৈরী করা হয়েছে আমাদের পিঠ। আমাদের কালীবাড়ীর ইতিহাস না শুনিয়ে তাঁরা শোনান ইংলণ্ডের ইতিহাস। বাড়ী আর ইস্কুলের এই সব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমার ছিল নীরব প্রতিবাদ। আমার প্রতিবাদের জবাবে পেয়েছি কানমলা আর বেত্রাঘাত। আমার সেই প্রতিবাদটা যখন আরও একরোখা হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়—তখনই আমি বাড়ী থেকে পালাই। বাড়ী থেকে পালানো, এটা আমার এক আনন্দের খেলা। এই সিকিমে এসে মনের সেই ছোট আনন্দটা মহানন্দে পরিণত হয়েছে। মানুষ গর্ব করে তার গুণ নিয়ে, আমার কোন গুণ নেই, কাজেই গর্ব করা আমার সাজে না। তবুও সিকিমের এই অবারিত আনন্দ আর উন্মুক্ত হিমালয়ের দৃশ্য দেখে বার বার যেন আমার বুক ফুলে উঠছে, চেঁচিয়ে সকলকে বলতে ইচ্ছে করছে, আমি দেখছি—আমি পাচ্ছি। এই দেখা আর পাওয়ায় আমার হৃদয়টা ভরপুর। তোমরা যারা দেখনি, যারা বইয়ের মধ্যে আর চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে পড়ে আছো, একবার কি আসতে পারো না? এই মহানন্দের সামান্যাংশও যদি তোমরা স্পর্শ করতে পারতে তাহলেই দেখতে এ জগৎ কি আনন্দময়! বাতাসের সাথে মনের যোগাযোগটাইতো পরম যোগাযোগ!

মন্দিরের দালানে বসে আবোল তাবোল অনেক কিছুই ভাবতে লাগলাম। কি অদ্ভুত আমার ভাগ্য! ঘরে বসে দিব্বি ভাল ছেলে হয়ে নির্বিঘ্নে থাকা যেত, কোথাকার ছেলে কোথায় এসে পড়েছি, ভদ্রলোকদের মতে আমার বর্তমান পরিবেশ অতি অভদ্র, কল্পনারও বাইরে। রাত্রিতে রাস্তায় শুয়ে আমার রাত কাটে, দিন কাটে ছন্নছাড়া গরীব কুলী আর ভিখিরীদের সাথে। খাওয়ার ঠিক নেই। খিদের জ্বালায় পেট জ্বলে, পাথর

আর ইট মাথায় দিয়ে শুতে শুতে মাথা শক্ত হয়ে গেছে, তবুও মনের আনন্দ আর উৎসাহ এতটুকু কমেনি।

সন্ধ্যের পর আমি পাহাড় থেকে আস্তে আস্তে নীচে নেমে এলাম। আনচুকে খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। আমাকে দেখেই ও বুঝতে পারল যে আমার গুরু দর্শন হয়নি। আনচুকে আমি বুঝিয়ে দিলাম যে সাধুবাবাকে না পেলেও আমার কোন অসুবিধে নেই, কারণ সিকিম আমার খুব ভাল লেগেছে। কোনো রকমে মাথা গোঁজার একটু জায়গা পেলে আমি সেখানে থেকে যেতে পারি। আনচু আমার কথায় অবাক হয়ে গেলো—সেকি গ্যাংটক একটা বিরাট শহর, এত বাড়ী, বাজার, রাস্তা; চেয়ে দেখো তারায় ভরা আকাশ, এত সব থাকতেও তুমি বলছো মাথা গোঁজার জায়গা নেই।—এ কথাটা ও ঠিক বুঝতে পারছে না। রাতের বেলা কম্বল লেপ না থাকলে যেটা একান্তই দরকার সেটা হচ্ছে আগুন, ওর মতে বাঁচবার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় হচ্ছে আগুন, আর খাদ্য। এই দুটো জিনিস থাকলে জীবনে আর অন্য কিছুর দরকার হয় না।

ওর কথাটা খুবই সত্য, ভালভাবে ভেবে দেখলাম, আগুন আর খাদ্য এই দুটো জিনিস সত্যি দরকার। খাদ্যের জন্য আমরা বেঁচে আছি, আর আগুন আমাদের সেবা করছে। বর্তমান সভ্যতাটা সম্পূর্ণভাবে গড়ে উঠেছে আগুনকে কেন্দ্র করে। আনচুকে দেবার মতো আমার কিছু নেই, কিন্তু মনে হয় আনচুই সব কিছু আমাকে উজার করে দিচ্ছে।

গ্যাংটক শহরের সাথে আস্তে আস্তে পরিচিত হতে লাগলাম, শহরে বৌদ্ধ ভিক্ষু বা লামাতে ছড়াছড়ি। গ্যাংটকের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে চৈত্য ও গুম্ফা বা বুদ্ধ মন্দির। গুম্ফাগুলোর একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলাম। এরা শুধু মন্দিরে পূজো করেই ক্ষান্ত হয় না, বুদ্ধ মন্দিরকে কেন্দ্র করে রয়েছে লামাদের থাকবার জন্য ব্যবস্থা, ধর্মশালা বা অতিথিশালা তারই সংলগ্ন। সিকিমে প্রায় ষাট-সত্তরটা এই ধরনের বুদ্ধ বিহার আছে আর তার অধিকাংশই গ্যাংটকের চল্লিশ পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে। সমতল ভূমি হলে চল্লিশ পঞ্চাশ মাইলের ব্যবধান খুব বেশী নয়, কিন্তু এই পাহাড়ী জঙ্গলাকীর্ণ পথে সেটা একটা বিরাট ব্যবধান। নেপালী, ভূটিয়া (স্থানীয় লোকেরা ভোটিয়া বলে), গুর্খা, লেপ্চা ও তিব্বতীরা সাধারণতঃ পায়ে হেঁটেই এই বিরাট দূরত্ব অতিক্রম করে। গ্যাংটক ছাড়া অন্যান্য শহর থেকে দূরবর্তী গ্রামগুলোতে হাঁটা পথই একমাত্র পথ। বুদ্ধধর্ম সিকিমের রাজ-ধর্ম। সাধারণ লোকেদের কাছে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক পবিত্র শিখর। কাঞ্চনজঙ্ঘা মনে হয় গরীবের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। গ্যাংটকের আশপাশে যেখানেই যাওয়া হোক না কেন কাঞ্চনজঙ্ঘাকে চোখে পড়বেই, শ্রান্ত পথিকের তিনিই একমাত্র ভরসা, সর্বোচ্চে তিনি বসে আছেন সকলকে পথ দেখাবার জন্য।

তারপর আরও পাঁচদিন কেটে গেলো। এর মধ্যে আমি গ্যাংটকের রাস্তাঘাট মোটামুটি চিনে ফেলেছি। চলার পথে কয়েকজন বাঙালীরও দেখা পেয়েছি, অতি সাবধানে তাদের এড়িয়ে গেছি। আমি জানি যে তাদের সাথে আন্তরিকতা হলে আমাকে আবার বাড়ী ফিরতে হবে। শহরের আশপাশে যতগুলি গুম্ফা ও মন্দির আছে

সেগুলো সব তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি যদি তিনি থেকে থাকেন। আমার পরনের হাফ্ প্যান্ট ও সার্টটা এখন পাহারিয়া কুলিদের পোশাকের মতোই নোংরা হয়ে গেছে। তাতে আমার সুবিধাই হয়েছে, লোকে ভাবে যে আমিও তাদেরই একজন। আনচুর সাথেই থাকি, খাওয়া দাওয়া করি। ওকে মালপত্র ওঠানামা করাতে সাহায্য করি, আর অবসর সময়ে ওকে কিছু কিছু ইংরেজি ও বাংলা শব্দ শেখাই। গ্যাংটকের ঠাণ্ডা এখন গা সহা হয়ে গেছে। কালিম্পং, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং থেকে গাড়ী এলে আনচু তার পেছনে ছুটে যায় খদ্দের ধরবার জন্য। আমার বাসে ওঠবার বা খদ্দের ধরবার অধিকার নেই কারণ আমি সেখানকার লোক নই। ওদের দলে আমি পড়ি না, সর্দার আমাকে বার বার হুসিয়ার করে দিয়েছে, তবে আনচুকে সাহায্য করতে কোন অসুবিধা নেই।

তিস্তা বাজারে একটা বাস আসতেই যথারীতি আমরা ছুটে গেলাম তার পিছু, বাসটা গ্যারেজে ঢোকবার আগে মোড় ফেরাবার জন্য যেই স্পিড্‌টা কমিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল শেরপার দল। আনচু পেছনের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে পড়ল, আর আমি জানলার কাছে পজিসন নিয়ে নিলাম আনচুর মালগুলো ধরবার জন্য। বাসটা থামতেই যাত্রীরা আস্তে আস্তে নামতে শুরু করল, হঠাৎ একজন যাত্রীকে দেখে আমি চমকে উঠলাম! ভালভাবে দেখবার জন্য তাঁর দিকে এগিয়ে এলাম। যা ভেবেছি তাই, লাফিয়ে উঠলাম আনন্দে! 'পেয়েছি' বলে এগিয়ে গিয়ে পড়লাম তাঁর ঠিক সামনে। আমাকে পেয়ে তিনি জড়িয়ে ধরলেন। কি আনন্দ! সাধুবাবাকে খুঁজে পেয়েছি, আমি চেঁচিয়ে আনচুকে ডেকে বললাম—এই দ্যাখ্ আমার হারানো রত্ন। আমার কথা শুনেই আনচু নেমে এল, আনচুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম সাধুবাবাকে।

একটু পরেই সাধুবাবার সাথের সেই তিনজন লামাও নেমে এলেন।

সাধুবাবা আমাকে দেখে কিন্তু মোটেই বিস্মিত হননি—তিনি জিজ্ঞাসাও করলেন না যে আমি সেখানে কিভাবে এসেছি, তবে তাঁর মুখ দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় যে তিনি আমাকে পেয়ে খুবই আনন্দিত।

আনচু উপযাচক হয়েই সাধুবাবাকে আমার প্রসঙ্গে দু'এক কথায় কিছু বলল, অর্থাৎ কোথায় থাকি কি খাই ইত্যাদি। সাধুবাবার সঙ্গের লোকেরা আমাকে দেখে বলাই বাহুল্য খুব আশ্চর্য হয়ে গেছে। তারা বুঝতেই পারছে না যে এই হাজার হাজার লোকের মধ্যে কি করে আমি সাধুবাবাকে খুঁজে পেলাম। আমি সেই পুরোনো প্রবাদটাকে আর একবার তাদের শুনিয়ে দিলাম—'ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়।'

সাধুবাবাকে আবার পাওয়া আমার কাছে এক বিরাট পাওয়া, সেই পাওয়ার বুঝি তুলনা নেই। তাঁকে পেয়ে গ্যাংটকের সৌন্দর্য আমার কাছে দ্বিগুণরূপে দেখা দিল। কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্র ও পবিত্র শিখর আমার কাছে আরও পবিত্রতর হয়ে উঠল।

এবারকার তাঁর দর্শন আমার কাছে আরও উদ্দেশ্যপূর্ণ বলে মনে হতে লাগল। গ্যাংটকের এই বুদ্ধ লামাদের মধ্যে সাধুবাবা সম্বোধনটাও মনে হল ঠিক খাপ খায় না, তাই গুরুজী বলে সম্বোধন করতে লাগলাম। গুরুজীর সাথে কোন মালপত্র নেই, তবে

তাঁর সঙ্গী লামাদের একটা বাক্স ছিল। আনচু উপযাচক হয়ে বলল যে মালপত্রগুলোকে সে পৌঁছে দেবে। আমি আনচুকে অনুরোধ করলাম সে হাঁপিয়ে গেলে আমি বইব। পিঠে মাল বইবার জন্য যে দড়ির দরকার হয় সেই দড়ি আমার কাছে নেই, কাজেই আনচুর সাহায্য নিতেই হয়। গ্যাংটক থেকে আমরা হাঁটা ধরলাম ওপরের দিকে। প্রধান সড়ক ধরেই আমরা উঠতে লাগলাম। রাস্তাটা বেশ চওড়া ও পরিষ্কার। দার্জিলিং-এর বাজার থেকে মলের দিকে যে মেইন রোডটা এগিয়ে গেছে, ঠিক সেই রকম, আনচু হেলে দুলে হাঁটছে, আমরা ঠিক তারই পেছনে পেছনে চলতে লাগলাম। গুরুজীর সাথে রাস্তায় কথাবার্তা কওয়া যায় না, গয়াতে থাকতেই সেটা বুঝতে পেরেছিলাম। তিনি চলার পথে কথা বলতে চান না, কাজেই আমরা প্রায় নিঃশব্দেই আস্তে আস্তে চলতে লাগলাম। মনে হয় আনচুকে গুরুজী গন্তব্যস্থান বলে দিয়েছেন, কারণ সে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। এমনি করে খানিকক্ষণ বসে ও দাঁড়িয়ে আমরা প্রায় এক ঘন্টার মধ্যেই এসে পৌঁছলাম পাহাড়ের ওপরকার একটি বুদ্ধ মন্দিরে, স্থানীয় নাম এচে গুম্ফা (Echey Gompha)। মনে হয় এটাই গ্যাংটকের সর্বোচ্চ পাহাড়। অন্যান্য পাহাড়গুলো গ্যাংটক শহরের বাইরে। এখান থেকে সম্পূর্ণ গ্যাংটক শহরটা পরিষ্কার দেখা যায়, বিশেষ করে রাজপ্রাসাদ ও তার সংলগ্ন মন্দির। কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য আরও চমৎকার।

গুম্ফাতে পৌঁছানো মাত্র প্রায় কুড়ি পঁচিশটি ছেলে এসে গুরুজীকে ঘিরে ধরল, মনে হয় তারা গুরুজীর খুব আপন জন। পাঁচ ছ'জন বয়স্ক লামাও গুরুজীকে স্বাগতম্ জানালেন। গয়ার পথের ভিখিরি সেই গুরুজীকে এখানে নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম। আনচু আবার আসবে বলে বিদায় নিল, গুরুজী আমাকে তাঁর সাথে থেকে যেতে বললেন। আমার এ এক পরম সৌভাগ্য বলতে হবে, গুরুজীর সম্মানে নিজেকে সম্মানিত বলে মনে করলাম।

এচে গুম্ফা, একটা পাহাড়ের ওপর পাইন ও পাহাড়ী ঝাউ গাছের বনের মধ্যে সুন্দর এক পরিবেশে স্থাপিত। গুম্ফা অর্থাৎ একটি বুদ্ধ মন্দিরকে ঘিরে একটি মঠ ও ছোট্ট একটি ধর্মশালা। বুদ্ধ মন্দিরটি উপাসনা ও পূজার্চনার জন্য ব্যবহার করা হয়। সাধুসন্ন্যাসীরা থাকেন তারই পাশের মঠে আর অতিথিরা থাকেন ধর্মশালায়। বুদ্ধ মন্দির ও মঠের মেঝে ও ভিতটা পাথরে তৈরী আর তারই ওপর সুন্দর কাঠের বিরাট বাড়ী। ধর্মশালাটা সম্পূর্ণই কাঠের, শক্ত কাঠের ওপর ছোট ছোট ঘর। গুরুজীর সাথেই আমার থাকবার বন্দোবস্ত হয়েছে। গুম্ফার চার পাশে পাহাড়ী-মাটির ওপর সিঁড়ির মতো করে বাগান তৈরী হয়েছে আর তারই পাশে এলাচীর বন। গুম্ফায় শিশুর সংখ্যা ছাব্বিশ, তাদের বয়স নয় দশ থেকে চৌদ্দ পনেরোর মধ্যে; আর পরিচালকমণ্ডলীতে রয়েছেন আটজন। আট জনের মধ্যে দু'জন বড় লামা তারা গুরু স্থানীয়, আর ছ'জন সাধারণ লামা। ছোট ছেলেরা নবীন ব্রহ্মচারী বলা যেতে পারে, তাদের বলা হয় দাবা।

এক কথায় বলা যেতে পারে যে, মঠের শিক্ষক ও পরিচালক-মণ্ডলীর সবাই লামা

পর্যায়ে পড়ে আর ছাত্ররা দাবা পর্যায়ের। ছাত্ররা সবাই পীতবসন পরিহিত। পরিবেশটা অতি চমৎকার। এর আগে এই ধরনের পরিবেশে আমার থাকার সৌভাগ্য হয়নি। গয়ার সাথে তুলনা করলে এটা সত্যি স্বর্গ রাজ্য, এখানে সকালে উঠে ভিক্ষে করতে হয় না, তার পরিবর্তে করি প্রার্থনা। গুরুজীর সেবারও প্রয়োজন নেই, তিনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। দিনের বেলায় একটা নতুন কাজ পেয়েছি সেটা হচ্ছে এখানকার মন্দিরের বিগ্রহগুলোর ধূলো পরিষ্কার করে তাতে রঙ করা। দু'জন লামা এ কাজ করেন, আমি তাদের সাহায্য করি মাত্র। এখানেই আস্তে আস্তে পরিচিত হতে লাগলাম ভগবান বুদ্ধের বিভিন্ন রূপের সাথে, আর তার সাথে সাথে প্রচুর তান্ত্রিক বিগ্রহের সাথে। এখানকার বুদ্ধধর্ম মানে তান্ত্রিক বুদ্ধ-তত্ত্ব। এ দুটো পথই আমার কাছে নতুন, ভাষার অভাবে সকলের সাথে কথাবার্তা বলতে পারছি না বলে খুব বেশী একটা অসুবিধা বোধ করছি না।

কয়েকদিনের মধ্যেই গুরুজীর আর একটা দিক আবিষ্কার করলাম তিনি আসলে একজন নামকরা বৌদ্ধ ভিক্ষু। সিকিমের কাছাকাছি কোথাও তার আদি বাড়ী। তিনি এককালে এখানকার একটি সঙ্ঘের সাথে যুক্ত ছিলেন, তারপর তিনি সে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এখন সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছেন। তিনি লামা হলেও হিন্দু ধর্মে অনুরাগ বেশী। তাঁর মতে ভগবান তথাগত তো সেই বেদেরই সংস্কারক মাত্র, ভারতবর্ষের মাটিতেই ভগবান বুদ্ধের জন্ম আর সেই মহান্ ভারতের পবিত্র ভূমিতেই বুদ্ধবাণী ও ধর্মের সূত্রপাত আর স্বীকৃতি। কাজেই গুরুজীর কাছে ভারতবর্ষই হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তীর্থ। ভারতের মাটিতেই যুগে যুগে অবতাররা আসেন আনন্দ বাণী নিয়ে। গত পনেরো বছর যাবত তিনি লাসা, গয়া ও সারনাথ যাতায়াত করছেন। ভূটান, সিকিম ও নেপালী লামাদের নিয়ে তিনি যান তিব্বতে আর ফেরার পথে তিব্বতী সাধুদের নিয়ে আসেন ভারত দর্শনের জন্য, বলা যেতে পারে যে সৎসঙ্গের তিনিই পথ-প্রদর্শক। ভিক্ষা করা তাঁর নেশা, ভারতের রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করা মানে এক বিরাট ও মহান্ জগতের সাথে সরাসরি যোগাযোগ, সংস্কৃতির সংযোগ। বিচিত্র মানুষের স্বভাবের সাথে পরিচিত হওয়ার এটা একটা উপায় মাত্র। ভিক্ষার মাধ্যমে মানুষের অন্তরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ হয়। সাধুরা দান গ্রহণ করে অপরকে মুক্তি দেয়, ব্যক্তি আত্মার কাছে সে ভিক্ষে চায় পরমাত্মার দর্শনের জন্য। মানুষের মধ্যে লুকিয়ে আছে যে হরি তার দর্শনেই তার আনন্দ কিন্তু সাধারণ ভিখিরিরা ভিক্ষে করে শুধু পেটের দায়ে, সেটা যুক্তির পথ নয়, বাঁচবার পথ মাত্র।

এবার গুরুজী এসেছেন গ্যাংটক থেকে একদল সাধুকে লাসার পথে নিয়ে যাবার জন্য। তার সাথে তিনজন সাধু তিব্বতের কোন একটি গুম্ফা থেকে বছর খানেক আগে এসেছেন তীর্থ ও বিদ্যার জন্য, এখন তাঁরা ফেরার পথে, মাসখানেকের মধ্যেই তাঁরা ফিরে যাবেন। গয়া, সারনাথ, বেনারস, কলকাতা, শিলিগুড়ি ও গ্যাংটকের এই গুম্ফাটা হচ্ছে তাদের মিলন ও প্রস্তুতি কেন্দ্র। সাধুবাবা আমাকে নিজে না বললেও এই সংবাদগুলো সংগ্রহ করতে মোটেই অসুবিধা হয়নি।

দিন দশেকের মধ্যেই আরও আঠারোজন লামা সেখানে উপস্থিত হলেন।

মার্চমাসের প্রথম সপ্তাহে এচে (অনেকে জানে এসে মন্যাস্ত্রি বলে) মন্যাস্ত্রিতে সকলের জমায়েত হওয়ার কথা। হিসাব করে দেখলাম যে নির্দিষ্ট সময়ের আরও আটদিন বাকি। অর্থাৎ আর আটদিন পর আবার গুরুজীর সাথে বিচ্ছেদ হবে। কথাটা ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম এবারে আর গুরুজীকে হঠাৎ হারাতে হবে না—মনটাকে প্রস্তুত করার সময় রয়েছে। বিকেলবেলা মঠের চত্বরে হাঁটতে হাঁটতে গুরুজীকে প্রশ্ন করলাম,

—আপনি লাসায় যাচ্ছেন ?

—হ্যাঁ। গুরুজী সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন।

—আপনার সাথে আমিও যাবো। আমার কথাটা শুনে তিনি একটু স্নিগ্ধ হাসি হেসে বললেন,

—অন্য কেউ হলে আমি সরাসরি না বলে দিতাম কিন্তু তোকে সে কথা বললে তুই শুনবি না আর আমি জানি যে তোকে আটকে রাখারও কেউ নেই, তবে আমি চিন্তা করে দেখি পরে বলবো।

—অসুবিধাটা কোথায় ?

—অসুবিধা অনেক। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বলতে লাগলেন—এক নম্বর অসুবিধা হচ্ছে যে তুই লামা বা সাধু নস, সাধু ছাড়া অন্য কাউকে আমি দলে নিতে রাজি নই। কারণ তিব্বতের বরডারে আজকাল চীনা সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে, তারা সাধু ছাড়া অন্য কাউকে ঢুকতে দিতে চায় না। দ্বিতীয় অসুবিধা হচ্ছে যে তুই ভাষা জানিস না, এই দুটোই হচ্ছে মূল অসুবিধা। অন্যান্য অসুবিধাগুলো হয়তো এড়িয়ে চলা যেতে পারে।

—কিন্তু গুরুজী আমিতো নেপালী, ভোটিয়া, গুর্খা কোনো ভাষাই জানি না তা সত্ত্বেও তো বেশ মানিয়ে নিয়েছি, আমার তো কোন রকম অসুবিধা হচ্ছে না।

গুরুজী আমার যুক্তি শুনে বললেন—তর্ক করে লাভ নেই, আমাকে একটু ভাবতে দে।

আমি থামতে বাধ্য হলাম। কথাটা ঠিক, তর্ক করে লাভ নেই, তাতে শুধু জটিলতা বাড়ে ছাড়া কমে না। গয়ার সেই ভিখিরি সাধুবাবা গ্যাংটকে গুরুজী। তার ব্যক্তিত্বেও মনে হয় অনেক পরিবর্তন হয়েছে অথবা হয়তো আমার মনের পরিবর্তনের জন্যই মনে হচ্ছে তাঁর পরিবর্তন হয়েছে। অতএব সবুর করা ছাড়া উপায় নেই।

আনচুর সাহায্যের কথা আমি ভুলিনি, আমার সময় হলে বাজারে গিয়ে ওর সাথে দেখা করি অথবা রাতের দিকে ও আমাদের এখানে আসে। গুম্ফার মধ্যে এসে আমাদের সাথে ও বেশীক্ষণ থাকে না, এখানকার নিঃশব্দ তপোবনের আবহাওয়ায় ও হাঁপিয়ে ওঠে। ওর মতে এ জায়গাটা প্রাণহীন, বাজারেই ওর প্রাণ। গুরুজী ওকে স্নেহ করেন, তাই আনচু মাঝে মাঝে আমাদের সাথে খাওয়া দাওয়া করে।

সেদিন কথায় কথায় আনচুকে আমার তিব্বতে যাওয়ার কথা বললাম। আনচু অবাক হ'ল। জিজ্ঞাসা করল—তিব্বতে কি আছে ? গুরুজী ওকে বুঝিয়ে বললেন যে তিব্বত একটি তীর্থক্ষেত্র, তা ছাড়াও দেশ হিসাবে সেটা খুব ভাল। আনচু কথাটা শুনল

বটে কিন্তু মুখ ফুটে গুরুজীকে কিছু বলল না। পরে আমার দিকে তাকিয়ে বলল আমার যদি যাওয়ার উপায় হয়, যদি কোনদিন ঠাকুর করেন তাহলে কলকাতায় যাবো। আনচুর কাছে তিব্বত এক মরুভূমি। সেখানে গিয়ে মরার চেয়ে কলকাতায় যাওয়া অনেক ভাল, কারণ সেখানে হরেক রকম মজা আছে আর টাকাতো বটেই।

আমি সকাল সাতটার সময় ঘুম থেকে উঠি তারপর প্রার্থনা সেরে চলে আসি রান্নাঘরে। সেখানে রান্না তৈরী করতে সাহায্য করি। কয়লার উনোনে রুটি সেঁকা সহজ, কিন্তু কাঠের উনোনে রুটি তৈরী করার একটা বিশেষ বাহাদুরী আছে, বর্তমানে আমি সেটাই আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করছি। উনোনে কাঠটাকে ঠেসে ধরছি ঠিক এমন সময় পেছন থেকে গুরুজী এসে দাঁড়ালেন। আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন—বাইরে আয় তোর সঙ্গে একটু কথা বলার দরকার।

তাঁর কথা শুনে পাশের লামার ওপর দায়িত্বভার দিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম।

গুরুজীর সাথে মঠ থেকে বেরিয়ে পাহাড়ী ছোট্ট পথটা ধরে বনের দিকে চলে এলাম। গুরুজী আমাকে একটা পাথর দেখিয়ে দিয়ে বললেন—বস্ এখানে।

পাথরের ওপর বসে আমি গুরুজীর দিকে তাকালাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন,

—তোকে একটা কাজ দিচ্ছি মনোযোগ দিয়ে শোন। আজকে সারাদিন এই পাথরটার এখানেই থাকবি, অন্য কোথাও যাবি না। দুপুরে মঠে শুধু খেতে যাবি, তা ছাড়া সমস্ত দিনটাই এখানে কাটাতে হবে। কি রাজি তো?

আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে জবাব দিলাম—ঠিক আছে।

—সারাদিন তোর একটা চিন্তাই থাকবে সেটা হচ্ছে তোর বাড়ীর কথা। আজকে সারাদিন ধরে তুই বাড়ীর কথা চিন্তা করবি, তোর বাড়ীর সবাই আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কাউকে বাদ দিবি না, সকলের কথা চিন্তা কর, বাড়ীর লোকদের সাথে কল্পনায় যোগাযোগ করবার চেষ্টা কর।

আমি জবাব দিলাম—ঠিক আছে।

তিনি আমার মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—কাল সকালে চা জলখাবার খেয়ে এখানে আসবি, আবার কথা হবে।

গুরুজীর কথানুযায়ী আমি চা জলখাবার খেয়ে চলে এলাম। পাথরের ওপর না বসে আমি আশপাশের চারিদিকে দেখতে লাগলাম। এই বনটা আমার কাছে তপোবনের মতোই লাগছে। রূপকথার গল্পে তপোবনের যে পরিচয় পেয়েছি এটা যেন তারই জীবন্ত রূপ। ঝাউ গাছের ফাঁক দিয়ে দূরে দেখতে পাচ্ছি কাঞ্চনজঙ্ঘা আর তার ঠিক উল্টোদিকে বিস্তীর্ণ উপত্যকা। এই উপত্যকার গা ঘেঁষে যে পাহাড়টি উঠে গেছে সেটা পার হলেই তিব্বত, দালাই লামার দেশ। মনটা উড়ে গেল তিব্বতে। তিব্বত সম্পর্কে কিছুই জানি না তবুও মনে হয় ওই নামটাই যেন আমাকে টানছে।

না! এসব কি ভাবছি? মনটাকে সংযত করলাম তাইতো অতদূরে না গিয়ে গুরুজীর কথামত চললেই ভাল, বাড়ীর কথা ভাবতে হবে।

মনটা যেন প্রস্তুতই ছিল, বাড়ীর কথা মনে হতে প্রথমেই মনে পড়ল ঠাকুরমার কথা, তারপর একে একে দিদি, দাদা ও পাড়ার বন্ধুবান্ধবদের কথা। আমাকে নিয়ে বাড়ীতে নিশ্চয়ই খুব কথাবার্তা চলছে, কোথায় গেছি কি করছি ইত্যাদি। পাড়ার ও ইস্কুলের বন্ধুদের কথা মনে হতে লাগল। কিন্তু এসব চিন্তার মধ্যে খুব একটা বিশেষত্ব আমি খুঁজে পেলাম না, শুধু বার বার মনে হতে লাগল যে আমি যদি তাদের এখানে আনতে পারতাম, একবার যদি তারা তাদের গণ্ডীর বাইরে এসে এই অনন্ত সৌন্দর্যকে দেখতে পেতো তাহলে নিশ্চয়ই আমার আর তাদের মধ্যে এই প্রভেদটা থাকতো না। ছোটবেলা থেকেই ঘর পালানো আমার স্বভাব, প্রত্যেকবারই বাড়ী ফিরে গিয়ে তাদের বলি আমার নিত্য নতুন কাহিনী, তারা ভালবাসে শুনতে, তারা চায় জানতে অথচ কোনো এক অজ্ঞাত সুখের শিকলটা কেটে তারা বাইরে আসতে রাজি নয়। তাদের মতে—আমি বাউণ্ডুলে, হতচ্ছাড়া ইত্যাদি। আমি বার বার ভাবি, এই বিশ্বজোড়া আনন্দ স্বাদ-পাবার জন্য যদি হতচ্ছাড়া হতে জন্মাতে হয় তাহলে, হে ভগবান! আমাকে অনন্তকাল ধরে এই জন্ম দাও। একতারা বাজিয়ে রাঙা মাটির ওপর দিয়ে যেতে যেতে বাউল যে সুরের আনন্দে আত্মহারা হয়, সে আনন্দ কি ইস্কুলের চার দেয়ালের মধ্যে পাওয়া যাবে?

গুরুজী আমাকে বলেছেন সারাদিন ধরে বাড়ীর কথা ভাবতে, কিন্তু ভাববো কার কথা? বাড়ীতে ঠাকুরমা ছাড়া আমার বাঁধন নেই। বাপ মা ছোট বেলাই মারা গেছেন, মানুষ হচ্ছি দাদা বৌদিদের কাছে।

পিতৃ-মাতৃ হারা এটা আমার দুর্ভাগ্য নয়, আসলে পরম সৌভাগ্য। হয়তো এ কারণেই আমি আরও বাঁধন ছাড়া। কাজেই পাথরের ওপর বসে গালে হাত দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে ভাববো, এমন ভাবার পাত্র আমি নই। বার বার চেষ্টা করেও সে রকম কাউকে পেলাম না। পাথরের ওপর চুপচাপ বসে থাকতেও আমার ভাল লাগে না, মনে হয় তাতে সময়ের অপচয়। অথচ গুরুজীর কথা অমান্য করতেও ইচ্ছা নেই। আমার এ গুরু ভাবগম্ভীর উর্ধ্বলোকের গুরু নন, তিনি আমার বন্ধুস্থানীয়, তাঁর কথার মধ্যে যে স্নেহ ও ভালবাসা লুকিয়ে আছে সেটা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছে। গয়ার ধর্মশালায় তাঁর পীঠে সুড়সুড়ি দিয়ে ঘুম পাড়িয়েছি, আবার নাকে দুব্বোঘাসের সুড়সুড়ি দিয়ে ঘুম পাড়িয়েছি। তাঁর কৌপীন পরে কতবার রাস্তায় বেড়িয়েছি আর তাঁর অকথ্য হিন্দী গালাগাল খেয়ে প্রাণভরে হেসেছি,—বাড়ীর কথা ভাবতে গিয়ে তাঁর কথাই বার বার মনে পড়ে। সাধুবাবা বা গুরুজী আমার ফুটপাতের সাথী, একই নিম-দাঁতনের এ মাথা দিয়ে উনি দাঁতন করেছেন আর ও মাথা দিয়ে দাঁতন করেছি আমি। এখানে গ্যাংটকেও একই সরায় আমরা ভাত খাই। এ গুরু আমার অন্তরের গুরু আমার দরদী বন্ধু।

কিন্তু তিনি আমাকে বাড়ীর কথা চিন্তা করতে বললেন কেন? ঠাকুরমার কি কিছু হল? আর হলেই বা আমি কি করতে পারি? তাঁর সেবা করার লোকের তো অভাব নেই!

সেদিন সারাদিন এবং সন্ধ্যে পর্যন্ত বাড়ীর কথা চিন্তা করতে লাগলাম, কিন্তু সে চিন্তায় গুরুজীই বার বার এসে পড়েছেন। গয়াতে গুরুজীকে আমি যা বলতাম তিনি তাই শুনতেন, তাঁর খাওয়া-ধ্যান-স্নান-ঘুম সব কিছুর মধ্যে আমার ছিল কড়া নজর। তিনি অনেকবার ধর্মশালা পালটাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি দিইনি। তিনি ছোট্ট শিশুর মতো আমার কথা শুনতেন, সম্পর্কটা ছিল অনেকটা দাদু-নাতির মতো। সে সম্পর্কটা এখনও বজায় আছে তবে পরিবেশের জন্য তার প্রকাশটা কম। সে কারণেই কথাবার্তাও কম। তাঁর ওপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে, সে কারণেই তিনি বলেছেন বাড়ীর কথা ভাবতে। অতএব আমি ভাবছি। এ ভাবনাটা বিকেলের দিকে আমাকে একঘেয়ে করে তুলল। শেষে পাথর ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। বনের একটা গাছকে উদ্দেশ্য করে বললাম—না! আর নয়। বাড়ীতে গিয়ে বাড়ীর কথা ভাববো কিন্তু এখন নয়। গ্যাংটকে বসে বাড়ীর কথা চিন্তা করা মানে এখানকার আনন্দটাকে মাটি করা। সন্ধ্যের দিকে আমি বন ছেড়ে মঠের দিকে ফিরে এলাম। সেদিন রাতে গুরুজীর সাথে আর কোন রকম কথাবার্তা হয়নি।

পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে সেই পাথরের কাছে এসে বসলাম গুরু-শিষ্যে। তিনি হাসিমুখে বললেন—আজকেও কি বাড়ীর কথা ভাবছিস?

আমি বললাম—না।

তিনি বললেন—তোর যদি বাড়ী যাবার ইচ্ছে থাকে তাহলে আমাকে বল আমি তোকে টিকিট কেটে ফেরার বন্দোবস্ত করে দেবো।

টিকিট কেটে! আমি আশ্চর্য হলাম। ভিক্ষে করে যাঁর দিন চলে সে দেবে আমার গ্যাংটক থেকে কলকাতা যাবার খরচা!

মনে হয় গুরুজী বুঝলেন আমি কি ভাবছি। তিনি আগের সুরেই বললেন—হ্যাঁ, টিকিট কেটেই। ঠিক ভদ্রলোকের ছেলেদের মতো তোকে যাবার বন্দোবস্ত করে দেবো, টাকা আমার আছে চিন্তা করিস না।

—না, আমি বাড়ী যেতে চাই না, আমি যাবো আপনাদের সাথে তিব্বতে। আমার জন্য চিন্তা করবেন না, আমি আপনাদের পেছন পেছন গিয়ে ঠিক হাজির হব। আমি তাঁকে আশ্বাসের সুরে বললাম।

—সেটা আমি জানি, তৈয়ার হো বেটা। আনন্দ সংবাদ! তাঁর কথা শুনে আমি তাঁর কোমর জড়িয়ে ধরলাম। ভাবাবেগে বললাম ঠিক আছে আমাকে তৈরী করুন।

তিনি একটু চিন্তা করে বললেন—ঠিক আছে তাহলে মন দিয়ে শোন আমি যা বলছি।

আমি তাঁকে বললাম—যা বলবেন সেটাই হবে আমার ব্রত।

গুরুজী বলতে লাগলেন,

—এই একই পাথরের ওপর আজকে যতক্ষণ পারিস বসে থাকার অভ্যাস কর, কোমর ধরে গেলে বা খুব কষ্ট হলে মাঝে মাঝে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করবি তারপর আবার এসে এখানে বসবি। বুঝলি তো? কিছুক্ষণ থেমে তিনি আবার বলতে

শুরু করলেন—আজকের চিন্তাধারাটা হবে অন্যরকম। ভাল করে শোন, পাথরের ওপর যে রকম করে খুশী তুই বসতে পারিস, কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। বসে সামনের দিকে সোজা তাকাবি, দূরে দেখ পাহাড় আর আকাশের সংগম ঘটেছে, তাই না?

—ঠিক, আমি বললাম।

—দৃষ্টি সব সময়ই সামনের দিকে থাকবে। আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকে ভালভাবে দেখবি। মনে মনে চিন্তা করবি, এই আকাশ মানে অনন্ত, মহাশূন্য; সুখ দুঃখের অতীত। আর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করবি যে এই পাহাড়টা বিরাট, তার অস্তিত্ব আছে, সে সীমার মধ্যে আবদ্ধ। গুরুজী আর একবার ভাল করে তাঁর কথাগুলোকে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন তারপর আশ্বাস দিয়ে বললেন,—যদি খুব একঘেয়েমী লাগে অথবা একান্তই অসুবিধা হয় তাহলে মঠে আমার কাছে চলে আসবি।

—ঠিক আছে। আপনার উপদেশ শিরোধার্য। এই বলে তাঁকে আশ্বাস দিলাম। গুরুজী কিছুক্ষণ সেখানকার বনে পায়চারী করে তারপর শহরের দিকে নেমে গেলেন হয়তো কোন কাজ থাকবে।

'জয় গুরু' বলে আমি পাথরের ওপর আমার চাদরটা পেতে বসলাম। বলাই বাহুল্য মঠাধ্যক্ষ আমাকে একটা কম্বল ও চাদর দিয়েছেন, নয়তো এখানকার ঠাণ্ডায় কষ্ট পেতে হতো। গুরুজীর নির্দেশমতো আমি আকাশের দিকে তাকালাম, অসীম নীল আকাশ তার ওপর দিয়ে মেঘ ভেসে চলেছে অনন্ত দিগন্তের দিকে। অনন্ত-অসীম, কথাগুলো চিন্তা করতে লাগলাম আর সেই কথার সাথে আকাশের সামঞ্জস্য খুঁজতে লাগলাম। অনন্ত মহাশূন্য কথাটা কিছুটা হয়তো সত্যি, কিন্তু সুখদুঃখের অতীত মানে কি? কিছুক্ষণ ভেবে যুক্তি দিয়ে ইহার বিশ্লেষণ করতে লাগলাম—সত্যিই তো এই যে অনাদি অনন্ত আকাশ তার মধ্যে তো কোন দুঃখ নেই, দুঃখটাতো আসলে শরীরের, কাজেই দুঃখের সীমানা হচ্ছে এই শরীর আর জগতের মধ্যে। এই দেহ নশ্বর মরণশীল; আকাশের এই অনাদি অনন্তের মধ্যে শারীরিক দুঃখ থাকার কথা নয়। অনাদি ও অনন্তকালের তুলনায় এই শরীরের ক্ষুদ্র দুঃখ একান্তই অগ্রাহ্যের। এমনও হয়তো হতে পারে যে, মনটাকে যদি ঊর্ধ্বমুখী করা যায়, মনটাকে যদি অনেক উঁচুতে নেয়া যায় তাহলে জগতের দুঃখকে দুঃখ বলে আর মনে হবে না। এতো গেলো শুধু দুঃখের কথা, কিন্তু গুরুজী বলেছেন, সুখ ও দুঃখের কথা। মনটাকে উঁচুতে তুললে দুঃখটাকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু সুখটাকে ডিঙ্গোবার দরকার কি? মানুষমাত্রেই তো সুখ চায়। বিশ্লেষণ করতে লাগলাম; আমার দর্শন পড়া নেই। ধর্মের 'ধ'ও জানি না, তবুও গুরুজীর আদেশমতো আমাকে ভাবতেই হবে।

আজকের বিষয়টা বেশ ভাল, গতকালের মতো একঘেয়েমী নেই। কখনো বসে কখনো বনের মধ্যে পায়চারী করতে করতে আমি ভাবতে লাগলাম। সকালের রোদটা খুব ভাল লাগে তার ওপর পাইন গাছের মধ্য দিয়ে হিমালয়ের দৃশ্য, এই দুই মিলিয়ে মনটাকে খুব হালকা করে দিয়েছে।

সুখের অতীতে কেন যেতে হবে? মনে হয় সুখটা দুঃখেরই বিপরীত, অথবা সুখদুঃখ

অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, একটাকে টানলে আর একটা আসতে বাধ্য। সুখ চাইলে দুঃখটাকেও চাওয়া হয়, এরা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ঠিক আলো আর অন্ধকারের মতো। হয়তো সে কারণেই গুরুজী বলেছেন—আকাশ, অনন্ত, মহাশূন্য সুখদুঃখের অতীত। আমাদের মন ও হৃদয়টাও নিশ্চয়ই আকাশের মতো, সেখানে বিভিন্ন বস্তুর কারণে সুখদুঃখরূপ মেঘের উদয় হয়, মনেরও উর্দ্ধে যে আত্মা সেখানে নিশ্চয়ই সুখ দুঃখের কোন ব্যাপার নেই। মনে হয় আমাদের এই মনটাকে যদি অনন্তের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে সেখানে সুখ বা দুঃখ কিছুই নেই।

যুক্তিটা ভাল লাগলো, নিজেকে আশ্বস্ত করলাম। সকালের দিকে এই ধরনের আরও অনেক চিন্তা মাথায় এল আবার নিরুদ্দেশও হল। দেখলাম এই ধরনের চিন্তা মনকে ভারী করে না, বরঞ্চ আরও চিন্তা করবার জন্য উৎসাহিত করে। দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে এল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই খাবার জন্য ডাক এল।

খাওয়ার পর দ্বিতীয় চিন্তার জন্য প্রস্তুত হলাম। দূরের এই পাহাড়টা, কি বিশাল তার রূপ, জগতের এক বিরাট অংশ নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। গুরুজী বলেছেন—পাহাড়টা বিরাট, সে সীমার মধ্যে আবদ্ধ। কথাটা ঠিক, পাহাড় সে যত বড়ই হোক না কেন সে সীমার মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু রূপতো সীমার মধ্যেই পাওয়া যায়, রূপ দেখেই তো আমাদের মধ্যে সুখ ও দুঃখের উৎপত্তি হয়, সুখদুঃখ তাহলে সব সময়ই সীমার মধ্যে আবদ্ধ। কি অদ্ভুত এই জগৎ, এই অনন্ত-অসীমের মধ্যেই রয়েছে সীমা। আমাদের এই দেহটা সীমার মধ্যে আবদ্ধ, কিন্তু মনটাকে মনে হয় চালিয়ে নেওয়া যায় অসীমের দিকে। এই যে আমি বসে আছি এই পাথরের ওপর, আমার এই দেহটা ইহার স্থূলত্ব নিয়ে জড় হয়ে আছে, চোখ, কান ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলো মনকে পৌঁছে দিচ্ছে বিভিন্ন সংবাদ, কিন্তু আমার চিন্তাধারাটা সম্পূর্ণ মুক্ত। সে যেখানে খুশী যাচ্ছে, অনন্ত নীলাকাশকেও সে অনুভব করতে পারছে। কি অদ্ভুত! আমার মধ্যেই তো রয়েছে আত্মারূপী অনন্ত আর দেহরূপী সীমা। গুরুজী কি এটাই আবিষ্কার করবার জন্য আমাকে চিন্তা করতে বলেছেন? কি জানি, হয়তো এর চেয়ে আরও আকর্ষণীয় তথ্য কিছু লুকিয়ে আছে তাঁর এই উপদেশের মধ্যে। সেও সম্ভব তবে আপাততঃ আমার এর চেয়ে মনে লাগার মতো ভাবধারা বা ব্যাখ্যা মনে আসছে না, তবে পরে হয়তো আসতে পারে, তাই কিছুক্ষণ বনের মধ্যে পায়চারী করে আবার বসে পড়লাম পাথরটার ওপর। নয়নভরে দেখতে লাগলাম শুভ্র ও পবিত্র কাঞ্চনজঙ্ঘার নয়নাভিরাম দৃশ্য।

তৃতীয় দিন গুরুজী দিলেন নতুন নির্দেশ। তিনি বললেন—তোমার মনটাকে মনে কর একটা আকাশ আর মনের চিন্তাস্রোতকে মনে কর মেঘ। আকাশের মেঘগুলোকে দেখার মতো মনের চিন্তাস্রোতগুলোকে দেখতে থাক। শুধু নীরব দর্শক হয়ে আকাশের মেঘ দেখার মতো চিন্তাস্রোতটা কোথা থেকে আসছে কোথায় যাচ্ছে তা লক্ষ্য করার চেষ্টা কর।

আমি বাধ্য ছেলের মতো গুরুজীর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের উপদেশগুলোকে পালন করতে লাগলাম।

চতুর্থ দিনে গুরুজী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—তোর কি কোন অসুবিধা হচ্ছে?

—একদম না।

—এই বনের মধ্যে একা থাকতে কি খুব একঘেয়েমী লাগছে?

—না।

কষ্টের কোন প্রশ্নই আসে না। সকলের সাথে ঘন্টা বাজার সাথে সাথে হাজির হই, খাওয়া দাওয়ার পর চলে আসি। সারাটা দিন কাটে সম্পূর্ণ নির্জনে, রাত্রিবেলা মঠে গিয়ে প্রার্থনা করি তারপর শুয়ে পড়ি। এটা প্রায় নিয়মমাফিক হয়ে গেছে, তবে আমি জানি যে গুরুজীর এই নির্দেশের মূলে নিশ্চয়ই কোন কারণ রয়েছে, তাই কোন রকম কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। আমার কাছে একটা নতুন নেশা হয়ে দাঁড়াল। সম্পূর্ণ নির্জনে এরকম একা একা কোনদিন থাকিনি। মনে হয় আমার আচরণে তিনি সন্তুষ্ট। তিনি বললেন—আজকে আর তোকে বনে যেতে হবে না। তারপর খুব গোপনভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,

—তুই কি সত্যি তিব্বতে যেতে চাস?

আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বললাম—নিশ্চয়ই। তবে আপনার যদি একান্তই অমত থাকে তাহলে আপনার সাথে আমি যাবো না। আমাকে রাস্তাঘাট ও প্রয়োজনীয় তথ্য কিছু কিছু জানিয়ে দিলে আমি নিজেই চলে যেতে পারবো।

গুরুজী আমার কথা শুনে একটি মোক্ষম প্রশ্ন করে বসলেন—তিব্বতে যেতে চাস কেন?

আমি তাঁর কাছ থেকে এই প্রশ্নটা আশা করিনি, কারণ আমি জানি যে তিনি নিজে ভবঘুরে, তিনি নিশ্চয়ই জানেন এর উত্তর। আমি এর উত্তর জানি না। কিন্তু গুরুজী প্রশ্নটা করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন উত্তরের জন্য তাই তাঁকে কিছু বলতেই হবে। উত্তরে জানালাম,

—ওই যে দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর দিয়ে মেঘগুলো যাতায়াত করছে, আপনি কি জানেন কেন তাদের এই গতিবিধি?

গুরুজী আমার উত্তরটা শুনে প্রসঙ্গ পালটালেন—আজ তুই শিল্পী লামাকে রঙ করার কাজে সাহায্য কর, তারপর কাল সকালবেলা আবার তোকে কিছু করবার জন্য দেবো।

—ঠিক্ হায় গুরুজী, আপ্‌কো যেয়সা মর্জি।

পঞ্চমদিনে খুব ভোর বেলা গুরুজী আমাকে ঠেলে তুললেন। বললেন—যা প্রাতঃকৃত্য সেরে আয়।

তখনও সূর্যোদয়ের অনেক দেরী, কম্বল ছাড়তে একটু বেগ পেতে হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত না ছেড়ে উপায় নেই। বাগান সেরে চৌবাচ্চায় ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুয়ে এসে হাজির হলাম গুরুজীর সামনে। তিনি আমাকে নিয়ে মন্দিরে এলেন। মন্দিরে ঘিয়ের প্রদীপটা সব সময়ই জ্বলন্ত থাকে, তিনি সেটাকে একটু উস্কে দিলেন তারপর পাশের নতুন বস্ত্রখণ্ড নিয়ে ভগবৎ প্রণাম সারলেন। তাঁর দেখাদেখি আমিও করলাম। তারপর তিনি

আমাকে পাশের প্রার্থনা বেদীতে বসতে বললেন। এখানে লম্বা প্রার্থনা বেদীতে সব সময়ই গদি পাতা থাকে, যে-কেউ সেখানে যখন খুশী এসে ধ্যানে বসতে পারে।

গুরুজী বললেন—ভাল করে ভগবান তথাগতের মুখের ভাব লক্ষ্য করতে থাক।

প্রদীপের মৃদু আলোতে সেই বিরাট মূর্তিটা প্রায় অস্পষ্ট, তার ওপর বছরের পর বছর ধরে প্রদীপের শিখার কালিতে ঘরটাও প্রায় কালো। ভগবান তথাগতের মূর্তিটাও বিরাট, এত কাছ থেকে সেই মূর্তিটার সম্পূর্ণ অবয়বকে দৃষ্টির মধ্যে আনা মুশকিল। তাই চেয়ে রইলাম তার মুখের দিকে। প্রদীপের আলোটা সরাসরি তার চোখে গিয়ে পড়েছে, সাদা চোখের ওপর নীল রঙের নেত্রবিন্দুটা জ্বল জ্বল করে জ্বলছে, সেদিকেই আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রইল। মনে হচ্ছে তিনি যেন আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। সেদিক থেকে আমি দৃষ্টি ফেরাতে পারলাম না। আমার সামনেই যেন দেখতে পাচ্ছি ধ্যানী পবিত্র ও শান্ত বুদ্ধের এক অপরূপ জ্যোতি—অপলক দৃষ্টিতে সেদিকে আমি চেয়ে রইলাম। তার চোখের জ্যোতিতে আস্তে আস্তে সমস্ত মন্দিরটা যেন আলোকিত হয়ে উঠতে লাগল। তথাগতের মুখটা এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কি অপূর্ব অনুভূতি ··· ।

এমন সময় কানের কাছে গুরুজীর কণ্ঠ শুনতে পেলাম—তিনি ফিস ফিস করে বললেন,

এবার আস্তের ওপর চোখ দুটো বন্ধ কর, শরীরটাকে একদম নাড়াবি না, চুপচাপ বসে বসে শুধু ভগবান বুদ্ধের অপূর্ব জ্যোতিটা উপলব্ধি করার চেষ্টা কর। তার আলো যেন আস্তে আস্তে তোর দেহের ওপর এসে পড়ছে, তোর দেহটা আলোকিত হয়ে উঠছে, এইভাবে কিছুক্ষণ বসে থাক, মনে মনে শুধু তথাগতের উজ্জ্বল মুখটা চিন্তা কর। চোখটা বুজেই থাক ; এইবার মুখ ফুটে বল—'ওম্ মণি পদ্মে হুম্, ওম্ মণি পদ্মে হুম্, ওম্ মণি পদ্মে হুম্ ···' ; মনে মনে এই মন্ত্রটা জপ করতে থাক্। মন্ত্রটাকে হারাসনি, মুখ দিয়ে বল আর কান দিয়ে শোন্।

গুরুর উপদেশানুযায়ী আমি চুপচাপ বসে সেই মন্ত্র জপ্‌তে লাগলাম।

বেশ কিছুক্ষণ পরে চেষ্টা করেও মন্ত্রটাকে ধরে রাখতে পারলাম না, বার বার হারাতে লাগলাম। এমন এক সময় এল যখন চিন্তা আর মন্ত্রের সঙ্ঘাত বেঁধে উঠল ; আমার ইচ্ছা মন্ত্রটাকে ধরে রাখার, আর চিন্তা বার বারই তার জায়গা দখল করে বসছে। নানা রকমের চিন্তা মাথার মধ্যে যেন কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে তুলছে। আবার শুনতে পেলাম গুরুজীর কণ্ঠ—মনটাকে হালকা করে রাখ। মনের মধ্যে চিন্তা এলে তাকে আসতে দে, তার সঙ্গে যুদ্ধ করে লাভ নেই। তাকে ভালবাসা দিয়ে জয় করতে হবে। কোন রকম চিন্তাই খারাপ নয়। ভালমন্দের বিচার করিস না, শুধু আস্তের ওপর চিন্তার জায়গায় মণি মন্ত্রটাকে বসিয়ে দে।

আমি পা-টাকে একটু বদলিয়ে নড়েচড়ে আবার স্থির হয়ে বসলাম, মনে মনে জপতে লাগলাম—'ওম্ মণি পদ্মে হুম্, ওম্ মণি পদ্মে হুম্, ওম্ মণি পদ্মে হুম্ ···'

এইভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেলো তারপর ঘুম ভাঙার মতো হঠাৎ মনটা জেগে

উঠল, মনে হয় বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। চেয়ে দেখলাম সামনে গুরুজী নেই, বাইরের রোদটা দরজা দিয়ে ভেতরে এসে উঁকি মারছে। আমার চমক ভাঙলো, দরজাটা পশ্চিমমুখী, এখান দিয়ে যখন সূর্য ভেতরে আসে তখন সাধারণতঃ বিকেলের দিক। আমি উঠবো কি না জানি না। দেহটাকে খুব হালকা লাগছে, মনটা মনে হয় হালকা মেঘের চেয়েও হালকা—কি অদ্ভুত সুন্দর অনুভূতি! দরজা দিয়ে একটা মুখ উঁকি দিল, তার দিকে তাকাতেই সে নিরুদ্দেশ হল। মঠের কোন একটি শিশু বলে মনে হয়। চুপচাপ বসে স্ট্যাচুগুলোকে আবার দেখতে লাগলাম। এমন সময় ঢুকলেন গুরুজী।

হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন লাগছে?

—খুব ভাল লাগছে। দেহ ও মন খুব হালকা লাগছে, মনে হয় আমি উড়ে যেতে পারবো। উত্তর দিলাম।

গুরুজি হেসে বললেন—এখন উঠতে পারিস, যা, কিছু খেয়ে নে, রান্নাঘরে নাউকা তোর জন্যে বসে আছে।

আমি আসন ছেড়ে উঠলাম, ভগবানকে প্রণাম করে গুরুজীকে প্রণাম করলাম। তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কি আমাকে বৌদ্ধ ভিক্ষু মতে দীক্ষিত করছেন?

তিনি বললেন—তাঁকে জানাটাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। মত আর পথ নিয়ে সেই উদ্দেশ্যটাকে হারিয়ে লাভ নেই।

—গুরুজী, আমার জানতে ইচ্ছে করছে, আমি যেভাবে আজ ধ্যান বা প্রার্থনা করলাম সেটাই কি মহায়ান বা হীনযান পন্থা? তিব্বতে শুনেছি বজ্রযানের খুব প্রচলন।

উত্তরে তিনি জানালেন—সব যানই সেই মহাসত্যে পৌঁছে দেয়।

তাঁর উত্তর শুনে আমি থামতে বাধ্য হলাম। বুঝলাম যে তিনি দর্শনের তর্কের মধ্যে মহাসত্যের পথকে হারাতে চান না। গুরুজীর মতে সাধারণের পক্ষে ভজন পূজন আর ধ্যানের মাধ্যমেই সত্যের পথ সহজ। আর যারা দর্শনের কঠিন তত্ত্ব ও রহস্য নিয়ে তর্ক করে তারা চলে কঠিন পথে।

গুরুজী আমাকে বললেন—এখন থেকে সব সময়ই এই মণি মন্ত্র জপতে থাকবি। যতক্ষণ পারবি মনে মনে জপতে থাকবি, একদম বিরাম দিবি না।

গুরুজীর বাক্য শিরোধার্য। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি তখন বেলা দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে পড়েছে। কিভাবে যে সময়টা এত তাড়াতাড়ি কেটে গেছে আমি সেটা কল্পনাও করতে পারছি না।' মনে হয় ভোর চারটে থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত আমার এক জায়গায় বসেই কেটে গেছে। আমার কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা—নতুন স্বাদ—নতুন জগৎ। আবার বসবার জন্য মনটা ছট্‌ফট করতে লাগল। এই অনুভূতিই মনে হয় আনন্দানুভূতি। এতে আমার কৃতিত্ব কিছু নেই, গুরুর কৃপা মাত্র। 'গুরু কৃপাহি কেবলম্‌।'

পরের দিন সকালবেলা গুরুজী সকলকে বললেন যে আমি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত

হয়েছি, সকলে হাসিমুখে আমাকে তাঁদের মধ্যে গ্রহণ করলেন। বিকেলবেলা মঠের একজন লামাকে দিয়ে আমার মাথা মুণ্ডিত করে দিলেন, আর তারপর থেকেই আমাকে মঠের অন্যান্য সকলের মতো পীত-বসন পরতে নির্দেশ দিলেন। তাঁদের সাথে আমিও যুক্ত হলাম।

সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই হল অতি সাধারণভাবে। কোন রকম জাঁকজমক দীক্ষা-পর্ব পূজো-আচার কিছুই হল না। বিনা উপনয়নেই আমি দীক্ষিত হলাম। গুরুজী বললেন—সত্যের পথ অতি সহজ। আড়ম্বরের কোন দরকার নেই, দরকার অন্তরের ভক্তি ও সততা।

গুরুজী শিক্ষককে অনুরোধ করলেন আমাকে তিব্বতী অক্ষরগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে। হাতে মোটেই সময় নেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে সেটা আয়ত্তে আনতে হবে। শুরু হল আমার তিব্বতী ভাষা শিক্ষা। আমার এখন কোনো নাম নেই, গুরুজী কোন নাম দেননি, মঠের সকলে 'এই' 'ওই' বলেই সম্বোধন করে। দিনগুলো বেশ আরামে কাটতে লাগলো। লামা বা বৌদ্ধ ভিক্ষুর পোশাকে মনে হল আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বটাই যেন পাল্টে গেছে, এই পোশাকের মাহাত্ম্য আছে বলতে হবে। তিব্বতী ভাষায় ওদের প্রার্থনা, সেটাকে আমি বাংলা অক্ষরে লিখে নিয়েছি কাজেই তাঁদের সাথে সমবেত প্রার্থনায় যোগ দিতে কোন অসুবিধা হয় না। প্রার্থনা ও মণিমন্ত্র ছাড়া আমার কথাবার্তা বলা প্রায় বন্ধ। তিব্বতী ভাষার ক্লাশেও সেই একই অবস্থায় আমাকে শুনতে হয় ও লিখতে হয় কথা বলা নিষেধ। মৌন কথাটাই আমার কাছে স্বাভাবিক হয়ে এল।

তিব্বতে যাত্রার নির্দিষ্ট দিন পেরিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে সব যাত্রী লামারা এসে সেখানে জমায়েত হয়েছেন। মার্চ মাসের মাঝামাঝি হয়ে গেল তবুও তাঁদের যাবার কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। গুরুজী বলেছিলেন যে মার্চ মাসের প্রথম দিকেই তাঁরা যাত্রা করবেন। জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হলাম।

তিনি আমাকে বুঝিয়ে বললেন—তিব্বতে যাওয়া দিনদিন অসম্ভব হয়ে উঠছে। আগে তিব্বতে যেতে হলে কোন রকম কাগজ পত্রের দরকার হতো না, সীমানার কোন প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু ১৯৫০ সালের পর থেকে নেপাল, সিকিম ও ভুটিয়াবাসীদের কাগজপত্র দরকার হয়। সরকারের তরফ থেকে লিখিত অনুমতি দরকার। কাঠমাণ্ডুর দূতাবাস থেকে একটা ছাড়পত্র দেওয়া হয়, একমাত্র লামারাই আজকাল তীর্থযাত্রী হিসেবে তিব্বতে যেতে পারে। ভারতবাসীদের ওরা কোন রকম অনুমতি দেয় না। তাঁর কথা শুনে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আমিতো ভারতীয় গুরুজী, তাহলে আমাকে নিশ্চয়ই ওরা যেতে দেবে না।

—সেটা ঠিক, তোকে ওরা বরডারেই আটকে দেবে, তবে আমি ওদের বলবো যে তুই আমার চেলা, সিকিমের ছেলে।

—কিন্তু গুরুজী আমি ভাষা জানি না, আর ওরা আমাকে দেখলেই বুঝবে যে আমি এদেশের ছেলে নই।

আমার কাঁধে হাত দিয়ে গুরুজী আমাকে আশ্বস্ত করলেন। তিনি বললেন—তুই

চিন্তা করিস্‌নি আমি তোর হয়ে সব ভেবেছি, আমার পরিকল্পনাটা তোকে খুলে বলছি মন দিয়ে শোন; তুই জানিস যে আমার ডান পায়ের জোর কমে গেছে, তোকে তোর মালের সাথে আমার কম্বলটা বইতে হবে। মনে করছিস এটা কিছুই না এ খুব হাল্‌কা কাজ কিন্তু রাস্তায় নেমেই বুঝবি। এতেআমার একটা বিরাট উপকার হবে। আমাদের পারমিশন বাহান্নজনের জন্য, মনে হয় কিছুতেই তিরিশজনের বেশী যাত্রী হবে না। চীনারা তিব্বতে আসার পর থেকে লামারা ইচ্ছা থাকলেও যেতে চায় না; পারমিশনের কাগজে কোন নাম নেই, কাজেই যাকে খুশী আমি নিতে পারি। তুই যাবি আমার চেলা হয়ে, আর যেখানে চীনা সৈন্যরা থাকবে সে সব জায়গায় তুই মৌন থাকবি, আমি বলব যে তুই মৌনী লামা তুই কথা বলিস না। কাজেই যা কিছু বলার আমিই বলবো। মনে থাকে যেন তুই আমাদের সঙ্গে যাবি মৌনীবাবা হয়ে।

গুরুজীর কথা শুনে আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। আমার আনন্দটাকে ধরে রাখতে পারলাম না। তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললাম, জয় সাধুবাবা কি জয়। এই বলেই তাঁকে গড় হয়ে প্রণাম করে বলতে লাগলাম—'গুরু কৃপাহি কেবলম্, গু-রু কৃপা হি কেবলম্।' গুরুজী আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—

—উচ্ছ্বাস নয়, বৌদ্ধভাবকে আয়ত্তে আনবার চেষ্টা কর, 'ওম্ মণি পদ্মে হুম্, ওম্ মণি পদ্মে হুম্…।' আমিও তার কন্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তথাগতের কৃপার্থে বলতে লাগলাম—'ওম্ মণি পদ্মে হুম্, ওম্ মণি পদ্‌মে হুম্, ওম্ ম ণি প দ্ মে হুম্…।'

যাত্রা

লামাদের মধ্যে হঠাৎ আনন্দের সাড়া পড়ল।

১৯৫৬ সালের ৮ই এপ্রিল, কাঠমাণ্ডু থেকে অনুমতি পত্র এল। কাঠমাণ্ডুর চীনা দূতাবাস থেকে একজন কর্মচারী নিজের হাতে নিয়ে এসেছে সেই অনুমতি পত্র। গুরুজীকে সে চেনে, গুরুজীর নামই গাইড্ হিসেবে সেখানে লেখা। এই প্রথম তাঁর নাম জানতে পারলাম। তাঁর নাম গুরু গেশে রেপ্‌তেন। তিব্বতী পদবী-খুব সম্মানীয় ও উচ্চস্তরের তো বটেই। লামারা একই সঙ্গে গুরুজীর নামে চীনা দূতাবাসে অনুমতি পত্রের জন্য আবেদন করেছিলেন। এটি তারই উত্তর। ভদ্রলোক গুরুজীকে অনুমতি পত্রটি দিয়ে বার বার করে তীর্থযাত্রীদের গুণলেন তারপর প্রত্যেকের পাঁচ আঙ্গুলের টিপসই নিয়ে বিদায় জানালেন। তিনি ছিলেন চীনা দূতাবাসের একজন নেপালী কর্মচারী।

লামাদের মধ্যে চঞ্চলতা দেখা দিল, তৈরী হও, এবার যেতে হবে।

এচে ধর্মশালায় তাঁদের থাকা ও খাওয়া বাবাদ যা কিছু পাওনা তা মিটিয়ে দেওয়া হল। খুব সস্তাই বলতে হবে মাথা পিছু একদিনের জন্য মাত্র দশ আনা।সেইদিনই বিকেলবেলা সিকিমের রাজবাড়ী থেকে আমাদের প্রত্যেকের জন্য এল নতুন কম্বল ও চাদর। সিকিমের মহারাজ বরাবরই যাত্রীদের জন্য এই দানের সঙ্গে তার শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ পাঠান। কৈলাস বা লাসা যাত্রীদের জন্যই এই ব্যবস্থা। সেদিন রাত্রিতেই গুরুজী তাঁর শেষ উপদেশ দিয়ে দিলেন। যাত্রীদের মধ্যে একমাত্র গুরুজী ছাড়া অন্যান্য সকলেরই এই প্রথম তিব্বত যাত্রা, আনন্দ-উৎসাহ আর কৌতূহলের যেন অন্ত নেই।

৯ই এপ্রিল।

পরেরদিন খুব ভোরে উঠে আমরা তৈরী হয়ে নিলাম। প্রত্যেকের পিঠে সামান্য মালপত্র। ভারী পোশাক, হাতে জপমালা আর লাঠি। মালপত্রের মধ্যে আছে প্রধানতঃ কম্বল, আটা, ছাতু। নুন প্রত্যেকের কাছেই কম করেও পাঁচ-ছ কিলো, তিব্বতে নুনটা খুব দামী সামগ্রী, যত ওপরে ওঠা যাবে ততই এর দাম বাড়বে।

সমবেত প্রার্থনা সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম মন্যাস্ট্রি থেকে। বাইরে এসে দূরে পাহাড়টার দিকে দেখিয়ে গুরুজী বললেন—ওই দেখ চুম্বি ভ্যালী—তার গা ঘেঁষে যে পাহাড়টা উঠে গেছে তার ওপর আমাদের উঠতে হবে, পাহাড়ের ওপারেই রয়েছে

আমাদের রহস্য জগৎ তিব্বত আর মহাতীর্থ কৈলাসনাথ ও মানস-সরোবর মঠ থেকে অনেকেই আমাদের সাথে সাথে রাস্তায় এসে গিয়েছিল। তাদের বিদায় জানাবার আগে আরেকবার তথাগতের উদ্দেশ্যে আমাদের সমবেত প্রার্থনা করলাম—

'প্রজ্ঞাহীন লোক ধ্যানে বসতে পারে না
ধ্যানহীন ব্যক্তির প্রজ্ঞা হয় না,
হে ভগবান করুণাসিন্ধু জগৎপতে
তুমি আমাদের প্রজ্ঞার পথে চালিত কর,
বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের পথে পরিচালিত কর।'

বলাই বাহুল্য, এই মঠের সবাই তিব্বতী ভাষা জানে। তিব্বতী ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে এখানকার পূজা-পদ্ধতি। গুরুজী সকলের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন—আমার নতুন নাম হল গেলং লামা।

আমাদের যাত্রা হল শুরু, ছোট বড় সবাইকে একে একে বিদায় জানিয়ে আমরা বড় রাস্তা ধরলাম। সেখানেই দেখা হল আনচুর সাথে। সে আমাকে জড়িয়ে ধরে ভাঙা ভাঙা শব্দ মিলিয়ে বলল—'আমাকে ভুলে যেও না।' আমিও ওর পিঠে মৃদু আঘাত করে আশ্বাস দিলাম। সে জানে যে আমার কথা বলা নিষেধ।

গ্যাংটক শহরের একটু বাইরেই হচ্ছে এই মঠটা, এখান থেকেই আমরা ধরলাম নাথুলা সড়ক। এই রাস্তাটাই পাহাড় থেকে নেমে উপত্যকায় পড়ে আবার উঠে গেছে পরের পাহাড়ে, তিব্বতের পথে। আমার নিজের মালপত্রের সাথে যোগ হয়েছে গুরুজীর কম্বল আর একটা অ্যালুমনিয়মের ডেক্‌চি। আমার পিঠের মাল সব মিলিয়ে দশ কিলোও হবে না। পাহাড় থেকে নামতে কোন অসুবিধা হল না। আমার পোশাক বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরই মতো, অসুবিধা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই পোশাক। ঠিক ভারী নয় কিন্তু মনে হয় জটিল। ছেলেদের লুঙ্গি আর মেয়েদের সেমিজ এই দুটোকে এক করে তার ওপর সোয়েটার আর চাদর জড়ালে যা দাঁড়ায়। যারা অভ্যস্ত তারা বলবে যে শীতের দেশে এর চেয়ে উপযুক্ত পোষাক আর হতে পারে না। কথাটা ঠিক, যারা লুঙ্গি পরে দৌড়য় তাদের কাছে সেটাই উপযুক্ত, আসলে সবই অভ্যাসের ব্যাপার। আমি এই পোষাক পরে এখনও মঠের বাইরে চলা ফেরা করিনি কাজেই আমার কাছে এটা খুবই অস্বস্তিকর লাগছে, বিশেষ করে এই পাহাড়ি এলাকায়।

ঘন্টা চারেক চলার পর আমরা পড়লাম সমতল ভূমিতে। ডান ও বাঁদিকের মিলিটারী ক্যাম্পের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে এগুতে লাগলাম। গুরুজীর নির্দেশ তাড়াতাড়ি হাঁটবে না, আর চলার পথে কেউ কথা বলবে না। প্রথম দিন, কাজেই সকলেই সুস্থ ও সবল, মনের উদ্যম আর উৎসাহ চলার ভঙ্গিতে প্রকাশ পাচ্ছে। দুপুরবেলায় আমরা থামলাম। শুকনো ডালপালা যোগাড় করে আমাদের খাবারের জন্য উনুন ধরালাম। এ পর্যন্ত শুধু নীচের দিকেই নেমেছি, কাজেই আমরা কেউই ক্লান্ত হইনি। ভাত আর আলুসেদ্ধ পরম আনন্দে খেয়ে, সব জিনিসপত্র গুছিয়ে আবার ধরলাম রাস্তা।

এবারে ওপরে ওঠার পালা। আমাদের এই দলে আমিই সবচেয়ে বয়সে ছোট, আর গুরুজীই বয়োজ্যেষ্ঠ। অধিকাংশ লামাদের বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। এরা সবাই পাহাড়িয়া, কাজেই পাহাড়ই এদের নিত্য সখা, পাহাড়েই এদের প্রাণ। আমিও এদের সাথে তাল মিলিয়ে ধীরে ধীরে এগুতে লাগলাম। গ্যাংটকের মতো এই অঞ্চলটাও সুন্দর পাইন ও ফার্ণের বনে ভরা আর তারই সাথে খাপ খাইয়ে রয়েছে সেওলা পাথরের ভ্যাপসা গন্ধ। সিকিমের বড় রাস্তাটা ছেড়ে আমরা ধরেছি নাথুলার পথ। নাথু মানে নাম আর লা মানে সংকট, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথ। জীলাপ লা এই ধরনের আর একটি পাশ, এখান থেকে একটি পথ এগিয়ে গেছে সেদিকে। যে বর্ধিষ্ণু গ্রামটা আমরা পার হলাম তার নাম কারপোনাং (Karponang)।

আমরা যত ওপরে উঠতে লাগলাম ততই গ্যাংটক ও সমস্ত হিমালয়ের দৃশ্য পালটাতে লাগল, হিমালয়ের অন্য এক রূপ আমাদের সামনে ধরা দিল। পাহাড়ের গা ঘেঁষে বনের পথ ধরে আমরা এগিয়ে চলতে লাগলাম। আবহাওয়াটা খুবই উপভোগ্য, পাহাড়ে ওঠার জন্য যে পরিশ্রম হচ্ছে তা এখানকার ঠাণ্ডা হাওয়ায় উপশম হচ্ছে। তবে ক্লান্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়া মুশকিল। চলা দেখেই বোঝা যায় যে আমরা সবাই হাঁপিয়ে উঠেছি। সন্ধ্যের দিকে গুরুজী বললেন আর কিছুদূর গিয়েই আমরা থামবো। তাঁর কথা মতো ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আমরা একটা ছোট গ্রাম পেলাম, গ্রাম না বলে তাকে চটি বলাই ভাল। একটা কাঠের বাড়ীর সামনে আসা মাত্রই কয়েকজন ভদ্রলোক আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন। গুরুজী তাঁদের ভাষায় কি যেন জিজ্ঞেস করলেন, ভদ্রলোক আমাদের পথ দেখিয়ে দোতলার একটি ঘরে নিয়ে তুললেন। দুটো ঘরে ঠাসা-ঠাসি করে বত্রিশজনের ব্যবস্থা হলো। বুঝলাম সে রাতে সেখানেই থাকতে হবে। গুরুজী বললেন জায়গাটার নাম চেংগু (Chengu)।

প্রত্যেকদিন রাত্রিবেলা শোবার আগে গুরুজী ভগবান বুদ্ধের বাণী পাঠ করেন, সকলে তা মন দিয়ে শোনে। চেংগুর যে ঘরে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছিল, সেখানে ছাদটা খুব নীচু ভালভাবে বসার উপায় নেই, বসতে হলে বারান্দায় যেতে হবে, কাজেই গুরুজী সকলকে একশ আটবার মালা জপ করতে বলে শুতে চলে গেলেন। রাতের খাবার হিসেবে খেতে হল স্থানীয় বাগানের কাঁচা সব্জি। মূলো ও ফুলকপি। খিদের মুখে যা পাওয়া যায় তাইই চলে। খাবার থেকে তখন বিশ্রাম আর ঘুমের বেশী প্রয়োজন।

পরের দিন খুব ভোরে উঠে আবার রওনা হলাম। চাংগু বা চেংগু থেকে আর মাত্র আট মাইল আছে নাথুলা। গ্যাংটক থেকে এখানে আসতে সাধারণতঃ দেড় দিন সময় লাগে কিন্তু আমরা একটা খাড়াই সংক্ষেপ পথে একদিনেই পৌছতে পেরেছি।

খুব ভোরবেলায় উঠে আমরা অবার রওনা হলাম। এবার রাস্তাটা সত্যি কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এঁকে বেঁকে সরু রাস্তাটা ওপরের দিকে উঠে গেছে, রাস্তার দুধারে সামরিক বাহিনীতে ভর্তি। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য আগের থেকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে, চলার ক্লান্তি কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্যেই যেন মিটে যাচ্ছে। আমাদের হঠাৎ থামতে

হল—একজন সৈন্য আমাদের কাছে এসে বলল—আর এগুবে না সরাসরি ফিরে যাও। তার কথা শুনে আমরা তো অবাক, গুরুজী খুব ভাল হিন্দী জানেন। তিনি সৈনিককে ভালোভাবে বুঝিয়ে বললেন যে আমরা তীর্থযাত্রী, আমরা যাচ্ছি তাশিলুম্পা ও মানস সরোবরের দিকে।

সৈনিক তার কথায় হেসে উঠল—সব তীরথ বন্ হোগিয়া, আপস্ যাও।

গুরুজী তার কথায় কান না দিয়ে আমাদের চলতে বললেন। আমরা চলা আরম্ভ করতেই সৈনিকটি পথ আগলে ধরলো, তারপর বলল—ঠিক আছে, যদি যেতেই চাও যাও সামনেই সীমান্ত প্রহরীর পাল্লায় পড়বে. তখব বুঝবে মজা। আমরা তাকে বিনা তর্কে এক পাশে রেখে এগিয়ে চললাম। আধঘন্টা পরই আমরা আবার পেলাম সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর বেড়া। একটা গাছকে রাস্তার ওপর রেখে তৈরী করা হয়েছে কৃত্রিম সীমান্ত। ছ'জন জাট সৈনিক আমাদের দেখে এগিয়ে এল। গুরুজী প্রস্তুতই ছিলেন, তিনি তাদের বুঝিয়ে বললেন যে আমাদের ছেড়ে দিলে তার কাজের কোন শিথিলতা হবে না। আমাদের কাগজপত্র সব আছে। গুরুজীর কথা শুনে তারা আমাদের পাশের একটি তাঁবুতে নিয়ে গেল, সেখানে অফিসারের সামনে আমরা হাজির হলাম। অফিসার ভদ্রলোক আমাদের কাগজপত্র খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে আমাদের যেতে অনুমতি দিলেন। সীমান্ত এখনও অনেক দূরে। বলাই বাহুল্য যে এই অঞ্চলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীই সীমান্ত রক্ষা করছে। সেখান থেকে আরও তিন ঘন্টা পর আস্তে আস্তে রাস্তাটা সরু হয়ে এল। ঘন বনের ভ্যাপ্সা গন্ধটা আরও ভারী হয়ে এল, শরীরটাও যেন আগের চেয়ে অনেক ভারী ভারী ঠেকছে। রাস্তাটা একেবারে কাঁচা পাথর আর ধুলোয় ভর্তি। আমাদের সামনের পাহাড়টা দেয়ালের মতো যেন এগিয়ে আসছে, গুরুজী আমাদের থামতে বললেন। আমরা সে অপেক্ষাতেই ছিলাম। তাঁর কথা কানে যাওয়া মাত্র আমরা বসে পড়লাম রাস্তার ওপর। উঃ, কি উঁচু এই পথ। আর কতদূর ?

আধঘন্টা বিশ্রাম করে আমরা আবার রওনা হলাম, সামনের বাঁকটা পেরোতেই আমরা পড়লাম একটা বিরাট সৈন্যবাহিনীর হাতে, নাথুলার দৃশ্য এখন সামরিক বাহিনীর দৃশ্য, প্রায় সাড়ে চার হাজার মিটার ওপরে পাহাড়ের ওপর যেন সবাই কুরুক্ষেত্রের জন্য তৈরী আছে। সৈন্য সংখ্যার সাথে পাল্লা দিয়ে রয়েছে গোলা বারুদ বন্দুক। সবাই তৈরী শুধু ভেরী বাজার অপেক্ষা। আমাদের চারিদিকে শ'খানেকে জওয়ান এগিয়ে এল, সকলের হাতেই উদ্যত বন্দুক, হঠাৎ দেখে মনে হবে এরা যেন আমাদেরই অপেক্ষায় বসে ছিল। বুঝতে অসুবিধা হল না, এটাই ভারত তথা সিকিম ও তিব্বতের সীমান্ত।

এদের সর্তক দৃষ্টি এড়িয়ে একটা মাছিও সীমানা লঙ্ঘন করতে পারবে না। এদের ক্ষমতা ও কর্মতৎপরতা দেখে মহান ভারতের সৈন্যবাহিনীর তারিফ না করে থাকা যায় না। রাস্তার ধারেই একটা কাঠের বাড়ীতে সীমান্ত চৌকি, সেখানে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। অফিসার ভদ্রলোক আমাদের বসতে বললেন। তার কথার কায়দায় ও হাবভাবে মনে হল তিনি বাঙালী। আমার কথা বলার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই।

সামান্য একটু অসাবধানতার জন্য হয়তো আমার সম্পূর্ণ যাত্রাটাই নষ্ট হয়ে যাবে, সামরিক বাহিনীর হলেও দেখে মনে হয় তিনি খুবই ভদ্র। তিনি গুরুজীকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে আমাদের যাওয়ার খবর তিনি সরকারীভাবে জানতে পেরেছেন। কোন অসুবিধা হবে না, আমাদের কাগজপত্র সব ঠিক আছে। গুরুজীর সাথে তিনি হিন্দীতেই কথাবার্তা বললেন। তিনি আমাদের সবাইকে মিলিটারী তাঁবুর ক্যান্টিনে নিয়ে গিয়ে সেখানকার কোয়ার্টার মাস্টারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমরা লাসা ও কৈলাসের দিকে যাবো শুনে চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কি পাগলা নাকি? শীত এখনও কমেনি আর তাছাড়া রাস্তাও খুব সহজ নয়। আমরা যাবো কি করে? যাই হোক ভদ্রলোক আমাদের খুব প্রশংসা করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁরা আমাদের বিরাট মগে করে চা সেই সাথে রুটি ও তরকারী পরিবেশন করলেন। আমাদের কাছে এটা অপ্রত্যাশিত, তাঁরা আমাদের পেট ভরে খাওয়ালেন, আমরা তাঁদের প্রাণভরে আর্শীবাদ করে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

নাথু-লা'র এই ভয়াবহ গিরিসংকটকে এতক্ষণে দেখবার অবকাশ পেলাম। হিমালয়ের এ আর এক অপরূপ দৃশ্য। পাহাড়ের এটাই হচ্ছে সবচেয়ে উঁচু অংশ। এখান থেকে পাঁচ মাইল দক্ষিণে আর একটি পথ আছে সেটার নাম জীলাপ লা। দূরে দেখা যাচ্ছে সিকিম আর কাঞ্চনজঙ্ঘার সুন্দর দৃশ্য আর আমাদের সামনেই চুম্বি উপত্যকার পথ। আরও কিছুদূর এগুতেই বাঁদিকে হঠাৎ নজরে পড়ল বিরাট খাদ, হঠাৎ এখান থেকে পাহাড়টিকে কে যেন দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। বিরাট খাদের পরই ঝরণার এক উগ্র মূর্তি। প্রকৃতির কাছে আমাদের যেন মনে হচ্ছে অতি তুচ্ছ ও নগণ্য কীট। সাবধানে আমরা নামতে লাগলাম। যে কোন মুহূর্তে ধস নামতে পারে। রাস্তার ধারেই নজরে পড়ল ছোট ছোট পাথরের একটা বিরাট স্তূপ। গুরুজী বুঝিয়ে দিলেন—তীর্থযাত্রীরা এখান দিয়ে পার হবার সময় একটা পাথর এর ওপর যোগ করে। মহান হিমালয়কে প্রণাম জানাবার এ আর এক রূপ। আমরাও সেই পাথরের স্তূপে এক-এক করে আরও এক-একটি পাথর যোগ করলাম। আমি প্রার্থনা করলাম—হে দেব-দেবী! তোমরা আমাদের যাত্রা সফলের জন্য আর্শীবাদ করো।

আমাদের সামনেই চুম্বি উপত্যকার বিশাল দৃশ্য উদঘাটন হল। সামরিক বাহিনীরা যদি না খাইয়ে দিত তাহলে রান্না ও খাওয়ার জন্য আমাদের অনেক সময় ব্যয় করতে হত, সেই সময়টায় আরও এগিয়ে চললাম, পেছনে পড়ে রইল মাতৃভূমি ভারত। ভৌগোলিক সীমা অনুযায়ী আমরা এখন তিব্বতের মাটিতে।

সমতলভূমির আট মাইল মোটেই কষ্টকর নয়, কিন্তু পার্বত্যাঞ্চলের আট মাইল খুবই কষ্টসাধ্য। প্রথম প্রথম আমরা আধঘন্টা পর পর বিশ্রাম করতে লাগলাম, তারপর প্রত্যেক পনেরো-কুড়ি মিনিটে আমরা দাঁড়াতে লাগলাম। কাঁকর মেশানো কাঁচা পাহাড়ে-রাস্তাটা যেন এবার আগের চেয়ে অনেক খাড়াই হয়ে গেছে। যত ওপরে উঠছি ততই হিমালয়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেতে লাগল। সিকিমের রূপটা আরও অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে, বিভিন্ন পাহাড়ের চূড়াগুলো মনে হচ্ছে বিরাট বিরাট ঢেউ। দূরের

পাহাড়গুলোকে মনে হচ্ছে যেন মেঘের থেকে সরাসরি নেমে এসেছে। হিমালয়ের অনেকগুলো ধাপ ডিঙ্গিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছি। সন্ধে হয়ে এল এখান থেকে সুর্যাস্তের লাল আভা দেখলাম। হঠাৎ গুরুজী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, পিছন ফিরে তাকালাম সিকিম তথা ভারতবর্ষের দিকে, এরপর আর এই দৃশ্য দেখা যাবে না। সিকিম কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে। আমাদের সামনেই নজর পড়ল একটা স্তূপ। কোন সিমেন্ট বা পাথরের কারুকার্য নয়। বলা যায় যে কোন ছোট ছেলে হয়তো আশপাশের পাথর জমিয়ে একটা স্তূপ করবার চেষ্টা করেছে, আবার আমরা জানালাম হিমালয়ের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ। নাথুলা'র এইটাই সর্বোচ্চ অংশ ১৪০০০ ফিট। গুরুজী বুঝিয়ে দিলেন যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারত থেকে তীর্থযাত্রীরা তিব্বতে যাওয়ার পথে একটা করে পাথর এখানে জমা করে রাখে। নাথুলা পৌঁছবার প্রতিভূ হিসাবে, আর তিব্বতীরাও ভারতে যাবার পথে পাশের থেকে একটা পাথর এখানে জমা করে। পাথরের এখানে অভাব নেই, আমাদেরও প্রত্যেককে একটা করে পাথর এখানে রাখতে হবে। গুরুজীর কথামতো আমরা পাথর রাখলাম, সেই স্তূপাকৃতি পাথরের ওপর আরও কিছু পাথর পড়ল।

বিশ্রামের জন্য আমরা একটা বড় পাথরের পেছনে জড়ো হলাম। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর পর আমরা এখন পর্যন্ত অন্য কোন লোকের দেখা পাইনি। শুধু মাঝে মাঝে মাথার ওপর দিয়ে কয়েকটি কাক কা-কা করে আমাদের স্বাগতম্ জানিয়েছে মাত্র। গুরুজীকে আমি লামা বলি আর সকলে ডাকে রেপ্তন লামা বলে। তিনি সকলকে তিব্বতের গ্রামে ঢোকাবার আগে শেষ পরামর্শ দিতে শুরু করলেন,

—খুব শীগগীরই আমরা তিব্বতের প্রথম গ্রাম পাবো। সম্ভবতঃ গ্রামে ঢোকবার আগেই হান্দের (তিব্বতীরা চীনাদের হান্ বলে) সম্মুখীন হতে হবে, এটাই স্বাভাবিক যে তারা আমাদের নানাভাবে পরীক্ষা করবে। তারা যাচাই করে দেখবে যে আমরা সত্যিকারের লামা কি না। তোমাদের সামনে আসছে এক ধৈর্যের পরীক্ষা, তোমরা তার জন্য প্রস্তুত হও।

আমরা আবার চলতে শুরু করলাম। প্রায় সমতলের কাছাকাছি পৌঁছতেই আমরা পেলাম একটি চৌকি। সীমান্ত প্রহরীরা সবাই তিব্বতী, তাদের সাথে মাত্র দুজন চীনা সৈন্য। চীনা সৈন্যদের পিঠে বাঁধা ওয়ারলেশ রেডিও। তারা আমাদের দাঁড়াতে বলল। তিব্বতী সেনা এগিয়ে এসে গুরুজীকে তিববতী ভাষায় কি যেন জিজ্ঞাসা করল, গুরুজী তার উত্তরে কাগজ বের করে দেখাতে লাগলেন। চীনা প্রহরী দুজন খুব ভাল করে ছাড়পত্রগুলো পরীক্ষা করতে লাগল। ছাড়পত্র বলতে কাঠমাণ্ডুর চীনা দূতাবাসের অনুমতিপত্র, তার সাথে সিকিম সরকারের প্রশংসা ও শুভেচ্ছা বাণী আর গুরুজীর ব্যক্তিগত পরিচয় পত্র। তার মানে গুরু গেশে রেপ্তেনের সততা প্রমাণ হলেই চলবে, আমরা তাঁর সহচর মাত্র। তিব্বতী ভদ্রলোক চীনা ভদ্রলোককে কাগজের প্রত্যেকটি শব্দের চীনা ভাষায় তর্জমা করে দিতে লাগল। চীনারা এ বিষয়ে খুবই হুসিয়ার তারা সব মনোযোগ দিয়ে শুনে আমাদের সামনেই ওয়ারলেশ রেডিওর মারফত তার উর্ধ্বতন

মহলে জানিয়ে দিতে লাগল। তিব্বতী ও চীনা ভাষার শব্দগুলো আমার কাছে খুবই অদ্ভুত বলে মনে হল। আমি মনে মনে খুবই আনন্দিত, ভারত ছেড়ে বিদেশে আসার আনন্দে আমার মন তখন খুশীতে ভরা, যদিও শরীর খুবই ক্লান্ত তবুও মনে উৎসাহের অন্ত নেই।

আমরা সেখানে ওপর মহলের উত্তরের আশায় প্রায় ঘন্টাখানেক বসে রইলাম, কিন্তু কোন সাড়া শব্দ নেই। আস্তে আস্তে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল, তবুও কনফারমেশন কিছু এল না। গুরুজী বলে রেখেছেন—খুব সাবধান! ধৈর্য ধরে থাকবে। অতএব ধৈর্য ধরে থাকতেই হবে। সন্ধ্যার আলোও নিভে এল! চৌকির কাঠের ঘরে ওরা একটা হ্যারিকেন জ্বালালো। আমরা বত্রিশ জন লামা, চারজন তিব্বতী সৈন্য, দুজন চীনা সৈন্য, সবাই চুপচাপ, কারও মুখে এতটুকু শব্দ নেই। শুধু থেকে থেকে মালার খস খস শব্দ আর লামাদের ভারী নিঃশ্বাস,সেই নিঃশব্দতাকে একটু নাড়াচাড়া দিতে লাগলো। আমাদের মধ্যে অনেকেই পথের শ্রান্তিতে বসে বসেই ঝিমিয়ে পড়েছে। ঘন্টাখানেক পর চীনা রেডিও বেজে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই সচকিত হয়ে উঠলাম। রুদ্ধ শ্বাসে শুনতে লাগলাম—চীনা শব্দে আমাদের জবাব। চৌকিদাররা ভালভাবে উপরিওয়ালার নির্দেশ শুনতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর তারা আমাদের বুঝিয়ে বলল—ঠিক আছে তোমরা যেতে পারো তবে তোমাদের ভালভাবে সার্চ করা হবে। সত্যি আনন্দ সংবাদ বটে। কথানুযায়ী তারা আমাদের পোশাক ও মালপত্র ভালভাবে সার্চ করে এবং সন্দেহজনক কিছু না পেয়ে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।

আমরা ছাড়া পেলাম, আমাদের আনন্দ আর দেখে কে? তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা রাস্তায় পড়লাম। রাস্তায় পড়লাম বটে কিন্তু এগুতে গিয়ে দেখি এ আর এক বিপদ, রাত্রির অন্ধকার চারদিকে ঘনিয়ে এসেছে, রাস্তা দেখার জন্য যে সামান্য আলোর দরকার সেটাও নেই। আমরা থামতে বাধ্য, অথচ চৌকিদাররা বলেছে এ অঞ্চলে না থামাই ভাল, কারণ সৈন্য বাহিনীর লোকেরা ভুল করে আমাদের ওপর গুলি ছুঁড়তে পারে। সমস্যা সমাধানের জন্য গুরুজী এগিয়ে এলেন। তিনি বললেন—তোমরা আমার পেছনে লাইন ধরে এসো আমি প্রথম যাচ্ছি। গুরুজী তাঁর লাঠিটার পেছন দিকটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন, আমি বাঁ হাতে তাঁর লাঠিটা ধরে ডান হাতে আমার লাঠিটা পেছনের দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। এই ভাবে লাঠির শিকল ধরে আমরা চলতে লাগলাম। প্রায় আধঘন্টার মধ্যেই আকাশের তারার আলো আমাদের চোখে ধরা দিল, সেই আলোতেই দেখতে পেলাম রাস্তা।

পাহাড়ে ওঠার পর পা ধরে যায়, আর নামার পর অবশ পা কাঁপে। পাহাড়ে যারা ওঠা নাম করেন তারা ভালভাবেই এই ব্যাপারটা জানেন। আমার সঙ্গী লামাদের অবস্থা কি রকম জানি না তবে আমার অবস্থা খুবই কাহিল, মনে হয় এখানে যদি আমাকে শুতে বলে তাহলে শোবার সাথে সাথেই আমি ঘুমিয়ে পড়ব, কিন্তু চলতেই হবে। ওপরে তারার আলো, পাশে ঝি ঝি পোকার ডাক আর আমাদের চলার শব্দকে কেন্দ্র করেই আমরা চলতে লাগলাম। চলতে চলতে হঠাৎ আমাদের ওপর যেন কারা আক্রমণ

করল। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে একঘেয়েমী চলার সাথে আমরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিলাম, হঠাৎ যেন কতকগুলো দৈত্য হারে-রে করে ঘুমন্ত গ্রামবাসীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, ঠিক ব্যাপারটা কি বোঝার আগেই আমরা দেখলাম যে আমাদের চারপাশে প্রায় ডজন খানেক কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়ে তারস্বরে চীৎকার করছে, আর একপা এগুলেই তারা মনে হয় আমাদের টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে। আমি আমার মণি মন্ত্র ভুলে গিয়ে বলে উঠলাম—মা তারা রক্ষা কর। তারপর হঠাৎ আমি মৌনী বাবা একথাটা মনে পড়তেই থেমে গেলাম। কুকুরগুলোর চীৎকার মনে হয় কেউ শুনতে পায়নি। কুকুর বেষ্টিত হয়ে আমরা চোরের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুরে আস্তে আস্তে দু-একটা আলো দেখা দিতে লাগল। আমি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললাম—যাক বাঁচা গেল এটা একটা গ্রাম বলে মনে হচ্ছে। প্রথম গ্রামবাসী এগুতেই গুরুজী তাদের বললেন—আমরা লাসার তীর্থযাত্রী, আমরা মহাগুরু চেন্‌রেজি দর্শনে যাচ্ছি। আস্তে আস্তে কুকুরগুলো শান্ত হল।

গুরুজীর সাথে স্থানীয় লোকেদের একটু কথাবার্তা হল, অন্ধকারে কারও মুখই স্পষ্ট করে দেখতে পারলাম না। গুরুজী আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন—এরা ভেবেছিল যে চীনা সৈন্য তাই প্রথম প্রথম কেউ বাইরে বেরোয়নি, এখন থেকে খুব সাবধান থাকিস্। আমাকে গুরুজী না বলে বলবি গেশে রেপ্‌তেন। আমিও তাঁর কথা শুনে খুব মৃদুভাবে বললাম—ঠিক আছে। আমি অবশ্য মৌনী বাবা, কাজেই কথার কোন প্রশ্নই আসে না, তবে যদি ফস্ করে মুখ ফুটে বেরিয়ে যায় তাই তিনি আগে থেকে সাবধান করে দিলেন।

গ্রামবাসীদের পেছনে পেছনে আমরা একটা ছোট্ট সেতু পার হয়ে গ্রামে ঢুকলাম। কাঠের একটা বিরাট সিংহ দরজা পার হয়ে আমার মনে হল একটা মঠের ভেতরে এসে পৌঁছলাম। হ্যারিকেনের অল্প আলোতে কোন রকমে পথ দেখা যায় মাত্র, তার বেশী নয়।

আমার ধারণাটা পরিষ্কার হল, একটু পরেই একটা বারান্দায় এনে গ্রামবাসীরা আমাদের বসতে বলল। একে শীত তার ওপর ক্লান্ত আর সেই সাথে পেটের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে খিদে। অন্যান্য লামাদের অবস্থা কি রকম জানি না তবে আমার অবস্থাকে সত্যিকারের দুরবস্থা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। সঙ্গের প্রত্যেকটি লামার ধৈর্য অপরিসীম, তারা কথা প্রায় বলেই না। গেশে রেপ্‌তেন বলেছেন—কথা বলা মানেই শক্তি ক্ষয়। যতক্ষণ কথা না বলে পারা যাবে ততক্ষণই শক্তিটা দেহের মধ্যে সঞ্চিত থাকে, প্রয়োজনে তাকে খরচ করতে হয়। আমার যদি এই মৌনী লামার ভূমিকা না থাকতো, তা হলে চেঁচিয়ে বলতাম আমার মনের কথা। আমাকে বলতে হল না, গুরুজী সব বোঝেন। তিনি পৌঁছানো মাত্র গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসা করেছেন যদি কিছু খাবার পাওয়া যায়। রাত এখন কটা বাজে কে জানে? নাঃ, এই রাতে দোকান-পাট সব বন্ধ। খাবার কিছু পাওয়া যাবে না, তবে তথাগতের মহাকৃপা বলে স্থানীয় চায়ের দোকানের মালিক সাধুদের সেবার জন্য চা তৈরী করে দিতে রাজী, অবশ্য বিনা পয়সায় নয়।

তিব্বতী চা'কে বলে চ্যাং। প্রচুর পরিমাণে গুঁড়ো চায়ের সাথে মাখন আর নুনের সংমিশ্রণে তৈরী। তা হোক তাতে ক্ষতি কি? খিদের সময় যা জোটে তাই যথেষ্ট। কিছুক্ষণের মধ্যেই মালিক তার ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে এল আমাদের সামনে চ্যাং তৈরী করার জন্য। বত্রিশজনের জন্য করতে হবে কাজেই এটা ছোটখাটো ব্যাপার নয়। মঠের দালানে যে যার কম্বলটা বিছিয়ে আমরা কাত হয়ে শুয়ে পড়লাম, শ্রান্ত দেহটাকে কিছুতেই যেন ধরে রাখতে পারছি না। তবুও মনের জোর ফিরিয়ে এনে সজাগ থাকবার চেষ্টা করলাম, কারণ এ সুযোগ হয়তো আর আসবে না। গেশে রেপ্‌তেনের অবস্থা সত্যি প্রশংসনীয়, সব ধকল সামলে তিনি সজাগ হয়ে আছেন। শরীরের বল তো বটেই আর তাঁর মনোবলেরও যেন তুলনা নেই।

কাঠের একটা আলগা উনোন ধরিয়ে তার ওপর বিরাট একটা ডালডা টিনের মধ্যে গরম জল বসানো হল। আর পাশেই বিরাট দুটো টিনের চোঙার মধ্যে মালিকের মেয়েটি একটা ইটের মতো কি যেন ফেলে তাকে একটা বিরাট খল দিয়ে গুড়ো করতে লাগলো। আমি আমার কৌতূহল দমন করতে না পেরে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে হামালদিস্তের ভেতরকার পদার্থের গন্ধ শুঁকবার চেষ্টা করলাম। আমার উৎসাহ দেখে মেয়েটি হেসে বলল—চ্যাং। গন্ধেও মনে হল চা। মনে হয় গুঁড়ো চা'কে জমিয়ে ইটের মতো করা হয়েছে তাতে রাখবার সুবিধা। চ্যাং বা চায়ের খণ্ডটা শক্ত ইটের মতো। মেয়েটির চা গুঁড়ো করা হয়ে গেলে সেই পাত্রের মধ্যে গরম জল ঢেলে দেওয়া হল, তারপর সেটাকে আবার লম্বা লাঠি দিয়ে মেশাতে লাগলো। প্রায় আধ ঘন্টা সেটাকে নাড়াচাড়া করে আবার উনোনের উপর রাখা হল। তারপর সেই চায়ের পাত্রের ওপর ছড়িয়ে দিল সম্ভবত এক বাটি আটা বা ছাতু। তারপর সেটাকে আরও কিছুক্ষণ ফুটিয়ে তার মধ্যে মাখন আর দুধ মেশানো হল।

আমার কাছে এটা যে শুধু নতুন তাইই নয় অদ্ভুতও বটে। চা না বলে তাকে চায়ের সুপ বলা যেতে পারে। তারপর সেই গরম চা-কে প্রত্যেকের বাটিতে বাটিতে দেওয়া হল।লামাদের মধ্যে অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আর অনেকেই কাঠের আগুন পেয়ে তার পাশে এসে আগুন পোয়াচ্ছিলেন।এই তিব্বতী চা খেতে খুব একটা সুস্বাদু নয় সেটা বলাই বাহুল্য, কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তা পেট ভরার পক্ষে যথেষ্ট। এ রকম এক বাটি চ্যাং-এর দাম নিল দু'আনা। অবশ্য একবার মাত্র দাম দিয়ে যতবার খুশী খাওয়া যায়। গেশে রেপ্‌তেন আমাদের বললেন যে, মালিক মওকা পেয়ে খুব চড়া দামে বিক্রি করেছে, আসলে এর দাম কিছুতেই চার পয়সার বেশী নয়। দাম মিটিয়ে দেওয়ার সাথে সাথেই চায়ের দোকানের মালিক তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলেন, তবে উনোনটায় তখনও কাঠ জ্বালছে, কাজেই তিনি লামাদের সেবার জন্য সেটা রেখে গেলেন তার সাথে দুটো চেলা কাঠও বটে। আমরা উনোনটাকে বারান্দায় তুলে মাঝখানে রেখে গোল হয়ে তার পাশে কম্বলকে আশ্রয় করে সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়লাম। তিব্বতে প্রথম পদক্ষেপ সত্ত্বেও আমাদের আর এদিক ওদিক চাইবার মত ক্ষমতা নেই। চোখ দুটোকে

কিছুতেই আর ধরে রাখা যাচ্ছে না—দেখা যাবে কালকে সকালে। আমি কুকুরকুণ্ডলী হয়ে কম্বল মুড়ি দিলাম।

কতক্ষণ আমরা ঘুমিয়েছিলাম জানি না, তবে ঘুমটা যে খুবই গাঢ় ছিল সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙালো। কে বা কারা চেঁচামেচি করছিল সেটা জানবার জন্য অনেক কষ্ট সত্ত্বেও চোখ খুলতে বাধ্য হলাম। চেয়ে দেখি প্রায় ভোর হয়ে এসেছে, আর আমাদের চারপাশে বেশ কিছু তিব্বতী লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছে, আর তারই মাঝে দুজন হান্ বা চীনা সৈন্য তাদের হাতের বন্দুকের খোঁচা দিয়ে সবাইকে জাগিয়ে তুলছে। তাদের মধ্যে মনে হয় আমিই প্রথম জেগেছি। গুরুজী আমারই সাথে শুয়েছিলেন। বন্দুকের খোঁচা এড়াবার জন্য আমি তাঁকে জাগাতে বাধ্য হলাম। শ্রান্ত, বৃদ্ধ গুরুকে কাঁচা ঘুম থেকে তোলার মত পাপ বোধ হয় জগতে আর নেই; তবুও তাঁকে জাগাতে বাধ্য হলাম। তাঁর পা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে অনেক কষ্টে তাঁকে তুললাম। আমাদের সঙ্গী লামাদের মধ্যে প্রায় সবাই কিছু না কিছু তিব্বতী ভাষা বোঝে, কিন্তু গেশে রেপ্‌তেন অর্থাৎ গুরুজী হচ্ছেন আমাদের গাইড্, কাজে তাঁকেই সব সময়ে এগিয়ে দেওয়া ভাল। গুরুজী চোখ খুলে কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হল ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। ভোরের আলোতে আমি এই ফাঁকে দেখতে লাগলাম তিব্বতের প্রথম গ্রামকে আর গ্রামবাসীদের।

আমাদের চারপাশে যারা হাজির হয়েছে তাদের একনজরে দেখলেই মনে হয় যে এরা গরীব। দেখতে সিকিমি, বিশেষ করে ভূটানীদের মতো। গায়ের জামা কাপড় খুবই ময়লা কিন্তু সকলেই বেশ স্বাস্থ্যবান, স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই মাথায় লম্বা চুল। ছোট ছেলে মেয়েদের দেখলে মনে হয় তারা কোনদিন মাথায় জল বা চিরুনি ছোঁয়ায়নি।

গুরুজী আমাদের সকলকে প্রস্তুত হতে বললেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের চুম্বি শহরে যেতে হবে, ভারত তিব্বত সীমানার সেটাই হেড্ কোয়ার্টার, অবশ্য যারা নাথুলা ও জীলাপ লা দিয়ে যাতায়াত করে তাদের কাছে। মঠের বাইরে আসতেই গুরুজী ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন—অর্থাৎ আমরা গত সন্ধ্যার পর যে চৌকিটা পার হয়েছি তারা তাদের ঊর্ধ্বতন অফিসারদের রেডিও মারফত জানিয়ে দিয়েছে যে একদল লামা তীর্থযাত্রী বর্ডার ক্রস করেছে আর শীগগীরই তারা চুম্বি শহরে যাবে। সেই কথানুযায়ী চুম্বির থানা আমাদের অপেক্ষায় ছিল, সারা রাত তারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করেও যখন দেখল যে কোন তীর্থযাত্রীর সাড়াশব্দ নেই তখন ভোরবেলা তারা চুম্বি থেকে এগিয়ে এসেছে আমাদের খোঁজে; এখন এই সৈন্য দুজন আমাদের নিয়ে যাবে তাদের থানায়, সেখানেই আসল কথাবার্তা হবে।

আমরা রাস্তায় নামতেই গেশে রেপ্‌তেন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন—জায়গাটার নাম চুবিতাং আর এই গুম্ফা (মঠ)-টাকে ভালভাবে দেখে নাও। এটা অনেক দিনের পুরান, তীর্থযাত্রীরা সাধারণতঃ এখানেই প্রথম রাত কাটায়। আজকাল অবশ্য তীর্থযাত্রীর অভাব; দুঃখের বিষয় যে আমাদের সীমান্ত রক্ষীদের সাথে যেতে হবে শহরে নয়তো এই মঠটাকে ভালভাবে ঘুরিয়ে দেখাতাম। মঠটার নাম

কারগীড গুম্ফা। এই গুম্ফা তিব্বতের অন্যান্য গুম্ফা থেকে আলাদা, সাধারণতঃ গুম্ফার অধ্যক্ষ থাকেন একজন লামা, কিন্তু এই গুম্ফার মালিক লামা নন। সিকিম মহারাজার এক বংশধর এই গুম্ফার সর্বেসর্বা। তবে এই গুম্ফায় অনেক উচ্চ শ্রেণীর লামাও থাকেন। নিম্ন শ্রেণীর বা নবীশ-ছাত্র লামাদের এই অঞ্চলে বলা হয় ত্রাপা। কারগীড গুম্ফার গ্রন্থাগারটিও দেখবার মতো। খুবই আপশোষের বিষয় যে আমাদের এ গুম্ফা থেকে চলে যেতে হচ্ছে। উপায় নেই কারণ এদের সাথে সহযোগিতা না করলে আমাদের তিব্বতের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। বাইরে থেকে এই কারগীড গুম্ফাকে খুব সুন্দর দেখায়, বিরাট কাঠের সিংহদরজা, পাথরের দেয়াল, গ্রামবাসীদের জল পানের জন্য ঝর্ণা, কাঠের সুন্দর কারুকার্য, মঠের মতো হলেও বোঝা যায় যে, এটাকে প্রয়োজন বোধে দুর্গ হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

সীমান্ত বাহিনীর ঘন ঘন সাক্ষাতের ফলে আমাদের মনটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে তাদের প্রতিই বেশী আকৃষ্ট হতে বাধ্য হয়েছে, আমাদের মনে সব সময়েই একটাই ভয় ছিল, ঢুকতে দেবে কি না। নাথুলা'র পথটা হঠাৎ নেমে এসেছে তিব্বতের মধ্যে, নামতে নামতেই আমাদের নজরে পড়ছে সামনের উন্মুক্ত চুম্বি উপত্যকা; এই উপত্যকা ধরে চলতে হবে আগামী কয়েকদিন লাসার পথে। তিব্বতটা যেন হঠাৎ সরু হয়ে ঢুকে গেছে দুই দেশের মধ্যে। আমাদের ডান দিকের পর্বতাংশ ভূটান আর বাঁদিকের পাহাড়টা সিকিম ও ভারত। দুদিকেই পাহাড়ের ওপর বরফ পড়ে সাদা হয়ে আছে । চুম্বি উপত্যকা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার সেই নয়নাভিরাম দৃশ্য আর দেখা যায় না। এখন আমাদের দুদিকেই বিরাট পাহাড়, বলা যেতে পারে যে এখন আমরা হিমালয়ের উল্টোদিকে এসে পৌঁছেছি। একটা ছোট্ট পাহাড়ি নদীর পাশ দিয়ে রাস্তা ধরে আমরা এগুতে লাগলাম। এই রাস্তাটাই তিব্বত ও সিকিমের প্রধান সড়ক, দেখলে মনে হয় না। মঠ ছেড়ে আরও প্রায় ঘন্টাখানেক চলার পর আমরা দেখতে পেলাম একটা শহর, চুম্বি। যদিও তিব্বতীদের কাছে এটি একটি শহর কিন্তু আমার কাছে মনে হল যে মেদিনীপুরের যে কোনো ছোট গ্রাম এর থেকে বড়। রাস্তার দুপাশে দেখতে পেলাম অসংখ্য সরকারী তাঁবু, আর তারই সাথে অসংখ্য চীনা সৈন্য। গেশে রেপ্তেন আমাদের আগেই চিনিয়ে দিয়েছেন—এদের মধ্যে কারা হান্ আর কারা তিব্বতী, তা এখন দেখলেই তফাতটা বুঝি। তিব্বতীদের চলনেই বোঝা যায় যে তারা এই মাটির লোক, চলার মধ্যে আছে এদেশের ছন্দ। আর চীনা সৈন্যদের চলার মধ্যে আছে বিদেশী ভাব—চলায় আছে মাটিকে দাবিয়ে রাখার দম্ভ, ছন্দের অভাব। আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে সে কথাটা সীমানা পার হবার সাথে সাথেই বুঝতে পেরেছি।

চুম্বি একটা পুরানো বর্ধিষ্ণু গ্রাম, সিমেন্ট ও পাথরের দেয়াল, তার ওপর কাঠের ঝুলন্ত বারান্দা, বাড়ীটা দেখেই মনে হয় যে শ'খানেক বছরের পুরানো। দরজার সামনে দাঁড়ানো দুটো মিলিটারী জিপ্ কার আর সশস্ত্র প্রহরী। আমাদের বাইরে বসতে বলে গুরুজী চীনা ভদ্রলোকদের সাথে ভেতরে ঢুকে গেলেন কাগজপত্র পরীক্ষার জন্য। আমরা রাস্তার ধারেই বসে রইলাম। রাস্তার দুপাশে এখন পাহাড়াগুলো আস্তে আস্তে

যেন দূরে সরে যাচ্ছে। উপত্যকাটা এখন খুব প্রশস্ত। এখানকার বাড়ীগুলো সব স্থানীয় পাথর ও কাঠ দিয়ে তৈরী, বাড়ীগুলোর মধ্যে কোন রকম উন্নত ধরনের কারুকার্য নজরে পড়ল না। সামনেই একটা বাজার অনেকটা হাটবাজারের মতো। কয়েকটা মুদিখানার দোকান, চায়ের দোকান আর কম্বল ও পোশাকের দোকানের সামনে স্থানীয় লোকদের আনাগোনা লক্ষ্য করতে লাগলাম। সকালের রোদ্দুরটা খুবই উপভোগ্য। প্রায় এক ঘন্টা পর গেশে রেপ্‌তেন ফিরে এলেন, তিনি বললেন যে খুব ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। এরা একে একে সবাইকে পরীক্ষা করবে, তন্ন তন্ন করে জিনিসপত্র ঘাটবে। কোন কিছুতেই আমরা যেন বাধা না দিই, বাধা দিলেই তারা ভাববে যে আমরা কিছু গোপন করছি। আসলে আমাদের গোপন কারার কিছুই নেই সে কথাটা আমাদের হাবভাবে যেন প্রকাশ পায়। আমাদের ছাড়পত্র এসেছে কাঠমাণ্ডুর চীনা দূতাবাস থেকে। গুরুজী আসলে তিব্বতের লামা, অন্যান্য সকলে ভুটিয়া ও নেপালী। গুরুজী আমাকে সবাধান করে দিলেন মনে থাকে যেন তুই নেপালের লামা, আমার শিষ্য। আমরা গুরুজীকে আশ্বাস দিলাম আমাদের তরফ থেকে কোন রকমেই তাঁর কথার অমান্য করবো না। প্রথম লামা ভেতরে ঢুকে ফিরে এলেন প্রায় এক ঘন্টা পর। আমি মনে মনে হিসাব করে দেখলাম যে এই ধরনের সময় যদি প্রত্যেকটি লামার পেছনে নেয়া হয় তাহলে আজকে তো নয়ই কালকেও আমরা ছাড়া পাবো কিনা সন্দেহ। আস্তে আস্তে দুপুর গড়িয়ে এল। আমরা রাস্তার ধারেই খাবার বন্দোবস্ত করতে লাগলাম। খাবারের খুব অসুবিধে নেই, আটার সাথে জল আর নুন মিশিয়ে গলধঃকরণ করা মাত্র। বাঁচবার জন্য খাওয়া। মনে হয় প্রহরীরা লামাদের শত প্রশ্ন করেও সন্দেহজনক কিছু পাচ্ছে না তাই শেষের দিকে তারা সময় সংক্ষেপ করে দিল। এক এক জনের আধঘন্টার মধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ হয়ে গেল। হঠাৎ ভেতর থেকে চারজন চীনা অফিসার বেরিয়ে এলেন, তিনি সকলকে হুকুম দিলেন—আমাদের মালপত্র যা কিছু আছে সব থলি থেকে বের করে রাস্তায় রাখতে, তাতে সার্চ করতে সুবিধা হবে। তার কথানুযায়ী আমরা জিনিসপত্রগুলো সব রাস্তায় একের পর এক খুলে রাখলাম। বলাই বাহুল্য যে আমাদের মধ্যে গোপনীয় কিছুই নেই, মগ, থালা, ন্যাকড়া, আটা, নুন, আলু, চাল, ডাল, মালা, সোয়েটার, কম্বল, জামা, গেঞ্জি, জুতো, চাদর এর মধ্যে সন্দেহজনক কিছুই পাবার কথা নয়। দেখলে মনে হয় এগুলো আমরা চোরাবাজারের রাস্তার ধারে বিক্রি করতে বসেছি।

অফিসার চারজন সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন, এমনকি আমাদের লাঠিগুলো পর্যন্ত। তারপর তারা রাস্তার ওপরই আমাদের জামা কাপড়ের পকেট (নেই যদিও) খুঁজতে লাগলো। চীনা অফিসারদের সাথে সাথে রয়েছে আরও পাঁচজন তিব্বতী সেনা, তারা প্রত্যেকটি লামাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব আজব প্রশ্ন করতে লাগলেন। একজন তিব্বতী আমার কাছে এগিয়ে থমকে দাঁড়ালো, আমার সাথে চোখাচোখি হতেই আমি চোখ নামালাম, হাতের মালাকে আঁকড়ে ধরে জপতে লাগলাম মণি মন্ত্র। তিব্বতী লোকটা আমার ঠিক সামনে এসে হাজির হল, তারপর আমার দিকে খুব সন্দেহজনক

দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাকিয়ে কি যেন জিজ্ঞাসা করল। আমি তার কিছুই বুঝলাম না, সে এবার আমার হাত ধরে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে মনে হয় আবার আগের প্রশ্নই পুনরুচ্চারণ করল। আমি এবারে তাকে এড়াতে পারলাম না, আমি আঙ্গুল দিয়ে গেশে রেপ্‌তেনকে দেখিয়ে দিলাম, মানে—ওনার সাথে কথা বলুন, উনিই আমার সম্পর্কে যা বলার বলবেন। তিব্বতী চৌকিদার—গুরুজীকে ডাকলেন, তারপর আমার সম্পর্কে তাকে বিশদ জানালেন। চৌকিদার সাহেব মনে হল তার কথায় মোটেই সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি তার চীনা অফিসারকে ডেকে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

গুরুজী আমাকে অতি নিম্নস্বরে হিন্দীতে বললেন—তুই মৌনী লামা—নেপালের ছেলে, ওরা সেটা বিশ্বাস করতে চাইছে না। খুব সাবধান, ওরা তোকে যাচাই করবে, তথাগতের শরণ নে। বলা সোজা কিন্তু তার শরণ নেবার জন্য যে মানসিক অবস্থার প্রয়োজন হয় আমার সেটি নেই। আমার দীক্ষাটাই হয়েছে খুব তাড়াহুড়োর মধ্য দিয়ে, মানসিক প্রস্তুতির আগেই আমি পেয়েছি বীজমন্ত্র। কাজেই মনের ভারসাম্যকে বজায় রেখে এই অবস্থায় তথাগতকে শরণ করা মুশকিল। মনের মধ্যে আমার যাই থাক না কেন বাইরে তাকে প্রকাশ করতে দিলাম না। হাতের রুদ্রাক্ষটাকে আস্তে আস্তে জপতে লাগলাম যেন কিছুই হয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই গেশে রেপ্‌তেনের ডাক পড়ল। তিনি ভেতরে গিয়ে আধঘন্টার মতো জবাবদিহি দিয়ে বেড়িয়ে এলেন। তারপরই আমার পালা। আমি ইষ্টনাম জপ করতে করতে অফিসে ঢুকলাম।

একটা বহুদিনের পুরানো ঘর। বাড়ীটার পেছনে মনে হয় কোন পার্বত্য ঝর্ণা রয়েছে, তারই ঝিরঝির জল পড়ার শব্দ। ঘরটাও স্যাঁতস্যাঁতে, একটা ছোট জানালা দিয়ে সামান্য আলো এসে পড়েছে। একটা তক্তাপোশ, তারই চারদিকে ভাঙা-হাতল চেয়ার ও টেবিল সাজিয়ে সরকারী অফিসের মর্যাদা রক্ষা করা হয়েছে। চারজন চীনা অফিসার ও দুইজন স্থানীয় তিব্বতী সহকর্মীর সেখানে বসে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পরিবেশটা এর চেয়ে গম্ভীর কল্পনা করা যায় না।

ঘরে ঢুকতেই আমাকে তারা যেন কি বললেন। আমি মৌন রইলাম। দ্বিতীয়বার তার কি যেন আবার জিজ্ঞাসা করলেন। আমিও মৌন থেকেই তার উত্তর দিলাম। এবার তিব্বতী ভদ্রলোক প্রায় ধমকের সুরে মনে হল একই প্রশ্ন করলেন। আমি নীরব রইলাম। আমার নীরবতা দেখে তারা একটু অস্বস্তিবোধ করতে লাগলো। আমি মনের জোরটা ইতিমধ্যে ফিরিয়ে এনেছি।পা-টা কাঁপছিল, তাকে সংযত করলাম। ভাগ্য ভাল যে আমার পরণে পা পর্যন্ত ভিক্ষু-লুঙ্গি, নয়তো এদের চোখ এড়াতে পারতাম না। মনে মনে ভাবলাম, এই তিব্বত, এই কৈলাসনাথ এতো মান্ধাতার আমল থেকে আমাদের তীর্থভূমি, শিব স্বয়ম্ভু তিনি আমাদের ঘরের দেবতা, তাঁর মন্দিরে যাবো সেটা তো আমাদের জন্মগত অধিকার—এ তীর্থ তো আমাদের তীর্থ, হিন্দুদের, পবিত্র ভূমি চীনাদের নয়, এই পবিত্র হিমালয়তো হিন্দুদের, এরা এসেছে জোর করে তা দখল করতে, কাজেই ভয় কি! কিছুতেই ধৈর্যচ্যুতি হতে দেবো না। মনকে আরও সংযত করলাম। মনে মনে বললাম—সাবধান! এদের এই সামান্য ধমকে আমরা সস্তা এদের

কাছে বিলিয়ে দেবো না, দেখ যাক কে জেতে। আরে বাবা! এরা তো আমাকে খেয়ে ফেলবে না, বড় জোর বলবে যে ফিরে যাও। ঠিক আছে ফিরে যাবো, তাতে কি? ভয়টা কিসের? ভয়টা কিসের বলা সোজা, চিন্তা করা আরও সহজ, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যখন পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে তাকে থামানো কঠিন। অফিসাররা আমার কাছ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে, নিজেরাই আমার সম্পর্কে সত্য মিথ্যা বিভিন্ন রকমের কল্পনা করতে লাগলেন। তাদের মধ্য থেকে তিব্বতী ভদ্রলোক (সৈন্য) বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর সে একটি তিব্বতী যুবককে নিয়ে ফিরে এল। তিব্বতী ভদ্রলোক আমাকে খুব ভাল করে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো তারপর আমার দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করল—তুম্‌কা নাম কিয়া হায়?

বলার ভঙ্গি ও উচ্চারণ শুনে মনে হল লোকটা হয়তো সিকিমের বাজারে কিছুদিন ঠেলাগাড়ী ঠেলেছে। লোকটার অঙ্গভঙ্গীও খুব অভদ্র গোছের, আমার তরফ থেকে কোন রকম সাড়া না পেয়ে সে আবার জিজ্ঞাসা করল—দার্জিলিং সে আয়া তুম, নেপালী নেহি। মনে মনে ভাবলাম যে ও ঠিকই ধরেছে। আমার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছে যে আমি নেপালী নই। আবার ভাবলাম একবার যখন আরম্ভ করেছি শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকতেই হবে, অতএব আমি পুর্ববৎ মৌনই থেকে গেলাম। লোকটা এবার সত্যি রেগে উঠল, একটা অশ্লীল গালাগাল দিয়ে মারমুখী হয়ে জিজ্ঞাসা করল—নাম বোল্। চীনা সৈনিকরা তার হাবভাব দেখে কি যেন পরামর্শ করল, তারপর আমাকে ও সেই লোকটাকে অফিস ঘরে রেখে সবাই বাইরে বেরিয়ে এলো। সেই লোকটা এবার আমাকে একলা পেয়ে আমার মুখের কাছে মুখ এনে বলল—হাম্ জান্‌তা তুম নেপালী নেহি হু, নাম বোলো। আমি জানি যে যদি একবার মুখ ফুটে নামটা বলি তাহলে আর রক্ষা নেই, এর পরেই শুরু হবে পুলিশি ঝামেলা আর শেষে গুপ্তচর ভেবে আমাকে এরা ধরে রাখবে। কিন্তু কতক্ষণই আর এভাবে থাকা যায়। আর এই লোকটাকে বিশ্বাস নেই, হয়তো রেগে গিয়ে বসিয়ে দেবে একটা কীল, আর দেখতেও ঠিক গুণ্ডাদেরই মতো। হঠাৎ মাথায় এল এক বুদ্ধি। হাতের রুদ্রাক্ষ মালাকে দু'বার খুব তাড়াতাড়ি জপ করার মতো আঙ্গুল দিয়ে গুনে নিলাম তারপর সেই মালাটাকে লোকটার মাথা ছুঁয়ে প্রায় অভিশাপ দেবার ভান করে বলে উঠলাম—'ওম্ ভূ-র্ভূব-স্বঃ তৎসবিতুর বরেন্যম্‌····'।

ব্যস্ আমাকে আর শেষ করতে হল না। সে সঙ্গে সঙ্গে প্রায় এক লাফে দূরে সরে দাঁড়ালো তারপর তিব্বতী ভাষায় আমাকে কি যেন বলল, আমি তার কিছুই বুঝলাম না। কিন্তু ওর হাবভাব দেখে মনে হল যে ও খুব ভয় পেয়ে গেছে, আমি আবার শান্ত হবার ভাব করে জপ করতে লাগলাম। লোকটা মাথায় ধুলো পড়া সাপের মতো যোড় হাত করে বেড়িয়ে গেল। ওর অবস্থা দেখে আমার ভীষণ হাসি পেয়ে গিয়েছিল, ইচ্ছে হল চীৎকার করে হাঃ হাঃ করে হাসি। কিন্তু নিজেকে সংযত করতে বাধ্য হলাম। অফিসার চারজন ভেতরে ঢুকলেন, তারপর অনেকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাইরে বেরিয়ে যেতে বললেন। আমার ফাঁড়া কেটে গেল।

এটাও গুরুজীর দেওয়া একটা কৌশল মাত্র। গুরুজী একবার কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে তিব্বতীরা ভীষণ তন্ত্রে বিশ্বাস করে। ভূত প্রেত ওঝা ও দৈত্য দানবে দেশটা যেন ভর্তি। এখানকার ঐতিহ্য অনুযায়ী লোকেরা বিশ্বাস করে যে যেকোন উচ্চ পর্যায়ের লামারা ভূতকে বশ করতে পারে, অথবা প্রয়োজন বোধে তাদের ডেকে আনতে পারে। লামারা লোকেদের মাথায় হাত দিয়ে আর্শীবাদ করে, আর রুদ্রাক্ষের মালা মাথায় ছুঁইয়ে অভিশাপ দেয়। লামাদের অভিশাপ লাগাবেই লাগবে, বিশেষ করে যারা উগ্র তান্ত্রিক তাদের কথাই আলাদা। গুরুজীর সেই কথাটা যে এত সত্য তা হাতে হাতে প্রমাণ পেলাম।

লোকটা সেই যে গেল তারপর আর আসার নাম গন্ধও নেই। অফিসাররা গুরুজীকে আবার ডাকলেন আমাকে দেখিয়ে কি যেন উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগলেন। মনে হয় আমি যে একজন খাঁটি লামা গুরুজী সেটাই তাদের বোঝাচ্ছেন। অগত্যা কিছু না পেয়ে অন্যান্য বাকি কজন লামাদের সার্চ ও জিজ্ঞাসাবাদ করে আমাদের ছেড়ে দিলেন। সারাটা দিন সেদিন এইভাবেই কেটে গেল।

একটি তিব্বতী পরিবার

বিকেলবেলার দিকে আর একবার হাল্কা চা খেলাম। হাল্কা চা মানে, চা-এর সাথে নুন ও মাখন মিশিয়ে ওরা হাল্কা চা তৈরী করে, সস্তাও বটে, মাত্র তিন পয়সা দিলেই বাঁশের চোঙ্গায় ভর্তি করে ওরা চা বিতরণ করে। এরকম এক চোঙা মানে প্রায় আমাদের দেশী কাপের ছ-সাত কাপ তো বটেই। জিনিসপত্রগুলো পিঠে গুছিয়ে আমরা আবার হাঁটতে শুরু করলাম। আমাদের আশপাশে আস্তে আস্তে গ্রামের লোকজনরা জমতে লাগল, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তো বটেই আর যুবক ও কয়েকজন বৃদ্ধও বটে।

রাস্তায় যেতে যেতেই অদ্ভূত একটা জিনিস নজরে পড়ল। অনেকে আমাদের দেখে মা-কালীর মতো লম্বা জিভ দেখাতে লাগল, আর অনেকে রাস্তায় লম্বা হয়ে দণ্ডিকাটার মতো প্রণাম করতে লাগল। গুরুজী ব্যাখ্যা করে বললেন যে সাধারণতঃ তিব্বতীরা নমস্কার বা প্রণাম করে জিভ বার করে, তবে এদের মধ্যে অনেকে ভারতীয় ধারায় সাষ্টাঙ্গ প্রণামও করে।

এখান থেকে আমরা কিছু জ্বালানী কাঠ কিনে নিলাম। জ্বালানী কাঠ মানে ছোট ছোট শাল কাঠের টুকরো, চন্দন কাঠের মতো অনেকটা দেখতে, কাঠ বা উনোন ধরাবার জন্য এই ধরনের কাঠ আসাম বা উত্তরবঙ্গে খুব ব্যবহার করতে দেখেছি। প্রাকৃতিক দৃশ্যটা এখান থেকে খুবই চমৎকার। দু'পাশে হিমালয়ের তুষারাবৃত শৃঙ্গ, বরফও খুব নীচে দেখা যাচ্ছে। আর পাহাড়ের গায়ে ঘন পাহাড়ি ঝাউয়ের বন, আর সামনে একটা পাহাড়ি নদীকে পাশে রেখে এগিয়ে গেছে রাস্তাটা। এই সুন্দর দৃশ্যের মধ্যে একমাত্র এখানকার বাসিন্দারাই মনে হয় নোংরা। ছোট বাচ্চা ছেলেমেয়েদের নাকগুলো মনে হয় জন্মে কেউ পরিষ্কার করে দেয়নি। দেশের লোকেরা মনে হয় চিরুনির সাথে পরিচিত হয়নি। এদের জামাকাপড়গুলো দেখলে মনে হয় সাবানের আবিষ্কার-বার্তা এখনও এরা শোনেনি। এরা দাঁত মাজে কি না সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। খাওয়া দাওয়ার নমুনা এখনও পাইনি। এখনও পর্যন্ত কোন তিব্বতী যুবক বা যুবতীর সাথে আলাপ হয়নি কাজেই এদের সম্পর্কে এর বেশী কিছু আপাততঃ লিখতে পারছি না। তবে এরা যে খুবই রসিক আর আমুদে তা দেখেই বোঝা যায়। চলতে চলতে মাঝে মাঝে কানে আসে এদের উচ্চ-হাসির শব্দ, সহজ আর সরলতার প্রতীক।

চুম্বিকে বলা যায় তিব্বতের অন্যতম এক পুরোনো গ্রাম। গ্রামের প্রধান আকর্ষণ

হচ্ছে বাজার। কাঠের মাচান ধরনের কয়েকটা বাড়ী, চার পাঁচটা চায়ের দোকান, ছ'টা মুদিখানার দোকান, একটা বিরাট শুকনো মাংস ও চামড়ার দোকান—এই হচ্ছে এখানকার পুরান ও বনেদি দোকান, রাস্তার পাশে ছোট-খাটো আরও অনেক দোকান আছে। সব্জি বাজারটা খুবই ছোট। তিনসারির দোকান-পাট নিয়ে চুম্বি বাজার গঠিত।

আমাদের সাথে চেক্-পোস্ট থেকেই একটা তিব্বতী ছেলে পিছন ধরেছে। বয়েস মনে হয় ষোল-সতেরো বছর। গুরুজীকে বার বার জিজ্ঞাসা করছে কোথায় আমরা রাত কাটাবো। তার কথায় কোন রকম কান না দিয়েই আমরা এ পর্যন্ত চলে এসেছি। কিন্তু ওর সাথে বাজার থেকে আরও দু'জন যোগ দিয়েছে। ওরা আমাদের রাতের খাওয়া ও আগুনের বন্দোবস্ত করে দেবে বলছে। গুরুজী আমাদের সবাইকে ডেকে পরামর্শ করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাত হয়ে যাবে কাজেই আমাদের এক জায়গায় থাকতেই হবে । দু' একজনের জন্য হলে কোন কথাই ছিল না কিন্তু বত্রিশজনের জন্য ব্যবস্থা করা তো মুখের কথা নয়। রাত্রিবেলা এখানে থাকতেই হবে। আমাদের মন ও দেহের অবস্থা এমন যে রাস্তার ধারে হলেও আমাদের চলে যাবে, গুরুজীর শুধু হুকুমের অপেক্ষা। ভোর রাত্রিতে শুয়ে আবার ভোর বেলাই চীনাদের পাল্লায় পড়েছিলাম। সারাটা দিন গেছে এক বিরাট দুশ্চিন্তায়, এখন আমাদের ঘুমুতেই হবে। আমাদের জবাব পেয়ে গুরুজী শুরু করলেন দর কষাকষি, শেষে ঠিক হল যে বত্রিশজনের জন্য ওকে দিতে হবে তিরিশ টাকা, তার বদলে ও দেবে একটা বিরাট ঘর তার ভেতর কাঠ কয়লার আগুন থাকবে সারারাত আর রাতের খাওয়া।

রাস্তা ছেড়ে আমরা একটা নীচু মাঠের মধ্য দিয়ে কিছুক্ষণ হেঁটে একটা ছোট্ট টিপির উপর উঠে এলাম। সন্ধ্যের আলো এখন প্রায় উধাও হতে চলেছে, তাই আমাদের একটু তাড়াতাড়ি হাঁটতে বলল। কিছুক্ষণ পর আমরা একটা বিরাট বাড়ীর সামনে এসে হাজির হলাম। বাড়ীর দরজার সামনে আসতেই তিব্বতী ছেলে দুটো আমাদের দাঁড়াতে বলল। তাদের মধ্যে একজন পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুকে গেল দরজা খুলতে। দরজাটা খুলতেই ভেতর থেকে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে আমাদের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, বরাত ভাল যে দ্বিতীয় ছেলেটি আমাদের সাথে থাকায় সঙ্গে সঙ্গে সে কুকুরটাকে সামলে নিল। অস্পষ্ট আলোয় আমরা বাড়ীটার উঠোনে এসে দাঁড়ালাম। সেখান থেকে বাড়ীটাকে ভালভাবে দেখার সুযোগ পেলাম। সিমেন্টের ভিত্তির ওপর সুন্দর একটি কাঠের বাড়ী, যদিও পুরানো কিন্তু তার বনেদি ভাবটা এখনও যায়নি। একটা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আমরা উপরে উঠে এলাম। বাড়ীটা অনেকটা স্কুল বাড়ীর মতো, অনেক লোককে এক সাথে স্থান দেবার জন্যই এটা তৈরী। উপরের বারান্দায় উঠতেই দেখতে পেলাম বাড়ীর মালিককে। একজন প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা হ্যারিকেন হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আমাদের সকলকেই তিনি একে একে মাটিতে গড় হয়ে প্রণাম করলেন। তাঁর মুখের ভাঁজপড়া চামড়ার মধ্যে লুকিয়ে আছে এক পবিত্র আভিজাত্যের ছাপ। তাঁর সাথে আমরা পরিচিত হলাম। তিনিই আসলে বাড়ীর মালিক। ভদ্রমহিলার স্বামী মারা গেছেন বহু বছর আগে, তিন ছেলে ও দুই মেয়ে সকলেই এখন

সিকিমে থাকেন, তিনি একা ভিটে মাটি আঁকড়ে পড়ে আছেন। তাঁর ভাইয়ের ছেলেমেয়েরাই এখন ঘর বাড়ী দেখছে। বাড়ী ছাড়াও তাঁদের বিরাট জমিদারী রয়েছে, কিন্তু আজকাল সবই দেখাশুনার অভাবে জঙ্গল হয়ে যাচ্ছে। আগে ভারতের সঙ্গে যখন ঘন যোগাযোগ ছিল তখন এবাড়ীতে প্রায়ই লোকজনের যাতায়াত ছিল, আজকাল সীমান্ত-ঘাঁটির হাঙ্গামার জন্য কেউ আসে না। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—সবই ভগবানের ইচ্ছে, জানি না আর কতদিন এরকম চলবে।

তিনি আমাদের মতো সাধু তীর্থযাত্রী পেয়ে খুব আনন্দিত হলেন, আমাদের তিনি তিনটে ঘর খুলে দিলেন। দুটো বড় ঘর আর একটা ছোট। দুটো ঘর পাশাপাশি আর একটা একটু দূরে। ছেলেটির নাম থাংমে, সেই আমাদের বাজার থেকে ধরে এনেছে। উঠোনে দেখতে পেলাম বিরাট একটা উনোনে কাঠকয়লার আগুন জ্বালানো হচ্ছে। লামারা আস্তে আস্তে সেদিকেই চলে গেলেন। এই শীতে আগুনের মতো বন্ধু আর নেই, বিশেষ করে আমাদের হাত ও পা বরফের মতো হয়ে আছে। গুরুজী সকলকে দুই ঘরে বন্দোবস্ত করে দিলেন আর আমাকে তাঁর সাথে থাকতে বললেন, মনে মনে সেটাই আশা করেছিলাম। সকলেই উনোনের কাছে চলে গিয়েছে আগুন পোয়াবার জন্য, আমি কিন্তু গুরুজীর পেছন পেছন ঘুরছি তাঁকে একটু একলা পাওয়ার জন্য। তিনি সেটা বুঝলেন। এ পর্যন্ত আমি শুধু তাঁর কথা শুনেই যাচ্ছি কিন্তু আমার তরফ থেকে কিছুই তাঁকে বলা হচ্ছে না। আমার মনের মধ্যে হাজার প্রশ্ন ঠেসে বসে আছে, গুরুজী যদি একটু কৃপা না করেন তাহলে আমার অবস্থা খুবই কাহিল হয়ে দাঁড়াবে। মনটাকে হাল্কা করার জন্য কিছু অন্ততঃ বলার দরকার। থাংমে ও তার ভাই একটা লোহার কড়াইতে করে ঘরে ঘরে কাঠকয়লার আগুন পৌঁছে দিল, তাতে ঘরগুলো আগের চেয়ে অনেক গরম হয়ে উঠল।

গুরুজীকে এবার ঘরে একলা পেলাম। আমাকে তিনি অভয় দিয়ে বললেন—এখন কথা বলতে পারো। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম—তাহলে প্রাণখুলেই বলি কি বলুন? প্রথমেই আসা যাক, বর্ডারের কথায়। মনে আছে আপনি আমাকে একদিন তিব্বতীদের অভিশাপ দেওয়ার কথা বলেছিলেন। সীমান্ত চৌকির সেই গুণ্ডা মতো দোভাষীটা আমাকে যখন কিছুতেই ছাড়ছিল না তখন তার মাথায় রুদ্রাক্ষের মালা ছুঁইয়ে গায়ত্রী মন্ত্রটা আবৃত্তি করতেই বেটা পালিয়েছে। ভাগ্যিস্ মনে এই চিন্তাটা এসেছিল তাই, নয়তো কি যে হতো কে জানে? আমার কথাটা শুনে গুরুজী একটু হাসলেন তারপর বললেন—

—ভাগ্য ভাল যে তোকে তোর 'ইদম্' জিজ্ঞাসা করেনি।

—'ইদম্', সেটা আবার কি?

—'ইদম্' হচ্ছে ইস্ট মন্ত্র।

—'ওম্ মণি পদ্মে হুম্', এটা কি তাহলে ইদম্ নয়?

—তিব্বতী মাত্রেই মন্ত্রটা জানে, এটা গুপ্তমন্ত্র নয়। 'ইদম্'টা হচ্ছে গুপ্তমন্ত্র। সেটা

একমাত্র গুরু শিষ্য ছাড়া আর কেউ জানে না। হিন্দুমতে যেমন—'ওম্ নারায়ণায়, ওম্ নমঃ শিবায়, সোহম্', ঠিক সেরকম মন্ত্র তিব্বতী বৌদ্ধদের মধ্যেও আছে।

—মহাকালকে তো তিব্বতীরা দেবতা হিসেবে ধরে নিয়েছে। অথবা তারা, ভুবনেশ্বরী ইত্যাদি নামে যে সব তান্ত্রিক দেবতা আছে তাদের নাম কি 'ইদম্' বা মূল মন্ত্র হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে?

—তুই ঠিক ধরেছিস। বিপদে পড়লে এটাই মূল মন্ত্র হয়।

—গুরুজী, এবার আসা যাক্ অন্য কথায়। আপনাকে সবাই ডাকে গেশে রেপ্‌তেন বলে, কিন্তু আমি গুরুজী বলেই ডাক্‌বো, এতে আপনার আপত্তি নেই তো?

—ঠিক আছে তোর যা খুশী।

—আর একটা অনুরোধ গুরুজী। আপনি তো বুঝতেই পারছেন যে এই ধরনের তীর্থ সকলের ভাগ্যে দু'বার হয় না, কাজেই আপনি যখন অন্যান্য লামাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন তখন যদি নেপালী ভাষার মধ্যে হিন্দী মিশিয়ে বলেন তাহলে আমার বুঝতে খুব সুবিধা হয়। তাঁরা তো সবাই নেপালী ভাষা বোঝেন, অনেকের তো নেপালীই মাতৃভাষা, আর তারা সবাই জানেন যে আসলে আমি ভারতীয়; এতকাল যখন আমাকে সহ্য করেছেন তখন নিশ্চয়ই তাদের তরফ থেকে কোনোরকম আপত্তি হবে না।

আমার অনুরোধে গুরুজী বললেন—তোর কথা রাখতে চেষ্টা করবো, তবে যখন আমরা দু'জনে এক ঘরে থাকবো তখনই একমাত্র তুই কথা বলবি, নয়তো সর্বদাই তুই থাকবি মৌন, তাতে যাত্রার পক্ষে সুবিধাই হবে।

এই ধরনের আরও প্রয়োজনীয় কিছু কথাবার্তা হচ্ছিল এমন সময় সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ শুনে আমরা থামলাম। গুরুজী আশ্বাস দিয়ে বললেন—মৌনী শিষ্যেরা গুরুজীর সাথে কথাবার্তা বলতে পারে তাতে দোষ হয় না, যদি কেউ শুনেও থাকে তাতে দোষণীয় কিছু নেই। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলেন সেই প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা, তার সাথে একটি মেয়ে। তারা দু'জনেই আবার আমাদের প্রণাম করলেন, তারপর দরজার কাছে হাঁটুগেড়ে বসে তিব্বতী ভাষায় কি যেন বললেন। গুরুজী সেকথা শুনে তার জবাব দিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে গুরুজী বললেন—এই মেয়েটি হচ্ছে থাংমের বোন, ভদ্রমহিলার ভাইঝি। তিনি জানতে চাইছেন যে গুরুজী তাকে যেন প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন, ও যেন সুখী হয়। এর মতো এত ভাল মেয়ে হয় না, ও যেন শীগগীরই স্বামীর ঘর করতে পারে। গুরুজী তাকে আশীর্বাদ করলেন। তারা দু'জনেই আবার প্রণাম করে চলে গেলেন। মেয়েটিকে দেখতে সুন্দরী, মুখটা খুবই লাবণ্যে ভরা। বিশেষ করে গাল দুটো লাল টক্‌টকে। গুরুজীকে জিজ্ঞেস করলাম ওর বয়স কতো? উত্তরে তিনি জানালেন—ভগবান জানেন, চোদ্দও হতে পারে—চব্বিশও হতে পারে, ভালভাবে দেখার সুযোগ হয়নি। গুরুজী বললেন—চল একবার নীচে যাই, দেখা যাক ওরা কি রান্না করছে, এদের খাওয়া সম্পর্কে তোমার কিছু জানা দরকার। গুরুজীকে বললাম এর আগের বারে যে চ্যাং খেয়েছিলাম সেটা খুব ভাল হয়েছিল। তিনি জবাবে

বললেন—তিব্বতে চ্যাং এক এক শহরে এক এক রকম করে তৈরী করে, তবে থুক্‌মা, মাখন, চা ও বিয়ার সব জায়গায় একই রকম।

আমাদের সঙ্গী লামারা খুব কম কথা বলে, মনে হয় সেটাই তাদের শিক্ষা। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই হাসি বিনিময় হয়। কেউ আমাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে না। আর নিজেদের মধ্যেও সেরকম। মাঝে মাঝে মনে হয়, এদের জিজ্ঞাসা করবার মতো কিছু নেই। গুরুজীর উপর এদের অপরিসীম শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস। গুরুজী যা বলেন মনে হয় সেটাই ছিল তাদের জিজ্ঞাস্য। হাঁপিয়ে গেলেও কেউ বসতে চায় না, খিদের সময়ও মুখে এতটুকু শব্দ নেই আর ঘুমের ঘোরে রাস্তায় পড়ে গেলেও এদের মুখ দিয়ে টু-শব্দটি বেরোবে না। এটাই হয়তো এদের লামাব্রত। আমি এদের কাছে নবীশ মাত্র। বয়স বা অভিজ্ঞতা দুটোই আমার কম।

উনোনের পাশে তাদের সাথে আমি ও গুরুজী এসে যোগ দিলাম। গুরুজী তাদের শোনাতে লাগলেন এখানকার কাহিনী।

থাংমে ও তার ভাই রান্না করছে, মাঝে মাঝে তার বোন ও বৃদ্ধা মহিলা জিনিসপত্র যোগান দিচ্ছে। তিব্বতে আসার পর এটাই হচ্ছে আমাদের প্রথম সুখের দিন।

কেরোসিন এখানে দুর্মূল্য কাজেই যতক্ষণ উনোনে কাঠের আগুন আছে ততক্ষণ আলো জ্বালাবার কোন প্রশ্নই নেই। রান্না হল,-তৈরী হল তিব্বতী খাওয়া। গুরুজী বললেন, এরই নাম থুক্‌মা। গরম জলে কিছু আলু কেটে দেওয়া হল তারপর আলুগুলো প্রায় গলে যাবার সময় সেউ জাতীয় আটার লম্বা লম্বা কাঠি তাতে ফেলে দেওয়া হল তারও কিছুক্ষণ পর শুকনো খুব ছোট ছোট করে কাটা ভেড়ার মাংস তাতে যোগ করা হল। বেশ কিছুক্ষণ ফুটিয়ে যখন সুস্বাদু গন্ধ বেরোচ্ছে ঠিক সেই সময় তাতে মাখন নুন সামান্য হলুদ ও কিছু গন্ধ পাতা দিয়ে নামানো হল। ইংরেজী মতে এটাকে স্টু বলা যেতে পারে। এর গন্ধে আমার খিদেটা যেন বেড়ে উঠল, মনে হল বহুদিন যাবত খাইনি, মনে খটকা লাগল—তাই গুরুজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, অবশ্য ফিস্‌ ফিস্‌ করে—এর মধ্যে মাংস দিচ্ছে আমরা খাবো কি করে? গুরুজী বললেন—তিব্বতী লামারা নিরামিষভোজী নয়, তারা সব খায়। তারপর সবাইকে শুনিয়ে বলতে লাগলেন—তিব্বতী ধার্মিক বা সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা মাংস খায় বটে কিন্তু তারা নিজের হাতে কোনোদিন প্রাণী হত্যা করে না। তিব্বতে ভারতবর্ষের মতো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই ধরনের জাত বিচার নেই। যে কোন লোক বা যে কোন ঘরের ছেলেমেয়েরা লামা হবার উপযুক্ত। তবে একমাত্র কামার হচ্ছে এখানকার নিম্নজাতি, কারণ তারা প্রাণীহত্যার জন্য অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করে। তিব্বতে মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম, সাধারণতঃ তারাই কষাইয়ের কাজ করে। আর তাদের অভাবে যে কোন লোকই এ কাজ করে থাকে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলে তাকে প্রাণীহত্যার জন্য বছরে একবার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। অথবা ভগবানের নামে একটা ছাগল বা ভেড়া ছেড়ে দেওয়া হয়—মুক্তির প্রতীক। এই ধরনের ভেড়া বা ছাগলের শিং-এর সাথে লালরঙের ফিতে বাঁধা থাকে, কেউ তাকে ধরে না। গুরুজীর কথার মাঝে থাংমের বোন এসে সকলকে

খাবার জন্য প্রস্তুত হতে বলল। আমরা ঘরে গিয়ে যে যার নিজের থালা বাটি নিয়ে খাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। বলতে গেলে ভারত ছাড়ার পর এই প্রথম আমরা ভালভাবে বসে খাবার হাতে পাচ্ছি। সমবেত প্রার্থনার পর আমরা খেতে আরম্ভ করলাম।

ওঃ কি চমৎকার! এরই নাম থুক্‌মা, অতি সাধারণভাবে প্রস্তুত অথচ স্বাদে যেন অমৃত। যতবার খুশী চেয়ে নিতে পারো অভাব নেই। খাওয়ার পর আমরা যে যার ঘরে চলে গেলাম। সেখানে ঘরের মাঝখানে রাখা ছিল কড়াইতে করে কাঠকয়লার আগুন। কাজেই ঘরটাও বেশ গরম হয়ে উঠেছে। শুধু কম্বল পাতার অপেক্ষা। থাংমের বৃদ্ধা পিসিমাকে তাঁর আতিথেয়তার জন্য অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম।

পরেরদিন বেশ একটু বেলা করেই আমরা উঠলাম, সকলে যদি ভালভাবে বিশ্রাম করতে পারে তাহলে চলার পথটা আরও সুবিধার হবে, তাই গুরুজী কাউকে ডাকেননি। সম্ভবতঃ বেলা ন'টা নাগাদ আমরা একে একে কম্বল ছাড়লাম। ঝরণার জল ছোঁয়ার কথা চিন্তাও করা যায় না, খুব ঠাণ্ডা, বরফ গলে মাত্র শ'খানেক মিটার নেমে এসেছে। আমি কিছু পুরোনো খবরের কাগজ সঙ্গে এনেছিলাম তাতেই কাজ চলে, আর লামারা সাধারণতঃ বনের পাতা ব্যবহার করে। তিব্বতীদের মতো আমাদের লামারাও মুখ ধোয়ার কোন প্রয়োজন মনে করেন না, তবে আমি সেদিকে একটু অন্য ধরনের। কাঠকয়লা, দাঁতন, ছাই, যা হাতের কাছে পাই তাই দিয়েই আমি মুখ ধুই। প্রায় একমাস হতে চলল আমি স্নান করিনি, তিব্বতীরা স্নান করে বছরে দু'একবার কাজেই আমি তাদের তুলনায় খুবই পরিষ্কার বলতে হবে।

সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ আমরা আবার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়লাম। গুরুজী থাংমের পিসিমার হাতে চল্লিশ টাকা দিলেন। বৃদ্ধার মুখটা হাসিতে ভরে উঠল। তিনি বার বার বলতে লাগলেন, আমরা ফেরবার সময়ও যেন তাঁর বাড়ীতে পদার্পণ করি। গুরুজী তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। থাংমে, তার ভাই ও বোন আমাদের সাথে সাথে এগিয়ে এল বড় রাস্তা পর্যন্ত। তারপর তাদেরও বিদায় জানাতে আমরা বাধ্য হলাম। আবার পথ।

ইয়াটুং শহর ও দুংকার গোম্পা

দশটা নাগাদ আমরা চুম্বির শেষ চায়ের দোকান থেকে মাখন চা খেয়ে নিলাম, প্রথম দিন মোটেই ভাল লাগেনি, কিন্তু এখন মনে হয় খারাপ না। তিব্বতী চা আমাদের দেশের গুড়ো বা পাতা চায়ের মতো নয়; চায়ের পাতা বা কচি ডালগুলোকে গুড়িয়ে সেটাকে শক্ত ইটের আকারে জমাট করা হয়। তারপর প্রয়োজনানুযায়ী সেটাকেই ভেঙ্গে ভেঙ্গে চা তৈরী করা হয়, বলা চলে চা-এর ইট। বহন করার পক্ষে সুবিধা, মনে হয় এটা চীনদেশীয় প্রথা। চা বললেই তৈরী হয় না, এরা আগের থেকে তৈরী করে রাখে। গরমজলে চা ফুটছে তো ফুটছেই, সেই গরম চায়ের জলটাকে নিয়ে লম্বা চোঙ্গায় মাখন মেশাতে লাগে প্রায় আধঘন্টা। গরমজলে চায়ের পাতায় যখন আর কোন রকম স্বাদ থাকে না তখন সেটাকে না পাল্টে তারই ওপর যোগ করা হয় চায়ের পাতা অর্থাৎ জমাট চায়ের অংশ। সপ্তাহে একবার মাত্র এই পুরোনো পাতার জল বদলায়। প্রথমবার সাম্পাকে ভেবেছিলাম চা, কিন্তু এখন দেখছি যে সাম্পা অর্থে বলা যেতে পারে ছাতু ধরনের।

অনেক দিন পর ভাল খাবার ও ঘুম হয়েছে এখন সবাই নতুন উৎসাহে পা বাড়াচ্ছি। আমাদের সামনের দৃশ্যটা অতি সুন্দর। সামনেই দেখতে পাচ্ছি বরফে ঢাকা—চোমলহরি পাহাড়ের শৃঙ্গ, আর পেছন দিকে মনে হয় কাঞ্চনজঙ্ঘা উঁকি মারছে আমাদের অভয় দেবার জন্য। পাহাড়ি নদীটা এখন আরও সুন্দর রূপ নিয়েছে, তার দু'পাশ ছোট ছোট জংলা ফুলে ভর্তি, ছোট ছেলেমেয়েরা সেখানে বুনো ফল কুড়োচ্ছে আর আমাদের দেখতে পেলেই থ' হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। মনে হয় এরা একসাথে এতগুলো লামা দেখায় অভ্যস্ত নয়। রোদটা মাথার উপর ধীরে ধীরে উঠে আসছে, এ রকম হাওয়ায় হাঁটতেও কোনো অসুবিধা হয় না। মাঝে মাঝে পথচারীদের সাথে দেখা হয়। আমাদের কাছাকাছি এলেই হয় জিভ বার করে অথবা মাথা নীচু করে সম্মানসূচক অভিবাদন করে। আজকে সকাল থেকে চীনা সৈন্যদের সাথে দেখা হয়নি। আমার মালের উপর বাড়তি মাল হচ্ছে ছোট রসাল জ্বালানী কাঠ। পাঁচ কিলো মাত্র, বেশী ভারী নয়, মাঝে মাঝে বিশ্রাম করে আমরা এগিয়ে চলতে লাগলাম। রাস্তাটা উঁচু নীচু পাহাড়িয়া পথ নয়। দুপুরবেলা আমাদের খাওয়া হয়নি, তাতে মোটেই অসুবিধা হচ্ছে না। গুরুজী বলেছেন যতদূর এগিয়ে চলা যায় ততই মঙ্গল, আর রসদ যত কম খরচা করা যায় ভবিষ্যতে ততই লাভবান হব।

বিকেলের দিকে একটা শহর পেলাম, নাম ইয়াটুং। শহরে ঢোকার মুখেই আমরা পেলাম একটা সুন্দর সেতু। সেটা পার হয়ে ওদিকে আসতেই বাঁদিকে পড়ল বিরাট সৈন্যাবাস, দেখেই বোঝা যায় যে এরা চীনা সৈন্য। এখানেও আছে একটা চেক্‌-পোস্ট, আমাদের কাগজগুলো দেখাতেই তারা কোন হাঙ্গামা করল না। ইয়াটুং একটা সুন্দর শহর। সুন্দর মানে এ পর্যন্ত যে সব শহর পেরিয়েছি তার মধ্যে মনে হয় একমাত্র এটাকেই ছোট খাটো একটা শহরের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। এ পর্যন্ত আমাদের চোখে কোন রকম গাড়ী পড়েনি, রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়ার ভয় নেই।

চুম্বিকে যেমন দেখেই মনে হয়েছিল খুব পুরোনো একটা গরীব গ্রাম, ইয়াটুং-এ কিন্তু সেই ভাবটা নেই। এখানে সবাই কর্মব্যস্ত, মনে হয় এই শহরে বেচা কেনা মন্দ হয় না। গাধা ও ঘোড়ার পিঠে মাল বোঝাই, দোকানগুলোতেও লোকজনে ভর্তি, আমাদের দেখে অনেকেই এগিয়ে এসে প্রণাম জানিয়ে গেছে, তীর্থযাত্রীদের দর্শন ও প্রণামেই অনেক পুণ্য হয়। আমরা থামতে বাধ্য হলাম ; গুরুজীর সামনেই একটা তিব্বতী পরিবার উলের মোজা ও টুপি বিক্রির জন্য বায়না ধরেছে। আমাদের পায়ের দিকে দেখিয়ে বার বার ওরা বলতে লাগলো যে এখানকার উল খুব সস্তা। ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচতে হলে এদের কাছ থেকেই কেনা ভাল কারণ আমাদের কারও পায়েই ঠাণ্ডার উপযোগী মোজা নেই।

গুরুজী তাদের এড়াবার জন্য শত চেষ্টা করেও এগুতে পারলেন না, কাজেই তিনি অন্যান্য লামাদের জিজ্ঞাসা করলেন তারা মোজা কিনতে রাজি আছেন কি না। একটু অমত থাকলেও শেষ পর্যন্ত সকলেই রাজি হয়ে গেলেন। কথাটা সত্যি অর্থাৎ সকলেই ঠাণ্ডায় খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম। আমাদের মধ্যে সাতজন লামার পায়ে কাপড়ের জুতো মাত্র। তিব্বতী পরিবারটি যাযাবর। সারাটা শীত ধরে তারা মোজা, কম্বল, সোয়েটার, টুপি ইত্যাদি বোনে আর গরমের দিনে সেগুলো বিক্রি করে, খাঁটি উল সে বিষয়ে কোনরকম সন্দেহ নেই। ভেড়ার লোম থেকে সরাসরি সূতো কেটে তারই থেকে তৈরী, হাতেকাটা খস্‌খসে উল। লোকটা তীর্থযাত্রী পেয়ে এক ঢিলে দুই পাখী মারতে চায়। সে একেবারে জলের দরে বিক্রি করবে, তাতে ব্যবসা হবে আর সেই সাথে সাথে হবে পুণ্য। সে অত্যন্ত বিনয়ের হাসি হেসে বললে—আমি যদি বড়লোক হতাম তাহলে আপনাদের আমি এগুলো প্রণামী হিসাবেই দিতাম।

সত্যি জলের দরে পেলাম বত্রিশ জোড়া খাঁটি তিব্বতী উলের ফুল সাইজ মোজা, তার দাম নিল মাত্র দশ টাকা। লামারা এত সস্তায় নিতে চান না, সরল পেয়ে তাকে ঠকাতে কেউ চায় না। কিন্তু যাযাবরটি আগের মতো দিলখোলা হাসি হেসে বলল—না আমি এর বেশী কিছু চাই না। আপনারা সবাই লামা তার ওপর তীর্থযাত্রী, আপনারা আমার মোজা পরে সব তীর্থ ঘুরবেন এটা আমার মহা সৌভাগ্য! আপনারা তো জানেনই যে আজকাল তীর্থযাত্রীর সংখ্যা খুবই কম। আরও দু'টাকা হাতে দিয়ে আমরা তাকে প্রাণভরা আশীর্বাদ করে আবার চলতে লাগলাম।

ইয়াটুংয়ের ঘর-বাড়ী, দোকান-পাট, বাজার, সব কিছু দেখে মনে হচ্ছে এটা বর্ধিষ্ণু

শহর, অনেক নতুন নতুন কাঠের বাড়ীও নজরে পড়ছে। এখানকার দোকানে ভারতীয় জিনিসপত্রগুলো ফলাও করে সাজানো হয়েছে। টর্চ ও ব্যাটারী, খাতা, পেন্সিল, শ্লেট, অ্যালুমিনিয়ামের জিনিসপত্র, গামছা, কাপড় এগুলোর ছাপ দেখলেই বোঝা যায় যে ভারত থেকে এসেছে। ভারত মানে গ্যাংটক বা শিলিগুড়িই হচ্ছে এদের ব্যবসায়িক বড় বাজার। এখানকার তিব্বতীদের মধ্যে অনেককে দেখলাম বেশ ভাল ও পরিষ্কার পোশাক পরনে। রাস্তার ধারে যুবকদের সাথে অনেক যুবতীও চোখে পড়ল, তারাও মনে হয় বেশ ভদ্র ও শিক্ষিত। তিব্বতে শিক্ষা বলতে সবই গুম্ফা বা মঠের অধীনে। উপযুক্ত শিক্ষা পেতে হলে ত্রাপা হওয়াই ভাল। অনেক বাড়ীঘরে বেশ সাজানো,ফুলের বাগানও নজর এড়াল না। লাসার পথে ইয়াটুং, ভারত ও তিব্বতের প্রথম ব্যবসায়িক বাজার বলে মনে হল। আমরা বরাবরই উত্তরের দিকে এগিয়ে চলেছি।

গুরুজী আমাদের একটা স্তূপের কাছে দাঁড়াতে বলে খোঁজ করতে গেলেন রাতে থাকার জন্য। ইয়াটুং-এ থানা ও ট্যাক্স্ অফিসও আছে। গুরুজী ফিরে এসে বললেন—রাতে এখানে থাকার কোন অসুবিধা নেই, তবে সকলের একজায়গায় থাকার মতো কেউ বন্দোবস্ত করতে পারবে না। দু'চার জন হলে কোন অসুবিধা ছিল না, কিন্তু বত্রিশজনের জন্য কোন হোটেল বা সরাইখানা এখানে নেই। কিন্তু লামারা কেউই গুরুজীকে ছাড়তে রাজি নন। কাজেই আমরা আরও এগিয়ে চললাম। গুরুজী বললেন—একটু দূরে অনেকদিনের একটা পুরানো মঠ আছে মঠাধ্যক্ষকে আমি চিনি, চল দেখা যাক যদি সে থেকে থাকে তাহলে কোন অসুবিধাই হবে না, তাতে খরচটাও বাঁচবে আমরা নিজেরাই রান্না করে নিতে পারবো।

আমরা রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ের উপর উঠতে লাগলাম। এক ঘণ্টার মধ্যেই পাহাড়ের কোল ঘেঁষা একটা মঠ আমাদের চোখে পড়ল। গুরুজী সকলকে সেদিকে আকৃষ্ট করে বললেন—চেয়ে দেখো কি চমৎকার দেখাচ্ছে, এই মঠটার নাম দুংকার অর্থাৎ দুংকার গুম্ফা। ভগবান তথাগত যদি প্রসন্ন হন তাহলে সেখানেই আমরা আজ রাতটা কাটাবো। আমরা বিশ্রাম করবার জন্য একজায়গায় বসলাম। গুরুজী সেই সময়ে সেই গুম্ফা সম্পর্কে কিছু বলতে লাগলেন।

তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের বহু শাখা প্রশাখা আছে, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে গেলুক-পা সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ই তিব্বতের মুখ্য সম্প্রদায়। এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোয়াং লোবসাং চোদেন। এই মঠের মূল পূজারী ছিল এক অশরীরী আত্মা, ক্রুলপ তার স্থানীয় নাম। এখানে ছোট ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ লামা করার জন্য ভর্তি করা হয়। চল দেখা যাক এই মঠটা দেখবার মতো।

আমরা আরও কাছে আসতে প্রথমেই পড়ল একটা চৈত্য যার স্থানীয় নাম চোরতেন, তারপর আরও কয়েকটা। সেগুলোর পাশ দিয়ে মণি মন্ত্র পাঠ করে এগিয়ে চললাম। সামনেই পড়ল বিরাট একটা পাথরের দেয়াল, মনে হয় একটা দুর্গ। আমরা আরও এগিয়ে এলাম তার প্রধান দরজার দিকে। আরও একটু এগিয়ে যেতেই হঠাৎ যেন পড়লাম বাঘের মুখে, ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করল দুটো কুকুর, আমরা পিছু হঠ্‌তে

বাধ্য হলাম। ভাগ্যিস কুকুর দুটো বাঁধা ছিল নয়তো এতক্ষণে আমাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠতো। লম্বা চেন দিয়ে কুকুর দুটোকে বাঁধা হয়েছে, মঠের সিংহ দরজার প্রহরী হিসাবে। আমাদের বেশীক্ষণ সেখানে দাঁড়াতে হল না, ভেতর থেকে কয়েকটি ত্রাপা অর্থাৎ নবীশ লামা ছুটে এসে কুকুরগুলোকে সামলে নিল। আমাদেরও পরনে লামার পোশাকে দেখে তারা সসম্ভ্রমে প্রণাম করে পাশে এসে দাঁড়ালো, গুরুজীকে জিজ্ঞাসা করলো—আপনারা ভেতরে আসবেন ?

নিশ্চয়ই। আমরা ভেতরে ঢুকলাম। মঠতো নয় যেন দুর্গ। পাহাড়ের কোলে অতি সুন্দর স্থাপত্যশিল্পের এক নিদর্শন, এতদিন পর মনে হল আমরা সত্যিকারের এক বিহারে এসে পৌঁছেছি। আমরা ভেতরে বেশ কিছুদূর পৌঁছে একটা উঠোনের মধ্যে পড়লাম, এর চারপাশে নবীশদের থাকবার ব্যবস্থা তারই এক কোণে একটা অফিস ঘর। আমাদের আর অফিস পর্যন্ত যেতে হল না, মনে হয় কোন ত্রাপা আমাদের সংবাদ আগেই সেখানে পৌঁছে দিয়েছে। একজন বয়স্ক ভারিক্কি গোছের লামা আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন, বিস্ময়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কোথা থেকে আসছেন, কোথায় যাবেন ?

শুকনো প্রশ্ন। গুরুজী সংক্ষেপে আমাদের কথা তাকে জানালেন তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—গুরু চু-মিন্‌জেন্‌ এখানে আছেন কি ? তিনি আমাকে চেনেন।

—তা বেশ, তা বেশ, ভেতরে আসুন, গুরুজী গালিগংএ গেছেন। আপনারা তো সেই পথেই এসেছেন, দেখা হয়নি ?

—না, আমাদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। গুরুজী তার সঙ্গে কাজের কথায় এলেন। সোজা কথা আজকে এই বত্রিশজনকে নিয়ে এখানে থাকা যাবে কি না। ভদ্রলোক এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না, তার কারণ গুরু চু-মিন্‌জেন্‌ হচ্ছেন এখানকার মঠাধ্যক্ষ অতএব তাঁর অবর্তমানে কেউ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। ঠিক আছে, তিনি যতক্ষণ না আসেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করছি। আমরা কাঁধের মালপত্রগুলো অফিস ঘরে রেখে, হালকা হয়ে বেড়িয়ে পড়লাম এদিক ওদিক,মঠটাকে ভাল ভাবে দেখবার জন্য। আমি গুরুজীর সাথেই রইলাম। আমরা একটা বিরাট চোরতেন-এর কাছে এসে দাঁড়ালাম। গুরুজী বললেন—ভালভাবে এর কাজগুলো লক্ষ্য করে দেখো। সূক্ষ্ম শিল্পের নমুনা, স্তূপ আমি এ পর্যন্ত অনেক দেখেছি, সত্যি ! এত সুন্দর রং বেরঙের কারুকার্য এর আগে চোখে পড়েনি। তার চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম, অজস্র মণি মন্ত্র খোদাই করা রয়েছে। ছোট বড় মাঝারি ছাড়াও শিল্পী তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছে প্রত্যেকটি অক্ষরের ওপর 'ওঁ মণি পদ্মে হুম্‌'। গুরুজীকে জিজ্ঞাসা করলাম—গ্যাংটক থেকে এ পর্যন্ত রাস্তায় অনেক চোরতেন (স্তূপ বা চৈত্য) পেরিয়েছি বিশেষ করে তিব্বতে ঢোকার পর থেকে দেখছি চোরতেনের ছড়াছড়ি, এর মূল অর্থটা কি আমাকে বলবেন ?

আমার কথা শুনে তিনি একটু মাথা নাড়লেন তারপর বললেন—চোরতেনের অর্থ ব্যাপক। বিভিন্ন লোক ও সম্প্রদায় বিভিন্ন রকম তার ব্যাখ্যা করে, তবে তার মূল অর্থ

একই। চোরতেন আমাদের এই জড় জগতের প্রতীক। তাই কোন মহান বা ধার্মিক ব্যক্তি দেহত্যাগ করলে, এই চোরতেন স্থাপিত করে তার প্রতি সম্মান দেওয়া হয়। ভারতে এই ধরনের স্তূপ তুই দেখেছিস। চোরতেন অনেক সময় সমাধি বেদীতুল্য, যখন একটা চোরতেন পাবি তখন সেটাকে বাঁদিকে রেখে এগিয়ে যাবি, তার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করবি। চোরতেন ধর্মের প্রতীক, সংঘের প্রতীক, বুদ্ধের প্রতীক। চোরতেন যেরকম ভাবেই তৈরী হোক না কেন তাকে কোন সময়ই অবহেলা করবি না। চোরতেন মন্দিরের প্রতীক, চোরতেনের মধ্যে আছে প্রাণ। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের প্রতীক। চোরতেনকে ভালভাবে পরীক্ষা করলেই এই পাঁচটি অংশ পরিষ্কার বুঝবি। আজকে নয় একদিন সময় করে তোকে ভাল করে বুঝিয়ে দেবো। অন্যান্য গুম্ফার * মতো এখানেও মন্দির, বিদ্যালয়, লামা ও ত্রাপাদের থাকার বন্দোবস্ত রয়েছে। শিল্প শিক্ষার জন্য সম্পূর্ণ আলাদা একটা বাড়ী আছে। বর্তমানে ছাত্রের সংখ্যা পঞ্চান্ন, তবে প্রয়োজনবোধে দু'শ জন ছাত্রের জন্য এটা প্রস্তুত। এতো হল ছোটদের কথা। এই দুংকার গুম্ফা উচ্চ শ্রেণীর লামাদের এক জমায়েৎ কেন্দ্র, বিভিন্ন জায়গা থেকে লামারা আসেন শিক্ষা ও প্রচার সম্বন্ধীয় সভা সমিতির জন্য। এখানকার ধ্যানের ঘরগুলোও অতি সুন্দর জায়গায় অবস্থিত। সেখান থেকে দেখা যায় চোমলহরি তথা হিমালয়ের এক অনবদ্য দৃশ্য। প্রায় সন্ধ্যের কাছাকাছি একটা তিব্বতী ভেরী বেজে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে সবাই ছুটে চলে গেল। মনে হয় জমায়েতের বাঁশী। হঠাৎ কানে এল গুঞ্জন ধ্বনি, মনে হল ভীমরুলের চাকে কে যেন ঢিল মেরেছে। শব্দটা অবিকল ঠিক সেই ধরনের, বুঝল্যাম লামারা প্রার্থনা করছে। লামাদের প্রার্থনা সাধারণতঃ খুব নীচু গলায় থেমে থেমে হয়। কেউ যদি সেই শব্দে অভ্যস্ত না হয় তাহলে আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, সে কিছুতেই আন্দাজ করতে পারবে না এটি তিব্বতী ভাষায় প্রার্থনা হচ্ছে। আমরাও সেদিকে এগিয়ে গেলাম। হিমালয়ের ঠিক কোলে শিশুদের এই সহজ ও সরল প্রার্থনায় ভগবান সাড়া দিতে বাধ্য। প্রার্থনা শেষে সবাই চলে গেল খাবার ঘরে। আমরা অফিস ঘরের এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগলাম। গুরু চু-মিন্‌জেন এলেন তারও অনেক পরে। এখানকার ছেলেরা সংবাদ বহনে খুব চতুর, গুম্ফায় ঢোকবার আগেই তিনি আগন্তুকদের সংবাদ পেয়েছেন। অফিস ঘরের সামনে আসতেই হ্যারিকেনের আলোয় তিনি দেখতে পেলেন আমাদের গুরুজীকে, দুইজন দুইজনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, বহুদিনের পর যেন দুই ভাইয়ের মিলন হল। আনন্দের উচ্ছ্বাসটা কেটে গেলে গেশে রেপ্‌তেন আমাদের মঠাধ্যক্ষ চু-মিন্‌জেনের সাথে একে-একে পরিচয় করিয়ে দিলেন। থাকবার কথা বলার সাথে সাথেই তিনি রাজী হয়ে গেলেন, তিনি বললেন একদিন নয় যতদিন খুশী থাক। তিনি আমাদের রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন, সেখানে বিরাট হাঁড়ি আর কড়াই দেখিয়ে বললেন তোমাদের রান্নার জন্য এগুলো ব্যবহার করতে পারো, উনোন কাঠ সব তৈরী। তারপর জংকার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন—এ তোমাদের সাহায্য করবে। চল এখন

* গুম্‌ফা বা গোম্‌পা, একই অর্থ।

মন্দিরে যাওয়া যাক তোমরা সেখানেই আজকের সন্ধ্যাধ্যান করতে পারবে। আঁকা-বাঁকা সরু গলির মধ্য দিয়ে আমরা এসে হাজির হলাম আর একটা বিরাট বাড়ীর সামনে। হ্যারিকেনের আলোয় কাঠের দরজার কাজগুলো ভালভাবে লক্ষ্য করতে পারলাম না। আমরা ভেতরে ঢুকলাম। তিব্বতের কোন বুদ্ধমন্দিরে ঢোকবার জন্য জুতো খুলতে হয় না, মনে হয় খুব শীতের জন্যই এই ব্যবস্থা। সামনেই সারি সারি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে, তারই আলোয় দেখা যাচ্ছে বিরাট অবলোকিতেশ্বরের শান্ত মূর্তি। এই মূর্তিই এদের মূল দেবতা। চার হাত, নীচের দুহাত দিয়ে অভয় দিচ্ছেন আর উপরের দুই হাতে বজ্র ও পদ্ম। অবলোকিতেশ্বরের বাম ও ডান দিকে আরও অনেক মূর্তি রয়েছে। আমার নজরে পড়ল তারই পাশের বিরাট থাক্‌গুলোর দিকে। সেগুলো সব বড় বড় বইয়ে ভর্তি, প্রত্যেকটা বইয়ের উপরে ও নীচের মলাট কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরী আর তার সামনে রঙ্গীন কাপড়ের পর্দা দিয়ে ঢাকা, সম্ভবতঃ প্রদীপের কালি থেকে বাঁচাবার জন্য। এই বইগুলো আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, সেই দিকে আমি এগিয়ে গেলাম। হাত দিয়ে বইগুলোকে একটু স্পর্শ করবার চেষ্টা করতেই মঠাধ্যক্ষ আমার দিকে এগিয়ে এলেন, তিনি মৃদু হেসে তীব্বতী ভাষায় কি যেন জিজ্ঞেস করলেন—আমি বুঝতে না পেরে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি এবার আমার দিকে চেয়ে স্পষ্ট হিন্দীতেই জিজ্ঞাসা করলেন, তুম্ কি ধার কা আদ্‌মী হো? অন্য সময় হলে নিশ্চয়ই আমি মৌনী বাবার ভান করতাম, কিন্তু এখানকার এই পবিত্র পরিবেশে সে মিথ্যাটা মুখ দিয়ে বেরোলো না, সেটা রেখে দিলাম চীনা সৈন্যদের জন্য। আমি উত্তর দিলাম—কল্‌কাত্‌তাকা। তিনি আনন্দিত হলেন, আমি গেশে রেপ্‌তেনের দিকে ফিরে বললাম—ওনাকে জিজ্ঞেস করুন, তিনি আমার সম্পর্কে সব জানেন।

আমার কথা শুনে গেশে রেপ্‌তেন চু-মিন্‌জেনকে খুব আস্তে আস্তে মানে ফিস্‌ফিস্ করে আমার পরিচয় দিলেন। মঠাধ্যক্ষ আমার পরিচয় পেয়ে খুব আনন্দিত হয়ে বললেন—অল্প বয়সে তীর্থ করাই ভাল, সেই অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে খুব কাজে লাগে, বিশেষ করে গেশে রেপ্‌তেনের মতো বিজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গ খুব দুর্লভ। জানো আমি ও গেশে রেপ্‌তেন লাডাকে এক সাথে চার বছর ছিলাম। আমি আমার আগের প্রশ্নে ফিরে এলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—এই বইগুলো কি মহাযান গ্রন্থের ভাষ্য?

চু-মিন্‌জেন উত্তর দিলেন—না, দাঁড়াও তোমাকে দেখাচ্ছি। এই বলে পাশের একটা থাক থেকে দুহাতে বিরাট একটা বই বের করলেন। বইটা একটা তক্তার উপর রেখে তিনি আমাকে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। বইটার সাইজটা বিরাট, আড়াই ফুট লম্বা ও দু-ফুট চওড়া। তিনি বইটাকে সসম্মানে প্রণাম করে আমাকে বললেন—এইটি আমাদের তিব্বতীয় উপনিষদ্, আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। বুদ্ধ নীতি শাস্ত্র, এই বইটা ভারতের সংস্কৃত বই থেকে অনুবাদ করা হয়েছে, নাম কাংগীউর। তুমি এই ধরনের বই একমাত্র বড় বড় গুম্ফা ছাড়া আর কোথাও পাবে না। এই যে দেখছো চারপাশের দেওয়ালগুলো ঠাসা বই। প্রত্যেকটি খোপের সংখ্যার উল্লেখ আছে, এ-ধরনের একশ

আটটা (১০৮) বই নিয়ে তৈরী কাংগীউর। অর্থাৎ কাংগীউর একশ আট ভাগ, প্রত্যেকটা ভাগ নিয়ে তৈরী এক একটা বই। হাতে ছাপানো ভারী ভারী বইগুলোর দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিতে হলে কি করেন ?

জবাবে মৃদু হেসে তিনি বললেন—সেটা একটা সমস্যা বটে। এ-ধরনের চারটে বই এক গাধার দু'পাশে দুটো দুটো করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তারপর সেই গাধাকে লামা বা ত্রাপা টেনে নিয়ে যায়। চলার পথে অবশ্যই হুঁশিয়ার থাকতে হয়, যাতে বইয়ের প্রতি কোনরকম কু-দৃষ্টি না পড়ে।

—এই বইগুলো কি ছোট লামারা পড়তে পারে ?

—না, এর জন্য চাই উপযুক্ত প্রস্তুতি। পনেরো ষোল বছর মঠে থাকার পর, আস্তে আস্তে তাদের আমরা তাংগীউর-এর সহজ ভাষ্য বোঝাই।

—তাংগীউর ? সেটা আবার কি ?

—তাংগীউর হচ্ছে কাংগীউর-এর সহজ ব্যাখা, সেটাও তিব্বতী ভাষায় লেখা। এস পাশের ঘর তোমাদের দেখাচ্ছি। তাঁকে অনুসরণ করে আমরা সবাই পাশের ঘরে এলাম, তিনি দুটো ঘি-এর প্রদীপ জ্বালিয়ে আমাদের চারদিকে তাকাতে বললেন। তাঁর কথানুযায়ী আমরা চারদিকে তাকালাম, কাঠের একটা বিরাট ঘর তার দেয়ালগুলো সব বইয়ে ঠাসা। চু-মিন্‌জেন আবার শুরু করলেন,

—এই ঘরটায় যত বই দেখছো তার সবগুলোই তাংগীউর। বিশেষভাবে এই ঘরটা তৈরী হয়েছে এই বইগুলো রাখবার জন্য। তাংগীউর-এর দুশ পঁচিশ ভাগ (২২৫), এখানে গুণে গুণে দেখো দুশ পঁচিশটা খোপ আছে। ছোট লামা বা ত্রাপাদের এই বই ধরতে দেওয়া হয় না। বইগুলোর উপরে ও নীচে কাঠের মলাট আর প্রত্যেকটি পাতা আলাদা আলাদা করা, পাতার মধ্যে কোন সংখ্যা দেওয়া নেই। একটার পর একটা সাজানো, যারা এই বই পড়তে আসে তারা যথাযোগ্য সম্মান, মনোযোগ ও যত্ন সহকারে এর ব্যবহার করে। চু-মিন্‌জেন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—এটা রামায়ণ ও মহাভারত থেকে অনেক কঠিন।

আমাদের মূল মন্দিরে রেখে দুই গুরুজী চলে গেলেন বাইরে। শান্তি ও রক্ষার আশ্বাস পেয়ে আমরা সেখানকার গদীতে ধ্যানে বসলাম।

পরেরদিন সকাল বেলা। গুম্ফাবাসীরা সকালে কেউ খায় না। দিনে দুবার মাত্র এরা খায়। প্রথম খাওয়া দুপুরবেলা আর দ্বিতীয় খাওয়া সন্ধ্যের আগে, আমরাও তাদের সাথে যোগ দিলাম।

গুরু চু-মিনজেন আমাদের দ্বিতীয় মন্দিরে নিয়ে এলেন দর্শনের জন্য, দ্বিতীয় মন্দিরটি মনে হল প্রথম মন্দিরটির থেকে আরও জাঁক্‌জমকপূর্ণ। মনে হয় পাহাড়ের দেয়াল কেটে এই মন্দিরটি তৈরী হয়েছে। অনেকগুলো মূর্তি, ধর্মরাজের মূর্তি, যবযুম ও বিভিন্ন ধরনের আসুরিক মূর্তি। যদিও তখন সকাল কিন্তু দিনের আলো মনে হয় ভেতরে ঢুকতে পারে না, একটাই মাত্র দরজা কোন জানালা নেই। তৃতীয় মন্দিরটি

শুধু দেবদেবীতে ভরা, মনে হয় স্থানাভাবে সেগুলোকে একজায়গায় জড়ো করে রাখা হয়েছে, সব কয়টি মন্দিরেই টাঙানো রয়েছে রঙ বেরঙের বহু তাংকা অর্থাৎ কাপড়ের উপর বিচিত্র রঙের যন্ত্র, মণ্ডলা, বুদ্ধ মূর্তি ও জন্ম-মৃত্যু জরার প্রতীক। এই মন্দিরগুলোর সোনার তৈরী প্রদীপের কাজগুলোও দেখবার মতো, মন্দিরের গঠন এমনভাবে তৈরী যে কেউ না নিয়ে গেলে সেখানে একা একা যাওয়া মুশকিল।

এমন সময় খাওয়ার ভেরী বেজে উঠল। আমাদের ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই ফিরে আসতে হল। আমরা আজ ছাত্রদের সাথে নিমন্ত্রিত অতিথি, গুরু চু-মিনজেন আমাদের তরফ থেকে কিছু চান না। তিনি বললেন—তথাগতের ইচ্ছায় আর কুবেরের কৃপায় তাঁর ভাণ্ডারে অভাব নেই, তীর্থযাত্রীরা সেখানে একবেলা আহার করলে গুম্ফার মঙ্গলই হবে। তিনি যদিও একটু গম্ভীর প্রকৃতির কিন্তু তাঁর মনের প্রসারতা আমাদের মুগ্ধ করল। ছাত্রদের সাথে আমরা একসাথে খেতে বসলাম। সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে গেশে রেপ্‌তন ঘোষণা করলেন যে, খাবার পরই আমাদের আবার পথে পড়তে হবে।

ফারি

খাওয়া দাওয়ার পর কথামতো আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বেরোতে আমাদের সত্যি দেরি হয়ে গেলো, তাই গুরুজী সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন, আজকে আমরা যতদূর সম্ভব এগিয়ে যাবো, রাত্রিবেলা সম্ভবতঃ একজায়গায় থেমে রাতের খাবার তৈরী করতে হবে, তারপর খাওয়ার পর আবার চলবো। আমাদের শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ, বিশেষ করে গুরু চু-মিন্‌জেন-এর আতিথেয়তায় আমাদের শরীর ও মন সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্রাম পেয়েছে কাজেই এখন হাঁটতে কোন অসুবিধাই নেই।

হিমালয়ের সুন্দর দৃশ্য থেকে আসতে লাগলো প্রেরণা আর সূর্যাস্তের রঙীন আকাশ দিল শান্তি, আমরা নতুন উদ্যমে চলতে লাগলাম।

রাতে একটা পোড়ো বাড়ীতে রুটি তৈরী করলাম, নুন দিয়ে পরম তৃপ্তিভরে তা খেয়ে আবার চললাম। এবারকার রাস্তা দীর্ঘ আর কিছুটা একঘেয়ে তো বটেই। তিন চার বার বিশ্রাম করে ভোর বেলার দিকে আমাদের সামনে দেখা দিল ফারি।

শহরে ঢোকবার মুখেই পেলাম একটা চায়ের দোকান। আমরা মালিকের উদ্দেশ্যে ডাকাডাকি করলাম। মালিক উঠলো না তবে তার স্ত্রী, মধ্যবয়স্কা, আমাদের ডাকে সাড়া দিলেন। দরজা খুলেই দেখলেন সামনে এক বিরাট লামা তীর্থযাত্রী। শুধু সুপ্রভাত নয়, এটা একটা বিরাট ভাগ্য। আমাদের সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে তিনি বললেন—কি চাই? —চা। বলাই বাহুল্য, এত ভোরে চায়ের দোকানে কি কেউ সরবৎ খেতে আসে। আমাদের অপেক্ষা করতে বলে ভদ্রমহিলা ধাক্কা মেরে তার স্বামীকে তুলে দিলেন। উপায় নেই এতগুলো খদ্দেরের ঝামেলা একা সামলানো যাবে না। অবাক কাণ্ড কিছুক্ষণের মধ্যে ঘর থেকে একে-একে তিনজন লোক বেরিয়ে এল। গুরুজী আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন—সম্ভবতঃ এরা তিন ভাই, আর তিন ভাইয়ের একই স্ত্রী। আমি অবাক হয়ে গুরুজীর দিকে তাকালাম, তিনি আমার ভাবটা বুঝতে পেরে বললেন—অবাক হবার কিছু নেই, তিব্বতে এই ধরনের পরিবার প্রায়ই চোখে পড়বে, ঠিক যেমন মহাভারতে পঞ্চপাণ্ডবের ছিল একমাত্র বউ-দ্রৌপদী। প্রথমে বড় ভাই বিয়ে করে, তারপর ভাইদের মধ্যে যদি সদ্ভাব থাকে তাহলে অন্যান্য ভাইরাও তাকে আপন স্ত্রী বলে গ্রহণ করে। তবে বড় ভাইয়ের দাবী ও অধিকার সব সময়ই প্রাধান্য পায়।

চা হল আর তার সাথে গরম জলে ছাতু গুলে খেয়ে নিয়ে আমরা প্রস্তুত হলাম। আমাদের প্রত্যেকেরই দৈহিক অবস্থা তখন শেষ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। ঘুম ও

বিশ্রাম দুইয়েরই প্রয়োজন। আমাদের আশ্বাস দিয়ে গুরুজী বললেন—ওই যে দেখা যাচ্ছে গুম্ফাটা সেখানেই আমরা এখন যাবো। সকালবেলাটা সেখানেই কাটিয়ে আমরা বিকেলের দিকে আবার রাস্তা ধরবো।

আমাদের নজরে পড়লো গুম্ফার সারি সারি থামে পতাকা, বিরাট বিরাট এই বাঁশ বা কাঠগুলোকে কেউই এড়িয়ে যেতে পারবে না। তিব্বতের যে কোন গুম্ফার এগুলোই হচ্ছে পথ প্রদর্শক। ছোট ছোট কাপড়ে প্রার্থনা লিখে দড়ি দিয়ে অনেক উঁচু করে সেগুলোকে টাঙিয়ে দেওয়া হয়, অনেকটা কলকাতার পূজো উৎসবের কাগজের শেকলের মতো। যত ওপরে টাঙানো যাবে ততই ভক্তের প্রার্থনা পৌছবে ভগবানের কাছে। আবার অনেকে ভাবেন যে, বাতাসই বয়ে নিয়ে যাবে সেই প্রার্থনা স্বয়ং বুদ্ধের কাছে। একটা ছোট রাস্তা ধরে এগুতেই গুম্ফার দেয়ালটা ঠিক আমাদের সামনে পড়ল। দেখে মনে হয় স্থানীয় পাথর ও মাটি দিয়ে সেটা তৈরী। অনেক দিনের পুরানো, দরজা নেই, মাটির দেয়ালের মাঝখান ফাঁকা রেখে দরজার কাজ সারা হয়েছে। ভেতরে ঢুকতেই পেলাম একটা বিরাট উঠোন অনেকটা বিহারের বর্ধিষ্ণু খেতি বাড়ির মতো। উঠোনের চারপাশে গুম্ফার দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে ছাদওলা বারান্দা। ভেতরে কেউ তখনো ওঠেনি, কাজেই জিজ্ঞাসা করার মতো কাউকে পেলাম না। গুরুজীর নির্দেশে ওই বারান্দাতেই আমরা আশ্রয় নিলাম, তারপর কম্বল পেতে ভারী মোজা পায়ে দিয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন বাধা আসে ততক্ষণ পর্যন্ত ঘুমিয়ে নিতে হবে।

দুপুর বেলার দিকে আমাদের ঘুম ভাঙলো, বেলা মনে হয় একটা কি দুটো হবে। গুম্ফার ত্রাপারা আমাদের চারদিকে এসে জড়ো হয়েছে, আমাদের উঠতে দেখেই তারা সম্ভ্রমে দূরে সরে দাঁড়ালো। মঠের গুরু বৃদ্ধ লামাও তাদের সাথে এসে হাজির হয়েছেন। আমাদের পরিচয় পেয়েই তিনি আনন্দে আমাদের স্বাগতম্ জানালেন। তিনি বললেন যে, আমরা যতদিন খুশী সেখানে থাকতে পারি কিন্তু মঠের অবস্থা দিনদিন খুবই খারাপের দিকে চলেছে। লাসার থেকে সব সময় সাহায্য আসে না, কাজেই শিশুদের নেওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। মোটকথা কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে চলছে। আমরা যদি আমাদের খাওয়ার খরচ দিই তাহলে তিনি সব বন্দোবস্ত করতে রাজি, আর তা না হলে শুধু থাকার বন্দোবস্ত। আমার মতে এটা মোটেই বন্দোবস্ত নয়, যেখানে আমরা শুয়েছিলাম সেগুলো ঘর নয় দেয়ালের সঙ্গে একটা ছাউনি মাত্র। আপাততঃ কিছু ঠিক না করে পরে দেখা যাবে বলে গুরুজী তাকে এড়িয়ে গেলেন। এবার তিনি সবাইকে শহরে বেরোবার জন্য স্বাধীনতা দিলেন। তিনি বললেন—সবাই একসঙ্গে বেরোলে সকলের দৃষ্টি পড়বে, সবচেয়ে ভাল এক-এক দলে দু'তিন জন করে আলাদা আলাদা বেরিয়ে পড়, শহরটা দেখে এস। তিব্বতের এটা খুব দর্শনীয় শহর, যে যখন খুশী আবার ফিরে আসবে, তবে যদি কোন চীনা সৈন্য নজরে পড়ে তাহলে তাদের এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। তাঁর কথা শুনে সবাই একে-একে বেরিয়ে গেল, আমি গুরুজীর সাথেই রইলাম।

সবাই বেরিয়ে গেলে গুরুজী আবার গুম্ফার বৃদ্ধ লামার সঙ্গে পরামর্শ আরম্ভ করলেন। আজকাল আমি তিব্বতী শব্দ কিছু কিছু আয়ত্ত করার চেষ্টা করছি, দু'একটা শব্দ পেলে মন্ত্রের পরিবর্তে সেটাকেই আওড়াতে থাকি। খুব মনোযোগ দিয়ে চেষ্টা করি তাদের কথা শুনতে। একমাত্র আমি বাদে দলের সবাই অল্পবিস্তর তিব্বতী ভাষা জানেন। গুরুজী বৃদ্ধ লামার সাথে অনেকক্ষণ পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে, আমরা দু'বেলা খাবার জন্য মোট দশটাকা দেবো, আর তার সাথে কিছু লবণও তাকে উপহার হিসেবে দেবো। গুম্ফা আমাদের দু-বেলা ঝোলা সাম্পা খেতে দেবে। পরে গুরুজীকে বললাম, বত্রিশ জনের জন্য মাত্র দশ টাকা সত্যি সস্তা বলতে হবে। গুরুজী এক ধমকে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—মোটেই না, দশ টাকা অনেক। সাম্পা মানে এখানকার বার্লির জলের সাথে আটা ও সামান্য শুকনো মাংসের টুকরো মেশানো, এই অঞ্চলেই বার্লি হয় কাজেই খুব সস্তা।

তারপর বেরিয়ে পড়লাম শহর দেখবার জন্য। গুম্ফা থেকে বেরিয়েই আমরা ডানদিকের একটা রাস্তা ধরে শহরের দিকে চললাম। একনজরে দেখেই বলা যায় যে এই অঞ্চলের এটাই সবচেয়ে বড় শহর। যতই আমরা তিব্বতের কেন্দ্রের দিকে এগুচ্ছি ততই গ্রামগুলো আস্তে আস্তে বড় হতে লাগলো। মনে হয় এই শহরটি খুব বড়, বাড়ীগুলো উপত্যকার মধ্যে আরও বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে। আমরা ইতস্ততঃভাবে এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগলাম। অনেকগুলো বাড়ীর সামনে এই প্রথম নজরে পড়ল সাইনবোর্ড, লেখাগুলো অবশ্য পড়তে পারছি না তবে দেখে মনে হয় বিশেষ প্রয়োজনীয়। মুদীখানার দোকানগুলো আগের চেয়ে অনেক উন্নত। চায়ের দোকানের সামনে উট্‌কো হয়ে বসে ডজনখানেক যুবক আড্ডা মারছে, কয়েকটা ইয়াকে টানা গাড়ীও নজরে পড়ল। তিব্বতে ঢুকে প্রথম নজরে পড়ল রাস্তায় ছাড়া ইয়াক, অর্থাৎ গরু আর মোষের মাঝামাঝি ধরনের জন্তু। একটা মাংসের দোকানের সামনে দেখলাম কয়েকটি লোক পয়সা ছুঁড়ে খেলছে। এই শহরেই প্রথম দেখলাম বেশ কিছু উঠতি বয়সের মেয়েদের। পেছনে টেনে বাঁধা চুল আর পরণে বাকু অর্থাৎ লম্বা ধরনের সেমিজ। বয়স্কা ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকের প্রায় একই পোশাক। শহরটা খুব জমজমাট, প্রচুর কেনা বেচা হচ্ছে। পোশাকে তিব্বতীরা প্রায় সবাই এক রকম, খয়েরী রঙটা মনে হয় এরা সকলেই পছন্দ করে। ইস্কুল বলতে মঠ অর্থাৎ ধর্মভিত্তিক। ছোট ছেলেরা সবাই পোশাক পায় মঠ থেকে, তারপর যতদিন তারা মঠে থাকবে ততদিন তাদের আর খাওয়া পরার ভাবনা নেই। মঠ ছাড়া বাইরে কোন ইস্কুল বা পাঠশালা নেই কাজেই অভিভাবকরা তাদের গুম্ফা বা মঠে দিতে বাধ্য। মেয়েদের ক্ষেত্রেও তাই, তবে তারা যৌবনে পৌঁছলেই বিয়ের প্রস্তাব এসে যায়। তাই সাধারণতঃ যুবতী সন্ন্যাসিনী চোখে পড়ে না। মনে হয় তিব্বতে মেয়েদের সংখ্যা কম যার জন্য সব ভাই মিলে একই মেয়েকে বিয়ে করে সমাজের চাহিদা মেটায়।

ফারিকে এখানকার লোকেরা বলে ফারি জোং, জোং অর্থে দুর্গ। ফারি দুর্গকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই শহর। আর একটি মঠকে কেন্দ্র করে প্রথমে গড়ে উঠেছিল সেই

দুর্গ। সিকিম, ভূটান, শিলিগুড়ির সাথে তিব্বতের এটাই মূল ব্যবসা কেন্দ্র। এই শহরে তাই অনেক বছর আগে থেকেই গড়ে উঠেছে ভারত-তিব্বত ব্যবসা সংস্থা, যার চলতি নাম ট্রেড সেণ্টার। সেজন্য ভারতের একজন সরকারী প্রতিনিধি এখানে আছেন।

অনেকের পোশাক পরিষ্কার দেখলাম কিন্তু তা সত্ত্বেও এই শহরের জঞ্জাল ও আবর্জনার কথা না বললে আমার বলা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার বর্ণনা দিতে বাধ্য হচ্ছি।

ফারি শহরের ঠিক কেন্দ্রে আমি ও গুরুজী এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি। একটা বিরাট দোতলা বাড়ীর ঠিক নিচে এসে আমরা দাঁড়ালাম। আমাদের ডান দিক দিয়ে একটা ছোট্ট পাহাড়ি খরস্রোতা এগিয়ে চলেছে। গঙ্গায় বান ডাকার ঠিক পরই তার যে ঘোলা জল সে জল এর চেয়ে অনেক পরিষ্কার। এ বর্ণনা দেবার আগে আমি অনেক ভেবেছি এর মধ্যে এতটুকু বাড়িয়ে লেখা নেই, যারা লাসার পথে এই ফারি পাড়ি দিয়েছেন তারা আমার সাথে অবশ্যই একমত হবেন।

শহরটা নোংরা, কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। কেউ যদি কাঁকুড়গাছি থেকে খাল ধরে গঙ্গা পর্যন্ত হেঁটে আসেন তাহলেও ফারির নোংরামি কিছু আন্দাজ করতে পারবেন না। শহরে নর্দমা বলতে কিছু নেই, সরকারী পায়খানাও নেই। মাঠ ঘাটের অভাব নেই যদিও শহরবাসীদের পক্ষে সব সময় বাইরে সে কাজের জন্য যাওয়া সম্ভব নয় বিশেষ করে জরুরী সময় তা একান্তই অনুপযুক্ত। এখানকার ঘর বাড়ীর রূপ দেখলেই বোঝা যায় যে, রান্না ঘরের জানালা বা দরজার বাইরেই হচ্ছে এদের জঞ্জাল ফেলার জায়গা। জানালা দিয়ে জঞ্জাল ফেলার দরুন অনেক বাড়ীর জানালা বা দরজার সামনে বিরাট স্তূপীকৃত জমাট আবর্জনার দেয়াল উঠেছে। ঘরের যে কোন রকম আবর্জনা এরা ঘরের সামনেই রাস্তায় ফেলে, এর জন্য কার কি অপকার বা অসুবিধা হচ্ছে তা এদের জানার দরকার নেই। বাড়ীঘরের সামনে সেই স্তূপীকৃত ছাইগাদার ওপরেই সকালবেলার দিকে দেখা যায় সারি সারি লোক বসে আছে, বলতে গেলে রাস্তার ঠিক ওপরেই। দিনের যে কোন সময়ে সেখানে বসতে এরা দ্বিধা করে না, মহিলাদের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যবস্থা। ফারিতে একটাই চৌরাস্তা, সেই চৌরাস্তার পাশেই রয়েছে ডাক-চৌকি। লাসা ও ভারত-তিব্বত সীমান্তের পেমা চৌকির থেকে সেখানেই আসে ডাক। সপ্তাহে একদিন এটাই এ অঞ্চলের মূল ডাকঘর। ডাকঘরের বাঁদিকে রাস্তার ঠিক পাশে নজরে পড়ল একটা মাচা। ছেলেমানুষী মাচার মতো, ছ'সাতটা ছোট ছোট কাঠের তক্তা পেতে সেটা করা হয়েছে। মাচার ওপরে একটা শতচ্ছিন্ন চটের বেড়া। মাচাটা প্রায় ৯/১০ ফুট উঁচু হবে। মাচার ঠিক নীচেই পথিকের নজরে পড়বে জমাট বিষ্ঠার পাহাড়, কেউ একটু অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটলেই তার মধ্যে পড়ে যাবে।

এ সত্ত্বেও শহরের লোকগুলো টিকে আছে, কয়েকবার কলেরা বসন্তের মহামারী হয়েও এদের নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। শহরবাসীরা এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। চৌরাস্তার পর আরও একটি রাস্তায় পড়লাম, সে রাস্তায় পড়েই আমি অবাক হলাম;

নোংরামির চূড়ান্ত রাস্তার দু'ধারে। ঘরবাড়ী থেকে বছরের পর বছর ধরে রাস্তার উপর আবর্জনা ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে, আর তারই ফলে রাস্তাটা আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে উঠেছে। আমি গুণে গুণে এগারোটি বাড়ী দেখলাম যাদের ঘরে ঢুকতে হলে রাস্তা হতে চারটি সিঁড়ি নামতে হবে।

তবে রাখে হরি মারে কে? তিব্বতের ঠাণ্ডা বাতাসে সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু যায় জমে, যার ফলে দুর্গন্ধটা যতটা হওয়া দরকার ততটা নয়। সামনেই অরূপ সৌন্দর্যের প্রতীক তুষার ধবল চোমলহরি আর তারই পদতলে ছড়িয়ে রয়েছে পৃথিবীর অন্যতম জঘন্য শহর। কনট্রাস্ট আর কাকে বলে।

ফারি তিব্বতী শব্দ। এর বাংলা করলে বুঝাবে শূয়ার, নামের দিক থেকে বিচার করলে বলতেই হবে যে এর চেয়ে যোগ্য নাম আর হতে পারে না। গুরুজী এসব দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, আমার অনুন্নত পাপী মন হয়তো এ নরক দেখতে বাধ্য হয়েছে, সত্যি জগৎটাই অদ্ভূত যেখানে স্বর্গ সেখানেই যেন নরক।

'নমস্কার জী'! হঠাৎ হিন্দী শব্দে সেদিকে তাকাতে বাধ্য হলাম। আমাদের পেছনে কম্বলে সমস্ত শরীর জড়িয়ে এক ভদ্রলোক সহাস্যে দাঁড়িয়ে আছেন। চেহারা ও পোশাক দেখেই বুঝলাম যে তিনি তিব্বতী নন। গুরুজী তার দিকে তাকিয়ে বললেন—'নমস্কার'। আমিও মৃদু হেসে তার দিকে তাকালাম। ভদ্রলোক গুরুজীকে উপেক্ষা করে আমার দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমাকে দেখে খুব অল্প বয়েস বলে মনে হচ্ছে। তুমি কি হিন্দুস্থান হতে আসছো?

আমি উত্তর দেবো কি না ভাবছি, কিন্তু আমার হয়ে গুরুজীই উত্তর দিলেন—আমরা নেপাল হতে আসছি, এই ছেলেটি আমার শিষ্য।

—ওঃ! তাই বলুন, আমি ভেবেছিলাম ও হিন্দুস্থানী। তা আপনারা কোথায় যাবেন? ভদ্রলোক আলাপ শুরু করলেন।

—আমরা বেরিয়েছি তীর্থ ভ্রমণে।

—কোথায় কোথায় যাবেন?

—ভগবান জানেন, আপাততঃ গীয়াৎসের পথে।

—আপনাদের ভাগ্য ভাল, নেপালী বলেই পারমিশন পেয়েছেন, আজকাল মনে হয় ভারতীয় সাধুদের আসা বন্ধ হয়ে গেছে।

এবার গুরুজী তাকে পালটা প্রশ্ন করতে লাগলেন—আপনি কি হিন্দুস্থানী, এখানে কি করেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি এখানে উলের ব্যবসা করি। এখান থেকে উল কিনে ভারতে পাঠাই আর সেখান থেকে সামান্য কিছু মাল খরিদ করে এখানে বিক্রী করি। এটা আমার নিজের ব্যবসা নয়, মালিকের হয়ে কাজ করি, মালিক থাকে সিকিমে।

ভদ্রলোক আলাপী, তিনি সমস্তিপুরের লোক, এখানে চার বছর যাবৎ আছেন, বছরে একবার দেশে যান। কথায় কথায় তিনি জানালেন যে আজকাল ব্যবসা মোটেই ভাল চলছে না। এ অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্য বলতে গেলে আস্তে আস্তে চীনারা দখল করে

ভগবান বলেছেন—দেহই দুঃখের কারণ, মন সেটা প্রকাশ করে মাত্র। দুঃখ আছে,

ও-পা-মে বা অমিতাভ বুদ্ধ

শাক্য-থুপ বা শাক্য মুনী

চেন্-রে-জি বা অবলোকিতেশ্বর

ঐশ্বর্য প্রদায়িনী মহাজ্ঞানী আর্য-তারা

ভগবান বুদ্ধের এই চার প্রকার রূপ তিব্বতের সর্বত্রই চোখে পড়ে।

আর দুঃখের মুলে আছে তার কারণ। দুঃখটাকে নাশ করতে হলে নাশ করতে হবে তার কারণ।

আমরা আজ হিমালয়ের দুর্গম পথ অতিক্রম করে পৌঁছেছি তিব্বতে, পৃথিবীর ছাদে। এখানকার মতো শুদ্ধ বাতাস আর নেই, এমন পবিত্র ভূমি আর দ্বিতীয় নেই। যদিও প্রচণ্ড শীতে আমাদের কষ্ট হচ্ছে তবুও এই শান্ত নীরবতা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এই পবিত্র ভূমিতে বসে গভীরভাবে চিন্তা কর আমার কি কোনো দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ কি? দুঃখটা আধিভৌতিক, আধিদৈবিক না আধিআত্মিক? চিন্তা কর, ভেবে দেখো, তুমি যদি সম্পূর্ণ ভাব ও বিশ্বাস দিয়ে জানতে চাও তাহলে পদ্ম সম্ভবা নিজে আসবেন তোমাকে সাহায্য করতে।

লামারা প্রত্যেকেই জ্ঞানী, সবাই বলতে গেলে দার্শনিক। গুরুজী এ পর্যন্ত পথ প্রদর্শক ছিলেন, আজ সকালে তিনি হঠাৎ ভূমিকা নিলেন গুরুর। নদীর ধারে সকলকে বসিয়ে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন কি করতে হবে। এখন সকাল, রোদের তেজটাও আস্তে আস্তে বাড়ছে। নদীর কাছেই আমরা পেলাম ছোট্ট উষ্ণ প্রস্রবণ, নদীর কাছেই ছোট্ট এই কুয়োর মতো জায়গাটায় জল জমে আছে, জলে হাত দিয়ে দেখি কি অদ্ভুত, এই চারদিকে বরফের রাজত্বে আমাদের জন্য কে যেন গরম জল করে রেখেছে। জলের তাপমাত্রা মনে হয় শরীরের তাপমাত্রার চেয়ে দু'এক ডিগ্রী বেশীই হবে। তারই ধারে বসে আমরা ধ্যানে মগ্ন হলাম।

ঘন্টাখানেক বাদে আমাদের ধ্যান ভাঙার পর, আমরা সকলে মিলে উলঙ্গ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম সেই জলে, আ! কি আনন্দ। প্রায় দেড়মাস পর এই প্রথম গায়ে জল পড়ছে, চারদিকে বরফ এটা বরফেরই দেশ, আর তারই মধ্যে আমরা উলঙ্গ হয়ে স্নান করছি, প্রকৃতির কি অদ্ভুত খেলা। গুরুজী আমাদের হুঁশিয়ার করে দিলেন, এরপর আমাদের স্নান আর হবে কি না সন্দেহ, কাজেই ভালোভাবে স্নান করে নাও। আমরা স্নান করে যেন নবজীবন পেলাম। সেই প্রস্রবণের ধারেই আমরা রান্না আরম্ভ করলাম। গতকাল নীয়াং-চু গুম্ফা ছাড়ার পর আমরা রাত্রিবেলা একটা ভাঙা বাড়ীতে কাটিয়েছি, রাতে খাওয়াও কিছু হয়নি কাজেই আমরা প্রত্যেকই ক্ষুধার্ত। কাঠ আমাদের সঙ্গেই ছিল। গুরুজী সকলকে সাবধান করে দিলেন—এই প্রস্রবণের জলটা দেহের পক্ষে ভাল কিন্তু খাবার জন্য নয়, এই জল খেলে বদহজম ও পেটে গণ্ডগোল হবার সম্ভবনা আছে। এই জলে গন্ধকের পরিমাণটা খুব বেশী।

কাছেই গীয়াৎসে, অনেকে গীয়ান্‌সে বা গীয়াচ্চেও বলে অভিহিত করে। পাহাড়ি পথে চলতে চলতে গুরুজী সবাইকে হঠাৎ অপেক্ষা করতে বললেন, তারপর পাহাড়ের অবস্থান ঠিক করে আমাদের ঘোষণা করলেন—খুব শীগগীরই আমরা গীয়াৎসে শহরে ঢুকবো। সেখানে ঢোকার পথেই হান্‌দের চৌকি পেরোতে হবে, তোমরা ধৈর্য ধরে থাকবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর যাতে আমরা ভালোভাবে এই শেষ চৌকিটা পেরোতে পারি।

গুরুজীর কথায় আমরা খুবই উৎসাহিত হলাম। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পাবো তিব্বতের অন্যতম ঐতিহ্যমণ্ডিত শহর। তিব্বতের তিনটি শহর ব্যবসা বাণিজ্য ও

চলার কৌশল

আমরা এগিয়ে চললাম তিব্বতের কেন্দ্রের দিকে অর্থাৎ উত্তর দিকে। চোমলহরি পর্বতচূড়া আমাদের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে লাগল। পাহাড়ের ওপর থেকে তার প্রকৃত রূপ দেখা যায় না। সত্যিকারের পাহাড়ের রূপ ধরা পড়ে দূর থেকে। আমাদের সামনে এখন চোমলহরির এক অনবদ্য রূপ দেখা দিয়েছে, কয়েক দিন যাবৎ আমরা তা লক্ষ্য করেছি—অবশ্য লক্ষ্য না করে উপায় নেই। এ পথের পথিকদের মনে হয় সেটাই একমাত্র উপভোগ্য বস্তু। হিমালয়ের অনেক শৃঙ্গ দেখেছি এখন দেখছি চোমলহরিকে, লাসার পথে হিমালয়ের এ রূপ যার চোখে পড়বে না সে অন্ধ, পাহাড়কে একবার দেখলে তার রূপ সত্যিকারের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে না, তাকে দেখতে হয় বার বার. সূর্যোদয়ে রাঙিয়ে ওঠে তার চূড়া—সেখান হতেই শুরু হয় দর্শন। তারপর আস্তে আস্তে সেই আলোর ছটা ছড়িয়ে পড়ে তার সর্বাঙ্গে—ধরা পড়ে তার অবয়ব। সূর্যের গতির সাথে তার রূপ আর স্বভাবের যেন পরিবর্তন হয়। প্রতিমুহূর্তেই চোমলহরির চেহারার পরিবর্তন আমাদের চোখে পড়ছে, কখনও ভয়ংকর, কখনও শান্ত, কখনও স্নিগ্ধা মাতৃমূর্তি, পরক্ষণেই বজ্রধারী রুদ্ররূপী, মনে একটু কল্পনার কালি ছোঁয়ালেই হল, মনে হয় বুদ্ধের যতগুলো রূপের কল্পনা করা যায় তার সবই পাওয়া যায় এই চোমলহরির মধ্যে। এই ভয়ংকর নিঃশব্দ আর ঠাণ্ডার মধ্যে চোমলহরি পথিকদের যোগায় উৎসাহ আর তার রূপের আকর্ষণে এগিয়ে চলে তীর্থযাত্রীর দল। তাইতো অনন্তকাল ধরে তীর্থযাত্রীরা অক্লান্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও এগিয়ে চলেছে এ পথে। তার ডাকে শত বাধা তুচ্ছ করে আমরাও এগিয়ে চলছি।

বিকেলের দিকে ঠাণ্ডাটা আরও বাড়তে লাগল—পড়ন্ত সূর্যের সোনালী আভায় যখন চোমলহরির তুষার ধবল শৃঙ্গ (৪৭০০ মিটার) মায়াবী মূর্তি ধারণ করেছে, ঠিক সেই সময়ই যেন আমাদের সর্বশরীরে তুষারের ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকতে আরম্ভ করল। সূর্যাস্ত হল আর তার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ যেন ঠাণ্ডায় আমাদের দেহ অবশ হয়ে এল। হঠাৎ বাতাসটা আরও জোরে বইতে লাগল। এ অবস্থার জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না, গ্যাংটক থেকে নাথু-লা পার হবার সময়ও আমরা এত ঠাণ্ডা পাইনি। কম্বলগুলো খুলে যে যার গায়ে জড়িয়ে নিলাম। রাস্তায় যে উলের মোজা আমরা কিনেছিলাম সে মোজাও আমরা পরতে বাধ্য হলাম। কিন্তু মোজা পরার পর দেখা দিল আর এক সমস্যা, এত পুরু মোজা পরে কিছুতেই জুতোর মধ্যে পা ঢোকানো সম্ভব

নয়—অর্থাৎ এই ধরনের মোজার জন্য চাই উপযুক্ত তিব্বতী জুতো। আমাদের মধ্যে চার পাঁচ জনতো শীতে রীতিমতো কাঁপতে আরম্ভ করে দিয়েছে। গুরুজী সব দিক বিচার করে আমাদের আগুন জ্বালাতে পরামর্শ দিলেন। একটা বিরাট পাথরকে আড়াল করে আমরা দাঁড়ালাম, জ্বালানী কাঠ সঙ্গেই ছিল। এখন পরিষ্কার বুঝলাম যে কেন এই কাঠ কেনা হয়েছিল। সেই অবস্থায় আগুনটা যে উপকারে লাগল তা লিখে বোঝাতে পারবো না।

আগুন পোহাবার জন্য আমাদের বেশ কিছু দেরী হয়ে গেল, গুরুজী আপসোস করে বললেন—আমাদের আরও আগে বেরোনো উচিত ছিল। এই অঞ্চলে কোন জনমানবের চিহ্নও নেই কাজেই আমাদের হাঁটতেই হবে। আমাদের শ্বাসকষ্ট দেখা দিল, বসলে বাতাসের ঠাণ্ডা আর দাঁড়ালে মনের ভেতরের ঠাণ্ডা, আমাদের চলা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। আরও দু'বার আমরা আগুন জ্বালিয়ে শরীরটাকে গরম করে নিলাম। এই সময় গুরুজীর উৎসাহ ও মনোবল দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমরা এইভাবে যদি হাঁটতে থাকি তাহলে মনে হয় প্রত্যেককেই এ পথে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে হবে।

কিন্তু রাখে হরি মারে কে? গোধূলির অল্প আলোয় হঠাৎ আমাদের নজরে পড়ল একটি তাঁবু, ঠিক রাস্তার ধারেই। জলে ডোবার আগে লোকে যেমন একটা ভাসমান পাতাকেও আঁকড়ে ধরে বাঁচবার আশায়, আমরাও ঠিক তেমনি এগিয়ে গেলাম তাঁবুটার দিকে একটু আশ্রয়ের জন্য। তাঁবুটাকে ঠিক তাঁবু না বলে রোদ ঠেকাবার সামিয়ানা বলা যেতে পারে, অর্থাৎ চারদিক খোলা। আমি ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখলাম যে আমাদের এই বত্রিশজনের দল যদি এই তাঁবুটার মধ্যে শুধু দাঁড়িয়ে থাকতে চায় তাহলেও এতে স্থান হবে না, বসাতো দূরের কথা। আমাদের দেখে তাঁবুর ভেতর থেকে খক্ খক্ করে কাশতে কাশতে বেরিয়ে এল দু'জন লোক। গুরুজী তাদের সাথে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। আমার সাধারণ বুদ্ধিতে এই প্রথম মনে হল যে গুরুজীর মতিভ্রম হয়েছে, যে তাঁবুর মধ্যে এতগুলো লোকের ঢোকা অসম্ভব, সেখানে আশ্রয় চাওয়ার কোন মানে হয় না। তবে আমাদের দলের প্রত্যেকটি লামাই দেখলাম এই ব্যাপারে একদম চুপচাপ। আমি যদি মৌনী-বাবা না হতাম নিশ্চয়ই তর্কের ঝড় তুলে এক তীব্র প্রতিবাদ করতাম। গুরুজীর সাথে তাদের কি কথা হল জানি না তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার আগুন জ্বালানো হল। সেই আগুনের উপর যাযাবর লোকটা একটা পুরোনো অ্যালুমিনিয়মের হাঁড়ি চাপালো, তাতে ভর্তি করা হল জল। এই যাযাবার পরিবারটি এই অঞ্চলের, এই ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে এদের ছোটবেলা থেকেই পরিচয় আছে, বাতাসের ধরন দেখেই এরা বুঝতে পারে এর উৎস। তীর্থযাত্রীদের কষ্ট শুনে এরা বলল সেটাই স্বাভাবিক। দুপুরবেলা খাওয়ার পর ঠাণ্ডা বাতাসে বেরোনো ঠিক নয় কারণ অনেকক্ষণ হাঁটার পর দেহ গরম হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত হাঁটলে দেহটা উপযুক্ত পরিমাণে গরম হয় আর সেই সময় শরীর সহজেই এই বাতাস সহ্য করতে পারে।

এই অঞ্চলে সব সময় এত ঠাণ্ডা বাতাস বহে না। কয়েকদিন আগে চোমলহরির

জমাট বরফের একটা বিরাট ধস নীচে নেমে এসেছে, আর মৃদু বাতাস তার উপর দিয়ে এসে পড়ছে এই অঞ্চলে। এখন যতদিন পর্যন্ত না বরফ গলে ততদিন পর্যন্ত এই বাতাস বইতে থাকবে। গুরুজী বললেন যে এখন এখানকার তাপমাত্রা বরফ পড়ার মান ছাড়িয়ে অনেক নীচে নেমে এসেছে, অর্থাৎ বরফ পড়া মানে এই কন্‌কনে ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া। আমাদের যে ঠাণ্ডা লাগছে সেটা আসছে পায়ের থেকে, পায়ের ঠাণ্ডাটাই মাথায় উঠছে।

এর মধ্যে জলটা গরম হলে সেই জলে কিছু শেকড় ও মাখন ফেলে দেওয়া হল। শেকড়টাকে বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ সেদ্ধ করা হল, তারপর আমরা চা-এর মতো করে সেই জল পান করতে লাগলাম ও সেই সাথে আগুনে পা-গুলোকে ভালোভাবে গরম করে নিলাম। এই চা-টাকে আমি গরম আদা জলের সঙ্গে তুলনা করবো, চা খাওয়ার সাথে সাথেই শরীরটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। চা মন্ত্রের মতো কাজ করল।

পরে বুঝলাম যে এই চা-ই হচ্ছে এই পরিবারটির বৈশিষ্ট্য। পথিকদের চা বিক্রি করাই তাদের পেশা। শিকড় দিয়ে যে চা আমাদের জন্য তৈরী করেছে সেটা অবশ্য খুবই দামী চা, গরীবেরা তা কিনতে পারে না। বত্রিশজনের জন্য কম করেও চল্লিশ গ্লাস জল, তার সঙ্গে দামী বিশেষ শেকড়, সামান্য চা আর মাখন। দাম পড়ল মাত্র তিন টাকা। আমাদের কাছে খুবই সস্তা, কিন্তু গুরুজীর মতে খুব চড়া দামে ছেড়েছে। জানি না শিকড়টার কি গুণ লুকিয়েছিল, কিন্তু আমি হলপ করে বলতে পারি যে এটা এর ঔষধ-গুণ। রক্তকে গরম করার এমন অব্যর্থ ঔষধ আমার কল্পনার অতীত। তিব্বতী যাযাবররা এই ধরনের অনেক টোটকা ঔষধ জানে।

আবার চলার আগে, গুরুজী আমাদের রাতে চলার এক চমৎকার উপায় বলে দিলেন। তিনি বললেন যে, সরাসরি উত্তর দিকে আমাদের চলতে হবে। রাস্তা অন্ধকার আর পাথরে ভর্তি তাই তিনি উত্তর দিকের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জ দেখিয়ে দিয়ে আমাদের সেদিকেই চলতে নির্দেশ দিলেন, অন্য কোন দিকে আমরা যেন নজর না দিই। আমরা যদি নিজেদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাই তাহলেও হারাবার সম্ভাবনা নেই। ওই তারার প্রতি নজর রাখলেই হবে। কতদূর বা কোথায় আসতে হবে সেটা তিনি ঠিক সময় মতো বলে দেবেন। তিনি বার বার সাবধান করে দিলেন—আমরা মুখ দিয়ে যেন নিঃশ্বাস না নিই। তবে প্রয়োজনবোধে নাক দিয়ে টেনে মুখ দিয়ে ছাড়তে পারি। তিনি সকলকে নির্দেশ দিয়ে এগিয়ে গেলেন, আমি রইলাম ঠিক তাঁর পেছনে, ছায়ার মতো। কম্বলটাকে গুটিয়ে আবার আমরা কাঁধে ঝুলিয়েছি প্রয়োজনবোধে ব্যবহার করা হবে।

রাত্রি বেশ হয়েছে, ক'টা বাজে কে জানে, কারও কাছে ঘড়ি নেই। এত শীত কিন্তু তাপমাত্রা মাপবার কোন যন্ত্র আমাদের নেই, আর কত মাইল আছে তাও জানি না। তবে রেপ্‌তেনজী বলেছেন যে আমরা এখন চোমলহরি পাহাড়ের ঠিক নীচেই রয়েছি। এখান থেকে পাহাড়ি রাস্তাটা উপরের দিকে উঠে গেছে, একটা পাহাড় ডিঙোতে হবে। এটাই হিমালয়ের শেষ ধাপ, তারপরেই আমরা পাব তিব্বতের সমতলভূমি। এই

রাস্তাটার সর্বোচ্চ অংশে রয়েছে গিরি কন্দর বা পাশ। তারই কাছাকাছি আমাদের রাত কাটাতে হবে। এ পর্যন্ত আমি গুরুজীকে আমাদের যাত্রা পথের কোন রকম পরিকল্পনা জিজ্ঞাসা করিনি, অর্থাৎ কোথা দিয়ে কোথায় যাবো। আমাদের এই তীর্থের শেষ কোথায়, কতদিন এ দেশে থাকবো—এ সবের আমি কিছু জানি না, অন্ধের মতো গেশে রেপ্‌তেনকে অনুসরণ করে চলেছি।

চারদিকে নিঃশব্দ, এ অঞ্চলে গাছপালা প্রায় নেই বললেই চলে। আমাদের সামনে-পেছনে, ডান-বাঁয়ে হালকা অন্ধকারের এক দেয়াল। বড় বড় পাথরগুলো মাঝে মাঝে চোখে পড়ে আর ছোটগুলোতে হোঁচট খেতে খেতে আমরা এগিয়ে চলেছি। সেই নিঃশব্দের মধ্যে মাঝে মাঝে লামাদের শ্বাস-প্রশ্বাস শোনা যাচ্ছে। ঠাণ্ডা বটে কিন্তু আকাশ পরিষ্কার, তারার অভাব নেই। আকাশের দিকে নজর দিয়ে চলেছি, অসংখ্য তারা দিয়ে যেন আমাদের পথটাকে আলোকিত করা হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে আমাদের রাস্তার দু'পাশে যেন হাজার তারা ছড়িয়ে তাকে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। তারা দেখে দেখে চোখটা অভ্যস্ত হয়ে গেল, যেন রাস্তার উপরেও আমরা তারার মেলা দেখতে পেলাম। অন্ধকার এখন চোখে সয়ে গেছে। লক্ষ তারার আলোয় লুকিয়ে থাকা অন্যান্য তারাগুলোও আমাদের চোখে একে-একে ধরা পড়তে লাগলো, ঠাণ্ডাটাও এখন কম লাগছে। রাস্তায় চলার মধ্যে পেয়েছি অতি ধীর এক ছন্দ, চারদিকের স্তব্ধতা আমাদের সেই ছন্দের সঙ্গে যেন তাল মিলিয়েছে। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি—জানি না সেই অনুভূতি কি আনন্দের না স্তব্ধতার অনুভব মাত্র। সমস্ত শরীর মনে হচ্ছে যেন হালকা হয়ে এসেছে, মেঘের উপর দিয়ে আমরা যেন এক স্বর্গীয় আনন্দ উপলব্ধি করে চলেছি অনন্তকাল ধরে মহাতীর্থের পথে।

কতক্ষণ ধরে চলেছি তার ঠিক নেই, হঠাৎ কানে এল এক সুন্দর সুর। আমরা সকলেই কান খাড়া করলাম—ঠিক, ভুল নয়। এ অতি পরিচিত গুরুজীর কণ্ঠ। আমরা দাঁড়ালাম, তারপর গুরুজীর কণ্ঠের সাথে সুর মিলিয়ে আমরাও আবৃত্তি করতে লাগলাম, নিঃশব্দ রজনীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উদ্দেশ্যে। গুরুজী বললেন—আমরা এখন তাংলাতে এসে পৌঁছেছি। তাংলা থেকে চোমলহরি পর্বতশৃঙ্গ খুব কাছে। এই পথের এটাই সবচেয়ে উঁচু অংশ, এবার আমরা আস্তে আস্তে নীচের দিকে যাবো। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা পৌঁছবো পরবর্তী শহর তুংলাতে।

একটু বিশ্রাম করে আমরা আবার রওনা হলাম। আকাশের তারাগুলো ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হতে লাগলো, বুঝলাম ভোর হতে আর দেরী নেই। সারারাত ধরে হেঁটেছি; মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমরা এই অংশটা পাড়ি দিয়েছি। তারার দিকে তাকাতে তাকাতে আমরা আমাদের দেহের ক্লান্তি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। এই ধরনের চলা একমাত্র নিঃশব্দতার মধ্যেই সম্ভব। মনকে দূরের তারার সাথে একাগ্র নজরে রেখে যদি চলা যায়, তাহলে মন দেহের ক্লান্তিকে তুচ্ছ করার ক্ষমতা পায়। আমাদের এই চলাই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তিব্বতী সাধুরা এবং তীর্থযাত্রীরা এই কৌশলের সাথে খুবই পরিচিত।

এই কৌশল না জানলে চোমলহরির এই পথ এত তাড়াতাড়ি পাড়ি দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার ছিল।

ভোরবেলার দিকে পাহাড়ি রাস্তার শেষ অংশটা পেরোতেই আমাদের সামনে একটি সুন্দর দৃশ্য দেখলাম। পাহাড়, বরফ আর তার উপর সোনালী আভার এক নয়নাভিরাম দৃশ্য, অনেকটা দার্জিলিং-এর টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয়ের দৃশ্যের মতো।

লাসার পথ এখন আমাদের কাছে মুক্ত, আমাদের সামনে এখন সমতলভূমি। সমতল অবশ্য নামে মাত্র, পাহাড়ি অঞ্চলে খুব বেশী ওঠা নামার রাস্তা না হলেই তাকে বলে সমতল। আসল কথা হচ্ছে যেএখান থেকে লাসার পথে আর কোন বিরাট পাহাড় পড়বে না। এখান থেকে উত্তরে ধুধু কুয়েল্ লান্ পর্বত। সুখের বিষয় যে সেটাকে আর আমাদের পার হতে হবে না।

তিব্বত এখন আমাদের কাছে এমন সহজ হয়ে এসেছে যে ঠাণ্ডা বাতাস, এখানকার লোকজন আর খাবারের সাথে নিজেদের আস্তে আস্তে খাপ খাইয়ে নিয়েছি, পথও আজকাল আগের মতো কষ্টকর নয়। পথটা সহজ পেয়ে আমাদের চলাতেও খুব উৎসাহ এসেছে। ফারির পর আমরা আরও কয়েকটি ছোট শহর পেলাম, এক রাত্রি করে প্রত্যেক জায়গায় বিশ্রাম করে ছ'দিনের দিন দুপুরের দিকে আমরা এসে পৌছলাম সামাদা নামক একটি শহরে। ফারির পর যে সব শহরগুলো পার হয়েছি তাদের নাম যথাক্রমে তূনা, রাম, দোসেন, এদের মধ্যে দোসেনকেই বলা যেতে পারে শহর। চলার পথে আর একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, এখানে রাস্তার সংখ্যা খুবই কম। আমাদের দেশে যেমন বড় রাস্তার সাথে প্রায়ই ছোট ছোট রাস্তা বা হাঁটা পথ নজরে পড়ে, এখানে সে রকম কিছু নেই, মাঝে শুধু যাযাবরদের সাথে দেখা হয় বটে তা ছাড়া জনবসতি খুবই কম।

সামাদা দোসেনের মতোই একটি শহর, ফারির তুলনায় খুবই ছোট বলতে হবে। এই পর্যন্ত রাস্তায় ইলেকট্রিক চোখে পড়েনি। যানবাহনের মধ্যে কয়েকটি মিলিটারী চীনা জীপ নজরে পড়েছে। লরি, মোটর বা বাস মনে হয় এ অঞ্চলের লোকেরা কোনদিনই দেখেনি। রেলগাড়ীর তো প্রশ্নই নেই। সামাদা শহরে ঢোকবার পথেই একটা সাদা দোতলা বাড়ী আমাদের চোখে পড়ল, বাড়ীটার চারদিকে রঙিন কাগজ ও কাপড় দিয়ে সাজানো। আরও কাছে আসতেই দেখি ঠিক তার সামনে একটা সামিয়ানা গোটানো রয়েছে, নিশ্চয়ই কোন উৎসবের আয়োজন হয়েছে। সামিয়ানার সামনে রাস্তার উপরে বসে আছে বেশ কিছু লোকজন ও ভিখিরি, আর তার পাশেই একটা বাজনার দল। বাজনার মধ্যে রয়েছে দুটো চোঙা-ভেরী, একটা ভাঙা বিরাট খঞ্জনী আর একটা একমুখো ঢোল। আমাদের কাছে আসতে দেখেই রাস্তার উপর থেকে তারা জিভ বার করে নমস্কার জানিয়ে দুধারে হাসিমুখে সরে দাঁড়ালো। আমরাও তাদের হাসিমুখে শুভেচ্ছা জানিয়ে এগিয়ে চললাম। বাড়ীটা পেরিয়ে কিছুদুর এসেছি এমন সময় পেছন থেকে কয়েকটি লোক আমাদের দিকে দৌড়ে এল, তাদের দেখে আমরা দাঁড়ালাম।

তাদের মধ্যে একজন খুব ভক্তিভরে আমাদের প্রণাম জানিয়ে অতি বিনয় সহকারে আমাদের বলল,

—দয়া করে আপনারা আমাদের বাড়ীতে আসুন, বাড়ীর মালিক আপনাদের ডাকছেন।

তার কথা শুনে গুরুজী জিজ্ঞাসা করলেন—কেন কি ব্যাপার। উৎসব নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার বোনের বিয়ে, বাবা আপনাদের ডাকছেন।

আমরা তার কথা শুনে নিজেদের মধ্যে চোখ চাওয়া-চাও'ই করলাম মাত্র তারপর রাজি হয়ে গেলাম।

তার সাথে সেই বাড়ীতে এসে হাজির হলাম। দরজার সামনেই সেই ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দেখেই তিনি গড় হয়ে প্রণাম করলেন, তার দেখাদেখি অন্য সকলেও। রাস্তার উপরই তিনি একটি সতরঞ্চি বিছিয়ে দিয়ে আমাদের বসতে দিলেন। গুরুজীর আশ্বাস পেয়ে আমরা সকলেই বসলাম।

ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন তিনি এই অঞ্চলেরই একজন জমিদার। তাঁর বড় মেয়ের বিয়ের দিন আজ, আর সৌভাগ্যক্রমে আজই তিনি এই সাধু তীর্থযাত্রীদের দর্শন পেয়েছেন। ভগবানের অশেষ কৃপাবলে তাঁর মেয়ের এই সৌভাগ্য উপস্থিত। ঠিক বিয়ের দিনে এতগুলো সাধুদের আশীর্বাদ পাওয়া খুবই দুর্লভ। তিনি তাই আমাদের সকলকে সেখানে থাকতে বললেন। দুপুরবেলা গুরুজীকে খেতে হবে আর তার পরিবর্তে মেয়েকে সুখী ও দীর্ঘজীবনের জন্য আশীর্বাদ করতে হবে।

এই মুহূর্তে অন্যান্য লামারা কি ভাবছেন আমি জানি না। তবে আমার কাছে এ এক সুবর্ণ সুযোগ। তিব্বতে ঢোকা অবধি শুধু রাস্তা ও মঠ দেখে দেখে একঘেয়েমী লেগে গেছে। এ সুযোগ না হারানোই ভাল। আমাদের এই তীর্থযাত্রীরা তিব্বতের সমাজ ও লোকজনদের প্রতি একেবারেই উদাসীন, তাদের লক্ষ্য অন্যদিকে। আমি কিন্তু তাদের মতো নই অন্ততঃ এখনও সেই অবস্থায় পৌঁছাইনি, কাজেই এমন সুযোগ আমার কাছে সত্যি লোভনীয়। গুরুজীর লাভ হচ্ছে দুপুরবেলার খাওয়াটা। তাতে খাওয়ার হাঙ্গামা ও খরচ দুইই বাঁচবে। তিনি যতদূর সম্ভব খরচ ও খাওয়া দাওয়ার হাঙ্গামা বাঁচিয়ে চলছেন। তাঁর মতে প্রথমের দিকে যত বাঁচাবে পরের দিকে ততই লাভবান হবে।

এই প্রথম দেখছি তিব্বতী সম্ভ্রান্ত পরিবারকে। পুরুষদের ঢিলে-ঢালা পোশাক আর মেয়েদের পোশাকটা, সিকিমিদের মতো অনেকটা, অর্থাৎ পরনে লম্বা বাকু। তবে নতুনত্বের মধ্যে দেখলাম ওদের চুলের বাহার। ছোট্ট কাঠের ফ্রেম দিয়ে মাথার উপরে চুলটাকে ছড়িয়ে বাঁধা হয়েছে অনেকটা চূড়ার মতো। সবাই খুব হাসি খুশী। ওদের পোশাকেই আভিজাত্যের চিহ্ন। রাস্তার লোকেদের সাথে এদের তফাৎটাও অনেক। মনে হয় বিয়ে বা কোন রকম উৎসবের সময়ই এই ধরনের পোশাক ব্যবহার করে।

গৃহকর্তা কিছুক্ষণ পরে আমাদের কাছে এলেন। তারপর নীচু স্বরে কি যেন জিজ্ঞাসা করলেন, গুরুজী কথাটা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে তারপর গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়ে সম্মতিসূচক উত্তর দিলেন। বাড়ীর ঠিক পেছনেই একটা তাঁবু খাটিয়ে রান্নার বন্দোবস্ত

হয়েছে। বিয়ে বাড়ীর অধিকাংশ লোকজনই সেখানে ভিড় করে আছে, বিয়ে বাড়ীর প্রাণকেন্দ্র মনে হয় সেখানেই রয়েছে। যুবক যুবতীরা হাসাহাসি করছে, ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করছে, আর বয়স্করা বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও সাহায্য করবার জন্য ব্যস্ত।

তিব্বতী মেয়েদের চুলের বাহার

আমাদের বুঝিয়ে দেওয়া হল যে বাজারে চাং আনবার জন্য লোক পাঠানো হয়েছে। চাং আসলে চা নয়, এর মধ্যে কণামাত্র চা-ও নেই। তিব্বতের খুব প্রিয় একটি ঠাণ্ডা পানীয়, উৎসব ও বিশেষ দিনে এর চাহিদা আরও বেশী। চাং তৈরী হয় বার্লি থেকে। বার্লির পাঁচন থেকে এটা তৈরী হয় বলে এর মধ্যে মাদকতা আছে—অনেকটা আমাদের দেশে যেমন তালের রস থেকে তৈরী হয় তাড়ি। চ্যাং বা চাং খাওয়াতে দোষ নেই; ছেলে-মেয়ে, বাপ-মা, দাদু-দিদিমা সবাই এক সাথে বসে চাং খেতে পারে। কোলের শিশুদেরও ঝিনুকে করে চাং খাওয়ানো যেতে পারে, তাতে নাকি শিশুদের ভালো ঘুম হয়। সমাজের সকল পর্যায়ের লোকেরাই এটা পছন্দ করে, এমনকি লামারাও। তবে লামাদের মধ্যে দালাই লামা সম্প্রদায় অর্থাৎ গেলুক্‌পা পন্থার লামারা এই চাং খান না। প্রায় একঘণ্টা বসার পর দেখলাম একটা কুলির পিঠে করে বিরাট একটা টিন এল, বুঝলাম এরই মধ্যে আমাদের পানীয় এল।

গুরুজী বুঝিয়ে দিলেন যে আমরা তীর্থযাত্রী, আসছি বহুদূর থেকে। তীর্থযাত্রীদের মধ্যে সাধুরাই হচ্ছে সেরা, তাদের সেবা করা একটা বিরাট কর্ম, কাজেই তাদের এই

আগ্রহকে উপেক্ষা করা ভাল নয়, তাতে চলার পথে বিঘ্ন আসতে পারে। গৃহকর্তা এসে আমাদের জানালেন জলখাবার প্রস্তুত, আর সেই সাথে তিনি অতি বিনীতভাবে নিবেদন করলেন—আমাদের পরিবারের একান্ত ইচ্ছা যে আপনাদের পাদোদক ধরে রাখি। আপনারা ভগবান বোধিসত্ত্বের দেশ থেকে আসছেন, এ সুযোগ তো আর আমাদের সব সময় হয় না। আশা করি আপনারা এ অধমের প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন। আপনারা ঠিক এমন শুভদিনে এসে পৌছেছেন, সবই ভগবান চেন্‌রেজির ইচ্ছা।

আমরা সকলে গুরুজীর দিকে তাকালাম, পাদোদক কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। তিনি আমাদের বুঝিয়ে বললেন—আমরা হচ্ছি অতি পুণ্যবান মহাত্মা, ভারত হতে যেসব সাধু তীর্থযাত্রীরা আসেন এদের কাছে তারা সত্যিকারের পুণ্যাত্মা। এখন এই ভদ্রলোক আমাদের পাদোদক চাইছেন, মানে আমাদের পা ধোয়ানো জলটা রেখে দেবেন। সেই জলটাকে ঠিক গঙ্গাজলের মতোই বিভিন্ন পবিত্র কাজে ব্যবহার করবেন, প্রয়োজনবোধে অসুখ-বিসুখের সময়ও পান করা যাবে। তিব্বতে এই ধরনের পাদোদক খুবই প্রচলিত।

এই ব্যাখ্যা শুনে আমরা রাজি হয়ে গেলাম অবশ্য গররাজি হওয়ার তো কোন প্রশ্নই নেই। আমার মন কিন্তু তাতে সম্পূর্ণ রাজি হল না। চরণামৃত দেওয়া একমাত্র দেবতা ও সৎগুরু ছাড়া সম্ভব নয়। এই লামাদের মধ্যে আমি হচ্ছি এক নম্বরের ভণ্ড। তিব্বতের হাজার হাজার বালক সন্ন্যাসীদের যে কেউ আমার থেকে অনেক পবিত্র। আমার দেহ-মন, বাক্য ব্যবহার, কোনোটার মধ্যেই পবিত্রতার ছাপ নেই। কাজেই আমার মতো পাপীর পা-ধোয়া জল নিয়ে এরা কিছুতেই উদ্ধার পাবে না, মাঝখান থেকে ফোস্‌কা পড়া পা-ধোয়া জল খেয়ে নিশ্চয় অসুখে পড়বে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা বিরাট টিনের গামলায় করে জল এলো। গুরুজী আমাদের সকলকে জুতো খুলতে বললেন, বলা সহজ কিন্তু এই ঠাণ্ডায় জুতো খোলা সত্যিই একটা সমস্যা। যাই হোক, আমরা জুতো খুলতে বাধ্য হলাম, তারপর গুরুজীই প্রথমে সেই হিমশীতল জলে দু'পা ডুবিয়ে পা দুটো ধুয়ে নিলেন। তারপর একে-একে অন্যান্য লামারাও পা ধুয়ে নিলেন, এবার এল আমার পালা। জলে বাঁ পা-টা ডুবোতেই মনে হল ঠাণ্ডাটা আমার শিরা ধরে সরাসরি উঠে আসছে বুকের কাছে। কোনক্রমে সেই ভাবটাকে গোপন করে আমি দু'পা ডুবিয়ে ভালোভাবে পা-টা ধুয়ে নিলাম। একমাস পর এই প্রথম আমার পদযুগল জলস্পর্শ করল। পাশেই একজন ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়েছিলেন গামছা হাতে নিয়ে তাতে পা-দুটো মুছে তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বিছিয়ে দেওয়া সতরঞ্জিতে বসলাম। জলের ঠাণ্ডায় পা-দুটো জমে যাওয়ার মতো হয়েছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরই আশ্চর্যান্বিত হলাম। পায়ের রক্ত চলাচল আগের চেয়ে আরও অনেক ভালোভাবে শুরু হল, ধীরে ধীরে পা-টা গরম হয়ে উঠল। মনে হয় এটা আমাদের পক্ষেও খুব দরকার ছিল। তারপর একে-একে বাড়ীর সবাই আমাদের প্রণাম করে যেতে লাগল। একদম শেষে এল কন্যা আর তার ছোট বোন। মেয়েটিকে দেখতে খুবই সুন্দরী। সিল্কের পোশাক, কোমরে পেটি বাঁধা, তিব্বতে অধিকাংশ মেয়েরাই

কোমরে পেটি বাঁধে, ঠাণ্ডার হাত হতে রক্ষা পাওয়ার এটা একটা চমৎকার উপায়। ভূটান বা সিকিমেও এই জিনিসটা চোখে পড়েছে। ভদ্রলোকদের মধ্যে অনেকেরই মাথায় সাহেবী টুপী। তাছাড়া পোশাক স্ত্রী-পুরুষের প্রায় সমান। বিরাট হাতাওলা জামা, শুধু গরমের সময় এরা তার একটা হাতাখুলে রাখে।

মেয়েটি আমাদের প্রত্যেককে একে-একে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে লাগল, আর আমরাও তাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করতে লাগলাম। আমার কাছে এলে আমি অতি গম্ভীরভাবে তার মাথা ছুঁয়ে—'নারায়ণ! নারায়ণ তোমায় রক্ষা করুন, তোমার জীবন সুখের হোক' এই বলে আশীর্বাদ জানালাম। এরপর 'কন্যা' ঘরে গিয়ে আমাদের জন্য চাং নিয়ে এল। কাঠের ও বাঁশের গেলাসে করে চাং (অর্থাৎ বার্লির বিয়ার) আর তার সাথে এল ছাতুর লাড্ডু। খাবার আগে আমরা পরিবারের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করলাম। বিয়ার এর আগে আমি খাইনি। একটু তিতো আর মিষ্টি, অনেকটা বিকেলের ঝরে যাওয়া খেজুরের রসের মতো খেতে। আমি এক গ্লাস মাত্র খেলাম আর আমাদের মধ্যে অনেকে তিন গ্লাস খেলেন। কন্যাকে উপহার স্বরূপ গুরুজী একটা রুদ্রাক্ষের মালা দিলেন। তারপর সবাইকে বিদায় জানিয়ে আবার পথ ধরলাম। গুরুজী আমাকে ফিস্ ফিস্ করে বললেন—যদি আমাদের এত বড় দল না থাকতো, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের না খাইয়ে ছাড়তো না।

আমরা সামাদা শহরের মধ্যে ঢুকলাম, শহরটি খারাপ নয় অন্ততঃ ফারির তুলনায় অনেক পরিষ্কার। বাড়ীগুলোও বেশ চমৎকার। অধিকাংশ বাড়ী পাথর আর মাটি দিয়ে তৈরী, জানালা দরজা আর ঝোলানো বারান্দাগুলো অবশ্য কাঠের। বাঁদিকে একটা ছোট মিলিটারী চৌকি। রাস্তার ধারে অনেক ভদ্রমহিলাকে দেখলাম সূর্যের আলোয় ভেড়ার পশম শুকোতে দিচ্ছে আর প্রয়োজন মতো বস্তায় ভর্তি করছে। এতগুলো লামাকে একসাথে যেতে দেখে শহরের সবাই রাস্তার ধারে ছুটে ছুটে এসে আমাদের প্রণাম করতে লাগল। মনে হল এটাই তাদের আজকের দিনের প্রধান আকর্ষণ। অনেক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ঠিক দণ্ডি কাটার মতো এসে আমাদের চরণ স্পর্শ করে আশীর্বাদ চাইল—সবাই হাসি খুশী। অনেকগুলো টিন ও কাঠের ঘর আমাদের চোখে পড়ল, মনে হয় এটাই বাজার। আমার ইচ্ছে ছিল শহরটা দেখার কিন্তু গুরুজী থামলেন না; মিলিটারীরা হাঙ্গামা করতে পারে, আমরা এগিয়ে চললাম। সামাদা পেরিয়ে আরও দু'ঘন্টা হাঁটার পর আমরা পেলাম একটা বিরাট গুম্ফা। গুরুজী বললেন—ওই যে দেখতে পাচ্ছো দূরের গুম্ফাটা ওখানেই আমরা আজ থামবো, অবশ্য যদি সেখানে বন্দোবস্ত না হয় তাহলে ফিরে আসতে হবে সামাদায়। যদিও খুব শীত কিন্তু মাথার ওপর সব সময়ই সূর্য থাকায় আমাদের খুব বেশী অসুবিধা হচ্ছে না। তবে সূর্য না থাকলে আমাদের পক্ষে হাঁটা খুব মুশকিল ছিল। এখন জমিটা আবার অসমতল হয়ে আসছে—এই গুম্ফাটাও একটু উঁচু জায়গায় অবস্থিত। গুম্ফার কাছে যেতেই কয়েকটা কুকুর আমাদের দিকে চিৎকার করে ছুটে এল। তিব্বতের প্রায় প্রত্যেকটি গ্রাম, শহর ও মঠে তাদের অ্যাপ্যায়ন এড়িয়ে যাওয়া মুশকিল, এখন আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি।

কিয়াংফু গুম্ফা ও লামা শেরিং জোং

কুকুরদের ডাক শুনে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। প্রথমে গুরুজীকে তিনি চিনতে পারলেন না, কারণ লামার চোখের দৃষ্টি কমে এসেছে। আগে তিনি ছিলেন সহকারী লামা, তারপর প্রধান লামা দু'বছর যাবৎ স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়ার দরুন লামা শেরিং জোং তার স্থান পেয়েছেন।

গুম্ফাটা ছোট, বিরাট উঁচু মাটির দেয়াল আর তারই উপরে সামান্য কাঠের কাজ করা ছাদ, দেখেই মনে হয় যে এটা অনেক দিনের পুরোনো। আমরা ভেতরে ঢুকলাম। একটা বিরাট হলঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শুরু হল। এই গুম্ফায় এখন মাত্র তিনজন লামা থাকেন। তাঁরা গরীব, কোন রকমে দিন চলে যায়। আগে সামাদার জমিদার এখানকার দেখাশুনা করতেন, কিন্তু আজকাল তিনি তার পরিবার নিয়ে সিকিমে চলে গেছেন। এখন অন্যলোক, সে এসব দিকে মন দেয় না। লামা শেরিং জোং তাই খুব আফসোস করে বললেন তিনি এত লোককে কিছুতেই রাখতে পারবেন না। গুরুজী তাকে বুঝিয়ে বললেন যে, আমরা সেখানে তাঁর খরচায় থাকতে চাই না, আমাদের নিজেদের খাওয়ার জিনিসপত্র সব আছে আমরা চাই একটু আশ্রয় আর আগুন, কাঠের দামও আমরা দিতে প্রস্তুত। আর প্রণামী হিসেবে আমরা পাঁচ টাকা দেবো। তিনি একটু ইতস্তত করলেন বটে কিন্তু শেষে রাজি হয়ে গেলেন। লামা শেরিং জোং মনে হয় হাসতে জানেন না, অথবা কোন কারণে সেটা উবে গেছে। আমরা একটা হলঘরে বসলাম।

বেলা যত গড়াতে লাগলো শীতের প্রকোপ ততই বাড়তে লাগলো। এখানকার শীতটা খুবই কষ্টদায়ক। তাপমাত্রা যদি এরকমভাবে কমতে থাকে তাহলে রাত্রিবেলা আমাদের থাকা মুশকিল। গুরুজী তাই সময় থাকতেই লামা শেরিং জোং-কে জিজ্ঞাসা করলেন, যদি তিনি একটা ঘর দিতে পারেন তাহলে আমাদের খুবই ভালো হয়। শেরিংজী মনে হয় এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন তিনি রাজি হলেন—তবে তারজন্য আরও তিন টাকা বেশী দিতে হবে। আমরা রাজি হয়ে গেলাম।

মঠের একটা পুরোনো মন্দিরে আমরা উঠে এলাম। মন্দিরের ঘিয়ের প্রদীপটি জ্বালিয়ে দেওয়া হল। সেখানে বহু দিনের পুরোনো কয়েকটা বেদীও পাওয়া গেল। শেরিংজী আমাদের বুঝিয়ে দিলেন এ মন্দিরটি খুব পবিত্র। তেরো বছর আগে এটাই ছিল মূল মন্দির তারপর নতুন ঘর হওয়ার পর ভগবান বুদ্ধের মূর্তিটা সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তা ছাড়া সবই যেমন ছিল তেমনি আছে। সেখানে আমরা থাকবো আর মঠের রান্না ঘরে রান্না করবো। সেটাই ঠিক হল।

আমার কাছে মন্দিরটা খুব ভালো লাগলো। প্রদীপের অল্প আলোকে প্রত্যেকটা স্ট্যাচুকে মনে হল প্রাণবন্ত। দেয়াল ও থামের সাথে ঝুলানো রয়েছে অসংখ্য তাংখা অর্থাৎ কাপড়ের উপর নিখুঁত শিল্প। অসংখ্য মণ্ডলা ও দেব-দেবীতে ভর্তি। আরও আলো হলে আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেগুলোকে দেখতাম। যাই হোক আপাতত যা দেখছি তাতেই আমি খুশী। ঘরের পরিবেশটা পবিত্র কি না আমার দ্বারা যাচাই করা অসম্ভব। তবে বলতেই হবে যে এর মধ্যে একটা রহস্য ও রোমাঞ্চের ভাব রয়েছে। ঘরের বড় মূর্তিটির দিকে বার বার চোখ পড়তে লাগল, তিব্বতী দেবতা যুবযূং-এর মূর্তি। হিন্দুদের মতে বলতে হবে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন দৃশ্য। পুরুষের বিরাটত্বের সাথে প্রকৃতির অহং একাত্ম হয়ে আছে। এই মূর্তিটার মধ্যে শান্তভাব খুঁজে পাওয়া মুশকিল। শিবের রুদ্ররূপী ধ্বংসের বিকট রূপ, প্রকৃতির সাথে লিঙ্গাবদ্ধাবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। হিমালয়ের প্রত্যেকটি গুম্ফাতেই এই চিত্র বা স্ট্যাচু আমি লক্ষ্য করেছি, মৌনীবাবা হয়েছি বলে সব সময় জিজ্ঞাসাও করতে পারিনি। কারণ আমি কথা বলি সাধারণত রাতে অথবা নির্জনে, তাই এবার সুযোগ এসেছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই একে-একে শুতে চলে গেলেন আর ঠিক সেই সময়ে গুরুজীকে জিজ্ঞাসা করলাম—এই মূর্তিটার বিষয় আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন কি? এই ধরনের প্রশ্নে তিনি কোনদিনই আমাকে নিরাশ করেননি বরঞ্চ উৎসাহ দিয়ে তার সহজ উত্তর দিয়েছেন। তিনি ব্যাখ্যা করতে লাগলেন—

এই মূর্তিটার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিব ও শক্তির মিলনকে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা। আমাদের ব্যক্তি-আত্মা হচ্ছে প্রকৃতির প্রতীক আর বিশ্বাত্মা হচ্ছে শিবের প্রতীক। তবে সেটা হচ্ছে হিন্দুমতে ব্যাখ্যা, তিব্বত বৌদ্ধ তান্ত্রিকের দেশ। এখানকার বৌদ্ধ ধর্মের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তন্ত্রের গূঢ় রহস্য। সে তত্ত্বকে বুঝতে হলে অনেক সাধনা করতে হয়। ভালোভাবে চেয়ে দ্যাখ, পুরুষ মূর্তিটার সাথে নারী মূর্তিটা কণ্ঠলগ্ন হয়ে লিঙ্গাবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। বীজ মন্ত্রের সাহায্য নিয়ে আমরা যখন সেই মহাশক্তির সাথে এরকমভাবে একদেহে মিশে যাবো তখনই হবে আমাদের মুক্তি। সাধনার শেষ ধাপ। যুবযূম্ বা পিতামাতার মিলনে সৃষ্টি হয়েছে এই জগৎ, কাজেই এই জগৎকে জানতে হলে আগে জানতে হবে সেই পরমপিতা ও পরমমাতার মিলন রহস্য, সে গুহ্যসূত্র; অবলোকিতেশ্বরের সেই সৃষ্টিরহস্য অতি কঠিন পথ। অনেককাল ধরে এই মূর্তির উপর ধ্যান করলে সেই রহস্যের আলো জানা যায়। তিব্বতী ভাষায় একে বলে 'জিগ্-তেন্-বাং-ফিউগ্ গ্সাগ্-গ্রব'—এই এতগুলো শব্দ মিলে হয়েছে একটা নাম সেটাই আবার হয়েছে ইষ্টমন্ত্র বা বীজমন্ত্র। এই মূর্তিটারই ভয়ংকর রূপ বজ্রহুংকার মুদ্রা। এই মুদ্রার উপর ধ্যান করলে প্রজ্ঞাদেবীর দর্শন পাওয়া যায়। পদ্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এই মূর্তির ধ্যানে জাগতিক ভয় সম্পূর্ণরূপে দূর হয়।

গুরুজী কিছুক্ষণ থামলেন, একই সঙ্গে এর আরও বেশী ব্যাখ্যা শোনালে আমি ধরে রাখতে পারবো না, সে কথা ভেবে আমিও আর গুরুজীকে কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না।

আমি অবাক হয়ে সেই রহস্যময় তান্ত্রিক দেব-দেবীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। গুরুজীই নীরবতা ভঙ্গ করলেন। তিনি বললেন—চুপচাপ তাকিয়ে না থেকে মনে মনে মণিমন্ত্র জপ করতে থাক। এমন এক সময় আসবে যখন দেখবে মন্ত্র আর দেবতা এক হয়ে গেছে। চেষ্টা কর, ধৈর্য ধরে অভ্যাস করতে হবে। তিনি এই কথা বলে কম্বলের ভেতর আশ্রয় নিলেন। আমি বসে রইলাম আরও কিছুক্ষণ।

মধ্য হিমালয়ের সেই নিঃশব্দ রাত্রিতে আমি প্রজ্ঞাদেবীর আরাধনায় মগ্ন হলাম।

গীয়াৎসের পথে

পরেরদিন আবার রাস্তা। সামাদার আগে যে বড় শহরটা দেখেছি সেটা ছিল দোসেন তার কাছাকাছি আমরা রাতের বেলা একটা সুন্দর হ্রদ দেখেছিলাম, সামাদার লামা শেরিং জোং আমাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আমরা সেখানে আমাদের তীর্থযাত্রার জন্য প্রার্থনা করেছিলাম কি না ? রাতের প্রচণ্ড শীতের জন্য গুরুজী সেখানে আমাদের দাঁড়াতে দেননি। শেরিং জোং বিশেষভাবে উপদেশ দিয়ে বললেন রাস্তায় নেমেই আমরা যেন সেই হ্রদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করি। ভারতবর্ষ হতে যারা এদিকে আসে তারা সবাই সেই হ্রদের ধারের মন্দিরে পূজা দেয়। হ্রদের নাম রাম-হ্রদ, অনেকে সেটাকে রাম সরোবরও বলে থাকে কারণ সেটা নাকি মানস সরোবরের মতোই পবিত্র ও সুন্দর। কাজেই বৃদ্ধ লামা শেরিং জোং-এর উপদেশানুযায়ী আমরা রাস্তায় নেমেই প্রার্থনা করলাম। গুরুজী আমাদের বললেন যে তাঁরও ইচ্ছা ছিল সেখানে এক রাত থাকবার, কিন্তু অনেকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন তার কাছাকাছি নাকি হান্‌দের তাঁবু আছে তীর্থযাত্রীদের তারা ভালো নজরে দেখে না। তাই তিনি বাধ্য হয়েছেন সে পথটা সূর্যাস্তের পর পাড়ি দিতে।

তাংলার পর থেকেই আমাদের পথ সহজ হয়ে এসেছে, তবে পার্বত্য পথ, সহজ বলা মানে কলকাতার লোকদের কাছে খুবই কঠিন। আমরা এখন বিশাল হিমালয়ের ঠিক ছাদের উপর দিয়ে চলছি। উচ্চতা মনে হয় সব সময়ই এগারো-বারো হাজার ফিটের উপর, তারই মধ্যে কোন কোন সময় নামছি, কোন কোন সময় উঠছি।

গ্যাংটক ছাড়ার পর থেকে আমরা উঠেছিলাম নাথুলা উচ্চতায়, সেখানে পেয়েছি কঠিন পাথরের বাধা, তারপর চুম্বি উপত্যকায় পেয়েছি তিস্তা ভ্যালীর মতো সুন্দর বর্ণ। তারপর সেখান থেকেই দেখছি বরফে ঢাকা পর্বত চূড়ার সৌন্দর্য। তার কয়েকদিন পর আবার উঠেছি উপরে, পার হয়েছি তাংলার পর্বত কন্দর, ১৫,৬০০ ফিটের উচ্চতায়ও আমাদের সকলের মন ও দেহ অটুট ছিল। আমাদের এ দলটি যদি তীর্থযাত্রী না হয়ে অভিযাত্রী দল হতো তাহলে বিরাট অ্যাড্‌ভেঞ্চার কাহিনীতে ভরে যেত আমার ডায়েরীর পাতা। তীর্থযাত্রীদের সে অহংকার শোভা পায় না। এ বিরাট হিমালয়ের কাছে আমরা অতি ক্ষুদ্র, এ বিরাট শক্তির কাছে আমরা তুচ্ছ, এ অসীম মহিমান্বিত তুষার শোভিত সৌন্দর্যের কাছে আমাদের অহংকার করা পাপ। তীর্থযাত্রীর প্রত্যেকটি পদক্ষেপে রয়েছে ভক্তি, নম্রতা আর আত্মসমর্পণের ভাব। পথই তীর্থযাত্রীদের সাধনা—এ

সাধনায় আছে বৈচিত্র্য আর তথাগতের প্রতি আত্মসমর্পণের ব্রত। জাগতিক পথ যেখানে শেষ হয়ে যাবে সেখান থেকেই শুরু হবে আধ্যাত্মিক পথ।

দু-তিন দিন যাবৎ আমাদের শারীরিক ও মানসিক বল ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে, ঠাণ্ডাটা এখন অনেক সহ্য হয়ে এসেছে। উচ্চতার জন্য অনেকের হাঁপানির মতো হয়েছিল, আর যাদের কাশি হয়েছিল সেটাও অনেকটা কম। তুনার পর থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্য অনবদ্য, চারদিকে শুধু বরফের পাহাড়। বরফের সাদা পর্বতশৃঙ্গগুলো আমাদের সঙ্গে যেন রঙের খেলায় মত্ত হয়েছে। আমাদের সামনে এখন আর হিমালয়ের বাধা নেই, তাকে পার হয়ে তারই অন্যদিকে এসে পৌঁছেছি। এখন আমাদের দেশে বসন্তোৎসবের আয়োজন চলছে আর এখানে মনে হয় চির তুষারের অনন্ত উৎসব চলছে। বন জঙ্গল এখানে স্বপ্নের কথা। বড় গাছ এত ঠাণ্ডায় হয় না। পুরো গরম যখন পড়বে তখন চারদিক শুধু ঘাসে ঢেকে যাবে। এখানকার ঠাণ্ডা খুব কনকনে আর শুকনো, দিনে সূর্যকিরণে তাপমাত্রা বেড়ে ওঠে আর রাত্রিবেলা যায় কমে। সূর্যাস্তের সময় এ রাজ্যটা সম্পূর্ণ যায় পাল্টে। বরফের রঙগুলো আস্তে আস্তে রুপোলী হতে থাকে তারপর শুরু হয় আলো আঁধারের লুকোচুরি খেলা। এ পৃথিবীর উপর নেমে আসে রহস্যময় তন্ত্র-জগৎ।

আমারা আবার ধরেছি উত্তরের পথ, এ ছাড়া অন্য পথ নেই। রাস্তায় দুপুরবেলা আমরা থামলাম। জ্বালানী কাঠ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে সামাদার থেকে কিছু বার্লি ও যবের ছাতু কিনেছি। একটা পাথুরে মাটির বাড়ীর সামনে এসে থামলাম। আমাদের দেখেই বাড়ীর চারপাশ থেকে সবাই ছুটে এল,আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে জিভ বার করে নমস্কার জানালো। তাদের মধ্যে যুবক-যুবতী ও বয়স্ক লোকজনও এসে উপস্থিত হল। আমাদের পরিচয় দিতেই তাদের মধ্যে অনেকে গড় হয়ে প্রণাম করল। আমরা ছাতু ভেজাবার জন্য কিছু গরম জল চাইলাম। তারা বিনা দ্বিধায় গরম জলের জন্য বন্দোবস্ত করতে চলে গেল। এক একটি পরিবার পাঁচ ছ'জনের জন্য গরম জল আনলেই আমাদের সকলের হয়ে যাবে। শিশুরা আমাদের সামনেই বসে রইল। পৃথিবীর এই ছাদে প্রকৃতির কোলে এই শিশুদের দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তাদের চোখে দেখছি স্বচ্ছ ও পরিষ্কার জ্যোতি, মুখে সরল ও পবিত্রভাব। এখানকার লোকদের মুখেও সেই পবিত্রভাবটা কেউ গোপন করতে পারবে না। এই নিষ্কলঙ্ক স্বর্গভূমিতে এখনও মনে হয় পাপের হাওয়া লাগেনি। হিমালয়ের এই উঁচু বেড়া ডিঙিয়ে মনে হয় পাপ এখানে প্রবেশ করতে পারে না। জীবনযাত্রা এদের যে রকমই হোক না কেন, পোশাকে এরা যতই ভিখিরি হোক না কেন, এদের মধ্যেই আমি দেখতে পাচ্ছি সত্য-শিব ও সুন্দরের প্রকাশ। এদের মতো এত মনখোলা হাসি বোধহয় জগতের আর কোন জাতিই হাসতে পারে না।

মনে হয় আর যদি আমরা নাও এগুতে পারি তাহলে ক্ষতি নেই। এ পর্যন্ত আসাটাই আমাদের একটা বিরাট লাভ।

গরম জলে ছাতু ভিজিয়ে তাতে নুন দিয়ে আমরা শিশু ও গ্রামবাসীদের সাথে তা

ভাগাভাগি করে খেলাম। এতগুলো সাধুদের সাথে একসাথে বসে খেয়ে গ্রামবাসীরাও খুব আনন্দ পেল। তাদের ভাব দেখে মনে হল, যেন তারা স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করছে। তারপর আবার পথ।

সামাদার পর থেকেই আমরা পেয়েছি নীয়াং নদী, আশপাশের বরফ গলে গলে নালার মতো এসে পড়েছে এই নদীতে, খুব ছোট পাহাড়ি খরস্রোতা। তার কলকল ধ্বনি আমাদের চলার মধ্যে যোগাচ্ছে প্রাণ। মোটেই একঘেয়ে লাগছে না। এই নদীটার অনুসারেই এই উপত্যকার নাম হয়েছে নীয়াংচু। এই নদীর ধার ধরে সমস্ত জীবন হাঁটলেও মনে হয় কেউ ক্লান্তি বোধ করবে না। আমাদের চলায় এখন ছন্দ এসেছে। মনটাও আজকাল খুব হালকা লাগছে। ভারত-তিব্বত সীমান্তের কাছাকাছি প্রচুর সৈন্য মোতায়েন দেখে আমাদের মনটাও ভারী হয়ে উঠেছিল, সীমান্তের আবহাওয়াটাও ছিল খুব ভারাক্রান্ত। এখন আমাদের সেই ভয়টাও নেই।

সেইদিন রাত্রিবেলা আমরা ছোট একটা বস্তিবাড়ীতে রাত কাটালাম। পরের দিন দুপুরবেলা আমরা পৌঁছলাম খাংমা নামে একটা বর্ধিষ্ণু গ্রামে।

খাংমা গ্রামে ঢুকতেই সেখানকার এক গ্রামীণ পুলিশ খাম্‌পা শ্রেণীর, আমাদের দিকে এগিয়ে এল। আমাদের প্রণাম করে বলল—আপনারা গ্যাংটক থেকে আসছেন? আপনারা নেপালী তীর্থযাত্রী?

হ্যাঁ বলতেই হবে তা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু আমাদের মনে সংশয় ছিল যে, সে হয়তো আমাদের হান্‌-চৌকিতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাবে। সে বলল—তাহলে আমার সাথে আসনু। আধঘণ্টা পর তার সাথে একটা ছোট বাংলোতে এসে হাজির হলাম। বাংলোর বারান্দায় একজন লামাগোছের তিব্বতী ভদ্রলোক আমাদের হাসিমুখে আপ্যায়ন জানালেন। তার হাসিমুখ দেখে আমাদের সংশয় দূর হল। আমাদের কাছে পেয়েই ভদ্রলোক গড় হয়ে প্রণাম করলেন, তার দেখাদেখি অন্যান্য সকলেও। গুরুজী ও আমরা সকলে তাদের আশীর্বাদ করলাম।

ভদ্রলোক এবার অতি বিনীতভাবে নিবেদন করলেন—আমাদের এই ছোট্ট গ্রামে স্বাগতম্‌ জানাই। আমরা গ্যাংটক থেকে আপনাদের আসার সংবাদ টেলিগ্রাম মারফৎ পাই। পবিত্র সিকিমের মহারাজ আপনাদের যত্ন নেবার জন্য আমাদের বলেছেন। আমার ভাই সিকিমের পবিত্র মহারাজের ওখানে কাজ করে, সে-ই সংবাদটা পাঠিয়েছে।

আমাদের কাছে এটা একটা বিরাট আনন্দ সংবাদ, কিন্তু লামাদের আনন্দে লাফিয়ে উঠলে চলবে না, খুব সংযতভাবে সংবাদটাকে আমরা গ্রহণ করলাম তারপর অতি বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়িয়ে ও হাত তুলে তার সেই ভাইয়ের প্রতি আমরা আশীর্বাদ বাণী উচ্চারণ করলাম।

ভদ্রলোকের নাম সোরন থাপে। বাংলোটা ছিল ভারতের সম্পত্তি। গ্যাংটক থেকে গীয়াৎসের পথে ভারতীয় ব্যবসা ও তিব্বতীদের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য এই ধরনের বহু বাংলো আছে। আজকাল লোকজনদের যাতায়াত কম তাই এই বাংলোগুলো

ব্যবহার করা হয় না। হান্‌দের প্রভাবের জন্য তীর্থযাত্রীরাও বড় একটা আসতে চায় না। কাজেই এই বাংলোটা এখন গ্রামের সম্পত্তি। সোরন থাপে এই গ্রামের সর্বেসর্বা, আইন ও শৃঙ্খলা তার হাতে। প্রায় চারশ'র মতো জনবসতি নিয়ে এই গ্রামটা গড়ে উঠেছে। গরমের সময় বার্লির চাষ হয়, আর প্রচুর ভেড়াও আছে। তার থেকে উৎকৃষ্ট উল তৈরী হয়। তিনি আমাদের যতদিন খুশী থাকতে বললেন।

বাংলোটা খারাপ নয়, দেখেই মনে হয় যে পুরোনো ব্রিটিশ আমলের তৈরী। এক কালে বেড়া, বাগান সব কিছুই ছিল, আজকাল স্থানীয় ছোট ছেলেমেয়েদের খেলার জায়গায় পরিণত হয়েছে। গরম কালে মনে হয় ভেড়ার আস্তানা। ভদ্রলোক অনেক কষ্টে পুরোনো তালা খুলে আমাদের ঘরগুলো দেখিয়ে দিলেন। আমাদের কাছে এ অতি সুন্দর ব্যবস্থা। তিব্বতে ঢোকার পরে এই প্রথম আমরা পাচ্ছি অতিথি মর্যাদা। খাট ও জাজিমগুলো দেখে মনে হয় পাঁচ বছরের মধ্যে কোন লোকের পা পড়েনি। শীতে ধূলোগুলো জমে আঠার মতো আটকে আছে। স্থানীয় পাথর ও সিমেন্টের তৈরী বাংলোটা সত্যি ভালো। আমরা সেখানে আমাদের মালপত্র নামিয়ে স্থির হয়ে বসলাম।

সোরন থাপে থাকেন একটু দূরে। তিনি আমাদের বার বার আশ্বাস দিয়ে বললেন—এখানে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না, গ্রামের লোকেরা সব সময় আমাদের সঙ্গে থাকবে সাহায্য করবার জন্য। আরও আনন্দের বিষয় তিনি ঘোষণা করলেন যে, আমাদের রান্না করতে হবে না, গ্রামের লোকেরাই ভাগাভাগি করে আমাদের জন্য খাবার তৈরী করে আনবেন।

গুরুজী বললেন—এখানে কোন কু-লক্ষণ দেখছি না কাজেই ইচ্ছে করলে তুই কথা বলতে পারিস। ইতিমধ্যে আমি তিব্বতীদের কিছু কিছু শব্দ আয়ত্তে এনেছি তবে তাকে ব্যবহার করার সুযোগ পাইনি। অনুমতি যখন পেয়েছি তখন চেষ্টা করতে ক্ষতি কি? আমি একাই বাংলো ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তাটাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এই গ্রামটা। ছোট্ট গ্রাম কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে একটা পবিত্রভাব। পাথুরে-মাটি দিয়ে তৈরী সব বাড়ী, কোন বেড়া নেই। বাড়ীগুলো সব যেন ঠাসাঠাসি হয়ে আছে, চলতে চলতে রাস্তা হয়েছে, আর দু'পাশে পাথর বসিয়ে সেটাকে রক্ষা করা হয়েছে। বাড়ীগুলোর মধ্যে কাঠের বারান্দা নেই, মনে হয় এ অঞ্চলে কাঠ খুবই দুষ্প্রাপ্য। বাড়ীর ভেতর থেকে সবাই বেরিয়ে এসে আমাকে একে-একে প্রণাম করে যেতে লাগলো।

গ্রামে এখন সবাই জেনে গেছে আমাদের কথা, শিশু থেকে আরম্ভ করে যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাই এসে আমাকে স্বাগত জানাতে লাগলো। অনেকে অনেক প্রশ্নও করতে লাগলো, বিশেষ করে যুবক সম্প্রদায়; কিন্তু ভাষার অভাবে উত্তর দিতে পারলাম না। শুধু হাসিমুখে হাত তুলে তাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে এগুতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামে আমি পরিচিত হয়ে গেলাম।

বিকেলের দিকে গ্রামবাসীরা এল আমাদের সাথে দেখা করতে। এদের মধ্যে

অনেকেই সিকিম দেখেছে। বিকালবেলা বারান্দায় আমরা কম্বল পেতে বসেছি আর আমাদেরই চারপাশে বসেছে গ্রামবাসীরা, সমবেতভাবে আমরা প্রার্থনা শুরু করলাম—

"নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্‌মাসম্‌বুদ্ধস্‌স,
অরহন্তং সম্‌মাসম্বুদ্ধং বিজ্‌জীচরণ সম্পন্নং সুগতং
লোকবিদুং অনুত্তমং পুরীসধম্মসারথীং সত্থারং
দেবমনুস্‌সানাং শিরসা নমামি।"

আমরা প্রার্থনা করলাম প্রথমে পালিভাষায়, তারপর তিব্বতী ভাষায়। তিব্বতীভাষায় প্রার্থনা আমার খুব ভাল লাগে যদিও তার অর্থ বিন্দুবিসর্গও বুঝি না কিন্তু থেমে থেমে তারা যখন শব্দগুলো উচ্চারণ করে, তখন প্রার্থনাটা খুব শ্রুতি মধুর লাগে। তিব্বতীরা মন্ত্র উচ্চারণ করার সময় প্রত্যেকটি অক্ষর আলাদা আলাদা উচ্চারণ করে, তাকে সমবেতভাবে অনুসরণ করতে হয়। প্রত্যেকটা অক্ষর মনে হয় নাভিদেশ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে। মণি-মন্ত্র গ্রামের সকলেই জানে আর কিছু কিছু প্রার্থনাও। প্রায় আধঘণ্টা পর আমাদের প্রার্থনা শেষ হল। সূর্যদেব তখন পশ্চিমদিকে হেলে পড়েছেন। ধীরে ধীরে তাপমাত্রা কমতে লাগলো, শীতের প্রকোপ বাড়তে লাগলো। বাংলোর বারান্দায় একে-একে সকলে ঠাসাঠাসি করে বসতে লাগলো। বাংলোর সেই ছোট্ট বারান্দায় মনে হল প্রায় আড়াইশ লোক ধরে গেল। তারই মধ্যে রয়েছে শিশু বিভিন্ন বয়সের মেয়েরা। ঘরের কাজ সেরে মায়েরাও এসে হাজির হয়েছে।

আমাদের কোন কর্মসূচী নেই, আর সাধুপুরুষ দর্শনেই তাদের আনন্দ। সূর্যাস্তের সাথে সাথেই এখানে অন্ধকার নেমে এল। হঠাৎ নজরে পড়ল, তিব্বতীদের মধ্যে অনেকেই লোহার কড়াইতে করে কাঠকয়লার আগুন নিয়ে এসেছে। এরকম অনেকগুলো কড়াই পর পর সেখানে জড়ো হল। সেই আগুনকে কেন্দ্র করে তারা ছোট ছোট ভাগে ভাগ হয়ে আগুন পোয়াতে লাগলো। এক নজরে দেখলে মনে হয় গ্রামবাসীরা এখানে আগুন পোয়াতেই এসেছে, আমরা উপলক্ষ মাত্র। তাদের মধ্যেই গল্পগুজব শুরু হয়ে গেল, সবাই যেন একই পরিবারভুক্ত। তারই ফাঁকে এক-একজন মাঝে মাঝে উঠে এসে গুরুজীকে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন করতে লাগলো। প্রশ্নগুলো খুবই সরল সহজ।

—আপনাদের এখানে আসতে কতদিন লাগলো,

—আপনারা কি চেন্‌-রে-জিকে দর্শন করতে যাচ্ছেন,

—আমাদের এখানে কতদিন থাকবেন ?—এই ধরনের আরও অনেক প্রশ্ন।

মা-বোনদের প্রশ্নগুলো একটু আলাদা ধরনের, যেমন—আমার আর কটা ছেলে হবে, মেয়ের বিয়েটা ভালোভাবে হবে কি না, স্বামীর অসুখটা সারবে কি না, ইত্যাদি।

আমাদের সাথে কিছু চাল ছিল। রাত্রি যখন আরও ঘনিয়ে এল তখন গুরুজী তাদের সবাইকে একে-একে ডেকে প্রত্যেককে দু'তিনটে করে প্রসাদের মত চাল বিতরণ করতে লাগলেন, গুরুজীর প্রসাদ পেয়ে তারাও সন্তুষ্ট হল। এবার তাদের ঘরে ফিরে যাবার পালা। এমন সময় গুরুজীর কাছে এসে সোরন থাপে ফিস্‌ফিস্ করে তাঁর কানে

কানে কি যেন বলল—গুরুজী ওর কথা শুনে একটু মৃদু হাসলেন, আমার দিকে তাকিয়ে তাঁর কাছে আমাকে ডেকে বললেন,

—গ্রামবাসীরা এত ছোট ভারতীয় তীর্থযাত্রী দেখেনি। এদের কাছে তুমি খুব ভাগ্যবান ও পুণ্যাত্মা। তোমার কাছ থেকে এরা কিছু শুনতে চায়, এরা জানে যে তুমি ভারতীয়।

গুরুজীর দিকে তাকিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—বেশ! কিন্তু কি বলবো বলুন?

—যা খুশী।

গুরুজীর আশ্বাস পেয়ে আমি তাঁকে বললাম, ঠিক আছে আমি হিন্দীতে বলছি আপনি তার তর্জমা করে দিন তিব্বতী ভাষায়। তিনি রাজি হয়ে গেলেন। আমি তাদের উদ্দেশ্যে বললাম,

—আমার প্রিয় ভাইবোনেরা, মা আর পিতৃতুল্য পূজনীয় ব্যক্তিগণ! আপনাদের আন্তরিক আপ্যায়নে আমরা খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি। ভারত থেকে অনেক দূরে এসে খুঁজে পেয়েছি আমার ভাই-বোনদের। আমি আপনাদের ভাষা জানি না বলে খুবই দুঃখিত, কিন্তু পরের বার যখন আসবো তখন নিশ্চয়ই তিব্বতী ভাষা শিখে আসবো। আমার গুরুজীর কৃপায় এখানে এসেছি। এমন সুন্দর দেশ আমি আর দেখিনি। মহাতীর্থের পথে আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে আমার যাত্রা সার্থক। আপনাদের সহজ ও সরল স্বভাবসুলভ আচরণে মনে হয় আপনারা কৈলাসের শিব-চরিত্রের প্রতীক স্বরূপ। আমি আপনাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি—

‘ওম্ ত্র্যয়ম্বকম্ ইজামহে সুগন্ধি পুষ্টিবর্ধনং

উরভরুকমিভ বন্ধনন্ মৃত্যুরমুক্ষি মামৃতৎ, ওম্ শান্তি, শান্তি, শান্তি।’

প্রার্থনা শেষে আমি থামলাম। তারপর সকলে একে-একে আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

গ্রামবাসীদের কাছ থেকে সেদিন রাত্রিবেলা আমরা ভাত ও ডাল পেলাম। অনেকদিন পর তা পেয়ে আমরা সকলেই খুশী। আমরা তিব্বতের যতগুলি শহর ও গ্রাম এ পর্যন্ত পেয়েছি তাতে কিন্তু ইলেক্ট্রিক কোথাও চোখে পড়েনি। রাস্তার দুধারে দেখেছি শুধু টেলিগ্রাফিক পোস্ট। তিব্বতের লোকেরা আজ পর্যন্ত বিদ্যুতের আলো না পেলেও তাদের আলোর অভাব নেই—ঘিয়ের প্রদীপ অথবা হ্যারিকেনেই এখানকার কাজ চলে। তিব্বতের রাত বড় নিঃশব্দ, সম্পূর্ণ জগৎটাই যেন ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবার জন্য মনে হয় একটা পেঁচাও সেখানে নেই।

গ্রামবাসীদের অনুরোধে পরেরদিনও আমাদের থাকতে হল। আমাদের নিয়েই তাদের আনন্দ, সারাদিন ধরে গ্রামবাসীরা আমাদের চারদিকে ঘোরাফেরা করে। আমাদের আর একটা কাজ হচ্ছে তাদের বাড়ীতে বাড়ীতে যাওয়া, লামাদের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া একটা পুণ্য কাজ, আর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে লামাকে খাওয়ানো তো একটা বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। সেদিন বিকেলে আমিও এরকম একটা আমন্ত্রণ পেয়ে

গেলাম। সোরণ থাপে নিয়ে গেছে গুরুজীকে, অন্যান্য লামারাও গেছেন বিভিন্ন গ্রামবাসীদের সাথে। আমি আমন্ত্রিত হলাম দোরজের বাড়ীতে। দোরজে ভদ্রলোকের বাড়ীটা খুব কাছে। আমাদের দেশের মাটির ঘরের মতো, জানালা দরজাগুলো খুব ছোট ছোট, চারটে ঘর, তারমধ্যে দুটো ঘরের কোন জানালা নেই। তাদের বড় ঘরে এসে আমি বসলাম। দোরজের ছোট পরিবার। ভদ্রলোকের বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি, তার স্ত্রীই মনে হয় তার থেকেও বেশী সমঝদার। তিব্বতে দেখেছি মেয়েদের প্রভাব খুব বেশী, বিশেষ করে বিবাহিতা মহিলারাই মনে হয় সংসারের মালিক। একাধারে তারা ঘরে কাজ করছে, আর স্বামী, পুত্র-কন্যার দেখাশুনা করছে, অন্যদিকে জমিতে গিয়ে পুরুষের সাথে সমান তালে কাজ করছে। তিব্বতী মেয়েদের কর্মতৎপরতার প্রশংসা করতেই হবে।

দোরজের ঘরে বিরাট একটা চটের গদি পাতা। গদীর ভেতরে মনে হয় শুকনো খড় ঠাসা, তারই উপরে ভদ্রলোক আমাকে বসালেন। শ্রীমতী দোরজে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন, তিনি জানেন যে আমি তাদের ভাষা জানি না, তাই আমাকে হাত ধরে গদীর থেকে তুলে দিলেন। তারপর দড়িতে ঝোলানো তার অতি ময়লা সেমিজটা নিয়ে গদীতে পেতে আমাকে সসম্মানে সেই আসনে হাসিমুখে আবার বসিয়ে দিলেন। তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে মনে হয় ভর্ৎসনার সুরে বললেন—এই ময়লা গদীতে সাধুজনকে বসতে দিতে আছে? যদিও আমার কাছে এই পরিবর্তনটা বিরাট কিছু নয় কিন্তু আমার প্রতি তার নিষ্ঠা ও যত্ন দেখে আমি হেসে তাকে আশীর্বাদ করলাম—মা, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

শোবার ঘরের পাশেই ছোট্ট একটা বারান্দা, আমাদের বসিয়ে রেখে শ্রীমতী দোরজে সেখানে গেলেন। ঘরের নমুনা দেখেই বুঝলাম যে সেটি রান্না ঘর। রান্নাঘরের কোন দরজা বা জানালা নেই। তিনি উনোন ধরাতেই কাঠের ধোঁয়ায় সম্পূর্ণ ঘরটা ভর্তি হয়ে গেল। কয়েক শতাব্দীর পুরানো গামলাটায় তিনি জল চাপালেন, মনে হয় অতিথি সৎকারের জন্য। আমি বসে বসে ঘরের অল্প আলোতে তা দেখতে লাগলাম। জলের মধ্যে তিনি চীনা জমাট চায়ের কিছুটা ভেঙ্গে দিলেন সেদ্ধ করতে। সাধারণ তিব্বতীরা পুরোনো চায়ের পাতাই বার বার সেদ্ধ করে খায়। আমার জন্যই মনে হয় তিনি নতুন পাতা ভেজালেন। তিব্বতী চা-এর মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার সাথে মাখন মেশানো। সরু কাঠের চোঙ্গার মধ্যে গরম জলের সঙ্গে চা মিশিয়ে ঢেলে দেওয়া হয়, তারপর তার সাথে মেশানো হয় মাখন। সেই চোঙ্গার মধ্যে মাখনটাকে ঘোলের সরবতের মতো করে মেশানো হয় তাতেই লাগে সময়। শ্রীমতী দোরজে তার স্বামীকে ডাকলেন সাহায্য করার জন্য। চা করাটা সত্যি হাঙ্গামার ব্যাপার বটে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ছেলেমেয়েরা এসে হাজির হল, বড় দুই মেয়ে বয়েস উনিশ কুড়ি হবে আর তারপরে ছোট ছোট আরও চারটি। দোরজে এবার তার বড় মেয়ের ওপর মাখন মেশানোর ভার দিয়ে আমার কাছে ফিরে এসে বসলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হামালদিস্তের মধ্যে মশলা বাটার মতো করে মেয়েটি চা তৈরী করতে লাগলো। মাঝে মাঝে সে তার মায়ের সঙ্গে

কথা বলছিল। প্রায় এক ঘণ্টা পর চায়ের সঙ্গে মাখনটা মিশে গেলে তাকে আবার গরম করে একটা লম্বা বাঁশের চোঙ্গায় করে ভদ্রমহিলা আমাকে দিলেন। এত কষ্টে তৈরী চা নিশ্চয় ভালো হবে। ঘরের আর কাউকে তিনি দিলেন না। সাধু-সেবাই বোধ হয় তাদের উদ্দেশ্য। আসলে আমি সাধু নই, কিন্তু সরল দোরজে পরিবার সে কথা বুঝবে না। কাজেই তাদের নিরাশ না করে, হাসিমুখে চুমুক দিলাম। চায়ের মধ্যে কি ছিল জানি না কিন্তু একটা বিশ্রী গন্ধ নাকে যেতেই আমি থামলাম। আমি খুব ভালোভাবে সেই ভাবটা গোপন করে গেলাম। চায়ের ব্যাপারে তিব্বতীরা খুব সেন্টিমেন্টাল, তাদের অসন্তুষ্ট করলে আমাদের পথে কাঁটা পড়তে পারে। ঘরে কোন জানালাও নেই যে তার বাইরে ফেলে দেবো, শুধু তাই নয় এই চায়ের মধ্যে রয়েছে শ্রীমতী দোরজে ও সম্পূর্ণ পরিবারের পবিত্র ভাব। এরা গরীব যা পারে তাই দিয়ে অতিথি সেবা করেছে, এই স্বাদকে তাই খারাপ বলি কি করে, এরা হয়তো এরকমই পছন্দ করে। যুক্তি তর্ক দিয়ে নিজেকে বোঝালাম বটে কিন্তু তবুও দ্বিতীয় বার মুখে ছুঁয়েও তা ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হলাম। অন্য কোন উপায় না দেখে আমি দোরজের ছোট ছেলেকে আদর করে কাছে নিয়ে এলাম তারপর পরম স্নেহের ভাব দেখিয়ে তাকে আমার কোলে তুলে বসালাম, এইবার তার মুখের কাছে বাটিটা ধরে বললাম—খাও। আশ্চর্য! আমার এই ব্যবহারে কেউ এতটুকু টুঁ শব্দ করল না। ছেলেটি এক চুমুক খেয়ে সেও মুখ ফেরালো, এবার তার বড় ভাইকে ডাকলাম সেও এসে এক চুমুক খেল, তারপর আর কোন অসুবিধা হল না, শেষের দিকে দোরজের মেয়েরাও আমার কাপ থেকে চা খেলো, অনেকটা প্রসাদ-প্রাপ্তির মতো হল। খালি কাপটা শ্রীমতী দোরজের হাতে দিয়ে বললাম—খুব ভালো হয়েছে।

আমার কথা শেষ হবার সাথে সাথে তিনি উঠে গিয়ে সেই কাপে আরও কিছুটা চা ঢেলে দিলেন। কি সর্বনাশ, ভালো বলেও বিপদ। এবার তিনি আমাকে হাব ভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে ছেলেমেয়েদের আর দিতে হবে না আমি নিজেই যেন তা পান করি। আমার চারদিকে সবাই বসে আছে আমার দিকে তাকিয়ে, এ যেন জোর করে চিরতার জল খাওয়ানো হচ্ছে।

উপায় নেই তাদের খুশী করতেই হবে। এবার মনে মনে ভাবলাম তিব্বতে প্রথম এই ধরনের পরিবেশে পড়েছি, এই পরিবারকে দুঃখ দেওয়াও আমার উচিত নয়। এই দেশে যখন এসেই পড়েছি কাজেই এদের খাওয়া ও সামাজিক ব্যবস্থার সাথে আমাকে খাপ খাইয়ে নিতেই হবে। অভ্যাসে সবই সয়। এইসব ভেবে আমি চা-এ চুমুক দিলাম। মনে হয় নুন মেশানো হয়েছে, চিনির স্পর্শ মাত্র নেই। এই শীতে দুধকে মাখন করে রাখার সুবিধা, ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে মাখনগুলো শক্ত হয়ে থাকে। মাখনের স্বাদটাও অন্য রকম, মনে হয় ইয়াকের দুধে তা প্রস্তুত। এর আগে রাস্তায় আমরা চা খেয়েছি কিন্তু তাতে মনে হয় কিছুটা গুড় মেশানো ছিল। আমাকে যে বাঁশের তৈরী কাপটা দেওয়া হয়েছিল তাতে কম করেও আমাদের দেশের চার-পাঁচ কাপ চা ধরে যাবে। আমি চা

খেয়ে হাসিমুখে তাদের আবার ধন্যবাদ দিলাম, আমার পেটে যে তার জন্য পাক খাচ্ছে সে ভাবটা অতি সাবধানে গোপন করে গেলাম।

আমাকে ঘিরে তারা বসে রইল, আমার বলার ভাষা নেই নয়তো অনেক কথাই বলতে পারতাম কারণ সাধুবাবা তার মৌনী চেলাকে এখানে ব্রত ভাঙ্গবার আদেশ দিয়েছেন, সুযোগ আছে, অথচ উপায় নেই। দোরজে পরিবারের সবাই আমাকে ঘিরে বসে আছে; দেখে মনে হয় তার মেয়েদের বয়স আমার থেকেও বেশী, আমি তাদের সন্তানতুল্য। তাদের সকলের চোখে মুখে ফুটে রয়েছে এক আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব। সময় কাটাবার জন্য আমি মাঝে মাঝে ছোট ছেলেটির সাথে হাসি বিনিময় করতে লাগলাম। তারপর মনে হল এরা হয়তো আমার কাছ থেকে কোন প্রার্থনা বা শ্লোক শুনতে চায়। সে কথা মনে করে আমি চোখ বুজে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে কবিগুরুর লেখা আমার অতি প্রিয় একটি কবিতা আবৃত্তি করলাম। আসলে এই কবিতার সাথে স্থান কালের কোন মিল নেই, কিছু একটা বলার জন্যই বলা মাত্র। আমার আবৃত্তির শেষে শ্রীমতী দোরজে আস্তে আস্তে ঘর থেকে সকলকে বাইরে নিয়ে গেলেন, তার স্বামীও উঠে গেলেন কিন্তু ভদ্রমহিলা আমাকে জোর করে বসিয়ে রাখলেন। তারপর ভদ্রমহিলা নিজেও বেরিয়ে গেলেন। ঘরের মধ্যে বসে রইলাম আমি ও আমার মুখোমুখি তার বড় মেয়ে যে চা তৈরী করতে সাহায্য করেছিল। মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগল, কিন্তু কেন?

মেয়েটা আরও কাছে এগিয়ে এল—আমার ঠিক মুখোমুখি হয়ে বসল। ওর মুখের সহজ আর পবিত্রভাব, তুষারশুভ্র চোমলহারির মতোই নিষ্কলঙ্ক। আমার মধ্যের সেই পুরোনো বিমলটা যেন ধাক্কা দিতে লাগল—কেন? মেয়েটা আমার দিকে লাজুক চোখ তুলে কি যেন বললো, আমি বুঝলাম না। তার মাথায় হাত দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন। আমি তোমার কথা কিছু বুঝছি না তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

আমার মনের মৌনীবাবা তখন অন্তর্ধান হয়েছেন। আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম, ষোল বছরের একটি বাঙ্গালী ছেলে মুখোমুখি একটি তিব্বতী যুবতীর সাথে বসে! সে কি চায়, এদের রীতিনীতিই বা কি, আমারই বা কি কর্তব্য? বুকের মধ্যে রক্তপ্রবাহ যেন বেড়েই চলল। অনেকদিন যাবৎ এ অবস্থার মুখোমুখি হইনি। এ পরিবেশে কি করা উচিত, ভালো করতে গিয়ে মন্দও হতে পারে। আমার সামান্য চালে ভুল হলে সম্পূর্ণ সন্ন্যাসীর দলটাই হয়তো পড়বে বিপদে। খুব সাবধানে মনের কৌতূহল সংযত করে রাখলাম। তারপর কর্তব্য ঠিক করার জন্য চোখ বুজে জপতে লাগলাম মণি-মন্ত্র।

আমাকে ধ্যানস্থ দেখে মেয়েটি নিজেই কথা বলতে আরম্ভ করলো। আমি বুঝি বা না বুঝি তাতে তার কিছু যায় আসে না, সে বলে যেতে লাগল তার কাঁহানী। মাঝে মাঝে সে চোখ তুলে আমার দিকে তাকায় তারপর আবার বিড়বিড় করে কি যেন বলতে থাকে। মনে হয় সে তার মনকে উজাড় করে তার অন্তরের কথা শোনাচ্ছে। কিন্তু কি

বলছে ভগবান জানেন। তারপর ঠাকুর প্রণাম করার মতো করে আমাকে প্রণাম করলো এবং আমার দিকে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর সে বেরিয়ে গেল, ঘরে একে-একে তার বাবা, মা ও ভাই-বোনরা ফিরে এল। আরও কিছুক্ষণ বসে আমি উঠলাম। দোরজে পরিবারের সবাই এল আমার সাথে সাথে বাংলোয়। ভেবেছিলাম গুরুজীকে সেখানে পাবো, তাঁর কাছে সব কিছু বলে এর ব্যাখ্যাটা শোনা যাবে। বাংলোতে এসে দেখলাম তিনি নেই, অর্থাৎ তিনি তখনও ফেরেননি। কাজেই হাসিমুখে দোরজে পরিবারের সকলকে সেই রাত্রের জন্য বিদায় জানালাম। আমাদের দলের প্রত্যেকটি লামার সাথে আমার ভাষা ছাড়াই ঘনিষ্ঠতা জমে উঠেছে। তাদের নামগুলোর সাথে আমার পরিচয় হয়নি। আমি তাদের সাথে অবশ্য ইশারাতেই কাজ সারি, তাদের মধ্যে যিনি খুব চালাক-চতুর, তিনি অন্যান্য লামা অপেক্ষা বয়সে ছোট, গুরুজীর অবর্তমানে তিনিই ছোটখাটো দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে তিনি এগিয়ে এসে আমাকে হাসিমুখে বললেন—ভক্তরা কিছু কিছু সব্‌জি, চাল ও গম নিয়ে এসেছে চল দেখা যাক কি রান্না করতে পারি।

এ অঞ্চলটা তিব্বতের উচ্চাংশ। ফারিজোং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৫,০০০ (পনেরো হাজার) ফুট উঁচুতে। তুনাও প্রায় তার কাছাকাছি উচ্চতায়। খাংমা বা নিয়াং নদীর উপত্যকাটা অপেক্ষাকৃত কম উঁচু কিন্তু দার্জিলিং বা গ্যাংটকের তুলনায় এ অনেক অনেক উঁচুতে। হিমালয়ের ছাদ এখানে শুধু বরফের রাজত্ব। এখানে একমাত্র ভারতের সাথে বাণিজ্য পথের দরুনই মনে হয় এই শহরগুলো গড়ে উঠেছে, নয়তো এখানে চাষ-আবাদ প্রায় অসম্ভব। সাধারণ লোকেরা গরু-ভেড়া চরিয়ে খায়, আর খুব স্বল্পস্থায়ী গরমের সময় সামান্য বার্লি ও যবের চাষ করে, তবে সে চাষ অধিকাংশ সময়ই ঘরে তোলবার আগে বরফে নষ্ট হয়ে যায়। এমতাবস্থায় লামা যখন আমাকে বলল—সব্‌জি পাওয়া গেছে তাতে আনন্দের চেয়ে বেশী আশ্চর্য হলাম। যাই হোক রান্নাঘরে গিয়ে সত্যি অবাক হলাম। সের পাঁচেক আলু, বারো তেরোটা পাহাড়ি বিট আর বার্লি। গ্রামের একজন মাখন দিয়েছে, কাজেই আমাদের পক্ষে এ এক বিশেষ দিন। লামা আমাত্য (তার নাম) আমাকে সব্‌জিগুলো কাটতে নির্দেশ দিলেন। বার্লির খিচুড়ি করা হবে।

পরের দিন ভোরবেলা উঠেই দেখি বারান্দায় শ্রীমতী দোরজে ও তার মেয়ে কড়াইয়ের আগুনটাকে মাঝখানে রেখে বসে আছেন। মনটা অকারণেই জিজ্ঞাসু হয়ে উঠল, কি ব্যাপার এই ভোরবেলা এরা কেন? গতকাল আমার ব্যবহারে এরা কি কিছু খুঁত পেয়েছেন। যাই হোক, আমি যথারীতি কম্বলটা ভাঁজ করে, চোখ রগড়াতে রগড়াতে গুরুজীর কাছে এলাম, তিনি তখনও ওঠেননি। আমি সেখানে বসে রইলাম—যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি ঘুম থেকে ওঠেন। ইতিমধ্যে জানালা দিয়ে শ্রীমতী দোরজের সাথে চোখাচোখি হতেই তিনি ও তার মেয়ে জিভ বার করে সুপ্রভাত জানালেন। আমি তাদের কাছে না গিয়ে গুরুজীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই গুরুজী উঠলেন, আমাকে কাছে বসতে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা

করলেন—ভালো ঘুম হয়েছিল তো?—আজ্ঞে হ্যাঁ, উত্তর দিলাম। তারপর বিনীতভাবে তাঁকে জানালাম যে বাইরে তাঁর জন্য মনে হয় এক ভদ্রমহিলা অপেক্ষা করছেন। তাই নাকি, বলে তিনি ঘর থেকে বেরোলেন, আমিও তাঁর সাথে বাইরে এলাম, আমাদের ঘর থেকে বেরোতে দেখেই শ্রীমতী দোরজে বারান্দার কোণে রাখা একটা হাড়ি নিয়ে এসে আমাদের কাছে দিলেন। তারপর সবিনয়ে বললেন—আপনাদের জন্য চা এনেছি।

আবার চা, তার ওপর এই সকালে! চা কথাটা শুনেই কেন জানি না পেটের ভেতর পাক দিয়ে উঠল, মনকে একটু শান্ত করলাম। এরা গরীব শ্রদ্ধাভরে যা এনেছে তা পরমানন্দে গ্রহণ করা দরকার; তথাগত তাতে খুশী হবেন। চা গরম করে আমি ও গুরুজী ভদ্রমহিলার সামনে বসলাম, তিনি আগুনের কড়াইটা আমাদের দিকে একটু এগিয়ে বললেন—আপনার কথা শুনতে এলাম। গুরুজী আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যেন একথাটা আমারই উদ্দেশ্যে বলা। আমি সুযোগ বুঝে গুরুজীকে গতকালের ঘটনাটা সব খুলে বললাম—তারমানে চা পর্ব থেকে আরম্ভ করে তার মেয়ের কথা সব। আর একথাও গুরুজীকে খুলে বললাম যে আমার ইচ্ছে থাকলেও তার মেয়ে আমাকে যা যা বলেছে তার বিন্দু বিসর্গও বুঝিনি। গুরুজী আমার কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর তাদের সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। মেয়েটি সলজ্জভাবে তার কাপড়ের খুঁট চিবোতে লাগলো। আর মাঝে মাঝে আমার সাথে দৃষ্টি বিনিময় হতে লাগলো। তাদের কথা থামলে, গুরুজী আমাকে বুঝিয়ে বললেন সব। অর্থাৎ দোরজে পরিবার আমার উপস্থিতিতে খুবই সম্মানিত হয়েছে আর আমার মধুর ব্যবহার তাদের সকলেরই খুব ভালো লেগেছে। তিব্বতের রীতি অনুযায়ী সাধু-সজ্জন দেখলে যুবতী মেয়েরা তাদের গোপন কথা জানায় ও বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। আবার অনেক সময় কোন দোষ করলে তার জন্য ক্ষমা চায়। দোরজের বড় মেয়েও গতকাল তার মনের কথা জানিয়েছে। সে জানতো যে আমি তার কথা বুঝি না তা সত্ত্বেও সে সব খুলে বলেছে। তাতে মেয়েটির বুক খুব হালকা হয়ে গেছে আর তার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি অন্তর্যামী, আমি মুখ দেখলেই নাকি সব বুঝতে পারি। বুঝলাম ছোট হলেও আমার প্রতি মেয়েটার বিশ্বাস ও ভক্তি খুব গাঢ়। আমি নিজেকে খুব ধন্য মনে করলাম, তবে মনে মনে ভাবলাম যে এই মেয়েটি আমাকে না বলে যদি গুরুজী বা অন্য কোন লামাকে বলতো তাহলে হয়তো তার সহজ মীমাংসার জন্য উপদেশ পেত। আমার মতো এক ভণ্ডকে বলে সে কি লাভবান হতে পারবে? ভগবানের কাছে তার কথা পৌছে দেবার ক্ষমতা আমার কোথায়! এই মুহূর্তে নিজেকে খুব অপরাধী বলে মনে হল। কিন্তু কি-ই বা করতে পারি। এই ছোট্ট পরিবারের জন্য এতটুকু উপকার করার ক্ষমতাও বোধ হয় আমার নেই। অথচ তারা মন উজাড় করে দিয়েছে তাদের আন্তরিক বিশ্বাসে। মেয়েটির বিশ্বাস যে, আমি অন্তর্যামী আমি তার আবেদন সব বুঝেছি, কাজেই সে নতুন করে অন্যের সামনে কিছু বলবে না।

আমরাও বেশ কিছুক্ষণ নীরব হয়ে বসে রইলাম। তারপর গুরুজীকে বললাম—আমার হয়ে যা হোক কিছু বলে দিন না। তিনি মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি

জানালেন—প্রশ্ন না জেনে কি উত্তর দেওয়া যায়! বিশেষ করে এরকম বিষয় নিয়ে ছেলেমানুষি করতে নেই। তাঁর কথা শুনে আমি মনে মনে হাসলাম—ছেলেমানুষি! আমাকে দীক্ষা দিয়ে কি তিনি ছেলেমানুষি করেননি? আমাকে মৌনী-বাবা সাজিয়ে তিনি কি ছেলেমানুষি করেননি? অবশ্য তার ভালো-মন্দের বিচার করা আমার কাজ নয়। এখন আমার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে এই সমস্যার সমাধান করা। শ্রীমতী দোরজে আর তার মেয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছেন, আমার কাছ থেকে জবাব না পেলে তারা হয়তো উঠবেন না। মহা সমস্যায় পড়েছি। একদিকে ভন্ডামী আর একদিকে বিবেক এই দুই সমস্যার মাঝে আমি পড়েছি। জবাব আমাকে দিতেই হবে গুরুজী আমার হয়ে এক্ষেত্রে কিছু বলবেন না, তিনি তর্জমা করে দেবেন মাত্র। আমি মেয়েটির মুখের দিকে তাকালাম সহজ সরল ও পবিত্রতার প্রতিমূর্তি, তাকে আবোল-তাবোল বলে ঠকাতে বিবেকে বাঁধছে। বলা যায় না এটাও হয়তো আমার উন্নতির পথে এক ভাগ্য পরীক্ষা। হঠাৎ মনে এক বুদ্ধি এল। গুরুজীকে বললাম বুঝিয়ে দিতে। মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে আমি বললাম, "সোমম্ (মেয়েটির নাম) তুমি আমাকে উপলক্ষ্য করে যে সব কথা বলেছো তা আমি না বুঝলেও অন্তর্যামী জ্ঞানী ও ধ্যানী বুদ্ধ ঠিক শুনেছেন। তাঁর ওপর ভরসা রেখে তুমি জীবন পথে এগিয়ে চল, তিনি তোমার মঙ্গল করবেনই। আমি তিব্বতের সবচেয়ে বড় মন্দিরে তোমার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো, আমি তোমাকে কথা দিলাম।

গুরুজী আমার এই কথাগুলো বুঝিয়ে দিতেই মা ও মেয়ে দু'জন আমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলো। তাদের মুখ উজ্জ্বল হাসিতে ভরে উঠল। এর চেয়ে বড় উপহার যেন আর হতে পারে না। তার মা আমাকে ছুঁয়ে বললেন—আমি জানি তুমি সব শুনেছো ও বুঝেছ—তোমার জয় হোক! তোমার জয় হোক!

তিব্বতী কথাগুলো সরাসরি বুঝতে পারলে খুবই ভালো হতো। মা ও মেয়ে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেল, আমি তাদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। নিষ্কলঙ্ক ও নির্মল চরিত্রের এমন নিদর্শন আমার জীবনের এক স্মরণীয় অধ্যায়। মানুষকে যারা ভগবান বলে মনে স্থান দেয় তারাই মনে হয় ভগবানের প্রিয়সন্তান।

মহাতীর্থের পথ

শ্রীসোরন থাপের আতিথেয়তায় আমাদর খুব ভালোভাবে বিশ্রাম হচ্ছে। আর সেই সাথে সাথে গ্রামবাসীদের সঙ্গে মেশবারও সুযোগ হয়েছে। তারই পরামর্শে গ্রামের আর চারজন বিশিষ্ট লোকের সাথে শ্রীথাপে আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করতে চান। তারা এ অঞ্চলের পথ-ঘাট ভালোভাবে জানেন, এ বিষয়ে পরামর্শ দেবেন। বাংলোয় আগে ঠাকুর চাকর ছিল, কিন্তু আজকাল অতিথির সংখ্যা খুব কম, প্রায় নেই বললেই চলে। কাজেই আমাদের মতো অতিথিদের দেখা শোনার ভার পড়েছে গ্রামবাসীদের উপর। তারা সব সময়ে আমাদের চারপাশে ঘিরে রয়েছে। যদিও আমাদের চাহিদা খুবই কম তবুও তারা সেবার জন্য সব সময়ই তৈরী। আমরা পরামর্শের জন্য বসলাম, গ্রামের লোকেরা আমাদের জন্য চা প্রস্তুত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

গুরুজীর সাথে পথ সম্পর্কে এ পর্যন্ত কোন কথাই হয়নি। আমি শুধু জানতাম যে তিব্বতে যাচ্ছি, এখন জানি তিব্বতে এসেছি। এরপর কোথায় যাবো, কোথায় থাকবো, কি খাবো তার সব দায়িত্বই নিয়েছেন গুরুজী, আমাদের কাজ এগিয়ে চলা। কাজেই গ্রামের মোড়লদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা আমার কাছে খুবই আগ্রহের ব্যাপার।

কথাবার্তায় এই প্রথম জানতে পারলাম আমাদের ভবিষ্যৎ পথ, ওখান থেকে আমরা যাবো গীয়াৎসে (Gyatse)। তারপর সেখানে থেকে পূর্বদিকের পথ ধরে যাবো লাসায়। লাসায় লামাদের শরীর ও মন যদি সুস্থ ও ভাল থাকে তাহলে ফিরে আসা হবে ব্রহ্মপুত্র নদীর ধার ধরে শীগাৎসে (Shygatse) নামক শহরে। সেখান থেকে আবার শুরু হবে নতুন লক্ষ্যস্থল, কৈলাসনাথ ও মানস সরোবর তারপর আলমোড়ার পথ ধরে ফিরে আসবো ভারতে।

এই খাংমা গ্রাম থেকে সরাসরি লাসায় যাবার একটা পথ আছে, গুরুজীর ইচ্ছা ছিল সে পথ ধরার কিন্তু শোরনজী বলেছেন যে গীয়াৎসে আমাদের যেতেই হবে। টেলিগ্রামটা এসেছে সেখান থেকে, সেখানকার পুলিশ-অফিস আগে থাকতেই জানিয়ে রেখেছে সেখানে আমাদের রিপোর্ট করতেই হবে।

তিব্বতের গুম্ফা মাত্রেই তীর্থক্ষেত্র, ঠিক যেমন ভারতের মন্দিরগুলো। কিন্তু তার মধ্যে প্রধান প্রধান স্থানগুলোতেই তীর্থযাত্রীরা বহু যুগ ধরে যাতায়াত করে আসছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য লাসা, শীগাৎসে ও কৈলাসনাথের মন্দিরগুলো। লামা ও সাধুদের তিনটি স্থানই মহাতীর্থ, কৈলাসনাথ তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মানীয় স্থান দখল করে আছে। পাঁচ বছর আগেও এসব জায়গা ছিল ভারতীয়দের জন্য মুক্ত, আজকাল

রাজনৈতিক কারণে সে পথ দিন দিন বন্ধ হয়ে আসছে। চীনা বা হান্‌দের কোন ধর্ম নেই, রাজনীতিই তাদের ধর্ম আর নেতারাই দখল করে আছে ঈশ্বরের স্থান। তবে এখন পর্যন্ত তারা তীর্থযাত্রীদের উপর কোন রকম বাধা নিষেধ জারী করেনি। তবে ভারতীয় সে তীর্থযাত্রীই হোক অথবা স্বর্গযাত্রীই হোক না কেন তাদের প্রবেশ নিষেধ। নেপালীদের জন্য এখনও পথ খোলা আছে, আমি সেই পথেরই পথিক। সাধারণ তিব্বতীদের কাছে নেপাল, সিকিম, ভূটান সবই ভারতের অঙ্গ এদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

সিকিম থেকে এ পর্যন্ত চলার পথে আবহাওয়াও প্রচুর পাল্টেছে। নাথুলা পার হবার আগে ও পরে পেয়েছি ঠাণ্ডা বাতাস তার সাথে ছিল ভেজা বাতাস কিন্তু তাংলা পার হবার সাথে সাথে সে বাতাস উধাও হয়েছে, এখন পাচ্ছি ঠাণ্ডা শুকনো বাতাস, তাতে হাড়ে কাঁপুনি ধরে। রাতের বেলা যদি আগুন না পাওয়া যেত তাহলে আমাদের পক্ষে এতদূর পর্যন্ত আসা সম্ভব হতো না, দেহটাকে রাস্তায়ই রেখে আসতে হতো।

এখন আমরা রয়েছি বরফের রাজত্বে। হিমালয় পার হতে আমাদের লাগলো পনেরো দিন। এখন আমাদের চারদিকে ছোট-খাটো পাহাড়-উপত্যকা, আর বরফ গলে সৃষ্টি হওয়া পাহাড়ী নদী। ঠাণ্ডা বাতাস দিনের বেলা সূর্যের তাপে একটু দূরে গিয়ে অপেক্ষা করে, সন্ধ্যে হলেই সে আবার নেমে আসে। রাতের ঠাণ্ডা এখানে ভয়ংকর। তিব্বত এক অদ্ভুত দেশ। তার দক্ষিণে হিমালয় পর্বতশ্রেণী, আর উত্তরে কুয়েন লুন পর্বতশ্রেণী। এই দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যে লুকিয়ে আছে এই ভীষণ ঠাণ্ডার দেশ, যার উচ্চতা গড়ে প্রায় তেরো থেকে পনেরো হাজার ফুট আর তাপমাত্রা ওঠে একশ পাঁচ ডিগ্রি পর্যন্ত আর নামে শূন্যের থেকেও পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি নীচে। এখন সবে বরফ পড়া বন্ধ হয়েছে, সূর্যের তাপে দিনেরবেলা আস্তে আস্তে সেগুলো গলতে শুরু করেছে মাত্র। ঠিক গরমকাল এখনও অনেক দূরে।

চুম্বিভ্যালীর পর যতই উত্তরে যাচ্ছি ততই আমরা প্রবেশ করছি বরফের রাজত্বে। এই অঞ্চলে লোকবসতি আছে একমাত্র ভারত-তিব্বত ট্রেড রুট-এর জন্য। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যে নদীটি চলছে সেটা এই অঞ্চলের বরফগলা জলধারা নিয়ে আরও উত্তরে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিশেছে। এই নীয়াং নদীর ধার ধরে এগিয়ে গেলেই পাওয়া যাবে গীয়াৎসে শহর। খাংমা থেকে সংক্ষেপে লাসার দিকে যে পথ গিয়েছে ইচ্ছা থাকলেও সে পথে আমরা এখন যেতে পারছি না অথচ গীয়াৎসে আমাদের যেতে হবে।

সভায় অনেকেই আমাদের সুপরামর্শ দিলেন যে একসঙ্গে না গিয়ে দুটো বা তিনটে দলে বিভক্ত হয়ে গেলেই ভালো, কারণ আর মাইল দশেক উত্তরে হান্ সৈন্যদের বিরাট ঘাঁটি আছে, তারা অকারণে হয়রান করতে পারে। বিশেষ করে আমরা আসছি ভারত থেকে, তারা এই তীর্থযাত্রীদের গুপ্তচরও ভাবতে পারে।

তাদের দ্বিতীয় পরামর্শ হচ্ছে যতটা সম্ভব বড় গুম্ফাগুলো এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। গীয়াৎসের মন্দিরগুলোতে হান্-সৈন্য মোতায়েন আছে, বিদেশী দেখলেই তারা প্রশ্নবাদ করে। বর্তমানে আমাদের উদ্দেশ্য লাসা; লাসা যাবার জন্যই আমাদের অনুমতিপত্র

আছে সেখানে ভয় নেই। গ্রামবাসীরা আমাদের আরও কয়েকদিন রাখতে চায় কিন্তু আমাদের ইচ্ছা যতদূর এগিয়ে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল।

তিব্বতে আর একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম, সাধারণ তিব্বতীরা এমন কি সোরন থাপে মশাইও এখানকার বিভিন্ন শহরের দূরত্ব জানেন না। মাইলের হিসাব কেউ জানে না, দূরত্ব বোঝায় দিন বা বেলা দিয়ে। অর্থাৎ এখান থেকে ওখানে এক বেলার পথ, পাঁচ-দিনের পথ, সাড়েসাত-দিনের পথ ইত্যাদি। ফাড় জোং ও গীয়াৎসের মধ্যে মাঝে মাঝে যদিও লরি যাতায়াত করে কিন্তু তা যাত্রী বহন করে না। যাতায়াতের জন্য গাধা, ঘোড়া, ইয়াকের গাড়ী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের জন্য পাল্কি ব্যবহার করা হয়।

সভা শেষ হল আলোচনা ও চা চক্রের মাধ্যমে। আমাদের যেতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

তিন রাত সেখানে বিশ্রাম করে আমরা গ্রামবাসীদের বিদায় জানাতে বাধ্য হলাম। আমাদের বিদায়কালে গ্রামবাসীদের অনেকেই গামলায় জল এনে তাতে আমাদের পা ধুইয়ে দিল, সেই সাথে সাথে আমরাও তাদের আতিথেয়তার জন্য আন্তরিক আশীর্বাদ জানালাম, তারপর সমবেত প্রার্থনা করে আমরা পথে নামলাম। আমাদের সাথে সাথে গ্রামবাসীরাও এগিয়ে চলল আমাদের কিছুদূর এগিয়ে দেবার জন্য। গ্রামবাসীদের মধ্যে দোরজে পরিবারও আমার সাথে সাথে চলল। অকারণেই সোমমের দিকে বার বার আমার দৃষ্টি পড়তে লাগলো, মনে হল ওকে কিছুই দিতে পারলাম না। হঠাৎ মনে হল আমার কাছে কয়েকটা বাড়তি রুদ্রাক্ষের হাত-মালা আছে, আমি চলতে চলতে ব্যাগ থেকে সেটা বার করে নিলাম। তারপর শেষ মুহূর্তে সোমমের হাতে গুঁজে দিলাম, হেসে মনে মনে বললাম—এটাই আমার শেষ উপহার। আমি জানি লামাদের কাছ থেকে জপমালা পাওয়া তিব্বতীদের কাছে মহাভাগ্যের বিষয়।

তীর্থযাত্রীর প্রথম অঞ্জলি

পরের দিন সকালের দিকে দু'পাশের পাহাড়গুলো যেন আস্তে আস্তে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। নীয়াং নদীর সেই প্রশস্ত রূপ ক্রমশ সীমিত হতে লাগল। শেষে আমরা যেখানে হাজির হলাম সেখানে নীয়াং-চু উপত্যকা, মনে হলো দুই পাহাড়ের মধ্যে নদীটাকে মাঝখানে রেখে সম্পূর্ণ উপত্যকাটা ঢুকে গেছে এক রহস্যময় জগতে।

নাথু-লাতে উঠবার সময় রাস্তা অনেকটা এরকমই ছিল, তবে সেটা ছিল উঠবার মুখে। কিন্তু এবারে রাস্তাটা নেমে গেছে নীচের দিকে।

বিরাট নদীটা আস্তে আস্তে মনে হচ্ছে পাতালের দিকে নেমে গেছে। হঠাৎ তীর্থযাত্রীদের কৌতূহল আর উৎসাহ যেন শতগুণে বেড়ে গেল। আমাদের চলার গতি আপনা থেকেই যেন বেড়ে গেল। উপরে নীল আকাশ, আর আমাদের দু-পাশের পাহাড়গুলো দেয়ালের মতো নদীটার দু-পাশে সরে এসেছে। নদী থেকে সেই দেয়ালটা মনে হয় কম করেও তিন হাজার ফিট উঁচু। আসলে এই নীয়াং-চু নদীটা হাজার হাজার বছর ধরে চেষ্টা করার পর তৈরী করেছে এই ভয়ংকর পথ। জল পাহাড়কে কেটে করেছে রাস্তা, নদীর শান্ত রূপ এখানে রুদ্র রূপে পরিণত হয়েছে। এখানে তার সংহার মূর্তি, ভীষণ তার রূপ। ধ্বংস লীলার সাক্ষী এখনও বর্তমান। বিরাট বিরাট পাথরগুলো নদীটাকে বাধা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে পড়ে আছে। নদীর শক্তি এখানে কেন্দ্রীভূত হয়ে শত বাধাকে তুচ্ছ করে এগিয়ে চলেছে। ভীষণ তার রূপ আর ভয়ঙ্কর তার শব্দ।

বন্যা নদীর এক সংহার মূর্তি, বৃষ্টির মূর্তি অন্যরকম। আর এখানে দেখছি তার পাহাড় ফাটানো মূর্তি। আরও কাছে আসতেই আমাদের কাছে এক অনবদ্য রূপের আবির্ভাব হল। স্বপ্নরাজ্যের দুয়ার হঠাৎ যেন গেল খুলে। নীলাকাশের নীচে আমাদের এই পৃথিবীতে লুকিয়ে ছিল পৃথিবীর এই বিস্ময়। এই অনিন্দ্যসুন্দরের বর্ণনা লেখার ভাষা আমার নেই। শুধু আমি নই, আমরা সবাই হঠাৎ স্থির হয়ে গেলাম। এই অনন্ত সৌন্দর্য হঠাৎ যেন আমাদের বুকে আনন্দের আঘাত হেনেছে। ঝরনার সৌন্দর্য আর কাকে বলে! আমাদের বিহ্বলভাবটা কাটাতে একটু সময় লাগল, তারপর সমবেতভাবে আমরা সেই রুদ্রারূপী সুন্দরী ভৈরবীকে আরাধনা করতে লাগলাম—

হে দেবী!

তুমি রূপ ও অপরূপের অধিষ্ঠাত্রী
তুমি আলো ও অন্ধকারের দেবী

তুমি জ্ঞান ও অজ্ঞানের ওপারে বিরাজিতা।
আমাদের শক্তি দাও তোমাকে উপলব্ধি করার
আমাদের চোখ দাও তোমাকে দেখবার
তোমার নিরাকার রূপের সাকার রূপ দর্শন করাও
আমাদের এগিয়ে নিয়ে চল—এগিয়ে নিয়ে চল
এগিয়ে নিয়ে চল।।

নদীটা তার সমস্ত শক্তি নিয়ে হঠাৎ যেন আছাড় খেয়ে নীচে পড়েছে, আর তারই ফলে জলটা ফেটে গিয়ে সাদায় সাদা হয়ে গেছে। সেই একই নীয়াং নদী এখানে হাজার ঝরনায় রূপান্তরিত হয়েছে। মনে হচ্ছে হাজার হাজার রূপসী তাদের সাদা মেখলা ছড়িয়ে কোন এক অজ্ঞাত দেবতার উদ্দেশ্যে নাচ করছে। তারই উপর সূর্যের আলো পড়ে ছোট ছোট রামধনুর সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন আকারের পাথরগুলোকে কেন্দ্র করে তারা যেন তাদের নিজস্ব খেলায় মত্ত। পাথরগুলোও বিভিন্ন রঙের, তার মধ্যে শেওলা জমে সৃষ্টি করেছে সবুজ ঝালর। তারই পাশে রয়েছে অনেকগুলো চৈত্য বা চোরতেন আর পাহাড়ের দেয়ালে কোন এক অজ্ঞাত শিল্পীর অমর শিল্পপ্রতিভার স্বাক্ষর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জ্যোতির্ময় ভগবান বুদ্ধের শান্ত মূর্তি। পৃথিবীর এই নির্জন প্রান্তে প্রকৃতি ও পুরুষের চলছে এক অনন্ত লীলা। শিবময় পাহাড়ের ওপর নদীময় প্রকৃতির এই লীলা রহস্যের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সৃষ্টি রহস্য।

পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলো বুদ্ধ মূর্তি খোদাই করা আছে, অজন্তার ফ্রেস্কোর মতো, এগুলোও অতি প্রাচীন। নীল, লাল, হলুদ ও সবুজ রঙের এই মূর্তিগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে ভগবান পদ্ম সম্ভবার মূর্তি। পাহাড়ের গায়ে লেখা আছে—'আমাকে পূজা না করে যারা এগিয়ে যাবে তাদের পথ অন্ধকার।' তাই তীর্থযাত্রী মাত্রেই এখানে পূজা ও অর্ঘ্য নিবেদন করতে বাধ্য। কৈলাসের পথে এখানেই নিবেদন করতে হয় প্রথম অর্ঘ্য।

পদ্ম সম্ভবাকে বলা যায় তিব্বতের মুখ্য দেবতা, ভগবান বুদ্ধেরই আর এক রূপ। তিব্বতের যে কোন গুম্ফাতে তাঁর মূর্তি পাওয়া যাবেই। তিনি ছিলেন আসলে একজন নামকরা কাশ্মীরী পণ্ডিত। তাঁকে তিব্বতের রাজা এনেছিলেন তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য। তিনি গূঢ় তন্ত্রশাস্ত্র ও বৌদ্ধধর্মের সংমিশ্রণে রূপ দিলেন বৌদ্ধ-তন্ত্রের।তাঁর অলৌকিক ক্রিয়া ও অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে তিব্বতের অধিবাসীরা তাঁর পায়ে আত্মসমর্পণ করলেন। তিব্বতের কোন কোন মঠ ও মন্দিরে ভগবান বুদ্ধের থেকে পদ্ম সম্ভবাই উচ্চে স্থান পেয়েছেন। তিব্বতের সহজ মানুষের কাছে তিনি গুরু রিম্পোচে নামে পরিচিত। গুরু রিম্পোচে মানে অমূল্য গুরু; যাঁর গুণকে জাগতিক কোণ দ্রব্য দিয়েই কেনা সম্ভব নয়। তিব্বতের অনেক বইয়ে তিনি উরগীয়ান লামা বলেও অভিহিত হয়েছেন! তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা ছিল অসীম। গুরু রিম্পোচ আসার পর তিব্বতের আদি দৈত্য ও প্রেতাত্মাদের মধ্যেও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়ে যায়। গুরু রিম্পোচে তাদের স্ববশে এনে, মানুষদের মনে আস্থা এনে দেন। গুরু

রিম্পোচে মাঝে মাঝে শূন্যপথে চলে যেতেন কৈলাসে, সেখানে তিনি শাসন করতেন দুষ্ট আত্মাদের। পদ্ম সম্ভবার ঐশ্বরিক ক্ষমতা ছিল, আর তাঁর যাদু বিদ্যার ফলে পূর্বের পিশাচ সিদ্ধরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে পদ্ম সম্ভবার ধর্মীয় একাধিপত্য মেনে নিয়েছিল। পদ্ম সম্ভবাই বলতে গেলে তিব্বতে স্থায়ীভাবে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই বৌদ্ধ ধর্মের সাথে তন্ত্র সাধনাকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে দেন। এই ভাবেই তিব্বতে সৃষ্টি হয়েছেবৌদ্ধ-তন্ত্র। তাঁরই উপদেশে তিববতী রাজা ত্রি-স্রোন-দে-সান্ এদেশের সর্বত্র মঠ বিহার ও চৈত্য স্থাপন করেন। সেটা ছিল সম্ভবত সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকে। সিকিম বা ভূটান হয়ে যে সব তীর্থযাত্রীরা কৈলাসে যান তাদের কাছে তিনি অনেক সময় পদ্মাসন বাবা বলেও পরিচিত।

পদ্ম সম্ভবার মুর্তির আশপাশে আরও অনেকগুলো মূর্তি রয়েছে; তার মধ্যে ধ্যানীবুদ্ধ, মঞ্জুশ্রী ও অবলোকিতেশ্বরের মূর্তিগুলো সবই ধ্যানমগ্ন। ধ্যনের এত সুন্দর পরিবেশ জগতে বিরল। তারই আর একপাশে আমাদের নজরে পড়ল সারি সারি চৈত্য। রাস্তাটা এগিয়ে গেছে আর তারই দু'পাশে সৃষ্টি হয়েছে এই সুন্দর তীর্থক্ষেত্রটি। জায়গাটির নাম নীয়াং-চু-চোরতেন। চৈত্য আর ঝরনার নামানুসারেই এই স্থানটির নাম।

এখানে ছোট একটি গুম্ফা পাওয়া গেল। গুম্ফা না বলে বলা যায় পুরানো একটা মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। সেখানে আমরা আমাদের জিনিসপত্র রেখে দিলাম, তারপর তৈরী হলাম আরাধনার জন্য। গুরুজী বললেন—এখানে আমরা ঘন্টাখানেক থাকবো। অর্থাৎ পূজো, আহ্নিক ও রান্নাবান্না করে খেতে খেতে প্রায় বিকেল হয়ে যাবে। তারপর আবার চলতে হবে। এখানে রাত্রিবেলা থাকা চলবে না। ঝরনার জন্য এখানকর বাতাসও খুব ভারী, আমাদের মধ্যে অনেকেরই সর্দি কাশি হয়েছে তারা কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। গুরুজী আমাদের বার বার করে বললেন—ধ্যানস্থ হয়ে এ জায়গাটার মাহাত্ম্য অনুভব করবার চেষ্টা কর। স্থান-মাহাত্ম্যের কথা বহুবার শুনেছি, কিন্তু তাকে যে উপলব্ধি করা যায় সে কথা এই প্রথম শুনছি। কৈলাসের পথে এ আর এক নতুন অভিজ্ঞতা।

গীয়াৎসে শহরে প্রবেশের আগে কয়েকটা কথা জেনে রাখা ভাল। ভগবান বুদ্ধের তিনটি প্রধান রূপ—ধ্যানী বুদ্ধ, ধ্যানী বোধিসত্ত্ব, মানসি বুদ্ধ। তিব্বতী ভাষায় তাদের নাম যথাক্রমে—ও-পা-মে, চেন্-রে-জি ও শাক্য থুপ। সংস্কৃতে তাদের বলা হয় অমিতাভ, অবলোকিতেশ্বর ও শাক্যমুনী। তিব্বতে বুদ্ধ মঠ ও বিহারগুলো এই তিন শ্রেণীর মধ্যে পড়ে, তবে এ ছাড়াও বহু শাখা-প্রশাখা রয়েছে। পাঞ্চেন লামাকে বলা হয় অমিতাভ বুদ্ধ বা তাশি লামা, আর দালাই লামা হচ্ছেন অবলোকিতেশ্বরের রূপ, দালাই লামার স্থানীয় নাম চেন্-রে-জি।

আমাদের উদ্দেশ্য পাঞ্চেন লামা ও দালাই লামা দর্শন। তারপর আমরা যাবো কৈলাসের পথে।

ভগবান বলেছেন—দেহই দুঃখের কারণ, মন সেটা প্রকাশ করে মাত্র। দুঃখ আছে,

ও-পা-মে বা অমিতাভ বুদ্ধ

শাক্য-থুপ বা শাক্য মুনী

চেন্-রে-জি বা অবলোকিতেশ্বর

ঐশ্বর্য প্রদায়িনী মহাজ্ঞানী আর্য-তারা

ভগবান বুদ্ধের এই চার প্রকার রূপ তিব্বতের সর্বত্রই চোখে পড়ে।

আর দুঃখের মুলে আছে তার কারণ। দুঃখটাকে নাশ করতে হলে নাশ করতে হবে তার কারণ।

আমরা আজ হিমালয়ের দুর্গম পথ অতিক্রম করে পৌঁছেছি তিব্বতে, পৃথিবীর ছাদে। এখানকার মতো শুদ্ধ বাতাস আর নেই, এমন পবিত্র ভূমি আর দ্বিতীয় নেই। যদিও প্রচণ্ড শীতে আমাদের কষ্ট হচ্ছে তবুও এই শান্ত নীরবতা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এই পবিত্র ভূমিতে বসে গভীরভাবে চিন্তা কর আমার কি কোনো দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ কি? দুঃখটা আধিভৌতিক, আধিদৈবিক না আধিআত্মিক? চিন্তা কর, ভেবে দেখো, তুমি যদি সম্পূর্ণ ভাব ও বিশ্বাস দিয়ে জানতে চাও তাহলে পদ্ম সম্ভবা নিজে আসবেন তোমাকে সাহায্য করতে।

লামারা প্রত্যেকেই জ্ঞানী, সবাই বলতে গেলে দার্শনিক। গুরুজী এ পর্যন্ত পথ প্রদর্শক ছিলেন, আজ সকালে তিনি হঠাৎ ভূমিকা নিলেন গুরুর। নদীর ধারে সকলকে বসিয়ে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন কি করতে হবে। এখন সকাল, রোদের তেজটাও আস্তে আস্তে বাড়ছে। নদীর কাছেই আমরা পেলাম ছোট্ট উষ্ণ প্রস্রবণ, নদীর কাছেই ছোট্ট এই কুয়োর মতো জায়গাটায় জল জমে আছে, জলে হাত দিয়ে দেখি কি অদ্ভুত, এই চারদিকে বরফের রাজত্বে আমাদের জন্য কে যেন গরম জল করে রেখেছে। জলের তাপমাত্রা মনে হয় শরীরের তাপমাত্রার চেয়ে দু'এক ডিগ্রী বেশীই হবে। তারই ধারে বসে আমরা ধ্যানে মগ্ন হলাম।

ঘন্টাখানেক বাদে আমাদের ধ্যান ভাঙার পর, আমরা সকলে মিলে উলঙ্গ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম সেই জলে, আ! কি আনন্দ। প্রায় দেড়মাস পর এই প্রথম গায়ে জল পড়ছে, চারদিকে বরফ এটা বরফেরই দেশ, আর তারই মধ্যে আমরা উলঙ্গ হয়ে স্নান করছি, প্রকৃতির কি অদ্ভুত খেলা। গুরুজী আমাদের হুঁশিয়ার করে দিলেন, এরপর আমাদের স্নান আর হবে কি না সন্দেহ, কাজেই ভালোভাবে স্নান করে নাও। আমরা স্নান করে যেন নবজীবন পেলাম। সেই প্রস্রবণের ধারেই আমরা রান্না আরম্ভ করলাম। গতকাল নীয়াং-চু গুম্ফা ছাড়ার পর আমরা রাত্রিবেলা একটা ভাঙা বাড়ীতে কাটিয়েছি, রাতে খাওয়াও কিছু হয়নি কাজেই আমরা প্রত্যেকই ক্ষুধার্ত। কাঠ আমাদের সঙ্গেই ছিল। গুরুজী সকলকে সাবধান করে দিলেন—এই প্রস্রবণের জলটা দেহের পক্ষে ভাল কিন্তু খাবার জন্য নয়, এই জল খেলে বদহজম ও পেটে গণ্ডগোল হবার সম্ভবনা আছে। এই জলে গন্ধকের পরিমাণটা খুব বেশী।

কাছেই গীয়াৎসে, অনেকে গীয়ান্‌সে বা গীয়াচ্চেও বলে অভিহিত করে। পাহাড়ি পথে চলতে চলতে গুরুজী সবাইকে হঠাৎ অপেক্ষা করতে বললেন, তারপর পাহাড়ের অবস্থান ঠিক করে আমাদের ঘোষণা করলেন—খুব শীগগীরই আমরা গীয়াৎসে শহরে ঢুকবো। সেখানে ঢোকার পথেই হান্‌দের চৌকি পেরোতে হবে, তোমরা ধৈর্য ধরে থাকবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর যাতে আমরা ভালোভাবে এই শেষ চৌকিটা পেরোতে পারি।

গুরুজীর কথায় আমরা খুবই উৎসাহিত হলাম। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পাবো তিব্বতের অন্যতম ঐতিহ্যমণ্ডিত শহর। তিব্বতের তিনটি শহর ব্যবসা বাণিজ্য ও

শিল্পকলার জন্য প্রাচীন কাল থেকেই প্রসিদ্ধ। তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে লাসা যেটি তিব্বতের রাজধানী, দ্বিতীয় শীগাৎসে, ও তৃতীয় গীয়াৎসে। লাসা মহামান্য দালাই লামার স্থান, শীগাৎসেতে থাকেন শাক্য অবতার পাঞ্চেন লামা, আর গীয়াৎসে বুদ্ধস্থাপত্য ও তীর্থক্ষেত্রের জন্য প্রসিদ্ধ। কিছুক্ষণ পর আমরা একটা পাহাড়ের পাঁচিল পেরোতেই সামনে ঠিক পাহাড়ের নীচে আমাদের নজর পড়ল। বিরাট সমতল ভুমিটার মধ্যে হঠাৎ যেন আকাশ থেকে সোনা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এটাই গীয়াৎসে।

সকালের সূর্যরশ্মি সেই শহরের সোনালী ছাদে ঠিকরে পড়ছে, আমরা আছি অনেক উঁচুতে। এখান থেকে শহরটাকে দেখে মনে হচ্ছে এক যাদুপুরী।

গুরুজী আমাদের বুঝিয়ে দিলেন—এই গীয়াৎসে শহরটাকে পরিষ্কারভাবে দু'ভাগ করা হয়েছে, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে অগণিত বাড়ীঘর রাস্তা ইত্যাদি, সেটা হচ্ছে শহরের এক অংশ; শহরের দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য। শহরের দ্বিতীয় অংশ মনে হচ্ছে বিরাট একটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সেই অংশে রয়েছে পবিত্র মন্দির ও বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় সংস্থা। গীয়াৎসের মুল মন্দির সেখানেই অবস্থিত। ওই প্রাচীরের মধ্যে যে সবচেয়ে বড় সোনালী রঙের ছাদটা দেখতে পাচ্ছো সেটাই এখানকার মূল মন্দির। কাছে গেলে দেখতে পাবে এটা বৌদ্ধ জগতের এক অমর সৃষ্টি, তিব্বতী ভাস্কর্যের প্রাণ ওখানেই লুকিয়ে আছে।

গুরুজীর কথামতো আমরা ভালভাবে চারদিক দেখতে লাগলাম, এ পর্যন্ত যতগুলো শহর পেয়েছি তার সঙ্গে এর যেন তুলনাই চলে না, একনজরে দেখলেই বোঝা যায় যে এটি একটি সমৃদ্ধ শহর। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই শহরর সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম ঠিক তারই কাছে পেলাম একটি চৈত্য। চৈত্যটির কাছে বসে আমরা গীয়াৎসে শহরে ঢোকবার আগে শেষ বিশ্রাম করে নিলাম।

এবার আমাদের নামার পালা। আধঘন্টা পরই আমরা পেলাম শহরের শুরু। আমাদের ডানদিকে অনেকগুলো বস্তি বাড়ী, তার পেছনে যাযাবরদের তাঁবু, অনেকগুলো ইয়াক ও গাধা তারই আশপাশে পাথরে মাটির উপর ঘাস খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আমাদের সকলেরই লামার পোশাক, আর আমাদের সংখ্যাও কম নয়। কাজেই রঙচঙে এই তীর্থযাত্রীর দল শহরবাসীদের চোখে পড়বেই। ইয়াকগুলো আমাদের দেখে থমকে দাঁড়ালো, কয়েকটা ভেড়া তাদের ভাষায় চীৎকার করে আমাদের স্বাগতম জানাল আর তার চেয়েও বেশী আপন করা অভ্যর্থনা পেলাম এখানকার গ্রাম রক্ষীবাহিনীর কাছ থেকে, তারা সদলবলে তারস্বরে চীৎকার করতে করতে ছুটে এলো আমাদের সামনে, আমরা দাঁড়াতে বাধ্য হলাম। তাদের ঘেউ ঘেউ শব্দ আজকাল আমাদের কাছে পরিচিত। তিব্বতের এই যমদূত-তুল্য প্রহরীদের এড়িয়ে এগিয়ে চলে এমন সাধ্য কার। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে একটা মাছিও বুঝি প্রবেশ করতে পারবে না। তবে আমার মনে হয় চীনা ড্রাগনদের এরা ভয় করে নচেৎ এই দেশে তারা কি করে বাসা বাঁধল।

এই কুকুরগুলোর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, দাঁড়িয়ে পড়লে এরা আর কিছু করে না,

আস্তে আস্তে যে যার পথ দেখে। এই শহরে প্রবেশ পথেই এমন অভ্যর্থনা। আমার কাছে এটা একটা খুব ভালো ইঙ্গিত বলে মনে হল না। কুকুরের ডাকে এদিক-ওদিক থেকে রাস্তার কাছে লোকজন এসে জড়ো হতে লাগল। আমাদের দেখেই তারা জিভ বার করে ওদের রীতি অনুযায়ী শ্রদ্ধা জানাতে লাগল। কয়েকটা বস্তীবাড়ী পেরিয়ে আমরা ঢুকলাম সত্যিকারের শহরে। দু'পাশে মাটি পাথর ও সিমেন্টের সম্ভ্রান্ত বাড়ী ও দোকান। রাস্তার ধারেই চা ও তেলেভাজার দোকান, উল মুদিখানার দোকানগুলোও বেশ সম্ভ্রান্ত। একটা গলিতে মাংসের দোকানও আমাদের চোখ এড়াল না, এই বাড়ীগুলো আমাদের দেশের মতোই ঢালাই ছাদের। বারান্দা ও উঠোন রয়েছে মজলিশের জন্য। দোকানে যারা কেনা বেচা করছে তাদের অধিকাংশই মহিলা। বাজারটা অনেকটা দার্জিলিং-এর সবজি বাজারের মতো তবে তার তুলনায় অনেক ছোট আর নোংরা তো বটেই। অনেকগুলো ভেড়া ও ইয়াক রাস্তার ওপরেই খুঁটি দিয়ে বাঁধা, সম্ভবতঃ সেগুলোকে বিক্রির জন্য রাখা হয়েছে। আমাদের কথা ইতিমধ্যেই শহরে ছড়াতে আরম্ভ করেছে। তীর্থযাত্রী দর্শন তিব্বতীদের কাছে এক পুণ্যের ব্যাপার। তবে তীর্থযাত্রীরা যদি ভিখিরি হয় তাহলে তাদের দিকে কেউ তাকায় না। লামা তীর্থযাত্রীদের সম্মান অনেক আর ভারতীয় তীর্থযাত্রী মানেই গুরু স্থানীয়। ওরা ভাবে ভারত থেকে যারা আসে তারা সবাই পুণ্যাত্মা।

বাজারের ঠিক মাঝখান দিয়েই রাস্তাটা এগিয়ে চলেছে, বাজারের ঠিক শেষের দিকে একটা বড় চায়ের দোকান দেখে আমরা থামলাম। পুরী বা গয়ার মতো এখানে তীর্থস্থানে পাণ্ডার উপদ্রব নেই বলেই মনে হয়, অন্ততঃ এ পর্যন্ত তো তাই মনে হল। আমাদের কাছে কেউই কোনরকম উৎপাত করতে আসেনি। চায়ের দোকানের বাইরে দুটি মেয়ে কাঠের লম্বা চুঙ্গাতে মাখনের সাথে চা মেশাচ্ছে, বড় বড় দোকানের এই ধরনের চা মেশাবার জন্য আলাদা লোক রাখা হয়, তাদের কাজ শুধু চায়ের সাথে মাখন মেশানো। দোকানের ভেতরে আমরা সবাই ঢুকলাম। দোকানের ঠিক মাঝখানে একটা বিরাট কাঠকয়লার উনোন তারই চারপাশে ভিড় করে ঠাসাঠাসি ও গোল হয়ে বসে আছে দশ-বারোজন লোক। আমাদের দেখে তারা সসম্ভ্রমে তাদের গোলটা বড় করে তাদের মধ্যে আমাদের ডেকে নিল, প্রত্যেকের হাতেই চায়ের গ্লাস।

আমরা সকলে এক গ্লাস করে চা খেয়ে দাম মিটিয়ে দিলাম। এই শহরটা ভারতবর্ষের ছোট-খাটো শহরের মতোই বলতে হবে, তবে রাস্তায় কোন গাড়ী ঘোড়া নেই এই যা তফাৎ। রাস্তায় এরই মধ্যে চোখে পড়েছে কয়েকজন ভারতীয়, তারা আমাদের নমস্কার করে পাশ কাটিয়ে গেছেন। রাস্তাটা পাথরে বাঁধানো, সিমেন্ট বা পীচের নয়। আমাদের সামনে হঠাৎ তিনজন হান্ সৈনিক এসে বাধা দিল, তাদের সাথে একজন স্থানীয় তিব্বতী চৌকিদারও আছে। আমাদের সম্ভাষণ জানিয়ে তারা জিজ্ঞাসা করলো—

—কোথা থেকে আসছেন ?

—নেপাল থেকে। আমরা জবাব দিলাম।

—সিকিম হয়ে আসছেন কি ? তাদের পাল্টা প্রশ্ন।

—হ্যাঁ। আমরা গ্যাংটক, পেমাচৌকি, ফারি জোং ইত্যাদি হয়ে আসছি। গুরুজী তাদের বুঝিয়ে দিলেন।

তিব্বতী চৌকিদারটি হান্ সৈন্যদের বুঝিয়ে দিল আমাদের কথা। তিব্বতী সৈন্য ও হান্ সৈন্যদের দেখলেই বোঝা যায়। হান্ সৈন্যরা আমাদের দেশের সৈনিকদের মতোই খাঁকি পোশাক পরে। তাদের পরনে ফুল প্যান্ট, সার্ট, জ্যাকেট, বেল্ট-বুট, মাথায় টুপী ও হাতে রাইফেল। আর তিব্বতীদের পরনে ওদের ঢোলা লুঙ্গির মতো বেশ, তার সাথে ঢোলা পা-জামার মতো জামা। ইচ্ছা করলে একটা হাতা অনায়াসেই খুলে ফেলা যায়। সর্বোপরি আছে ভারী সোয়েটার। তাদের পোশাকগুলো এত ভারী যে মনে হয় প্রয়োজনবোধে এরা দৌড়তেও পারবে না। হান্ সৈনিকদের পোশাকেই আছে চতুরতার ভাব। হান্‌দের মুখগুলোও দেখলাম একটু হলদে ধরনের, আর তারা উচ্চতায় তিব্বতীদের তুলনায় ছোট।

তারা আমাদের অনুসরণ করতে বলল। বলাই বাহুল্য, আবার আমরা পুলিশি জেরার সম্মুখীন হতে চলেছি। মনে হয় এটাই আমাদের শেষ ঝামেলা, গীয়া ৎসের এই চৌকিটা পার হতে পারলে তারপর আর কোন ভয় থাকবে না। আমরা শহরের ভেতর দিয়ে আর একটা রাস্তা ধরে শহরের বাইরে চলে এলাম, সেখানে নজরে পড়ল সারি-সারি সৈনিকদের তাঁবু, আর কাঠ ও টিনের অস্থায়ী ঘর।

আমরা শেষে এসে হাজির হলাম ওখানকার সবচেয়ে বড় অফিসারের তাঁবুতে। বিরাট একটা মাঠের চারদিকে মিলিটারী প্যারেড হচ্ছে আর তারই মাঝখানে একটা তাঁবুর পাশে টেবিল-চেয়ার পেতে তৈরী হয়েছে অস্থায়ী কেন্দ্র।

তাঁবুর কাছে আসতেই নজরে পড়ল একটি ছোট গোলগাল ধরনের লোক, হঠাৎ দেখলে মনে হয় একটা খুদে সৈনিক। তার কাছে আসতেই আমাদের সঙ্গের হান্ সৈনকিরা স্যালুট করে দাঁড়াল। বুঝলাম এই খুদে লোকটিই হচ্ছে এখানকার সর্বেসর্বা। কলকাতার প্যারেড গ্রাউণ্ডে এই ধরনের রিপোর্ট অনেক দেখেছি। অফিসার ভদ্রলোক আমাদের দিকে হাসিমুখে এগিয়ে এসে করমর্দন করলেন, তারপর সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন—

—আপনাদের মধ্যে লিডার কে ? তিনি তিব্বতী ভাষায় কথাটা বললেন। বুঝলাম এই ভাষাটা তার ভালোই আয়ত্তে আছে।

গুরুজী কাগজপত্র বের করে বললেন—আমি এদের গাইড্। আমরা সবাই কাঠমাণ্ডুর স্বয়ম্ভূনাথ গুম্ফা থেকে আসছি। পথটাকে সংক্ষেপ করার জন্য আমরা সিকিম হয়ে আসছি। আমরা যাচ্ছি তীর্থ করতে, তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যাবো। গুরুজী অতি পরিষ্কাভাবে সংক্ষেপে আমাদের অভিপ্রায় জানালেন।

অফিসার ভদ্রলোক খুব ভালভাবে আমাদের অনুমতি পত্রটি পরীক্ষা করতে লাগলেন, তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন—

—কাগজে আছে পঞ্চাশজন, আর সীমান্ত পার হয়েছেন বত্রিশজন, বাকী লোক কোথায়?

—বাকিরা কেউ আসেনি।

—কেন?

—প্রবল ঠাণ্ডার জন্য তারা শেষে নারাজ হয়েছেন।

—হুম্! আপনারা এর আগে কোনোদিন এসেছেন?

—একমাত্র আমিই এখানকার রাস্তাঘাট চিনি, আমি তীর্থযাত্রীদের নিয়ে আরও অনেকবার এসেছি, তা ছাড়া এরা সবাই এই প্রথম।

—হুম্! সঙ্গে কি আছে?

—সামান্য খাবার আর দু'একটা বাড়তি কাপড়।

গুরুজীর উত্তর শুনে ভদ্রলোক কার নাম ধরে ডাকলেন। সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকটি পুতুলের মতো তার সামনে এসে হাজির হল। তারপর তার প্রভুর হুকুম অনুযায়ী জিনিসপত্র ঘাঁটতে লাগলো। বলাই বাহুল্য, সন্দেহজনক কোন মালপত্র আমাদের কাছে না পেয়ে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।

আমার দিকে বার বার সন্দেহের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাকালেও ফলতঃ ভদ্রলোক কোন জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না। খুবই কম বয়স ভেবে ছেড়ে দিলেন। ছাড়া পেয়ে আমরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। এত তাড়াতাড়ি আমরা নিষ্কৃতি পাব আশা করতে পারিনি। চীনা সৈনিকদের এলাকা ছেড়ে আমরা এবার এগিয়ে চললাম আরও দূরে বিরাট পাঁচিল ঘেরা অংশের দিকে। শহরের ঘন বসতি এলাকার মধ্য দিয়ে যাবার পথে শহরবাসীরা আমাদের শ্রদ্ধা জানাতে লাগলো। এখানকার বাসিন্দাদের দেখলেই মনে হয় যে এরা খুব সরল ও বিশ্বাসী। এই শহরটা তিব্বতের অন্যান্য শহরগুলোর চেয়ে পরিষ্কারও বটে।

প্রায় একঘন্টা চলার পর আমরা নির্দিষ্ট স্থানে এসে হাজির হলাম। তারপর বিরাট তোরণের ভেতর দিয়ে আমরা প্রবেশ করলাম সেই পুণ্যভুমিতে।

প্রাচীর ঘেরা এলাকাটা হচ্ছে একটা বিরাট মন্দির, এখানে ছোট বড় অনেকগুলো মন্দির রয়েছে। আমরা ভেতরে ঢুকতেই সামনে দেখতে পেলাম একটা চৈত্য, সেখানে আমরা কাঁধের মালপত্র নামিয়ে থামলাম। আমাদের দেখেই কয়েকটি ছোট লামা দৌড়ে এল তারপর গুরুজীর সাথে কথাবার্তায় জানল যে আমরা তীর্থযাত্রী। সেই কথা শুনেই তারা অদৃশ্য হল। আমাদের কথা পনের মিনিটের মধ্যেই সবাই জেনে গেলো। দু'জন বয়স্ক লামা আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। নমস্কার করে তারা বিনীতভাবে জানতে চাইলেন আমরা কতদিন থাকবো কোথায় যাবো ইত্যাদি। পরিচয় পেয়ে তারা বললেন—আসুন আপনাদের সাথে মুখ্য লামার পরিচয় করিয়ে দিই। তিনিই এখানকার সর্বেসর্বা।

অনেকগুলো মন্দিরের এদিক ওদিক দিয়ে ঘুরে আমরা এলাম একটা বিরাট মন্দিরের কাছে, সেখানে লামা আমাদের বললেন—আপনারা মন্দির প্রদক্ষিণ করতে থাকুন

আমি দেখছি খাম্পো আছেন কি না। দ্বিতীয় লামা আমাদের সাথেই রইলেন। মন্দিরটি বিরাট, মন্দিরের চারপাশের দেয়াল প্রার্থনা চক্রে ভর্তি। আমরা শুরু করলাম গীয়াংসের মন্দির পরিক্রমা , অর্থাৎ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে তারপর প্রার্থনা চক্র ঘোরাতে ঘোরাতে মন্দির পরিক্রমা। আর সেই সাথে মণি-মন্ত্র জপ। দার্জিলিং-এর ঘুম মন্যাস্ট্রি থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত যত মন্যাস্ট্রি দেখেছি তার সবগুলোতেই এই ধরনের প্রার্থনা চক্র পেয়েছি, গুম্ফার সাথে প্রার্থনা চক্র ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। এই মন্দিরের সাথে তার তফাৎ হচ্ছে যে এখানকার প্রার্থনা চক্রগুলো আরও বড় আর কাগজের বদলে প্রার্থনা-মন্ত্র সরাসরি টিনের পাতের ওপর খোদাই করা।

আমাদের তিনবার পরিক্রমা শেষ হলে আমরা বসলাম। প্রাচীর ঘেরা এই পবিত্র স্থানের চারদিকে আমরা অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম রঙচঙে মন্দিরগুলো। লামা হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে এলেন তার সঙ্গে আরও তিনচারজন লামা এসেছেন আমাদের দেখতে।

ভদ্রলোক আমাদের বললেন যে মহামান্য খাম্পো (মঠাধ্যক্ষ) তাঁর ঘরেই আছেন এবং আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। বড় মন্দিরের অনতিদূরেই পেলাম সাদা রঙের একটা বিরাট বাড়ী, তার বিরাট দেয়ালের ওপরে কাঠের সুন্দর কাজ করা ব্যালকনি, ব্যালকনিটা লাল-হলদে রঙের সুন্দর কাঠের খোদাই করা কাজে ভর্তি। বাড়ীটার দরজা জানালাগুলোর চারদিকেও লাল ও হলদে নক্সা করা। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে সামনেই একটা বিরাট হলঘর পেলাম। সেই ঘরটার এক কোণে চৌকির ওপরে কয়েকজন লামা বসেছিলেন, তাদেরই মধ্যে একজন হচ্ছেন এখানকার মঠাধ্যক্ষ, খাম্পো। তিনি উঠে এসে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানালেন, আমাদের সকলকে তিনি হাসিমুখে স্বাগতম জানিয়ে বসতে বললেন। গুরুজী তাকে স্বয়ম্ভূ গুম্ফা ও গ্যাংটকের মহারাজের খবরাখবর জানালেন, সেই সাথে সাথে রাস্তার খবরাখবরও বটে। খাম্পো আমাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন যে, এখানে কয়েকদিনের জন্য থাকা ও খাওয়ার বন্দোবস্ত তিনি করে দেবেন, তারজন্য কোন চিন্তা করতে হবে না।

তারপর তিনি একে-একে সকল লামাদের পরিচয় নিতে লাগলেন। গুরুজী আমার পরিচয় দিয়ে দিলেন—এ আমার শিষ্য। তীর্থের পথে সে মৌনব্রত অবলম্বন করছে। তীর্থের শেষে সেও পাকাপাকিভাবে লামা হয়ে যাবে। এখন ওকে কঠিন-ত্রাবা পথে দীক্ষা দিয়েছি।

মহামান্য খাম্পো গুরুজীর কথা শুনলেন তারপর ভালভাবে আমার দিকে নজর দিয়ে বললেন—একে দেখতে ঠিক নেপালীদের মতো নয়, যাই হোক এর বাবা বা মা হয়তো ভারতীয়। অবশ্য উত্তর ভারতের লোকদের সঙ্গে নেপালীদের—একটা বিরাট তফাৎ কিছু নেই। তবে এর বয়স খুবই কম, নয়তো হান্‌দের কড়া নজর এড়ানো মুশকিল হত, ওরা একদম ভারতীয়দের পছন্দ করে না।

আপনার অনুমান সত্য, চৌকিতে বার বার আমাদের এজন্য জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, তবে শেষ পর্যন্ত বয়স কম এবং তীর্থযাত্রী সেইজন্য আটকায়নি—গুরুজী বললেন।

খাম্পো আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন—তুমি মানুষ হও, তথাগত তোমায় রক্ষা করুন। তিনি শেষে তার এক সহকর্মী লামার ওপর আমাদের দেখাশুনার ভার ছেড়ে দিয়ে বললেন—আজ সন্ধেবেলা মন্দিরে দেখা হবে।

আমাদের থাকবার বন্দোবস্ত হল সেখানকার অতিথিশালায়, আর খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত হল সেখানকার লামাদের সাথে। মূল মন্দির থেকে অতিথিশালা মোটেই দূরে নয়। বিরাট কাঠের বাড়ীর একটা হলঘরে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হল। গ্যাংটক ছাড়ার পর এটাই ছিল আমাদের প্রথম লক্ষ্যস্থল। বিনা বাধায় আর অতি সহজে এখানে থাকবার অনুমতি পেয়ে আমরা ধন্য হলাম, স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। আমরা খুব ক্লান্ত তাই গুরুজী সকলকে নির্দেশ দিলেন ভালভাবে বিশ্রাম করতে।

সেদিন বিকেলে লামা ও ত্রাবাদের জমায়েত করে খাম্পো সকলের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তীর্থযাত্রীদের মধ্যে আমিই ছিলাম সবচেয়ে ছোট কাজেই সকলের দৃষ্টি পড়ল আমার দিকে। সিকিম থেকে এ পর্যন্ত এসেও আমি ক্লান্ত হইনি, এতে সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেছে। পরিচয় শেষে আমরা গেলাম তাদের সাথে খাবার ঘরে। সেখানে গুরুজীকে ঘিরে সকলে আমার সম্পর্কে হাজার প্রশ্ন করতে লাগল, আমি কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত, আমি কবে থেকে মঠে আছি, এই মহাতীর্থের জন্য আমাকে কি করে তিনি বাছাই করলেন, অধ্যাত্মমার্গের আমি এখন কোন স্তরে, আমার নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য আছে কি না ইত্যাদি ইত্যাদি। · · ·

পরের দিন খুব ভোরবেলা আমার ঘুম ভাঙলো। দিনের আলোয় ভাল করে এই পবিত্র শহরটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার জন্য আমার মন উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল। আমি ধর্মশালার ছোট জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম, দিনের আলো তখনও প্রকাশ পায়নি কাজেই আমাকে ধৈর্য ধরে আরও কিছুক্ষণ থাকতে হবে।

সূর্যোদয় দেখা আমার এক অতি প্রিয় নেশা, তাই বেশ কিছুক্ষণ বিছানায় এপাশ ওপাশ করে শেষে উঠতে বাধ্য হলাম। জানালা দিয়ে আর একবার বাইরের দিকে তাকালাম, বাইরের দৃশ্য আগের চেয়ে আরও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ব্যস, আর কথা নয়। তাড়াতাড়ি আমি কম্বলটা চাদরের মতো জড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম ঘর থেকে, আমার পরনে লামাদের মতোই পোশাক কাজেই ভোরের এই অল্প আলোতে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো কিছু আমার মধ্যে নেই। নির্ভয়ে আমি একটা ছোট পথ ধরে এগিয়ে চললাম। ধর্মশালার রাস্তাটা ছাড়াতেই দুটো কুকুর আমার দিকে চীৎকার করতে করতে ছুটে এল, কিন্তু আমার কাছে এসে থেমে গেল। আমি তাদের কোনো রকমে এড়িয়ে একটু এগুতেই পড়লাম একজন লামার সামনে। ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আমাকে ভালভাবে দেখে দু'হাত জোড় করে সম্মানসূচক নমস্কার জানালেন। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় যাবে ?

কুম্‌বুম্। আমি হেসে জবাব দিলাম। কারণ এ ছাড়া অন্য কোন নাম আমার মনে পড়ছে না। ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে চললেন কুম্‌বুমের দিকে। ভেবেছিলাম একা একা স্বাধীনভাবে এখানে ঘুরে বেড়াবো, ভোরের নিঃস্তব্ধতায় দেখবো এই পবিত্র শহরের

শান্ত রূপ আর সূর্যোদয়ের রঙিন আকাশ কিন্তু মনে হয় সেটা সম্ভব নয়, কারণ লামা ভদ্রলোক কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়ছেন না। আমরা চৈত্য কুম্‌বুমের কাছে এসে দাঁড়ালাম। এই লামাটি সঙ্গে না থাকলে আমি কি করতাম জানি না, কিন্তু ওর সামনে আমি খাঁটি লামার ভূমিকা নিতে বাধ্য হলাম নয়তো কথা উঠতে পারে। প্রবল শীত ও ঠান্ডায় শরীর জমে যাবার উপক্রম তারই ওপর আমি মাটিতে দণ্ডি কাটার মত শুয়ে পড়লাম—সাষ্টাঙ্গ প্রণাম সেরে প্রার্থনা চক্রের দিকে এগিয়ে গেলাম। তারপর সেই চক্রগুলো ঘোরাতে ঘোরাতে মন্দির পরিক্রমা করতে লাগলাম।

সাতবার পরিক্রমা করে তারপর আমি ধরলাম প্রধান দরজার রাস্তা, লামা ভদ্রলোক আমার সাথে সাথেই ভক্তের মতো রইলেন। আমার মনে হয় উনি এখানকার প্রহরী, কারণ চোখ-মুখ দেখে মনে হয় রাতে ঘুম হয়নি। কিন্তু তারই মধ্যে মুখের হাসিটা বড় চমৎকার। পাঁচিলের কাছে এসে দেখি সেখানকার সিংহ দরজা বন্ধ তারই পাশে ছোট দরজাটা খোলা, আর দরজার বাইরে আট-দশটা কুকুর শুয়ে আছে। দরজা পার হলেই মনে হয় আমাকে ধরবে, কাজেই বাইরে না বেরিয়ে পাঁচিলের ধার ধরে ধরে এগিয়ে যেতে লাগলাম। পাঁচিল বিরাট উঁচু প্রায় তিন মানুষ সমান ভেতর থেকে যেমন হঠাৎ বাইরে বেরোনো সম্ভব নয় তেমনি বাইরে থেকেও সাধারণ মানুষের পক্ষে ভেতরে ঢোকা অসম্ভব। পাঁচিলটা খুব আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠে গেছে। পাঁচিলটা এত চওড়া যে তার ওপর দিয়ে মনে হয় পাশাপাশি দু'জন লোক হেঁটে যেতে পারে। লামা ভদ্রলোক, আমি জানি না তিনি আমাকে নজরে নজরে রাখছেন কি না, আমার সঙ্গ কিন্তু কিছুতেই ছাড়ছেন না। একা একা আমি যাতে হারিয়ে না যাই, ছোট ছেলে ভেবে তাই হয়তো তিনি সাথে সাথে চলেছেন। মোটের উপর কারণটা যাই হোক না কেন তার সঙ্গটা আমার কাছে বাধোবাধো ঠেকতে লাগল।

আকাশ আগের চেয়ে অনেক পরিষ্কার হয়েছে। প্রাচীরের ওপাশ থেকে ঘন ঘন মুরগীর ডাক কানে আসছে। তবুও সূর্যদেবের দেখা নেই, এমনকি আকাশের রঙটাও সোনালি হয়নি, আমি নিরাশ হলাম। প্রাচীর ধরে আরও কিছুদূর উঠতেই হঠাৎ নজরে পড়ল সূর্যোদয়, আমি দাঁড়ালাম, টাইগার হিলের মত এখানে সূর্যের সেই মনোহর দৃশ্য দেখা যায় না বটে কিন্তু পৃথিবীর এই ছাদে দাঁড়িয়ে সূর্যদেবের আর্বিভাবের একটা আভিজাত্য আছে। সূর্যোদয়ের পরই শুরু হল তুষারে ঢাকা পর্বত শৃঙ্গের উপর তার রূপোলী আলোর খেলা। তাকে আহ্বান করার জন্য ঘুমিয়ে থাকা পর্বতশৃঙ্গগুলো যেন ধীরে ধীরে মাথা তুলে জেগে উঠতে লাগলো। স্বর্গের উর্বশীরা তাদের রূপালি চূড়ো নিয়ে যেন শান্ত ছন্দে নাচতে লাগল, পাহাড়ের এই চলন্ত রূপ এর আগে দেখিনি। সূর্য যতই উপরে উঠতে লাগলো তার আলোয় ছোট ছোট পর্বত চূড়াগুলো যেন আনন্দে মাথা নাড়াতে লাগল। এ দৃশ্যের জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না, গীয়াৎসের এই সূর্যোদয় আমার কাছে এক নতুন আবিষ্কার। আমি ইচ্ছে করে এখানে আসিনি, মনে হয় প্রকৃতিদেবী নিজেই আমার প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে এখানে আমাকে নিয়ে এসেছেন তাঁর এই অপরূপ লীলা দেখাবার জন্য। আমি টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় দেখেছি,

কন্যাকুমারী থেকে দেখেছি সূর্যাস্ত, কিন্তু এ দৃশ্য তার থেকেও অপরূপ, এ আর এক স্বপ্ন জগৎ। আমি হাত জোড় করে তাকে প্রণাম জানালাম। আমার অর্ঘ্য—

ওঁ সূর্যম্ সুন্দর লোকনাথম্ অমৃতং
বেদান্ত সারং শিবম্ ॥
জ্ঞানং ব্রহ্মময়ং সুরেশম্ অমলং লোকৈকচিত্তং স্বয়ম্
ইন্দ্রাদিত্য নরাধিপং সুরগুরুং ত্রৈলোক্য চূড়ামণিং
ব্রহ্মাবিষ্ণু শিব স্বরূপহৃদয়ং বন্দে সদা ভাস্করম্ ॥
ওঁ হিরণ্যময়েন পাত্রেন সত্যসাপিহিতং মুখম্
তত্বং পুষণ্ণপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥
পুষণ্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহম্ অস্মি ॥

তারপর কম্বলটা পাশে রেখে শুরু করলাম সূর্যপ্রণামের ব্যায়ামটা। লামা ভদ্রলোকটি শ্রদ্ধাভরে আমায় লক্ষ্য করতে লাগলেন। তারপর ধীরে ধীরে নেমে এলাম আমাদের ধর্মশালার দিকে। সেখানে এসে দেখি সবাই প্রায় প্রস্তুত হয়ে পড়েছে, বাইরে যাবার জন্য। আমি তাড়াতাড়ি কম্বল রেখে আমার উত্তরীয়টা নিয়ে নিলাম। আমাকে আর ব্যাখ্যা করতে হল না কোথায় গিয়েছিলাম বলে, সঙ্গের সেই লামা ভদ্রলোকই গুরুজীকে বুঝিয়ে দিলেন।

গুরুজী বললেন—আজ সকালবেলা গীয়াৎসের মঠ ও বিহার সমিতি আমাদের সম্বর্ধনা জানাবে, সেখানে যেতে হবে। প্রাচীরের ভেতরকার অংশটা পবিত্র মঠ, লামারা সবাই এখানেই থাকেন, কোনো মহিলা-লামা এখানে নেই। শহর থেকে কিছু মেয়ে ভক্তরা আসবে আর গীয়াৎসের পৌর প্রতিষ্ঠানের সভাপতিও আসবেন আমাদের স্বাগত জানাতে।

আমরা একটা বিরাট কাঠের বাংলোতে এসে তার বারান্দায় দাঁড়ালাম। বারান্দার ঠিক সামনেই মাঠ, সেখানে লোকজন এসে দাঁড়াতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের পাশে এসে যোগ দিল রঙচঙে বাদকের দল। তাদের পরনে লামার পোশাক মাথায় লম্বা মুকুটের মত টুপী, পায়ে লম্বা উলের জুতো আর তারই ওপর ঝালরে হাতের সূক্ষ্ম কাজ করা। শঙ্খের মতো তাদের লম্বা ভেরী বেজে উঠল, প্রায় পনেরো মিনিট ধরে তারা বিভিন্ন সুরে বাজাতে লাগল তাদের বাঁশী। মনে হল হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় তার শব্দ আঘাত করে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। সেই শব্দটা অনেকটা শঙ্খ ও সানাইয়ের মাঝামাঝি। সেই শব্দে যেন জেগে উঠল সম্পূর্ণ শহর। চারিদিক থেকে লামা ত্রাপার দল ছুটে এসে জড়ো হতে লাগল বাংলোর সামনের মাঠে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঠটা ভর্তি হয়ে গেল। আমাদের বারান্দাটা বেশ উঁচুতে তাই তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমাদের দেখতে লাগলো। ছোট ন'দশ বছর থেকে আরম্ভ করে নব্বই বছর

পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের এক লামা-সমুদ্র আমাদের সামনে তৈরী হল। সকলেরই প্রায় এক পোশাক—আর মুণ্ডিত মস্তক, মনে হচ্ছে এ দেশটাই ব্রহ্মচারী আর সন্ন্যাসীতে ভর্তি। এরকম দৃশ্য আমি কোনোদিনই দেখিনি। আর লামাদের পেছনে শহরবাসীরা একে-একে এসে জমা হতে লাগল। বারান্দার এক কোণে বিরাট একটা সিংহাসনের মতো চেয়ার রাখা ছিল, সেখানে এসে বসলেন মহামান্য খাম্পো।

বাজনাটা অনেকটা নহবৎখানার মতো, বাজনা দিয়েই তীর্থযাত্রীদের স্বাগতম জানানো হল। বাজনা থামলে মহামান্য খাম্পো জনসাধারণের কাছে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। গীয়াৎসের পৌর-প্রধান তারপর উঠে আমাদের সকলের হাত ধরে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি বললেন যে, তিব্বতের সাথে নেপালের বন্ধুত্ব অনেকদিনের তাঁর ইচ্ছা যে নেপাল থেকে আরও বহুসংখ্যক তীর্থযাত্রী এলে ভালো হয় তাতে দুই দেশের বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হবে। তিনি আমাদের তীর্থের সফলতা কামনা করলেন। তাঁর ছোট্ট হৃদ্যতাপূর্ণ ভাষণ শেষ হলে শুরু হল সমবেত প্রার্থনা। প্রার্থনার শেষে ত্রাপা ও লামারা একে-একে এসে আমাদের হাত ছুঁয়ে স্বাগতম জানাতে লাগলো। লামাদের অভিবাদন আমার কাছে এক চিরস্মরণীয় ঘটনা। তাদের প্রাণের প্রাচুর্য আর সদাহাস্য মুখ আমাকে অভিভূত করল। প্রায় একঘণ্টা ধরে চলল একের পর এক সেই অভিবাদন। এই মন্দির প্রাচীরের ভেতরের শহরটায় যে এত লোক আছে তা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। তারপর শুরু হল শহরবাসীদের শ্রদ্ধা নিবেদন। তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই গড় হয়ে প্রণাম করতে লাগল। ছোট শিশু-বালক-বালিকা যুবক-যুবতী বয়স্ক ব্যক্তিরা সকলেই আমাদের দর্শন চায়। তীর্থযাত্রীরাই মনে হয় শহরের মূল আলোচনার বিষয়। শহরবাসীদের মধ্যে অনেকে আমাদের ছোট কাপড় বা তাংখা দিয়েও তাদের শ্রদ্ধা জানালো। আমার এই বয়সে এতগুলো লোকের ভক্তিঅর্ঘ্য পাওয়া নিশ্চয়ই পূর্বজন্মের সুকৃতি আর গুরুজনদের স্নেহ ও আশীর্বাদের ফলস্বরূপ।

শেষের দিকে আর একবার মন্দিরের বাদকরা তাদের ভেরী বাজিয়ে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিল। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর আমরা নিষ্কৃতি পেলাম। মহামান্য খাম্পোকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর সাথে আর একবার প্রার্থনা শেষে আমাদের সভা ভঙ্গ হল। বেলা তখন প্রায় দশটা। খাম্পো'র সাথে আরও দশ এগারোজন উচ্চস্থানীয় লামা ছিলেন। তাঁদের সাথে আমরা বারান্দায় বসে তিব্বতী চা ও বিস্কুটে সকালের খাওয়া শেষ করলাম। খাম্পো আমাদের আশ্বাস দিয়ে দিয়ে বললেন যে, তিনদিন আমরা অনায়াসে সেখানে থাকতে পারি ও আমরা খুশীমতো চলাফেরার অনুমতি পেলাম।

কুম্‌বুম্‌ হল একটি চৈত্য। এটি দূর থেকে মন্দিরের মতো দেখায়। এই স্তূপটিতে মহামান্য দোরজে চাং মুনীর অনন্ত দেহকে ধরে রাখা হয়েছে। দেখতে অনেকটা কাঠমাণ্ডুর স্বয়ম্ভূনাথ মন্দিরের মতো উপরে ঠিক ওরকমই দুটো বুদ্ধের চোখ আঁকা।

কুম্‌বুম্‌ কথাটার ঠিক তর্জমা করলে হয় 'হাজার বিগ্রহের মন্দির'। হাজার বিগ্রহই

বটে, স্তূপটির মূল ভিত্তি লম্বায় একশ আট হাত, চওড়ায় একশ আট হাত। আর চারতলা বা চারটি ধাপে এটাকে দাঁড় করানো হয়েছে। উপরের দিকটা সম্পূর্ণ গাঢ় সোনালী রঙে ঢাকা, আর নীচের দিকে রয়েছে অন্যান্য রঙ। তার মধ্যে সাদাই বেশী। স্তূপটির চারদিকে প্রার্থনা চক্র তো আছেই, আর তার চেয়েও বেশী আছে মূর্তি। দেয়ালের উপর পাথরের খোদাই কাজে ভর্তি যেমন দেখেছি কোণারকের সূর্য মন্দিরে। এত মূর্তি সত্ত্বেও স্তূপের গঠনে এতটুকু খুঁত নেই।

মণ্ডপের উপর দাঁড়িয়ে আছে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্-এর সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি, ধ্যানীবুদ্ধের অনন্ত দেহ। শূন্য, মহাশূন্য, সূক্ষ্ম, মহাসূক্ষ্ম এখানে তার রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কুম্‌বুম্ তিব্বতী ভাস্কর্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভক্ত ও ভক্তি এখানে এক হয়ে ধরা দিয়েছে, জগৎ ধীরে ধীরে উঠে গেছে সূক্ষ্ম জগতের দিকে। চারতলা এই স্তূপটির মধ্যে রয়েছে চুয়াত্তরটি মন্দির। জগতের বিভিন্ন মতবাদকে খণ্ডন করে ভগবান তথাগত এক মনোমন্দির গঠন করেছেন, স্থূল জগতের 'যত মত তত পথ' সূক্ষ্ম জগতের এক পথে গিয়ে পৌঁছেছে। ত্রিতাপ দুঃখের কারণ ও নিবারণের উপায়গুলোকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে দেব-দেবী ও বিভিন্ন রূপের মাধ্যমে। কুম্‌বুমের প্রত্যেকটি ছোট ছোট মূর্তিকে নিয়ে গবেষণা করতে গেলে প্রয়োজন একটা পুরো মানব-জীবনের। আমার মতো খুদে মানুষের পক্ষে এ-কাজ অসম্ভব। তিব্বতী স্থাপত্যের এমন সুন্দর দৃষ্টান্ত জগতে বিরল।

গীয়াৎসের এই মন্দিররাজ্যে সবাই পবিত্র। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত চোখে পড়ে ছোট্ট ছোট্ট ব্রহ্মচারীদের (ত্রাপা) চলাফেরা। এ রাজ্যের এরাই রাজা, তিব্বতে যেহেতু কোনো সাধারণ পাঠশালা বা বিদ্যালয় নেই, কাজেই অভিভাবকরা বাধ্য হয়ে তাদের শিশুদের পাঠায় মঠে। সেখানে তারা মুণ্ডিত মস্তকে গেরুয়া বসন পরে ধর্মপথে শিক্ষা গ্রহণ করে। এই ছোট দাবা-ত্রাপারাই বড় হয়ে লামা হয়। এদের মধ্য থেকেই বাছাই করা হয় উপযুক্ত দেশের কর্ণধারদের। এরাই ভবিষ্যতে ছড়িয়ে পড়ে সমাজ, শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্যে, ধর্ম ও রাজনীতির দিকে। মেয়েদের জন্য এত ভালো বন্দোবস্ত নেই, সব মঠে স্ত্রী-শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। তারা তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে সামান্য কিছু লেখাপড়া শেখে, তাতেই তাদের কাজ চলে। সেই সামান্য জানাকে কেন্দ্র করেই মেয়েরা দোকান চালাচ্ছে, মালপত্র কিনছে, জমি চাষ করছে। বাজারে গেলে মনে হয় মেয়েরাই এদের রাজত্ব চালাচ্ছে আর পুরুষেরা সন্ন্যাস নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দ্বিতীয় দিন শহরের এই পবিত্র অংশে আর একটা জিনিস বেশ চমৎকার লাগলো। এখানকার লামাদের মধ্যে দেখলাম দু-তিন রঙের চাদর ও কানঢাকা টুপী, প্রথম প্রথম ভেবেছিলাম এটা নেহাৎই রঙের আধিক্য অথবা অভাবে এই রঙের সৃষ্টি হয়েছে। খয়েরি রঙটা প্রায় সর্বত্রই দেখেছি, এখানে ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম যে তার মধ্যে হলুদ, লাল ও গেরুয়া রঙ রয়েছে। এ বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম যে, এটা আসলে সাম্প্রদায়িক ব্যাপার। এখানে তিন সম্প্রদায়ের এক মিলন ঘটেছে। এক নম্বর হচ্ছে গেলুক্-পা সম্প্রদায়, দালাই লামা যার সর্বেসর্বা। দ্বিতীয়টি শাক্য সম্প্রদায়,

পাঞ্চেন লামা তার প্রধান। তৃতীয়টি হচ্ছে সা-লু সম্প্রদায়, তাদের প্রধান নির্ভর করে তাদের প্রার্থীর উপর, অর্থাৎ বাঁধাধরা কোন গুরু নেই, তবে আদর্শ আছে।

এখানে এই তিন সম্প্রদায়ের তিনটি পৃথক সংস্থা, তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা প্রধান। মহামান্য খাম্পো এই তিন সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে থেকে এখানকার শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। খাম্পো লাসার দ্বারা নিয়োজিত প্রতিনিধি। পৌর প্রধানের থেকেও তার খ্যাতি ও শাসন ক্ষমতা বেশী। তবে রাস্তার লোকেদের মতে চীনাদের আসার পর থেকে পৌর প্রধানের ক্ষমতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। গীয়াৎসের ধর্মীয় ক্ষমতার প্রধান হচ্ছেন খাম্পো আর বাণিজ্যিক ক্ষমতার প্রধান হচ্ছেন পৌর-প্রধান।

আমরা থাকি অতিথিশালায় আর খাওয়া দাওয়া করি এক এক সময় এক এক সম্প্রদায়ের সাথে। লামাদের থাকার ঘরগুলো শহরের উপরের অংশে। এখান থেকে গীয়াৎসের দুর্গটাকেও চমৎকার দেখা যায়, গীয়াৎসের এই দুর্গটা অনেক উঁচুতে প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে অতি সুন্দর ভাবে তৈরী করা হয়েছে। আমার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সেদিকে যাওয়ার উপায় নেই, তীর্থযাত্রীর পক্ষে এই ধরনের উৎকণ্ঠা না দেখানোই ভালো। আমরা বত্রিশজন এখানে খুব ছাড়াছাড়ি হয়ে আছি, যার যখন খুশী বেরুচ্ছি ঢুকছি—সবাই স্বাধীন। গুরুজী আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন, আমরা এখানে ঠিক ঘরের ছেলের মতোই আছি। তবে আমাকে একটু সাবধানে থাকতে হচ্ছে কারণ আমি এই আটশ' সন্ন্যাসীর মধ্যে একমাত্র মৌনী বাবা। সকলের দৃষ্টি আমার উপর। মৌনী পথ সকল পথের শ্রেষ্ঠ আর কঠিন, সেই পথই আমি অবলম্বন করেছি। একটু অসাবধানতা, একটু বন্ধুত্ব, একটু সহজ হলেই আমার মুখ খুলে যেতে পারে, তাতে আমার শুধু অসম্মান নয় তীর্থের পথও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। চোখ দিয়ে যা দেখা যায় দেখছি, কান দিয়ে যা শোনা যায় শুনছি, মুখ দিয়ে একমাত্র মন্ত্র ছাড়া কিছু বেরোয় না। কাউকে এড়াতে হলে জপমালাটা দ্রুত জপ করতে করতে এগিয়ে যাই। হোক ভণ্ডামী। তবু আমি মৌনী তো, তাতেই আমার খুব আদর। মন মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে, গর্বে বুকের রক্তটা ঝলকে ওঠে নিজেকে সান্ত্বনা দিই সাবধান! কঠিন বলেই না এতদূর আসতে পেরেছি। মৌনী বলেই তো আমার নিজের সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি, নিজেকে ভালোভাবে জানার আর শুদ্ধ করার এমন চমৎকার উপায় বুঝি আর দ্বিতীয়টি নেই। এটাই আমার এই ছোট্ট জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া, এখন এ পাওয়াটাকেই ইচ্ছে করছে ধরে রাখতে।

পাঁচিলের ভেতরের পবিত্র শহরটা সব সময়ই গম্ভীর। পরিবেশটা পবিত্র বটে, কিন্তু হালকা নয়। গীয়াৎসের বাজারটা বড় চমৎকার। সেখানে গেলে মনে হয় এ এক অন্য রাজত্ব। এখানে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত হৈ চৈ, হাসি-ঠাট্টা আর তামাসায় ভরপুর। এখানকার লোকদের দেখে গ্যাংটক বাজারের শেরপাদের কথা মনে পড়ে। আমার বন্ধু আনচু যদি আজ আমার মত মৌনী বাবা সাজতো তাহলে নিশ্চয়ই বেচারা হাঁপিয়ে উঠতো।

এখানকার বাজারে সব কিছু পাওয়া যায়। পুরোনো বাজারটা একটা অদ্ভূত, এখানে পুরোনো টুথপেস্ট, পুরোনো মোজা থেকে আরম্ভ করে হাতীর দাঁত ও চীনের ব্রোঞ্জের ড্রাগন সব কিছুই পাওয়া যায়। ওদিকে সিঙ্গারা রুটি, নানা ধরনের তেলেভাজা ও ভারতীয় চায়ের দোকান রয়েছে। বলতে গেলে সব কিছুই এখানে পাওয়া যায়, তবে টাটকা নয়, শাক সব্জিরও ওই একই অবস্থা।

আর্য তারার ধ্যান

দ্বিতীয় দিন রাত্রিবেলা আমরা হলঘরে বসে নিঃশব্দতা উপভোগ করছি এমন সময় একটি ত্রাপা এসে গুরুজীকে বলল—মহামান্য খাম্পো আপনাকে ডাকছেন। গুরুজী তার কথা শুনে উঠে চলে গেলেম।

আমরা বসে রইলাম। এই হলঘরটা সাধারণত লামাদের ধ্যান ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহার করা হয়। দেওয়ালের গায়ে অসংখ্য তাংখা। কাঠের কাজগুলো ড্রাগন মূর্তিতে ভর্তি, আর বেদীতে রয়েছে অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্তি। ঘিয়ের প্রদীপটা সব সময়ই জ্বলে কিন্তু খুবই ক্ষীণ, তার আলোতে ভালোভাবে কিছুই দেখা যায় না। এই হলঘরটার দিনরাত্রি সব সমান। তিব্বতের অন্যান্য মন্দিরের মতোই এখানে কোনোরকম জানালা নেই। দিনের বেলা দরজা দিয়ে যতটুকু আলো আসে তাতে ঘরটার সব শিল্পগুলো দেখা যায় না। তিব্বতের সব গুম্ফাতেই দেখছি অতি সুন্দর ও অপূর্ব শিল্পসম্ভার। কিন্তু উপযুক্ত আলোর অভাবে সেগুলো অখ্যাতই থেকে গেছে। শিল্পী তার শিল্পকে এখানে স্থান দিয়েই তার কর্তব্য শেষ করেছেন, জগতে এর পরিচয় হোক বা না হোক তাতে তার কিছুই যায় আসে না। ভগবান সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ তিনি এই উপহার নিশ্চয়ই গ্রহণ করেছেন। তিব্বতে যে কোন ব্যাপারে এরা অতি উজ্জ্বল রং ব্যবহার করে তাতে অনেক সময় ক্ষীণ আলোকেও দেয়ালের কাজগুলো দেখা যায়। কিন্তু সেই কাজগুলো যদি পঁচিশ তিরিশ বছরের পুরোনো হয় তাহলে সেগুলো দেখা অসম্ভব, কারণ সেগুলো প্রদীপের কালি পড়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। আমাদের এই হলঘরটার অবস্থাও তাই। প্রদীপের কালি ছাড়াও এখানে আছে কাঠের ধোঁয়া, তার কবল থেকে এই দেয়ালের ছবিগুলো কিছুতেই মুক্তি পায়নি।

গুরুজী এলেন প্রায় একঘণ্টা পর, তাঁকে দেখেই মনে হয় যে তিনি চিন্তান্বিত। তিনি আমাদের মাঝখানে বসে তাঁর সমস্যাটা বললেন।

যদিও তিব্বত একটি স্বাধীন রাজ্য কিন্তু তার সীমান্ত ও পররাষ্ট্র বিভাগটার পুরো দায়িত্ব হান্‌দের হাতে। গীয়াৎসের হান্‌ সামরিক বাহিনী বিদেশীদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। আমরা এখানে পৌঁছবার আগে তারাই আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তাদের এক প্রতিনিধি খাম্পোর কাছে এসে নতুন আদেশ জারী করেছেন। সেই আদেশের প্রথমটি হচ্ছে, সাতদিনের বেশী তীর্থযাত্রীদের গীয়াৎসে থাকা চলবে না; দ্বিতীয়ত, শহরে কোন রকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান করতে গেলে সামরিক প্রধানের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে এবং তৃতীয়ত, এখান থেকে লাসার পথে তিন জনের বেশী

একসাথে যাওয়া চলবে না। প্রথম ও দ্বিতীয় সর্তটি মোটেই অসুবিধার নয়, কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে তৃতীয় সর্তটি নিয়ে অর্থাৎ দলবদ্ধভাবে যাওয়া চলবে না।

আমাদের ইচ্ছা ছিল তিনদিন থেকে চারদিনের দিন খুব ভোর বেলা এখান থেকে রওনা দেবো, কিন্তু একবার যখন হান্‌দের দৃষ্টি আমাদের উপর পড়েছে তখন এখানে আর না থাকাই মঙ্গল।

গীয়াৎসে আমাদের মোটামুটি দেখা হয়েছে তবে আরও কিছুদিন থাকলে এখানকার ভেতরকার তথ্য জানা যেতো কিন্তু 'ন্যন্যঃ পন্থা ন বিদ্যতে', আমাদের যেতে হবে। গুরুজী বললেন—ভগবান তথাগতের এইরূপই ইচ্ছা। পরে ঠিক হল যে আমাদের ভাগ হয়ে তিনজন তিনজন করে যেতে হবে, অর্থাৎ তিন দশকে তিরিশ আর বাকি থাকবে দু'জন। গুরুজী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—আমি বুঝতে পারছি যে তুই আমার সাথে যেতে চাস। কিন্তু তা সম্ভব না কারণ খাম্পোর ইচ্ছা যে তুই আরও দু'তিন দিন থাক। তাঁর বাক্য শিরোধার্য। গুরুজী সবচেয়ে আগে যাবেন আর আমি যাবো একদম শেষে। বলাই বাহুল্য, আমাকে এবার একা একা যেতে হবে।

সেদিন রাতেই গুরুজী সবাইকে ভাগ করে দিলেন, আর সেই সাথে সাথে রাস্তাঘাটও বলে দিলেন। অর্থাৎ গুরুজী যাবেন সকালবেলা তারপর একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা পর পর তিনজন তিনজন করে রওনা দেবেন। পরের দিন ষোলজন রওনা দেবেন বাকি ষোলজন রওনা দেবেন তারও পরের দিন।

এখানকার মঠে খাবার জন্য ডাক পড়ে দু'বার, প্রথমবার সাড়েদশটা নাগাদ আর দ্বিতীয়বার বিকেল চারটে নাগাদ। সকাল বা রাতে এরা খায় না। আমাদের খাওয়ার মধ্যে হচ্ছে ভাত আর লাব্‌রা ধরনের তরকারী, আর বার্লির ডাল। গুরুজীকে বিদায় জানালাম খাওয়া-দাওয়ার ঠিক পরই। মঠের বড় লামারা সবাই তাঁর যাত্রার শুভ কামনা জানিয়ে প্রার্থনা করলেন। তিনি যাবার ঘণ্টাখানেক পর খাম্পো আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হতেই তিনি আমাকে তার পাশে বসতে বললেন। আমি তাঁকে প্রণাম জানিয়ে পাশে বসলাম। আমি ইতিমধ্যে তিব্বতী ভাষা কিছু কিছু বুঝতে পারি বটে কিন্তু বলতে পারি না। খাম্পোর ঘরটা বিরাট। বড় বড় কাঠের থাম বসিয়ে ছাদটাকে ধরে রাখা হয়েছে।

দেয়ালের গায়ে লাল-হলুদ ও সোনালি রঙের বিভিন্ন ছবি আঁকা। ঘরটায় একটামাত্র জানালা, সেই জানালা দিয়ে দেখা যায় অন্যান্য মন্দির ও বাড়ীঘর। আমি সেদিকে দেখছি এমন সময় খাম্পো আমার নাম ধরে ডাকলেন, আমি চমকে তাঁর দিকে তাকালাম। গ্যাংটক ছাড়ার পর আমায় সেই নাম ধরে কেউ ডাকেনি। খাম্পোর মুখের দিকে আমি অবাক হয়ে তাকালাম, তবে কি তিনি সর্বজ্ঞ? খাম্পোজী আবার নাম ধরে ডেকে পরিষ্কার হিন্দীতে বললেন—

—শোন বিমল, তোমার বিষয়ে আমি সব শুনেছি। গয়া থেকে এ পর্যন্ত তুমি যেরকমভাবে এসেছো তাতে আমি খুবই অবাক হয়ে গেছি। তোমার সাহস ও ধৈর্যের প্রশংসা করি। তুমি আমার সাথে কথা বলতে পারো তাতে কোন অসুবিধা হবে না।

আমি খুব লজ্জিত হয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে অপরাধীর মতো বললাম—আমাকে ক্ষমা করবেন।

সেই মহামান্য বিরাট পুরুষটির সামনে নিজেকে হঠাৎ খুব ছোট বলে মনে হল। আমি তাঁকে কি বলবো ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। খাম্পোজী নিজেই আমাকে সহজ করে দিলেন—আমি গয়াতে তিনবার গিয়েছি আর সারনাথে থেকেছি দশ বছর। কলকাতার অনেক লোকের সাথে আমার পরিচয় আছে। তুমি এতদূর যখন এসেই পড়েছো তখন ভয় নেই, তথাগত তোমায় রক্ষা করবেন। এই বলে তিনি জোর গলায় ডাকলেন—সামশর্গে! তাঁর ডাক শুনেই একজন লামা তার কাছে ছুটে এলেন, খাম্পো তাকে দু-কাপ চা আনতে বললেন। আগে ভেবেছিলাম এখানকার সর্বত্যাগী বড় লামারা হয়তো চা-পান করেন না। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটো কাচের গ্লাসে চা এল আর তার সাথে কিছু নোন্‌তা বিস্কুট।

চা খেতে খেতে তিনি আমাকে তাঁর পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে দিলেন। গীয়াৎসের অনেকের মতে আমি ভারতীয়, যদিও নেপালী লামাদের সাথে আমি এসেছি কিন্তু এখানে অনেকে আমাকে নেপালী বলে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। তিব্বতী মাত্রেরই বিশ্বাস ভারত হচ্ছে পবিত্রভূমি। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় মুনি-ঋষিরা এ পথে কৈলাস-তীর্থে যাতায়াত করছেন। তাঁদের দর্শনে আসে শান্তি আর তাঁদের আশীর্বাদে হয় পাপমুক্তি। প্রায় চার পাঁচ বছর যাবৎ ভারতীয় সাধুদের এ পথে দেখা যায় না। কাজেই এখন আমার মতো একজন ভারতীয়কে পেয়ে তারা খুবই খুশী। হোক ছোট তাতে ক্ষতি নেই এই বিরাট পথ আর হিমালয় পার হয়ে যারা এই পর্যন্ত আসতে পেরেছে তারা সবাই পুণ্যবান। খাম্পো চান না যে জনসাধারণের এই মতবাদ এখানকার চীনা কর্তৃপক্ষ জানতে পারে, তাতে অসুবিধা হতে পারে। তিনি নিজে ভারতবাসীদের খুব প্রশংসা করেন, তাই তিনি ঠিক করেছেন যে বাকি যে দু'দিন আমি থাকব, সে দু'দিনে কিছু শিখে যাওয়া উচিত। শুধু মন্দির আর লামা দেখে এখানে সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

গীয়াৎসের বিভিন্ন পর্যায়ের দীক্ষার জন্য বিভিন্ন রকম বন্দোবস্ত আছে। তারই মধ্যে লাভজনক একটি প্রক্রিয়া তিনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—

—তুমি কোনো সংস্কৃত মন্ত্র জানো?

—নিশ্চয়ই। আমি উত্তর দিলাম।

—কোন মন্ত্র তুমি জানো?

—সাধুসঙ্গ আমি অনেক করেছি কাজেই অনেক মন্ত্র আমার মুখস্থ, এমন কি ব্রহ্ম গায়ত্রী মন্ত্র পর্যন্ত।

খাম্পো অবাক হলেন—বলো কি, তুমি গায়ত্রী মন্ত্র জানো? তুমি কি ব্রাহ্মণ, তোমার উপনয়ন হয়েছে?

—আজ্ঞে না, আমার উপনয়ন হয়নি, আমি ব্রাহ্মণও নই। মানুষ মাত্রেই ঊর্ধ্বমার্গে

ওঠার উপযোগী, গায়ত্রী মন্ত্র তারই একটি সোপান মাত্র। আমি জাত মানি না, মানুষের মধ্যেই ভগবান আছেন সেটাই স্বীকার করি।

—বেশ! বেশ! তাহলে বলো তো দেখি মন্ত্রটা।

তাঁর কথা শুনে আমি আসনকেটে বসে চোখ বুজে শুরু করলাম—

—ওম্ ভূ ভূবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্ ভার্গো দেবস্য ধীমহী ধীয়ো ইয়ো ন প্রচোদয়াৎ ওম্।

খাম্পোজী আমাকে থামতে বললেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হয় তিনি আমার প্রতি খুবই প্রসন্ন হয়েছেন, তিনি জোর গলায় কাকে যেন ডাকলেন। আগের লামাটি এগিয়ে এলে তিনি তাকে কি যেন বললেন, তারপর ভদ্রলোক চলে গেলেন। খাম্পোজী এবার আমার সাথে কলকাতার গল্প আরম্ভ করলেন। তাঁর মতে কলকাতা একটি যাদুকরের দেশ, কলকাতার সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে সেখানকার ট্রাম। তিনি চালকের পাশে থেকে খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করেছেন। সামান্য একটা চাকা ঘুরিয়ে অতগুলো মানুষকে নিয়ে হেলেদুলে সে কলকাতার রাস্তাগুলোর মধ্যে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। তিনি যত ভাবেন ততই আশ্চর্য হয়ে যান।

আমি তাঁর কথা শুনে বললাম—ট্রামগুলো চলে ইলেক্‌ট্রিকে জানেন নিশ্চয়ই? তিনি শিশুর মত হেসে উঠলেন—হ্যাঁ, সেটাই তো আসল আশ্চর্যের কথা। ওই সরু তারটার ভেতর দিয়ে যে একটা প্রচণ্ড শক্তি কাজ করছে সেটা ভাবলেই অবাক হয়ে যাই।

দরজার কাছে একজন লামাকে দেখে আমরা থামলাম। খাম্পো হঠাৎ আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন,—তিনি লামাকে ডেকে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন—ইনি গেলুক্-পা সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় প্রধান লামা। দার্জিলিং ও কালিম্পং-এ তিনি ছিলেন আর সারনাথেও পড়াশুনা করেছেন। ওর সাথে তুমি দু'দিন থাকবে। ইনি তোমাকে কিছু জিনিস শিখিয়ে দেবেন।

আমি লামাকে প্রণাম করলাম, খাম্পোজির সাথে আরো কিছুক্ষণ আলাপ করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সম্ভব হল না। তিনি খুব ব্যস্ত তা সত্ত্বেও যে আমার সাথে তিনি সহজভাবে কথা বলেছেন ও আমার জন্য ভেবেছেন তার জন্য আমি কৃতার্থ হয়ে রইলাম। মুখে কিছু বললাম না অবশ্য। তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করে দ্বিতীয় লামার সাথে বেড়িয়ে পড়লাম। গীয়াৎসের ধর্মশহরের গেলুক্-পা সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় প্রধান লামা, নাম থেরেপা, বয়স মনে হয় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। মুখটা হাসিখুশী না হলেও খুব গম্ভীর নয়। তিনি খুব পরিষ্কার হিন্দী বলেন না, তিব্বতী নেপালী ও হিন্দী শব্দের সংমিশ্রণে আমার সাথে কথা আরম্ভ করলেন, বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না।

আমরা একটা পুরোনো মন্দিরের ভেতর এসে ঢুকলাম, মন্দিরের ভেতরটা খুব ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেঁতে। তিনি একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে আমাকে সেখানে অপেক্ষা করতে বললেন। প্রদীপের আলোয় দেখলাম অনেকগুলো দেব-দেবীর মূর্তি। দেয়ালের গায়ে সারি সারি খোপের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য তিব্বতী পুস্তক। কিছুক্ষণ পরে তিনি দুটো

ভারী কম্বল নিয়ে উপস্থিত হলেন। সেই মন্দিরের ভেতরে এক কোণে কাঠের উপর কয়েকটা পাতলা গদী পাতা ছিল আমরা তার উপর পাশাপাশি বসলাম। এবার কম্বলটা দিয়ে ভালোভাবে মাথা ও শরীরটাকে জড়িয়ে বসলাম। এই মন্দিরটার দরজা বেশ বড়ই কিন্তু ঠিক দরজার সামনেই রয়েছে আর একটি বিরাট মন্দিরের পাঁচিল কাজেই দরজা থেকেও না থাকার মতো, তাতে আলো একদম ঢুকতে পারে না। আর সূর্যকিরণ তো স্বপ্নের ব্যাপার। বাইরের সুন্দর গরম রোদ ছেড়ে আমরা ঢুকলাম এক অন্ধ গুহায়।

প্রদীপের আলোয় সব মূর্তিগুলোকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। অনেকগুলো কাপড় ও চাদরের ভেতর দিয়ে যে মুখটা মোটামুটি দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে মা তারার মূর্তি। শুধু মুখটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। লামা থেরেপা সেদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে মৃদু গলায় বললেন—আমরা এখন মা তারার ধ্যান করবো। আমার অন্তরাত্মা নেচে উঠল—মা তারা মা কালীরই এক রূপ, কাজেই ক্ষতি কি ? ছোটবেলা থেকে পাড়ার কালী মন্দিরের সাথে আমাদের পরিচয়, কাজেই লামা থেরেপার কথাটা ভালোই লাগল। তবে মনের উৎকণ্ঠা দমন করতে না পেরে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—

—আপনারা তো বৌদ্ধ, কাজেই আপনাদের মন্দিরে মা তারার আবির্ভাব কি রকম করে হল ?

—আমরা তান্ত্রিক বৌদ্ধ, পরে যদি সময় হয় তোমাকে বুঝিয়ে বলবো, এখন এস ধ্যানে বসা যাক।

সাধারণ লোকে ভগবান বা দেব-দেবীর উপর ইহকাল পরকালের সমস্ত ভার সমর্পণ করে দিয়ে বসে থাকে, কিন্তু লামাদের নিজস্ব চেষ্টার ফলে সব কর্মফল কাটিয়ে ঊর্ধ্বে উঠতে হয়। কর্মফলের বন্ধন কাটাবার জন্য প্রয়োজন নির্বাণ লাভের।

—নির্বাণ লাভের কথা আমি বহুবার শুনেছি আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন কি ? আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম।

—নিশ্চয়ই। এই বলে তিনি একটি শ্লোক তর্জমা করে বললেন—এই যে চারদিকে মন্দির, আকাশ, পথ, পাহাড়, মানুষ সব দেখছো নির্বাণে এসব থেকে সম্পূর্ণ এক আলাদা জগতে আমাদের অবস্থান ঘটে, সেটাকে মনের এক অবস্থা না বলে বলতে হবে অহংকারকে ছাড়িয়ে আরও উঁচুতে আমরা উঠে যাই, সে জগতে জল নেই, পৃথিবী নেই, বায়ুর অস্তিত্ব নেই, সেখানে আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের দরকার হয় না। সে জগতে তারাসকল জ্যোতি দান করে না, সূর্যেরও প্রকাশ নেই, চন্দ্র ও অন্ধকারের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। সে এক অমৃতময় জগৎ সেখানে রূপ ও অরূপ সুখ ও দুঃখ হতে বিমুক্ত হয়ে আমরা বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হই। সেই গভীর নীরবতাই হচ্ছে নির্বাণ জগৎ, স্থান কাল ও পাত্র'র ঊর্ধ্বে এক অমৃতময় জগৎ।

লামা থেরেপা একটু থামলেন তিনি চোখ বুজে মনে হয় সেই অবস্থাটি হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে তিনি চোখ খুললেন তারপর বললেন—তোমার কি মন্ত্র জানা আছে? আমি তাঁর প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে

চুপচাপ না বোঝার ভান করে বসে রইলাম, তিনি কি বুঝলেন জানি না তবে তিনি প্রসঙ্গ পাল্টালেন ও বললেন—

—তোমাকে এখানে চুপচাপ ওই মা তারার দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে হবে। তুমি এখানেই বসে থাক, একদম উঠবে না। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না আসি ততক্ষণ পর্যন্ত এখানেই থাকবে। এই বলে লামা উঠে গেলেন।

আমি তাঁর কথামতো সেখানেই বসে রইলাম। মা তারার দিকে তাকিয়ে রইলাম কিন্তু মনের মধ্যে উঁকি দিতে লাগল ভগবান বুদ্ধের বিভিন্ন রূপ। প্রায় আধ ঘণ্টা (বা এক ঘণ্টাও হতে পারে) পর লামা ফিরে এলেন, আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—

—চুপচাপ বসে থাকতে তোমার কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে?

আজ্ঞে না। তিনি আমার পাশে বসলেন এবং আমাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন—

—তুমি জান হিন্দু-ধর্মের সাথে মহাযান বৌদ্ধদের অনেক মিল আছে। শুধু মা তারাই নয়, আমাদের প্রজ্ঞাপারমিতার সাথে হিন্দুদের সরস্বতীর তুলনা করা চলে। বৌদ্ধ আরতি হিন্দু অদিতি, বুদ্ধেরই এক শক্তির নাম তারা। শিবের সাথে মঞ্জুশ্রী, ইন্দ্র ও বোধিসত্ত্ব বজ্রপাণি একই, যে রকম করেই হোক নির্মাণ লাভ বা মোক্ষই আমাদের চরম লক্ষ্য।

—আপনি হিন্দু-ধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন দেখছি।

—না-না। আমি হিন্দু ধর্মের কিছুই জানি না, তবে বৌদ্ধ ধর্মের জন্য এ সব আমাদের পড়তে হয়েছে। আমি তোমাকে তারার সম্পর্কে কিছু বলবো, মন দিয়ে শোনো। মা তারা হচ্ছেন অবলোকিতেশ্বরের শক্তি, যেমন হিন্দু ধর্মে পাবে শিবের শক্তি কালী উমা, পার্বতী ইত্যাদি। ভগবানকে পেতে হলে আগে তার শক্তিকে পাওয়া দরকার। মা তারা মুক্তি-দায়িনী সংকট নাশিনী, তিব্বতের মা তারার দুটি রূপ একটি সবুজ রঙের, সবুজ তারার হাতে থাকে উৎপল ফুল আর সাদা তারার হাতে থাকে একটি পদ্মফুল—এতটা বলে লামা একটু বিশ্রাম করলেন অর্থাৎ আমাকে হৃদয়ঙ্গম করার সময় দিলেন, তারপর আবার শুরু করলেন—আমরা এখন সুবজ তারার ধ্যান করবো, আমাদের মতো সাধারণ লোকের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি অত সহজে সম্ভব নয়, তারজন্য প্রয়োজন হাজার হাজার বছর, এমনকি শাক্য মুনিকেও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য, অবলোকিতেশ্বর বা পদ্মপাণিকে পেতে হলে চাই তার শক্তির পূজা, ধৈর্য ধরে তাঁর পূজা করতে হবে। তাঁর পূজার আগে তাঁর রূপের ধ্যান করতে হবে। তুমি চোখ বোজ আমি তোমাকে তার রূপের বর্ণনা দিচ্ছি তুমি কল্পনা করে তাকে দেখবার চেষ্টা কর।

—ঠিক আছে আমি আপনার কথামতো চোখ বুজছি। আমি একটু নড়ে চড়ে বসে কম্বলটাকে জড়িয়ে নিলাম।

লামা থেরেপা এবার আমার দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করলেন—চিন্তা কর আকাশ, শুধু আকাশ। তার মধ্যে কোন রঙ নেই সে এক মহাশূন্য, সেই মহাশূন্যে চাঁদ

নেই, তারা নেই, সূর্য নেই, আলো নেই, অন্ধকার নেই। এবার চিন্তা কর সেই মহাশূন্যের উপর ধীরে ধীরে উদিত হচ্ছে একটা সবুজ পাহাড়, সেই পাহাড়টা সবুজ জ্যোতির্ময়, এবার তুমি সেই সবুজ রঙটাকে মনে ধরে রাখার চেষ্টা কর ··· । সেই রঙটা ক্রমে ক্রমে জমা হয়ে তৈরী হচ্ছে একটা নারীমূর্তি, সেই নারীমূর্তিই আমাদের আরাধ্য দেবী ভগবতী তারা। এবার চোখ খুলে দেখো সামনেই তিনি, এই করুণাময়ী রক্ষাকর্ত্রী দেবী মা তারার মুখাবয়ব।

আমি লামার কথামতো ঘিয়ের প্রদীপে ভালোভাবে দেখতে লাগলাম মা তারার মূর্তিটির দিকে। তারপর লামার কথানুযায়ী আবার চোখ বুজলাম। তিনি আবার শুরু করলেন—আবার কল্পনার আশ্রয় নাও, তার একটা মুখ, দুটো হাত, তার ডানহাতে অভয় মুদ্রা, বাম হাতে উৎপল-পুষ্প, চুলের অর্ধেক মাথার ওপর খোঁপা করা আর বাকি অর্ধেক পিঠের উপর ছাড়া, কল্পনা কর তিনি সর্বালঙ্কারে ভূষিতা। তার স্তনযুগলের উপর দিয়ে পড়েছে ছোট্ট একটি বস্ত্রখণ্ড ; আর পরনে লাল বসন। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন বীরের মতো। আর তাঁর পীঠস্থান রয়েছে সবুজ একটি অর্ধ-চন্দ্রের উপর, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আলোর উপর, তিনি জ্যোতির্ময়ী, তাঁর দেহ সর্ব লাবণ্যে ভরা, তিনি ষোড়শী সদাহাস্যময়ী বরপ্রদায়িনী ; হে দেবী ! হে মাতা ! তোমাকে আমি ধ্যান করি, তোমাকে আমি ধ্যান করি—তোমাকে আমি ধ্যান করি ··· ।

আমি অপলক দৃষ্টিতে সেই অভয়দায়িনী মা তারাকে নয়ন ভরে দেখতে লাগলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর মনে হল তিনি যেন ধীর পদক্ষেপে অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছেন, অনেক কষ্টেও কল্পনায় তাঁর রূপ ধরে রাখতে পারলাম না। প্রচণ্ড শীতে আমার সর্বশরীর যেন কাঁপতে লাগলো। আমি চোখ খুললাম, কম্বলটা ভালোভাবে জড়িয়ে লামা থেরেপাকে বললাম—কিছু মনে করবেন না, খুব শীত করছে তাই ধ্যানস্থ হতে পারছি না। আপনার কি শীত করছে না ? তিনি আমার সাথে একমত হয়ে বললেন—হ্যাঁ কথাটা ঠিক্। আমি দরজাটাকে বন্ধ করে এসেছিলাম কোন ছোট ছেলে হয়তো সেটাকে খুলে দিয়েছে। যাই হোক, চল আজকের মতো এখানেই ইতি করি।

আমরা মা তারাকে প্রণাম করে উঠলাম। বাইরে এসে দেখি সত্যি শীত পড়েছে। প্রায় সন্ধ্যে হতে চলেছে, কাজেই শীত সূর্যাস্তের সাথে সাথেই বেড়ে যায়। লামা থেরেপা থাকেন অন্যান্য লামাদের সাথে, আমি তাঁর সাথে রান্নাঘরে উঠে এলাম। বিরাট রান্নাঘর, কাঠের আগুনে রান্না হয়। এতবড় রান্নাঘর অথচ তার একটাও জানালা নেই। অন্য একটা ঘরের ভেতর দিয়ে এখানে আসতে হয়, মনে হয় উত্তাপটাকে সম্পূর্ণরূপে ধরে রাখার জন্যই এই ব্যবস্থা। অন্যান্য লামাদের খাওয়া হয়ে গেছে আমরাই ছিলাম বাকি। বার্লি ও চালের সংমিশ্রণ করে তাতে সামান্য আলু ছেড়ে দিয়ে তৈরী হয়েছে খিচুড়ী, খেতে যেন অমৃত। লামা থেরেপা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—

—তুমি কি আজ রাতে এখানে শোবে না তোমার সঙ্গীদের সাথে থাকবে ?

—আমি অনেকদিন যাবৎ তাদের সাথে আছি এবং থাকবো কিন্তু আপনাদের সাথে থাকবার এ সুযোগ হয়তো আর পাবো না, যদি অনুমতি দেন তাহলে এখানেই থাকি।

—তা ঠিক, তুমি ইচ্ছে করলে এখানেই শুতে পারো, এখানে আরও দু'তিনজন রাতে শোয় কোনো অসুবিধা হবে না, উনুনের কাঠগুলো সারারাত ধরেই জ্বলে এ ঘরটা সব সময়ই খুব গরম থাকে।

লামা থেরেপা আরও কিছুক্ষণ আমার সাথে থেকে চলে গেলেন। ভেবেছিলাম রাত্রিটাও তাঁর সাথে কাটাবো কিন্তু শেষ পর্যন্ত উনি আমাকে রান্নাঘরে রেখে চলে গেলেন। অন্যান্য লামাদের সাথে থাকার চাইতে এখানকার এই উনোনের ধারে রাত কাটালে আর এক অভিজ্ঞতা হবে। তাই আমি আমাদের ধর্মশালায় গিয়ে ওদের নিকট হতে সে রাতের মতো বিদায় নিয়ে এলাম। কথামতো আমি উনোনের পাশেই একটা থামের কাছে কম্বল নিয়ে শুয়ে পড়লাম। আশপাশে আরও তিন চারজন লামা এরই মধ্যে নাসিকা গর্জন শুরু করেছে। রাতে এদের করার কিছু নেই কাজেই খুব তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে। রান্নাঘরে কোনো লামা থাকে না, রান্না ও রান্নার কাজে যারা সাহায্য করে তারাই থাকে। তারা খুব ভোরবেলা ওঠে। তিব্বতীদের কেউই মনে হয় ভোরবেলা মুখ-হাত-পা ধোয় না। এই শীতে তা সম্ভবও নয়। পায়খানার জন্য রয়েছে বিরাট বিরাট গর্ত, যার যখন খুশী ব্যবহার করতে পারে। জলের ব্যবহার খুবই কম, অন্তত আমি তাই দেখছি। পাতা বা খবরের কাগজ পেলে তাতেই চলে পরিষ্কারের কাজ। বিশেষ লামাদের কথা আলাদা, তাদের জন্য রয়েছে গরম জল। তিব্বতে সাধারণ লোকদের পক্ষে এটা শুধু যে দুষ্প্রাপ্য তাই নয় দুর্মূল্যও বটে।

সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই উদয় হলেন লামা থেরেপা। এরই মধ্যে আমার দু-কাপ চা খাওয়া হয়ে গেছে, কাজেই আমি খুবই চাঙ্গা হয়ে উঠেছি, লামা থেরেপার উপর দায়িত্ব পড়েছে আমাকে গড়ে তোলার। তিব্বতীরা আমাকে দু-কাপ চা খাইয়েছে, লামাকে বললাম আমার হয়ে তাদের ধন্যবাদ দিতে। তিনি শুনেই অবাক হবার ভান করে বললেন—খেয়েই যখন ফেলেছো তখন ধন্যবাদ দিতেই হবে। আজকে ভেবেছিলাম সকালে কিছু না খেয়েই মায়ের ধ্যানে বসবো, অবশ্য আমারই ভুল হয়েছে তোমাকে আগে জানানো উচিত ছিল।

আমরা বেরিয়ে পড়লাম। মূল স্তূপের কাছে এসে সাতবার প্রার্থনা চক্র ঘুরিয়ে প্রদক্ষিণ করলাম। শেষে স্তূপের চারপাশের খোদাই করা মূর্তিগুলোকে খুব ভালোভাবে দেখতে বললেন—তিনি আমাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে বললেন,

এই দেখো বৈরচনার সিংহ এটা রাজার প্রতীক। অক্‌শোভ্যের হস্তী শক্তির প্রতীক। রত্নসম্ভবার ঘোড়া গতির প্রতীক। অমিতাভের ময়ূর সৌন্দর্য আর ছন্দের প্রতীক।

কিছুক্ষণ পর আমরা কুম্‌বুম্ স্তূপ ছেড়ে নীচে নেমে এলাম। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন তারপর বললেন—ওই মন্দিরটা নির্জন ছিল কিন্তু খুব স্যাঁতসেঁতে আর ঠাণ্ডা, চল যাই মৈত্রেয় মন্দিরে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে পুরোনো অথচ চমৎকার কারুকার্য করা একটা মন্দিরে এসে হাজির হলাম। লামা আমাকে বুঝিয়ে বললেন যে মৈত্রেয় হচ্ছেন ভবিষ্যৎ বুদ্ধ। মৈত্রেয়াবস্থার পর মানসী বুদ্ধ তারপর শাক্যমুনী বোধিসত্ব। এই মৈত্রেয় বুদ্ধই অসংগামুনীকে দেখা দিয়ে তন্ত্রের গুঢ় রহস্যের সন্ধান দেন। আমরা সেখানে

যাচ্ছি বটে কিন্তু আমাদের লক্ষ্য থাকবে তারা দেবীর দিকে। তিব্বতে মহাযান হীনযান বজ্রযান তন্ত্রযান সবই সমানভাবে স্বীকৃত এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন পথ বেছে নিয়ে তা অভ্যেস করে।

আমরা মন্দিরে ঢুকে দরজার কাছাকাছি একটা বেদীতে বসলাম। তিনি কোনো রকম ভূমিকা না দিয়েই সরাসরি বললেন—

এবার চোখ বোজ। মনে মনে বলো—হে দেবী! আমার হৃদয় চক্র খুলে দাও তুমি আমার প্রতি কৃপা পরবশ হও;

মা তারা তুমি আমাকে সংস্কার থেকে মুক্ত কর,
মা তারা তুমি আমাকে ভয় থেকে মুক্ত কর,
মা তারা তুমি আমাকে ব্যাধি থেকে মুক্ত কর।
ত্বম্ ওম্ বজ্রঃ সমজঃ, নমো গুরুভ্য, নমো আর্য তারা মণ্ডলেভ্য
ওম্ আর্য তারা সপরিবারে অর্ঘ্যম্, প্রতিচ্য হুম্ স্বাহা।
" " " " পদ্মম্ প্রতিচ্য হুম্ স্বাহা।
" " " " পুষ্পে " " "
" " " " ধুপে " " "
" " " " আলোকে " " "
" " " " গন্ধে " " "
" " " " নৈবিদ্যে " " "

হে দেবী! তোমার চরণে আমি আশ্রয় নিচ্ছি, আমি তোমাতে আত্মসমর্পণ করছি, আমি বৌদ্ধ ও সংঘে আত্মনিবেদন করছি ···

ধ্যানাবস্থায়ই শুনতে পেলাম মন্দিরের পূজার আহ্বান। ভেরী, ঢোল ও কাঁসরের শব্দ হিমালয়ের পাথরে পাথরে লেগে ধ্বনিত হতে লাগল। মনে হলো জগন্মাতা তারার পূজায় সবাই প্রস্তুত হয়ে পড়েছে। এক অপূর্ব অনুভূতির মধ্যে আমি চোখ খুললাম। এবার আমাদের যাবার সময় হয়েছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক একটু বিশ্রাম করে তারপর আবার কথামতো এলাম মৈত্রেয় মন্দিরে। ধ্যানে বসার আগে লামা থেরেপা আমাকে বললেন—তুমি এখনও ছোট, কাজেই সাধনমার্গের কষ্টকর উপায়গুলো তোমার না মানলেও চলবে।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—কষ্টকর উপায়গুলো কি?

প্রথম প্রথম সেগুলো সোজা কিন্তু যতই তুমি ঊর্ধ্বমার্গে উঠবে ততই কঠিন। যেমন ধর প্রথম প্রতিজ্ঞাগুলো হচ্ছে—প্রাণিহত্যা, অপহরণ, ব্যভিচার, মিথ্যাকথন ও সুরাপান থেকে বিরত থাকা। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাগুলো হচ্ছে—অকালভোজন, নৃত্যগীতাদিতে অনুরাগ, গন্ধমাল্যাদি ব্যবহার, কোমল শয্যায় শয়ন ও সোনা রূপাদি গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। সাধারণ মানুষ ও গৃহীদের এগুলো হচ্ছে প্রধান শত্রু।

আমি লামাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আমার অনেকগুলো বদস্বভাব

আছে এই যাত্রায় সেগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ ছেড়ে আসতে পারিনি। সেইসব বদঅভ্যাসগুলো আমার সাথে সাথেই যাচ্ছে, কাজেই আমার মতো পাপীকে মা তারা কৃপা করবেন কি ?

আমার কথা শুনে তিনি উত্তর দিলেন—নদীগুলো সাগরে যাওয়ার আগে অনেক আবর্জনাই বয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু তাই বলে সাগর কি তাকে গ্রহণ করে না। এই বলে তিনি একটু থামলেন।

তারপর আবার মুখ খুললেন—সবুজ মা তারার আরাধনায় মনের সব মলিনতা দূর হয়। তারপর অনেকক্ষণ আমরা চুপচাপ বসে রইলাম। পাশের মন্দির থেকে লামাদের স্তোত্র পাঠ আমাদের কানে আসতে লাগল। সেই স্তোত্র পাঠ বড় চমৎকার শুনতে। থেমে থেমে নীচুস্বরের আবৃত্তির স্বরগুলো হিমালয়ের ওপর ছোট ছোট অসংখ্য শৃঙ্গের মতোই কোনো নাভিপ্রদেশ থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে আর নামছে। তার অর্থ না বুঝলেও সেই ছন্দ ও সুর হৃদয়কে স্পর্শ করে। দরজার বাইরের দিকে তাকালেই চোখে পড়ে অসংখ্য প্রার্থনা পতাকা, মনের ইচ্ছাটাকে ভাষায় প্রকাশ করে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে,অনেক ঊর্ধ্বে বাতাসের সাহায্যে সেই প্রার্থনা গিয়ে পৌঁছচ্ছে মা তারার কাছে। মনোবাসনা পূর্ণ করার তিনিই মালিক।

এবার চোখ বুজে মন দিয়ে শোনো আর আমার মুখে মুখে বলো—

ওম্ বজ্র সমজাঃ

ওম্	সর্ব	তথাগত	অর্ঘ্যম্	প্রতিচ্য	হুম্	স্বাহা।
”	”	”	পদ্মম্	পদ্মম্	”	”
”	”	”	পুষ্পে	”	”	”
”	”	”	ধূপে	”	”	”
”	”	”	আলোকে	”	”	”
”	”	”	গন্ধে	”	”	”
”	”	”	নৈবিদ্যে	”	”	”
”	”	”	শব্দে	”	”	”

এইবার একুশবার দাঁড়িয়ে ও জানুর ওপর বসে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে মাকে প্রণাম কর। প্রত্যেকবারই মায়ের মূর্তি হৃদয়ে স্মরণ করবে। আমি তাঁর কথামতো একুশবার ওঠ-বস করে মার উদ্দেশ্যে প্রণাম করলাম। একুশবারকে মনে হল একশ আটবার। যাই হোক, শেষে আমি বসলাম। এবার তিনি আগের মতোই বললেন—

—এবার তোমার কপালে মন দিয়ে দেখবার চেষ্টা কর সেখানে লেখা আছে ‘ওম্’। কণ্ঠে মন দাও মানসপটে কল্পনা কর যে সেখানে লেখা আছে ‘আহ্’। এবার হৃদয়ে মন দাও—চেষ্টা কর যে সেখানে লেখা আছে ‘ত্বম্’। এবার কপালে মন দাও সেখানকার ‘ওম্’ সাদা বর্ণের। এবারে কণ্ঠের ‘আহ্’ শব্দ লাল বর্ণের। এবারে হৃদয়ে মন দাও সেখানকার ‘ত্বম্’ শব্দ নীল বর্ণের।

আমি তাঁর কথামতো বর্ণগুলোর রঙ দেখবার চেষ্টা করতে লাগলাম। আমি চুপচাপ বসেছিলাম—মন্ত্র ও রঙ হারিয়ে আমি আমার নিজস্ব গড়া এক স্বপ্নজগতে বিচরণ করছিলাম, সেখানে হিমালয়ের সাদা শৃঙ্গগুলোর উপরে চলছিল শিব ও শক্তির লীলা। বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ ও মৈত্রেয়কে হারিয়ে আমি বিচরণ করছিলাম আমার প্রিয় হর-গৌরীর রাজত্বে। চমক ভাঙলো লামার সুমধুর কণ্ঠস্বরে—

ওম্ তারে তুত্ তারে তুরে স্বাহা। মা আমাকে সংস্কার থেকে মুক্ত কর, আমাকে ভয় থেকে মুক্ত কর, আমাকে ব্যাধি থেকে মুক্ত কর। আমাকে বুদ্ধের পথ দেখাও, ধর্মের পথ দেখাও, সঙ্ঘের পথ দেখাও··· ,

গীয়াৎসের চতুর্থ দিন, এক-এক করে সব লামাদের বিদায় জানালাম, একমাত্র আমিই সেখানে রইলাম, মা তারার যে আরাধনা শিখছি তা শেষ না করে যেতে পারবো না, তাতে অমঙ্গল হবে। আমার আপত্তি নেই তবে গুরুজীর অবর্তমানে খুবই ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। মনে মনে ভাবলাম—মা তারার আরাধনার যদি সত্যিই প্রয়োজন থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই গুরুজী আমাকে শিখিয়ে দিতেন। আবার পরক্ষণেই মনে হতে লাগলো এটাই ছিল ভবিতব্য যখন যা হবার হবেই—যখন যা আসবার আসবেই। এটাই নিয়তি, এটাই তাঁর ইচ্ছা।

থেরেপা লামা আমাকে সকালবেলা বিভিন্ন মন্দির দেখাতে লাগলেন। কোন মন্দিরের কোন বৈশিষ্ট্য সেগুলো ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন—যার অধিকাংশই আমি বুঝতে পারলাম না কিন্তু তাতে লামার কিছু যায় আসে না। তিনি গাইডের মতো অনর্গল বলে যেতে লাগলেন—মনে হয় এটাই তাঁর কর্তব্য অথবা তাঁকে এই দায়িত্বই দেওয়া হয়েছে। প্রায় চারঘণ্টা ধরে বিভিন্ন মন্দির ঘুরে আমরা এসে পৌছলাম মহামান্য খাম্পোর ঘরে।

খাম্পো সাধারণতঃ হাসেন না কিন্তু হাসলে তাঁকে বড় সুন্দর দেখায়। তাঁর সেই বিরাট দেহটায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে শিশুর সৌন্দর্য, তিনি আমাকে দেখে সহাস্যে আমার মাথায় হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি, কেমন লাগছে আমাদের এখানে ?

বেশ ভালোই লাগছে। আমিও হেসে উত্তর দিলাম।

তারপর অনেকক্ষণ তাঁর পাশে বসে রইলাম, কোন কথাবার্তা নেই। বেশ কিছুক্ষণ পর হঠাৎ তিনি উঠলেন, তারপর আমাকে বললেন—এসো আমার সাথে।

আমরা সেই বাড়ীটার পেছনের দিকের একটা সরু গলি দিয়ে হেঁটে একটু উপরদিকে উঠলাম, একটি বিরাট মন্দিরের মতো বাড়ীতে এসে আমরা থামলাম। বাড়ীটার উঠোনে রোদে বসে ত্রাপারা স্তোত্র পাঠ করছিল। আমাদের দেখেই তারা সবাই উঠে দাঁড়াল। আমরা তাদের দিকে হেসে হাত নাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম কোণের একটা বড় ঘরের দিকে। ঘরে ঢুকেই দেখলাম এটা একটা পুরোনো মন্দির। সামনের বিরাট বেদীর ওপর নজরে পড়ল একটা ভয়ংকর মূর্তি, তার সামনে আমরা প্রণাম করে দাঁড়ালাম, খাম্পো আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—এই মূর্তিটা কার বলতে পারো ?

অনেকক্ষণ সেই ভয়ংকর মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে তারপর বললাম,

—না, চেনা চেনা মনে হলেও ঠিক ধরতে পারছি না।

—এই মূর্তিটা হচ্ছে মহাকালের, মহাকাল খুব জাগ্রত দেবতা। তুমি এখানে কিছুক্ষণ একা একা থাকবে। তুমি এই মহাকাল দেবের কাছে তোমার অভিষ্ট ফল প্রার্থনা কর। তারপর তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে। এই কথা বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

সেই মহাকালের কাছে কি চাইব, চাইবার আছেটাই বা কি! এ পর্যন্ত আমি না চাইতেই সব পেয়েছি, যেটা চাইব সেটা হয়তো আমার পক্ষে ভালো নাও হতে পারে, অথচ খাম্পো বলেছেন কিছু চাইতে। সেই ভয়ংকর মহাকালের কাছে কিছু চাইতেও যেন ভয় করতে লাগল। শেষে কিছুই না চেয়ে বসে রইলাম। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে চুপচাপ বসে থেকে তারপর উঠলাম। যে পথে সেখানে গিয়েছি সেইপথেই ফিরে এলাম খাম্পোর বাড়ীতে।

খাম্পো আমাকে দেখে পাশে বসতে বললেন। তিনি অধিকাংশ সময়ই বসে থাকেন। তিনি তাঁর ঘরে বসেই গীয়াৎসের পবিত্র মন্দির এলাকাকে পরিচালনা করেন। সবশুদ্ধ নিয়ে সেখানে তিন হাজারের মত লোক আছে। চারটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ; মন্দির ও তার সংলগ্ন প্রাঙ্গণগুলো, রাস্তাঘাট, পুরোহিত সব কিছুর পরিচালনার ভার তাঁর উপরে। ১৯৫০ সালের আগে তিনিই ছিলেন সম্পূর্ণ গীয়াৎসের মালিক। এখন বয়স বাড়ার সাথে সাথে দায়িত্বটাও কমে আসছে। রাজনীতিরও আজকাল অনেক পরিবর্তন হয়েছে, আগে ছিল ধর্ম-ভিত্তিক এখন হচ্ছে আইন-ভিত্তিক। খাম্পো অবশ্য এ ব্যাপারে কিছু বলতে চান না। তবে তাঁর মতে প্রত্যেকটা দেশই তথাগতের বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের ভিত্তিতে স্থাপিত হলে, দুঃখ-কষ্ট ও জরা থেকে এ জগৎ রক্ষা পেতে পারে।

খাম্পোকে হঠাৎ একটি প্রশ্ন করলাম—আমাকে হঠাৎ আপনি এত দয়া করছেন কেন? আপনি তো জানেনই যে আমি মোটেই এ পথের পথিক নই। বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছিলাম গয়ায়, তারপর গুরুজীর কৃপায় এখানে।

তিনি হেসে বললেন—আমি তোমার প্রশ্নে খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার প্রশ্নই প্রমাণ করছে যে তুমি সত্যবাদী ও সরল। আমি তাঁর কথার প্রতিবাদ করে উঠলাম কিন্তু তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে তাঁর কথা চালিয়ে যেতে লাগলেন—তুমিতো একা নও ভারতের শত শত ছেলেরা ইস্কুল পালাচ্ছে আর বাড়ী থেকেও পালাচ্ছে কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও তো এই পথে আসে না। এ পথে আসার জন্য চাই উপযুক্ত প্রস্তুতি আর পূর্বজন্মের কর্মফল। তাঁর ইচ্ছায় তুমি একবার যখন এখানে এসে পৌছেছ তখন কিছু শিখে যাও। তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্ম অন্যান্য দেশের বৌদ্ধ ধর্ম থেকে আলাদা। এখানে বৌদ্ধ ধর্মের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে হিন্দু দেব-দেবী। তুমি এখানে তাদের আসল ও আদিরূপে দেখতে পাবে। যেমন ধর মা তারার আরাধনা, বল তুমি কি তা শিখে খুশী নও?

তাঁর কথা শুনে আমি আমতা আমতা করতে লাগলাম। তিনি নিজেই আমার হয়ে জবাব দিলেন—বুঝতে পারছি যে তোমার পক্ষে তাঁর আরাধনা করা প্রথম প্রথম খুবই মুশকিল। কিন্তু যত তুমি এতে অভ্যস্ত হবে ততই দেখবে তাঁর কৃপালাভে তুমি সমর্থ

হবে। সবুজ আর্য তারা এটা প্রথম দীক্ষা, দ্বিতীয় দীক্ষা হবে সাদা আর্য তারার আরাধনার। তুমি এখন লাসায় যাচ্ছো যাও ফেরার পথে তোমার ইচ্ছে হলে দ্বিতীয় দীক্ষার বন্দোবস্ত করা যাবে।

কিন্তু খাম্পোজী আপনি আমাকে দীক্ষা দিলেন কেন ?—আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

এই দীক্ষার মাধ্যমে তুমি সত্যিকারের তিব্বতী লামা সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়লে, বাইরের কেউ তোমাকে অপদস্ত করতে পারবে না। আর এই ধর্ম তোমাকে তিব্বতে থাকাকালীন সাহায্য করবে ও রক্ষা করবে। এখন না হলেও তুমি পরে বুঝবে। এটা আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছানুসারে হয়েছে—তোমার গুরুকে আমি সে কথা জানিয়েছি। যাই হোক, তোমার যাত্রাপথ শুভ হোক তোমার মঙ্গল হোক। এই বলে তিনি চুপ করলেন।

প্রথমে তাঁর গুরুগম্ভীর ভাব দেখে ভেবেছিলাম যে এই বিরাট দেহটার মধ্যে শুকনো নীতিবাক্য ছাড়া আর কিছু নেই, কিন্তু এখন হঠাৎ আমার সামনে তাঁর মহানুভবতার রূপ খুলে গেল। খাম্পোর দরদী হৃদয়ের কাছে আমার মাথা নীচু হয়ে এল। তাঁকে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম।

তিনি মাথায় স্নেহের স্পর্শ দিয়ে বললেন—তোমাকে আমার ভালো লেগেছে এই দীক্ষা তারই কারণ হিসেবে গ্রহণ কর। তথাগত তোমার মঙ্গল করুন। মা তারা তোমার চিত্তকে পাপমুক্ত করুন।

গীয়াৎসেতে আমি সবশুদ্ধ ছিলাম পাঁচদিন, ছ'দিনের দিন সকাল বেলা আমি শহর ছাড়লাম। খাম্পো আমাকে শহরের এক ভদ্রলোকের সাথে ছাড়লেন। ভদ্রলোকের নাম দেশেন ওয়াংদি, তাঁর সাথে আমি যাবো পরের গোব্‌শি গ্রাম পর্যন্ত। ভদ্রলোক সেখানে থেমে যাবেন, এই পথ ধরেই আমাকে এগিয়ে যেতে হবে যমদ্রোক সরোবর পর্যন্ত। সেখানে সামদিং গুম্ফা থেকে পাওয়া যাবে পরবর্তী নির্দেশ। এখান থেকে সামদিং পৌঁছতে বেশ কয়েকদিন লাগবে। পথে বার বার খাম্পো আর লামা থেরেপার কথা মনে হতে লাগলো। ভোরবেলাই মঠ ছাড়তে হয়েছে তাই তাঁদের সাথে দেখা করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। গীয়াৎসেতে আমার লাভ হয়েছে প্রচুর। আধ্যাত্মিক লাভ তো বটেই আর পার্থিব লাভও বটে। একজোড়া নতুন তিব্বতী জুতো, নতুন গৈরিক বসন আর দু'টাকা নগদ। এ সবকিছুই খাম্পোর কৃপায় পেয়েছি। এ শীতের দেশে এর চেয়ে বড় উপহার আর কিছু হতে পারে না।

গীয়াৎসের থেকে সাম্‌দিং গুফা

ওয়াংদি মশায় লোক হিসেবে বেশ ভালো। বয়স হয়ত তিরিশের কাছাকাছি হবে। মাথায় মেয়েদের মতো লম্বা চুল আর লেপ্‌চাদের মতো পোষাক। ওয়াংদি মশায়ের গ্রাম এখান থেকে আঠারো মাইল দূরে, লাসার পথেই। গ্রামের নাম গোব্‌শি সেখানে তার একটা ছোট মুদীখানার দোকান আছে। প্রায় পনেরো ষোল,দিন পর তাকে গীয়াৎসে শহরে আসতে হয় মালপত্র কেনার জন্য। তার মাল বইবার জন্য সাথে আছে একটি খচ্চর। শহরে এলেই সে বড় মন্দিরে যায় প্রদক্ষিণ ও প্রার্থনাচক্র ঘোরাবার জন্য। লামাদের সাথেও এর ভালই পরিচয় আছে। খাম্পো প্রত্যেকবার লাসায় যাবার পথে এদের বাড়ীতে চা খান। দেশন ওয়াংদি অন্যান্য বারের মতো এসেছিল বাজার করতে, খাম্পো এ সুযোগটা ছাড়লেন না। তিনিই ওয়াংদির সাথে গোব্‌শি গ্রাম পর্যন্ত যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

খচ্চরটির পীঠেই সব মালপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে, আমাদের হাত একদম ফাঁকা। জানোয়ারটির মনে হয় এখানকার রাস্তাঘাট সব মুখস্থ আর তার পেছনে চলার জন্য কোন চাপ দিতে হয় না, তার নিজস্ব গম্ভীরভাব বজায় রেখে সে হেলেদুলে চলতে লাগলো। আমার মত এক বিদেশী লামাকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে মনে হয় সেও খুব আনন্দিত। ওয়াংদি ধূম পানে ওস্তাদ আর তার সাথে একটি দেশীয় মদের বোতলও রয়েছে। এই শুকনো শীতে দেহ-মনকে চাঙ্গা রাখবার জন্য এর চেয়ে উপযুক্ত আর কিছু হতে পারে না।

গীয়াৎসে থেকে' এবারে আমাদের রাস্তার ধারেই পাচ্ছি নীয়েরু নদী, তাই এই অঞ্চলের নাম নীয়েরু-উপত্যকা।

গীয়াৎসের মন্দিরগুলো এখনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আর পাহাড়ের উপরে দুর্গটি আগের থেকেও যেন স্পষ্ট দেখাচ্ছে। গীয়াৎসের এই দুর্গটিকে দেখার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এ যাত্রায় আর তা সম্ভব হল না। পাহাড়ের সাথে খাপ খাইয়ে এত সুন্দরভাবে ও কৌশলে সেটাকে দাঁড় করানো হয়েছে যে দেখলেই তার দিকে সকলকে টানে। মনে হয় এই বিরাট প্রাসাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন যাদুকর লুকিয়ে আছে। পাহাড় কেটে এই সুদৃশ্য বাড়ীটাকে দাঁড় করানো মানুষের পক্ষে মনে হয় অসম্ভব। অনেকক্ষণ ধরে আকাশের গায়ে সেই দুর্গটিকে আমি বার বার ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে লাগলাম। তারপর ধীরে ধীরে সেটাও অদৃশ্য হয়ে গেলো। আমরাও যাচ্ছি পূর্বদিকে।

গীয়াৎসের সেই প্রশস্ত সমতলভুমি ক্রমশঃ একটি সরু উপত্যকায় পরিণত হতে লাগল। এই প্রথম নজরে পড়ল চাষযোগ্য ভূমি। আমাদের দেশের মতো দু'পাশে লাঙ্গল চষা জমি। বরফ এখন গলতে শুরু করেছে, এ পথ দিয়ে যদি ফিরে যাই তাহলে নিশ্চয়ই চোখে পড়বে ইয়াকের কাঁধে লাঙ্গল খাটিয়ে তিব্বতী চাষারা চাষ করছে। রাস্তাটা খারাপ নয়, পাথর বসানো কাঁচা রাস্তা। রাস্তায় প্রায়ই চোখে পড়তে লাগল ইয়াক্, গাধা ও খচ্চরের পিঠে মাল বোঝাই করে লোকজনেরা চলাফেরা করছে। ওয়াংদির থেকে আমার দিকেই তাদের দৃষ্টি বেশী। কাছাকাছি এলেই তারা বিরাট জিভ বার করে আমাকে নমস্কার জানাতে লাগলো। আমাদের ডান দিকের পর্বত-শ্রেণীটাই চোমলহারি, তার ওপরের বরফের দৃশ্যটা এখান থেকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। নীয়াং উপত্যকা থেকে তার দৃশ্যটি ছিল অন্য রকমের। আমাদের রাস্তাটা এবার নদীটাকে নীচে রেখে উপরের দিকে উঠতে শুরু করল। নদীটা রইল পাহাড়ের নীচে আর সেই পাহাড়েরই উপরে উঠতে লাগলাম। অনেকটা তিস্তা পুলের পরেই গ্যাংটকে আসার পথে যেরকম পেয়েছিলাম। তবে তফাৎ হচ্ছে যে সেই তুলনায় এই নদী খুবই ছোট। নদীর ধারেই এই রাস্তাটাও আগের মতো অত নির্জন নয়। আশপাশে মাঝে মাঝে ঘর-বাড়ীও নজরে পড়তে লাগল। আমরা পাহাড়ের উপর উঠতে লাগলাম। গাছ-গাছড়া খুব বেশী একটা চোখে পড়ে না, এই শুকনো ঠাণ্ডায় মনে হয় একমাত্র পাইনজাতীয় ছাড়া অন্য কোন গাছ হওয়া সম্ভবও নয়।

দুপুরবেলা আমরা একটা ঝরনার কাছে থামলাম, ওয়াংদি খচ্চরকে বরফে ভেজা ঘাস ও জল খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সেই ফাঁকে আমি একটা হিমশীতল পাথরের ওপর কম্বলটা বিছিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম একটু বিশ্রামের জন্য। আমরা শুকনো রুটি ও ঝরনার জলে ছাতু ভিজিয়ে মধ্যাহ্ন আহার শেষ করে আবার রওনা হলাম। সন্ধ্যার সময় আমরা একটা গ্রাম পেলাম। এই গ্রামটিই গোব্শি। গোব্শি গ্রামে এক হাজারের বেশী লোক হবে না। গ্রামে ঢুকতেই যথারীতি গ্রামের কুকুরদের দ্বারা আমরা আপ্যায়িত হলাম। ওয়াংদি এই গ্রামেরই লোক কাজেই কুকুরগুলো ওকে চেনে। ছোটখাটো কয়েকটি বস্তি বাড়ী দিয়ে গ্রাম শুরু। ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সবাই যে যার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। গ্রামের মূল কেন্দ্রটা হচ্ছে চারটি রাস্তার সঙ্গমস্থল। নদীটা এখান থেকে মনে হয় দেড়শো ফিট নীচে। মাটি ও স্থানীয় পাথরের সংমিশ্রণে ঘরগুলো তৈরী। আমরা একটা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালাম। বাড়ীটা খামার বাড়ীর মতো, দরজায় ধাক্কা দিতেই ভেতর থেকে দরজাটা খুলে গেলো। সামনেই দেখলাম তিন-চার জন লোক। একজন বয়স্কা ভদ্রমহিলা, দু'জন যুবক একজন যুবতী। আমাকে দেখেই সবাই অবাক হয়ে গেলো। ওয়াংদি সকলকে আমার পরিচয় দিতেই তারা সসম্ভ্রমে জিভ বার করে নমস্কার করে দাঁড়ালো। তাদের মধ্যে সবচেয়ে খুশী হয়েছেন বয়স্কা ভদ্রমহিলা, আমার পরিচয় পেয়ে তার মুখটা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমাদের পরিচয়ের পালা চলছিল। ভদ্রমহিলা সবাইকে তাড়া দিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন। আমরা একটা ঘরে এসে বসলাম। ঘরের

মধ্যে বিছানা, লেপ-তোষকগুলো পাতাই ছিল। সেখানে বসবার জন্য আমি জুতোটা খুলতেই তারা আমাকে বাধা দিল। অগত্যা জুতো নিয়েই আমি তাদের বিছানায় উঠে বসলাম। বলাই বাহুল্য, বিছানাগুলো কোনদিনই পরিষ্কার করা হয়নি। লেপ ও তোষকের নমুনা দেখলেই বোঝা যায়। হ্যারিকেনের অল্প আলোয় ভদ্রমহিলার মুখটা খুব উজ্জ্বল ও পবিত্র বলেই মনে হল। ওয়াংদি সকলের সাথে আমার পারিচয় করিয়ে দিল। বয়স্কা ভদ্রমহিলা তার মা, দুই ভাই, যুবতীটি তার স্ত্রী, আর তার দুই ছেলে এখন ঘুমোচ্ছে।

হ্যারিকেনটা মাঝখানে রেখে তার চারদিকে সবাই আমাকে ঘিরে বসল। দু'ভাই ইতিমধ্যে মালপত্রগুলো খচ্চর থেকে নামিয়ে রেখেছে। এই বাড়ীরই একটা অংশে তাদের দোকান। আমার সাথে তাদের কথাবার্তা খুবই কম হতে লাগলো। ওয়াংদি আমার সম্পর্কে কি বলল কে জানে। যাই বলুক না কেন সেটা যে আমার অনুকূলে ছিল তা বলাই বাহুল্য। কিছুক্ষণ পরে আমরা সবাই রান্নাঘরে এসে বসলাম। ঘরটা কাঠের ধোঁয়ায় সম্পূর্ণ কালো রঙের। আমরা কয়েকটি কাঠের পিঁড়িতে উনোনেরপাশে এসে বসলাম। বাড়ীর সকলের খাওয়া হয়ে গেছে, রান্না হল শুধু আমাদের জন্য। বার্লির ঝোলের মধ্যে শুকনো ভেড়ার মাংস দিয়ে অতি চমৎকার এক তিব্বতী ঝোল তৈরী হল। আমরা খুব ক্লান্ত ছিলাম। কাজেই খাওয়া দাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে শোবার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। আমি পরের দিন ভোরবেলায়ই রওনা হব। মাত্র একরাত্রির জন্য ওদের ওখানে থাকবো। আমার শোবার বন্দোবস্ত হল ওয়াংদির সাথে। অর্থাৎ ওয়াংদি তার স্ত্রী ও শিশুরা যে বিছানায় শুয়েছে সেখানেই আমার স্থান হয়ে যাবে। একটু ঠাসাঠাসি অবশ্য হবে কিন্তু তিব্বতের শীতে সেটাই সকলের কাম্য। অনেকদিন পর মনে হল আমি ঘরোয়া পরিবেশে এসে পড়েছি।

পরের দিন সকালবেলা শিশুদের খেলার শব্দে আমার ঘুম ভাঙলো, বিছানায় শুয়ে শুয়েই ওরা তাদের বাবার সাথে খেলা করছে। ওয়াংদির স্ত্রী মনে হয় এরই মধ্যে উঠে গেছে। আমিও বিছানায় উঠে বসলাম। শিশু দুটি হঠাৎ এক আগন্তুককে বিছানায় দেখে একটু চুপ হয়ে গেলো, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের সে ভাবটাকে দূর করে আমি ওদের প্রিয় হয়ে উঠলাম। সূর্য এখানে একটু দেরী করে ওঠে। সূর্য ওঠার সাথে সাথেই গ্রামের লোকেরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে রোদ পোয়ানোর জন্য। ওয়াংদি পরিবার খুব মিশুকে ও হাসিখুশী, তাদের দেখেই বোঝা যায় যে আমার উপস্থিতিতে তারা যেন সম্মানিত হয়েছে। সকালবেলা আমি তাদের সাথে দুক্পা খেয়ে সবাইকে বিদায় জানাতে বাধ্য হলাম। গ্রামের চার মাথায় সবাই এরই মধ্যে আমার বিষয়ে জেনে গেছে। রাস্তার দু'পাশে ছোট শিশু থেকে বুড়ো পর্যন্ত সবাই দাঁড়িয়ে রয়েছে দর্শনের জন্য। আমাকে দেখেই কেউ মাটি ছুঁয়ে, কেউ জিভ বার করে প্রণাম করতে লাগল। তাদের সকলকে আর্শীবাদ করে আমি আবার পথ ধরলাম।

এবার আমি সম্পূর্ণ একা। গোব্শি থেকে যেতে হবে সামদিং পর্যন্ত সম্পূর্ণ একা। এখান থেকে তিনদিনের পথ; রাতে কোথায় কোথায় থাকতে হবে সব লিখে

নিয়েছি। গুরুজী আমাকে লিখে দিয়েছেন স্থানগুলোর নাম। লামারা সবাই সামদিং গুম্ফাতে আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। গোব্‌শি গ্রামের পর পাবো রালুং; কারো-লা,জারা, নাগাৎসে, ত্রামালুক ও শেষ সামদিং। রাস্তায় পরে মনে মনে ভাবলাম যে গোব্‌শি ছেড়ে খুব ভালো করেছি কারণ ওয়াংদি পরিবারের মায়ায় পড়ে যেতাম, বিশেষ করে শিশু দুটি এত হাসিখুশী আর সুন্দর যে একবার কোলে নিলে আর ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

পাহাড়ের উপর এবারকার রাস্তাটা সরু, নদীটা অনেক নীচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে রাস্তাটা খাড়াই হয়ে উপরে উঠছে আবার নেমে আসছে। রাস্তার ঠিক পাশেই মাঝে মাঝে খাড়া হয়ে জমিটা নীচে নেমে গেছে, একবার পা পিছলে পড়লে আর দেখতে হবে না। আমার চলায় এবার কোনো বাঁধন নেই, তাড়াতাড়ি বা আস্তে যে রকম খুশী চলতে পারি। তবে আমি এখন ভালোভাবে শিখেছি যে, তাড়াতাড়ি চলার থেকে আস্তে আস্তে চললেই ভালো, তাতে রাত পর্যন্ত চলার দম থাকে। পাহাড়ি রাস্তায় এখন কিছু কিছু গাছপালা দেখতে পেলাম, মনে হয় এই গাছগুলোর কথাই ভুগোলে পড়েছি চিরহরিৎ বৃক্ষ। মাঝে মাঝে দেখেছি পাহাড়ের কোলে ঘরবাড়ী রাস্তায় লোকজনেরও অভাব নেই। এখানে শীত মনে হয় গীয়াৎসের থেকে আরও বেশী। পথটা মোটেই সমতল নয়, বিকেলের দিকে উপত্যকাটা আরও সরু হয়ে আসতে লাগলো, প্রায় সন্ধ্যের কাছাকাছি পেলাম রালুং গ্রাম। রালুং-এর উচ্চতা চোদ্দ হাজার পঁচিশ ফুট। পাহাড়ের উপর এই গ্রামটি যেন ছবির মতো সুন্দর। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট বাড়ী, গোব্‌শির তুলনায় এটা আরও বড় গ্রাম। এই গ্রাম থেকেই দূরে দেখতে পেলাম সুন্দর তুষারাবৃত আর একটি পাহাড়, পড়ন্ত সূর্যের রঙিন আলো পড়ে সেটাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। শীতের প্রকোপ বেশী না থাকলে আমি নিশ্চয়ই আশপাশের কোনো পাথরে বসে বসে সেই দৃশ্য দেখতাম। কিন্তু এখন শুধু শীতই নয়, সেই সাথে দিনের আলোও নিভে আসছে। রাত হবার আগেই আমাকে খুঁজে বার করতে হবে এখানকার মঠ। তিব্বতের একটা সুবিধা হচ্ছে যে, এখানে কথা বলা বা জিজ্ঞাসা করার জন্য লোক খুঁজতে হয় না। নতুন লোকের গন্ধ পেলেই এরা দৌড়ে এসে ভিড় করে। আমার লামা বেশ দেখে, অনেকেই ভাবে যে আমি এদেশেরই একজন কেউ, কিন্তু কাছে এসে একটু থমকে দাঁড়ায়, তারা এক পা দু-পা করে এগিয়ে এসে আলতোভাবে দু'একটা কথা ছুঁড়ে দেয়, হয়তো পরীক্ষা করে দেখতে চায় যে আমি সত্যিই তাদের দেশের না বিদেশের। এই পথে কোন চীনা সৈন্য নেই, কাজেই আমার ভাগ্যটা ভালই বলতে হবে নয়তো আমাকে একা পেলে তাদের কবল থেকে সহজে ছাড়া পাওয়া মুশকিল হত।

একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আমি তাদের জিঞ্জাসা করলাম—এখানকার গুম্ফাটা কোনদিকে বলতে পারেন? আমার প্রশ্ন শুনে সকলেই একসাথে জবাব দিতে লাগলো, সকলেই হাত-মুখ নেড়ে আমাকে বুঝিয়ে দিতে লাগল রাস্তাটার নিশানা। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমি তাদের দ্রুত কথার কিছুই বুঝতে পারলাম না, শেষে এক

ভদ্রলোক দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন—সকলকে থামিয়ে দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—গুম্ফায় যাবে? বেশ ভালো কথা, এখান থেকে খুব বেশী দূর নয়। এই রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলেই পাবে, রাস্তায়ই পড়বে।

তাদের হাসিমুখে ধন্যবাদ দিয়ে আমি পা বাড়ালাম। কয়েক পা এগিয়েছি মাত্র এমন সময় পেছন থেকে তিন চারজন 'ত্রাপা-ত্রাপা' বলে চীৎকার করে আমার দিকে দৌড়ে এল। আমি থামলাম। তারা আমাকে বুঝিয়ে বলল যে পেছন থেকে আমাকে একজন ডাকছেন। পেছনে আবার ফিরে এলাম। যে ভদ্রলোক আমাকে গুম্ফার পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন আসলে তিনিই আমাকে ডাকছেন। কাছে আসতেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—একটু চা খাবে? নিশ্চয়ই—বলে আমি আনন্দে যেন লাফিয়ে উঠলাম।

ভদ্রলোক আমার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেলেন। আমি গ্রামবাসীদের সাথে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলাম। ইতিমধ্যে সূর্যাস্ত হয়ে গেছে, সূর্যাস্তের সাথে সাথেই নেমে আসে কন্‌কনে ঠাণ্ডা আর অন্ধকার। ঠিক এই মুহূর্তে এক কাপ গরম চা, আহা! সে যে অমৃত। ভগবানের অশেষ কৃপা ছাড়া এ ব্যবস্থা সম্ভব নয়। আমার পকেটে দু'টাকা রয়েছে কিন্তু চা খাওয়ার কথা মনে আসেনি, কতক্ষণে রাতের বিশ্রাম পাবো, একটু শুতে পারবো—সেটাই ছিল আমার লক্ষ্য।

একটু পরে দোকানের দরজা খুলে এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। তিনি আমাকে ডেকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। দোকানের ভেতরে ঢুকেই বুঝতে পারলাম যে এটি একটি চায়ের দোকান। সুর্যাস্তের সাথে সাথেই এখানকার দোকান-পাট সব বন্ধ হয়ে যায়। ভদ্রমহিলাকে দেখতে ঠিক লেপচাদের মতো, কোমরের উপর জড়ানো সাতপাকের একটা পেছি, মাথার চুল শক্ত করে টেনে বিনুনী করা, পোশাকের সামনের দিকটা খুবই ময়লা, কাজ করবার সময় গামছা হিসেবে মনে হয় বুকের ওপর তিনি হাত পোঁছেন। একনজরে দেখলেই বোঝা যায় যে তিনি খেটে খাওয়া মানুষ। যদিও চায়ের দোকান কিন্তু ভেতরে বেঞ্চি বা টেবিলের কোনো বন্দোবস্ত নেই। বিরাট ঘরের মাঝখানে একটা বিরাট গর্ত করা হয়েছে, সেখানে আগুন রেখে চারপাশে খদ্দেররা বসে গল্প করতে করতে চা পান করে। এরা খুবই পরিশ্রমী মানুষ। এই অঞ্চলে চাষ-আবাদ করার জন্য পাথর কেটে তৈরি করেছে ধাপে ধাপে চাষের উপযোগী জমি। গরম হয়তো এখানে বড়জোড় এক বা দুই মাস, সেই সময়েই যতটুকু সম্ভব তাড়াহুড়ো করে ফসল ফলানো হয়। চাষ-আবাদ ছাড়া আর একটা জিনিস খুব ঘন ঘন চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে এখানকার গবাদি পশু, ভেড়া, গাধা, ইয়াক্ ইত্যাদি। কুকুর আর মুরগীদের তো এটা স্বর্গরাজ্য। চা মনে হয় তৈরি করাই ছিল সেটাকে গরম করে একটা গ্লাসে করে ভদ্রমহিলা আমাকে দিলেন। পকেট থেকে দুটাকা বের করে বললাম এর থেকে দামটা নিয়ে নিন।

ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে দু'পা পিছিয়ে গেলেন। তিনি কিছুতেই দামটা গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। চা খেয়ে আমি বেরোতে যাবো এমন সময় ভদ্রলোক আমাকে একটু

অপেক্ষা করতে বললেন—তারপর তার স্ত্রী সাথে কোন একটা বিষয়ে আলাপ করতে লাগলেন। আমাকে বুঝিয়ে বললেন—এখান থেকে গুম্ফার পথ খুব দূরে নয়, তবে রাতের রাস্তাটা খুব ভয়ঙ্কর। গ্রামের কুকুরগুলো তোমাকে চেনে না কাজেই সেটাও একটা বিপদ, রাতের বেলা কুকুরগুলো আরও বিপজ্জনক। তুমি ইচ্ছা করলে এখানে থেকে যেতে পারো, উনোনের আগুন প্রায় সারারাতই থাকে কাজেই কোনো অসুবিধা হবে না।

আমি একটু দ্বিধা করলাম কিন্তু তাদের সুপরামর্শের বাইরে যেতে আমার সাহস হল না। আমি রাজি হয়ে গেলাম। একটা অচেনা পথিকের প্রতি তাদের দরদ ও আন্তরিকতার পরিচয় পেয়ে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমার মতো একটা সামান্য মানুষকে বাঁচিয়ে তাদের লাভটা কি? মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা সেটাই হয়তো এই তিব্বতীদের বৈশিষ্ট্য। অথচ এরা যখন আমাদের ওখানে যায় তখন এদের বেশভূষার নোংরামি দেখে তাদের আমরা হেয় চোখে দেখি। এদের ভেতরে লুকিয়ে থাকা এই দরদী প্রাণটাকে আমরা কতভাবে আঘাত করি, এই কথা ভেবে লজ্জায় আমার মুখটা নত হয়ে এল।

বুঝলাম যে এই ভদ্রমহিলা আর ভদ্রলোক কর্তা গিন্নী নয়। দোকানের মালিক ভদ্রমহিলা, অর ভদ্রলোক তার এখানে কাজ করেন। তবে তার এখানেই রাত কাটায়। এর বেশী কিছু আর জানতে পারলাম না, তবে তারা দু'জনেই যে মানবদরদী সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। দোকানটির অবস্থা দেখে মনে হয় না যে এরা বড়লোক। সারাদিন চলার জন্য আমি ক্লান্ত এমন অবস্থায় আমার যেটা একান্তই দরকার তা হচ্ছে আস্তানা আর আগুন। খাওয়া না হলেও চলে। কিন্তু ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা দু'জনেই আমাকে তাদের সাথে খেতে বললেন। খুব সংক্ষেপে আধঘন্টার মধ্যেই রান্না হল। বার্লি সেদ্ধ আর মাংসের কুঁচো দিয়ে একটা ঝোল, সে যেন অমৃত।

হঠাৎ মনে পড়ল যে আমার থলির মধ্যে কিছু বাড়তি নুন আছে, তিব্বতে নুন খুব দামী কাজেই প্রয়োজনবোধে বিক্রি করা যেতে পারে। গীয়াৎসে থেকে ছাড়াছাড়ি হবার সময় গুরুজী কিছু ছোট জ্বালানী কাঠ ও লবণের থলিটা আমার ভরসায় রেখে এসেছিলেন। খাওয়ার জন্য ওরা দাম নিতে চায় না, কাজেই ভাবলাম আমার তরফ থেকে কিছু দেওয়া দরকার। তাই খাওয়ার শেষে আমি থলেটা থেকে কিছু নুন বের করে একটা বাটিতে রাখলাম। আমার কাছ থেকে নুন পেয়ে তারা দু'জনেই খুব খুশী। হ্যারিকেনের আলোয় তাদের খুশীতে ভরা মুখটা যেন জ্বল জ্বল করে উঠল। কোনো রকম বাধা না দিয়েই ভদ্রমহিলা তা গ্রহণ করলেন। তারপর আমি কম্বলটা বিছিয়ে শোবার বন্দোবস্ত করে ফেললাম। আমার শোবার সময় ভদ্রমহিলা তার বাক্স থেকে অতি যত্নে রাখা একটা টেবিল ঘড়ি আমার কাছে নিয়ে এলেন, তারপর কোন রকমে আমাকে বুঝিয়ে বললেন আমি ওটাকে চালাতে পারি কিনা। আমি ঘড়িটাকে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম সব ঠিকই আছে, তবে মনে হয় অনেকদিন যাবৎ ব্যবহার করা হয়নি। সেটাকে দম দিতেই চলতে আরম্ভ করল, ভদ্রমহিলা তাই দেখে আনন্দে নেচে

উঠলেন। তারপর, তাদের আরও অবাক করে দিয়ে অ্যালার্মটা বাজিয়ে দিলাম। সেটা শুনে ভদ্রমহিলা বাচ্চা মেয়ের মতো হিহি করে হেসে উঠলেন, এই সামান্য ব্যাপারে তিনি যে এত খুশী হয়ে উঠবেন আমি তা ভাবতেই পারিনি। আমি যেন তাদের যাদু দেখাচ্ছি।

ভদ্রমহিলা পরে বুঝিয়ে বললেন—এই ঘড়িটা তার ভাই শিলিগুড়ি থেকে কিনে এনেছিল, কিন্তু মুল্যবান উপহার বলে সেটাকে তিনি সব সময় বাক্স-বন্দী করে রেখেছিলেন। তার ভাই অবশ্য বুঝিয়ে দিয়েছিল কিভাবে সেটাকে চালাতে হয়, কিন্তু তিনি কোনোদিনই সেটাতে হাত দিতে সাহস করেন নি। যাই হোক, আমি ভদ্রমহিলাকে আবার নতুন করে ঘড়ি দেখা, দম দেওয়া ও অ্যালার্ম বাজানো শিখিয়ে দিলাম। ভদ্রমহিলা আমার মতো একজন গুণী সাধু পেয়ে খুবই আনন্দিত হলেন। তার হয়তো আরও অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করার ছিল কিন্তু আমার অবস্থা কাহিল, ক্লান্তিতে দুই চোখ আপনা থেকেই বুজে আসছে। তিনি সে কথা বুঝতে পেরে উনোনের পাশে আরও দুটো বড় কাঠ রেখে লেপের মধ্যে আশ্রয় নিলেন। উনোনটাকে মাঝখানে রেখে আমরা তিনজন তিনদিকে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই পেলাম গরম চা, তারপর ভদ্রমহিলা নিজেই এলেন আমাকে এগিয়ে দেবার জন্য। ভদ্রলোক তখনও মহাসুখে নাক ডাকছেন। গ্রামের সবাই তখনও ওঠেন নি, রাস্তায় এসে সামনের দিকে তাকাতেই আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার সামনেই হিমালয়ের যে অপূর্ব রূপ দেখতে পাচ্ছি তাতে আমার বাক্‌রুদ্ধ হল। একে সুন্দর বললে ছোট করা হয়। অতি সুন্দর বললেও তার আসল রূপ বর্ণনা থেকে অনেক দূরে থাকতে হয়, মনে হয় এ সৌন্দর্য ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করা যায় না। ভাষার বাইরে যে এক অব্যক্ত জগৎ সেই জগতেরই এই প্রাকৃতিক সম্পদ। আমাদের অনতিদূরেই একটি সুন্দর বরফে ঢাকা পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে, সুর্যের আলোকে তার এক পবিত্র স্নিগ্ধ রূপ পৃথিবীর উপর ধরা দিয়েছে। মনে হচ্ছে এই পাহাড়ের উপরেই রয়েছে দেবরাজ ইন্দ্রের ইন্দ্রপুরী, উপরে পরিষ্কার নীল আকাশের চাঁদোয়া খাটিয়ে যেন তার অখন্ড পবিত্রতা রক্ষা করা হয়েছে।

ভদ্রমহিলা আমাকে বিহ্বল দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বললেন—এই পাহাড়টার নাম নোজিন্ কাং সাং। এই পাহাড়টির ঠিক নিচে দিয়েই বয়ে গেছে সাংপু নদী ; তোমাদের দেশের লোকেরা যাকে বলে 'ব্রহ্মপুত্র'। মনে মনে তাকে স্মরণ করে প্রণাম জানালাম।

তিব্বত থেকেই শুরু হয়েছে ব্রহ্মপুত্র। পাহাড়ের উপরকার তুষার গলে গলে তৈরী হয়েছে তার জল। ব্রহ্মপুত্রের আদি দেখতে পাবো মনে আনন্দে বুকটা নেচে উঠল। তিব্বতের এই মহান নোজিন্ কাং সাং পর্বত চোমলহারির সাথে কারো-লা নামক স্থানে মিলিত হয়েছে। লাসার পথে আমাদের সে পথ পার হতেই হবে, এখান থেকে তা মাত্র ঘন্টা তিনেকের পথ। নোজিন্ কাং সাং-এর উচ্চতা চব্বিশ হাজার ফুট। পর্বতশৃঙ্গের উপরে বরফ পড়ে জমাট হয়ে আছে একেই বলে গ্লেসিয়ার। আরও কিছু ভারী হলে হয়তো সম্পূর্ণ

চূড়াটাই ধসের আকারে নেমে আসবে নীচে। আকাশের মেঘ পর্বত চূড়ায় বাধা পেয়ে সেখানেই সৃষ্টি করেছে শিবের জটারূপ ভারী বরফ। তারপর সেই বরফ থেকে সূর্যের কিরণে সৃষ্টি হচ্ছে খরস্রোতা নদী। সেই নদীর জলে পুষ্ট হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র। টাইগার হিল থেকে এই ধরনের দৃশ্য দেখা যায় না, একমাত্র যারা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে অজানাকে জানতে অথবা ভাগ্যচক্রে এসে পড়ে তিব্বতের এই অঞ্চলে তাদের কাছেই ধরা পড়ে প্রকৃতি দেবীর এই গূঢ় রহস্যময় দৃশ্য। এ দৃশ্য একবার দেখলেই মনে আনে স্বর্গীয় অনুভূতি। স্বর্গরাজ্যকে কল্পনা করার এ-এক চরম সুযোগ।

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে রওনা দিলাম রালুং গুম্ফার দিকে। মাইলখানেক হাঁটার পর রাস্তার মোড় ঘুরতেই পাহাড়ের নীচে ছোট্ট একটা গ্রাম নজরে পড়ল, গ্রামটা বর্ধিষ্ণু সবগুলো বাড়ীর ছাদই মন্দিরের মতো, আর বাড়ীগুলোপাথরেরতার আশেপাশে রয়েছে সুন্দর কৃষিযোগ্য ভূমি। নদীটা বেশী দূর নয়। দেখেই মনে হয় সুন্দর শান্ত ও পবিত্র পরিবেশ। সেই গ্রামটা দেখিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন—এটাই রালুং গুম্ফা, এই রাস্তাটা ধরে এগিয়ে গেলেই তার দরজা পাবে। ভদ্রমহিলা আমাকে ছেড়েও যেন ছাড়তে চাইছেন না, কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। আমি আস্তে আস্তে এগুতে লাগলাম সেই মঠের দিকে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে দেখা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মাতৃমূর্তি আমার হৃদয়ে গাঁথা হয়ে থাকবে।

গ্রাম বলতে আসলে এটা সম্পূর্ণ একটা বৌদ্ধ বিহার। সাতটা ছোট ছোট বাড়ী নিয়ে এই বিহারটি গড়ে উঠেছে, বড় বড় থামের সঙ্গে অসংখ্য প্রার্থনা পতাকা উড়ছে। সামনেই কয়েকটা গাধা ও ভেড়া আমাকে দেখে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর তিব্বতের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী কুকুরগুলো ছুটে এসে আমাকে স্বাগতম জানালো। কুকুরগুলো ছুটে এলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়তে হয় সেটাই হচ্ছে নিয়ম, তারপর মঠের থেকে দু'জন লামা বেরিয়ে এসে আমাকে উদ্ধার করলেন। অল্প বয়স্ক লামা দু'জন মনে হয় সবে তাদের নবীন জীবন শেষ করে লামা পর্যায়ে পড়েছে। আমার কাছে এসেই জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি মৌনীবাবা, গ্যাংটক থেকে আসছো? আমি মাথা নেড়ে হাসিমুখে সম্মতি জানালাম। আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হল না। তারা আমাকেই আমার যা জানা দরকার তা জানাতে লাগলো—তীর্থযাত্রীরা সবাই একে-একে এখান দিয়েই গিয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকে এখানে রাত কাটিয়েছেন, তুমি এখন যদি রওয়ানা হও তাহলে আজ রাতেই সামদিং গুম্ফাতে পৌঁছতে পারবে সেখানে সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করবেন।

লামা দু'জন আমাকে খুব আস্তে আস্তে ভেঙে ভেঙে এই কথাগুলো বুঝিয়ে দিল। এদের ভাব দেখে আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে আমাকে মৌনীবাবা হিসেবেই সবাই ধরে নিয়েছেন কাজেই আমার কথা বলার কোন প্রশ্নই আসে না। তাদের কাছ থেকে পথের নির্দেশও পেয়ে গেলাম। এই পথ ধরেই আমাকে সোজা চলতে হবে। বিকেলের দিকে আমার ডানদিকে পড়বে একটা বিরাট সরোবর, তার নাম যমদ্রোক সরোবর।

সেই সরোবরের ধার ধরে রাস্তাটা এগিয়ে গেছে উত্তর দিকে সেখানে পাওয়া যাবে বিরাট একটা বৌদ্ধ বিহার, নাম সামদিং গুম্ফা। সেখানে তীর্থযাত্রীরা সবাই আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

তাদের কথা শুনে আমি আর দেরী করলাম না। তাদের সাথে আমি সেখানকার বড় মন্দিরে শাক্যমুনিকে প্রণাম করে মন্দিরের চারদিকে প্রার্থনা-চক্র ঘুরিয়ে প্রদক্ষিণ সেরে বিদায় জানালাম। এই রালুং গুম্ফায় বোধ হয় পঁচিশ তিরিশ জনের মতো লামা থাকেন তাদের সকলের সাথেই দেখা হল। কিন্তু মৌনী থাকার জন্য কোনো রকম কথাবার্তাই হয়নি। সেখানকার প্রত্যেকটি লামা আমাকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, সকলেই আমার মঙ্গল কামনা করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন।

রাস্তাটা আস্তে আস্তে এবার উপরের দিকে উঠতে লাগল। তুষারধবল নোজিন্ কাং সাং পর্বতশৃঙ্গের উপরেই মনে হয় এই রাস্তাটা গিয়ে শেষ হয়েছে। ছায়াতে খুব ঠাণ্ডা আর রোদ্দুরে গরম, মাথার উপর এখন নীল আকাশ, একটুকরো মেঘও নেই। আর তারই কোলে সাদা পাহাড়ের চূড়াটি যেন বীর দর্পে দিগ্বিজয়ীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। সকাল থেকে কোনোরকম বাতাস ছিল না এখন যতই উপরে উঠতে লাগলাম ততই বাতাসের প্রকোপ বাড়তে লাগলো। গুম্ফা ছাড়ার পর রাস্তাটা ছিল একদম ফাঁকা এখন পেছন থেকে দুটো গাধা এসে আমার সঙ্গ নিল। গাধার আরও অনেক পেছনে মনে হল আরও কয়েকটি গাধা ও ভেড়া রয়েছে। রাখাল্ বা এই পালের মালিক বোধহয় তাদের সাথেই আসছে। রাস্তাটা কঠিন নিঃসন্দেহ কিন্তু এখানে চলায় আছে আনন্দ। এই দেবভূমিতে যদি ঠাণ্ডার প্রকোপ না থাকতো তাহলে এখানেই আমি চিরদিনের জন্য থেকে যেতাম। যতই উপরে উঠতে লাগলাম ততই আমার শ্বাস-প্রশ্বাস ভারী হতে লাগল। তারপর এমন সময় এল যখন দু'পা এগিয়েই থামতে হচ্ছে বিশ্রামের জন্য। আরও উপরে হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে বাতাসটা বন্ধ হয়ে গেল। মনে হয় উচ্চতার জন্য বাতাসের অভাব অথবা অন্য কোন কারণও হবে। গাধা দুটোকে পেছনে ফেলে আমি শেষে কারো-পাস এর সর্বোচ্চে এসে উপস্থিত হলাম এখান থেকে মনে হয় হিমালয়ের ছাদে উঠে পড়েছি। আমার সামনের দৃশ্য ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমারও চারদিকে এখন শুধু বরফ আর বরফ। আকাশ থেকে কে যেন সাদা তুলো ফেলে বিছিয়ে দিয়েছে তুলোর বিছানা। এ দৃশ্য মনের উপর প্রভাব আনলো শান্তি আর পবিত্রতার। একে সৌন্দর্য বললে ভুল বলা হবে। শুদ্ধ পবিত্র কথাটা এখানেই যেন রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার হৃদয় এক অব্যক্ত আনন্দে ভরে উঠল। সেই আনন্দের বিশ্লেষণ করতে আমি পারবো না। সেটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আসল রূপটাই ফেলবো হারিয়ে তাই নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সেই মহানন্দ সমুদ্রের আনন্দ-রস পান করতে লাগলাম। এই দৃশ্যটাই আনলো উপলব্ধি। এই জগতের এক অনন্ত আনন্দধারার ছন্দ এসে যেন আমাকে স্পর্শ করেছে।সেই যাদুর ছোঁয়ায় আমাকে খুব হালকা বলে বোধ হতে লাগল। এটাই হয়তো স্থান মাহাত্ম্য। যে মাহাত্ম্যের নেশায় যুগ যুগান্ত ধরে ছুটে আসছে তীর্থযাত্রীর দল। সবাই আসছে এই অমৃতের সন্ধানে।

যম, নিময়, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি আমাদের কোথায় নিয়ে যায় আমার জানা নেই, আমার চারদিকের এই ছন্দোময় জগতের আমি সাক্ষী, বিনা সাধনায় আমার এই যে পাওয়া এই পাওয়াটকে রাখবো কোথায় ? সেই করুণাময়ী জগদ্ধাত্রী অনন্তরূপের অধিকারিণী দেবীর প্রতি আমার হৃদয়ের সম্পূর্ণ সত্তা দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য লুটিয়ে পড়লাম তাঁর চরণে। সাষ্টাঙ্গ প্রণামে নিবেদন করলাম আমার ভক্তি-অর্ঘ্য। আমি ধন্য, আমার জন্ম সার্থক। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার পাশে এসে দাঁড়াল, আমারই পথের পথিক সেই গর্দভ দুটো। তারাও মনে হয় নীরবে তাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে লাগলো তাদের ইষ্টদেবতার কাছে। তার কিছুক্ষণ পরই দু'জন তিব্বতী লোক একপাল ভেড়া তাড়াতে তাড়াতে সেখানে এসে হাজির হল। আমাকে দেখেই তারা সসম্ভ্রমে জিভ বার করে প্রণাম করে দাঁড়াল। তারা কি যেন জিজ্ঞাসা করল কিন্তু মৌনীবাবার পক্ষে তার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কারো-লা'র সেই উচ্চাংশের পাশেই নজরে পড়ল বিরাট পাথরের স্তূপ, সেই স্তূপের মাঝখানে দাঁড় করানো একটা বিরাট প্রার্থনা-পতাকা দণ্ড। আমি তিব্বতীদের দেখাদেখি পাশের থেকে একটা পাথর তুলে এনে সেই স্তূপীকৃত পাথরের মধ্যে ফেললাম। তিব্বতের যে কোন-'পাস' (Pass) পার হবার সময় এই ধরনের স্তূপীকৃত পাথর চোখে পড়বেই। 'লা' বা ইংরেজিতে যাকে বলে Pass স্বভাবতই সে অঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু যাতায়াতের পথ। স্তূপাকৃতি পাথরের স্থানটা 'চৈত্য'-এর প্রতীক। নির্বিঘ্নে সে অঞ্চলটা পার হবার জন্য ভগবানের কৃপাপ্রার্থী ভক্তদের সামান্য অর্ঘ্যস্বরূপ, ধন্যবাদ জ্ঞাপক। এত উপরে উঠেও মানুষ যাতে সেই পরমেশ্বরকে ভুলে না যায় পাথর সাজিয়ে স্তূপ গঠনের এই চেষ্টা সেই অর্থই বহন করছে। তিব্বতে এই ধরনের বহু ব্যাখ্যা প্রচলিত। সাধারণতঃ তিব্বতীরা অবশ্য এইসব ব্যাখ্যার ধার ধারে না। তাদের কাছে এটা একটা কর্তব্য, এই কর্তব্য কেন পালন করা হবে সে কথা মনে হয় তারা কোনোদিনই ভাবেনি।

আমি ঘন্টাখানেক সেখানে থেকে তারপর আবার পথ ধরলাম। এই পথটা সরাসরি নীচে নেমে গেছে। কারো-লা'র থেকে কয়েক পা এগুতেই পেলাম রাস্তার উপর জমাট বরফ। এই ঢালু অংশে সূর্যের তাপ অপেক্ষাকৃত কম। কাজেই বরফগুলো গলার সময় পায়নি। সাদা মিছরির মতো জমাট বরফের উপর দিয়া আমি হাঁটতে লাগলাম। কত কষ্ট করে উপরে উঠেছিলাম অথচ নামার সময় মনে হল কোন রকম পরিশ্রমই নেই। আমাদের জগৎটা মনে হয় এই নিয়মেই বাঁধা। কত কষ্ট করেই না সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, কত কষ্ট করে এগুতে হয় সাধনার পথে, অথচ যারা জীবন-সত্যের বাইরে তাদের পথ নীচের দিকে। নীচে নামাটাই সব সময়ে সুবিধাজনক। কাদার মতো বরফে বার বার পা বসে যেতে লাগলো। নীচে নামতে নামতে বার বার দেখতে লাগলাম সেই পর্বতচূড়ার শান্ত উজ্জ্বল রূপ। নীচের থেকে আর এ দৃশ্য দেখা যাবে না। কাজেই হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে নিতে হবে নামার আগেই। আমি একটি সাধারণ ভণ্ড মৌনীবাবা, সাধনালব্ধ আনন্দ আমার সাধ্যের বাইরে। সাধু সেজে যা পাচ্ছি তাতেই আমার প্রচুর লাভ, সত্যিকারের সাধুরা এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আনন্দ-সাগরে

ভাসেন। অবশ্য তাঁদের সাধনায় তাঁরা হয়তো এই ক্ষণস্থায়ী আনন্দকে চিরানন্দে পরিণত করেন। সে যাই হোক সেটা আমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে সম্পূর্ণ এক অন্য জগৎ।

কারো-লা'র থেকে নীচে এসে পেলাম ছোট্ট একটা গ্রাম, পাথরের বড় বড় বাড়ী তার অধিকাংশই খামার বাড়ী। ভেড়া, শুয়ার, মুরগী, গাধা, ইয়াক ও পাহাড়ী ঘোড়াদের এক বিরাট আড্ডাখানা বলতে হবে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে এটা একটা পশুমেলা। রাস্তার উপরেই তাদের জমা করে রাখা হয়েছে। ওদের পাশ কাটিয়ে অতি সন্তর্পণে আমি এগিয়ে চলতে লাগলাম। গ্রামের ঠিক কেন্দ্রেই পেলাম ছোট একটি চায়ের দোকান। দোকানটির সামনে আগুন জ্বালিয়ে তিব্বতীরা গল্প করছে। তাদের সাথে নমস্কার বিনিময় করে আমি ইসারায় জানতে চাইলাম যে সেদিকে কোনো সরাইখানা আছে কিনা। ইসারায় হলেও মনে হয় আমার কথা তারা বুঝতে পারলো। দোকানদার একটি অল্প বয়েসি ছেলে, সে আমাকে তার দোকানের এক কোণে নিয়ে গিয়ে একটা কৌটো থেকে কিছু যব আর গোটা বার্লি দেখালো, তার সাথে সামান্য শুকনো ভেড়ার মাংস মিশিয়ে সে একটা ঝোল তৈরী করে দিতে পারে। কিন্তু তার জন্য দাম দিতে হবে । আমি অবশ্য দাম দিতে রাজি, আমি পকেট থেকে দু'টাকার নোটটা তাকে দেখিয়ে আশ্বাস দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম যে পয়সার জন্য সে যেন চিন্তা না করে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই খাবার তৈরী হল। গরম গরম খেয়ে আমি তাকে দুটো টাকা দিতেই আনন্দে তার চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল। দুঃখের বিষয় তার কাছে ভাঙানি নেই, খাবারের দাম মাত্র চার আনা। তার কাছে তিব্বতী ও চীনা মুদ্রা আছে কিন্তু ভারতীয় মুদ্রা গ্রহণ করলে ফেরৎ দিতে হবে ভারতীয় মুদ্রায়। অনেকক্ষণ ধরে ইসারায় তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে আমার সেই দেশীয় মুদ্রা নিলে আপত্তি নেই। তার কাছ থেকে পকেট ভর্তি ফেরত পয়সা নিয়ে আমি রওনা হলাম, যাবার আগে তাদের কাছ থেকেই জেনে নিলাম গ্রামটির নাম। ছোট্ট নাম জারা।

জারা গ্রাম ছাড়ার পর আমার ডানদিকের তুষার ধবল গিরিশিখরটিও আস্তে আস্তে আর একটা ছোট পাহাড়ের ওপারে উধাও হল, রাস্তাটা ক্রমাগতই নীচের দিকে নামছে, ঘন্টাখানেক চলার পরই রাস্তাটা এসে মিশেছে বিরাট একটা সমতল-ভূমিতে। সেখানেই পেলাম একটা বিরাট সরোবর। এটাই যমোদ্রক সরোবর।

সরোবরটা বিরাট—চিল্কা হ্রদ যাঁরা দেখেছেন তাঁদের পক্ষে কল্পনা করতে সুবিধা হবে। সরোবরের জলে নীলাকাশেরই পরিষ্কার রূপ। আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল এখানকার হাজার হাজার পতাকা। কাঠ থাম বাড়ীর উঁচু অংশে গাছের ডালে চারদিকেই বিভিন্ন রঙের ধর্ম ধ্বজা আর প্রার্থনা লেখা কাপড়ে ভরা। মনে হয় যেন আসন্ন কোনো উৎসব উপলক্ষে সাজানো হয়েছে। গ্রামটার সব বাড়ীগুলোই পাথরের, স্থানীয় পাথর সাজিয়ে সিমেন্ট দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, আর ওপরে টিন বা ঢালাই ছাদ। প্রত্যেকটা দরজা জানালার চারদিকে সুন্দর কাঠের কাজ করা। আশপাশের পাহাড়ের বরফ গলে এই বিরাট হ্রদে এসে পড়ছে, তারপর একটা ছোট খরস্রোতের আকারে সেই জল গিয়ে মিশেছে ব্রহ্মপুত্র নদীতে। এই ধরনের অনেক লেক ও পাহাড়ের জল নিয়েই তিব্বতের

সাংপো নদী, আমাদের দেশে গিয়ে নাম নিয়েছে ব্রহ্মপুত্র। পাহাড় দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম হঠাৎ তার মধ্যে এই সাগরের মতো হ্রদটা পৃথিবীর আর এক প্রান্তে যেন আমাকে নিয়ে এল। শান্ত স্বচ্ছ গভীর ও গম্ভীর হ্রদের ওপার এখান থেকে দেখা যায় না। হ্রদের চারিদিকে হিমালয়ের শৃঙ্গগুলো যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনন্তরূপ অচল নির্বিকার শিবের উপর যেমন দাঁড়িয়ে আছে জগৎ প্রতীক মহামায়া ছন্দোরূপা মা কালী।

রাস্তাটা ধরে একটু এগিয়ে গেলাম, রাস্তাটা ঢুকে গেছে গ্রামের ভেতর। গ্রামে ঢুকতেই পেলাম একটি চৈত্য সেখানে রয়েছে চেন্-রে-জির মূর্তি। প্রণাম সেরে মন্দির প্রদক্ষিণ করতে লাগলাম। এই গ্রামে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম। আশপাশের অধিকাংশ বাড়ী ঘরের দরজা ও জানালা বন্ধ, মন্দির প্রদক্ষিণ করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উঠলাম। চৈত্য থেকে দু-পা এগিয়ে যেতেই তিন চারটে ছোট ছেলে আমাকে ঘিরে ধরল, তাদের বক্তব্য ঠিক বুঝতে পারলাম না, দেখেই বোঝা যায় যে এরা ভিখিরি নয়, ছোট ছেলেমেয়েদের দেখাদেখি আরও কয়েকজন যুবক আমার দিকে এগিয়ে এল। এদের কথাবার্তা খুব টানা টানা বোঝবার চেষ্টা করেও কিছু বুঝতে পারছি না। তাদের মধ্যে একজন আমাকে অনুসরণ করতে বললেন, আমি তার কথামত শিশুদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে এগিয়ে চললাম। আমাকে সামনে নিয়ে ওরা যতই এগুতে লাগল ততই আশপাশ থেকে ছেলেমেয়েরা তাদের দলে যোগ দিতে লাগল। শিশুদের মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে আমাকে ঘিরেই ওদের আনন্দ। পাড়ার ঠাকুর বিসর্জন দেবার মতো আমাকে সামনে রেখে মিছিল করে এগুতে লাগল। আমি নির্বোধের মতো ওদের কথানুযায়ী চলতে লাগলাম। গ্রামের একটু উঁচু অংশে একটা দুর্গ, এর গঠন অনেকটা গীয়াৎসের দুর্গের মতো। বাঁ দিকে কয়েকটা বাড়ীর পরই নজরে পড়ল রাস্তার ধারে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিরিশ চল্লিশজন লামা, আশপাশে কোন মঠ বা বিহার নজরে পড়ছে না। একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন মনে এসে ধাক্কা দিল—তাঁরা কি আমারই জন্য দাঁড়িয়ে আছেন? কে তাঁদের খবর দিল। হয়তো গামবাসীরা এই ভাবেই নতুন লামাদের সম্বর্ধনা করেন। আরও কাছে আসতেই দেখতে পেলাম লামারা সবাই হাত নেড়ে আমাকে সেদিকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করছেন। যতই কাছে এগুচ্ছি মনে হল, ওদের দেখেই আমার বুকের রক্ত যেন ধাক্কা মেরে উঠল, আমি মৌনীবাবাকে ভুলে গিয়ে চীৎকার করে উঠলাম—সাধুবাবা।

উত্তেজনায় কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম, তিনি আমাকে সস্নেহে পীঠে ও মাথায় হাত বুলিয়ে আমার শান্ত ভাব ফিরিয়ে আনলেন, মৌনীবাবা ফিরে পেল তার ভাব। আমি সাধুবাবাকে প্রথমে তারপর একে-একে সব সাধুকে প্রণাম করে তাঁদের দলে যোগ দিলাম। গ্রামের যে সব ছেলেমেয়েরা আমাকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে তারা আমাদের এই মিলন দেখে তৃপ্তি ও আনন্দ পেল। তাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি লামাদের সাথে ভেতরে ঢুকলাম।

ভেবেছিলাম যে আমি সাম্‌দিং-এ এসে পৌছেছি, আজ রাতে পৌছবার কথা ছিল

'সন্ধ্যে হতে এখনও অনেক দেরী, এত তাড়াতাড়ি কি করে এসে পড়লাম কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। ঘরে আগুনের পাশে বসতেই সাধুবাবা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন এই গ্রামটা সামদিং নয়, এই গ্রামটার নাম নাগারৎসে (Nagartse)। সামদিং এখান থেকে আরও উত্তরে। সামদিং গুম্ফাতেই সকলের যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু গুম্ফার অবস্থা আজকাল মোটেই সুবিধাজনক নয়, তারা আর্থিক অনটনে কাটাচ্ছে। কাজেই তারা একটা পুরানো বাড়ী কয়েকদিনের জন্য ভাড়া করে আছেন, বাড়ীর মালিক থাকেন লাসায়। মালিকের ভাইয়ের কাছে চাবি ছিল, তিনি পুণ্যার্জনের জন্য লামা তীর্থযাত্রীদের এই বাড়ীটা কয়েকদিনের জন্য ব্যবহার করতে দিয়েছেন।

গুরুজী সামদিং পৌঁছে যখনই দেখলেন যে সেখানে বত্রিশজন লামাদের থাকার বন্দোবস্ত করা যাবে না তখনই তিনি ফিরে এসেছেন এই গ্রামে। গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিদের মধ্যে অনেককে তিনি অনেকদিন যাবৎ জানতেন কাজেই কোন অসুবিধা হয়নি। লাসায় যেতে হলে এই গ্রামের মধ্য দিয়েই যেতে হবে। তিনি বাড়ী ঠিক করেই সবাইকে সজাগ করে দিয়েছিলেন, এই পথে বিদেশী লামারা এক-এক করে আসবে তাদের দেখা মাত্রই যেন সাধুবাবাকে জানানো হয়। গ্রামের একঘেয়েমী জীবনের মধ্যে এই সাধু খোঁজা কাজটা কয়েকদিনের জন্য গ্রামবাসীদের কাছে একটা খেলা হয়ে দাঁড়াল। প্রথম প্রথম বড়রাই উদ্‌যোগী হয়েছিল কিন্তু তাদের দেখাদেখি শিশুরাও এ খেলায় মেতে উঠেছে। গ্রামের মধ্য দিয়ে নতুন লামা যেতে দেখলেই তারা সাধুবাবাকে খবর দিয়ে দেয়। গীয়াৎসের থেকে লামারা এই পথে আমার মতোই সামদিং যাওয়ার পথে এখানে একে-একে ধরা পড়েছে। আমিই ছিলাম এদের মধ্যে শেষ যাত্রী।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সন্ধ্যের কাছাকাছি সাধুবাবার সাথে আমি বেরিয়ে পড়লাম সরোবরের দিকে। সরোবর তো নয় সাগর, এপার থেকে ওপার দেখা যায় না। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে আমি যেন পুরীর সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছি। সাধুবাবার সাথে জপ, সন্ধ্যা, আহ্নিক সেরে আবার ফিরে এলাম গ্রামে। সাধুবাবা আমাকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন—খুব সাবধান! তুই কিন্তু মৌনীবাবা, কথাবার্তা একদম বলবি না। গ্রামের সবাই তোকে মৌনীবাবা বলেই জানে। মনে হচ্ছে অনেক যুগ পর আমি আপনজনকে আবার ফিরে পেয়েছি, তাতেই আমার আনন্দ। সাধুবাবার সামনে আমি বছরের পর বছর ধরে মৌনী থাকলেও মনে হয় আমার একঘেয়ে লাগবে না।

বাড়ীটা একতলা, বড় বড় পাথরের তৈরী পুরু দেয়াল, চারদিকে পাথরের পাঁচিল। দেখে বোঝা যায় বনেদি বাড়ী, রান্নাঘরটাও বিরাট। বাড়ীর ছাদটা প্যাগোডা ধরনের তার উপর কাঠের বরডার দেওয়া কাজ, পাহাড়ি জমিদারদের বাংলোগুলো যেমন হয়ে থাকে। বাড়ীটা পাওয়া গেছে বিনা পয়সায়। লামারা সবাই রান্নাঘরেই আশ্রয় নিয়েছেন। আমার জন্যই তারা সবাই অপেক্ষা করছিলেন—সেদিন রাতেই ঠিক হল পরের দিন সকাল বেলা রওনা দেবো সামদিং-এর উদ্দেশ্যে।

দোরজে পামো

নাগাৎসের সন্ধ্যেটা বড় চমৎকার, সূর্যাস্তের রঙিন আলো বরফের চূড়ায় পড়ে সম্পূর্ণ জগৎটাকেই যেন মায়াজগতে পরিণত করেছে। সূর্যাস্তের পরই সবাই যে যার ঘরে ঢুকে পড়ে। অত্যধিক শীতে বাইরে আগুন ধরিয়েও কেউ থাকে না। খাওয়া-দাওয়ার পর গুরুজী আমাদের সামদিং গুম্ফার সম্পর্কে চমৎকার একটি গল্প বললেন, গল্পটা এরকম।

সামদিং গুম্ফার দুটো ভাগ, প্রথম ভাগ মহিলাদের জন্য, দ্বিতীয় ভাগ পুরুষদের জন্য। সামদিং গুম্ফা মহিলা বিভাগের জন্য খুব বিখ্যাত। তিব্বতে মহিলাদের জন্য এতবড় মঠ আর নেই। এখানকার মহিলারা পুরুষ লামাদের মতোই লামা পর্যায়ভুক্ত। সামদিং তিব্বতী কথা তার ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় 'ধ্যান-পর্বত'। এই গুম্ফার চারদিকের শান্ত-সৌম্য পাহাড়গুলোর জন্যই মনে হয় এই নাম রাখা হয়েছে। অনেকদিনের পুরোনো গুম্ফা। মহিলা বিভাগের যিনি সর্বেসর্বা অর্থাৎ গুরুকে বলা হয় দোরজে পামো। আদি দোরজে পামোকে সবাই তিব্বতের মা বলে অভিহিত করতো। তিব্বতে বুদ্ধদেবের আত্মার অভাব নেই। শক্তিশালী লামা মাত্রেই জীবিত বুদ্ধ বলে তাকে সম্মান জানানো হয়। তাঁর বাণী আর ধর্মের জন্য তিনি লামারূপে তিব্বতের চারদিকে বিচরণ করছেন, তিনি সব সময়ই জন্ম নেন পুরুষ দেহে। একমাত্র এই সামদিং গুম্ফাতেই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন 'স্ত্রী' রূপে, দোরজে পামো নামে। প্রথম দোরজে পামো রূপে তিনি এখানে আসেন প্রায় পাঁচশ বছর আগে, ঐতিহাসিকদের মতে ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে। সেই প্রথম দোরজে পামোর ঐশ্বরিক শক্তি ছিল অসাধারণ। নারীদেহে তিনি ছিলেন জগজ্জননী। তাঁর অলৌকিক কাহিনী অনেক। তার মধ্যে যেটা সর্বত্র পরিচিত সেটাই বলছি।

সামদিং আগে থেকে পুরুষ ও মহিলাদের গুম্ফা ছিল, কিন্তু মহিলাদের স্থান ছিল অপেক্ষাকৃত নীচে। সেই সময় চীনা তার্তাররা তিব্বতের চারদিকে লুঠতরাজ করে বেড়াচ্ছিল। তাদের আক্রমণ ও অত্যাচারের ভয়ে অনেক গুণী লামা এখানে এসে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। তাদের ধারণা ছিল যে, হিমালয়ের কোলে লুকিয়ে থাকা গুম্ফাটা অন্ততঃ বর্বরদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে। তাদের সেই ধারণাটা ছিল ভুল। তার্তাররা ছিল নেকড়েদের থেকেও হিংস্র, আর শেয়ালের থেকেও ধূর্ত। লুঠতরাজ করাই ছিল তাদের ধর্ম। কাজেই সামদিং তাদের হাত থেকে রক্ষা পেল না। সামদিং গ্রামের শান্ত ও নির্বিঘ্ন গ্রামবাসীদের উপর হঠাৎ একদিন তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল।

গ্রামবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই তাদের বাধা দিতে গিয়ে প্রাণ হারালো, তাদের বর্বরতায় মা-বোনেরা ইজ্জত হারালো আর তাদের মধ্যে যারা সুযোগ পেল সামদিং গুম্ফায় গিয়ে আশ্রয় নিল। গুম্ফার মাঝখানে বিরাট উঠোন আর তার পাশে দুর্গের মতো করে ঘেরা পাথরের বাড়ীর দেয়াল।তার্তার সর্দার যখন জানতে পারলো যে সবাই গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে সামদিঙের মঠে, সঙ্গে সঙ্গে তারা আক্রমণ করল সেই মঠ। গুম্ফা বা মঠের দেয়ালে আজও সেই চিহ্ন বর্তমান। গুম্ফার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও তারা বাইরে থেকে খুলতে পারল না। শেষে বিরাট একটা পাথরের হাতুড়ি মেরে তারা দরজাটাকে ভাঙতে শুরু করল। তাদের সেই শব্দ শুনে গুম্ফার সব মহিলা প্রধান লামার পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, আর্তস্বরে তারা আশ্রয় চাইল—মা আমাদের বাঁচাও। তিনি তাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন—ভয় নেই।

তার্তারদের চীৎকার তখন চরমে উঠেছে, তারা জানে যে এই গুম্ফার মধ্যে লুকিয়ে আছে গ্রামের সুন্দরী যুবতীরা তারা প্রায় হাতের মুঠোয়। তাদের চীৎকার জঘন্য পশুদেরও হার মানায়। শেষে তারা দরজা ভেঙ্গে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল গুম্ফার ভেতরে। ভেতরে ঢুকেই তাদের চক্ষু স্থির হয়ে গেলো। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তারা একটি মানুষও ভেতরে দেখতে পেল না। গুম্ফার উঠোনে পরমানন্দে একপাল শূকর ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর তাদেরই মাঝখানে রয়েছে একটি সাদা শূকরী। তার্তাররা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হল, তারা ভাবল এ গ্রামে আর কেউ নেই, কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলো। সেই সাদা শূকরীই হচ্ছেন বজ্রধারিণী দোরজে ফাগ্‌মো বা চলতি কথায় দোরজে পামো, আর বাকী শূকরগুলো ছিল গুম্ফার লামা ও গ্রামবাসীসকল। তিনি মন্ত্রবলে সকলকে শূকরে পরিণত করে তাদের রক্ষা করলেন অত্যাচারী তার্তারদের হাত থেকে। তারপর থেকে এই গুম্ফার প্রবীণা লামাকে বলা হয় দোরজে ফাগ্‌মো।

পরের দিন সকাল বেলা আমরা রওনা হলাম। গ্রামবাসীদের আশীর্বাদ করে আমরা সামদিং-এর রাস্তা ধরলাম। সকালবেলার রাস্তাটা বেশ ভালো লাগল, চলতে চলতে মা তারার পূজার মন্ত্রগুলো মুখস্ত করতে লাগলাম। গুরুজীর মতে মা তারার ধ্যানটা পুরোপুরি আয়ত্তে আনলে ভবিষ্যতে আমার কোন রকম জাগতিক কষ্ট থাকবে না।

যমদ্রোক সরোবরের ধার ধরে প্রায় দু'ঘণ্টা হাঁটার পর আমরা এসে পৌঁছলাম সরোবরের সর্বোত্তর অংশে যেখানে সরোবরটা অনেকটা কোণাকুণি এসে উত্তরমুখী হয়ে শেষ হয়েছে। তারই ধারে দেখতে পেলাম কয়েকটি মন্দির। আমাদের সামনেই সামদিং গুম্ফা। প্রথমেই চোখে পড়ল গুম্ফার উঁচু উঁচু পতাকাগুলো তারপর যতই এগুতে লাগলাম ততই বাড়ীগুলো পরিষ্কার দেখতে পেলাম। এই অঞ্চলের সব বাড়ীগুলোই একই রকম অর্থাৎ স্থানীয় পাথরের উঁচু উঁচু দেয়ালে তৈরী। গ্রামের মুখেই পেলাম একটা চৈত্য। সেখানে আমরা দাঁড়িয়ে প্রণাম জানিয়ে এগিয়ে গেলাম মূল মন্দিরের দিকে। গ্রামে ঢুকতেই আমাদের নাকে ঢুকল তীব্র মাছের গন্ধ। ঠিক মাছের

বাজারের মতো, আশপাশে তাকিয়ে কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। মূল মন্দিরটি গুম্ফার ভেতরেই। প্যাগোডা ধরনের একটা দরজা দিয়ে আমরা গুম্ফার পাঁচিল পার হয়ে ভেতরে ঢুকলাম। ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ল তিন চারটে যুবতী (লামা) আমাদের দেখে দৌড়ে এদিক ওদিক ছুটে পালাল। আমাদের সামনে এসে একজন পুরুষ লামা জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা কি তীর্থযাত্রী, ভারত থেকে আসছেন ?

হ্যাঁ। প্রধান লামা আমাদের কথা জানেন তাঁকে খবর দাও। গুরুজী উত্তরে বললেন।

লামাটি আমাদের কথা শুনে হাক্-ডাক্ শুরু করে দিলেন। তার ডাক শুনে কয়েকটি মেয়ে ছুটে এল, তাদের পরনে খয়েরি লামার পোশাক, মুণ্ডিত মস্তক। আমাদের সামনে এসে তারা প্রণাম করে দাঁড়াল। পূর্বপরিচিত লামা তাদের কি যেন বুঝিয়ে বললেন, মেয়েরা আবার আমাদের প্রণাম করে চলে গেল। সেখান থেকে আমরা একটা মন্দিরের কাছে এসে দাঁড়ালাম। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারদিক ভালো করে দেখতে লাগলাম। সরোবরটা এখান থেকে দেখা যায় না। চারদিকে শান্ত আর পবিত্রভাব। গরমকালে মনে হয় চাষ-আবাদ কিছু করা হয়। কিন্তু এখনও বাগানের কোণায় বরফ পড়ে রয়েছে, সবে গলতে শুরু করেছে মাত্র। প্রধান মন্দির ছাড়াও রয়েছে ছোটখাটো কয়েকটি মন্দির, আর লামাদের ধর্মশালা। মাঝে মাঝে বাতাসে উড়ে আসতে লাগল মাছের তীব্র গন্ধ। আমাদের চারপাশে গ্রামের লোকজন ও লামারা জমা হতে শুরু করেছে। তারপর এক সময় একজন বয়স্কা মহিলা আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন তার দু'পাশে দু'জন দু'জন করে চারজন অপেক্ষাকৃত কম বয়সের মহিলা। সকলেরই পরনে পুরুষ লামাদের মতো পোশাক, আর এই দারুন শীতেও মুণ্ডিত মস্তক। তাঁরা আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। গুরুজী আমাদের সাথে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই মাতৃতুল্যা মহিয়সী মহিলাটিই হচ্ছেন এখানকার সর্বেসর্বা পরমারাধ্যা দোরজে পামো। আমরা একে-একে সবাই সাষ্টাঙ্গে তাঁকে প্রণাম করলাম। আমাদের প্রণামের পর সেই মঠের মেয়েরা এসে আমাদের একে-একে প্রণাম করে যেতে লাগল। লামাদের মধ্যে আমি সবচেয়ে ছোট লামা বলে সহজেই সকলের দৃষ্টি আমার উপর পড়তে লাগল। প্রণামের পালা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই মন্দিরের দরজার দু-পাশ থেকে বেজে উঠল মঙ্গল ভেরী। প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে অরা ভেরী বাজিয়ে আমাদের সম্বর্ধনা জানালো। এইভাবে আমরা আপ্যায়িত হলাম সামদিং গুম্ফায়। আমরা তাদের সম্মানিত অতিথি। তারপর আমাদের দু-পাশে মেয়েরা দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করে আমাদের বরণ করল।আমি গুণে দেখলাম তাদের সংখ্যা মাত্র ছাপান্ন জন। তাদের প্রার্থনার উত্তরে আমরাও প্রার্থনা করলাম। আমাদের ছোট্ট সভার সেখানেই ইতি হল। মেয়েরা যে যার কাজে চলে গেল । মা-দোরজে পামো তাঁর সহচরী দু'জন লামার উপর আমাদের আতিথেয়তার ভার দিয়ে চলে গেলেন তাঁর ঘরে, বলাই বাহুল্য, তিনি খুব ব্যস্ত। আমরা দুপুরে মেয়েদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করার জন্য আমন্ত্রিত হলাম। শুরু হল আমাদের সামদিং প্রদক্ষিণ।

গ্রামটা ছোট কাজেই দেখার কিছু নেই। সামদিং গুম্ফাই হচ্ছে এখানকার আকর্ষণ।

মূল মন্দিরটিতে রয়েছে বিরাট শতবাহু বুদ্ধের মূর্তি। অন্যান্য মূর্তিগুলোর মধ্যে বজ্রপাণি প্রথম দোরজে পামোর মূর্তিই মনে হয় এখানকার ইষ্ট দেবতা। মন্দিরের মধ্যে রয়েছে কয়েকশ তাংখা, আর ছোট ছোট সোনার বিভিন্ন বুদ্ধাবতারের মূর্তি। অন্যান্য মন্দিরের মতো এখানেও জ্বলছে ঘিয়ের প্রদীপ। গীয়াৎসের তুলনায় সামদিং গুম্ফা কিছুই নয়। অন্ততঃ আমার সাধারণ চোখে ডায়েরীতে লেখার মতো ভালো তথ্য কিছু পেলাম না। আমি অনেকটা হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। কারণ দোরজে পামো ও সামদিং গুম্ফার নাম শুনে ভেবেছিলাম যে এটাও একটা বিরাট কিছুতো হবেই।

সবশেষে মন্দিরের পেছনে একটা ঘরে এসে আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম নতুন কিছু পেলাম। গুরুজী বললেন—আমরা এখন যে ঘরটাতে যাচ্ছি সেই ঘরটাতে বেদীর উপরে দেখবে সারি সারি বাক্স। সেই বাক্সগুলোর মধ্যে প্রথম থেকে এ পর্যন্ত সব দোরজে পামোর দেহগুলোকে মমির আকারে রক্ষা করা হয়েছে, এখানকার যিনি দেরজে পামো এই সব মরদেহগুলো সব তাঁরই, তিনিই একদেহ ছেড়ে অন্য দেহ ধারণ করেন। নতুন দেহ ধারণ করে অর্থাৎ দোরজে পামোর পদে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি তাঁর পূর্বের দেহগুলো দেখবার জন্য এঘরে আসেন। এখানে তাঁকে সম্পূর্ণ একলা থাকতে হয় তিন দিন। এই তিন দিনে তিনি সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের উপর ধ্যান করেন, তারপর সেই ধ্যান ভাঙার পর থেকেই তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী হন।

আমরা সেই ঘরটাতে ঢুকলাম। ঘরটার মধ্যে মনে হয় মৃত্যুর মতোই ঠাণ্ডা বিরাজ করছে। একটা মাত্র প্রদীপের আলোকে ভালো করে কিছু দেখাও সম্ভব নয়। প্রদীপের সেই মৃদু রহস্যময় আলোকে আমাদের মমীর বাক্সগুলো দেখেই ক্ষান্ত হতে হল। সেই ঘরে কথা বলাও নিষেধ। তীর্থযাত্রীদের সাথে না এলে আমি নিশ্চয়ই সেই ঘরে অন্ততঃ একদিন থাকবার অনুমতি চাইতাম। তন্ত্রসাধনার কোন এক মূল রহস্য নিশ্চয়ই ওই ঘরটায় লুকিয়ে আছে।

এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে আমাদের প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেলো, তারপরে আমরা এলাম গ্রামে, গ্রামের পেছন দিকে সরোবরের ধারে আসতেই চোখে পড়ল বিরাট শুকনো মাছের কেন্দ্র। সরোবর থেকে মাছ ধরে, তার পেট কেটে পরিষ্কার করে হ্রদের ধারে বালির ওপর শুকোতে দেওয়া হয়েছে। চিল ও অন্যান্য পাখির হাত থেকে সেগুলোকে বাঁচাবার জন্য হাতে ঢিল নিয়ে ছেলেরা পাহারা দিচ্ছে। মাছের গন্ধটা এখান থেকেই আসছে। সরোবর থেকে মাছ ধরে শুকিয়ে তা চালান দেওয়া হয় লাসায়। যানবাহানের অসুবিধার জন্য টাটকা মাছ চালানের কোন ব্যবস্থাই নেই। সরোবরের ধারে কিছুক্ষণ ঘুরে আমরা আবার ফিরে এলাম গুম্ফায়। খাবারের ঘণ্টা বাজার সাথে সাথে আমাদের নিয়ে আসা হল পাকশালায়। আস্তে আস্তে সেখানে সবাই এসে জড়ো হতে লাগল। বারান্দায় বেশ রৌদ্র এসে পড়েছে। সেখানেই দুটো সারিতে আমরা উবু হয়ে বসলাম। মেয়েরা আমাদের মুখোমুখি বসল। রান্নার দায়িত্ব এক এক দিন এক এক দলের উপর পড়ে। যারা রাঁধে তারাই পরিবেশন করে। এখানে মেয়েরা দশ বারো বছর যাবৎ ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসিনী ব্রত নিয়ে থাকে তারপর চলে যায় বিভিন্ন গ্রামে সেবার

জন্য। দেখেই বোঝা যায় যে এখানকার পরিবেশটা শুকনো আর কঠোর তো বটেই। বিভিন্ন সব্জি, শুকনো মাছ, বার্লি ও চালের সংযোগে তৈরী হয়েছে এক অদ্ভূত ধরনের তিব্বতী খিচুরী, খেতে সত্যি খুব সুস্বাদু, রান্নার বাহবা দিতেই হবে। প্রার্থনা সেরেই যে যার খাওয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল, খাওয়ার সময় একটাও কথা বলা চলে না। আমি সামনের মেয়েদের দিকে লক্ষ্য করতে লাগলাম—সাধারণ তিব্বতী-মেয়েরা খুব হাসিখুশী থাকে, কিন্তু এদের এই কঠিন সাধনার পথ থেকে মনে হয় হাসিটা সম্পূর্ণরূপে বিদায় নিয়েছে। এটাই কি আনন্দের পথ!

খাওয়া দাওয়ার পর আমরা মা দোরজে ফাগ্মোকে প্রণাম জানিয়ে ও তাঁর হাতে ছোট একটা হাতীর দাঁতের বুদ্ধ মূর্তি উপহার দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। বেরোবার সময়ও দেখলাম মেয়েরা ও অন্যান্য কর্মীরা সবাই গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের বিদায় জানাবার জন্য। আমরা তাদের যতদূর পর্যন্ত দেখা যায় ততদূর পর্যন্ত হাত নাড়িয়ে বিদায় জানাতে লাগলাম।

চলতে চলতে গুরুজী যমদ্রোক সরোবরটার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে লাগলেন—গরমের সময় অনেক তিব্বতী এই সরোবর পরিক্রমা করে থাকে। তাদের মতে এই সরোবর পরিক্রমায় খুব পুণ্যার্জন হয়। কিন্তু প্রদক্ষিণ করতে লাগে মাসখানেক, প্রায় দু'হাজার মাইলের পথ। সমতল থেকে (সমুদ্র পৃষ্ঠ) এর উচ্চতা প্রায় ১৫০০০ (পনেরো হাজার) ফুট। গরমকালে এই সরোবরটায় অনেক রাজহাঁস দেখা যায়, আর রঙ বেরঙের অনেক মাছরাঙাও দেখা যায়, আমি অবশ্য সে সব চিনি না।

ভাষা

আমি ইতিমধ্যে কিছু কিছু তিব্বতী শব্দ আয়ত্ত করে ফেলেছি, ধীরে ধীরে বললে এদের কথা বুঝতেও পারি। সবচেয়ে ভালো লাগে এদের প্রার্থনা, এদের ছন্দটা ঠিক যেন পাহাড়ের মতো উঁচু নিচু। কণ্ঠের সুর বলতে খুব বেশী নেই, গদ্যটাকে ছন্দের আকারে এরা পরিবেশন করে। মনের ভাব আর আন্তরিকতা দিয়ে গদ্যটাই পদ্যের মতো প্রকাশিত হয়। আমার শোনা বারণ নেই কাজেই সব সময়ই তাদের কথা শুনছি—মৌনীবাবার বলতে বারণ, তাই ইচ্ছে থাকলেও অভ্যাসের সুযোগ নেই।

প্রত্যেকটা শব্দকে এরা কেটে দু'ভাগ করে উচ্চারণ করে, যেমন রাজহাঁসকে বলা হয় ঙ্গাংপো। কথাটাকে একসাথে উচ্চারণ না করে এরা বলে ঙ্গাং-পো। হরিণকে বলে খাস্‌সা, উচ্চারণ করে খা-সা, প্রার্থনা পতাকা—ধার-চাক বা ধার-চক, শূকর (Pig)—পাক্-কো, ফুল—মে-তোক, পুল—ঝাম্-পা, ভেড়া—লুক্-ছা, জমি—সা-চা, লংকা—আ-কার ইত্যাদি।

এক অক্ষরেরও অনেক শব্দ আছে যেমন—ন্যা—মাছ, ভা—গরু, হাম্—শেয়াল, ইত্যাদি

পুরো একটা কথা বলতে ওদের অনেকবার থামতে হয়, যেমন—'থা-চু দি-থুং থুং বে', অর্থাৎ এই প্রার্থনা পতাকাটা ছোট।

খণ্ডত (ৎ) এবং অনুস্বার (ং) এরা খুব ব্যবহার করে। ৎ প্রায়ই শব্দের আগে ব্যবহার করতে শোনা যায়, অর্থাৎ শব্দটা উচ্চারণ করার আগেই ত্ থেকে আরম্ভ করে। যেমন ৎ-সাং—পাখীর বাসা, ৎ-জাম—বাসনপত্র, ৎ-সান-দেং—পাইন গাছ।

প্রচণ্ড শীতের জন্য মনে হয় ভাষাটা এই ভাবে সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ শীতে কাঁপতে কাঁপতে সহজেই এই ভাষায় কথা বলা যায়। এই পর্যন্ত রাস্তায় খুব অল্প লোকই পেয়েছি যারা একশ দু'শ ও হাজার সংখ্যা পর্যন্ত গুনতে পারে। বাজারের সাধারণ খুদে দোকানদাররা অধিকাংশ সময়ই এক থেকে দশ বা কুড়ি পর্যন্ত গুনতে পারে। আর যোগ বিয়োগ করার জন্য অনেক সময় দেখেছি তারা ছোট পাথরের সাহায্য নেয়। অনেকে জপের মালাও অঙ্ক করার জন্য ব্যবহার করে। সংখ্যাগুলো তিব্বতী ভাষায় শুনতে খুব ভাল লাগে। ছোটরা মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে যখন পড়ে মনে হয় এরা কবিতা পাঠ করছে। যেমন—চিগ্-নী-সুম-ঝি-ঙ্ গা-ড্রুগ্-ডুন-গী-গু-চু অর্থাৎ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০। তারপর চু-চিগ্, ঙ্ গী-সু, ঙ্গের-চীগ্, সু-চু, সা-চিগ্, ইত্যাদি। ঘড়ির ব্যবহার তিব্বতে খুব কম। বড়লোকদের ঘড়ি আছে বটে কিন্তু সেটা সম্পত্তি বা

সৌখিনতার প্রতীক। গুম্ফাতেও ঘড়ির ব্যবহার এ পর্যন্ত দেখিনি। সময়টা নির্ধারণ করা হয় ভোরের মুরগীর ডাক ও সূর্যের উপর ভরসা করে। আমার ডায়েরীতে সেই সময়গুলোও মোটামুটি লিখে রেখেছি—

চাক্-তাং পো—	ভোর রাতের প্রথম মুরগীর ডাক
চাক্-নীই-পা—	ভোর রাতের দ্বিতীয়বার মুরগীর ডাক
থোং-রাং—	প্রথম ভোরের আলো
ৎ-সে-শার	সূর্যোদয়
ঙ্-গা-ত্রো—	সকাল (সকাল আটটা বা সাড়ে আটটার (মতো)
ৎ-শা-তিং—	সূর্য উপরে (সাড়ে দশটা এগারোটার (মতো)
নীইং-কুং—	দ্বিপ্রহর
গং-তা—	বিকেল
নীই-গে—	সূর্যাস্ত
সা-রিপ্—	রাত্রি
নাম্-চে—	মধ্যরাত্রি

যে কোন গুম্ফায় থাকতে হলে উপরি-উক্ত সময়গুলো জানা দরকার কারণ এরই উপর নির্ভর করে তৈরী করা হয়েছে গুম্ফার কর্মসূচী। বারের হিসাবটা আমাদের দেশের মতোই, সাত দিনে এক সপ্তাহ। সোমবার—জা নীংমা, মঙ্গলবার—জা দাবা, বুধবার—জা-মিংমা, বৃহস্পতিবার—জা লাক্ পা, শুক্রবার—জা ফুরপু, শনিবার—জা-পাসাং, রবিবার—জা পেম্ পা।

আমি তিব্বতী ভাষা অ আ, ক খ থেকে শিখিনি, এদের লেখা পড়তে হলে এই ভাষাটাকে ভালভাবে শুরু থেকে আয়ত্তে আনা দরকার। আমার শেখা মানে চলার পথে কানে যা আসছে আর তা থেকে যা বুঝছি সেটাই বার বার মনে আবৃত্তি করে ধরে রাখার চেষ্টা করছি। যারা লেপ্চা ভাষা জানেন তাদের পক্ষে এ ভাষাটাকে বুঝতে খুব সুবিধা। আমি শিখছি বাধ্য হয়ে। গীয়াৎসে থেকে যে রকম ভাবে আসতে হল একলা, বলা যায় না—ভবিষ্যতে আবার যদি ছাড়াছাড়ি হয়ে যাই তাহলে চালিয়ে নেবার মতো কিছু কথার অবশ্য দরকার। কাজেই এখন থেকে আমি আরও সজাগ হয়ে রইলাম, নতুন শব্দ পাওয়া মাত্র চেষ্টা করছি তাকে ধরে রাখতে। সবচেয়ে ভাল লাগে এদের প্রার্থনা ও মন্ত্র পাঠ। যারা ভূটানে গেছেন এবং সেখানকার গুম্ফার সাথে পরিচিত তারা নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবেন।

প্রথম সাংপো দর্শন

ত্রামালুক থেকে আমরা ক্রমাগত উপরের দিকে উঠে পেলাম সেই অঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু পর্বত কন্দর, লাসার পথে এটাই ছিল শেষ বাধা। সতেরো হাজার ফিট উঁচুতে খাম্‌বা-লা বা খাম্‌বা পাস। এর আগে আরও তিনটে লা বা পর্বত কন্দর পেরিয়েছি, প্রথমটি ছিল সীমান্তের নাথু-লা, দ্বিতীয়টি ফারির তাং-লা, তৃতীয়টি কারো-লা। কিন্তু এই খাম্‌বা-লা নিঃসন্দেহে অন্য তিনটি থেকে সম্পূর্ণ অন্য রকমের। খাম্‌বা-লা'র নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখান থেকে দু-দিকের দুটো দৃশ্য, সম্পূর্ণ আলাদা। একদিকে চোমলহারি ও অন্যান্য হিমালয়ের তুষার ধবল শৃঙ্গ আর অন্যদিকে সাং-পোর উপত্যকা। যমদ্রোক সরোবরটাকে দেখা যাচ্ছে বড় অদ্ভুত রকমের, মনে হচ্ছে একটা বিরাট পাহাড়ের খাদে ঘুমিয়ে আছে একটা বৃশ্চিক। একটু কল্পনার আশ্রয় নিলেই এই হ্রদটাকে বৃশ্চিকের মত চোখে ধরা পড়ে। এত উঁচু থেকে জলটাকে আর জল বলে মনে হয় না, মনে হয় একটা বিরাট বৃশ্চিক দৈত্য ঘুমিয়ে আছে। তাইতো অনেক ভারতীয় তীর্থযাত্রীরা এই হ্রদটাকে বৃশ্চিক হ্রদ বলে বর্ণনা করেন। এখান থেকেই আমরা প্রথম দর্শন পেলাম ব্রহ্মপুত্রের আদি রূপের। শান্ত হিমেল বিরাট একটা অজগরের দেহ যেন পড়ে রয়েছে সামনের এই উপত্যকায়। মনে হচ্ছে যেন ছোট একটা পাহাড়ি নদী যার কোনো গতি নেই। শুধু সে তার সত্তা নিয়ে অবস্থান করছে মাত্র। সাংপোর এই শান্তরূপ দেখলে মনেই হয় না যে এই নদীটাই প্রতি বছর প্রলয়ঙ্করী হয়ে ধ্বংস করে শত শত গ্রাম আর প্রাণ। ভারতে ব্রহ্মপুত্র নাম ধারণ করার আগে এই তিব্বতের উপত্যকায় পশ্চিম থেকে পূর্বে তার পথ প্রায় পনেরো শ' মাইল। সাংপো এখান থেকে দু'হাজার ফুট নীচে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই নদীটি সব সময়ই প্রায় বারো হাজার ফুট উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। খাম্‌বালা'র পরই পাহাড়টা সরাসরি নীচে গিয়ে মিশেছে সাংপো নদীর উপত্যকায়। এটাই হিমালয়ের শেষ অংশ। মহান হিমালয় পার হয়ে আমরা তার অন্যদিকে এসে পৌঁছেছি। সাংপোর থেকেও উত্তরে ধূ-ধূ করছে চাং-তাং পর্বত। সেই পাহাড়টির উপারেই চীন।

আমি আগেই আমার ডায়েরীতে লিখেছি যে এ অঞ্চলের সৌন্দর্যকে লিখে প্রকাশ করার মত ভাষা আমার নেই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বলতে যা বোঝায় তারও যেন ঊর্ধ্বে এ জগৎ। হিমালয়ের গম্ভীর পবিত্র ও শান্ত সৌন্দর্যের প্রাণ এখানেই লুকিয়ে আছে। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমের পূর্ণ প্রকাশ। খাম্‌বা-লা'র থেকে আমরা নেমে এলাম নীচের পাটসি নামে একটি গ্রামে। সেদিন রাত্রিতে আমরা তিনটি বাড়ীতে ভাগাভাগি করে কোন রকমে রাত কাটালাম।

পরের দিন বিকেলবেলায় আমরা পৌঁছলাম সাংপোর তীরে। সূর্যাস্তের সাথে সাথে আমাদের প্রার্থনা সেরে পবিত্র সাংপোর জল মাথায় দিলাম। সাংপোর রূপটা খুব ভয়ংকর নয়, অনেকটা হৃষিকেশের কাছে গঙ্গার মত, তবে দুদিকের উপত্যকা এখানে আরও চওড়া। নদীটা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বয়ে চলেছে। এখান থেকে আমাদের নদী পার হতে হবে—লাসা এখন মাত্র দু'দিনের পথ।

সাংপোর হলদে বালির বিরাট চর, নদীর এদিকে ও ওদিকে অনেক বাড়ীঘর। নদীর পাশ দিয়ে রাস্তায় অনেক লোকজন চলাফেরা করছে। নদীর ওপারেই রাস্তার উপর নজরে পড়ল কয়েকটা লরী। অনেকদিন পর আমরা ফিরে এলাম আমাদের জগতে।

চাক্‌সাম গুম্ফা

সাংপোর ধারে আসতেই পাহাড়ের সেই শুকনো ঠাণ্ডা থেকে পরিত্রাণ পেলাম। এখানকার ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে খুবই ভদ্র। সাংপোর ধার ধরে আমরা এবার পূর্ব দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। রাস্তাটা সাংপোর কাঁকর বালিতে তৈরী। এখান থেকে লাসা পর্যন্ত যেতে আর কোন পাহাড় ডিঙোতে হবে না। কিছুদূর এগুতেই দূরে ডানদিকের পাহাড়ের কোলে দেখা দিল কয়েকটি মন্দির। শুকনো গাছ দিয়ে যেন তাকে ঢেকে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে।

এটাই চাক্‌সাম গুম্ফা, এই গুম্ফার ধর্মশালাতেই আমরা রাত কাটাবো—গুরুজী ঘোষণা করলেন।

সাংপোর তীরে আসার পর থেকেই আমাদের উৎসাহ যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেছে, শ্রান্ত ও ক্লান্ত লামাদের ভেতরে হঠাৎ যেন প্রাণের জোয়ার এসেছে। সাংপোর পথ ছেড়ে আমরা এবার বাঁক নিলাম ডান দিকে ছোট পাহাড়টির দিকে। পাহাড় না বলে সেটাকে একটু উঁচু ঢিবি বলাই ভাল। একটু এগুতেই হঠাৎ পড়লাম যেন বাঘের মুখে—না, তিব্বতী কুকুর নয় আরও সাংঘাতিক—চীনা সৈন্য। ওদের তাঁবুগুলো যে লুকিয়ে ছিল ঢিবির আড়ালে কিছুতেই আমরা তা ভাবতে পারিনি। ওরা হঠাৎ অমানুষিক চিৎকার করে ছুটে এল আমাদের দিকে। এর আগেও এদের আপ্যায়ন পেয়েছি, কিন্তু সেটা ছিল ভদ্র আপ্যায়ন, কিন্তু এবারের আপ্যায়ন আমি কি বলবো বুঝতে পারছি না, যদি লিখি অভদ্র তাতেও মনে হয় তাদের পূর্ণ সম্মানই দেখানো হল, এই পাহাড়ি সৈন্যদের এটাই বোধ হয় সাধারণ আচরণ।

আমাদের ধৈর্য আর শান্তভাব বজায় রাখতে রাখতে সেটাই হয়ে গেছে স্বভাবসিদ্ধ, সর্প দংশনান্তেও মনে হয় সে ভাব থেকে বিচলিত হব না। মাঝে মাঝে মনে হয় যেন প্রাণ থাকতেও আমরা নিষ্প্রাণ। কাম ক্রোধের বাইরে একটা নিষ্প্রাণ জগতের এক অদ্ভূত প্রাণী। আমি সখের সন্ন্যাসী তাই এই ধরনের চিন্তাধারা প্রায়ই মনে উদয় হয়, কিন্তু ইচ্ছে করেই আমি বেছে নিয়েছি এই পথ, কাজেই অভিযোগ করবো কার বিরুদ্ধে। চীনা সৈন্যরা আমাদের সামনে যে রকমভাবে হঠাৎ এসে ঘিরে ধরেছে তাতে মানুষ মাত্রেই চমকে উঠবে। গুরুজী সব রকম মুহূর্তের জন্যই প্রস্তুত ছিলেন, তিনি অনেক চেষ্টায় কোনো রকমে তাদের বোঝাতে সক্ষম হলেন যে আমরা লামা, যাচ্ছি চাক্‌সাম গুম্ফাতে। তারা আমাদের পথ ছাড়লো বটে, কিন্তু পেছন পেছন গুম্ফা পর্যন্ত এল। আমরা গুম্ফার মূল দরজায় ধাক্কা দিলাম, ভেতর থেকে একজন লামা এসে

আমাদের আপ্যায়ন করলেন। ঢোকার সাথে সাথেই আমরা জানলাম যে ধর্মশালায় আপাততঃ কোনো অতিথি নেই। কাজেই থাকার কোন অসুবিধা হবে না। আমাদের ভেতরে ঢুকতে দেখে চীনা সৈন্যরা চলে গেল, মনে মনে ভাবলাম আমি কি তিব্বতে আছি না পিকিং-এ।

ধর্মশালার উনোনের চারপাশে বসে আমরা সেদিন আনন্দে আর আন্তরিকতায় গুরুজীকে বার বার ধন্যবাদ দিতে লাগলাম। শত বাধা তুচ্ছ করে আমরা শেষ পর্যন্ত সাংপোর তীরে এসে যে পৌঁছেছি এর কৃতিত্ব গুরুজীর। লাসার পথে সাংপো পৌঁছনো মানেই লাসা পৌঁছনো।

চাক্‌সাম একটা বিরাট মঠ। প্রায় সাতশ' লোক সেখানে থাকে। আর ধর্মশালাতে ইচ্ছে করলে তিনশ' লোককে স্থান দেয়া যায়। বুদ্ধ পূর্ণিমা আর পদ্ম সম্ভবা উৎসবের জন্য এই গুম্ফা তিব্বতে খুব নাম করা। ধর্মশালাটি বিরাট, আমরা তারই কোণের তিনটে ঘর নিয়ে আছি। গীয়াৎসে বা অন্যান্য গুম্ফাতে যেরকম আপন করা আপ্যায়ন পেয়েছি এখানে সে রকমটি নয়। এখানকার সবাই যেন আলাদা আলাদা থাকতে পছন্দ করে। লামাদের সাথে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয় চলার পথে, মাথা নীচু করে প্রীতিভাব বিনিময় করি তার বেশী আর কিছু নয়। এখানকার ধর্মশালার যিনি অধ্যক্ষ তার সাথে প্রথমদিনই যা কথা বলার বলেছি তারপর তিনি যেন সম্পূর্ণ উধাও হয়ে আছেন। এখানকার সকলের মনেই যেন একটা থম্‌থমে ভাব বিরাজ করছে।

চাক্‌সাম গুম্ফার অবস্থানটি চমৎকার, এখান থেকে সাং-পো নদী আর তার সমতলভূমির দৃশ্যটিও চমৎকার। এখানকার বুদ্ধ মন্দির, পদ্ম সম্ভবার মন্দির আর উপাসনার ঘরগুলোও অতি সুন্দরভাবে সাজানো। কাঠের কাজ, দেওয়ালের চিত্রণ আর বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তিগুলো অতি সুন্দর আর সূক্ষ্মকাজে ভর্তি। গী-ইয়াৎসের গুম্ফাতে সব সময় আমাদের সাথে লামারা থেকে সব কিছুর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, এখানে যেন সবই ফাঁকা ফাঁকা। লামারা থেকেও যেন নেই। প্রথমে ভেবেছিলাম যে এরা সবাই ধ্যান-ধারণা সমাধির জগতে বিচরণ করছেন, সাধারণ কথাবার্তা ও অতিথি অভ্যাগতদের বিষয়ে তাই এদের ভ্রুক্ষেপ কম। কিন্তু পরে আমাদের সে ধারণা দূর হল। ধর্মশালায় থাকা-খাওয়ার জন্য কোনো পয়সা লাগে না, তাই লাসায় প্রবেশের আগে ঠিক হল যে আমরা আরও একদিন বিশ্রাম করে তারপর রওনা হব।

পরের দিন বিকেলবেলা ধর্মশালার ভারপ্রাপ্ত লামা এসে আমাদের সবিনয়ে জানালেন যে, এখানকার চীনা কর্তৃপক্ষ আমাদের বিষয় জানিয়ে লাসায় সংবাদ পাঠিয়েছে, অর্থাৎ লাসার চীনা কর্তৃপক্ষের কাছে মহামান্য দালাই লামার দরবারে নয়, লাসার চীনা কর্তৃপক্ষ যতক্ষণ পর্যন্ত না উত্তর দেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এখানেই অপেক্ষা করতে হবে, চীনা-কর্তৃপক্ষের আদেশ না পেলে আমরা যেন কিছুতেই সাংপো নদী পার না হই। ভারপ্রাপ্ত লামা খুবই দুঃখের সঙ্গে এ সংবাদটা আমাদের দিলেন। সেই কথায় আমরা সবাই অবাক হয়ে গেলাম, কারণ আমাদের ধারণা অনুযায়ী তিব্বত

মহামান্য দালাই লামার শাসনাধীন, কিন্তু এখানে চাক্ষুষ দেখছি সবই প্রায় চীনাদের অধীনে, তারাই এখানকার আসল মালিক। এখন বিষয়টা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হল, চাক্সাম গুম্ফার থম্থমে ভাবটা এই চীনাদের কারণেই উৎপত্তি হয়েছে। ড্রাগনের মতো চীনারা মনে হয় গুম্ফার সামনে ওৎ পেতে বসে আছে।

গুরুজী আমাদের বার বার সাবধান করে দিলেন, তিব্বত এবং চীনাদের মধ্যে এই সময় শক্তির লড়াই চলছে। তিব্বতীদের আছে মনোবল ও ধর্মবল, অন্যদিকে চীনাদের রয়েছে অস্ত্রবল। জানি না কারা জিতবে, তবে এ পর্যন্ত আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝে নিয়েছি যে চীনারাই কার্যতঃ তিব্বতের শাসনকারী। চীনারা নেপালী তীর্থযাত্রী বলে আমাদের ছাড়ছে, ভারতীয়দের ক্ষেত্রে রাস্তা এখন সম্পূর্ণ বন্ধ। এর মধ্যে আমাদের কিছুতেই ঢোকা চলবে না, এমন কি চীনারা যদি শত প্রশ্নও করে তাহলেও তাদের অতি সাবধানে এড়িয়ে চলতে হবে। তবে আমাদের মনোবল এতটুকু কমেনি। এতদূর যখন এসেছি তখন লাসা পর্যন্ত যাওয়া হবেই।

চাক্সামের একজন অল্পবয়স্ক লামার সাথে আমার পরিচয় হল। ভদ্রলোক নিজেই আমাদের সাথে এসে মিশলেন। তিনি এখানকার সহকারী উপ-অধ্যক্ষ। তিনি আমাদের কাছ থেকে পথ ও কোথায় কোথায় চীনা সৈন্য মোতায়েন আছে তা জানতে চাইলেন। আমি মৌনী সাধু কাজেই উত্তরটা জানা সত্ত্বেও চুপ করে রইলাম, আমার ডায়েরীতে সব পরিষ্কার লেখা আছে। অন্যান্য লামারা এ প্রশ্নের উত্তরে চুপ করে গেলেন। গুরুজীর কড়া নিষেধাজ্ঞা খবরদার এ সবের মধ্যে ঢুকবে না। কার মনে কি আছে, কি কথার কি ব্যাখ্যা করবে তা আমাদের জানা নেই। আমাদের কাছ থেকে কোন রকম উত্তর না পেয়ে সহকারী উপ-অধ্যক্ষ মহাশয় আমাদের সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার চেষ্টা করে বললেন—আপনারা আমাদের আপনজন কাজেই বলছি, জানেন ১৯৫০ সালের চীনা আক্রমণের পর থেকে আমাদের স্বাধীনতা প্রায় নেই-ই বলতে হবে। অনেক লোক চলে গেছে ভারত ও নেপালের দিকে। লাসার চারদিকে চীনা সৈন্যে ভর্তি, লাসার বাইরের মঠ ও বিহারগুলো এখনও স্বাধীনভাবে রয়েছে, কিন্তু আস্তে আস্তে চারদিকেই চীনা প্রতিনিধিরা তাদের নীতি ঢোকাবার চেষ্টা করছে। সাংপোর এদিকে চীনা সৈন্যরা আগে ছিল না। এই পাঁচ ছ'দিন হল তারা হঠাৎ এখানে এসে তাঁবু পেতেছে। এখান থেকে ফেরী ঘাট দূরে নয় লোকজন চলাচলের ওপর কড়া নজর রাখাই তাদের উদ্দেশ্য। ওরা কিছুতেই বুঝতে পারছে না যে এতে আমাদের তপস্যার ব্যাঘাত ঘটে। আমরা লাসায় পি-এল-ও অর্থাৎ পিপ্‌ল্‌স্ লিবারেশন আর্মি ও প্রিপেয়ারেটরি কমিটিতে তীব্র প্রতিবাদ করেছি, এখনও পর্যন্ত তার কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। এই চীনা বাহিনীরা আমাদের শান্তি ও সাধনার খুব ক্ষতি করছে। তাই জানতে চাইছি আপনারা তো বরডার হয়ে আসছেন, এ বিষয়ে আপনাদের মতামত কি ?

তার কথা শুনে গুরুজী বললেন—আমরা সামান্য ও সাধারণ তীর্থযাত্রী। এ পর্যন্ত কয়েক জায়গায় কিছু কিছু সৈন্য দেখেছি বটে কিন্তু আমাদের কোনোরকম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়নি। আমরা চীনা ও তিব্বতী সৈন্যদের তফাৎ কিছু বুঝি না, আর

সেদিকে নজর দেবার সময়ও আমাদের হয়নি। এ ব্যাপারে আমরা কিছুই বলতে পারবো না। গুরুজীর কথা শুনে ভদ্রলোক আমাদের কাছ থেকে কিছু আদায় হবে না বুঝে বিদায় জানালেন।

সেদিন সকাল থেকেই সূর্যের কিরণ অদ্ভুত ধরনের গরম। কাজেই গুরুজী আমাদের বললেন চল আজকে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করে পুজো দিয়ে আসি। বছরের এই সময়টায় ব্রহ্মপুত্রের (সাংপো) ধারে ছোট ছোট সাদা ফুল ফোটে আমরা সেই ফুল কুড়িয়ে নিয়ে এসে নদীর ধারে এলাম। আমাদের পরনের কাপড় ফতুয়া আর চাদরগুলোও খুব নোংরা ছিল আর মোজাগুলো তো বটেই। সেগুলোও ধুতে হবে। আমরা লেঙ্গট পরে নেমে পড়লাম জলে। জলে পা দিয়েই আমি লাফিয়ে উঠলাম—জলতো নয় বরফের টুকরো! অসম্ভব, এ জলে স্নান তো দূরের কথা জলকাচা করাও সম্ভব নয়। জল ছুঁলেই মনে হয় নিউমোনিয়ায় ভুগতে হবে। অন্যান্য লামাদের কথা আলাদা তারা সবাই কাঠমাণ্ডুর লোক, বাগ্‌মতীর বরফের জলে স্নান করা ওদের অভ্যাস। কিছুক্ষণ পরে মনের জোরে বললাম, যা হবার হবে, ব্রহ্মপুত্রের এই উৎসে স্নান করাও এক মহাপুণ্যের ব্যাপার। এই পুণ্যস্থানে যদি ঠাণ্ডায় মরি তাহলেও নিশ্চয়ই পরকালে স্বর্গলাভ হবে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সব লামারাই একে একে জলে নেমেছেন কাজেই আমি যদি না নামি তাহলে খুব সহজেই প্রমাণ করা হবে যে আমি শীতের দেশের লোক নই।

আবহাওয়াটা বড় অদ্ভুত। আকাশের কড়া রোদ ব্রহ্মপুত্রের বালির চড়ায় পড়ে আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। আমরা আছি ১২০০০ ফুট উপরে। আমাদের চারদিকের পাহাড়গুলো সব বরফে ঢাকা অথচ এই গরম সূর্যকিরণ দেখে তা মনেই হয় না। গুরুজীকে দেখে মনোবল বেড়ে গেল এই বয়সে তিনি যদি সাহস করে নামতে পারেন আমার সেক্ষেত্রে দূরে সরে যাওয়া উচিত নয়। আমি আস্তে পা ভিজিয়ে হাতের কনুই ভিজিয়ে ঠাণ্ডাটাকে গায়ে সহ্য করে নিলাম। একটু সময় নিলাম তারপর নেমে পড়লাম স্ফটিকস্বচ্ছ পবিত্র জলে। ডুব দিলাম সর্বপাপহরা ব্রহ্মপুত্রের হীমশীতল জলে। একটা মাত্র ডুব তাতেই মনে হল শরীরের এক বিরাট পরিবর্তন হল। তীরে উঠে গা-মুছে নিলাম, তারপরই শুরু হল আমার আভ্যন্তরিক রক্ত চলাচলের বিরাট পরিবর্তন। কন্‌কনে হাড় কাঁপান ঠাণ্ডাটা বন্ধ হয়ে সমস্ত শরীরের রক্তটা গরম হয়ে উঠল। এক অদ্ভুত আনন্দে মনটা ভরে উঠল, অনেক দিন পর জল পেয়ে আমার দেহটা শান্তি পেল। এই আনন্দ পাবার জন্য পাপ বা পুণ্যের কোন প্রশ্নই আসে না, এই আবহাওয়ায় এটাই স্বাভাবিক। এই পরিবর্তনের নামই বোধ হয় পুণ্যস্নান। অলকানন্দায় যারা স্নান করেছেন তারা বুঝবেন আমি কি বলতে চাইছি।

স্নানের পর আমরা বসলাম পুজোর জন্য। সমবেত প্রার্থনার পর আমরা মনের ভক্তি দিয়ে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করলাম। লামারা সুর করে পাঠ করতে লাগলেন ধম্মপদের পবিত্র শ্লোক—

মনই সব অবস্থার সৃষ্টি করে
মনই মনকে মালিক করে।

অপবিত্র মন আনে দুখ্খ
জীবনচাকা এইভাবেই ঘোরে ॥

হে দয়াময়! আমাকে এই ঘূর্ণিবাত্যা থেকে মুক্ত কর। ঘৃণা দিয়ে ঘৃণাকে দূর করা যায় না। ভালোবাসার নদীতে অবগাহন করলেই দূর হয় ঘৃণাভাব…।" চাক্‌সামের বজ্রধারা মন্দিরটি বিরাট, আর সহস্রবাহু মন্দিরের রঙ তাংখা, আর কাঠের সূক্ষ্ম কাজগুলো দিনের পর দিন ধরে দেখলেও আত্মার তৃপ্তি হবে না। তিব্বতী লামা শিল্পীরা মনের ভক্তি ও শান্তি উজাড় করে দিয়েছেন এই কাজের মধ্যে। পবিত্র পরিবেশে সেগুলো যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে, তাই দেখে দেখেই আমাদের সময় কাটে। লামাদের মতে ভগবান বুদ্ধের আত্মা লুকিয়ে আছে এইসব অব্যক্ত মূর্তিগুলোর মধ্যে।

চাক্‌সাম মন্দিরের আর একটা বৈশিষ্ট্যের কথা না লিখলে আমার রোজ-নামচা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেটা হচ্ছে এখানকার ইঁদুর। এখানকার মন্দিরগুলো যেন ইঁদুরের স্বর্গরাজ্য। এদের গতিবিধি এতই স্বাভাবিক যে মাঝে মাঝে ধ্যানমগ্ন লামাদের মাথায় উঠতেও এরা দ্বিধা বোধ করে না। মন্দিরের চাল আর মাখন এদের প্রধান খাদ্য। তিব্বতীদের মতে লামারা দেহত্যাগ করে এইসব ইঁদুরের মধ্যে তাদের আত্মাগুলোকে লুকিয়ে রেখেছেন, তাই এই মন্দির তারা ছাড়তে চান না। কাজেই সে-সব পুণ্যাত্মাদের তাড়িয়ে দেবার মতো বা ফাঁদে ধরার মতো দুষ্ট বুদ্ধি এদের মধ্যে কিছুতেই আসবে না।

বদ্রীনাথের ছারপোকার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আর এখানকার ইঁদুরের কথাও মনে হয় চিরজীবন মনে থাকবে। বিশেষ করে রাতে আমাদের ঘুমন্ত দেহের উপর দিয়ে এদের অবাধ যাতায়াতের কথা আমি কোনোদিনই ভুলবো না। আমার মতে এইসব মন্দিরগুলোকে বুদ্ধ মন্দিরের বদলে গণেশ মন্দির বলে এরা ভুল করেছে। চাক্‌সাম মন্দিরে আমার সবচেয়ে বড় লাভ হয়েছে, গুরুজীর সাথে ধর্মচর্চা। গুরুজী রোজই আমাদের ধম্মপদ থেকে বিশেষ বিশেষ অধ্যায় পড়ে শোনাতেন। চার দিনের দিন সকাল বেলা আমরা ছাড়া পেলাম, অর্থাৎ চীনা শিবির-অধ্যক্ষ লাসা থেকে আমাদের যাওয়ার আদেশ পেয়েছেন। সকাল ন'টার সময় আমরা খবর পেলাম। কালবিলম্ব না করেই আমরা রওনা হলাম, দশটার মধ্যে আমরা সাংপোর তীরে এসে পৌঁছলাম।

সাংপোর জলটাকে দূরে থেকে যতই শান্ত দেখাক না কেন আসলে এর বেগ ও স্রোতের খুব বদনাম আছে। সাংপোর ধার ধরে আমরা পূর্বদিকে চলতে লাগলাম। কিছুদূর আসতেই প্রথমে নজরে পড়ল তিব্বতী গ্রামবাসীরা মনের আনন্দে গান গাইছে আর নদীতে কাপড় কাচছে ও অনেকে স্নান করছে। ঠাণ্ডার জন্য যে জলে আমি নামতে ভয় পাচ্ছিলাম সেই জলেই দেখলাম মহিলারা মনের আনন্দে ঝাঁপা-ঝাঁপি করছে। মহিলাদের মধ্যে অধিকাংশই যুবতী তাদের বুকের কাপড় একদম নেই, পাথরের উপর জামা খুলে রেখে দিয়েছে। রোদ পোয়াবার এরকম দৃশ্য এর আগে কোনোদিন চোখে পড়েনি। আমাদের দেখে তারা একটু থমকে দাঁড়ালো তারপর চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী জিভ বার করে আমাদের প্রণাম করল। কিন্তু তাদের মধ্যে লজ্জার কোন চিহ্ন দেখলাম

না। কি সহজ এরা ; এরকম সহজ ও সরলতা বুঝি এখানেই সম্ভব। যেখানে মন পবিত্র সেখানেই আছে মুক্তি।

আরও কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে আমরা পেলাম একটা ফেরী ঘাট। এই অঞ্চলের পারাপারের জন্য এই ফেরীঘাটটাই একমাত্র ভরসা। নদীর জল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, তার উপর প্রবল স্রোত আর এপার ওপারের দূরত্বও অনেক। বহরমপুরের কাছে গঙ্গার মতো অনেকটা, কাজেই সাঁতার কেটে পার হবার তো প্রশ্নই আসে না। সকলকেই বাধ্য হয়ে নিতে হয় ফেরী। প্রয়োজনের তুলনায় ফেরীঘাটের অবস্থা খুবই শোচনীয়। ছোট একটা কাঠের ঘরকে কেন্দ্র করেই তার প্রাণ। নদীর ধারে যদি বালির ঝড় দেখা দেয় তাহলে মনে হয় এই ঘরটাকে তুলে নিয়ে দূরে ফেলে দেবে। ঘরটার ভেতরে একটা তোলা উনোনে একটা লম্বা টবের উপর জল ফুটছে। আর তার মধ্যেই রয়েছে চা-পাতা। এর মধ্যে কবে যে নতুন চা-পাতা যোগ হয় তা ভগবানই জানেন। চা চাইলে এই ফুটন্ত চায়ের জলটাকেই বাঁশের চোঙ্গা বা অ্যালুমনিয়ামের মগে করে দেওয়া হয়, তবে দেওয়ার আগে তাতে নুন ও মাখন মেশানো হয়। এরকম এক মগ চায়ের দাম দু'পয়সা, জলের দাম বলতে হবে। আমাদের মতো অনেকেই ফেরীর জন্য অপেক্ষা করছে। শিলিগুড়ি স্টেশনে তিব্বতীরা যেরকম দিনের পর দিন অপেক্ষা করে তাদের দলনেতার জন্য আমরাও সেরকম অপেক্ষা করতে লাগলাম ভবসিন্ধু পার হবার তরীর জন্য। ওপার থেকে লোকজন মালপত্র বোঝাই করা নৌকা এল। নৌকা ঠিক নয় একটা ভেলা। গঙ্গাবক্ষে কাঠের বোটের মতো। চারকোণা লগি ঠেলে যতদূর তাকে নিয়ে যাওয়া যায়, তারপর বৈঠা ও কোণাকুণি স্রোতের সাহায্যে নিয়ে আসা হয় ওপারে। বলাই বাহুল্য, এখানে জেটি বা কোনোরকম পুল নেই। বোটটা যতদূর সম্ভব তীরে আসে তারপর সেখান থেকে হাঁটু জলে নেমে আসতে হয়। অবশ্য বর্ষার সময় বা মাসখানেক পর বরফ গলার সময় যখন নদীর ভরাট অবস্থা হয় তখন বোটটা আরও কাছে আসে।

বোটটা যেন একটা গ্রাম বয়ে নিয়ে যায়, এর মধ্যে না আছে কি! ইয়াক, ভেড়া, গাধা থেকে আরম্ভ করে শূকর, মুরগী, মালপত্র, ঘাস, বিচালি, মানুষ পর্যন্ত কিছু বাকি নেই। ঠাসাঠাসি করে কোনরকমে পার হওয়া নিয়ে কথা। ভাড়া চার পয়সা (মাথাপিছু) মাত্র। আজকাল ১৯৫০ সালের পর অর্থাৎ হান্‌দের আগমনের পর থেকে ফেরীর অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। আগে ছিল ইয়াকের চামড়ার ভেলা, তাতে আট দশজনের বেশী একসাথে পারাপার হওয়া যেতো না। আর দিনে কোনো সময় একবার কোনো সময় দু'বার মাত্র পারাপার হওয়া যেতো। কিন্তু আজকাল অবস্থার উন্নতি হয়েছে। দিনে চার বার, আর প্রয়োজনবোধে আরও একবার বাড়ানো যেতে পারে, একটা বিরাট গাদাবোট ছাড়াও আর একটা বিরাট মিলিটারী বোট রয়েছে সৈনিকদের জন্য। তিব্বতী সেনাবাহিনীর অফিসাররাও সেই বোট ব্যবহার করতে পারেন।

আমাদের পার হতে লাগলো প্রায় একঘণ্টা। তিব্বতে এই প্রথম আমরা যান ব্যবহার করলাম। গ্যাংটক থেকে লাসা পর্যন্ত একমাত্র এই জলযান ছাড়া সবটাই পায়ে

হাঁটা পথ। যাদের ক্ষমতা আছে তারা পনি বা ঘোড়ার ব্যবস্থা করে। মাল টানার জন্য রয়েছে চমরী গাই বা ইয়াক, এদেশে গাধারও অভাব নেই।

সাংপো পার হলাম, আমরা পৌঁছলাম সম্পূর্ণ এক অন্য জগতে। হিমালয় ছাড়িয়ে এবার আমরা স্পর্শ করলাম লাসার পবিত্র মাটি। সুস্থ অবস্থায় পৌঁছবার জন্য আমরা ভগবানের উদ্দেশ্য প্রার্থনা করলাম। তারপর ধরলাম পথ। এবারের পথটা সম্পূর্ণ বালির, চড়ার উপর দিয়ে পথ। শিলিগুড়ি থেকে জলদাপাড়া আসার পথে শীতের সময় তিস্তা নদীর যে চড়া ঠিক সে রকম। আমরা সাংপোর ধার ধরেই পূর্ব দিকে এগিয়ে চললাম। কিছুদূর গিয়ে সাংপোকে বিদায় জানালাম। বড় রাস্তা ছেড়ে আমরা রাস্তাটাকে সংক্ষেপ করার জন্য একটা ছোট রাস্তা ধরলাম, রাস্তা নয় মেঠো পথ। সাংপোর তিব্বতী উচ্চারণ ৎ-সাং-পো, আমরা এখন তার উত্তরাংশে। এদিকটায় সমভূমি আর ও প্রশস্ত, ওদিকটায় ঠিক সাংপোর পরই শুরু হয়েছে হিমালয় পর্বতমালা অর্থাৎ সাংপোর দক্ষিণাংশ। এদিকে আবাদী জমিও চোখে পড়ত লাগল আর মাঝে মাঝে দু' একটা ঘরবাড়ীও। জমিগুলোর আল্য দেখে মনে হচ্ছে যে এখানে ভালই চাষ হয়। রাস্তায় লোকজন ভর্তি, এখান থেকে আর দুটো পুরো দিন হাঁটলেই লাসা, পবিত্র শহর। আমরা একটু ডানদিকে ঘুরে আবার বড় রাস্তায় পড়লাম। এই সমতল ভূমিটাকে বলা হয় কী-চু নদীর উপত্যকা। আমরা এই সংক্ষেপ পথ না ধরলে পেতাম কী-চু নদী ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম সেখান দিয়েই আসলে রাস্তাটা ঘুরে এসেছে। এই সংক্ষেপ রাস্তাটায় আসার জন্য আমরা প্রায় তিনঘন্টা সময় বাঁচিয়ে এসে পড়লাম কী-চু নদীর ধারে। এখানেই আমরা থামলাম, গ্রামটির নাম চুসুল।

ছোট্ট গ্রাম, ঘর বাড়ীগুলো সবই পাথরের তৈরী। এখানে অনেক গাছ-গাছড়াও চোখে পড়ল। সিকিমের ছোট্ট গ্রামের মতোই এর রূপ। গ্রামে কোন রকম রেঁস্তোরা বা চায়ের দোকান নেই। আমাদের দেখে আশপাশের বাড়ী থেকে ছোট ছেলেমেয়েরা পিছন ধরেছে, তাদের কাছ থেকেই খোঁজ নেওয়া গেল—এখানে কাঠ পাওয়া যায় কি না। এগারো বারো বছরের একটি ছেলে এগিয়ে এসে বলল —আমি আপনাদের নিয়ে যাবো চলুন।

ছেলেটিকে অনুসরণ করে আমরা নদীর ধারের একটা বাড়ীতে এসে দরজায় ধাক্কা দিলাম। ঘরে লোক থাকলে সাধারণতঃ দরজা খোলাই থাকে কাজেই বোঝা গেল যে ভেতরে কেউ নেই। সেই বাড়ীর সামনে বত্রিশজন লামাকে দেখে আশপাশের সবাই ছুটে এল, ব্যাপার কি? তাদের বুঝিয়ে দিলাম—ব্যাপার অতি সামান্য, আমরা তীর্থযাত্রী, মধ্যাহ্নে আহারের জন্য রান্নার ঘর খুঁজছি।

—তা বললেই হয়, বাড়ীর মালিক এখন নেই, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমরা আপনাদের জন্য কাঠ জোগাড় করে আনছি। ভিড়ের মধ্য থেকে এক ভদ্রলোক এসে সে দায়িত্ব নিলেন।

এ অঞ্চলে আশপাশে গাছ-গাছড়া অনেক আছে, কাঠের অভাব নেই কিন্তু আমাদের প্রয়োজন শুকনো কাঠ যা এখনই ধরানো সম্ভব। গ্রামবাসীদের সাহায্যে আমাদের সে

সমস্যার শীঘ্রই সমাধান হয়ে গেলো। কাঠের দোকানটা আপাততঃ বন্ধ, কাজেই গ্রামবাসীরা ভাগাভাগি করে যে যার নিজের বাড়ী থেকে একটা করে কাঠ নিয়ে এল। আমরা তার দাম দিতে চাইলেও তারা কিছুতেই গ্রহণ করল না। আমাদের সাহায্য করেই তারা কৃতার্থ হল। গ্রামের সকলেই খুব হাসি খুশী। এই সরল গ্রামবাসীদের মধ্যে সহজ ও সরলভাবটা সাদা বরফের মতোই পবিত্র। একটু বড় মেয়েরা দূরে গাছ বা বাড়ীর আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের রান্না দেখতে লাগলো। রান্না মানে ছাতু কিছু ডাল ও চালের সঙ্গে গরম জলের মিশ্রণ মাত্র। আনন্দে আমাদের মন ভরাই রয়েছে শুধু দেহের জন্য খাওয়া। আমরা যে যার অ্যালুমনিয়মের বাটিতে নদীর জল ধরে নদীর ধারের একটা বিরাট পাথরের আড়ালে কাঠ ধরিয়ে রান্না করলাম। আমাদের সাথে গ্রামবাসীদেরও খাবার জন্য আমন্ত্রণ জানালাম। তাদের মধ্য থেকে চারটি ছোট ছেলেমেয়ে আর দু'জন বয়স্ক লোক এসে আমাদের সাথে যোগ দিল, বাকি সবাই দূরে দাঁড়িয়ে রইল। খাওয়া-দাওয়ার পর গ্রামবাসীদের ধন্যবাদ দিয়ে মঙ্গলময়ের কাছে প্রার্থনা করে আমারা আবার পথ ধরলাম।

হিমালয়ে উঠবার সময় আমাদের পা ব্যথা খুব বেশী হয়নি কিন্তু চাক্‌সাম গুম্ফায় পৌছাবার পর থেকেই আমাদের জানু খুব কাহিল। খাম্‌বা-লা'র থেকে নামবার পর থেকেই আমাদের জানুতে ব্যথা ধরেছে। খাড়াই পথে তাড়াতাড়ি নামবার জন্যই এ অবস্থা। সেই ব্যথা এখনও আছে। কাজেই সমতল হলেও আগের মতো আমরা চলতে পারছি না। আমাদের গতি খুব ধীর।

কী-চু নদীটি আমার খুব ভালো লাগছে। নদীটা নেমে আসছে লাসার ওদিক থেকে সাংপোর দিকে। আমরা চলছি সেই স্রোতের বিপরীত দিকে। রাস্তাটা প্রায় সমতলই বলতে হবে। নদীর ওপারে একটা পর্বতশ্রেণী মনে হয় আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে নদীটার কাছে। খরস্রোতা নদীর মধ্যে রয়েছে অনেক পাথর, তারই উপর স্রোতটা ধাক্কা খেয়ে জলতরঙ্গের মতো শব্দ করছে। সেই তরঙ্গের ছন্দে পা মিলিয়ে আমরা চলতে লাগলাম।

সন্ধ্যার একটু পর আমরা একটা বড় গ্রাম পেলাম, গ্রামটির নাম নেথাং। গুরুজী বললেন যে এই গ্রামগুলোকে তিনি খুব ভালোভাবে চেনেন, গত বিশ বছরের মধ্যে এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। আমরা একটা বাড়ীর সামনে এসে থামলাম। আমাদের বাঁদিকে দু'টো বাড়ীর মধ্যে নজরে পড়ল একটা বিরাট চৈত্য। যে বাড়ীটায় আমরা ধাক্কা দিলাম সেটাই হচ্ছে এই গ্রামের গুম্ফা। গুম্ফা না বলে এটাকে ধর্মশালা বলাই ভালো। যাতায়াতের পথে লামারা এই গুম্ফাটাকে ধর্মশালা হিসেবে ব্যবহার করেন।

একজন বৃদ্ধ লামা এসে আমাদের আপ্যায়ন করলেন। আমাদের কথা শোনার আগেই তিনি বললেন—কাঠ বা কাঠকয়লা একদম নেই সব ফুরিয়ে গেছে, এমাসের ধার্য করা টাকাটা এখনও লাসা হতে এসে পৌছয়নি। গ্রামের মুদিখানার দোকানও টাকার জন্য তাগাদা দিচ্ছে, তবে দু'একদিনের মধ্যেই তা এসে পৌছাবে, চিন্তার কোনো কারণ নেই। বৃদ্ধ লামা আমাদের কোনো কথাতেই কান দিলেন না। আমরা কোথা

থেকে আসছি কতদিন থাকবো, সে সব কোনো প্রশ্নও তিনি করলেন না। রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে একটা হ্যারিকেন বা কোনো রকম আলো চোখে পড়ল না। সেই অল্প আলোতেই আমাদের দুটো ঘর দেখিয়ে দিয়ে বললেন—এখানেই রাতের মতো শুয়ে পড় কালকে দেখা যাবে যদি খাওয়া-দাওয়ার জন্য কিছু বন্দোবস্ত করতে পারি তো করবো। এই বলে তিনি যেন অন্ধকারে উধাও হয়ে গেলেন। দুটো ঘর থাকা সত্ত্বেও আমরা ব্যবহার করলাম মাত্র একটা ঘর। ঠাসাঠাসি করে শুলে ঠান্ডাটা খুব কম লাগবে। বলাই বাহুল্য, সে রাতে আর কিছু খাওয়া হল না। আমরা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম কাজেই ঘুমটাই আমাদের আসল। ভালোই হল। তাড়াতাড়ি শুয়ে কালকে খুব ভোরবেলা রওনা হওয়া যাবে।

খুব ভোরবেলায়ই আমাদের ঘুম ভাঙলো, আমার সবচেয়ে বেশী যা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে খাদ্য। পেটের মধ্যে যেন হাহাকার পড়েছে, এমন খিদে অনেকদিন যাবৎ পায়নি। আগের দিন কী-চু নদীর জল খেতে খেতে রাস্তায় চলেছি সেটাও তো এই ক্ষুধার কারণ। ভোরের আলো আরও ফুটতেই আমরা তৈরী হয়ে পড়লাম। সরাসরি গ্রামের কোনো চায়ের দোকানে গিয়ে ঢুকতে হবে। এত ভোরে বৃদ্ধ লামাকে জাগিয়ে তোলার কোনো প্রশ্নই আসে না। কোনো রকম শব্দ না করেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। চোরতেনের কাছে প্রার্থনা সেরে আমরা এদিক ওদিক খুঁজতে লাগলাম, মনে হয় সেই জায়গাটাই গ্রামের বাজার। কয়েকটা কুকুর আমাদের দেখে সসম্ভ্রমে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। তিব্বতে এই প্রথম দেখলাম যে কুকুরগুলোও আমাদের শ্রদ্ধা করে। তারা এতটুকু শব্দও করলো না।

হঠাৎ নজরে পড়ল রাস্তায় এক ভদ্রমহিলা কাশতে কাশতে এগিয়ে চলেছেন তাকেই থামিয়ে জিজ্ঞাসা করা হল—এখানে কোনো চায়ের দোকান আছে কি না বলতে পারেন? তিনি কাশতে কাশতেই দূরের একটা বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে বললেন—দরজায় ধাক্কা দিন ওরা ভেতরেই ঘুমোয়। তার কথামতো আমরা এগিয়ে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলাম। বেশ কিছুক্ষণ ধাক্কা মারার পর দোকানের ঝাঁপ খুলে রাগতস্বরে একজন হেঁড়ে গলায় জিজ্ঞেস করলেন—কি চাই? তারপর হঠাৎ এতগুলো লামাকে একসাথে দেখে তিনি জিভ বার করে সসম্ভ্রমে গলার স্বর পরিবর্তন করে বললেন—বলুন আপনাদের সেবায় কি ভাবে লাগতে পারি।

আমরা ঠিক জায়গায়ই পৌঁছেছি, এটা চায়েরই দোকান। ভদ্রলোক খুব তাড়াতাড়ি কাঠে আগুন দিয়ে পুরোনো বহুকালের কালি পড়া চায়ের পাত্রটা উনোনে চড়ালেন। তৈরীই আছে তার সাথে শুধু মাখনটা মেশাতে হবে মাত্র—তিনি অতি বিনয়ে জানালেন। চা তৈরী হল। তিব্বতে এ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক দিনই চা খাচ্ছি কাজেই নোন্তা চায়ে আজকাল অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। কলকাতার চায়ের স্বাদ এখন প্রায় ভুলেই গিয়েছি। আজকের চা খুব তেতো লাগল আমরা সকলেই দু-চুমুকের বেশী পান করতে পারলাম না; আমাদের সেই ভাব দেখে দোকানদার ভদ্রলোক বললেন—ও! বুঝতে পারছি আপনারা এ রকম চা খেতে অভ্যস্ত নন। এটা আমার স্পেশালিটি আমি চায়ের

মধ্যে কিছুটা ওষুধ পাতা (অনেকটা চিরতার মতো) মিশিয়ে দিই, গ্রামের লোকেরা প্রায়ই পেটের অসুখে ভোগে তাদের পক্ষে এ খুবই উপকারী। ভদ্রলোক খুব গর্ব করে বললেন যে এটা তার ঠাকুরদার আবিষ্কার। ভাগ্যিস্ বাড়ীতে ঠাকুমার দেওয়া চিরতার জল খাওয়ার অভ্যেস ছিল তাই গলাধঃকরণ করতে পেরেছি, নচেৎ মুশকিলে পড়তে হতো। তিব্বতীরা বেশ ভালো মানুষ, কিন্তু তাদের জাতীয় খাবারের অপমান করলে তা কিছুতেই ক্ষমা করেন না। তবে তিনি একটু বেশী মাখন দিয়ে তিক্ততাকে লঘু করে দিয়েছেন বলে তার মার নামে দিব্বি কাটলেন। দামেও অবশ্য খুব সস্তা বত্রিশ গ্লাস চায়ের জন্য নিলেন মাত্র এক টাকা। তাকে বিদায় জানিয়ে আমরা পথ ধরলাম, যাবার পথে আর একবার গুম্ফাতে ঢুকে সেই বৃদ্ধ লামাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি হাসিমুখে আমাদের আশীর্বাদ জানালেন।

পুণ্যতীর্থের দুয়ারে

আমারা আবার কী-চু নদীর ধারে এসে বড় রাস্তা ধরলাম। দূরের পাহাড়টা আস্তে আস্তে নদীর ধারে এসে পৌঁছেছে। কী-চু নদী এখন পাহাড়ী নদীতে পরিণত হয়েছে। বলাই বাহুল্য, তার গর্জন এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী। নদীর ওপারের পাহাড়টা নদী পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়িয়েছে, আর সেই পাহাড় থেকে বড় বড় পাথর গড়িয়ে পড়েছে নদীটার ওপর। তারই বিরুদ্ধে নদীর হুংকার আর গর্জন, নদীর স্রোত আছড়ে পড়ছে সেই পাথরগুলোর উপর। আমরা এগুতে লাগলাম। আমরা নেথাং গ্রামের একটু আগে থেকেই পূর্বদিকে এগিয়ে চলেছি। তার আগের রাস্তাটা ছিল উত্তরমুখী। একটু বাঁক দিতেই আমাদের সামনে এক অভাবনীয় দৃশ্যপট উদ্ঘাটিত হল। হঠাৎ যেন আমাদের সামনের পর্দাটা উঠে গিয়ে দর্শকদের স্তব্ধ করে দিল এক নতুন মঞ্চসজ্জায়। কী-চু নদীর এই বিশাল উপত্যকাটা একটু আগেও এই পাহাড়ের দেয়াল দিয়ে ঢাকা ছিল। আমাদের চোখের সামনে অনেকগুলো দৃশ্য হঠাৎ এসে পড়ল। আমাদের বিহ্বল ভাবটা কাটিয়ে উঠতে একটু সময় নিল।

উপত্যকার দূর পাহাড়ের গায়ে ঝক্‌মক্ করছে কতগুলো মন্দিরের উজ্জ্বল রঙের ছাদ, প্রভাত সূর্যের আলো পড়ে সেগুলো শত সূর্য হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। পাশে পাহাড়ের মসৃণ দেয়ালে আঁকা একটা বিরাট ছবি। চির আলোকের প্রকাশ স্বরূপ বুদ্ধাবতার ভগবান পদ্ম সম্ভবার এই বিরাট ছবিটার মধ্যে তাঁর প্রাণ যেন স্বতঃস্ফুর্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। চতুর্বাহু সেই মহান্ দেবের সামনে আমরা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত জানালাম। আমরা সবাই রাস্তার উপর লুটিয়ে পড়লাম আমাদের অর্ঘ্য নিবেদন করার জন্য। তারপর বসলাম ধ্যানে পদ্ম-সম্ভবার আশীর্বাদের জন্য আমাদের মনকে শূন্য ও পবিত্র করা দরকার। তারপর শুরু হল আমাদের সমবেত প্রার্থনা।

যখন আমাদের কর্ম, ক্লেশ আর
ক্লেশের কারণ সব দূর হয় তখনই
আসে মুক্তি।
বিষয় বাসনা থেকে আসে বন্ধন
প্রকৃত তত্ত্ব জানলে সেই বাসনা থেকে
মুক্তি লাভ করা সম্ভব, মহাশূন্য
জ্ঞান থেকে আমাদের নির্বাণ-পথ

দেখাও। হে তন্ত্রাচার্য পদ্ম সম্ভবা!
তোমার স্বরূপ আমাদের কাছে
প্রকাশ কর।
বুদ্ধ-পথই একমাত্র মুক্তির পথ
নির্জনে থেকেই একমাত্র নির্বাণ সম্ভব,
আমরা চলেছি তোমার পথে
হে মহাযোগী!
হে তন্ত্রাচার্য পদ্ম সম্ভবা
তোমার স্বরূপ আমাদের কাছে
প্রকাশ কর ॥

পাহাড়ের গায়ে নজরে পড়ল আরও অনেক ছবি, অসংখ্য দেব দেবীর মূর্তিতে পাহাড়ের মসৃণ দেয়ালটা ভর্তি হয়ে আছে, তারা সবাই মিলে আমাদের যেন আশীর্বাদ করার জন্য অপেক্ষা করছেন, সেই সুন্দর দৃশ্য দেখে আমাদের সর্ব ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। দূরে লাসার মঠ ও মন্দিরগুলো মনে হচ্ছে যেন স্বর্গ থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে এসে পড়েছে। সেই দৃশ্য দেখেই বোঝা যায় যে এটা পৃথিবীর এক রহস্যময় দেশ।

নদীর ধার ধরে আরও কিছুদূর গিয়েই আমরা আবার থামতে বাধ্য হলাম। নদীটির মাঝখানে একটা বেদীর উপর দাঁড় কারানো হয়েছে বিরাট একটা বুদ্ধের প্রস্তর মূর্তি, দর্শন মাত্রেই আমরা আবার রাস্তার উপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানালাম। উঠে প্রার্থনা করলাম। ভগবান বুদ্ধের পবিত্র ধ্যানমূর্তি দেখেই মনে হল আমাদের যাত্রা সার্থক, পাহাড়ের উপর থেকে অথবা নদীর স্রোতে অসংখ্য বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই নদীর মধ্যে আটকে পড়েছে। নদীর শত আস্ফালন সত্ত্বেও তাদের এতটুকু নড়বার ইচ্ছা নেই। তারা যুগ-যুগান্ত ধারে সেখানেই তাদের ভিত গেঁথেছে। নদীর স্রোত আর পাথরের স্থায়িত্ব এই দুই শক্তির মধ্যে এখানে অনন্তকাল ধরে চলছে লড়াই। আমরা সেই কুরুক্ষেত্রের সাক্ষী হয়ে রইলাম। তারই মাঝখানে বিরাট গ্রানাইট পাথরের উপর এই শান্ত সুন্দর বৌদ্ধ মূর্তি সমগ্র বুদ্ধধর্ম ও দর্শনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই সদা-চঞ্চল সংগ্রামমুখর জগতের মধ্যে স্থির ধীর হয়ে বসে আছেন জগৎপিতা মহামুনী ভগবান বুদ্ধ। শিল্পীর অপূর্ব সৃষ্টি শুধু কল্পনা নয় তাকে সাথে সাথে বাস্তবে রূপ দেওয়া হয়েছে। এখানে আমরা থামলাম। মহাতীর্থের পথে তীর্থযাত্রীদের এখানেই দিতে হয় দ্বিতীয় অঞ্জলি। এখানে স্নান করে দিতে হবে পূজা।

পৃথিবীর মধ্যে এ যেন এক সম্পূর্ণ আলাদা অধ্যাত্ম জগৎ। এ পর্যন্ত আসতে পেরেছি বলে নিজেকে ধন্য মনে করলাম, এ পথে আসা এমন তো কঠিন নয়, অথচ ক'জনই বা আসে। মনের মধ্যে আমার অহংভাব প্রবল হয়ে উঠল মনে হল আমি সকলের মতো নয়। বাড়ী ছেড়েছিলাম বলেই তো আসা হল। মনের জোরে বেরিয়ে পড়েছিলাম বলেই তো আজ এই পুরস্কার মিলল। এ পুরস্কারের কোন জাগতিক মূল্য নেই—এ

পুরস্কার আন্তরিকতা, পবিত্রতা আর আনন্দে ভরা। যারা পরীক্ষায় প্রথম হয়ে ভাবে সব পেলাম, তাদের এখানে আসা উচিৎ এ আনন্দসাগরে না ডুবলে তাদের বোঝান মুশকিল যে এখানে কি পেলাম।

নদীর সেই শত তরঙ্গ শব্দের মধ্যেও এসব নানা কথা ভাবছি, এমন সময় মনে হঠাৎ ধাক্কা খেলাম—নিজেকেই প্রশ্ন করে বসলাম—তুই কি অহংকার করছিস্? নিজেকে সংযত করে নিলাম, তাইতো এই আনন্দসাগরে ডুবেও আমার মনে আসছে অহংকার, এটা খুবই অন্যায়, শুধু অন্যায় নয় অবনতির কারণও বটে। অহংভাব থাকলে মুক্তি কোনদিনই আসবে না। আত্মভাব দূর করতে হবে, এই ভাব থাকলে অহংকার যায় না। অহং থেকেই আসে কামনা আর কামনাই আমাদের বন্ধনের কারণ। আমি বন্ধন চাই না মুক্তি চাই। বন্ধনই বা কি আর মুক্তিই বা কি ? আমি তো এখন মুক্ত, এই তীর্থযাত্রীদের সাথে সাথে হিমালয়ের দুর্গম পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি এটা কি মুক্তি নয়। মনের মুক্তি আর আত্মার মুক্তি এ কথাগুলো খুব জটিল কিছু বুঝি না তবুও জানতে ইচ্ছা হয়। পাথরের উপর বসে বসে ভাবছিলাম—হঠাৎ আমার সহতীর্থযাত্রী লামার কণ্ঠস্বর কানে এল—তিনি প্রার্থনা করছেন—

> মহাজ্ঞানী সোং-কা-পা আমাদের পথ দেখাও, আমাদের
> বোধিসত্ত্ব থেকে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পথ দেখাও, যে প্রাপ্তির
> সাথে সাথে আমাদের মনে আনবে মানবপ্রীতি সেবা
> একাত্মবোধ আর ঐক্য, বুদ্ধ তোমাকে অনুসরণ করি ;
> ধর্ম তোমাকে অনুসরণ করি, সংঘ তোমাকে অনুসরণ
> করি ···· ।

আমাদের পূর্জাচনা সারতে সারতে দুপুর হয়ে গেল। কাছেই একটা সরাইখানা আছে কাজেই খাওয়ার কোনো অসুবিধাই হল না। জায়গাটাকে অনেকটা হৃষিকেশ ও লছমনঝোলার সাথে তুলনা করতে পারি। দৃশ্যটা অনেকটা সেরকম, নদীটা কিন্তু লছমনঝোলার কাছে গঙ্গার যে অবস্থা তার থেকে আরও ভয়ানক। লছমনঝোলার দৃশ্যের সাথে অলকানন্দাকে কল্পনা করলে যে রকম দাঁড়ায় অনেকটা সেরকম। আমাদের সামনেই এখন লাসা আর কোন বাধা নেই।

আমাদের সামনের বিশাল মন্দিরটার দিকে আমরা এগিয়ে যেতে লাগলাম। অনেকগুলো মন্দির নিয়ে একটা বিরাট মন্দিরময় শহর। তার গম্বুজের মতো মন্দিরচূড়া আর অসংখ্য প্যাগোডার মতো বাড়ীগুলো শুধু যে পথিকমাত্রেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাই নয় পথিক মাত্রেই থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। এটাই পৃথিবী বিখ্যাত দ্রেপুং গুম্ফা, দ্রেপুং মন্যাস্ট্রি, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মঠ ও বিহার। নালন্দা বা তক্ষশিলা আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে কিন্তু তারই আদর্শ ও অনুকরণে গড়ে উঠেছে এই দ্রেপুং গুম্ফা। সন্ধ্যের দিকে আমরা সেখানে পৌঁছলাম। সেখানকার ধর্মশালায় ভারতীয়, নেপালী, সিকিম ও ভূটানী সাধু ও লামাদের অবারিত দ্বার। ধর্মশালায় উঠবার আগে আমরা

প্রার্থনা চক্র ঘুরিয়ে প্রার্থনা করলাম। আর একবার দণ্ডি কেটে সম্পূর্ণ মন্দিরটা প্রদক্ষিণ করে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালাম। এখান থেকে লাসা শহর মাত্র সাড়ে তিন মাইল। এতদিনকার পরিশ্রম আমাদের সার্থক হল। আমাদের আনন্দের যেন আর সীমা নেই। আজ সকাল থেকে পূজার্চনা নিয়ে কেটেছে, কাজেই আজ আমাদের মনে উত্তেজনার অন্ত নেই। সেই সাথে সাথে ক্লান্তিও বটে। এখন চাই বিশ্রাম।

দ্রেপুং গুম্ফা

ধর্মশালায় আমাদের খুব ভাল ঘুম হল। আমরা শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যে পৌঁছলাম কাজেই দুশ্চিন্তার আর কোন কারণই নেই। সকাল সাতটায় ভেরীর শব্দে আমাদের ঘুম ভাঙ্গল। ধর্মশালার বারান্দা থেকেই শব্দটা আসছে তাড়াতাড়ি উঠে সেদিকে দৌড়ে গেলাম, সেখানেই দেখলাম দু'জন তিব্বতী লামা রঙচঙে পোশাক ও মাথায় মুকুট পরে বিরাট বিরাট লম্বা দুটো বাঁশীতে ফুঁ দিচ্ছে। গীয়াৎসের গুম্ফাতে এরকম বাঁশী দেখেছি। এ ধরনের তিব্বতী বাঁশী আমাদের দেশে দেখিনি। সানাই-এর বিশগুণ লম্বা, বাঁশীর শেষ অংশটা একটু দূরে মাটির উপর রাখা হয়েছে। প্রায় দশমিনিট ধরে সেই শব্দধ্বনি বিভিন্ন মন্দিরের ছাদে ছাদে ধ্বনিত হয়ে থামলো। বাঁশী থামলে পর লামা দু'জন আমাদের মাথা নীচু করে শুভেচ্ছা জানালো—আমিও তাদের সাথে হাসিমুখে শুভেচ্ছা বিনিময় করলাম। বারান্দা থেকেই দূরে দেখতে পেলাম লাসা শহরের দৃশ্য। সর্বচেয়ে আগে চোখে পড়ে মহামান্য দালাই লামার প্রাসাদ পোতালা। রঙ-বেরঙের ছাদ মন্দির ও দরজা জানালা নিয়ে পোতালা পৃথিবীর গর্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই দুর্গম দেশে পাহাড়ের কোলে লুকিয়ে আছে এই আশ্চর্য যাদুপুরী।

সকালবেলাই আমরা দ্রেপুং গুম্ফায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। একজন সরকারী কর্মচারী এসে আমদের খোঁজ নিয়ে গেছেন, তিনি ছিলেন এখানকার বিদেশী নিবন্ধক দপ্তরের লোক। সেখানে লাসার প্রত্যেকটি বিদেশীদের নাম লেখাতে হবে। কতদিন থাকা হবে, কেন এসেছি, এরপর কোথায় যাবো এইসব কয়েকটা ছোটখাটো প্রশ্ন করে তিনি তার জবাব লিখে নিলেন, সেই সাথে সাথে তীর্থযাত্রীদের প্রত্যেকের নামও তিনি লিখে নিলেন, আমার নাম দেওয়া হল লামা মৌনীবাবা।

এরপর দ্রেপুং গুম্ফার মুখ্য সচিবের কাছে আমাদের ডাক পড়ল। দ্রেপুং গুম্ফার মুখ্য সচিব থাকেন আমাদের ধর্মশালা হতে একটু দূরে। তাঁর বাড়ীটা খুব চমৎকার প্যাগোডা ধরনের একটা সাজানো বাংলো। ভারিক্কি ধরনের বিরাট মানুষ। তিনি আমাদের হাসিমুখে সম্বর্ধনা জানালেন। আমাদের প্রত্যেকের হাত ছুঁয়ে মাথা নত করে তিনি অভিবাদন জানিয়ে বললেন—দ্রেপুং গুম্ফার তরফ থেকে আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি। বলাই বাহুল্য, মুখ্যসচিব মহাশয় খুব ব্যস্ত মানুষ তাঁর সহকর্মী আমাদের নাম লিখে নিলেন। তারপর আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা এক কাপ করে চা খাবেন কি ? —নিশ্চয়ই। আমরা এরই আশায় ছিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চা এল, দেখে অবাক হয়ে গেলাম ঠিক কলকাতার মতো চা আর চায়ের কাপ-প্লেটগুলোও খুব পাতলা, খুব সৌখিন ধরনের। দেখেই বুঝলাম যে আমরা লাসার অন্যতম একজন সম্মানীয় ব্যক্তির সাথে কথা বলছি। আরও অবাক হলাম চায়ের সাথে এল বিস্কুট। চা খেতে খেতেই তিনি আমাদের পথ ও শরীর সম্পর্কে খোঁজ নিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি এত কম বয়সে এখানে এসে পৌঁছেছো, নিশ্চয়ই তোমার পূর্বজন্মের কর্মফল। তিনি আমাদের সাথে আরও কিছুক্ষণ থেকে আমাদের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন তার সহকারীর উপর। সহকারীই আমাদের সম্পূর্ণ দ্রেপুং গুম্ফা ঘুরিয়ে দেখাবার দায়িত্ব নিলেন।

দ্রেপুং তিব্বতী শব্দ বাংলায় বলব ভাতের পাহাড়। দূর থেকে দেখলে সাদা রঙের এই গুম্ফাটাকে দেখায় ভাতের পাহাড়ের মতো, তাই এর নাম রাখা হয়েছে দ্রেপুং। আজকাল এর অনেক পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু আসল মন্দির ও বাড়ীগুলো আগের মতোই আছে। আমরা একটা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালাম। সহকারী ভদ্রলোক বললেন—

দ্রেপুং গুম্ফাতে শুধু তিব্বতী নয় বিদেশীরাও এখানে আসে পড়াশুনা করতে। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের উড়িষ্যা প্রদেশে 'শ্রীদংগ কতক' নামে একটা বিরাট বৌদ্ধ বিহার ছিল আজকাল সেটার কোন চিহ্ন নেই, সেই বিহারের অনুকরণেই এই দ্রেপুং গুম্ফা তৈরী হয়। আমাদের সামনের এই বাড়ীতে নেপালী ছাত্রা থাকে, আসুন আমি তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। আমরা আরও কাছে আসতেই ভেতর থেকে ভেসে আসা প্রার্থনা ও মন্ত্র-পাঠ আমাদের কানে এল। এ বাড়ীটা ঠিক দার্জিলিং-এর ঘুম গুম্ফার অতিথিশালার মতো। পরিচয় হতে কিছুক্ষণের মধ্যে ভেতর থেকে একে-একে সবাই এসে হাজির হল আমাদের প্রণাম করবার জন্য। অনেকদিন পর স্বজন পেয়ে আমরা খুবই খুশী হলাম। লামারা প্রত্যেকেই এই মঠ বিহার গ্রাম ও শহরের বিনিময় করে যে যার সংযোগ সূত্র বার করবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠল। তুমি কোথাকার? ওঃ, অমুক মঠের হ্যাঁ আমি সেখানে কয়েক বছর ছিলাম—কি বললে, তোমাকে দীক্ষা দিয়েছেন অমুক লামা সে আমার গুরু ভাই, তোমার বিহারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছি আমিই ....। তাদের এইসব কথাবার্তায় বুঝলাম যে আমাদের দলের প্রত্যেকটি লামাই বিশেষ জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি। গুরুজী সকলকে পরিচয় দিয়ে বললেন যে, আমি এসেছি নেপাল ও ভারতের সীমান্তবর্তী রক্সৌল নামে এক শহর থেকে। মনে মনে ভাবলাম যে, মৌনীবাবা থাকতে আমি রক্ষা পেয়েছি নয়তো এখানেই আমার আসল রূপ ধরা পড়ে যেতো। নেপালী ছাত্ররাই সহকারী লামাকে চলে যেতে বললো, ছাত্ররাই আমাদের পরিদর্শনের ভার নিয়ে নিল। তাদের সাথেই আবার বেরোলাম।

গুম্ফার মূলমন্দিরকে মাঝখানে রেখে তার চারদিকে চারটে মহাবিদ্যালয় রয়েছে। সাদা ও সোনালী রঙের দেওয়াল ও ছাদ, আর ব্যালকনি ও দরজা জানালার চারদিকে উজ্জ্বল লাল রঙের কাজ করা। প্রথম মহাবিদ্যালয়টির নাম লোসেলিং, খাম এবং

তিব্বতের পূর্বাঞ্চলের লামারা সেখানে আসেন দর্শন ও তিব্বতী সাংস্কৃতির চর্চার জন্য। দ্বিতীয় মহাবিদ্যালয়টির নাম গোমাং। ত্রত্সং (Gomang Tratsang), তৃতীয়টির নাম দেয়াং ত্রত্সং (Deyang Tratsang), চতুর্থটির নাম ঙ্গাক্পা ত্রত্সং (Ngakpa Tratsang)। ত্রত্সং কথাটির অর্থ সম্ভবতঃ আবাসিক শিক্ষাকেন্দ্র। তিব্বতের বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য নির্দিষ্ট করা থাকে ছাত্র সংখ্যা। এই ছাত্ররাই হচ্ছে তিব্বতের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। এই লামারাই ভবিষ্যতে মন্ত্রী, সচিব, সৈনিক, রক্ষীবাহিনী, ইঞ্জিনীয়ার, স্থাপতি, ডাক্তার, ধর্মনেতা ইত্যাদি পদে অনুষ্ঠিত হন। বিদেশী ছাত্রদের জন্যও এখানে বন্দোবস্ত আছে। নেপাল, ভূটান ও সিকিম থেকে যে সব শিক্ষার্থী আসে তাদের জন্য রয়েছে বিদেশী বিভাগ, তিব্বতী ছাত্রদের থেকে তাদের আলাদা করে রাখা হয়েছে।

দ্রেপুং গুম্ফার ছাত্র সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। এই দশ হাজারের সকলেই এখানে থেকে পড়াশুনো করে। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না—বলতে গেলে লাসার মধ্যে এ এক বিরাট শান্তিনিকেতন। প্রত্যেকটি মহাবিদ্যালয়ের প্রধানকে বলা হয় খেম্পো (Khempo) , এরকম চারজন খেম্পোর মধ্যে যিনি বয়সে ও পাণ্ডিত্যে শ্রেষ্ঠ তিনিই দ্রেপুং-এর সর্বপ্রধান কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের যেমন ভাইস চ্যান্সেলর। ছাত্রদের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য দু'জন শান্তি অধিকর্তা নিয়োজিত আছেন তাদের বলা হয় শালিংগো (Shalingo), বলা যায় তারাই দ্রেপুং-এর দারোগা।

মহাবিদ্যালয়গুলো সবই প্যাগোডা ধরনের। বলাই বাহুল্য, তিব্বতের এই অঞ্চলটি সমতল, চারদিকে গাছ-গাছড়ায় ভর্তি, এখন সবে শীত গিয়ে গরম শুরু হয়েছে খুব শীগগীরই এখানকার বাগানগুলো ভর্তি হয়ে যাবে ফুলের বাহারে।

তীর্থযাত্রী অর্থাৎ ধর্মশালায় যারা থাকেন প্রথম তিনদিন তাদের বিনা পয়সায় খাওয়ানো হয়, তিনদিন পর বিশেষ অনুমতি নিয়ে আরও চার দিন থাকা যায়, তারপরও থাকতে হলে এখানকার পুরোহিতদের সাথে থেকে ধর্মশিক্ষা নিতে হবে। সাধারণতঃ লোকেরা একদিন দু'দিনের বেশী থাকে না। ধর্মশালায় দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া করে আবার বেরিয়ে পড়লাম বাকী অংশটা দেখবার জন্য।

বিকেলের দিকে আমরা আবার প্রধান সচিবের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি চীনা কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন এর কারণ কি কিছুই আমরা বুঝলাম না। অবশ্য বুঝবার প্রয়োজনও নেই। প্রধান সচিব অবশ্য আমাদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন—কিছু মনে করবেন না হান্‌দের সাথে আমরা চুক্তিবদ্ধ নতুন কেউ এলেই তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হয়। অবশ্য এখানকার হান্ কর্তৃপক্ষ আপনাদের বিষয় ভালোভাবেই অবগত আছেন। বিভিন্ন কারণে আজকাল বিদেশী তীর্থযাত্রীদের এখানে আসাও প্রায় বন্ধ হবার যোগাড়। যাই হোক সে বিষয়ে আর বেশী কিছু না বলাই ভালো। এই বলে তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তারপর বললেন—চলুন আপনাদের মূল মন্দিরের অবলোকিতশ্বরকে দর্শন করিয়ে আনি।

দ্রেপুং-এর মূল মন্দিরটি বিরাট,—অসংখ্য স্ট্যাচু আর ফ্রেস্‌কোতে ভরা, তাদের বর্ণনা করার মতো জ্ঞান আমার নেই। মন্দিরে প্রবেশের আগেই আমরা সাতবার দণ্ডি কেটে মন্দির পরিক্রমা শেষ করলাম। তারপর মণিমন্ত্র জপতে জপতে আবার সাতবার প্রার্থনাচক্র ঘুরিয়ে মন্দিরের চারদিকে ঘুরলাম। শীতের দেশ না হলে গলদঘর্ম হয়ে যেতাম, তারপর ওম্—মানে—পাদ্‌মে-হুম জপতে জপতে মন্দিরে প্রবেশ করলাম। চতুর্বাহু বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল—মহাধ্যানী চতুর্ভূজ সত্যস্রষ্টা কর্মফল নামক সেই দেবমূর্তির শ্রীচরণে আমরা সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লাম। তারপর প্রার্থনা শুরু করলাম —

হে বিশ্ব কর্তা
জগৎ পিতা তুমিই
এই বরফের দেশের মালিক,
তুমিই এই অসীম নীলাকাশের দেব
মন্ত্রের রাজা, ছয় শব্দের মালিক
পদ্মধারী, স্থাবর ও জঙ্গমের অধীশ্বর।
হে অবলোকিতেশ্বর তুমিই আলোর স্রষ্টা,
ত্রিলোধকর ত্রিতাপ দূর করে
তুমিই আনো আলোক।
দুঃখ দুর করে তুমিই আনো আলো,
কর্ম ফল হরণ করে তুমিই দেখিয়েছো
মুক্তির আলো, তুমিই সম্ভোগকায়া
তুমিই হৃদয়ের আলোক স্বরূপ
অধিষ্ঠাত্রী দেব তোমাকে বরণ করি।

বিরাট সেই বুদ্ধ মূর্তিটা অসংখ্য তাংখা, ও কাপড়ে ঢাকা, তারই সামনে বেদীর উপর রয়েছে ছোট ছোট স্টাচু, আর পূজার বিভিন্ন সামগ্রী, ঘিয়ের প্রদীপের ঠিক সামনেই অনেকগুলো বাটিতে রয়েছে শান্তি জল আর একটা বিরাট পাত্রে রয়েছে নৈবেদ্য স্বরূপ চাল। আর অসংখ্য পুস্তক তো বটেই। মন্দিরের পূজো সেরে আমরা বাইরে এলাম। সচীব মশায় আমাদের সেখানে পৌছে দিয়ে চলে গেছেন। দ্রেপুং গুম্ফাতে গুরুজী এক বছর ছিলেন কাজেই এখানকার অন্যান্য বিষয়ে তিনিই বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।

আমরা দ্রেপুং-এ তিনদিন থাকবো অর্থাৎ যতদিন বিনা অনুমতিতে থাকা যায়। তারপর সম্পূর্ণ সুস্থ দেহ ও মনে লাসায় ঢুকবো কাজেই এ ক'দিন দ্রেপুং গুম্ফার অন্যান্য বিষয় জানবার পক্ষে সুবিধাই হবে। আমি এখানকার অন্যান্য বিষয়ে যতটা সম্ভব জানতে লাগলাম।

তিব্বতে প্রথম পা দিয়ে বুঝেছি যে এটি একটি পুরোহিত শাসিত রাজ্য। যে কোন সরকারী পদের কর্মচারী মাত্রেই পুরোহিত অর্থাৎ লামা। দ্রেপুং-এর পৌছবার পর সে বিষয়ে আরও বিশদ জানতে পারলাম।

তিব্বতের গুম্ফাগুলোই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান অধিকার করেছে। লাসার উত্তর-দক্ষিণ ও পশ্চিমে তিনটি প্রধান গুম্ফা আছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দ্রেপুং, তারপর দক্ষিণের সেরা ও উত্তরের গান্‌দেন। সেরা লাসার দেড় মাইল উত্তরে আর গান্‌দে লাসার পঁয়ত্রিশ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। দ্রেপুং-এর শিক্ষার্থী ও লামারা ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত আর প্রত্যেক বাড়ীর আলাদা আলাদা মন্দির বাগান আর পাকশালা আছে। রোজ সকালে এবং দুপুরে খাবার পর তারা একসাথে জমায়েত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করে কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। খাওয়ার মধ্যে মাখন চা আর ঝোলই প্রধান। বিকেল বেলা শিক্ষার্থীরা এদিক ওদিক ঘোরবার সময় পায়, তা ছাড়া সব সময়ই পুঁথির মধ্যে তাদের সময় কাটে। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে এরা সম্পূর্ণ নিরামিশ নয়। প্রাণিহত্যা নিষেধ তাই মঠ ও বিহারবাসীরা কেউ স্বহস্তে প্রাণিহত্যা করে না, লাসায় নিম্নজাতের অনেক তিব্বতী আছে মুসলমানেরও অভাব নেই তারাই লামাদের হয়ে সে কাজটা করে, লামারা সেবা করেন মাত্র।

ছাত্রী কেউ নেই কিন্তু ছাত্রদের অধিকাংশই এসেছে গরীব ঘর থেকে—বলতে গেলে তিব্বতী ত্রাপারা সবাই বিনা বেতনে পড়াশুনো করে। অন্যান্যরা যাদের অভিভাবকরা একটু স্বচ্ছল তাঁরা মাঝে মাঝে মাখন, বার্লি বা ঐ ধরনের কিছু দিয়ে গুরু দক্ষিণা দেন। তিব্বতে সরকারই আসলে সব ব্যয়ভার বহন করেন। আমার ধারণা ছিল যে লামারা ধ্যান ধারণা নিয়েই সময় কাটান, কিন্তু এখানে এসে আমার সে ধারণা পাল্টে গেল।

লামাদের বলা হয় জীবন্ত বুদ্ধ তাদের কাজ দেখলেই সে বিষয় আর কোন সন্দেহ থাকে না। ছোট ত্রাপা বা সাধারণ লামাদের জীবন খুবই কষ্টদায়ক। বারো বছরের একটা ছোট লামা বা ত্রাপার কথা ধরা যাক। তাকে উঠতে হয় খুব ভোরে।এই শীত ছেড়ে উঠেই চোখ রগড়াতে রগড়াতে বিছানা গুছিয়ে আসতে হয় প্রার্থনা ঘরে। অধিকাংশ সময়েই সে ঘরগুলো খুব ঠান্ডা, তাদের পোশাকগুলো খুব গরম নয়, পায়ে অধিকাংশ সময়ে যে উলের জুতো থাকে তার থেকে আঙুলগুলো বেরিয়ে গিয়ে ইঁদুরের মতো নড়াচড়া করে, প্রার্থনার পর তাদের পড়তে বসতে হয়। তাদের ঘরগুলো খুব ছোট ছোট কোনো রকমে একজনের শোওয়া চলে। যাদের ভাগ্য খুবই ভাল তাদের ঘরের জানালা আছে আর আধিকাশ ঘরগুলোই জানালা ছাড়া। প্রদীপের আলোতে কষ্ট করে পড়তে হয়। বছরখানেক হল দ্রেপুং গুম্ফায় ইলেকট্রিসিটি এসেছে কিন্তু সব ঘরে আলো যেতে এখনো অনেক দেরী। পড়াশুনোর জন্য এদের যেসব বই ব্যবহার করতে হয় তার এক-একটির ওজন প্রায় আড়াই থেকে তিন কিলোগ্রাম পর্যন্ত। এ· টি· দেবের পুরু ডিক্‌সনারি সে তুলনায় আয়তনে কিছুই নয়। মই বেয়ে উপরে উঠে সেইসব বইগুলোকে নামাতে হয় একবার যদি মই উল্টে পড়ে তাহলে বইয়ের তলায় চাপা পড়েই তাদের ইহকালের লীলা শেষ হবে। সকাল সাতটায় পড়তে বসে বেলা দশটা পর্যন্ত এক নাগাড়ে পড়া চালিয়ে যেতে হয়, সেই সাথে সাথে ধ্যান ও পূজাপদ্ধতি তো আছেই! দুপুরবেলা বাগানের কাজ, মন্দির পরিষ্কার, বাড়ীঘর ঝাঁট

দেওয়া, তারপর আবার পড়াশুনা। পড়াশুনা ঠিকমতো না করলে খেতে হয় কানমলা ও লামাদের গাট্টা। শীতের দিনে ছোটদের জীবন আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠে।

লামাদের মধ্যে অনেকের ডানায় ভলান্টিয়ারদের মতো লালা ফিতে বাঁধা। তারা হচ্ছে গুম্ফার আতঙ্ক। তাদের চলতি কথায় বলে ডব্-ড্‌ব। কোন রকমে নিয়মের একটু এদিক-ওদিক হলেই মাথায় পড়বে তাদের ডাণ্ডা। দ্রেপুং এবং সেরা গুম্ফার আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানকার সেনাবাহিনী। তিব্বতের একমাত্র এই দুটো গুম্ফাতেই লামাদের সেনাবাহিনী আছে। সেনাবাহিনীর সেনারা সবাই লামা থেকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে যাদের স্বাস্থ্য খুব ভাল আর দেখতেও খুব সু-পুরুষ অথচ লেখাপড়ায় যাদের মাথা নেই তাদেরই নেওয়া হয় এই সেনাবাহিনীতে। তাদের আর এক নাম ধর্ম-সেনা। প্রত্যেক বছর দ্রেপুং আর সেরা গুম্ফার সেনাবাহিনীদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের প্রতিযোগিতা হয়। দড়ি টানাটানি, কুস্তি, বালিতে পা দিয়ে গর্ত করা, দৌড় এগুলোই প্রধানতঃ প্রতিযোগিতার বিষয়।

তিব্বতের রাজনীতির মূলেই রয়েছে দ্রেপুং, সেরা ও গান্‌দেনের প্রভাব। সেরাতে আছে প্রায় পাঁচ হাজার লামা আর গান্‌দেনে আছে প্রায় তিন হাজারের মতো লামা। তিব্বতের প্রধান শাসক হচ্ছেন দালাই লামা। তিনি এখন ছোট কিন্তু সেই নাবালক দালাই লামার প্রতিভূ হিসেবে রাজ্য শাসন করছেন তার চারপাশের ধর্মগুরুরা। তিনটি গুম্ফা তিব্বতের তিনটি ভিত্তিপ্রস্তর, মহামান্য দালাই লামার দরবারে আছেন আটজন মন্ত্রী, তিনটি গুম্ফার প্রধানরা থাকেন উপদেষ্টা হিসেবে, রাজ্যের সচিব আর কয়েকজন উচ্চ শ্রেণীর লামাকে নিয়ে তৈরী হয়েছে পরিষদ। পরিষদের যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে দ্রেপুং, সেরা ও গান্‌দেন গুম্ফার প্রধান পুরোহিতদের মতামত ও পরামর্শের প্রয়োজন। প্রত্যেক বছর মহামান্য দালাই লামা তিব্বতের বাৎসরিক লামা-সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় এবং সেই সাথে সাথে বিতর্ক হয় প্রচুর। সেই সময় দালাই লামা এই দ্রেপুং গুম্ফাতেই অবস্থান করেন। সেই সময়ই হয় ধর্মীয় সমাবর্তন উৎসব।

দ্রেপুং গুম্ফার লামারা সবাই খুব সিরিয়াস, একমাত্র খাবারের সময় ছাড়া আর কখনও মনে হয় এরা হাসে না। সাধারণ শিক্ষা ছাড়া দ্রেপুং গুম্ফায় কিছু কিছু কুটির শিল্পও শিক্ষা দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে উল্লেযোগ্য পশমের কাজ, সেলাইয়ের কাজ, মাখন তৈরী ও তাঁতের কাজ। গুরুদের উপর এদের ভক্তিটা আন্তরিক বলে মনে হল না। সেটা ভয় মিশ্রিত সুর। হয়তো লামাদের জীবনটাই এরকম সুখ পেতে হলে দুঃখটা বরণ করতেই হবে। আমি মৌনী বটে কিন্তু আমার সব ইন্দ্রিয়কে সজাগ রেখে জানতে লাগলাম এই পুরোহিত শাসকদের আভ্যন্তরিক রহস্য।

লামা ও শিক্ষা ব্যবস্থা

তিব্বত পুরোহিত প্রধান দেশ।

আমি আগেই লিখেছি যে দ্রেপুং সেরা এবং গান্‌দেন এই তিনটি গুম্ফা হচ্ছে তিব্বতের শিক্ষা জগতের পীঠস্থান। ছোট দশ বছরের ত্রাপা বা দাবা থেকে শুরু করে আশী বছরের বয়স্ক লামা পর্যন্ত সকলেরই শিক্ষার স্থান। কিভাবে একটা শিশু ভবিষ্যতে লামা পর্যায়ে উন্নীত হয় তারই সম্পর্কে দু'চার কথা লিখতে বাধ্য হচ্ছি।

লামা শব্দের অর্থ আমাদের ভাষায় বলবো সাধু অথবা মহাত্মা। একটি শিশু (বালক) লামা হয়েই জন্মায় না। তার পরবর্তীকালের জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধি অনুসারে তাকে পদবী দেওয়া হয়। সেই পদবীর সাথে অনেকেদেহত্যাগকারী কোন লামার যোগসূত্র খুঁজে বার করে তার পুনর্জন্ম বলে প্রচার করা হয়। মহামান্য দালাই লামা এবং পাঞ্চেন লামাই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

শিশুর জন্মমাত্র পিতা-মাতা ঠিক করে ফেলে যে সে তাদের ছেলেকে মঠে পাঠাবে কি না, যেহেতু মঠগুলোই হচ্ছে তিব্বতের একমাত্র শিক্ষাকেন্দ্র। সেই হেতু পুত্র সন্তানকে সেখানে পাঠানোই হচ্ছে ভবিষ্যতের উন্নতির পথ। পুত্র সাত আট বছর বয়স হওয়া মাত্র পিতা বা অভিভাবকেরা স্থানীয় গুম্ফার অধ্যক্ষের সাথে যোগাযোগ করে। তারপর অধ্যক্ষ ছেলেটিকে দেখে একটা দিন ধার্য করেন তার ভর্তির জন্য। অবশ্য ভর্তি হবার জন্য ছেলেটির ভালো স্বাস্থ্য আছে কি না সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে নেন। গুম্ফার অধ্যক্ষ যদি ছেলেটির অভিভাবককে চেনেন তাহলে তো কথাই নেই যদি পরিচয় না থাকে তাহলে গুম্ফা পরিষদ এবিষয়ে খোঁজ খবর নিয়ে থাকেন। তিব্বতে বা বৌদ্ধ ধর্মে সাধারণতঃ জাত বিচার নেই। উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর কোন প্রশ্ন নেই। তবে কামার ও চণ্ডালদের শিশু-পুত্রদের সাধারণতঃ গুম্ফা পরিষদ গ্রহণ করেন না। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে যে বৌদ্ধ ধর্মে প্রাণী হত্যা নিষেধ। কামারেরা লোহার অস্ত্র তৈরী করে যুদ্ধ বা প্রাণিহত্যার জন্য, আর আদালতের মুণ্ডচ্ছেদকারীদেরও ওই একই কারণে সমাজের নিম্নে পর্যায়ে স্থান দেওয়া হয়েছে।

গুম্ফার অধ্যক্ষ একবার ভর্তির আদেশ দিলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভর্তি করানো হয়। যাদের বাড়ী গুম্ফার কাছাকাছি তারা দৈনিক স্কুলের মতো যতায়াত করতে পারে। যদি অভিভাবক তার ছেলেকে এই মুহূর্তে ছাড়তে রাজি না হন তাহলে আরও কয়েক বছরের জন্য বাড়ীতে অভিভাবকের কাছে থেকে যাতে পড়াশুনো করতে পারে সে বিষয়ে

পরামর্শ দেন। অভিভাবক যদি এই প্রথম শিক্ষার দায়িত্ব নেন তাহলে ভালোই নয়তো গ্রামের কোন লামা পাঠশালার মতো করে শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব দিয়ে থাকেন।

ছাত্রাবস্থায় এই প্রথম সোপানকে বলা হয় গে-থ্রুক, আর পাঠশালার এইসব ছোটখাটো লামাদের বলা হয় গে-গান। গে-গান লামারা সংসারী, গৃহী বা ব্যবসায়ীও হতে পারে, তাতে বাধা নেই। কয়েক বছর গে-গানের কাছ থেকে শিক্ষালাভের পর সে যখন গুম্ফায় বসবাসের জন্য আসে, তখন তাকে আবার গুরু সামনে নতুন করে পরীক্ষা দিতে হয়। গুম্ফায় বরাবরের জন্য প্রবেশের সময়ই হয় প্রথম দীক্ষা। মুণ্ডিত মস্তক ও গৈরিক বস্ত্র এই সময় থেকেই পড়তে হয়। অভিভাবকের সাধ্য অনুযায়ী গুরুদক্ষিণা এই সময়ই দিতে হয়। অনেক সময় গুরুদক্ষিণার উপর নির্ভর করে ছেলেটির ভবিষ্যত।

গুম্ফার অধ্যক্ষের উপর ছেলেটিকে মানুষ করার পুরো দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। ছোট ত্রাপা আস্তে আস্তে নিজের সম্পর্কে সচেষ্ট হয়ে উঠে, গুরু সেবাও তার শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। এইভাবে আরও কয়েক বছর কাটে, তেরো-চোদ্দ বছরে তাকে বসতে হয় আবার পরীক্ষায়। এই পরীক্ষায় পাস করলে তাকে গে-থ্রু-ক থেকে গে-নীয়েন পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। গে-নীয়েন শ্রেণী থেকে শুরু হয় সত্যিকারের তপস্যা। এই সময়ে তার স্বভাব-চরিত্র ও শৃঙ্খলার উপর ভীষণ চাপ দেওয়া হয়। তিন চার বছর যাবৎ গে-নীয়েন শ্রেণীর পড়াশুনা শেষ হলে তাকে পরীক্ষায় বসতে হয়। এই পরীক্ষাটা আমাদের দেশের ম্যাট্রিক বা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। পড়াশুনার বিষয়গুলোর মধ্যে প্রধানতঃ থাকে ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, অঙ্ক, ভুগোল। পূজা-পাঠ ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উপর বিশেষ চাপ দেওয়া হয়।

গে-নীয়েন পর্যায় থেকে আরও উঁচুতে অর্থাৎ মহাবিদ্যালয়ে যেতে হলে তাকে অনেক রকম পরীক্ষা দিতে হয়, এবং পণ্ডিতদের সাথে বিতর্ক প্রতিযোগিতাতেও অংশ গ্রহণ করতে হয়। সব রকম পরীক্ষায় পাস করলে পর তাকে পুরোহিত পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। এই নতুন সম্মানের জন্য সমাবর্তন উৎসব ও লামা পর্যায়ের শেষ উপনয়ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়। লামাদের এই পর্যায়কে বলা হয় গেট্-সুল্ বা গেত্শুল্।

গে-নীয়েন পরীক্ষায় জন্য নবীশকে যে সব ব্রত পালন করতে হয় তার মধ্যে পালনীয় হচ্ছে প্রাণিহত্যা, অপহরণ, ব্যভিচার, মিথ্যাকথন ও সুরাপান থেকে বিরত থাকা। গুম্ফা বা মঠের প্রত্যেককেই সাধু জীবন-যাপন করতে হয় অর্থাৎ পঞ্চব্যসন থেকে দূরে থাকতে হয়। যেমন অকালভোজন, নৃত্যগীতাদিতে অনুরাগ, গন্ধমাল্যাদি ব্যবহার, কোমল শয্যায় শয়ন ও সোনা-রূপা টাকা-পয়সা বর্জন, এগুলো বৌদ্ধ ধর্মের অবশ্য পালনীয় প্রতিজ্ঞা। গেত্-শুল্ পর্যায়ের জন্য ছাত্রকে গ্রহণ করতে হয় ছত্রিশটা প্রতিজ্ঞা। সে প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য চাই শারীরিক ও মানসিক গঠন। শরীর যখন সর্ব রোগমুক্ত থাকে তখনই মন হালকা হয় নিশ্চিন্ত মনে পরম জ্যোতির্ময় মহাবুদ্ধের ধ্যানে বসতে পারে।

গেত্-শুল্ পর্যায়ের লামারা সব রকমের সরকারী সাহায্য ও সুযোগ সুবিধার অধিকারী। এই সময় দু'চার বছর এদিক-ওদিকে কিছু যায় আসে না, যেটা সবচেয়ে প্রয়োজন সেটা হচ্ছে মনের সংযম। যার মধ্যে অহিংসা সত্য, ধর্ম ও দম আছে সেই প্রকৃত লামা। গেত্-শুল্'র বৃত্তির অধিকারী হওয়া তিব্বতীদের জীবনের এক শুভ ও পবিত্র অধ্যায়। এই সময় ছাত্রের পরিবারের সবাই আনন্দ উৎসবে মেতে উঠে। গেত্-শুল্'-এর সাধারণ ছাত্ররা অর্থাৎ যারা লেখাপড়ায় মেধাবী নয় তাদের অভিভাবকেরা আসেন বিভিন্ন রকমের অনুরোধ নিয়ে। এই ক্ষেত্রে অভিভাবক যদি হোস্টেল খরচা দিতে সমর্থ হন তাহলে ছাত্রদের রাখার কোন অসুবিধা হয় না। তিব্বতী লামাদের প্রায় আশীভাগই এইখানে থাকতে বাধ্য হয়। যে সব গেত্-শুল্'র ছাত্ররা টাকা দিয়ে গুম্ফার পড়াশুনা করে তাদের সংখ্যাই বেশী। এই টাকাটা গুম্ফার উন্নতিকল্পে ব্যবহার করা হয়। গুম্ফার ছোট্ট ঘরের মধ্যে শুরু হয় চিরমুক্তির কঠোর পরিশ্রম। গেত্-শুল্ অবস্থা থেকেই তাদের লামা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তবে তাদের পূর্ণ স্বীকৃতি এখনও অনেক দূর। এই সময় তাদের বলা হয় ত্রাপা, বয়েস এখনও কুড়ির নীচে। হোস্টেলে তাদের নিজস্ব জিনিসপত্রের মধ্যে থাকে দুটো বিরাট চাদর, লামার পোশাক, দুটো কম্বল, প্রদীপ, একটা বাটি একটা গ্লাস একটা থালা ও কয়েকটা বই। এই সময় থেকেই ত্রাপার উপর পড়ে মন্দিরের দায়িত্ব। মুণ্ডিত মস্তকের জন্য দায়িত্বভার দেওয়া থাকে গুম্ফার নাপিতের উপর।

লামাকে এই সময় থেকেই পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কাংগীউর মুখস্ত করে তার ব্যাখ্যা ও টীকা গুরুর কাছ থেকে শিখতে হয়। ধর্মপুস্তকগুলোর প্রতিলিপি তৈরী করা ও বিভিন্ন ধরনের মণ্ডলা অঙ্কনের উপরও চাপ দেওয়া হয়। আধ্যাত্মিকতার গূঢ় রহস্য নিয়ে বিতর্ক চলে ছাত্রদের মধ্যে, গুরুরা থাকেন বিচারকের আসনে। তর্কে যারা জয়ী হয় তাদের সম্মানীত করা হয় গেলং-মা পদবী দিয়ে। কুড়ি বছর পর থেকে লামাকে রাজ্য শাসনের জন্য অথবা গুম্ফার দায়িত্ব নেবার জন্য বিশেষ আইনসংক্রান্ত বিষয়ে অথবা দর্শন নিয়ে চর্চা করতে হয়। নির্বাণ লাভের জন্য সত্যিকারের সাধনাও শুরু হয় এই অবস্থা থেকে। যাঁরা রাজ্য শাসনের দিকে এগিয়ে যান তাঁরা বিবাহ করে সংসার ধর্ম পালন করেন। আর যাঁরা অধ্যাত্মমার্গের দিকে যান তাঁরা বেছে নেন চিরকুমারের কঠোর পথ।

এটা হচ্ছে তিব্বতের মোটামুটি ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা। লাসা হতে যে সব গ্রাম অনেক দূরে সেখানে গুম্ফার অধ্যক্ষরা স্থির করেন ছাত্রদের ভবিষ্যৎ। তবে যেমন করেই হোক রাজধানীর যে কোন রকম উচ্চ পদের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করা হয় দ্রেপুং সেরা ও গান্দেন গুম্ফা থেকে।

তিব্বতের ধর্ম ও ইতিহাস

তিব্বতে প্রবেশের পর থেকেই যত দেখছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি, এরা সবাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। ভগবান বুদ্ধ ছিলেন বৈদিক যাগ যজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডের বিরোধী। তিনি ছিলেন জাত বিচারের বিরুদ্ধে, মানুষমাত্রেই নির্বাণলাভের অধিকারী। ব্রাহ্মণ হয়েও যারা ব্রহ্ম সম্পর্কে কিছুই জানে না, ভগবানের বিষয়ে উপলব্ধি না করে যারা শুধু ভগবান ভগবান বলে শুকনো মন্ত্র উচ্চারণ করে, মাছ মাংস খেয়ে যারা জীবে-প্রেম ধর্ম শেখায় তাদের বিরুদ্ধে ছিল ভগবান বুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিযোগ। যাগ-যজ্ঞের মাধ্যমে পুরোহিত পোষণের তিনি ছিলেন বিরোধী। পূজার্চনা ও অসংখ্য দেব-দেবীদের মেলায় যখন অন্তর্যামী নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন, সেই সময়ই মহাবতার বুদ্ধদেব এগিয়ে এলেন।অন্ধকারে যারা হারিয়ে যাচ্ছিল তাদের তিনি দেখালেন আলো। তিনি সকলকে বুঝিয়ে দিলেন এই দুনিয়ার আনন্দ-রহস্য। তিনি বললেন—পথ হারাইও না। জীবনে মোক্ষ ব্যতীত অন্য কিছু কাম্য নেই। অন্ধকারে পথ ভুল করো না, মুক্তিমার্গে চল, সেখানেই আছে সচ্চিদানন্দ।

তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের রূপ সম্পূর্ণ আলাদা। প্রত্যেকটি মন্দিরের বেদীতে বুদ্ধদেবের বিভিন্ন মূর্তির সাথে রয়েছে অসংখ্য হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি। কালী, তারা, দুর্গা, ভৈরবী, ব্রহ্মা, সরস্বতী এই ধরনের আরও বহু দেব-দেবীর মূর্তি আমি নিজের চোখেই বিভিন্ন গুম্ফায় দেখেছি। তাছাড়া সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এখানকার বৌদ্ধ ধর্মের সাথে তন্ত্র-সাধনার অদ্ভুত মিশ্রণ। এর কারণ জানতে হলে আসতে হবে পূর্ব ইতিহাসে অর্থাৎ কিভাবে বৌদ্ধ ধর্ম এদেশে প্রভাব বিস্তার করল। সংক্ষেপে তারই আলোচনা করা যাক।

তিব্বতের আদি ধর্ম হচ্ছে বন্-পা। মারণ-উচাটন-পিশাচ-সিদ্ধ নরবলি এইসব নিয়েই ছিল তাদের কারবার। সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে তাদের থেকে সুযোগ সুবিধা আদায় করে অনেক অসাধু সাধুর পর্যায়ে বসে ধর্মের নামে ফাঁদ পেতে বসেছিল। তিব্বতের সাধারণ মানুষরা বরাবরই সরল ও সহজ, তারা এইসব বিভীষিকার বিরুদ্ধে কোনোদিনই মাথা তোলবার সাহস পেতো না। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে জাতীয় বা উপজাতীয় নেতারা মাথা তুলে উঠে দাঁড়াতো, তাদের মধ্যে যারা শক্তিশালী তারা নিজেদের রাজা বলে ঘোষণা করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজত্ব চালাতো, আবার অন্য শক্তির কাছে হেরে গিয়ে মাথা নত করতো। সেই সময়কার সঠিক ইতিহাস এখনও পাওয়া যায়নি। কিন্তু যেই রাজ্য শাসন করুক না কেন, ধর্মটা ছিল বন্-পা, অনেকটা নিম্ন

মার্গের তন্ত্রের মতো। তান্ত্রিক ধর্মের আদি হচ্ছে দেহ তত্ত্বকে জেনে তারপর আস্তে আস্তে মন শব্দ স্পর্শ রস গন্ধকে জানা, তারপর আরও উর্ধ্বে উঠে পঞ্চমহাভূত ভূত ও জাগতিক পদার্থের উৎস। খুঁজে বার করা। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরা ও অপরা বিদ্যার মাধ্যমে প্রকৃতি ও পুরুষের মিলন রহস্য জানা। কিন্তু সে পথ যেমন জটিল ঠিক তেমনি কঠিন। তাই অনেকেই পথভ্রষ্ট হয়ে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন রহস্যের মূল সূত্র না ধরতে পেরে দেহ-তত্ত্ব নিয়েই খুশী হল। শক্তিরূপী মায়ের সৃজনী শক্তির সন্ধানের কঠিন পথ ছেড়ে দিয়ে রূপ-রস-গন্ধের আকর্ষণে থেমে যেতো সেখানে। অথবা সচ্চিদানন্দের বদলে তারা ভোগানন্দ পেয়েই ক্ষান্ত হতো। এই ভাবেই তিব্বতে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য বন্-পথ, তন্ত্র-পথ। তন্ত্রের আলোর পথে না গিয়ে তাদের অধিকাংশই বেছে নিত অন্ধকার পথ, অর্থাৎ একটা দেহ ও তার আত্মাকে নিয়ে যত রকম খেলা খেলা যায় তার কোনোটাই বাদ ছিল না। তিব্বতী রাজা বা নেতারাও এই ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বন্-পা যদিও তন্ত্রের মতো কিন্তু তন্ত্রের সঙ্গে তার তফাৎ ছিল বিরাট। বন্-পা ধর্মে ছিল ড্রাগন ও পিশাচদের রাজত্ব। এই সময়কার তিব্বতের পুরা ইতিহাস আজও পাওয়া যায়নি। খৃস্টাব্দ সপ্তম শতকে অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধের শুভ আর্বিভাবের প্রায় বারোশ' বছর পর বুদ্ধদেবের বাণী প্রথম তিব্বতে প্রচারিত হয়। তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের মূলে ছিলেন তদানীন্তন রাজা স্রোং-সান্ গাম্পো। তারই নামানুসারে তিব্বতী মঠগুলোকে বলা হয় গোম্পা বা গুম্ফা।

প্রায় ৬৫০ খৃস্টাব্দে তিব্বতের মহান্ প্রতিপত্তি রাজা স্রোং-সান্ গাম্পো (Srong-Tsan-Gampo) তিব্বতের সীমাকে সুদূর চীন ও দক্ষিণে নেপাল পর্যন্ত বিস্তারের জন্য এই দুটো দেশ আক্রমণ করেন। চীন আক্রমণ করে তিনি বিজয়ী হন এবং চীন আক্রমণ থেকে সেখানকার রাজকন্যাকে বিয়ে করে তিব্বতে নিয়ে আসেন। চীন দেশ সেই সময় ছিল ভারতের মিত্র, বৌদ্ধ ধর্ম সেই সময় চীনদেশের রাজ ধর্ম হিসেবে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। চীনা রাজকন্যাকে বিবাহের সাথে সাথে তিনি সেখানকার ধর্মকেও বরণ করে আনলেন তিব্বতে। তারপর ফিরে এসে তিনি আক্রমণ করলেন নেপাল। নেপালের রাজা তার আক্রমণের ধাক্কা সামলালেন সন্ধি চুক্তি করে। সেই সন্ধি অনুসারে, নেপাল রাজ অংশু বর্মা তাঁর মেয়ে ভৃকুটিকে সমর্পণ করতে বাধ্য হলেন তিব্বতরাজ স্রোং-সান্-গাম্পোর হাতে। বলাই বাহুল্য, সম্পূর্ণ নেপাল তখন ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

এইভাবে রাজা স্রোং-সান্-গাম্পো চীন ও নেপাল থেকে রাজকন্যাদের সাথে সাথে আনলেন বৌদ্ধ ধর্ম। রাজার উপর এই দুই রাণীর প্রভাব ছিল খুব বেশী। এই দুই রাণীর অনুরোধে ও চাপে রাজা তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মকে রাজ ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন। নেপালের রাজকন্যা সেই সময় তার সাথে বিয়ের যৌতুক হিসেবে নেপাল রাজ-প্রাসাদ থেকে অক্সোভ্য বুদ্ধের এক বিরাট মূর্তি নিয়ে এসেছিলেন। সেই স্টাচুই হচ্ছে তিব্বতের প্রথম বুদ্ধ মূর্তি। রাজা স্রোং-সান্-গাম্পো তার সম্মানার্থে লাসায় এক বিরাট মন্দির তৈরী করে সেই বিগ্রহকে স্থাপন করেন।

তিব্বতরাজ এইভাবে বৌদ্ধ ধর্মে তিব্বতকে দীক্ষিত করেন। লাসায় বুদ্ধ মন্দির স্থাপন করেই তিনি তাঁর কাজ শেষ করেননি। বৌদ্ধ দর্শন তাঁর যোদ্ধা মনকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে ফেলল, নতুন ধর্মে দীক্ষিত হয়ে তিনি পেলেন শান্তি আর আনন্দের পথ। তিনি আনন্দিত হয়ে তার অর্থমন্ত্রীকে তিব্বতের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের নিয়ে যেতে বললেন ভারতবর্ষে। বুদ্ধদেবের ভূমি থেকে শিখে আসতে হবে সত্যিকারের বৌদ্ধধর্ম। তারপর সেই ধর্মে দীক্ষিত করতে হবে তিব্বতের প্রত্যেক নাগরিককে। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য এমন চেষ্টা বোধহয় একমাত্র সম্রাট অশোক ছাড়া আর কেউ করেননি।

অর্থমন্ত্রী থন্-মি-সন্‌বোথ ভারতবর্ষে এসে মহাপণ্ডিত লিপিদত্তকে গ্রহণ করলেন আচার্য হিসেবে। তিনি নিজে শুরু করলেন বিভিন্ন পালি ও সংস্কৃত বই থেকে তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ। তাঁর সেই পালি ও সংস্কৃত থেকে বৌদ্ধ দর্শন বেদ ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অনুবাদই পরবর্তী যুগে কানজুর ও তানজুর হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছে। রাজা স্রোং-সান্-গাম্পো নিজেই তাঁর মন্ত্রী ও পরিবারবর্গকে 'ওম্ মণি পদ্মে হুম' এই বীজমন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। এই সময় থেকেই তিব্বতে শান্তি ও ধ্যানের কথা প্রথম প্রচারিত হয়।

বৌদ্ধধর্ম প্রসারের সাথে সাথে প্রাচীন বন্-পা ধর্মটা একটু দূরে সরে দাঁড়িয়েছিল মাত্র। তিব্বতের প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে ভূতের ভয় ও দৈত্য দানবদের অত্যাচারের কথা এমনভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে সহজে তার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া খুবই মুশকিলের ব্যাপার। যে সব ওঝা ও সুযোগবাদী পুরোহিতেরা বুদ্ধের শান্তি বাণীর জন্য তাদের কারবার গুটিয়ে নিয়েছিল তারা রাজা স্রোং-সান্-গাম্পোর মৃত্যুর সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল আবার জনসাধারণের উপর। রাজধর্ম বুদ্ধ বাণীকে দূরে সরাবার সাধ্য তাদের নেই তাই তারা অতি চতুরতার সঙ্গে কৌশলে, বৌদ্ধধর্মের সাথে সাথে তন্ত্র মতকে সংযোগ করে দিল। বৌদ্ধধর্ম তন্ত্রও এবং ভারতীয় ধর্ম কাজেই তাকে দূরে সরানো মুশকিল হয়ে দাঁড়াল। দুই রানী, রাজা স্রোং-সান্ গাম্পো ও তার অর্থমন্ত্রীর আপ্রাণ চেষ্টায় তিব্বতে যে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, রাজার মৃত্যুর পর, সেখানে দেখা দিল আবার ভূতের তাণ্ডব। শত চেষ্টা সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে মহাকাল ও ড্রাগনের প্রবেশকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারল না, বুদ্ধের থেকে ড্রাগন প্রীতিই যেন জনসাধারণের রক্তে মিশে গেছে। এই ক্ষেত্রে বলা ভালো যে চীনে এই সময় বৌদ্ধধর্মের মধ্যেও ড্রাগনের প্রভাব ছিল অসাধারণ। কাজেই চীনা রাজকন্যার সাথে সাথে বৌদ্ধ দর্শন ও ড্রাগন স্থাপত্য এদেশে এল। বন্-পা ধর্মীয় পুরোহিতেরা সেই সময় ভারতীয় তন্ত্র সাধনার নাম করে তাদের নিজ নিজ ধর্মকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করতে লাগল। প্রায় একশ' বছর যাবৎ বৌদ্ধ ও বন্-পা ধর্মের রেষারেষি চলতে লাগল। তারপর সিংহাসনে উপবিষ্ট হলেন স্রোং-সান্-গাম্পোর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী থ্রি-স্রোন্ ইদে-সান্ (Thri-Sron-Ide-Tsan ৭৫৫-৭৮০ খৃস্টাব্দ)। রাজা থ্রি-স্রোন্-ইদে-সান্ শাসনভার হাতে নিয়েই ফিরিয়ে আনলেন তিব্বতের ভারসাম্য। তিনি তার মহান্ পূর্বপুরুষের নাম নিয়ে পারিষদদের ডেকে বললেন—আমাদের দেশের বন্-পা ধর্ম হচ্ছে আদি ধর্ম কিন্তু বৌদ্ধধর্ম আমাদের দেশে এনেছে শান্তি। বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ করেই

আমাদের পিতৃপুরুষেরা মোক্ষ ও নির্বাণ লাভ করেছেন। কাজেই সেটাকেও ছাড়লে চলবে না। তাই এমন একজন ধর্ম নেতাকে খুঁজে বের করতে হবে যিনি এই দুই পক্ষকে সসম্মানে বিচার করে একটা মীমাংসার পথ দেখাতে পারবেন। রাজার কথা শুনে চারদিকে মন্ত্রীরা ছড়িয়ে পড়ল উপযুক্ত ধর্মীয় নেতার সন্ধানে। শুধু তিব্বতের নয় তিব্বতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ল তিব্বতের রাষ্ট্রদূত, যুদ্ধ নয় চাই শান্তি, সেই শান্তির জন্য চাই এক মহাগুরু।

অনেক খোঁজাখুঁজি ও অনেক বাক-বিতণ্ডা ও যুক্তির ঝড় পেরিয়ে শেষে রাজা খুঁজে পেলেন উপযুক্ত গুরু। এক অসাধারণ গুরুর সন্ধান পাওয়া গেল কাশ্মীরে। কাশ্মীরের মহাপণ্ডিত গুরু পদ্ম সম্ভবাকে গ্রহণ করা হল রাজ্যের আচার্য হিসেবে। গুরু পদ্ম সম্ভবা সম্মানিত হলেন তিব্বত-গুরু পদে। তাঁর নাম হল রিম্‌পোচে অর্থাৎ মহার্ঘ গুরু। অনেকে তাঁকে জানেন উরগীয়ান লামা বলে। কাশ্মীরের উরগীয়ান গ্রামে তাঁর জন্ম। গুরু পদ্ম সম্ভবার জন্ম রহস্যও অতি অসাধারণ, তিনি কোনো মানবগর্ভে জন্মাননি, তিনি সরাসরি প্রকাশিত হয়েছেন একটা পদ্মফুলের ভেতর থেকে। তিনি ছিলেন সর্বজ্ঞ পণ্ডিত।

তিব্বতে এসেই তিনি লেগে গেলেন সংস্কারের কাজে। তন্ত্র ও বেদ উভয় শাস্ত্রেই তাঁর ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য আর সেই সাথে সাথে বৌদ্ধ-শাস্ত্র তো বটেই। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ পণ্ডিত। প্রাচীন পন্থীদের সরাসরি অগ্রাহ্য না করে তিনি অনাবশ্যক রীতিগুলোকে আস্তে আস্তে দূরে সরাতে লাগলেন। তিনি জানতেন যে হঠাৎ যদি তিনি তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন তাহলে বৌদ্ধধর্মই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যুগের পর যুগ ধরে দৈত্য-দানব-ভূত-প্রেতের উপর ভিত্তি ও বিশ্বাস করে এই ধর্মটা তিব্বতীদের সংস্কারের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে, সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে এ ধর্মটাকে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। উপরন্তু তিনি নিজেও ছিলেন তান্ত্রিক, কাজেই খুব সাবধানে তিনি নিজের অভিমতটাকে তাদের মধ্যে বিতরণ করতে লাগলেন—অর্থাৎ দৈত্য-দানব ও ভূত-প্রেতকে শ্রদ্ধা সহকারে আস্তে আস্তে বশে আনতে হবে তারপর শান্তির পথ খুঁজে বের করতে হবে। একবার শান্তি এলে তারপর মুক্তি-মোক্ষ ও নির্বাণ লাভের পথ খুঁজে বার করতে হবে।

তাঁর এই ঐক্যবাদ সকলের পছন্দ হল। যারা তাঁর কথায় অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করতো তাদের পদ্ম সম্ভবা নানা রকম ঐশ্বরিক ও অলৌকিক শক্তি দেখিয়ে বশে আনতেন। দেখতে দেখতে গুরু রিম্‌পোচের নাম সারা তিব্বতে ছড়িয়ে পড়ল। প্রাচীন পন্থীরাও তাঁর কাছে এসে অলৌকিক শক্তির জন্য দীক্ষা গ্রহণ করতে আরম্ভ করলো, সেই সাথে সাথে রাজধর্ম বৌদ্ধধর্মেরও বিস্তৃতি শুরু হল। রাজা থ্রি-স্রোন্-ইদে-সান্ পদ্ম সম্ভবার গুণ ও অলৌকিক শক্তির প্রতিভা দেখে রাজ্যের কোষাগার উন্মুক্ত করে দিলেন ধর্ম প্রচারের জন্য। এই সময় বহু তিব্বতী পণ্ডিত ভারতবর্ষে আসেন ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃত চর্চার জন্য। বিখ্যাত পণ্ডিত শান্ত রক্ষিত এই সময়ই তিব্বতে যান। রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় এই সময় চীন ও ভারতবর্ষ থেকে পণ্ডিতেরা আসতেন ধর্ম ও দর্শন

সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার জন্য। এই সময়েই বৌদ্ধ ধর্ম প্রসঙ্গে লাসার রাজপ্রাসাদে এক বিরাট বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় পণ্ডিত কমলাশীল চীনা পণ্ডিতদের পরাস্ত করেন। পণ্ডিত কমলাশীলের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে রাজা খুব খুশী হলেন বটে কিন্তু চীনারা লজ্জায় ও অপমানে বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে ফেলল, তারই কিছুদিন পর এক চীনা চক্রান্তের ফলে আততায়ীর দ্বারা পণ্ডিতপ্রবর কমলাশীল নিহত হন। তাঁর মৃত্যুতে ভারতীয় ভাবমূর্তির জয়জয়কার যেন আরও দ্বিগুণভাবে ছড়িয়ে পড়ল। তিব্বতের জ্ঞানীগুণীদের মধ্যে ভারতীয় দর্শন চর্চার এক বিরাট জোয়ার দেখা দিল। সম্ভবতঃ সেই সময় তিব্বতীয় ভাষায় ভারতীয় দর্শন ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের আরও অনেক অনুবাদ হয়।

গুরু পদ্ম সম্ভবার জয় জয়কার চারদিকে আরও ছড়িয়ে পড়ল। তিনি একাধারে বৌদ্ধ-ভিক্ষু, তান্ত্রিকাচার্য ও উরগীয়ান লামা হিসাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে বিভিন্ন শাস্ত্রে জ্ঞান ও দীক্ষা দিতে লাগলেন। এইভাবে তিনি জয় করলেন প্রাচীন পন্থীদের।

গুরু রিম্পোচে চারদিকে প্রচুর মঠ ও বিহার স্থাপন করলেন, আর সেই সাথে সাথে বহু তান্ত্রিক মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করলেন। তার ব্যক্তিগত জীবনটা ছিল খুবই অদ্ভুত। তন্ত্র, বেদ ও বৌদ্ধ দর্শনে তিনি ছিলেন চূড়ামণি। তার চার প্রধান স্ত্রী, অনেক উপপত্নীও নাকি ছিল। কিন্তু তাই বলে তার সম্মান বা প্রতিপত্তি এতটুকু কমেনি। তিনিই তন্ত্র ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের এক সমন্বয় ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন তিব্বতের বৌদ্ধতন্ত্র মার্গ। বুদ্ধদেবের বাণী ও উপদেশ প্রচারের জন্য তিনি প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে মোতায়েন করলেন লামা। এই লামা একাধারে রাজা ও ধর্মের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করবেন। তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের গোড়া পত্তন করেন রাজা স্রোং-সান্-গাম্পো, কিন্তু আর সেই ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেন তারই বংশধর রাজা থ্রি-স্রোন্-ইদে-সান্। এর মূলে মহামান্য গুরু পদ্ম সম্ভবার দান তিব্বতের ইতিহাসে লেখা থাকবে। তিব্বতের লামা পূজা এই সময় থেকেই শুরু হয়।

গুরু রিম্পোচে শেষ বয়সে বৌদ্ধধর্ম প্রসার ও প্রচারের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দেন। তন্ত্র থেকে তিনি আস্তে আস্তে সরে এলেন মোক্ষ ও নির্বাণের দিকে। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁরই এক প্রাচীনপন্থী (বন্‌পন্থী) সহকর্মীর হাতে তিনি নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর এই উগ্র প্রাচীনপন্থী পুরোহিতটি বহু অমূল্য তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করা সংস্কৃত গ্রন্থের বিনাশ করেন। সেইসব গ্রন্থের অনুবাদ আর পাওয়া যায়নি। গুরু পদ্ম সম্ভবার হত্যাকারীকে পরে ধরতে পেরে তার মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়।

তিব্বতে গুরু রিম্পোচ বুদ্ধাবতার হিসেবে আজও পূজিত। আমার মতে সমস্ত তিব্বতে গুরু রিম্পোচেই প্রাচীন জাগ্রত দেবতা বাংলায় যেমন মা-কালী। নী-ইংমা-পা সম্প্রদায়রা গুরু রিম্পোচেকেই সর্বাধিক সম্মানিত গুরু বা দেবতা বলে পূজা করে। গুরু রিম্পোচের দুই স্ত্রীর মূর্তিও সেই সাথে সাথে মন্দিরে স্থান পেয়েছে। প্রাচীন পন্থীদের ধাক্কা খাওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষ থেকে রীতিমত পণ্ডিতদের যাতায়াত বেড়েই চলল। এগার শতাব্দীতে রাজা ইয়ে-সেস্-অদ্ Ye-Ses-Od)-এর আমলে এক যুবক পণ্ডিতের দল ভারতবর্ষে আসেন বৌদ্ধধর্ম দর্শন শিখবার জন্য। তাদেরই আমন্ত্রণে

ভারতবর্ষ থেকেও একদল পণ্ডিত তিব্বতে যান ধর্মপ্রচারের জন্য। সে দলের নেতা ছিলেন মহাপণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর। পণ্ডিত অতিশ দীপঙ্কর তাঁর সুযোগ্য শিষ্য ব্রম্-টন্ (Brom-Ton)-এর সাহায্যে প্রবর্তন করেন কদম্-পা সম্প্রদায়। পরবর্তীকালে এই কদম্-পা সম্প্রদায়ই গেলুক্-পা নামে স্বীকৃতি পায়। দালাই লামা এই গেলুক্-পা সম্প্রদায়েরই প্রধান পুরোহিত।*

একাদশ শতাব্দীতে লাসায় গেলুক্-পা সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায় ছিল না। সবাই দালাই লামার একাধিপত্য মেনে নিয়েছিল। কিন্তু পঞ্চাশ শতাব্দীতে হঠাৎ দেখা দিল আর একটি সম্প্রদায়, যার নাম শাক্য। শাক্য সম্প্রদায় নী-ইংমা-পা ও গেলুক্পা'র মাঝামাঝি পথের পথিক। এই শাক্য সম্প্রদায় সম্রাট কুবলাই খানের পৃষ্ঠপোষকতায় অন্যান্য ছোটখাটো সম্প্রদায়কে দূরে সরিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াল। প্রবল পরাক্রান্ত চীনা সম্রাট প্রয়োজনবোধে তার সৈন্যবাহিনী নিয়েও সাহায্য করবেন বলে শাক্য সম্প্রদায়কে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাশী লামা অর্থাৎ পাঞ্চেন লামা শাক্য সম্প্রদায়ের নেতা বলে স্বীকৃতি পেলেন।

এইভাবে শুরু হল তিব্বতের দুটো প্রধান সম্প্রদায়। লাসায় দালাই লামার অধীনে গেলুক্-পা আর গীয়াৎসের পাঞ্চেন লামার অধীনে গড়ে উঠল শাক্য সম্প্রদায়। অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্ম প্রথমে ছিল নী-ইয়াংমা সম্প্রদায় স্বয়ং পদ্ম সম্ভবা ছিলেন তার গুরু। তারপর গুরু অতীশ'র অধীনে সৃষ্টি হল কদম্-পা সম্প্রদায়। তারপর দালাই লামার নেতৃত্বে গড়ে উঠে গেলুক্-পা ও পাঞ্চেন লামার শাক্য। শাক্য সম্প্রদায় পঞ্চদশ শতাব্দিতে খুব প্রবল হয়ে গেলুক্-পা সম্প্রদায়কে প্রায় পিষে ফেলার উপক্রম করে। সেই সময় তিব্বতে আবির্ভূত হল সোং-কা-পা নামে এক প্রতিভাশালী লামা। তিনি দালাই লামার কদম্-পা ওরফে গেলুক্-পা সম্প্রদায়কে জাগিয়ে তোলেন। তিনি ছিলেন একাধারে ধর্মীয় নেতা আর অন্যদিকে সমাজ সংস্কারক। সব দলীয় কোন্দল ঘুচিয়ে দিয়ে তিনি স্থাপন করলেন একনায়কত্ব। তারই আমল থেকে সম্পূর্ণ তিব্বতে দালাই লামার শাসনাধীনে আসে। অর্থাৎ ১৬৪০ খৃস্টাব্দ থেকে সম্পূর্ণ তিব্বত দালাই লামাকে প্রধান লামা ও শাসক বলে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

বিখ্যাত গান্দেন গুম্ফা এই সোং-কা-পা লামারই প্রতিষ্ঠিত। লাসায় সোং-কা-পা'র স্থান অতি উচ্চে অর্থাৎ দালাই লামারই পূর্ব জন্ম। সোং-কা-পা'ই বার বার দালাই লামার রূপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। গেলুক্-পা ও শাক্য এই দুই প্রধান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেও তন্ত্রের প্রভাব খুব বেশী। তন্ত্রকে বাদ দিয়ে আজ তিব্বতের লামা পুরোহিতদের কল্পনা করা যায় না।

পঞ্চাশ শতাব্দির পর থেকে তিব্বতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। কোন কোন সময় একটা মঠ বা মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে একটি সম্প্রদায়। তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য উরগীয়েন-পা, গান্দেন-পা, কারগীউড্-পা, কারমা-পা, দেকুং-পা, দুক্-পা, তন্ত্র মার্গ, শূন্য মার্গ, পং-পা। বাইরে

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

থেকে তাদের এই ভেদ বোঝা অসম্ভব। যেটা চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে এদের চাদরের বা টুপীর রং। তাই তাদের বলা হয় হলদে চাদর সম্প্রদায় ও লাল চাদর সম্প্রদায়। হলদে চাদর সম্প্রদায় হচ্ছে গেলুক্-পা বা দালাই লামার লোক আর লাল চাদর হচ্ছে শাক্য মুনি বা পাঞ্চেন লামার লোক। দালাই লামার সম্প্রদায়ভুক্ত লামারা সাধারণতঃ চিরকুমার ব্রত গ্রহণ করে থাকেন আর পাঞ্চেন লামা সম্প্রদায়ের লামারা বিবাহ করতে পারেন।

বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান, হীনযান, তিব্বতে এসে চৈনিক বৌদ্ধশাস্ত্র ও তন্ত্র-শাস্ত্রের সাথে মিশে বহুযানে পরিণত হয়েছে। আমার মতো এক অজ্ঞান তীর্থযাত্রীর পক্ষে তার বিচার বা বিশ্লেষণ করা মুশকিল। তাই চোখের সামনে যা দেখছি বা শুনছি তাই লিখে যাচ্ছি আমার ডায়েরীর পাতায়। পথের দুধারের সব ফুল কুড়িয়েই ভর্তি করলাম আমার ডালি, পণ্ডিত ব্যক্তিদের উপর ছেড়ে দিলাম তোড়া সাজাবার ভার।

লাসা ও মূল মন্দির জোখাং

দ্রেপুং গুম্ফায় আমরা তিনদিন ছিলাম, এখান থেকে লাসা মাত্র চার মাইলের পথ। এত কাছে এসে এখানে তিন দিন অপেক্ষা করার মত ধৈর্য আমার ছিল না কিন্তু আমি বাধ্য হয়েছি এখানে থাকতে। এখান থেকে দালাই লামার প্রাসাদ পোতালা স্বপ্নে দেখা রাজপুরীর মতই সুন্দর দেখায়। পৃথিবীর এক আশ্চর্য রূপে সেটা দাঁড়িয়ে আছে। তিনদিন যাবৎ সেটাকে দেখছি আর দেখছি। মনে হয় চিরজীবন ধরে দেখলেও তা একঘেয়ে লাগবে না। উন্নত স্থাপত্য নিদর্শনের এক প্রমাণ। দেখে মনে হয় না যে এই বিরাট অট্টালিকাটি মানুষের তৈরী। প্রাসাদটা ছোট্ট একটি পাহাড়ের উপর দাঁড় করানো আর তার পেছনে দূরে মেঘের সাথে মিলিয়ে আছে পাহাড়। পোতালা রাজপ্রাসাদের ঠিক নিচেই লাসা তিব্বতের রাজধানী। পোতালা রাজবাড়ী তিব্বতের গর্ব।

দ্রেপুং গুম্ফায় তিনদিন থাকাকালীন আমাদের কাগজপত্র সব আরেকবার পরীক্ষা করা হয়েছে। দ্রেপুং-এ যে সব নেপালী বৌদ্ধ ছাত্ররা পড়াশুনা করছে তাদের সবাই প্রায় পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে। তারা এসেছে নেপালের তিনটি বড় মন্দির ও মঠ থেকে তাদের নাম যথাক্রমে স্বয়ম্ভু, মহাবোধি আর নামবুদ্ধ। গুরুজীর উত্তর সত্ত্বেও আমি ঠিক কোন মঠের সাথে জড়িত সেটা জানবার জন্য তারা অস্থির হয়ে উঠেছিল। সেদিক থেকে আমি এখন মুক্ত আর কোনো বাধা নেই। দ্রেপুং-এ আমরা যাদের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম তাদের সবাইকে বিদায় জানিয়ে আমরা চারদিনের দিন সকাল বেলা বেরিয়ে পড়লাম রাজধানীর উদ্দেশ্যে। কী-চু নদী সব সময়ই আমাদের সাথে সাথে চলল।

রাস্তায় ঘোড়া ও ঘোড়ার গাড়ী চোখে পড়তে লাগল। দুপাশ এখন ঘর বাড়ীতে ভর্তি। ইয়াটুং ও গীয়াৎসের পর এই প্রথম চোখে পড়ল পাব্লিক লরি। রাস্তাঘাটে অনেক লোকজন চলাচল করছে, প্রায়ই চোখে পড়ছে দোকানপাট, রেঁস্তোরা আর গরীব যাযাবরদের তাঁবু। এই রাস্তাটাও মনে হচ্ছে হালে সারানো হয়েছে। বড় বড় পাথর দিয়ে ধার বাঁধানো শক্ত রাস্তা, দূরে শহরের ঘরবাড়ীগুলো দেখা যাচ্ছে। আগের মত নির্জন আর পাহাড়ি রাস্তা এটা নয়। এই রাস্তায় প্রাণ আছে। চলার পথেই সমাজ ও শহরের গন্ধ। লোকালয়ে ভর্তি। আমরা এখন পোতালার খুব কাছে। তিব্বতের মূলকেন্দ্র আর মাত্র দু' মাইল, আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে চলতে লাগলাম। হঠাৎ নজরে পড়ল সারি সারি পতাকা আর কয়েকটি ছোট বড় চৈত্য। রাস্তাটা এবার একটু উপরের

দিকে উঠে গেছে, একটু উপরে উঠতেই নজরে পড়ল একটা চৈত্য-চূড়া অনেকটা কাঠমাণ্ডুর স্বয়ম্ভূনাথ মন্দিরের মতো। রাস্তাটার সবচেয়ে উঁচুতে উঠতেই সামনেই দেখতে পেলাম বিরাট একটা চৈত্য। চৈত্যটাকে নানা রঙের প্রার্থনা পতাকা দিয়ে যেন ঢেকে রাখা হয়েছে। এখান থেকেই আরও পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলাম মহামান্য দালাই লামার পবিত্র প্রাসাদ পোতালা। একটা ছোট পাহাড়ের উপরে লাল রঙের অতি সুন্দর একটা বাড়ী। চৌদ্দতলার একটা বাড়ী তার হাজার কুঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিব্বতের এক আশ্চর্য স্থাপত্য নিদর্শন। সেই পাহাড়ের নীচেই হচ্ছে লাসার মূল শহর। সূর্যের আলো পড়ে পোতালার রাজবাড়ীটা তার উজ্জ্বল রঙের বাহার খুলে দিয়েছে। আমরা অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার ইচ্ছে ছিল কিন্তু আমাদের চারদিকে হঠাৎ যেন কারা এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। গুরুজী তাদের উপেক্ষা করে বললেন—সামনের যে বিরাট চৈত্যটা দেখছো এটার নাম ফারগো-কালিং।

ফারগো-কালিং, নদীর ধারের এই বিরাট চৈত্যটিকে পথিকের চোখে পড়বেই। এখন আমরা লাসা শহরের মধ্যে। আমরা হঠাৎ চারদিকে গণ্ডির মত ভিখিরিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই গণ্ডিটা চারগুণ বেড়ে উঠল, আমরা আর এগুতে পারলাম না ; আমরা তিরিশজন মাত্র, আমাদের চারদিকে কম করেও শ'খানেক ভিখিরি আমাদের এগোবার পথ বন্ধ করে দিল, সেই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া মুশকিল। মনে হল হঠাৎ আমরা ঢুকে পড়েছি ভিখিরিদের রাজত্বে যেখানে রাজা প্রজা সবাই ভিখিরি, কাজেই কার বিরুদ্ধে নালিশ করবো কার কাছে। আমরা যদি সকলকে এক পয়সা করেও দিই তাহলে কম করেও প্রয়োজন শ'খানেক টাকার। চারদিকে সবাই চীৎকার করে বলছে—দাও-দাও, চাই-চাই, এটাই বোধ হয় এখানকার জাতীয় মন্ত্র। একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করলুম যে এরা আমাদের ঘেরাও করেছে বটে কিন্তু গায়ে বা জিনিসপত্রে কেউ হাত দেয়নি। শেষে মুক্তির উপায় না দেখে আমরা বসে পড়লুম রাস্তার উপরে, আমাদের চারদিকে পাঁচিলের মত ভিখিরিরা দাঁড়িয়ে রইল।

গুরুজী সবাইকে নিষেধ করে দিলেন আমরা যেন একটা পয়সাও না দিই, তারপর তিনি শুরু করলেন তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া। তিনি তাদের ভালভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে আমরা তীর্থযাত্রী নই, আমরা ওদেরই মতো ভিখিরি লামা মাত্র। কাজেই আমাদের যদি চিরদিন এভাবে ঘিরে বসে থাক তাহলেও কিছু বেরোবে না। প্রথম প্রথম ওরা অবিশ্বাস করলেও পরে তারা একে একে পথ ছাড়তে বাধ্য হল। ছাড়া পেয়ে আমরা আবার পথ ধরলাম। ফারগো-কালিং-এর চৈত্যটাকে আমরা সাতবার ঘুরে প্রার্থনা করে একটা চায়ের দোকানে এসে থামলাম। সেখানে আমরা চা ও ভারী রুটি খেয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করে নিলাম। ফারগো-কালিং জায়গাটার নাম আর সে কারণেই এখানকার চৈত্যটাকেও সেই নামেই অভিহিত করা হয়। স্থানটা মোটেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। রাস্তার দু'দিকে ভিখিরি যাযাবরদের তাঁবু আর চটিতে ভরা। আর তারই সাথে সাথে রয়েছে অসংখ্য প্যাগোডা ধরনের সম্ভ্রান্ত ঘরবাড়ী। পরে আমরা জানতে পারলাম যে,

এই ফারগো-কালিং চৈত্যটাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে লাসার ভিখিরিদের আড্ডা। ভিখিরিদের এই আড্ডাখানাটা নতুন নয়, তবে গুরুজীর মতে তাদের সংখ্যাটা এখন প্রায় দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বেনারস, হৃষিকেশ ও কালীঘাটের মত এখানেও প্রচুর পেশাদার ভিখিরি রয়েছে। কাজ করার কথা বললে তারা সরাসরি উত্তর দেয়—কাজ করলে কত পয়সা দেবেন? ভিক্ষে করা তার থেকে অনেক ভাল। লাসার লোকেরা খুব দয়ালু, তারা পয়সা দিতে দরাজ আর সেই সাথে আমরা স্বাধীন, কারও চাকর নই। এই যুক্তির বাইরে তাদের নিয়ে আসা মুশকিল। ফারগো-কালিং থেকেই বলতে গেলে শহরের আরম্ভ। এখানেই পেলাম তোরণ, লাসা সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছে। লাসাকে বলে হ্লা-সা (Hla-Sa) অর্থাৎ ঠাকুর বাড়ী, অনেকে বলে তিব্বতের স্বর্গ। মোঙ্গলীয়রা লাসার অর্থ করে অন্য রকম তারা বলে স্বর্গ-স্থান। ভারতীয় সাধুদের অনেকে বিশ্বাস করেন যে কৈলাসের ইন্দ্রপুরী আসলে এই লাসায়। হিমালয়ের সব রহস্যই লুকিয়ে আছে এই লাসায়। আমাদের স্বপ্ন এতদিনে সার্থক হল। গ্যাংটক ছাড়ার বত্রিশ দিনের দিন আমরা পেলাম লাসা। লাসার দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে প্রবেশ করলাম শহরে। রাস্তার উপরই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত জানালাম প্রথমে শাক্য মুনির উদ্দেশ্যে, তারপর মহাকালীর উদ্দেশ্যে ও শেষে ধর্মরাজ চেন্-রে-জির (দালাই লামা) উদ্দেশ্যে। আমরা সমস্বরে চীৎকার করে উঠলাম—

জয় শাক্য মুনির জয়! জয় মহাকালীর জয়! জয় রাজাধিরাজ চেন্-রে-জির জয়! বুদ্ধের জয়, ধর্মের জয়, সংঘের জয়!

ওম্ মণি পদ্মে হুম্, ওম্ মণি পদ্মে হুম্, ওম্ মণি পদ্মে হুম্, জয় স্রোং-সান্-গাম্পোর জয়, জয় মহারাণীর জয়, জয় মহারাণীর জয়.....

তারপর পঁচিশবার বিভিন্ন দেব-দেবীর নামে দণ্ডি কেটে আমরা উঠলাম। আমাদের দু'পাশে লাসার নাগরিকেরা এসে ভিড় করেছে। আমরা এগিয়ে চললাম তারই মাঝখান দিয়ে।

পোতালা রাজবাড়ী আমাদের খুবই কাছে, আধঘণ্টার পথ মাত্র। রাস্তার দু'দিকে হঠাৎ শুরু হয়েছে বনেদি ধরনের কাঠের বাড়ী। অনেক একতলা দোতলা সিমেন্টের বাড়ী—আর ছাদগুলো সবই প্যাগোডা ধরনের, অনেকটা কাঠমাণ্ডুর মত। আশপাশে কয়েকটা পুকুর নজরে পড়ল, এই অঞ্চলে গাছ-গাছড়ার অভাব নেই। কয়েকটা পার্কও দেখতে পেলাম। একমাত্র পোতালা ছাড়া রাস্তাঘাটের নমুনা দেখে মনে হয় না যে আমরা একটা দেশের রাজধানীতে এসে পৌঁছেছি। দার্জিলিং-এর তুলনায় অনেক উন্নত। বড় রাস্তাটা আস্তে আস্তে শহরের মূলকেন্দ্রে এসে অনেকগুলো ভাগে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা ভিখিরি ও নাগরিকদের ভিড় কাটিয়ে শহরের মূল অংশে প্রবেশ করলাম। এখানকার সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর বাড়ীগুলোর প্রশংসা করতেই হবে। প্রত্যেকটা বাড়ীর রঙ কাঠের কাজ আর গঠন অদ্ভুত ধরনের সুন্দর।

লাসার গলিগুলো ঠিক বেনারসের মতো। আমরা অনেকগুলো গলি পার হয়ে

শেষে এসে পৌছলাম জোখাং মন্দিরের প্রাঙ্গণে। বিরাট এই মন্দিরটা লাসার বাড়ীগুলোর মধ্যে ঠাসাঠাসি করে কোন রকমে যেন নিজের অস্তিত্বটাকে বজায়

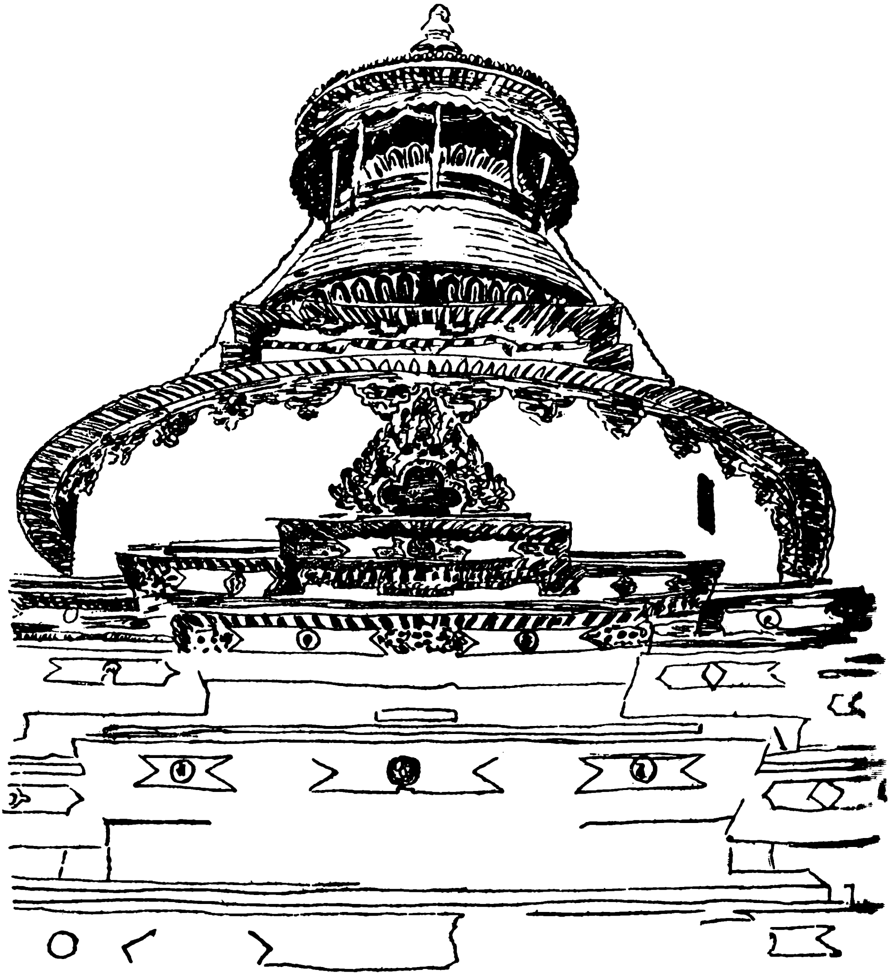

জোখাং মন্দিরের চূড়া

রেখেছে। বেনারসের বাবা বিশ্বনাথ মন্দিরের অবস্থাটাও ঠিক এ রকমের। বাইরে হতে কিছুতেই এই মন্দিরটাকে দেখা যায় না, লাসা ও তিব্বতের এটাই মুল মন্দির। জোখাং মন্দিরের চত্তরটা পেয়েই আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়লাম তার উপর। ধর্ণা দেবার মত করে আমরা নিজেদের লুটিয়ে

দিলাম ভগবান বুদ্ধের চরণে। সকলের মুখে ওই একই বীজমন্ত্র—ওম্-মা-নে প-দ্-মে-হু-ম্! এখানেই আমাদের সর্ব কর্মফল ভগবানের শ্রীচরণে সঁপে দিয়ে চেয়ে নিতে হবে তাঁর আশীর্বাদ, মুক্তি ও নির্বাণ লাভের উপায়।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে প্রণাম সেরে তারপর শুরু হল দণ্ডি কেটে মন্দির পরিক্রমা, ঘুরতে হবে সাতবার। তারপর আরও সাতবার প্রার্থনা চক্র ঘুরিয়ে পূর্বজন্মের কর্মফল খণ্ডন করতে হবে, তারপর শুরু হবে মন্দির প্রবেশের দণ্ডি। তার মানে মন্দিরে ঢুকতে এখনও প্রায় ঘণ্টাখানেক বাকি। আমি লামাধর্মে দীক্ষিত কাজেই আমাকেও তাদের সাথে সাথে সব ক্রিয়া-কর্ম করতে হবে। এখন বুঝতে পারছি যে লাসায় ঢোকার আগে আমাদের বিশ্রামের কেন প্রয়োজন ছিল।

খৃষ্টপূর্ব প্রায় চারশ' শতকে রাজা শ্রোং-স্যান্-গাম্পোর প্রতিষ্ঠিত এই লাসা শহর। পোতালা পাহাড়ের উপর তিনি তৈরী করেছিলেন তাঁর দুর্গ। সেই দুর্গটিই আজকাল পোতালা প্রাসাদ নামে পরিচিত, এই দুর্গটি অবশ্য তার আগেও ছোট আকারে ছিল। রাজার দুই রাণী। এক রাণী ছিলেন নেপালের, আর এক রাণী ছিলেন চীন দেশের। বিবাহের যৌতুক হিসাবে এই দুই রাণী তিব্বতে আনলেন বৌদ্ধধর্ম। নেপালের রাজকন্যা নিয়ে এলেন সোনা, রূপা, বুদ্ধ বাণী ও বৌদ্ধ পণ্ডিত। আর চীনের রাজকন্যা নিয়ে এলেন এক সুন্দর অমূল্য অতুলনীয় শাক্য মুনির এক মূর্তি। চীনের তাং দিনাস্তির রাজকন্যা বেন্-চেং'-এর আনীত সেই শাক্য মুনির মূর্তিটিই লাসার মূল মন্দির এই জোখাং এর পূজিত দেব। দৈনিক হাজার হাজার তীর্থযাত্রী ও ভক্ত লামারা এখানে আসছেন তাদের মুক্তির পথ সন্ধানে।

বৌদ্ধ-তান্ত্রিকদের মতে এই মন্দির-বিগ্রহ খুব জাগ্রত। মন্দির শুরু হয়েছে বিরাট একটা চত্বর পার হয়ে। জোখাং হচ্ছে মূল মন্দির আর তার চারদিকে আরও অসংখ্য ছোট ছোট মন্দিরে ভরা। ধ্যানী বুদ্ধ, ধ্যানী বোধিসত্ত্ব ও মানসী বুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর ও আরও অন্যান্য অনেক স্ট্যাচু মন্দিরের গায়ে খোদাই করা রয়েছে। আমি অবাক হয়ে সে সব দেখতে লাগলাম।

এই এত বড় মন্দির যার নাম ও খ্যাতির তুলনা নেই, অথচ একটা পাণ্ডাও এখানে নেই। বুদ্ধগয়া, পুরী, কাশী, হরিদ্বারে যে রকম পাণ্ডাদের অত্যাচার, এখানে সে সবের কোন বালাই নেই। চোখে পড়ে শুধু লামা আর ভিখিরি, অথবা ভিখিরি-লামা। আমি বহু তীর্থ ঘুরেছি কিন্তু একসঙ্গে এত ভিখিরি কোনদিনই দেখিনি। ভিখিরিদের মধ্যে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, এদের মধ্যে হ্যাংলামো নেই। এই গরীব সর্বহারা লোকগুলোর মধ্যেও রয়েছে এক আভিজাত্যের ছাপ। কোন তীর্থযাত্রীকেই এরা ব্যতিব্যস্ত করে না, পেছনে পেছনেও দৌড়য় না। তিব্বতে প্রবেশের পর একমাত্র ফারগো-কালিং-এর ভিখিরিরাই আমাদের ঘেরাও করেছিল। ওদের দোষ নেই, আজকাল বাইরের তীর্থযাত্রীরা আর এদিকে আসতে চায় না, সে কারণে ভিখিরিদের আয়ও কমে গেছে। এ হেন অবস্থায় হঠাৎ আমাদের মতো বত্রিশজন বিদেশী তীর্থযাত্রী পেয়ে ওরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল।

রাজা স্রোং-সান্-গাম্পোর নেপালী রাণী তৈরী করেছিলেন লাসার দ্বিতীয় বৌদ্ধ মন্দির—নাম রামোস্ মন্দির। আর চীনা রাণী আনলেন তিব্বতের জাগ্রত দেবতা শাক্য মুনি। শাক্য মুনির মূর্তিটা সারনাথের অন্যান্য বৌদ্ধ মূর্তির মতো তবে মুখাবয়ব সম্পূর্ণ চীনা ধাঁচের। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এখানে বৌদ্ধমতে পূজা-পদ্ধতি না করে এখানে পূজা-পদ্ধতি হয় অনেকটা হিন্দু মতে। অবশ্য হবেই বা না কেন বুদ্ধদেব স্বয়ং ছিলেন বেদ পন্থার সংস্কারক মাত্র, তিনি বেদ বিরোধী ছিলেন না। যে সব সংস্কার মানুষকে অর্ন্তযামী থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছিল তিনি তারই সংস্কার করেছেন মাত্র। জোখাং মন্দিরে কেউ প্রদক্ষিণ না করে প্রবেশ করে না তীর্থযাত্রী মাত্রেই দণ্ডি কাটতে হয়। ঠিক তারকেশ্বরের মন্দিরে যে ভাবে দণ্ডি কাটা হয় ঠিক তেমনি। এখানেই প্রমাণিত হয় যে মানুষের অন্তর্নিহিত ভক্তির প্রকাশ সব সময়ই এক। গঙ্গাসাগর গঙ্গোত্রী সিংহল অথবা লাসা মানুষ যেখানেই থাকুক না কেন সে যখন তার দেহ ও মন সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরকে সঁপে দেয় তখন দণ্ডিই তার প্রকাশ। দাঁড়িয়ে বসে শুয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করতে করতে আমরা ঘুরতে লাগলাম মন্দিরের চারপাশে।

দণ্ডির পর শুরু হল প্রার্থনা চক্র ঘোরাতে ঘোরাতে হেঁটে আবার মন্দির পরিক্রমা। আমাদের দেশে ভোরবেলা উপবাস থেকে স্নান করার পর যে পূজা দিতে হয়, এখানে সে নিয়ম নেই, বস্তুতঃ এখানকার নদীতে এই শীতে স্নান করার প্রশ্নই আসে না। আর যদিও বা কেউ মনের অদম্য উৎসাহ ও সাহস নিয়ে এই নদীতে ভোরবেলা ডুব দিতে যায় তাহলে আমি জোর করে বলতে পারি যে সে কিছুতেই আর ডুব দেবার পর উঠবে না। ঠাণ্ডায় তার দেহ অসাড় হয়ে পড়বে। শীতের কারণেই তিব্বতের অন্যান্য মন্দিরের মতো জোখাং মন্দিরেও সকলে জুতো পরেই প্রবেশ করে।

শুধু লামা আর ভিখিরিই নয় তিব্বতের সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরাও এইখানে দণ্ডি-পরিক্রমা করে তারপর মন্দিরে প্রবেশ করে। তবে আজকাল লাসার লোকেরা দণ্ডি না কেটেই সরাসরি মন্দিরে প্রবেশ করছে, অনেকের মতে এটা চীনাদের প্রভাব।

প্রায় দু'ঘণ্টা লাগল আমাদের পরিক্রমা সারতে। আমার সঙ্গী লামা ভক্তরা সবাই ভাবাবেগে আকুল, এত পরিশ্রম করে তারা শেষ পর্যন্ত এখানে এসে পৌঁছতে পেরেছে তাতেই তাদের পরমার্থ লাভ হয়েছে। সে সব পাপ ও সংস্কারের ফলে তাদের বার বার মানবজন্ম গ্রহণ করতে হচ্ছে এখানেই তার পরিসমাপ্তি। প্রাপ্তির ফলে তাদের এখন মুক্তির দরজা খোলা। তীর্থযাত্রীদের অনেকেই কাতর স্বরে নিবেদন করছে তাদের প্রার্থনা, আনন্দে অনেকেরই আনন্দাশ্রু ঝরছে। অনেক জন্মের সুকর্ম ও সাধনার ফলে এ জীবনে লাসায় পৌঁছানো গেছে। লামাদের জীবনে এটাই পরম শুভক্ষণ। ভগবান বুদ্ধ তাঁর মানবজীবন সাঙ্গ করে এখানেই অবস্থান করছেন তার চির জ্যোতি ও আনন্দের ছন্দ নিয়ে। তিব্বত ভগবান বুদ্ধের প্রিয় ভূমি। এখানকার প্রত্যেকটি নাগরিকের হৃদয়ে তিনি অবস্থান করছেন আর জোখাং মন্দির তার ইন্দ্রপুরী।

মন্দিরের চত্বরে কানে আসছে অজস্র ভক্তের কাতর প্রার্থনা—'বাবা আমাকে উদ্ধার কর, ধর্মরাজ আমার ছেলেকে বাঁচাও, ধর্মরাজ আমার স্বামীকে সুস্থ করে দাও, হে

মহাদেবরাজ আমার মেয়ের একটা সদ্‌গতি করে দাও, হে দেবাদিদেব আমাদের শান্তি দাও, আমাদের জন্মজন্মান্তরের পাপ থেকে মুক্ত কর, ...ইত্যাদি।

মন্দিরের সামনের দিকটা একটা বিরাট দালানের মত। লাইন করে না দাঁড়িয়ে একসাথে পাশাপাশি পঞ্চাশ-ষাটজন মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে। মন্দিরে মুখ্য দেবতা শাক্য মুনি, তাঁর উদ্দেশ্যে ভক্তেরা আনে সাদা বা হলুদ রঙের ছোট ছোট চাদর অনেকটা গামছার মতো। কেউ আনে প্রদীপ জ্বালাবার জন্য মাখন আর সম্ভ্রান্ত বা ধনীরা বিভিন্ন বস্তু ও চাল নিয়ে আসে অর্ঘ্য হিসেবে। আমরা প্রত্যেকেই এক-একটা করে চাদর নিয়েছি শাক্য মুনিকে নিবেদন করার জন্য। জোখাং মন্দিরের আর এক নাম সুক্-লা-খাং। আমরা এইবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে মন্দিরে ঢুকলাম। মন্দিরে ঢোকার আগে পরিক্রমাদি সারতে আমাদের লাগল প্রায় দু'ঘণ্টা। বাইরে থেকে প্রথমে দালানের মধ্যে ঢুকতেই অন্ধকার লাগল, কিছুক্ষণ পরেই সেই অন্ধকারটা চোখে অভ্যস্ত হয়ে গেল তারপরেই নজরে পড়ল দেয়ালের গায়ে সারি সারি ঘিয়ের প্রদীপ। এই ঘিয়ের প্রদীপগুলোকে কোনদিন নেভানো হয় না। শাক্য মুনির অনন্ত আলোকের প্রতীক। আরও এগিয়ে যেতেই ঠিক বেদীর সামনে দু'পাশে ভাঁজ করা হয়েছে গ্রীলের দরজা। লোহার এই দরজাটা বন্ধ থাকলেও ভক্তদের বুদ্ধ দর্শনে কোনও অসুবিধা হয় না। সামনেই এবার দেখতে পেলাম বিরাট ভগবৎ মূর্তি, প্রশান্ত সোনালী উজ্জ্বল রঙের মুখ আর সাদার উপর নীল রঙের চক্ষুমণি। ভক্ত ও শরণার্থীদের রক্ষা করবার জন্য তিনি তাকিয়ে আছেন স্নেহশীল দৃষ্টিতে। একমাত্র মুখ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না, তার শরীরটা সম্পূর্ণ চাদরে ঢাকা, শুধু চাদরে ঢাকা বললে ভুল হবে, শতাধিক চাদরের ভারে মনে হয় মূর্তিটার মেরুদণ্ড একটু কাহিল হয়ে পড়েছে। মূর্তির সামনে একটা বিরাট গামলার আকারে রয়েছে ঘিয়ের প্রদীপ। ভক্তরা সেই গামলার মধ্যে ঘি অর্পণ করছে। গামলা না বলে তাকে বিরাট একটা ড্রাম বলাই ভাল। আমি তার মধ্যে নামলে নিশ্চয়ই ডুবে যাবো। সেই তামার মহাপ্রদীপের চারদিকে ছোট ছোট সলতে উঠে গেছে সংলগ্ন প্রদীপগুলোর মধ্যে, এই ভাবে সৃষ্টি হয়েছে সহস্র প্রদীপ শিখা। অতি চমৎকার দেখতে। দৈনিক প্রায় চারশ' কিলোগ্রাম ঘি লাগে এই প্রদীপশিখাগুলোকে জ্বালিয়ে রাখতে। লোহার দরজার দু'পাশে চারজন পূজারী-লামা। পূজার জিনিসপত্রগুলো সাজাচ্ছে, ভক্তদের কাছ থেকে চাদর নিয়ে ভগবান বুদ্ধের হাতে নিবেদন করছে। পূজার পবিত্র জল (চরণামৃত) সকলকে বিতরণ করছে, প্রদীপে ঘি ঢালছে, চাল বিতরণ করছে। ভক্তদের অনুরোধ অনুযায়ী বিভিন্ন মুদ্রাসহকারে আরতি করছে, মোটের উপর তারা খুবই ব্যস্ত। মন্দিরের প্রধান দরজাটা চব্বিশ ঘণ্টাই খোলা থাকে, কিন্তু ভেতরকার লোহার দরজাটা খোলা থাকে সকাল ন'টা থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত। এখানকার পূজা হয় বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতে। প্রদীপের স্বল্পালোকে মন্দিরের ভেতরে দেয়ালের গায়ে দেখলাম অজস্র তাংখা ঝোলানো রয়েছে। মন্দিরের মতোই সেগুলো পুরনো, আমার খুবই ইচ্ছা ছিল যে সেগুলোকে খুঁটিয়ে দেখি, কিন্তু এ যাত্রায় আর তা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না, কারণ আমি যাদের সাথে এসেছি তাদের শিল্প ও ভাস্কর্যের

দিকে কোন রকম আকর্ষণ নেই। শাক্য মুনির স্ট্যাচুটা প্রায় দেড়মানুষ লম্বা আর তার বেদী নিয়ে উচ্চতায় তেরো ফুট ছাড়িয়ে গেছে। অভয় মুদ্রার একটা হাত ও মুখ ছাড়া আর কিছুই আমাদের চোখে ধরা পড়ল না। সবই অলংকার আর চাদরে ঢাকা। ভক্তদের চোখ অবশ্য এসব খোঁজে না তাদের হৃদয় উচ্ছ্বাসে ভরা। কেদারনাথ ও কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরেও ওই একই অবস্থা দেখেছি, ফুল বেলপাতা আর চন্দনের স্তূপে আসল দেবতা চাপা পড়ে আছে। মূল মূর্তি দেখতে হলে মন্দিরের বাইরে এসে ছবি কিনে দেখতে হয় তার প্রকৃত রূপ।

লাসার এই শাক্য মুনি শুধু যে জাগ্রত দেবতা তাই নয় এই মন্দির ও স্টাচুটার মধ্যেই লুকিয়ে আছে লাসার ট্রেজারী। পৃথিবীর অন্যতম সেরা দামী পাথরের তৈরী এই মূর্তি, আর তার উপর সোনার পাত মোড়া। শাক্য মুনির চূড়াতে কয়েকশ' মণি-মুক্তা ঝল্‌মল্‌ করছে। আর তার বেদীটা সম্পূর্ণ সোনার তৈরী। পরমার্থিক মূল্য ছাড়াও শাক্য মুনির আর্থিক মূল্যকে অগ্রাহ্য করা চলে না, লাসা তথা সমগ্র তিব্বতের সম্পদ। লোকে বলে যে, এই জোখাং মন্দিরের সোনাগুলোকে একত্র করলে তারা পৃথিবীকে কিনতে পারে। যদিও এটা প্রবচন তবুও এ কথাটাকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেয়া যায় না। মূল বেদীর পূজা-সামগ্রীগুলো সবই সোনার। বেদীর সামনে একমাত্র পূজারী ছাড়া আর কারও বসবার উপায় নেই। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ভক্তদের ভিড় লেগেই আছে। ধ্যানের জন্য তাই যেতে হয় মণ্ডপে, সেখানে বসবার জন্য গদি পাতা আছে। গদি মানে চট, কোন এককালে হয়তো তার মধ্যে নারকোলের ছোবড়া ছিল, এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। তাই ভক্তরা ধ্যানের জন্য কম্বল বা আসন নিয়ে আসে।

জোখাং মন্দিরটার ভেতরে ঢুকে তারপর মূল বেদীর জন্য নিচে নামতে হয়, রাস্তা থেকে মন্দিরের উঠোন বা চত্বর তারপর মন্দিরের ভেতর প্রথমে পড়ে মণ্ডপ। ধ্যান, দণ্ডি, প্রার্থনা, ভজন, পূজাপাঠ সেখানেই করা হয়। মণ্ডপের আর একদিকে আছে হাজার-বুদ্ধের মন্দির। আমরা এবারে সেখানে ঢুকলাম। অর্থাৎ মন্দিরের ভেতরে আরও একটি মন্দির। এই ছোট মন্দিরটাকে আমি বলবো একটি যাদুঘর। এই মন্দিরটা ছোট বড় বিভিন্ন মূর্তিতে ভরা। ভগবান বুদ্ধের যতরকম মূর্তি কল্পনা করা যেতে পারে তারই নমুনা এখানে পাওয়া যাবে। একটু ভালভাবে পরীক্ষা করলেই এই মূর্তিগুলোর মধ্যে পাওয়া যাবে ভারতীয় বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব, হর-গৌরী, সরস্বতী, যমরাজ, রাম, হনুমান, যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ, কালী, চামুণ্ডা ইত্যাদি। এখানেই দেখলাম চীন ও ভারতবর্ষের এক মিলনকেন্দ্র। শিবের সাপ, দুর্গার সিংহ এখানে ড্রাগনের রূপ নিয়েছে। সেখানে আমরা সব ঘুরে ঘুরে সব দেখে, এবারে উঠলাম, মন্দিরের দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ মন্দিরের উপর তলায়। মন্দিরের নীচের তলায় মুল বেদী যেখানে রয়েছে শাক্য মুনির বিরাট মূর্তি, তারই পাশের দ্বিতীয় মন্দিরের রয়েছে হাজার-বুদ্ধের মূর্তি। আর এবারে উঠে এলাম মন্দিরের উচ্চাংশে। এই মন্দিরে ঢুকেই আমি অবাক হয়ে গেলাম এই বুদ্ধের মূল মন্দিরে স্বপ্নেও যা ভাবিনি। আমার সামনেই দেখতে পেলাম ভয়ংকর এক কালীমূতি, কালীমূর্তি অথাৎ মা-কালী লাসার রক্ষাকালী।

ভয়ংকর করালীমূর্তি ধারণ করে যিনি রক্ষা করছেন পৃথিবীর এই পবিত্রভূমি তিব্বত সামনের এই বিগ্রহটি দেখে আমার সমস্ত লোমকূপগুলো খাড়া হয়ে উঠল। মনে হল অনেকদিন পর পেলাম আমার মাকে যার সঙ্গে রয়েছে আমার আত্মীক যোগাযোগ।

জোখাং মন্দিরটি সত্যই রহস্যজনক। এই মন্দিরে দেখতে পেলাম পুরুষ ও প্রকৃতির দুই রূপ। বুদ্ধের শান্ত শিব-রূপ, আর চির চঞ্চলা কালীর সংহার রূপ। চেতন ও অচেতনের সমন্বয় গড়ে উঠেছে এই জগৎ তারই শ্রেষ্ঠ প্রতীক এই জোখাং মন্দির। তিব্বতের ধর্মরাজ দালাই লামার ইষ্ট দেবতা এই মহাকালী ছিন্নমস্তা।

দালাই লামা নিজে বৌদ্ধ অথচ তার ইষ্টদেবী মহাকালী। শুনতে অদ্ভুত শোনায় আর তার চেয়েও অবাক লাগে স্বচক্ষে দেখতে। এই মহাকালীর বিগ্রহটিও খুব জাগ্রত। প্রত্যেক দিন দু'বার করে তার পূজা হয়। মহাকালীর পূজা হয় তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতে। তীর্থযাত্রী বা ভক্তেরা প্রথমে শাক্য মুনির দর্শন করে তারপর আসে মহামায়ার দর্শনে। সাধারণ মানুষের কাছে মহামায়া মহাকালীই সৃষ্টির মূল। সৃষ্ট জগতের তিনিই রক্ষাকর্ত্রী। সর্বপাপহারিনী বরাভয়দায়িনী।

এখানকার মূল মূর্তিটা দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট ও তারাপীঠের মত নয়। এই মূর্তিটা আরও ভয়ংকর। দৈত্যদলনী, মহাকালের বিনাশ ও সংহার মূর্তি নিয়ে তিনি চর্মবস্ত্র পরিধান করে মানুষের মাথার খুলিতে করে মগজ ভক্ষণ করছেন। এই মন্দিরের গায়ে মায়ের আরও পূজিত মূর্তি রয়েছে। তিব্বতের পৌরাণিক কাহিনী মায়ের রূপ সম্পর্কে কি ব্যাখ্যা করেন জানি না। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধুমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, ও কমলা মায়ের এই দশাবতারের বিভিন্ন চিত্র ও মূর্তিতে দেয়ালটা ভর্তি।

বৌদ্ধ-তান্ত্রিকেরা বলেন যে তিব্বত থেকেই তন্ত্র-সাধনার মাধ্যমে মহাকালী মহামায়ার এই রূপগুলো ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়েছে। তিব্বতের ধ্যানী বুদ্ধ সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্-এর প্রতীক। সেই ধ্যানী বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন ধ্যানী বুদ্ধের শক্তি সাধনার। লোচনা, যামকী, পাণ্ডারা, আর্যতারা ও বজ্রধাত্রীশ্বরী, বাণীপাণি, বজ্রপাণি এরাই আসলে তিব্বতের আদি শক্তি।

মহামায়া মহাকালীর সেই ভয়ংকর রূপের সামনে আমি আর বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলাম না হঠাৎ যেন আমার পা দুটো অবশ হয়ে এল, ভক্তি থেকে উচ্ছ্বাসে আমার লোমকূপগুলো খাড়া হয়ে উঠল, মনে হল মা আমাকে হাত বাড়িয়ে ডাকছেন। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আমার মন ও শরীরের ক্লান্তি দূর করার জন্য। লামা পোশাকের ভেতর থেকে আমার মিথ্যা আমিটা হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। আমার দেহটা লুটিয়ে পড়ল মন্দিরের দরজার উপর। সেইক্ষণে আমার যেন মনে হল আমি সব পেয়েছি, আমি ধন্য। আমার দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু এক অপূর্ব আনন্দ শিহরণে ভরে উঠল, সেই মহানন্দ সাগরে আমি নিজেকে সঁপে দিলাম।

বেশ কিছুক্ষণ সেই আনন্দের লহরীতে ডুবেছিলাম। তারপর হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করলাম। বসে আছি মণ্ডপ-দালানে, আমার চারদিকে অন্যান্য লামাদের ভিড়

দেখে নিজেকে সংযত করে নিলাম। মন্দির থেকে এখানে কি করে এলাম, কে আমায় নিয়ে এল ইত্যাদি প্রশ্নে মন ভরে উঠল। একজন পূজারী লামা আমাকে একটা বাটিতে করে গরম চা এনে দিল, আমি তাতে চুমুক দিয়ে শরীর ও মনটাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনলাম। আমার পাশেই ছিলেন সাধুবাবা। তিনি পরম স্নেহে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—এ কিছুই না, ভাবাবেগে এরকম অনেকেরই হয়ে থাকে। মৌন থাকার ফলে মনের তেজ ও ভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি এটা তারই ফল।

ভাবাবেগ বা উচ্ছ্বাস যাই হোক না কেন যুক্তি দিয়ে হয়তো তার একটা মনগড়া জবাব পাওয়া সম্ভব, কিন্তু আমার মনের মধ্যে যে একটা বিরাট আনন্দের পূর্ণতা জেগে উঠেছে তার ব্যাখ্যা মনে হয় কোনো ভাষাতেই ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখে অনেক সময় তা ব্যক্ত করতে গিয়ে শুধু তার জড় মূর্তিটারই ব্যাখ্যা করেছি। সকলের চোখের সামনে যা ধরে পড়ে আছে সেটাকেই ব্যক্ত করতে পারি না, আর অব্যক্তটাকে ব্যক্ত করবো কি করে?

কথায় বলে—মার থেকে মাসীর দরদ বেশী, আমার সম্পর্কে আমার থেকে লামাদের চিন্তা আরও বেশী। কারও মতে আমার খাওয়া দাওয়া ও বিশ্রাম ঠিক মতো হয়নি, কারও মতে আমার ঠাণ্ডা লেগেছে। কারও মতে আমার ভাব লেগেছে আবার কারও মতে আমার উপলব্ধি ঘটেছে, মোটের উপর যে কারণেই হোক না কেন মন্দিরের দরজায় আমি নাকি প্রায় ঘন্টাখানেক অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। বলাই বাহুল্য, সকাল থেকে আমাদের পেটে বিশেষ কিছু পড়েনি। দিনটা যেন দেখতে দেখতে কেটে যাচ্ছে। সন্ধ্যার দিকে আবার মন্দিরের বাকি অংশটা দেখতে আরম্ভ করলাম।

নীচের তলার একটা ঘরে আমরা বসে থাকলাম। সমস্ত মন্দিরটাই প্রায় অন্ধকারে ঢাকা তার মধ্যে নীচের তলাটা আরও বেশী। দিনের আলো এখানে কখনো প্রবেশ করেনি। আরেকটা পাতালপুরীর গল্পের মতো। অর্থাৎ আমরা এখন মাটির নীচের একটা ঘরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। এই ঘরটা ঠিক গৌহাটীর কাছে কামাখ্যার মূল মন্দিরের মতো। প্রদীপের অল্প আলোতে পাথরের ভিত্তির মধ্যে একটা ঘর, ঘরের দরজাটাও একটা বিরাট পাথরের তৈরী, দরজাটা বন্ধই থাকে। এই ঘরটা সম্পর্কে একটা চমৎকার গল্প আছে। সেটাই লিখছি ঃ

জোখাং মন্দিরটি তৈরী করার পর সেখানে তিনটি ঘর তিন দেবতার উদ্দেশ্যে সমর্পণ করা হয়। প্রথম ঘরটি শাক্য মুনির জন্য, দ্বিতীয় ঘরটি বুদ্ধের অন্যান্য অবতারদের জন্য, আর উপরের ঘরটি রক্ষাকালীর জন্য। অন্যান্য মন্দিরের মতই এটি শক্ত পাথরের দেয়াল আর ভেতরে কাঠের উন্নত ধরনের কারুকার্যে ভরা। সেই সময়ের এটাই ছিল এক আশ্চর্য স্থাপত্য নিদর্শন।

মন্দিরটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় মাতৃ-মণ্ডালর উপর, মাতৃমণ্ডলা সেই সময়ে তন্ত্র-উপাসকদের এক প্রিয় ও শক্তিশালী আসন। তারপর যথাসময়ে মন্দিরের উপাস্য দেবতা ও দেবীকে যথাযোগ্য পূজা ও উৎসবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তারও বহুদিন পর হঠাৎ পূজারী ও লামারা মন্দিরের ভেতরে এক অদ্ভুত ধরনের নিষ্প্রাণতা

অনুভব করেন। ঘিয়ের প্রদীপগুলো আপনার থেকেই যায় নিভে, মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি যেন নিষ্প্রভ, ভক্তদের প্রার্থনা যেন ভগবানের কানে পৌঁছয় না। পূজারীরা পূজা করতে গিয়ে মন্ত্র ভুলে যায়। মন্দিরের ভেতরে যেন হিমশীতল এক দৈত্যের আস্তানা গড়ে উঠেছে। এত খরচা করে এত ঘটা করে মন্দির স্থাপন করা হল, আর তারই এই ফল! হাজার হাজার লোকের পরিশ্রম আর স্বপ্ন ব্যর্থ হতে দেখে রাজারও চোখে ঘুম নেই। রাজ্যের পণ্ডিত, পুরোহিত ও তান্ত্রিকদের ডাকা হল। তারা মন্দিরটিকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে বললেন—এ মন্দিরে দুষ্ট আত্মারা বাসা বেঁধেছে। যারা দুষ্ট আত্মা, প্রেত, মারণ উচাটন নিয়ে সাধন করে তারা এসে পরিষ্কারভাবে জানালো যে পাঁচটি দৈত্য এই মন্দিরটি অধিকার করে বসেছে। তাদের সে কথা শুনে রাজ্যের সবাই হায় হায় করে উঠল। পবিত্র পুণ্য তথাগতের মন্দিরে কি না ভূতের আড্ডা, এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে? রাজা চারদিকে খবর পাঠালেন, ওঝা যাদুকর তান্ত্রিক যে-ই এই দুষ্টাত্মাগুলো থেকে মন্দিরকে রক্ষা করতে পারবে তাকেই রাজভাণ্ডার উজাড় করে পুরস্কৃত করা হবে। রাজ্যের বহু তান্ত্রিকরা এল কৌমারী, বরাহী মহাশক্তির মন্ত্র নিয়ে, কিন্তু একে একে সবাই ব্যর্থ হল। শেষকালে সকলকে অভয় দিয়ে এগিয়ে এলেন পদ্ম সম্ভবা। অভূতপূর্ব সাধনমার্গের অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন তন্ত্রাচার্য ভূতসিদ্ধ পদ্ম সম্ভবার চরণে লুটিয়ে পড়ল পঞ্চ-দৈত্য। পদ্ম সম্ভবা তাদের পঞ্চ-পাশের মন্ত্রে বন্দী করলেন। নীচের এই ঘরটিতেই তিনি তাদের বন্দী করে রাখলেন।

একদিন কোন এক কারণে পদ্ম সম্ভবা বাবা লাসার বাইরে যাবার প্রয়োজন বোধ করলেন। তিনি লাসা ছাড়ার আগে বার বার করে মন্দিরের লামাদের সাবধান করে দিলেন কিছুতেই যেন এই দুষ্ট আত্মাদের না ছাড়া হয়। কয়েকদিন পর একজন হৃদয়বান্ সৎ পূজারী নীচের ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাকে দেখেই সেই দুষ্টাত্মাগুলো কেঁদে উঠল—'আমাদের এই বন্দী জীবন থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।' তাদের সেই কান্না শুনে পূজারীর অন্তর করুণায় ভরে উঠল, সে দরজার কাছে এসে তাদের বলল—বুঝতেই পারছি কিন্তু করার কিছুই নেই। পদ্ম সম্ভবা বাবা এখন এখানে নেই, তিনি এলেই তাঁর কাছেই তোমাদের যা বলার বলবে।

পঞ্চ দৈত্যের কান্নায় পূজারীর দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে জেনে তারা আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল—বাবা আনেক দিন যাবৎ আমরা দিনরে আলো দেখিনি, এই অন্ধকার ঘরে থাকার মতো মহা যাতনা পৃথিবীতে আর নেই। আমাদের দয়া করে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিন, আমরা কথা দিচ্ছি বাইরের আলো দেখেই আমরা খুশী হব তারপর আবার আপনি আমাদের এখানে বন্দী করে রাখবেন। আপনার পায়ে পড়ি আমাদের একটু করুণা করুন। দৈত্যদের কান্নায় পূজারীর হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হল। তিনি তাদের কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি দিবার অভিপ্রায়ে দরজা খুলে দিলেন। পঞ্চদৈত্য ঘর থেকে বেরিয়েই অট্টহাস্যে ভেঙে পড়ল। হেসে গড়াগড়ি খেতে খেতে বলল—মুর্খ পূজারী তোমার মতো বোকা লোক আমরা কোনদিন দেখিনি—এই মন্দিরটা আমাদের, এটা আমাদের রাজত্ব। এই বলে তারা আবার আগের মতো ভূতের

তাণ্ডব শুরু করে দিল। তাদের থামায় এমন সাধ্য কার। পূজারী বেচারা নিজের বোকামী বুঝতে পেরে আফসোস করতে লাগল।

কয়েকদিনের মধ্যেই লাসার বাইরে পদ্ম সম্ভবার কানে গিয়ে সেই সংবাদটা পৌঁছল। পদ্ম সম্ভবাজী সেই সময় তান্ত্রিকদের নিয়ে বিশেষ সাধনায় ব্যস্ত ছিলেন। দৈত্যদের মুক্তি পাওয়ার সংবাদ পেয়েই তিনি ফিরে এলেন লাসায়। পদ্ম সম্ভবাজী ছিলেন অতি বিনয়ী কিন্তু প্রয়োজনবোধে তিনি অসুরের রূপ নিতেও দ্বিধা করতেন না। জোখাং মন্দিরে ঢুকেই তিনি হুংকার দিয়ে উঠলেন। তাঁর উপস্থিতিতে দৈত্যদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। দৈত্যদের দেখেই পদ্ম সম্ভবাজী একটা বিরাট পাথর তুলে তাদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। সেই পাথরটা নাড়াতে সাধারণতঃ পঞ্চাশ জন লোকের দরকার হয়। তাই দেখে দৈত্যদের মধ্যে দু'জন ভয়ে মন্দির ছেড়ে দৌড়ে পালিয়ে বাঁচল আর তিনজন আবার বন্দী হল পদ্ম সম্ভবার হতে। পদ্মসম্ভবা তাদের পঞ্চপাশে বেঁধে রাখলেন। যতদিন এই মন্দিরের দেবতারা জাগ্রত থাকবেন ততদিন পর্যন্ত তারা এখানেই বন্দী থাকবে। বহিঃশত্রুর আক্রমণে যদি কোনদিন ধ্বংস হয় তাহলেই তারা ছাড়া পাবে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি ঠিক তার সামনেই সেই বিরাট পাথরটা একটা থামের নীচে পড়ে আছে। এই পাথরটা দর্শন ও স্পর্শ করা একটি পুণ্যের কাজ।

মন্দিরের ঘন্টা, তাংখা, উৎসবের বড় বড় হাঁড়ি এসবগুলো দেখে, আবার আমরা বাইরে এলাম। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা গড়িয়ে এল। আমরা মন্দিরের চারপাশে আরও তিনবার প্রার্থনাচক্র ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মণি মন্ত্র জপ করে পরিক্রমা করছি ঠিক এমন সময় মন্দিরের ভেরী বেজে উঠল, সেই সাথে সাথে ডমরু। সেই শব্দ হঠাৎ যেন মন্ত্রের মত কাজ করল। চারদিক থেকে দলে দলে লোকজন ছুটে আসতে লাগলো সন্ধ্যারতির জন্য। আমরা শেষবারের মতো মন্দির পরিক্রমা করছি, কাজেই তা সম্পূর্ণ না হলে যেতে পারি না। যাই হোক, শেষে মন্দির পরিক্রমা সেরে যখন ঠাকুর মণ্ডপে এলাম তখন মণ্ডপে লোকে লোকারণ্য, ভেতরে একটা ইঁদুরেরও ঢোকার সাধ্য নেই। জোখাং মন্দিরের প্রথম সন্ধ্যারতি বাইরে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করতে হল। লামা ও ভক্তদের সমবেত প্রার্থনা আর সেই সাথে সাথে পুরোহিতদের মুদ্রা আর শঙ্খধ্বনীর মত ভেরী সব মিলিয়ে আমরা সেদিন স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করলাম, সারা জীবনেও তা ভুলবো না। সন্ধ্যারতির পরই মূল মন্দিরের (গ্রীলের) দরজা বন্ধ হয়ে যায়। চরণামৃত নিয়ে আমরা সেদিনের মত তৃপ্ত হয়ে ক্লান্তি দূর করলাম।

জোখাং মন্দিরটাতে বাইরের লোককে থাকতে দেয়া হয় না। মন্দিরের পাশে যে পুরোহিতের বাড়ীটা আছে সেখানে যারা মন্দিরের পূজারী ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন তারাই থাকেন। বাইরে থেকে আসা লামাদের কোনোরকম থাকার বন্দোবস্ত নেই। প্রায় শ'খানেক লামা সেখানে থাকেন তারা সবাই বেতনভোগী। কাজেই সেখানে আমাদের থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমাদের সে রাতের জন্য থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে অন্য একটা বাড়ীতে, সেটাকে একটা পুরানো ধর্মশালা বললে ভুল হবে না। শহরের যে অংশ দিয়ে সকালে প্রবেশ করেছি সেই অংশেই আবার ফিরে এলাম অর্থাৎ ফারগো-কালিং-এর দিকে। বাড়ীটা পুরানো কিন্তু ভেতরকার বন্দোবস্ত খুব ভাল অর্থাৎ তীর্থযাত্রীদের যা দরকার তার সবই এখানে আছে। রান্নাঘর ও আগুন পোহাবার জন্য কাঠ। পায়খানা নেই তার জন্য একটু হেঁটে নদীর ধারে যেতে হবে। আমরা অনেক হেঁটেছি কাজেই হাঁটতে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই।

ফারগো-কালিং'এর কাছেই আমাদের ধর্মশালাটি অবস্থিত। আমাদের ধর্মশালার কিছুদূরেই এখানকার কাশাক্ দপ্তর। কাশাক্ দপ্তরটা আমাদের রাইটার্স-বিল্ডিং এর মতো। এখান থেকে লাসা তথা সমস্ত তিব্বত শাসন করা হয়। প্রধান পুরোহিত ও মন্ত্রীরা এখানেই আসেন তাদের দৈনন্দিন হিসাব নিকাশের জন্য। সকাল থেকে এ পর্যন্ত মনে আনন্দে ও উচ্ছ্বাসের দরুন একটা জিনিস লক্ষ্য করিনি। সন্ধ্যে হতেই সেটা লামাদের চোখে পড়ল। সেটা হচ্ছে আলো। হ্যাঁ আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম লাসায় ইলেক্ট্রিক্ আছে। রাস্তায় তো বটেই সেই সাথে সাথে এখানকার বাড়ীঘরগুলোতেও বিজলী বাতি আছে। তবে সব বাড়ীতে নয়, একমাত্র বড়লোকেরাই ইলেক্ট্রিকের সংযোজন নিতে পারে। ধর্মশালার জানালা দিয়ে পোতালা প্রাসাদটাকে স্বপ্নপুরীর মতো দেখাচ্ছে। পোতালার আলোগুলোর সাথে আকাশের তারার এক সুন্দর সমন্বয়। মনে হচ্ছে আকাশের তারাগুলোই পৃথিবীতে এসে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

যদিও স্রোং-সান্-গাম্পো লাসা ও পোতালার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেছেন কিন্তু আসলে লাসার উন্নতি হয় তারও অনেক আগে। প্রায় চারশ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্য ও যাতায়াতের প্রধান কেন্দ্ররূপে লাসা শহরটির গোড়াপত্তন হয়। আর তারই পাশের পোতালা পাহাড়ে স্থাপিত হয় প্রথমে ছোট একটি দুর্গ। সেই দুর্গটিকেই পরবর্তীকালে

স্রোং-সান্-গাম্পো পরিণত করেন তার প্রাসাদে। লাসার শাসন কার্যের জন্য আশপাশের গুম্ফা থেকে লামাদের নিযুক্ত করা হয়। দ্রেপুং, সেরা এবং গানদেন্ এই তিনটি গুম্ফাই বলতে গেলে লাসার মালিক। আগের লামা-প্রধান অর্থাৎ দালাই লামাও নির্বাচিত করা হত এই সব গুম্ফা থেকে।

লাসা বড় আজব শহর। সকালবেলা ধর্মশালার জানালা দিয়ে লাসা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। মনে হল আজব শহরে এসে পড়েছি। এখানকার অধিকাংশ বাড়ীঘরই প্যাগোডা ধরনের। চীন বা জাপানের ছবিতে এই রকমই দেখেছি। আর সেই সব বাড়ীগুলোর মাঝে মাঝে বেখাপ্পা ধরনের আধুনিক বাড়ী। শহরের প্রধান আকর্ষণ বাজার। সেখানেই লুকিয়ে আছে শহরের প্রাণ। এখানে তীর্থযাত্রীরা সবাই স্বাধীন, যে যেখানে খুশী যেতে পারেন, যার যা খুশী করতে পারেন, সকলেই মুক্ত।

ভোরবেলা আমাদের সঙ্গী লামারা একে-একে সবাই উঠে মন্দিরের দিকে চলে গেলেন, আমি গুরুজীর সাথেই রইলাম। যদিও আমি তীর্থ করতে এসেছি তবুও যতটা সম্ভব শহরটাকে ভালোভাবে দেখাই আমার উদ্দেশ্য। রাজপ্রাসাদ পোতালাকে কিছুতেই এড়ানো যাবে না। শহরের যেখানেই যাওয়া যাক না কেন সেটা চোখে পড়বেই। শহরের বাইরে থেকে জোখাং মন্দিরের ছাদগুলো খুব ভালোভাবে নজরে পড়ে কিন্তু শহরের ভেতর থেকে তার কিছুই দেখা যায় না। আর রাস্তা না জানা থাকলে সেখানে যাওয়াও মুশকিল। কালিম্পং-এর বাজারের প্রায় চারগুণ বড়, তবে বাজারের গলিগুলো খুবই নোংরা। তুলো আর পশমের বাজারটা বিশেষ আকর্ষণীয়। ভেড়ার লোমগুলোকে বড় বড় বস্তায় করে রাস্তার ধারেই রাখা হয়েছে ঠিক তুলোর মতো। নানা রকমের পশমের তৈরী জামা কাপড়ের দোকানগুলোয় লোকে জম-জমাট। উলের মোজা, সোয়েটার, টুপী এখানে খুবই সস্তায় বিক্রি হয়। বাজারের এক অংশে পাইকারী আর অপর অংশে খুচরো বাজার। খুচরো বাজারের দোকানদাররা অধিকাংশই মহিলা, তারা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুন্দরভাবে চুল বাঁধা, পোশাকেও পরিষ্কার। রাস্তায় চলতে চলতে প্রায় কানে আসে মেয়েদের মনখোলা হাসির শব্দ। সবজির বাজারটা খুবই শুকনো। শাক-সবজি সবে হতে শুরু করেছে। বরফের পরেই জমিতে লাঙ্গল পড়েছে মাত্র, ফসল উঠতে এখনও মাসখানেক লাগবে। কিছু পাহাড়ি শাক, আলু, টমাটো-স্কোয়াশ আর ছোট ছোট তেলাকুচোর মতো কিছু সবজি চোখে পড়ল। সিকিম বা কালিম্পং থেকে আগে কিছু কিছু শাক সবজি আসতো এখন তা বন্ধ হয়ে গেছে। আজকাল বাজারের অবস্থা মোটেই সুবিধার নয়। সীমান্তের কড়াকড়ি দিন-দিন বেড়েই চলেছে। ভারতের সঙ্গেই ছিল এদের মূল কারবার সেই কারবার, এখন উঠে গেছে। পশমের আশীভাগই বিক্রি হত কলকাতার ব্যবসায়ীদের কাছে, সেটাও আজকাল বন্ধ হয়ে গেছে। সম্প্রতি পিকিং-এর ব্যবসায়ীরা এখানে যাতায়াত শুরু করেছে খুব শীগগীরই মনে হয় তারাই এ বাজারের দখলদার হয়ে যাবে।

তিব্বতী লামারা প্রাণিহত্যা করে না, কিন্তু মাংস খেতে আপত্তি নেই, কাজেই শুকনো মাংস ও মাছের বাজারটাও বেশ উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ গ্রামবাসীরাই শুকনো মাছের থলি নিয়ে বসে। কী-চু নদী হতে টাটকা মাছও স্থানীয় লোকেরা এখানে বিক্রির জন্য নিয়ে আসে। সাধারণ তিব্বতীদের মাছ মাংসই মনে হয় প্রধান উপাদেয় খাদ্য। যমদ্রোক হ্রদ ও সাংপো নদী হতেও প্রচুর পরিমাণে (শুকনো) মাছ আসে। যানবাহন সমস্যার জন্য তিব্বতে টাটকা জিনিসের খুবই অভাব। স্থানীয় ফসলের উপরই ভরসা করে থাকতে হয়। বলাই বাহুল্য, তিব্বতের এই দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলেই মাত্র ভালো ফসল ফলে। এই অঞ্চলটা অপেক্ষাকৃত উচ্চতায় কম আর উপত্যকাটাতেও অনেক সমতল ভূমি আছে। শীতের প্রকোপও এখানে অপেক্ষাকৃত কম। চাষের উপযোগী আবহাওয়ার দরুন এই অঞ্চলেই লোকসংখ্যা প্রচুর। তিব্বতের প্রায় সত্তরভাগ লোক বাস করে এই কী-চু নদীর দু'পাশে।

আমরা এবারে এলাম মুদীখানার গলিতে। সেখানে চাল-ডাল-যব-গম-বার্লি তার এক বিরাট সম্ভার। ডালের মধ্যে মুগ মটরই প্রধান। ছাতু ও বিভিন্ন ধরনের বার্লি দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমরা পাঁচসের চাল কিনলাম দু'টাকা দিয়ে। কৌটো মেপে চালটাকে আমাদের চাদরে ঢেলে দিল, আর তীর্থযাত্রী বলে ফাউ হিসেবে পেলাম আরও প্রায় একসের চাল। তারপর আড়াই সের মুগ ডাল কিনলাম দশ আনা দিয়ে। কলকাতার তুলনায় সস্তাই বটে, বাজারে অসংখ্য দোকান, কিন্তু খোলাবাজারের ফেরীওয়ালাদেরও সংখ্যা প্রচুর। চমরী গরুর শুকনো দুধ এখানকার আর এক উল্লেখযোগ্য ব্যবসা। চকোলেটের মতো ছোট ছোট করে কেটে সেগুলো সের দরে অথবা ডজন ভাগে বিক্রি করা হয়। বাজারের শেষের দিকে লাসা গেটের কাছে আর একটা জিনিস নজরে পড়ল। ভিখিরিরা ভাগে ভাগে পয়সা বিক্রি করছে, ভারতীয় পয়সা দিয়ে খুব সস্তায় তিব্বতী পয়সা কিনতে পাওয়া যায়। তীর্থযাত্রীরা ভিখিরিদের দেবার জন্য এই সব খুচরো পয়সা কিনে থাকে। ঠিক যেমন দেখেছি রামেশ্বরম-এর ঘাটে। বাজারের চায়ের দোকানে এই প্রথম নজরে পড়ল তেলেভাজা, অনেকটা পিঁয়াজী সিঙ্গারা ধরনের। রুটি, বিস্কুট, তরকারি, ডাল, রাস্তার ধারেই বিক্রি হয়, ভাষা না জানলেও কিনতে কোনো অসুবিধা হয় না। তিব্বতী চা, আর মদের দোকানের তো ছড়াছড়ি। ফলের মধ্যে কমলালেবু, ন্যাসপাতি আর আপেল প্রচুর পরিমাণে লাসার আশপাশেই জন্মায় তাই এই ফলগুলো বাইরে থেকে আনতে হয় না। মন্দিরের জন্য ছোট ছোট তাংখা, গামছা, ছোট চাদর আর প্রার্থনা পতাকার সারি সারি রঙ বেরঙের দোকান আছে। এ ছাড়াও রয়েছে পুজোর সরঞ্জামের দোকান, সেখানে ঘন্টা, ডমরু ভেরী, ও নানা ধরনের লামা ও পুরোহিতদের পোশাক পাওয়া যায়। মন্দিরে ফুলের প্রচলন নেই।

বাজারের পাশেই রয়েছে প্যারেড-গ্রাউণ্ড। লাসার পুলিশবাহিনী এখানেই জমায়েত হয়, আর বড় বড় অনুষ্ঠানগুলোও এখানেই হয়।

ঘরবাড়ীগুলোর অধিকাংশই অতি সুন্দরভাবে রঙ করা। সম্ভ্রান্ত বাড়ীগুলোর

ছাদগুলো প্যাগোডা ধরনের আর ঢেউ তোলা ছাদের শেষের দিকে উজ্জ্বল ড্রাগন মূর্তিগুলো মনে হচ্ছে লাসা শহরের জাগ্রত প্রহরী। লাসা শহরে চীনের প্রভাবকে কিছুতেই অগ্রাহ্য করা যাবে না, সম্ভ্রম রেষ্টুরেন্টগুলোতে চীনা মেনুতে ভর্তি, খাওয়া দাওয়ার স্টাইলও চীনাঘেঁষা। সেখানে চামচের পরিবর্তে কাঠি দিয়ে খাওয়াতেই লোকে অভ্যস্ত। কলকাতায় যেমন বিলিতি ধরনের রেস্টুরেন্টে খাওয়াটা উন্নত আভিজাত্যের প্রমাণ, তিব্বতীয়দের চীনা খাদ্য গ্রহণও অনেকটা সেই ধরনের । চীনা খাদ্য, বাসন, ও ঘরের সাজসজ্জার জন্য চীনদেশীয় ডেকোরেশন করা উন্নত রুচির পরিচয়। বাজারের অনেক সম্ভ্রান্ত দোকান চীনদেশীয় জিনিসপত্রে ভর্তি, অনেকটা কলকাতারর নিউ মার্কেটের মতো। ছোট্ট একটা চীনা মার্কেটও আছে। সেখানে লাসার সুন্দরীরা চাকরদের নিয়ে আসে মার্কেটিং করতে। সেই বাজার চীনা সামগ্রীতে ভর্তি।

লাসা শহরটা খুব বড় নয়। দৈর্ঘ্যেও-প্রস্থে দু'মাইলের বেশী নয়। শহরের উত্তর দিকে পোতালা প্রাসাদ—দক্ষিণে নদী পশ্চিমে দ্রেপুং গুম্ফা আর পূর্বে নরবুলিংকা অর্থাৎ চেন্-রে-জির গ্রীষ্মাবাস-প্রাসাদ। দ্বিতীয় দিন আমরা সবাই মিলে আবার গেলাম মূল মন্দিরে সন্ধ্যারতি ও সমবেত প্রার্থনার জন্য। জোখাং-এর সমবেত প্রার্থনার সুর আমাদের কাছে নতুন, সে প্রার্থনা যদি সারারাত ধরে শোনা যায় তাহলেও আমরা ক্লান্ত হব না। পৃথিবীর এই পর্বতচূড়ায় সম্পূর্ণ মানব জাতির এটাই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা।

রাজ-প্রাসাদ পোতালা

লাসায় আসা অবধি স্বপ্নপুরীর মতো এই প্রাসাদটাকে দেখছি, আর তার ভেতরের রূপ দেখবার জন্য ছট্‌ফট্ করছি। তীর্থযাত্রীদের মন পড়ে আছে জোখাং মন্দিরের দিকে আর আমার মন পড়ে আছে পোতালা প্রাসাদে। গুরুজীকে সেই ইচ্ছাটা বার বার জানিয়েছি। কিন্তু আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হচ্ছে। লাসায় এখন চীনা গুপ্তচরে ভর্তি। জোখাং প্রাসাদ ছেড়ে আমরা যদি পোতালার দিকে যাই তাহলেই লোকের নজরে পড়তে হবে। পোতালা প্রাসাদটা যদিও লাসা তথা তিব্বতের প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু তবু তীর্থযাত্রীদের কাছে তার মূল্য কম। তীর্থযাত্রীদের মূল আকর্ষণ জোখাং মন্দির।

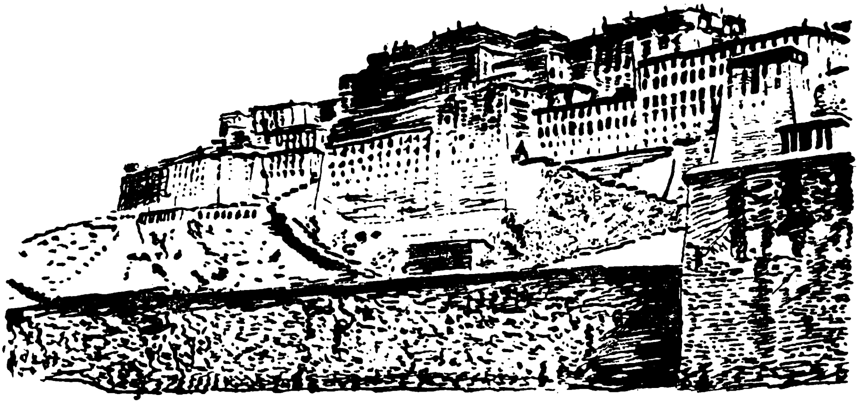

পোতালা প্রাসাদ

তৃতীয় দিন সকালে হঠাৎ গুরুজী শুভ সংবাদ নিয়ে এলেন। গুরুজীর এক বিশেষ পরিচিত লামা বর্তমানে পোতালা প্রাসাদেরই কোন একটা দপ্তরে কাজ কারেন। তার সাথে দেখা করার অজুহাতে আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। অন্যান্য লামারা ভোরবেলা উঠেই ধন্না দিতে বেরিয়ে গেছেন। আমাদের ধর্মশালার ঠিক নীচেই সারি সারি চায়ের দোকান। সেখান থেকে আমরা দু'কাপ চা খেয়ে রওনা দিলাম পোতালার উদ্দেশ্যে।

লাসা শহরের উত্তরাংশে পোতালা কুড়ি পঁচিশ মিনিটের পথ। পোতালার ঠিক বর্ণনা দিতে হলে আমি বলবো যে ছোট একটা পাহাড়ের চূড়া কেটে তার ওপর তেরো তলার

একটা বাড়ী বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর সেই বাড়িতে উঠবার জন্য চারদিকে বিভিন্ন আকারের সিঁড়ির সংযোগ রয়েছে। পৃথিবীর যত রাজপ্রাসাদ আছে পোতালা নাকি তার মধ্যে সবচেয়ে নয়নাভিরাম। পোতালার পিছনে সারি সারি পাহাড়, আর মেঘ দিয়ে তার ব্যাক্-গ্রাউণ্ডটা সাজানো হয়েছে। এই প্রাসাদটাকে পরিষ্কার তিনি ভাগে ভাগ করা যায়। মাঝখানে লাল রঙের আর তার দু'পাশে পাখীর ডানার মতো দুটো সাদা বাড়ী। মাঝখানের লাল বাড়ীটার ছাদগুলো সোনালী রঙের গম্বুজাকৃতির। অনেকটা মন্দিরের চূড়ার মতো আর দু'পাশের বাড়ীগুলোর ঢালাই ছাদ। লাসা শহর থেকে এই প্রাসাদের উচ্চতা প্রায় তিনশ' পঁচাত্তর ফুট। আর প্রাসাদের সর্বোচ্চে মহামান্য দালাই লামার ঘর সেটা চারশ' ফুটেরও উপরে। আমরা পোতালা পাহাড়ের নীচে এসে হাজির হলাম।

পোতালার ঠিক নীচে এসে বুঝলাম যে, লাসা শহর আর পোতালা দুটো পৃথক। পোতালা রাজপ্রাসাদকে নিয়ে গড়ে উঠেছে আর একটা শহর। পোতালায় উঠবার জন্য কোন বিরাট রাস্তা নেই। এখানকার রাস্তাগুলো সবই সিঁড়ি। সিঁড়িগুলো দৈর্ঘে প্রস্থে বিরাট কিন্তু ধাপগুলো ছোট ছোট। ঘোড়ায় চড়ে এই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে মোটেই অসুবিধা হবে না। পোতালা প্রাসাদটি যত সুন্দরই হোক না কেন, এর প্রবেশ পথটা মোটেই পরিষ্কার নয়। প্রথমেই চোখে পড়ল ভিখিরিদের আড্ডা তারপর কতকগুলো নোংরা বস্তিবাড়ী। সেই সব বাড়ী থেকে রাস্তাঘাটে আবর্জনা স্তূপীকৃত করা হয়েছে। এখানকার পৌর সংস্থা এদিকে কোনরকম দৃষ্টি দেন বলে মনে হয় না। বর্ষার জল অথবা ঝড়ই ময়লা পরিষ্কারের একমাত্র উপায়। পাহাড় কেটে সিঁড়ির রাস্তা তৈরী করা হয়েছে। রাজপ্রাসাদ এখনও অনেক উঁচুতে। আমরা একটা খাড়াই পাহাড়ের গা ঘেঁষে হেঁটে চলেছি। বস্তি এলাকাটা পেরিয়ে আরও এগিয়ে একটা ছোট গলিতে আমরা ঢুকলাম। গলির সিঁড়িতে কয়েকটা বাচ্চা ছেলে খেলা করছিল আমরা তাদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় পেছন থেকে কে যেন আমাদের ডাকলেন। ভালো করে তাকাতেই নজরে পড়ল, বাড়ীর জানালা দিয়ে এক বয়স্ক লামা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন।

আমাদের সাথে দৃষ্টি বিনিময় হতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় যাচ্ছো?

—আমরা আমাদের এক পুরোনো বন্ধুকে খুঁজছি, গুরুজী উত্তর দিলেন।

—তা তোমাদের দেখেই বুঝতে পারছি, তোমরা তো লাসার লোক নও, তোমাদের বন্ধুর নাম কি?

—তার নাম ইয়াংচে লামা, একটু বয়স্ক লোক।

—ওঃ বুঝেছি—একটু এগিয়ে বাঁদিকের সিঁড়িটার নীচের গলিতে। মনে হয় এখন সে অফিসেই আছে।

ভদ্রলোককে বিশেষ ধন্যবাদ দিয়ে আমরা আবার উঠতে লাগলাম। পোতালার রাস্তা মানেই সিঁড়ি। এখানকার সিঁড়িগুলো খুব অদ্ভূত ধরনের—প্রধান পথটা খুব চওড়া, কিন্তু আশপাশের গলিগুলোর সিঁড়ি খুব খাড়াই। উপর থেকে যদি কেউ একবার গড়িয়ে পড়ে তাহলে তার থামবার উপায় নেই। আমরা নির্দিষ্ট গলিতে এসে ইয়াংচে

লামার বাড়ীর দরজায় ধাক্কা দিলাম। অনেকক্ষণ ধাক্কা দেবার পরও কোন সাড়াশব্দ পেলাম না। আমাদের ডাকাডাকির শব্দে পাশের বাড়ী থেকে এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। তিনি হাসিমুখে আমাদের প্রণাম করে জানালেন—

—ইয়াংচে লামা সকালবেলা বেরিয়ে গেছেন, তিনি ফ্রাদ্রোং মারপোতে গেছেন। ফাদ্রোং মারপোর নীচের তলায় তাকে পাবেন।

ভদ্রমহিলাকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা আবার সিঁড়ি ধরলাম। দেখতে দেখতে আমরা অনেক উঁচুতে উঠে এলাম। তবে রাস্তাগুলোর দু'পাশে ঘন বাড়ী-ঘরের দরুন দূরের দৃশ্য আমাদের নজরের বাইরে। ফাদ্রোং মারপো পোতালার লাল প্রাসাদের স্থানীয় নাম। পাহাড়ের উঁচু অংশে প্রাসাদের আরম্ভ। দেখলেই বোঝা যায় যে এটা একটি দুর্গ। প্রধানত রাস্তাটা পোতালার লাল প্রাসাদের নীচে এসে থেমেছে। সেখানে এসে আমরা একটু জিজ্ঞাসাবাদ করেই ইয়াংচে লামাকে পেলাম।

প্রাসাদের নীচে প্রায় অন্ধকার একটা ঘরে এসে ঢুকতেই এক বুড়ো ভদ্রলোককে পেলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন—

—ইয়াংচে লামা ? কেন কি দরকার ?

—আমি তার বন্ধু, তার সাথে অনেকদিন যাবৎ দেখা হয়নি তাই দেখা করতে চাই।

—আপনার কি নাম ?

গুরুজী তার পরিচয় দিতেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, অন্ধকারেও যেন তার মুখটাকে গোপন করা গেল না। তিনি উঠে গুরুজী ওরফে সাধুবাবাকে জড়িয়ে ধরলেন। দুই বৃদ্ধের মিলন দৃশ্য বড় আনন্দের, তারা দু'জনে হঠাৎ যেন যৌবনে এসে পড়লেন। তাদের আলিঙ্গন শেষে আমি বৃদ্ধ লামাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। গুরুজী আমার সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন। দূরে একটা প্রদীপ জ্বলছিল, বৃদ্ধ লামা সেই প্রদীপটা একটু উস্‌কে দিয়ে ভালোভাবে আমার মুখের দিকে তাকালেন। বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নাম কি বাবা ? আমি উত্তর দিলাম—বিমল। বৃদ্ধ লামার উজ্জ্বল মুখ ও পবিত্রতার সামনে আমার সত্য কথাটা বেরিয়ে পড়ল। গুরুজী কথাটা লুফে নিয়ে বললেন—মানে মৌনী বাবা ও আমারই চেলা।

তারপর তিনি আমার বিষয় বিস্তারিত ভাবে বৃদ্ধ লামাকে জানালেন। বৃদ্ধ লামা বিস্তারিত শুনে আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, সাবধানে থেকো—সঙ্ঘ, ধর্ম ও বুদ্ধের পথই তোমাকে শ্রেষ্ঠ পথে পরিচালিত করবে। তারপর তিনি প্রায় ফিসফিস করে বললেন—একে খুব সাবধানে ও চোখে চোখে রাখবে, হান্‌দের চোখ যেন না পড়ে।ওরা ভারতীয়দের একদম পছন্দ করে না। তবে খুব যদি অসুবিধায় পড় তাহলে দিকী লিংকায় চলে যাবে, সেখানে ভারতীয় দূতাবাসের সাহায্য চাইবে। তবে এতদূর যখন আসতে পেরেছ তখন তথাগতই তোমাদের রক্ষা করবেন।

কথায় কথায় জানলাম যে বৃদ্ধ লামা ভারতবর্ষকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, তিনি

কলকাতায় একবার গিয়েছেন, বুদ্ধগয়াতেও তীর্থ করতে গিয়েছিলেন। লাসার লোকদের কাছে কলকাতা এক পরমাশ্চর্য স্থান।

বৃদ্ধ-লামার অনেক গুণ, তিনি শিল্পী, গুরু আর বিভিন্ন গুম্ফার হিসাব পরীক্ষক। আজকাল তিনি আগের মতো অতোখাটতে পারেন না, তাই পোতালার বস্ত্র-ভান্ডারের মজুতের হিসাব রাখেন। এই কাজটা আগের কাজের থেকে অনেক সহজ আর দায়িত্বও কম। বৃদ্ধ লামা হঠাৎ আমাকে বললেন—এস এই জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখো দৃশ্যটা খুব চমৎকার। তাঁর কথানুযায়ী আমি তার ঘরের কোণের জানালার দিকে এগিয়ে গেলাম। ঘরটার দেয়াল পাথরের কিন্তু দরজা জানলাগুলো সব কাঠের, অতি চমৎকার কাজ করা, জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই হঠাৎ যেন মাথাটা ঘুরে গেল। জানালাটার পরই পাহাড়ের বিরাট খাদ। এখান থেকে দূরে দেখা যাচ্ছে শহরের দৃশ্য, আমরা এখন পাহাড়ের উপরে। এই ঘরটা পোতালা রাজপ্রাসাদেরই একটা ঘর। বৃদ্ধ লামা রোজ ওঠানামা করতে চান না তাই এই ঘরটাই তার দপ্তর। অন্যান্য লামারা এই ঘরে আসেন তাঁর সাথে পরামর্শ করতে। তিনি বৃদ্ধ বটে কিন্তু শরীরটা খুবই মজবুত। পোতালার সিঁড়ি দিয়ে হাঁটা-চলা করা দুর্বলের কাজ নয়। জানালা দিয়ে বাইরে না তাকালে কিছুতেই মনে হবে না যে আমরা এত উঁচুতে উঠেছি। অনেকদিন পর বৃদ্ধ লামা তাঁর বন্ধুকে পেয়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে ডুবে গেলেন। তাঁদের মূল বিষয় হচ্ছে বর্তমানের তীর্থযাত্রী আসা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। চীনাদের ভয়ে কেউ আসেত চায় না। আর কতকাল এরকম চলবে কে জানে। মহামান্য দালাই লামার বয়স এখন মাত্র একুশ বছর। চীনা রাজনীতি বোঝা কি এইটুকু ছেলের পক্ষে সম্ভব! তবুও দালাই লামা বলে কথা, তিনি হোমরা চোমরা চীনা প্রতিনিধি ও মিলিটারী অফিসারদের সাথে যেরকমভাবে কথাবার্তা চালাচ্ছেন, অন্য কোনো এই বয়সের ছেলের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

প্রায় ঘন্টাখানেক বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা বলে আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম। বৃদ্ধ লামা আমাদের সাথে প্রাসাদের চারতলা পর্যন্ত এলেন সেখানে ছ'জন তিব্বতী প্রহরী প্রাসাদ তোরণে মোতায়েন করা রয়েছে, পরিচয় না থাকলে এখানকার গার্ড অফিস থেকে অনুমতি নিতে হয় প্রাসাদ দেখবার জন্য। রাজ্যের পুলিশ রক্ষীবাহিনী অথবা কাশাগ্ দপ্তর থেকে এই অনুমতিপত্র নিতে হয়। বৃদ্ধ লামার কৃপায় আমাদের আর আলাদা করে অনুমতি নিতে হল না। তিনিই আমাদের বন্ধু বলে দরজা পার করে দিলেন। তারপর বিকেলে আবার দেখা হবে বলে বিদায় জানালেন। ইয়াংচে লামা বয়সে গুরুজীর চেয়ে আরও প্রায় দশ বছরের বড় সেইজন্য গুরুজী তাঁকে বৃদ্ধ লামা বলে ডাকেন। ভদ্রলোক বার বার আমাদের বললেন যে তাঁর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া না করে যেন কিছুতেই না যাই। তিনি সেই সময়ের জন্য বিদায় নিলেন।

পোতালা প্রাসাদটি বহু বছর আগে অর্থাৎ বন্ ধর্মের সময়ে এটা ছিল সাধুদের ধ্যানকেন্দ্র। এখানকার আবহাওয়া আর অবস্থানটি ধ্যানের পক্ষে ছিল খুবই অনুকূল। সমস্ত জীবন ধরে তপস্যা করে যে ফল পাওয়া যায়, এখানে বসে ধ্যান করলে সে ফল পেতে লাগে মাত্র কয়েক বছর। তন্ত্র ও বন্ ধর্ম নিয়ে যাঁরা সাধনার উচ্চমার্গে উঠতে

চাইতেন তাঁদের কাছে পোতালা পাহাড়টি ছিল সাধন-সিদ্ধ পীঠ। সেই সময়টা ছিল আজ থেকে প্রায় তেরশ’ বছর আগে। প্রাচীন বন্ পন্থীরা এই অঞ্চলটিকে পরম পবিত্র স্থান বলে ঘোষণা করেন।

পোতালার শ্রীবৃদ্ধির জন্য সতেরোশ’ খৃষ্টাব্দে পঞ্চম দালাই লামা উঠে পড়ে লাগলেন, তাঁরই সময়ে নির্মিত হয় বর্তমান প্রাসাদটি। এর নির্মাণ সম্পর্কে খুব চমৎকার একটি গল্প শুনলাম। গল্পটি এরকম—

পঞ্চম দালাই লামার রাজ্য শাসন ও বিদ্যাবুদ্ধির খুব সুখ্যাতি ছিল। তাঁরই আমলে প্রথম ভৌগোলিক সীমা নির্ধারিত হয়। তিনিই ঠিক করলেন যে এই পোতালার উপর নির্মাণ করবেন তিব্বতের শ্রেষ্ঠ অট্টালিকা। গঠন ও সৌন্দর্যে যেটা হবে তিব্বতের নিজস্ব ভাবধারার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পোতালা পাহাড়ের উপর প্রাসাদ তৈরীর জন্য চারদিক থেকে তিব্বতের জ্ঞানীগুণীরা এসে হাজির হলেন। তারপর শুরু হল পরমারাধ্য দালাই লামার নেতৃত্বে প্রাসাদ নির্মাণ। প্রাসাদটির পরিকল্পনানুযায়ী তেরো তলা হওয়া দরকার আর ঘরের সংখ্যা হবে প্রায় একহাজার। প্রবল উৎসাহে শুরু হল কাজ, নাগরিকদের উৎসাহ আর রাজার ধনভাণ্ডর দুইয়ের সংমিশ্রণে আস্তে আস্তে পাহাড় কেটে তৈরী হতে লাগলো ঘর-বাড়ী। প্রায় দ্বিতীয় তলা সমাপ্ত হয়েছে এমন সময় রাজা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর সেই অবস্থা দেখে রাজার পার্শ্বচর ও মন্ত্রীরা ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। এমন সময় রাজার মৃত্যু হলে সম্পূর্ণ প্রাসাদ নির্মাণের কাজ থেমে যাবে। এই বিরাট পরিকল্পনাটা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবার উপক্রম। পঞ্চম দালাই লামা ছিলেন দূরদ্রষ্টা তাই তিনি মন্ত্রীদের ডেকে পাঠালেন তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে তারপর তাদের উৎসাহ দিয়ে বললেন—নিরুৎসাহ হয়োনা, থেমে যেয়োনা, যে গুরু দায়িত্ব নিয়েছো তা পালন করতেই হবে। এটা হবে আমাদের তথা সমস্ত তিব্বতের গৌরব। এই প্রাসাদটি হবে হিমালয়ের গৌরব। তারপর তিনি তাদের সাথে আরও গুপ্ত পরামর্শে লিপ্ত হলেন। পোতালার দ্বিতীয় তলাটি তখনও সম্পূর্ণ হয়নি এমন সময় তিনি অর্থাৎ পঞ্চম দালাই লামা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর যোগ্য মন্ত্রীরা সঙ্গে সঙ্গে সে কথা গোপন রেখে দিলেন। তাঁরা অনেকটা দালাই লামার মতো দেখতে এমন একজন বৃদ্ধ লামাকে নিয়ে বসালেন তাঁর জায়গায়, বাইরের লোকজনরা জানলো যে দালাই লামা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন সুস্থ হলেই তিনি ধ্যানমগ্ন থাকেন কাজেই কারও সাথে তিনি দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবেন না। প্রকৃত দালাই লামার মরদেহটাকে রাজবাড়ীরই একটা ঘরে গোপনভাবে সমাধিস্থ করা হল। পোতালার কাজ এগিয়ে চলল। দালাই লামার মৃত্যু সম্পর্কে কেউ এতটুকু সন্দেহও করল না। দীর্ঘ তেরো বছর ধরে চলল মানুষ ও পাথরের খেলা—তারপর প্রকাশিত হল রূপসী পোতালা-প্রাসাদটি। সেই পোতালা-প্রাসাদে নতুনভাবে সাড়ম্বরে সমাধিস্থ করা হল পঞ্চম দালাই লামার মরদেহ। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত পরবর্তী দালাই লামাদের দেহও এখানেই সমাধিস্থ করা হয়। ধর্ম ও কর্মফল অনুযায়ী পঞ্চম দালাই লামা বার বার আবির্ভূত হন চেন্-রে-জি অবতার হিসেবে। তাঁর সাধের পোতালা প্রাসাদের তিনিই

অধীশ্বর। এক দেহের অধীনে আর এক দেহ ধারণ করে পুনর্জন্ম নিয়ে তিনিই আসেন। পঞ্চম দালাই লামার আগে কোন দালাই লামা ছিল না। পুনর্জন্মে দালাই লামার ভূমিকাতে পঞ্চম দালাই লামাই হলেন প্রথম দালাই লামা।

পোতালা প্রাসাদে সাতটি বিশাল সমাধি মন্দিরে আছে সাতটি দেহে একই আত্মার নতুন দেহ। মনে পড়ে গীতার সেই অমর বাক্য—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবাণি গৃহ্লাতি নরোপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণীর যুক্তিসঙ্গত ও আক্ষরিক প্রমাণ এর থেকে বেশী আর কি হতে পারে। দালাই লামার একই আত্মা বার বার নতুন দেহ নিয়ে আসেন পোতালা প্রাসাদে বাস করতে।

পোতালার মাঝখানের বাড়ীটাই খুব রংচঙে, আর তার দু'পাশের বাড়ীগুলো সাদার উপর লাল ও সোনালী দাগ দেওয়া। আমরা ভেতরে ঢুকতেই একজন লামা আমাদের সাথে সাথে ঘুরতে লাগলেন। দেখেই মনে হয় তিনি গাইড। আমরা কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই তিনি সব কিছু বুঝিয়ে বলতে লাগলেন।

মূল প্রাসাদের মধ্যভাগে রয়েছে পঁয়ত্রিশটি ছোট ছোট মন্দির। এই পঁয়ত্রিশটি মন্দিরের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চেন্-রে-জির মন্দির। সেটা আসলে একটা স্মৃতিসৌধ। অনেকটা তাজমহলের মতো। তবে তাজমহলে বেগম নূরজাহানের দেহটা শায়িত তার উপর রয়েছে কবর। আর এখানে সৌধের উপর নির্মিত হয়েছে স্রোং-সান্-গাম্পোর বিরাট সোনার মূর্তি। এই মূর্তিটা যদি সত্যই সোনার হয় তাহলে পোতালা প্রাসাদটি নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সেরা ও দামী সৌধ। স্রোং-সান্-গাম্পো বা চেন্-রে-জির সেই মূর্তির দু'পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁর দুই স্ত্রী। নেপাল ও চীনের রাজকুমারীদ্বয় লাইফ্ সাইজের এই মূর্তিটি মানুষ মাত্রেই প্রশংসা না করে পারবে না। বহুদূর থেকে পোতালা প্রাসাদের এই সাতটি সোনালী রঙের চূড়া আমাদের চোখে পড়েছিল এখন কাছে এসে দেখছি যে সেই চূড়াগুলো আসলে সমাধি চৈত্য অর্থাৎ সাতটি চৈত্য। ত্রয়োদশ দালাই লামার চৈত্যটি সবচেয়ে বড়। এই চৈত্যটি জোখাং মন্দিরের মতো, কয়েকটা সিঁড়ি নীচে নেমে গিয়ে তাকে দেখতে হয়। এই সমাধি বেদি ও মূর্তিগুলো সম্পূর্ণ সোনার তৈরী এর মধ্যে এতটুকু ভেজাল নেই। এক টন সোনা দিয়ে শুধু ত্রয়োদশ দালাই লামার বেদী ও মূর্তিটা তৈরী। আমার মতো এক ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে এর মূল্য যাচাই করা অসম্ভব। এক টন সোনা চোখের সামনে দেখছি—তাকে স্পর্শ করছি, এর আগে কোনদিন এক ভরি সোনাও ছুঁইনি, এদিক থেকে বিচার করে দেখলেও মনে হয় আমার তিব্বতে আসা সার্থক হয়েছে। এক টন সোনার সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের আশপাশে অনেক তিব্বতী গরীব

তীর্থযাত্রী আর ভিখিরিরাও রয়েছে। এই বিরাট রত্নভাণ্ডারের তত্ত্বাবধানে কোন সৈনিক বা রক্ষীবাহিনী নেই। এখানেই তিব্বতীদের পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের পরিচয়। এমন পবিত্রতা আর স্বর্গীয় মনোভাবের পরিচয় জগতে বিরল। স্মৃতিসৌধগুলোর দেয়ালগুলোও চমৎকারভাবে চিত্রিত করা। তাতে ভগবান বুদ্ধের জীবনী এবং বহু তথ্য পাওয়া যায়। চীনদেশীয় অনেক উপকথা চিত্রের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিংহ, ড্রাগন, ঘোড়া, হাতী, সাপ, বানর ইত্যাদি বহু জন্তু জানোয়ারের ছবিও চারদিকে রয়েছে। চৈত্যের বারান্দায় সারি সারি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে দামী কাপড়ের উপর সৌখিন তৈল চিত্র। তাতে মণ্ডলা,মুদ্রা আর তথাগতের জীবন আলেখ্যতে ভর্তি। পাথরের সাথে খাপ খাইয়ে রয়েছে বিরাট বিরাট থাম। শালগাছের গুঁড়ির মতো সেই থামগুলোও সুন্দর খোদাই কাজে ভর্তি। লাল সোনালী আর হলদে রঙই মনে হয় তিব্বতীদের পছন্দ। যে রঙই হোক না কেন প্রত্যেকটি রঙই খুব উজ্জ্বলভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আমি শিল্পী নই কাজেই কারুকার্যগুলো বিশেষ বিচার ভঙ্গি নিয়ে দেখার ক্ষমতা আমার নেই। আমি হাতের নখ দাঁত দিয়ে কাটতে কাটতে ভাবছিলাম সেই তাল তাল সোনাগুলোর কথা। যে দেশে এত সোনা জমে আছে সে দেশের লোকেরা ভিক্ষে করে কেন? হয়তো এই সোনাগুলো সবই পবিত্র—তা খরচ করার অধিকার মানুষের নেই। এটাই আপাততঃ আমার মনোমতো উত্তর। চেন্-রে-জির সোনার মূর্তিটা তিরিশ ফুট উঁচু। শুধু সোনাই নয় সেই সাথে সাথে খাপ খাইয়ে রয়েছে অজস্র মণি-মুক্তা, দেব-দেবীর চূড়া ও বাসনপত্রগুলো সবই যেন অমূল্য রত্নসম্ভার। পোতালা প্রাসাদের এই লালবাড়ীটার সাতটি চৈত্যই দর্শকদের প্রধান আকর্ষণ। আমরা এখন হাঁটছি বাড়ীটার নয় দশ তলার উপর দিয়ে। ঘর বা বারান্দাগুলোর কোনটাই সমতল নয়। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে হলেও সিঁড়ি ব্যবহার করে উপরে উঠতে হবে নয়তো নীচে নামতে হবে। একটা পাহাড়কে কেটে এই যাদুপুরী তৈরী করতে কত যে কৌশল আর কেরামতির সাহায্য নিতে হয়েছে তা না দেখলে কিছুতেই বোঝানো সম্ভব নয়।

আমার অদম্য কৌতূহল দূর করবার জন্য মন্দিরের পেছনদিকের একটা জানালা দিয়ে উঁকি দিলাম। মনে হচ্ছে আমাদের এই প্রাসাদটা শূন্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আমার প্রশ্ন করার আগেই লামা ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে এলেন। তারপর অতি নরম গলায় বুঝিয়ে দিতে লাগলেন চারপাশের দৃশ্যাবলী।

এখন আমরা আছি পোতালা প্রাসাদের গুম্ফায়। এই গুম্ফা বা মন্যাস্ট্রীতে প্রায় দু'শ জনের মতো লামা থাকেন। এই গুম্ফাটা সম্পূর্ণ স্বাধীন, পোতালার নিজস্ব গুম্ফা। এখানকার লামারাই পোতালার চৈত্যগুলোর দেখাশুনা করেন। জানালা দিয়ে বাইরে দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ অন্য দৃশ্য। লাসা শহরের ঠিক বিপরীত দিক। কিছুদূরে যে বিরাট গুম্ফাটা দেখা যাচ্ছে সেটাই নামকরা চাক্‌পুরী ভেষজ কেন্দ্র। অর্থাৎ তিব্বতের সবচেয়ে বড় চিকিৎসাকেন্দ্র ও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। চিকিৎসাকেন্দ্র বটে তবে আমাদের দেশের হাসপাতাল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানকার চিকিৎসাবিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক প্রথায় প্রতিষ্ঠিত। আয়ুর্বেদের সাথে পাহাড়ি ও স্থানীয় চিকিৎসাপদ্ধতিও যোগ করা

হয়েছে। তিব্বতের নামকরা চিকিৎসকগণ ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা ভারতবর্ষ থেকে চিকিৎসাশাস্ত্র অনুবাদ করে নিয়ে গিয়েছেন, তাদের মধ্যে বৈরচনা, রিন্‌চেন জাম্পো, ইয়াং লাগ্‌ বিশেষ নাম করা। তিব্বতের এই চাক্‌পুরী বিদ্যানিকেতনে যে সব বই পড়ান হয় তাতে চন্দ্রনন্দন, জনার্দিন, ধর্মশ্রীবর্ধন, বাগ্‌ভট্ট, নাগার্জুন প্রভৃতি ভারতীয় পণ্ডিতদের নাম উল্লেখযোগ্য। পাঁচ-ছটা বড় বড় চৈত্যকে কেন্দ্র করে চাক্‌পুরী চিকিৎসালয় গড়ে উঠেছে। এখান থেকে শুধু তার ছাদটাই দেখা যায়। তারই একটু দূরে কী-চু নদীটা ধীরে বয়ে যাচ্ছে, অতি চমৎকার দৃশ্য। জানালার ঠিক নীচেই অর্থাৎ পোতালা পাহাড়ের ঠিক নীচে যে গ্রামটা দেখা যাচ্ছে তার নাম-চো।

গাইড প্রায় একনিঃশ্বাসে আমাদের জানালার বাইরের দৃশ্য বর্ণনা করে দিয়ে সরাসরি হাত পেতে বলল, দিন চার আনা পয়সা। আমরা দিলাম দু'আনা তাতেই সে খুশী। আমাদের বার ব্যর প্রণাম করতে করতে সে উধাও হল। গুরুজী পোতালা প্রাসাদকে ভালোভাবেই চেনেন কিন্তু লোকটি কিছুতেই আমাদের ছাড়ছিল না। বারান্দাগুলো খুবই চওড়া আর লম্বা তো বটেই। কিন্তু সে তুলনায় খুবই অন্ধকার। ভেতরের ঘিয়ের প্রদীপে পরিষ্কারভাবে সব কিছু দেখা যায় না। ইলেক্‌ট্রিক সব জায়গায় নেই, আবার অনেক জায়গায় আছে কিন্তু ল্যাম্প নেই। পোতালার এই মন্যাস্ট্রির নাম নাম্‌গীয়েত্রাচাং (Namgyetrachang)। বারান্দার দু'পাশে সারি সারি ঘর, মাঝে মাঝে লামাদের সাথে দেখা হচ্ছে বটে কিন্তু অস্পষ্ট আলোতে তাদের বয়স বোঝা মুশকিল। গুরুজীর মতে এখানকার লামারা সবাই বয়স্ক। পোতালা প্রাসাদের জন্য জল আনতে হয় কী-চু নদী থেকে। এত বড় প্রাসাদ কিন্তু জলের অবস্থা খুবই খারাপ। প্রত্যেকদিন সকালবেলা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে হাত বদল করে নদী থেকে জল তুলে আনতে হয়। অবশ্য এরজন্য লোকের অভাব নেই। শত শত তিব্বতী দাসেরা রয়েছে প্রভুর সেবার জন্য।

পোতালার এই চৈত্য এলাকার আর একটা গুরুগম্ভীর বৈশিষ্ট্য আগন্তুক মাত্রেই অনুভব করবেন, সেটা হচ্ছে এখানকার নিস্তব্ধতা। বারান্দায় প্রায়ই লামাদের সাথে ধাক্কা খেতে হচ্ছে কিন্তু কারও মুখে এতটুকু শব্দ নেই। সবাই যেন ধ্যানে মগ্ন। শুধু মাঝে মাঝে শোনা যায় লামাদের দীর্ঘ নিঃশ্বাস, আর কাশি।

লাল বাড়ীটা হচ্ছে পোতালা প্রাসাদের সবচেয়ে পবিত্র অংশ— চৈত্য, সমাধি, বেদি আর মন্দিরে ভর্তি। তবে পূর্বদিকের অংশটা সাদা রঙ করা, বাইরের থেকে দেখতে অনেকটা আমাদের রাইটার্স বিল্ডিং-এর মতো। তবে রঙটা সাদা, পূর্বাংশের ঘরগুলো সব সরকারী আইন-আদালত ও দপ্তরে ভরা। বিভিন্ন এলাকার শাসকদের জন্য এখানে একটি আইন ও শাসন বিভাগীয় শিক্ষা কেন্দ্রও রয়েছে। এই অঞ্চলেরই একটি বিরাট ঘরে তিব্বতের মন্ত্রী-সভাকক্ষ জেনারেল হল। সেই অংশেরই সর্বোচ্চ মাননীয় দালাই লামার ঘর অর্থাৎ পোতালা প্রাসাদের চৌদ্দ তলায়।

দালাই লামা এখানে শীতের সময় মাত্র থাকেন, শীতের শেষেই তিনি নেমে যান নীচে তাঁর গ্রীষ্মাবাস নরবুলিংকা প্রাসাদে। তিনি যখন পোতালা প্রাসাদ থেকে নরবুলিংকাতে যান তখন লাসার নাগরিকেরা তাদের উৎসবে মেতে উঠে, চারদিকের

ঘর বাড়ীতে রঙ ও বিভিন্ন পতাকার বাহার দেখা যায়। সেটাই লাসাবাসীদের বসন্তোৎসব। রাস্তার দু'পাশে হাজার হাজার লোক জমা হয় দালাই লামার শোভাযাত্রা দেখার জন্য। আমরা লাসায় পৌঁছবার কয়েক সপ্তাহ আগেই সেই উৎসবটা হয়ে গেছে। এই উৎসবটাই হিমালয়ের বরফ গলার উৎসব, এই বরফ গলে জল হয়ে সমতল ভূমিতে নেমে গিয়ে বাঁচিয়ে রাখছে লক্ষ লক্ষ জীবকে। এইভাবে পাষাণ হিমালয় করুণাময়ী মাতৃরূপে ধরা দেন প্রত্যেকটি প্রাণীর কাছে। তিব্বতী ভাষায় এই উৎসবকে বলা হয় মন্‌লান উৎসব। দালাই লামা সেই মহান হিমালয়েরই প্রতীক। শীতের শেষে তিনি পোতালা প্রাসাদ থেকে নীচে নেমে আসেন, সকলের মাঝে তিনি ধরা দেন। দালাই লামা এখন এখানে নেই, থাকলে চেষ্টা করা যেত তাঁর সাথে দেখা করার।

পোতালা প্রাসাদে বিভিন্ন উচ্চপদস্থ লামা ও সরকারী কর্মচারীদের বাসস্থান রয়েছে। প্রাদেশিক শাসক ইংরেজীতে যাদের গভর্ণরই বলবো তারা লাসাতে এলে এই পোতালা প্রাসাদেই থাকেন। এখানকার সরকারী অতিথিশালাটি সব সময়ই ভর্তি থাকে। দালাই লামার ঘরটি নীচ থেকে চারশ' ফুট উঁচুতে, তাঁর ঘরগুলো নাকি ঠিক মিউজিয়ামের মতো, দামী ও তিব্বতের সেরা বস্তু সামগ্রীতে ভর্তি। পোতালা প্রাসাদের বহু মূর্তির মধ্যে চন্দন কাঠের একটা বিরাট বুদ্ধ মূর্তি আমরা দেখলাম। অল্প প্রদীপে খুব পরিষ্কারভাবে দেখতে পারলাম না, মুর্তিটি এসেছে সিংহল থেকে। সেটা নাকি এক অলৌকিক মন্ত্রবলে তৈরী। মূর্তিটি যখন পূজা করা হয় তখন প্রাসাদের চারিদিক ভরে উঠে চন্দনের পবিত্র সুগন্ধে। পোতালা তিব্বতের ইন্দ্রপুরী।

দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এল, কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গেলো বুঝতে পারলাম না। ভেতরকার সোনালী, হলুদ, লাল, নীল রঙের বাহার দেখতে দেখতে আমাদের চোখে ধাঁধা লেগেছে। আমরা অনেকগুলো ঘর আর পাথরের সুরঙ্গের মতো বারান্দা ও গলি পেরিয়ে নেমে এলাম নীচের দিকে। হঠাৎ এসে হাজির হলাম উন্মুক্ত আকাশে। একটা গলির মুখে আসতেই দেখা হল কয়েকটি ভিখিরির সাথে। তারা আমাদের বলল যে, একটু এগিয়ে ডান দিকের চায়ের দোকানে একজন লামা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তাদের দুটো পয়সা দিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করলাম কিন্তু কোন চায়ের দোকানই নজরে পড়ল না। সম্পূর্ণ হতাশ হওয়ার আগে রাস্তার একটি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে হাসিমুখে বলল—আমাদের সামনেই তো দোকানটা, দেখতে পাচ্ছেন না? আসুন দেখিয়ে দিচ্ছি।

এই বলে সে এগিয়ে গিয়ে একটা জানলায় ধাক্কা দিল। ভেতর থেকে সঙ্গে সঙ্গে জানালাটা খুলে গেলো, আর সেই সাথে সাথে বেড়িয়ে এল মাখন-চায়ের গন্ধ। মেয়েটিকে আমরা হাসিমুখে ধন্যবাদ জানালাম। জানালার ভেতর থেকে ফোকলা-দাঁতে এক বৃদ্ধা আমাদের দিকে তাকিয়েই বললেন—ওঃ আপনারা এসেছেন। এই বলে উঠে গিয়ে পাশের দরজা খুলে দিলেন। ভেতরে ঢুকে আমরা

চটের উপর অতিথির মতো বসলাম। চায়ের দোকানের ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিষ্কার হল। এটা সত্যি একটা চায়ের দোকান। অফিসের লোক এসে জানালায় ধাক্কা দিয়ে বলে কত কাপ চায়ের দরকার। ভেতর থেকে তা সাপ্লাই দেওয়া হয়। ভেতরে বসে চা খাবার লোক কম। একান্ত পরিচিত না হলে কেউ ভেতরে ঢোকে না। বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা আমাদের একটু বসতে বলে কোথায় বেড়িয়ে গেলেন, তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললেন যে লামাজী এক্ষুণি আসবেন। ভদ্রমহিলা তার অতি দামী দুটো চীনে মাটির কাপ বের করে আমাদের দেখিয়ে বললেন—দেখছেন এই কাপ দুটো পিকিং-এ তৈরী, বিশেষ অতিথি না হলে আমি এই কাপ ব্যবহার করি না। চা তৈরীই ছিল তার মধ্যে আমাদের দেখিয়ে কিছুটা নোনতা মাখন ঘোলের সরবতের মতো মিশিয়ে দিয়ে কাঠের জ্বালটা উসকে দিয়ে সেটাকে গরম করে নিলেন। চায়ের কাপ দুটো ভালোই তবে মনে হয় কোনদিন সেটাকে ধোয়া হয়নি। যাই হোক, আমরা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে চুমুক দিলাম।

ভদ্রমহিলা হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গ পাড়লেন—শুনলাম আপনারা সাংপো পার হয়ে আসছেন, ফারগোর কাছে ভিখিরিদের পাল্লায় নিশ্চয়ই পড়েছিলেন। আর ওদের কথা বলবেন না, উৎসবের জন্য এরা এসেছিল এখনও যায়নি। প্রত্যেক বছর উৎসবের সময় এরা আসে। তবে হ্যাঁ উৎসবটা তো আর কারও একার নয় কাজেই ওরা আসবে না কেন, ওদেরও তো সখ আছে। তবে পথিক মাত্রেই ঘিরে ধরা এটা কিন্তু ঠিক নয়। আমি অবশ্য এর মধ্যে যাইনি, দোকান ফেলে আমার কোথাও যাবার উপায় আছে। একদিন বন্ধ রাখলেই দপ্তরের লোকদের গলা শুকিয়ে যায়। ভাগ্য ভালো যে আমার ছোট মেয়ে এখনও আমার কাছে আছে নয়তো আমি পেরে উঠতাম না। পাড়ায় ছেলেদের অভাব নেই কিন্তু তাদের ভরসা করা যায় না, ওরা শুধু বাজারে বসে আড্ডা মারতে ওস্তাদ ··· ।

আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে ভদ্রমহিলা একনাগারে নিজের মনেই বক্ বক্ করে যেতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই বৃদ্ধ লামা এলেন, তিনি এসেই জিজ্ঞাসা করলেন—

—খাওয়া দাওয়া কোথায় হল ?

—এখনও হয়নি।

—বল কি, এখনও পেটে কিছু পড়েনি। ঠিক আছে, এক সাথে খাওয়া যাবে।

বৃদ্ধ লামা দোকানের ভদ্রমহিলাকে ভালো করে একটা সাম্পা তৈরী করতে বললেন রাতের জন্য, তারপর আমাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পোতালার ছাদ দেখাবার জন্য! এখানকার রাস্তাঘাটগুলো না জানা থাকলে সকলের পক্ষে ছাদে ওঠা সম্ভব নয়। তেরো তলার প্রত্যেকটি বাড়ীর উপরে আছে বিরাট বারান্দা আর প্রত্যেক দু'তিন তলার উপর আছে বিরাট বিরাট ছাদ। দার্জিলিং-এর মল্-এর মতো এখানকার ছাদও খুব প্রশস্ত।

ছাদ থেকে লাসার চারদিকের দৃশ্য দেখা যায়। বলাই বাহুল্য, এ দৃশ্যটা অতি মনোরম। ছাদ থেকে চৈত্যর চূড়াগুলোতে হাত দিয়ে স্পর্শ করার সুযোগ পেলাম। সোনালী রঙের সেই সব চূড়ার কয়েকটি সত্যিকারের সোনার পাতে মোড়া। কিছুক্ষণ

থেকে আমরা নামতে বাধ্য হলাম, কারণ এর মধ্যে ঘণ্টা বেজে গেছে। বিকেলের এই ঘণ্টা বাজার পর বাইরের কাউকে এখানে থাকতে দেওয়া হয় না। মন্দিরের লোহার দরজাগুলো আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়। আর শুরু হয় প্রহরীদের আনাগোনা। সারারাত ধরে আধঘণ্টা অন্তর অন্তর পোতালা প্রাসাদের গলি দিয়ে রক্ষিবাহিনীরা চলাফেরা আরম্ভ করে। লালবাড়ীর প্রহরীরা রাতের বেলা সমাধি বেদির পাশ দিয়ে চলার সময় চীৎকার করে করে বলে "সজাগ থা-কো-ও-ও-ও ... ।"

বৃদ্ধ লামা পোতালার আরও রহস্য আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করলেন। প্রাসাদের নীচের তলাটি বন্দুক ও গোলা বারুদে ভর্তি। গোলন্দাজবাহিনী অবশ্য আমাদের নেই। বিদেশী শত্রু যদি লাসা আক্রমণ করে তবে এখানকার বীর যোদ্ধারা প্রাণ দিতেও দ্বিধা করবে না। আর তার সাথে সাথে আছে রাজ্যের রক্ষাকালী, মা তারার খড়্গ আমাদের রক্ষার জন্য সব সময়ই উদ্যত রয়েছে। সৈন্যাধ্যক্ষ, দালাই লামার শিক্ষক ও উপদেষ্টারা চারতলার বাড়ীগুলোতে থাকেন। তাদের ঘরগুলো সব সম্ভ্রান্ত তিব্বতী প্রথায় সাজানো। রাজ্যের প্রথম শ্রেণীর কারাগারটাও ওই প্রাসাদেরই পিছন দিকে অবস্থিত। বড় লামা ও উচ্চ-পদস্থ সরকারী কর্মচারীরা যদি কোন রকম আইন বিরুদ্ধ কাজ করেন তাহলে সেখানে তাঁদের বন্দী করা হয়।

পোতালা প্রাসাদটা যত সম্ভ্রান্তই হোক না কেন, আবহাওয়াটা আমার কাছে কিন্তু খুব ভারী বলে মনে হল ভেতরে ঢুকলেই মনে হয় পাথরের হিমশীতল স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে। সমাধির পবিত্র নির্মল ও বিমলানন্দ তরঙ্গের এখানে যেন প্রবেশ নিষেধ। এখানকার সোনার প্রদীপে যে ঘিয়ের বাতিগুলো জ্বলছে সেগুলো যেন নিষ্প্রভ। প্রহরীদের চলাফেরায় রয়েছে দম্ভের ধাক্কা। মনকে হালকা করার যে মন্ত্র, সে মন্ত্র পোতালার দুর্মূল্য মণিমুক্তা আর রত্ন সম্ভারের মধ্যে বোধ হয় চাপা পড়ে গেছে। অথবা পোতালা প্রাসাদের সত্যিকারের রসোপলব্ধি করার ক্ষমতা আমার নাই। শেষের উক্তিটা সত্যি হলেই আমি খুশী হব।

সন্ধ্যা হবার সাথে সাথে আমরা নেমে এলাম প্রাসাদের তোরণে। সেখানকার নোংরা গলিগুলো পেরিয়ে এসে ঢুকলাম সেই বৃদ্ধার চায়ের দোকানে। আমাদের দেখেই বৃদ্ধা ফোকলা দাঁতগুলো বের করে হেসে আমাদের আপ্যায়ন করলেন—ভেবেছিলাম তোমরা পথ হারিয়েছো। ভাগ্য ভালো যে তোমরা নতুন কুঠিতে যাওনি, সেখানে গেলে আজকে আর তোমাদের ফিরে আসতে হত না। ওখানকার সেনারাও খুব কড়া। ঘণ্টা বাজার সাথে সাথেই দরজা বন্ধ করে দেয় ভেতরে কেউ রইল কি না সেদিকে মোটেই ভ্রুক্ষেপ করে না। হ্যাঁ ভালো কথা, এই দেখো তোমাদের জন্য কি রেঁধেছি। আ! এর যা গন্ধ রাস্তা দিয়ে যে যায় সেই-ই একবার করে থমকে দাঁড়ায় এ গন্ধ পাবার জন্য। আর হবেই বা না কেন? এর মধ্যে কি দিয়েছি জানো? খুব টাটকা শুকনো ভেড়ার মাংস। খেতে কোনো অসুবিধা হবে না, সেদ্ধ করে সেটাকে গলিয়ে দিয়েছি। তার মধ্যে দিয়েছি কী-চু নদীর তিনটে শুকনো ছোট মাছ। অবশ্য দাম একটু হবে কিন্তু তোমরা হলে আমাদের সম্মানীয় অতিথি কাজেই যা তা

জিনিস তো আর খাওয়াতে পারি না। বৃদ্ধ লামা আমাকে বিশেষ সতর্ক করে দিয়েছেন—খুব সাবধান এরা আমার বিশেষ বন্ধু····· ।

বেশ বেশ! এবার থামো, খেলেই বুঝবো কি রকম হয়েছে। বৃদ্ধ লামা ভদ্রমহিলাকে থামিয়ে দিলেন। ভদ্রমহিলা একবার কথা বলতে শুরু করলে কিছুতেই তাকে থামানো যায় না।

আমার ভদ্রমহিলাকে খুব ভালো লাগল। প্রাণখোলা হাসি আর মনের সরলতা এ দুই মিলিয়ে তিনি যেন এক আনন্দের মন্দাকিনী।

খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা উঠলাম, শহরে ফিরতে হবে। বৃদ্ধ লামা আমাদের অনুরোধ সত্ত্বেও একটা পয়সাও নিলেন না। তিনি বললেন—আমার যা আছে তার কিছুটা যদি তোমাদের সেবায় লাগাতে পারি তাহলে আমার পুণ্যই হবে। তোমরা যে দয়া করে এসেছো এতেই আমার আনন্দ, এ আনন্দ থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না।

বৃদ্ধ লামাকে বিদায় জানালাম। তিনি আমাকে শুধু একটা অনুরোধ করলেন—আমি এর পরের বার বুদ্ধ গয়ায় গেলে সেখানকার একটু মাটি যেন তাকে এনভেলাপে করে পাঠাই। আমি তাঁকে কথা দিলাম। ঘণ্টাখানেক পর ভদ্রমহিলার ঝোলের ভূয়সী প্রশংসা করে এবং বৃদ্ধ লামাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে আমরা শহরের অন্ধকার পথে পা বাড়ালাম। আমাদের মাথার উপর পোতালা প্রাসাদের বিরাট বিরাট ঘরগুলো মনে হল সোনার ভারে যেন আস্তে আস্তে বসে যাচ্ছে মাটিতে। সম্পূর্ণভাবে মাটিতে বসে যাবার আগে মহামান্য দালাই লামা ও তার মন্ত্রীপরিষদ পারেন না কি দেশের গরীবদের কিছু কিছু তার ধন বিতরণ করতে। তাতেতো মুক্তি ও চিরনির্বাণের পথই উদঘাটিত হবে, এই ইচ্ছাটা আমার মতো হয়তো আরও হাজার মনে হাজার বার জেগেছে। প্রজাপালক দীন দয়ালু, অন্তর্যামী চেন্-রে-জি নিশ্চয়ই সে কথা অনুভব করেছেন। মনে হয় তার যুক্তি সম্পূর্ণ অন্যরকম। লাসার আকাশে চাঁদ উঠেছে, সেই আলোকে সম্পূর্ণ লাসাকে মনে হচ্ছে মায়াপুরী, তারই আলোয় পাথরে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চললাম আমাদের ধর্মশালার দিকে।

লামা লামদুপ্

পরের দিন খুব ভোরবেলা ডাকাডাকি করে কে যেন আমাদের ঘুম ভাঙালো—কম্বলটাকে মাথায় শব্দ রহিত করে জড়িয়েও কোন লাভ হল না। চার পাঁচবার কাঠের মেঝের উপর গড়াগড়ি দিয়ে উঠতে বাধ্য হলাম। কোন রকমে চোখটা খুলে জিজ্ঞাসা করলাম—কে ? তার পরই নিজেকে সংযত করে নিলাম। পাশেই নাক ডেকে ঘুমিয়েছিলেন গুরুজী তাঁকে ঠেলে তুলতে বাধ্য হলাম। দরজার কাছে আধো আলোয় ভূতের মতো যিনি দাঁড়িয়ে আমাদের নিদ্রাভঙ্গে ব্যস্ত, তিনি মনে হয় কোনো বিশেষ সংবাদ নিয়ে এসে হাজির। ঘরের কোণে লোহার গামলায় কাঠকয়লার আগুন সারা রাত্রিই ধুনচির মতো জ্বলে, তারই অল্প আলোতে ভালো করে তাকালাম, একটা দশবারো বছরের ছেলে আষ্টেপৃষ্ঠে চাদর জড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছে। আমি তার কাছে উঠে গিয়ে, ইসারায় তাকে আগুনের কাছে আসতে বললাম। সে মাথা নীচু করে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এগিয়ে গেল নিজেকে গরম করতে। আমাদের দেশে অতিথিকে চা দেবার মতো তিব্বতে অতিথিকে আগুন পোহাতে বলা খুব আন্তরিকতার পরিচয়। গুরুজী এর মধ্যে উঠে বসেছেন, ছেলেটি তাঁর দিকে তাকিয়ে খুব তাড়াতাড়ি কি যেন বলল। তার কথার মধ্যে বিশেষ খাম্পা টান আমি লক্ষ্য করলাম, আর বার বার একটা নামই কানে বাজল, "গুরু লামদুপ্"। কিছুক্ষণ আগুনের তাপে শরীরটাকে গরম করে নিয়ে তারপর চলে গেল। সাধুবাবা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন—জোখাং মন্দিরে লামা লামদুপ্ এসেছেন। লামা লামদুপ্ তিব্বতের নামকরা কুম্বুম্ মন্দিরের অন্যতম প্রধান পূজারী। এর আগে লামা লামদুপের সাথে গুরুজীর দু'বার দেখা হয়েছিল। তিনি গুরুজীর লাসায় আগমনের কথা লোকমুখে শুনেছেন, তাই তিনি লোক পাঠিয়েছেন দেখা করবার জন্য। শুনে বেশ ভালোই লাগল—গুরুজীর মতে লামা লামদুপ্ খুব জ্ঞানী ব্যক্তি কাজেই এ সুযোগ পরমেশ্বরের কৃপা ছাড়া সম্ভব নয়। তিনিই সব যোগাযোগের মালিক। কম্বলের আকর্ষণ সত্ত্বেও আমি গুরুজীর সাথে উঠতে বাধ্য হলাম। বারান্দায় এসে দেখি তখনও আকাশের তারাগুলো জ্বল জ্বল করছে। ভোরের প্রথম মুরগির ডাক কানে এল। গুরুজীকে জিজ্ঞাসা করলাম—

—এত ভোরবেলায় তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন কেন ?

—তিনি বরাবরই খুব ভোরবেলা ওঠেন। সন্ধ্যার পর তিনি কারও সাথে কথা বলেন না। সম্ভবতঃ এটাই তার সুস্থ শরীরের আসল চাবিকাঠি। তুই দেখিস তার বয়স ধরা মুশকিল। তিনি যখন এদিক ওদিকে যান তখন তার সাথে সব সময়ই পাঁচ ছ'জন শিষ্য থাকেন, কাজেই তুই মৌনই থাকিস।

আমাদের ওঠার সাথে সাথে আমাদের দলের আর একজন লামা উঠে পড়েছেন, তিনিও আমাদের সাথে তৈরী হয়ে নিলেন। আমরা জোখাং মন্দিরের কাছে একটা দোকানের সামনে এসে দাঁড়াতেই নজরে পড়ল একজায়গায় আগুনের চারধারে কয়েকজন দাঁড়িয়ে গল্পগুজব করছে। কাছে আসতেই দেখি আমাদের সংবাদদাতা সেই পরিচিত ছেলেটি। অন্যান্য লোকগুলো একটু বয়স্ক গোছের, তারা মন্দিরের প্রহরী। আমাদের দেখেই তারা সসম্মানে জিভ বার করে সম্মানসূচক প্রণাম জানাল। আমরা প্রধান পূজারীর বাড়ীর ঠিক সামনের বাড়ীটায় এসে দরজায় ধাক্কা দিলাম। দরজাটা খোলাই ছিল। ভেতরে ঢুকতেই হ্যারিকেন হাতে নিয়ে একজন ভদ্রমহিলা এগিয়ে এলেন। সাধারণ তিব্বতী পুরুষ ও মহিলাদের পোশাক প্রায় একই রকম, তাই ভদ্রমহিলাকে প্রথমে ভদ্রলোক বলে মনে হয়েছিল। ভদ্রমহিলার সাথে আমরা বিরাট বারান্দা পেরিয়ে একটা ঘরে এসে ঢুকলাম। সেই ঘরের মাঝখানে আগুন আর তারই পাশে সাতজন লামা চোখ বুজে বসে আছেন। সবাই ধ্যানমগ্ন। সকলের সামনে একটু উঁচু বেদীতে তাঁদের মুখোমুখি বসে আছেন একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি। তিনিও ধ্যানে মগ্ন। আমরা তাঁদের সাথে যুক্ত হলাম।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে তাঁদের ধ্যানভঙ্গ হল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক আস্তে আস্তে চোখ খুললেন। তাঁকে দেখেই মনে ভক্তির ভাব আসে, পবিত্র শান্ত রূপ। তিনি সরাসরি গুরুজীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। সেই হাসিতে যেন ঝরে পড়ল স্নেহ ও প্রীতি। শিশুর মতো সহজ ও সরল সে হাসিতে প্রাণ আর মধুরতার স্পর্শ পেলাম। তারপর তিনি বললেন—গতকাল খবর পাঠিয়েছিলাম তুমি ছিলে না, তাই এখন খবর পাঠিয়েছি। অনেকদিন পর দেখা হল, ভালো আছো তো? রাস্তায় কোন অসুবিধা হয়নি? তার কথাতে এতটুকু উচ্ছ্বাস নেই, এতদিন পর দেখা হচ্ছে অথচ তা সত্ত্বেও নেই এতটুকু ভাবাবেগ।

—আপনার আশীর্বাদে রাস্তায় কোন অসুবিধাই হয়নি। গতকাল আমরা একটু বেরিয়েছিলাম—ফিরতে একটু রাত হয়েছিল। আপনি আছেন তো কয়েকদিন?

গুরুজীর প্রশ্ন শুনে লামা লামদুপ্ আগের মতোই অতি মৃদু স্বরে জবাব দিলেন,

—আজকেই আমি অন্যত্র চলে যাবো। বিশেষ দরকারে আমি এসেছি।

এর পর আর কোন কথা হল না, লামা লামদুপ্ এরপর চোখ বুজলেন। ঘরের অন্যান্য লামারাও সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজলেন। তারপর শুরু হল নাভিস্বরে মন্ত্রপাঠ। কিছুক্ষণ পর আবার সবাই ধ্যানমগ্ন হলাম। আমাদের যখন ধ্যান ভাঙ্গলো তখন কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরের আলো দেখা দিয়েছে। ভোরের ধ্যান আর নীরবতা শরীর ও মনকে সুস্থ ও সবল করে, মনের প্রসন্নতা ও একাগ্রতা এনে দেয়। মনের অহঙ্কারকে বুদ্ধ চরণে নিবেদন করলে চিত্তের সংশয় দূর হয়।

ভক্তরা গুরুর চরণে প্রণাম করে আস্তে আস্তে উঠে পড়ল। আমরা পরমগুরু লামা লামদুপ্‌কে নিজেদের মধ্যে পেলাম। এবার তিনি গুরুজীকে আরও কাছে এগিয়ে আসতে বললেন। আমি এখন ভালোভাবে তাঁকে দর্শন করতে লাগলাম।

তাঁর মুখটা অন্যান্য তিব্বতীদের মতোই, মাথায় অল্প চুল অন্যান্য লামাদের মতো তাঁর মুণ্ডিত মস্তক নয়। সাদা-পাকা চুলের খুব হালকা দাড়ি গোঁফ। লম্বায় মনে হয় প্রায় ছ'ফুটের কাছাকাছি, চেহারাটাও খুব শক্ত। গুরুজী ঠিকই বলেছেন যে বয়স কত ধরা মুশ্‌কিল। গুরুজী পনেরো বছর আগেও তাঁকে এরকমই দেখেছেন। আমি অনেক তীর্থ ঘুরেছি হিমালয়ের সর্বোচ্চে এখন রয়েছি, একটা মানুষের মধ্যে হিমালয়ের পবিত্রতা যে এমন সুন্দরভাবে প্রকাশিত হতে পারে তা এই প্রথম চোখে পড়ল। তিনি সাক্ষাৎ যোগীপুরুষ। দেবতুল্য ব্যক্তিদের দর্শন পেয়ে নিজেকে ধন্য বলে মনে হল। গুরুজীর সাথে তাঁর মৃদু কথাবার্তার মধ্যে আমি খুঁজে পেলাম এক অপূর্ব ছন্দ। গুরুজীর সাথে তাঁর এই মিলন আমার জীবনে এক অব্যক্ত অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে। ঘরের মধ্যে দুটি মেয়ে একটা থালায় করে কিছু সুজির বরফি আর চা নিয়ে ঢুকল। মেয়ে দুটি খুব অল্প বয়সের। আগে সম্ভবতঃ এদের মাকে দেখেছি। পনেরো ষোল বছরের হবে। সবচেয়ে নজরে পড়ল তাদের চুলের বাহার। মাথার উপড়ে চূড়োর আকারে বেতের কাঠামোর উপর চুলগুলোকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ঠিক যেন পাহাড়ের একটি ছবি। চোখাচোখি হতেই একটু মিষ্টি হেসে আমার দিকে এক বাটি চা আর দুটো বরফি এগিয়ে দিল, আমি মাথা নীচু করে তাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তা গ্রহণ করলাম।

এরপর সেই ঘরটিতে আরও লোকজন পরমগুরু দর্শনার্থে এসে জড়ো হতে লাগল। আমরা বসে রইলাম। গুরুজী ছাড়া তিনি ব্যক্তিগতভাবে আর কারও সাথে কথা বললেন না। মাঝে মাঝে তিনি নিজেই মৃদু স্বরে কথা বলেন, মনে হয় তিনি নিজের সাথেই কথা বলছেন।

সমস্ত সকালটা সেখানে আমরা কাটালাম, তারপর তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে আমরা তাঁর ঘর ছাড়লাম। জোখাং মন্দিরের চত্বরে বসে গুরুজী আমাকে লামা লামদুপের উপদেশগুলো ব্যাখ্যা করে শোনাতে লাগলেন। মহামূল্য উপদেশ যে কাজে লাগাবে সেই উপকৃত হবে। যেমন—

ইচ্ছাশক্তির অভাবই অন্ধকার, ইচ্ছাশক্তির জাগরণই আলো।

মনটাকে পূর্ণ না করলে, শূন্য পাবে কি করে ?

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে যুক্তি ও বিচার দিয়ে জানাই হচ্ছে মহাযানকে জানা।

যারা অশুদ্ধ অপবিত্র তাদের দ্বারা 'বজ্রযান' জানা অসম্ভব। তাদের বজ্রযান পন্থা অবলম্বন না করাই ভালো।

আমাদের মধ্যে আছে ব্যক্তিগত শক্তি আর বাইরে আছে বিশ্বশক্তি। আত্মশক্তি দিয়ে জানতে হবে বিশ্বশক্তিকে। বিশ্বশক্তিকে নিজের মধ্যে আনার চেষ্টা, আত্মহত্যার চেষ্টা মাত্র।

মন্ত্র মনকে রক্ষা করে, তন্ত্রর মাধ্যমে বিশ্ব রহস্যকে জানা যায়। ঘটের মধ্যে যে শূন্যতা আছে তার মধ্যে নেই আলো সেই শূন্য অন্ধ। জ্ঞানের আলো দিয়ে যে শূন্যতা উপলব্ধি করা যায় সেটাই মহাশূন্য।

মনটাকে সংযত কর, ভালোমন্দ বিচারের মালিক মন, বিচারকের মন অনুযায়ীই তো

বিচার হয়। মনটাকে শুদ্ধ ও পবিত্র রাখলে তার বিচারও হয় শুদ্ধ ও পবিত্র। মনই মনের রাজা,তাকে যেভাবে গড়বে তোমার কর্মও হবে সে রকম। আর সেই কর্মফল ভোগ করবার জন্য বারবার আসতে হবে এই পৃথিবীতে। মনটাকে সজাগ রেখে দিন রাত্রি তার গতিবিধি লক্ষ্য কর দেখবে তাতে মঙ্গলই হবে।

আমাদের মনে যখন কোন একটা কিছু পাবার বা করবার ইচ্ছা জাগে তার মূলে আছে সংঘাত। চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক এর সাথে সংঘাত হয় বহির্জগতের শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের। সুন্দর ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সাথে মনের সংঘাতে সৃষ্টি হয় ইচ্ছা। কাম ভাব ও বিভাব এই তিন রকমের ইচ্ছা আমাদের সত্য থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। আমাদের যাবতীয় জাগতিক ইচ্ছাকে চরিতার্থ করবার জন্যই আমাদের বার বার এই পৃথিবীতে আসতে হয় জন্ম নিয়ে।

ইন্দ্রিয়ের সাথে বস্তুর সংঘাতে বেদনার উৎপত্তি হয়। বেদনার থেকে উপাদান, উপাদান থেকে ভাব আর ভাবের থেকে জাতি এই কথাগুলো বুঝলে চরম সত্যকে জানা যাবে; ভগবান তথাগত এই সত্যকে প্রচার করে জীবকে উদ্ধার করবার জন্যই মর্ত্যে এসেছিলেন। জরা ব্যাধি মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র উপায় এই সত্যকে উপলব্ধি করে জন্ম-কর্মের বাইরে যেতে হবে।

দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য আমরা চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তথাগত বলেছেন—দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য মানুষ আকাশে, সমুদ্রের মাঝখানে, পর্বতগুহায় যেখানেই থাক না কেন তাকে কিছুতেই এড়ানো যাবে না। দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে দুঃখের কারণটা জানতে হবে। কারণের মূল সত্যটা আবিষ্কার করলেই তবে দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ সম্ভব।

জোখাং মন্দির চত্বরে বসে গুরুজী আমাকে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন লামা লামদুপের উপদেশ। এই উপদেশগুলোর কিছু কিছু আমি বুঝলাম। তবে অনুভব করা আমার পক্ষে কঠিন।

জোখাং চত্বরটি সময় কাটাবার এক চমৎকার জায়গা। তীর্থযাত্রীরা দূর দূর থেকে আসছে। সবই হাঁটা পথ। আর পথের জন্য সবকিছুই নিজের সঙ্গে বইতে হয়। তাই এক একজনের পিঠে ও কাঁধে সম্পূর্ণ সংসারটাই যেন চলে এসেছে। চত্বরে পা দিয়েই তারা তাদের সব বোঝাসমেত ভাবে আকুল হয়ে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে, তারপর শুরু হয় তাদের পরিক্রমা ও দণ্ডি। এই ঠাণ্ডা পাথরের উপর তারা অনায়াসে দণ্ডি কেটে এগুতে থাকে। আশ্চর্য! এ সত্ত্বেও ঠাণ্ডা তাদের স্পর্শ করে না।

নরবুলিংকা—দালাই লামার গ্রীষ্মাবাস

আমি না চাইতেই যেন সব পাচ্ছি। লাসায় বর্তমান তীর্থযাত্রীরা সবাই জোখাং মন্দির ও বাজারেই তাদের যাতায়াত সীমাবদ্ধ রাখেন। আর তাদের মধ্যে যারা শক্ত সামর্থ্য তারা পোতালা প্রাসাদ তিনবার পরিক্রমা করেই ক্ষান্ত হন। পোতালা প্রাসাদে আজকাল তীর্থযাত্রীরা খুব বেশী যাতায়াত করেন না। প্রাসাদে উঠতে হলেই আজকাল বিশেষ অনুমতির দরকার। শান্তিপ্রিয় তিব্বতীরা সাধারণতঃ যাবতীয় বেড়াজাল এড়িয়ে চলে, এমন কি সাধারণ অনুমতিটাকেও তারা ঝামেলা বলে মনে করে।

আগে কিন্তু এমন ছিল না। জোখাং মন্দির চত্বরে তীর্থযাত্রীরা আসা মাত্রই পেছনে লোক লেগে যেতো। পোতালা প্রাসাদ ও অন্যান্য লাসার দ্রষ্টব্য বস্তুগুলো ঘুরিয়ে দেখাবার জন্য তারা পেছনে লাগতো। গুরুজী বলেছেন যে, লাসার গাইড সার্ভিস ছিল খুব সস্তা। বছর দশেক আগে একদিনের জন্য একটা পনি ভাড়া করে সম্পূর্ণ লাসা প্রদক্ষিণ করবার জন্য আট আনা পয়সা পেলেই তারা সন্তুষ্ট হত। গুরুজীর কল্যাণে আমার পোতালা দেখা হয়েছে। জোখাং-এ তো রোজই আসছি। রোজই মনে মনে ভাবি যদি কোন রকমে মহামান্য দালাই লামার দেখা পেয়ে যেতাম তাহলে আমার লাসায় আসা সবদিক থেকেই সার্থক হত। আমার সাথী তীর্থযাত্রীদের কথা আলাদা, তাদের একমাত্র জোখাং ছাড়া অন্য কোনো দিকে যাবার ইচ্ছে নেই। অন্যান্যদের মতো আমি ধার্মিক নই। আর জোখাং মন্দিরে ধন্না দেবার মতো চাহিদাও নেই। পথে চলতে চলতেই আমি পেয়েছি দর্শন, সে দর্শন আমার মনকে পূর্ণ করেছে, সে পূর্ণতা হয়তো ছেলেমানুষি। যা পাবার তা না পেয়েই হয়তো আমি ধন্য।

লাসার মন্দির অধিবাসী লামাদের মধ্যে আর বাজারে চলতে চলতে আমি খুঁজে পাই আমার সেই ছেলেমানুষটি যেটা নকল সেটার দিকেই তার বেশী নজর। মনের মধ্যে কয়েকদিন যাবৎ একটা কথাই বারবার ধাক্কা দিচ্ছে—যদি দালাই লামার দেখা পেতাম—যদি তাঁর দর্শন পেতাম। যদি তাঁর দর্শন পাই তাহলে কি করবো জানি না।গুরুজীকে মনের ইচ্ছাটা বলেই ফেললাম। এই দুর্গম পথে মহাতীর্থে জীবনে হয়তো আর আসা হবে না। কাজেই একবার যখন এসেই পড়েছি তখন এই ইচ্ছাটা পূরণ হবে না! গুরুজী আমার কথাটা শুনে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন। তিনি বললেন—দালাই লামার সাথে দেখা হওয়া মুশকিল তাতে অযথা ঝামেলা আসতে পারে। কারণ দালাই লামা যদিও তিব্বতের প্রধান লামা কিন্তু আসলে তিনিই রাজা। তাঁর দর্শন পেতে হলে তাঁর চার-পাঁচটা দপ্তরের মাধ্যমে আবেদন পাঠাতে হবে। আর আজকাল দালাই লামা যদি কোন বেদেশীর সাথে সাক্ষাৎ করেন তাহলে চীনারা ভীষণ রেগে যায়। যে কোন

বিদেশীকে মহামান্য দালাই লামার সাথে দেখা করবার আগে স্থানীয় চীনা কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে। বিশেষ করে আমি আসলে ভারতীয়, সেক্ষেত্রে সমস্যাটা আরও বেশী। তবে গুরুজী হতাশ হবার পাত্র নন। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন চল দেখা যাক একটা বন্দোবস্ত হয়ে যাবেই। দালাই-লামা শীতকালে থাকেন পোতালা প্রাসাদে আর শীতের শেষে নেমে আসেন নীচে, তাঁর গ্রীষ্মাবাসে। তাঁর গ্রীষ্মাবাসকে বলা হয় নরবুলিংকা প্রাসাদ। লাসার পূর্বদিকের এক শহরতলীতে সেটা অবস্থিত—এখান থেকে মাত্র মাইল খানেকের পথ।

আমি গুরুজীর সাথে সকাল দশটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম। লাসার এই অঞ্চলটা খুব সুন্দর। দু-দিকে প্রচুর চাষের জমি, আর খামার বাড়ীতে ভর্তি। এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা একটা সম্ভ্রান্ত এলাকায় এসে পৌঁছলাম। দোতলা তিনতলা বাংলো ও প্যাগোডা ধরনের বাড়ীগুলো দেখেই বোঝা যায় যে এটা খুব বর্ধিষ্ণু এলাকা।

গুরুজী একটু দূরে কয়েকটা বাড়ীর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন—ঐ যে বাড়ীগুলো দেখছো ওগুলো সব দালাই লামার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আমরা একটা বিরাট পাঁচিলের সামনে এসে দাঁড়ালাম। দরজার কাছে দু'জন সিপাহী দাঁড়িয়ে, আমরা তাদের দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে নমস্কার জানালাম। এই পাঁচিলের ভেতরেই বিখ্যাত নরবুলিংকা প্রাসাদ। এই প্রাসাদের এক কর্মচারীর সাথে গুরুজীর পরিচয় আছে। প্রহরীদের অনুমতি নিয়ে আমরা ভেতরকার দপ্তরে এসে হাজির হলাম। সেখানে আমাদের নাম লিখিয়ে অনুসন্ধান অফিসে জিজ্ঞাসা করতেই তারা একটা বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে বললেন—ওই বাড়ীতে খা-ওঙ্চে থাকে, আপনারা যেতে পারেন।

খা-ওঙ্চে নরবুলিংকা প্রাসাদের অন্যতম মালি। ছোট্ট একটা কাঠের বাড়ীতে এসে আমরা দরজায় ধাক্কা দিলাম। ভেতর থেকে এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। আমাদের দেখেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন। তারপর নিজেকে সংযত করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

—কি চাই?

—খা-ওঙ্চে-জী বাড়ীতে আছেন কি?

—না, তিনি বাড়ীতে নেই তবে তার ছেলে আছে, দাঁড়ান ডেকে দিচ্ছি।

ঘর থেকে একটি যুবক বেরিয়ে এল। খা-ওঙ্চের ছেলে খুব লম্বা চওড়া, ফুলপ্যান্ট পরনে, মাথায় সাহেবী টুপী। তিব্বতের লোকেরা সাহেবী টুপী খুব পছন্দ করে। সে আমাদের সামনে আসতেই গুরুজী তাকে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন—

—আমি তোমার বাবার পুরোনো বন্ধু, তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছি। তিনি কোথায় আছেন?

—ওঃ বাবার কথা জিজ্ঞাসা করছেন? তিনি লেকের ধারে গেছেন চলুন আপনাদের নিয়ে যাই।

খা-ওঙ্চের ছেলে, নাম ভাবান। সে আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে চলল। সেই সুযোগে আমি দেখতে লাগলাম নরবুলিংকা প্রাসাদটিকে। পাথর ও সিমেন্টের উপর

কাঠের বাড়ী, অনেকটা গ্যাংটকে সিকিমের রাজবাড়ীর মতো। কাঠের সুন্দর কারুকাজ করা, তার উপর রঙের বাহার। পোতালার তুলনায় এ এমন কিছু আকর্ষণীয় নয়। নরবুলিংকার প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে এখানকার সাজানো বাগান। চারিদিকে নানা রকমের ফুল ও ফলের গাছে ভর্তি। প্রত্যেকটি গাছই অতি যত্ন করে লাগানো।

প্রাসাদ না বলে বাগান বাড়ী বলাই ভালো। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা একটা লেকের ধারে এসে উপস্থিত হলাম। লেকটা বিরাট নয়, কলকাতার ইডেন গার্ডেনের লেকটার মতই হবে। এর চারপাশে বিভিন্ন পাতা বাহারের গাছে ভরা, লেকের মধ্যে সাপলার মতো ভেসে রয়েছে পদ্ম পাতা, আর মাসখানেক পরেই ফুল ফুটবে। তিব্বতে এই প্রথম নজরে পড়ল জলপদ্ম গাছ। অবশ্য এই ঠাণ্ডায় তাদের বাঁচিয়ে রাখা মুশকিল। সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম এখানকার জলে রাজহাঁস দেখে। ভাবনকে প্রশ্ন করতেই সে বুঝিয়ে দিল যে, রাজহাঁসগুলো তিব্বতেরই। লেকের জল যখন জমে বরফ হয়ে যায় তখন তারা লেকের পাশে কাঠের ঘরে থাকে, তবে তিব্বতের অন্যান্য হ্রদে যে রাজহাঁস ও বিভিন্ন ধরনের হাঁস জাতীয় পাখী আছে সেগুলো সবই দারুণ শীতের সময় ভারতবর্ষের দিকে উড়ে চলে যায়। রাশিয়ার উত্তর (সাইবেরিয়া) থেকেও অনেক হাঁস শীতের সময় লাসায় আসে। সমস্ত তিব্বতের মধ্যে লাসাই বোধ হয় উত্তর মেরুর পাখীদের প্রিয়। প্রচণ্ড শীতের সময়ও কী-নদীর ধারে দেখা যায় কিছু কিছু হাঁস। শীতের ঠিক আগে রাজহাঁসগুলো যখন ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যায় তখন সত্যি খুব সুন্দর দেখায়।

আমি অবশ্য কল্পনা করতে পারি মাত্র তার বেশী নয়। কারণ উড়ন্ত রাজহাঁসের ঝাঁক এখনও আমার চোখে পড়েনি। লেকের উপর রাজহাঁসগুলো পরম শান্তিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লেকের স্বচ্ছ জলে দেখা যাচ্ছে তাদের প্রতিবিম্ব। আরও একটু এগুতেই নজরে পড়ল কয়েকজন লোক বাগানের কাজ করছে। আমাদের দেখে তারা কাজ থামিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

তাদের মধ্যে একজন বয়স্ক লোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন, তারপর ভালোভাবে গুরুজীর দিকে তাকিয়ে যেন হঠাৎ চিনতে পারলেন। এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন সাধুবাবাকে, যেন অনেক দিন পর খুঁজে পেয়েছে তার পরমাত্মীয়কে। খা-ওঙ্চের সাথে পরিচিত হলাম। গুরুজী আমাকে দেখিয়ে বললেন—এ আমার চেলা ও মৌনব্রত অবলম্বন করেছে। খা-ওঙ্চে আমার মাথায় হাত দিয়ে সস্নেহে উৎসাহ দিয়ে বললেন—খুব ভালো পথ, খুব ভালো পথ। গুরুজী তাঁকে জানালেন যে আমি বাগান দেখতে ভালোবাসি, আর দূর থেকে যদি কোনরকমে দালাই লামার দর্শন হয়ে যায় তাহলে চির কৃতজ্ঞ থাকবো। ভদ্রলোক এই কথা শুনে খুব উৎসাহিত হলেন। তিনি আমাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন—কোন অসুবিধা নেই, চল আগে বাগানটা ভালোভাবে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই। এই বলে তিনি লেকের ঠাণ্ডা জলে হাত মুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে নিলেন। আমি মৌনই রইলাম, গুরুজী তার অনুবাদ করে শোনাতে লাগলেন।

বাগানটা সত্যি অদ্ভুত। নরবুলিংকা প্রাসাদের এই বাগানটাকে বলা হয় জুয়েল-পার্ক। এরকম বাগান শুধু তিব্বতে কেন জগতে বিরল। পৃথিবীর ছাদে এই শীতের মধ্যে হলেও এই বাগানে যেন মন্ত্রবলে সব ফুল ফোটে। খা-ওঙ্চে বাগানের অন্যতম সুপারভাইজার সে এর জন্য খুবই গর্বিত। সে একবার কালিম্পং আর একবার দার্জিলিং গিয়ে এ বিষয়ে বিশেষ বিশেষ শিক্ষা নিয়ে এসেছে। বাগানটা বিরাট, এর মধ্যে পাওয়া যাবে পৃথিবীর প্রায় সব রকমের ফুল গোলাপ, জলপদ্ম, ডালিয়া থেকে আরম্ভ করে বোগেনভেলিয়া, জিনিয়া, লিলি পর্যন্ত। দালাই লামারা সবাই ফুলের পক্ষপাতি। প্রত্যেকবার যখন নতুন দালাই লামা মনোনীত হন তিনি এই বাগানে নতুন কিছু যোগ করেন, এটি তাদের ব্যক্তিগত বাড়ীও বটে। কাজেই দূরে বাগানের মধ্যে মধ্যে যে সব দামী দামী বাংলো নজরে পড়ছে তার প্রত্যেকটিই এক একজন দালাই লামার নিজস্ব সম্পত্তি। তাঁদের দেহত্যাগের পর এই বাড়ীগুলো মিউজিয়ামের মতো রক্ষিত হয়, শুধু দামী আসবাপত্র ও বিগ্রহগুলো নতুন বাড়ীতে উঠে আসে।

আমরা একটা ফাঁকা জায়গা দিয়ে পার হবার সময় খা-ওঙ্চে খুব সসম্ভ্রমে বললেন—ওই দেখছেন কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তীর ধনুক ছুঁড়ছেন তাদের মধ্যে ডানদিকের ভদ্রলোক হচ্ছেন বর্তমান দালাই লামার ভগ্নীপতি, দালাই লামার মা-ভাই-বোনেরাও সবাই এখানেই থাকেন তাঁদের জন্য আলাদা বন্দোবস্ত আছে পোতালা প্রাসাদে দালাই লামা কাজের চাপে বন্দী হয়ে থাকেন সেখানে তাঁর নড়াচড়ার সময় নেই, তাই তিনি এখানে যখন আসেন তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। এই জুয়েল পার্ক হচ্ছে তিব্বতের নন্দন কানন। নরবুলিংকার ফলের বাগানটাও বড় চমৎকার। আপেল নাসপাতি, প্লাম, চেরী, কমলা প্রভৃতি গাছে ভর্তি। এই গাছগুলোর সবই এসেছে কালিম্পং কার্শিয়াং থেকে। বিলিতি ফুলের বীজ আসে সরাসরি ইউরোপ থেকে ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়া ট্রেড মিশনই এর মূলে। এই বাগানেরই এক অংশে আছে 'ডগ-গারডেন সেখানে দালাই লামার পোষা বিলিতি কুকুরগুলো থাকে। ইংরেজ সরকার প্রাক্তন দালাই লামাকে দুটো মোটর গাড়ী উপহার দিয়েছিল। এখানকার একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী কলকাতায় গিয়ে মোটর মেকানিজম শিখে এসেছে কিন্তু এ সব সত্ত্বেও উপযুক্ত রাস্তার অভাবে সেই দামী গাড়ীটি বাইরে বার করা সম্ভব ছিল না। গাড়ীটা ছিল ত্রয়োদশ দালাই লামার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এখনকার দালাই লামা হচ্ছেন চতুর্দশ দালাই লামা। আজকাল হান্‌দের দৌলতে কয়েকটা গাড়ীর উপযোগী রাস্তাঘাট হয়েছে, হয়তে তিনি একদিন তা ব্যবহার করতে পারেন।

আমরা এইভাবে নরবুলিংকার বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছি এমন সময় হঠাৎ খা-ওঙ্চে আমাদের থামিয়ে দিয়ে সাবধান করে দিলেন—তোমাদের ভাগ্য খুবই ভাল চেন্‌-রে-জি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন। এই বলে ভদ্রলোক সরাসরি মাটিতে শুয়ে পড়ল সাষ্টাঙ্গ প্রণামের ভঙ্গিতে, তার ইঙ্গিতে আমরাও গড় হয়ে প্রণাম করতে বাধ্য হলাম। প্রণাম সেরে উঠতে তিনি আমাদের দেখিয়ে দিলেন ওই দেখুন মহামান চেন্‌-রে-জি যাচ্ছেন।

চেন্-রে-জি অর্থাৎ দালাই লামা। তিনি যখন রাস্তা দিয়ে যান তখন তিব্বতের নিয়ম অনুযায়ী সবাই থেমে গিয়ে রাস্তার দুধারে হাত জোর করে দাঁড়ায়, আমরাও রাস্তা ছেড়ে বাগানের উপর এসে দাঁড়ালাম। দালাই লামার ছোট্ট প্রসেসন আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে লাগল। সবশুদ্ধ দশজন লোক, মহামান্য দালাই লামাকে চিনতে কোন অসুবিধাই হয় না। দালাই লামার আগে দু'জন দৈত্যাকৃতির তিব্বতী রক্ষী আর তার পেছনে আটজন লোক মাঝখানে উজ্জ্বল কমলা রঙের পোশাকে নবীন সন্ন্যাসী, দালাই লামা। আমাদের সামনে দিয়ে নিঃশব্দে তাঁরা হেঁটে চলে গেলেন। দালাই লামা আমাদের দেখেও যেন দেখলেন না। খুবই অল্প বয়স, পরে জানতে পারলাম যে তিনি আমার থেকে মাত্র পাঁচ বছরের বড়। অর্থাৎ তাঁর জন্ম ১৯৩৫ সালে। চোখের উপর দিয়ে তিব্বতের অধীশ্বর ধর্মরাজ চলে গেলেন, ঠিক মতো অনুভব করার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল ঠিক স্বপ্নের মতো। দালাই লামার মুণ্ডিত মস্তকের উপর খুব ছোট ছোট চুল দেখা দিয়েছে—দোহারা চেহারা, মুখের ভাবটা ঠিক বুদ্ধের মতো, সব রকমের সুখ দুঃখকে তিনি মনে হয় জয় করেছেন।

দালাই লামা চলে যাবার পর আমরা আবার রাস্তায় নেমে এলাম। এই সুযোগের জন্য খা-ওঙ্চেকে আমরা ধন্যবাদ দিতেই তিনি একটু গর্বের সাথে উত্তর দিলেন—এ আর এমন কি, আমরা তো দু'বেলা দেখছি—আর সাধারণ তীর্থযাত্রীরা ওই পাঁচিলের চারপাশে দণ্ডিকেটে ঘুরেও তার দর্শন পান না, সবই কর্মফল আর তাঁর কৃপা, এই বলে তিনি ধর্মরাজের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন। পোতালা-প্রাসাদ আর নরবুলিংকা-প্রাসাদ এই দুটো জায়গাই সাধারণ তিব্বতীদের কাছে পরম পবিত্র স্থান। নরবুলিংকা প্রাসাদে মহামান্য দালাই লামার অতি সাধারণ গতিবিধি, এ বাড়ী থেকে ও বাড়ী যেতে হলে তিনি পায়ে হেঁটেই যান, তাঁর সাথে অবশ্য সব সময়ই দু'চারজন বডি-গার্ড ও উচ্চস্তরের কয়েকজন লামা থাকেন। দৈনিক মহামান্য দালাই লামার দর্শনার্থে তিব্বতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে তীর্থযাত্রীরা এসে ভিড় করেন। পাঁচিলের ধারে তাঁরা দিনের পর দিন বসে অপেক্ষা করেও যদি তাঁর দর্শন না পান তাহলে সাদা পাঁচিলের চারদিকে ঘুরে দণ্ডি কেটে মনোবাসনা জানিয়েই তারা বিদায় নেন। সেদিক থেকে বিচার করলে বলতেই হবে যে আমার ভাগ্যটা অতি ভালো। নরবুলিংকা প্রাসাদের ছোট বড় বিভিন্ন বাড়ী দেখতে দেখতে আমরা বাগানের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। খা-ওঙ্চে আমাদের নরবুলিংকা-প্রাসাদের আরও অনেক তথ্য নিজের থেকেই জানাতে লাগলেন। গুরুজীর অবশ্য সেদিকে কোন আকর্ষণ নেই, জানবার আকর্ষণটা আমারই বেশী। মৌনী-বাবা না হলে আমি নরবুলিংকা প্রাসাদের খুঁটি-নাটি সব জানবার জন্য খা-ওঙ্চেকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতাম। গুরুজী এ বিষয়ে আমাকে খুব সুন্দর একটি কথা উপদেশ দিয়েছেন—যা সহজে আসে সেটাই আমাদের প্রাপ্য, সেটা খাদ্যই হোক আর তথ্যই হোক, সব ক্ষেত্রে ওই একই কথা।

মহামান্য দালাই লামাকে দেখলাম মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। তাতে মনটা শান্ত হবার কথা, কিন্তু তা না হয়ে তাঁর সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানবার জন্য মনটা

ব্যাকুল হয়ে উঠল। খা-ওঙ্‌চে লামার সাথে আমরা প্রায় সারাটা দিন নরবুলিংকা প্রাসাদের চারিদিকে ঘুরে বেড়ালাম। দুপুরবেলা তিনিই আমাদের থুক্‌পা খাওয়ালেন। বিকেলের দিকে তাঁকে কৃতজ্ঞতা ও অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে আমরা বিদায় নিলাম। পাঁচিলের বাইরে এসে বার বার দেখতে লাগলাম চেন-রে-জি'র প্রাসাদটাকে। পোতালায় পেয়েছি শিল্প ও ধনে পরিপূর্ণ এক বিরাট আভিজাত্যের ছাপ। সোনা ও ধনরত্নের মধ্যে পোতালার আত্মাটা যেন চিরবন্দী হয়ে আছে। আর নরবুলিংকা ঠিক যেন তার বিপরীত, এখানে অনুভব করা যায় শুদ্ধ আত্মার মুক্ত বিচরণ।

দালাই লামা

লাসার বাজারটা খুব ভালো, আমি আগেই লিখেছি যে সেটাই হচ্ছে তিব্বতের প্রাণকেন্দ্র। এখানকার প্রধান রাস্তাটাকে বলে 'ছ'কোণা রাস্তা। এ রাস্তাটার দু'পাশের বাড়ীগুলো বিরাট বিরাট, কিছু কিছু বাড়ী পুরোনো। লাসার একমাত্র এই রাস্তাটার সাথে কলকাতার রাস্তার তুলনা করা চলে। এই রাস্তাটারই উপরে বসে এদের বাৎসরিক মেলা। আমি রোজ সকালে লামাদের সাথে জোখাং মন্দিরে আসি, তারপর সকালবেলার প্রথম পূজোর পর চুপচাপ বেরিয়ে পড়ি শহরের দিকে! সেদিন ছ'কোণা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক ভদ্রলোকের সাথে দেখা। দেখেই মনে হয় তিনি সম্ভ্রান্ত ঘরের। রাস্তার ধারের একটা বিরাট বাড়ীর দরজার পাশে তিব্বতী ও ইংরেজিতে লেখা একটা নেম-প্লেট দেখেই আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ইংরেজিতে লেখা Trade Agent Mr. Chimi Tshewang. I. Sc., Calcutta। নামটা দেখেই হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল কলকাতার কথা, নিজের অজ্ঞাতেই মনে হয় সেখানে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। আর ঠিক সেই সময়ই ভেতর থেকে দরজা খুলে বেরিয়ে এল একটি তরুণ। উজ্জ্বল বর্ণ ঠিক নেপালীদের মতো আঁট পায়জামা পরনে। দামী কোট আর মাথায় নেপালী টুপী। বয়সে তরুণ, দরজার সামনে একজন বিদেশী লামাকে দেখে একটু আশ্চর্য হল বটে, তারপর তিব্বতী ভাষায় জিজ্ঞাসা করল—তুমি কি চাও? আমি তার কোনো উত্তর দিলাম না। সে একটু নীরব থেকে তারপর নেপালী ভাষায় জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি তীর্থ করতে এসেছো? আমি এবার চুপ না থেকে সরাসরি জবাব দিলাম—হ্যাঁ আমি তীর্থ যাত্রীই বটে। দেখে মনে হয় বয়সে আমারই মতো হবে। কাজেই অনেকদিন পর সমবয়সী পেয়ে আমি কথা বলার প্রলোভন ছাড়তে পারলাম না। রাস্তায় দাঁড়িয়েই আলাপ শুরু করলাম। ছেলেটিকে দেখেই মনে হল খুব বিশ্বাসী তাই আমি সরাসরি বলে ফেললাম আমার কথা। অর্থাৎ আমি তীর্থযাত্রী মৌনী বাবা, লাসাতে জীবনে হয়তো আর আসা হবে না তাই মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ি একলা। লাসার পথে পথে ঘুরলেই পাওয়া যায় অনেক তথ্য। আমার কথা শুনে সে খুব খুশী হল বলে মনে হল, সে যেন একটা নতুন কিছু আবিষ্কার করেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গিয়ে একটা সু-সজ্জিত ঘরে বসাল। তারপর তাকে যখন জানালাম যে আমি আসলে কলকাতার ছেলে তখন আমাকে সে যেন জড়িয়ে ধরতে চাইল। আধঘণ্টার পরিচয়েই আমাদের মধ্যে হৃদ্যতা হয়ে গেল। Mr Chimi Tshewang ছেলেটির বাবা। ব্যবসায়ী। কালিম্পং, শিলিগুড়ি ও কলকাতার সাথে তার কারবার। ছেলেটির নাম ইয়েশি-ৎ-সেওয়াং। কালিম্পং থেকে সে পড়াশুনা করে, শীতের সময়

দু'মাস দেশে আসে। তার ছোট তিন ভাই, দু'বোন ও মায়ের সাথে একে একে পরিচিত হলাম। তার মা আমার মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললেন—এ বেলা থেকে যাও আমাদের সাথেই খাওয়া-দাওয়া করবে। আমার আপত্তির কোন কারণই নেই। বরঞ্চ একটি সম্ভ্রান্ত তিব্বতী পরিবারের সাথে পরিচিত হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করলাম।

ইয়েশির বাবা ব্যবসায়ী, দুই কাকা সচিবালয়ে কাজ কারেন। দাদু একজন নাম করা লামা। আর ঠাকুর্দা ছিলেন লাসার একজন নামকরা শিল্পী। আমি তাঁদের সাথে এই পরিচয়টা একমাত্র সাধুবাবা ছাড়া আর কাউকে জানালাম না। এই পরিবার থেকেই আমি জানতে পারলাম দালাই লামার ইতিহাস। দালাই লামা সম্পর্কে বিশদ জানাতে পেরে তারা যেন নিজেদের আরও ধন্য মনে করতে লাগলেন। আমার সম্পর্কে বাইরে যাতে জানাজানি না হয় সেদিকে কঠোর দৃষ্টি রাখা হল। কারণ হান্‌দের গুপ্তচরের তো অভাব নেই বিশেষ করে তারা যদি একবার কোনক্রমে জানতে পারে যে আমি ভারতীয় তাহলে আমাকে কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ তীর্থযাত্রী-দলের ভীষণ সমস্যা হবে। ইয়েশির একান্ত ইচ্ছা একবার কলকাতা দেখার। আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম যে আমাদের বাড়ীতে সে ঠিক বন্ধুর মতো থাকতে পারে। এই সামান্য আশ্বাসে সে যে কত খুশী তা আর লিখে বোঝাতে পারবো না।

মহামান্য দালাই লামা সম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্য এই পরিবারের কাছে আমি ঋণী, সেটাই আমি আমার ডায়েরীর পাতায় লিখছি। ইয়েশিই আমাকে ডায়েরী লেখবার জন্য দুটো নতুন খাতা, পেন্সিল ও একটা ছোট ছুরি উপহার দিয়েছে।

তিব্বতে বিশেষ করে লাসায় দালাই লামার বহু নাম। তিব্বতীরা উচ্চারণ করে তা-লে-লামা। মোংগল চীনারাই প্রথম দালাই লামাকে এই নামে সম্মানিত করে। তিব্বতীরা দালাই লামাকে বলে কীয়াম্-গন্/রিম্-পো-চে, অর্থাৎ রক্ষাকর্তা। অনেকে বলেন—গী-ওয়া-রিম্-পো-চে, অর্থাৎ প্রভু; বুক্—অন্তর্যামী। কীয়াম-গন্-বুক্ অর্থাৎ আত্মার প্রভু; পোতালায় তাকে চলিত কথায় বলা হয় লাম-পন্-পো, অর্থাৎ প্রধান শাসক লামা; কুন্ -ডুন্ অর্থাৎ সর্বজ্ঞানী; চেন্-রে-জি—বজ্রপাণী।

দালাই লামা অমর তিনি এ পৃথিবীতে কর্ম করেও করেন না, তিনি স্বয়ং বুদ্ধাবতার। তাই তিনি প্রজাপালনের জন্য বার বার জন্ম নেন। দালাই লামা তিব্বতের প্রধান পুরোহিত এবং শাসক। তিনি একাই সমস্ত তিব্বতের মালিক। তিনি মানুষরূপে সাক্ষাৎ দেবতা। পঞ্চম লামার আমল থেকেই অর্থাৎ ১৬৪১ খৃঃ থেকেই এই ঐতিহ্য চলে আসছে।

দালাই লামার মৃত্যুর পর তাঁর আত্মা যে কোন একটি পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করে। তিনিই যে আদি দালাই লামা তার বহু প্রমাণ এই নতুন শিশুকে দিতে হয়। সাধারণতঃ মৃত্যুর পূর্বে বৃদ্ধ দালাই লামা তার পারিপার্শ্বিক অতি নিকট জনদের কাছে বলেন যে তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন। সরাসরি না বলে তিনি অনেক সময় পরোক্ষভাবে তাঁর অভিপ্রায় জানিয়ে দেন। তাতে ভবিষ্যৎ দালাই লামাকে খুঁজে বার করতে সুবিধা হয়। তবে এই ব্যাপারটা খুবই জটিল—মৃত্যু শয্যায় অথবা বৃদ্ধ দালাই লামাকে কেউ

সাহস করে জিজ্ঞাসা করতে পারে না তাঁর ভবিষ্যৎ জন্ম কোথায় হবে বলে। অনেকের মতে তাতে তিনি ভাবতে পারেন যে তাঁর উপস্থিতি হয়তো এরা আর চায় না। যে কোন কারণেই হোক তিনি যদি মৃত্যুর পূর্বে তার পরবর্তী জন্মস্থানে ঠিকানা না দিয়ে থাকেন তাহলে দেশের অগণিত নতুন শিশুদের মধ্যে মহামান্য দালাই লামা কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন বা করবেন তার দায়িত্ব পড়ে দেশের বিজ্ঞ লামা ও গণতকারদের উপরে। অবশ্য তিব্বতে শুধু দালাই লামাই নন, উচ্চ পর্যায়ের বহু লামাই এই ধরনের পুনর্জন্ম নিয়ে থাকেন।

দালাই লামার মৃত্যুর পর নবজাত দালাই লামাকে খুঁজে বার করবার দায়িত্ব পড়ে প্রধানতঃ রাজ্যের মন্ত্রী ও তিন গুম্ফার প্রধান পুরোহিতদের উপর । তিন গুম্ফার (দ্রেপুং, সেরা, গান্‌দেন্‌) পুরোহিতরা একত্র মিলিত হয়ে রাজ্যের সেরা গণৎকারদের সাথে পরামর্শ করেন। দালাই লামার মৃত্যুক্ষণ ও আবহাওয়া বিচার করে গণৎকাররা বিরাট পুজার্চনা করে ধ্যানে বসেন। সেই ধ্যানে বসে অথবা দৈববাণীর মাধ্যমে অথবা স্বপ্নে তার ভবিষ্যৎ দালাই লামা কোথায় জন্ম নিচ্ছেন তা জানতে পারেন। রাজ্যের মুখ্য গণৎকার সেই গুপ্ত সংবাদটি জানান রাজ্যের মন্ত্রী ও তিন গুম্ফার প্রধানদের। মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী এই সময় স্থাপিত হয় অনুসন্ধান সমিতি। রাজ্যের সেরা লামাগণ নিয়োজিত হন এই অনুসন্ধান সমিতিতে। তারা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গণৎকারের নির্দেশানুযায়ী ছড়িয়ে পড়েন সম্পূর্ণ তিব্বতে। এই ভাবেই শুরু হয় দালাই লামার মৃত্যুর পর তাঁর নবজন্মের সন্ধান।

মন্ত্রীপরিষদ দালাই লামার সিংহাসনকে উপলক্ষ্য করে তাঁর প্রতিনিধি হয়ে এই রাজ্য শাসন করতে থাকেন। সামিয়ে গুম্ফার গণৎকার ও জ্যোতিষিদের নাম সর্বত্র বিদিত। তারা নবজাতক দেহে কোন কোন চিহ্ন নিয়ে জন্মগ্রহণ করবেন সেটা পর্যন্ত নিখুঁতভাবে বলে দিতে পারেন। দালাই লামা পুরোনো দেহ ছেড়ে আত্মা কোন পথে কোথায় গিয়ে আবার নতুন দেহ ধারণ করেছেন তা সামিয়ে গুম্ফার জ্যোতিষিরা ভালোভাবে লক্ষ্য করে থাকেন। তান্ত্রিক সাধুরাও এ বিষয়ে খুব বিজ্ঞ। লাসার প্রধান গণৎকারের নাম নেচুং। নবজাতক প্রাক্তন দালাই লামার অনেক চিহ্ন ও স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। যেমন, পায়ে ব্যাঘ্র-চর্মের চিহ্ন, চক্ষু ও ভ্রূ উপরের দিকে টানা, কান দুটো সাধারণ শিশুর কানের থেকে অনেক বড়, কাঁধে তীর চিহ্ন, হাতের মধ্যে শঙ্খ অথবা বজ্র চিহ্ন। প্রত্যেক দালাই লামার দেহে এই সবগুলো চিহ্ন না থাকলেও এরকম তিন চারটে চিহ্ন পাওয়া যাবেই।

নবজাতক শিশুর দেহে এইসব চিহ্ন ও তার স্বভাব-চরিত্র যাচাই করে যখন বোঝা যাবে যে সে-ই দালাই লামার উপযোগী তখন প্রাক্তন দালাই লামার ব্যবহৃত কিছু জিনসপত্রের সাথে অন্যান্য লোকের জিনিসপত্র মিশিয়ে শিশুর সামনে ধরা হয়। শিশুটি সাধারণতঃ ঠিক মতোই দালাই লামার জিনিসপত্রে হাত দেয়, অন্যান্য জিনিসে সে মোটেই উৎসাহ দেখায় না। শিশু ত্রয়োদশ দালাই লামা বেছে নিয়েছিলেন বজ্র। শিশুকে যখন প্রাসাদে আনা হয় তখন সে অনায়াসে তার জিনিসপত্রগুলো দেখে

চিনতে পারে। চার-পাঁচ বছরের শিশু হলেও সে অনেক সময় তার প্রিয় ধর্মগ্রন্থটি বেছে নিয়ে পড়তে শুরু করে। এইসব প্রমাণের পর আর কিছুতেই সন্দেহ থাকে না যে এই শিশুটির মাধ্যমেই আসল দালাই লামার পুনর্জন্ম হয়েছে। এবার আসা যাক বর্তমান অর্থাৎ চতুর্দশ দালাই লামা কিভাবে মনোনীত হয়েছেন সেই গল্পে। ঘটনাটা বর্তমান জগতের বিজ্ঞানীদের কাছে অদ্ভুত শোনাবে। বিজ্ঞানীরা আধ্যাত্মিক জগতের কার্য-কারণ জানেন না। তাই তাদের যান্ত্রিক বিদ্যার মধ্যে এই ঘটনাকে এনে যাচাই করবার ক্ষমতা তাদের নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা সত্য।

ত্রয়োদশ দালাই লামা, থুপ্‌টেন গীয়াৎসো ছিলেন তিব্বতের খুব প্রিয়। তিনি বহুকাল রাজত্ব করে তিব্বতের সামাজিক ও রাজনৈতিক বহু উন্নতিসাধন করেন। পোতালা প্রাসাদে বর্তমানে তাঁর সমাধি বেদিটাই সবচেয়ে বেশী পূজ্য আর ঐশ্বর্যে ভরা তো বটেই। ১৯৩৩ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর দেহত্যাগের পর সঙ্গে সঙ্গে গঠন করা হল একটা বিশেষ পরিষদ। এই পরিষদই পরবর্তী দালাই লামা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত রাজ্য শাসন করবে।

রাজ্যের মুখ্য গণৎকার, জ্যোতিষী ও প্রধান লামাদের ডাক পড়ল পোতালা প্রাসাদে। তাদের উপর ভার পড়ল নতুন দালাই লামা খোঁজার। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রাক্তন দালাই লামা, কোথায় পুনর্জন্ম করবেন তার কোন ইঙ্গিতই তিনি দিয়ে যাননি। কাজেই জ্যোতিষিমণ্ডলের কাছে এটা একটা বিরাট সমস্যা। তাঁরা সমস্যার সমাধানের জন্য ধ্যানে বসে তাঁর আত্মার সাথে যোগাযোগ করতে চাইলেন—ঠিক সেই সময় লাসার উত্তর-পূর্ব আকাশে হঠাৎ দেখা দিল শরতের মতো হালকা মেঘ। আকৃতি ও প্রকৃতি বিচার করে জ্যোতিষীরা বললেন যে ঐ মেঘ ঠিক যে অঞ্চলের উপর দেখা দিয়েছে সে অঞ্চলেই মহামান্য চেন্‌-রে-জি জন্মগ্রহণ করবেন। রাজ্যের মুখ্য গণৎকারও পণ্ডিতদের সেই গণনায় একমত হলেন।

ত্রয়োদশ দালাই লামার মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহকে নরবুলিংকা প্রাসাদে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তাঁর প্রিয় সিংহাসনে মর দেহটাকে রাখার পর তাঁর মুখটাও নাকি ঐ একই দিকে ঘুরে গিয়েছিল। কাজেই এই দুই ঘটনাকে পণ্ডিতরা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে ধরে নিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আরও তথ্যের জন্য গণৎকাররা অপেক্ষা করতে লাগলেন। এইভাবে প্রায় আরও দু'বছর কেটে গেল। গণৎকারদের মতে এটাই দালাই লামার পুনর্জন্মের উপযুক্ত সময়। প্রায় দু'বছর তাঁর আত্মা স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করে এবার নেমে আসবেন। ১৯৩৫ সালে জ্যোতিষী ও গণৎকাররা একত্র হলেন, তারপর তাঁরা তিব্বতের অন্যতম পবিত্র সরোবরের কাছে এসে উপস্থিত হলেন, লাসার প্রায় নব্বই মাইল উত্তরে এই সরোবরটি অবস্থিত, তার নাম লামোয়-লাৎসো।

হিন্দুদের মানস সরোবরের ন্যায় তিব্বতীদের লামোয়-লাৎসো সরোবর খুব পুণ্য তীর্থ। প্রাচীন কাল থেকেই মুনি-ঋষিরা এখানে তপস্যা করতে আসেন। এই লেকের আয়নার মতো জলে জ্যোতিষীরা দেখতে পান ভূত-ভবিষ্যত ও বর্তমানের ছবি।

সেখানে আবার বসলেন চেন্-রে-জির ধ্যানে। অনেকের মতে সেই সরোবরের গভীরে অনেক জাগ্রত দেব-দেবী বাস করেন ; কেবল উপযুক্ত সাধক তাঁদের দর্শন পান।

ধ্যান, প্রার্থনা ও পূজার্চনাদির পর হঠাৎ সরোবরের জলে তারা দেখতে পেলেন এক অলৌকিক ঘটনা। সরোবরের মাঝখান থেকে আকাশের দিকে উঠে এল তিনটি শব্দ—'অ' 'ক' এবং 'ম'। সেই অক্ষরগুলো কিছুক্ষণ থেকে তারপর প্রদীপের আলোর মতো নিভে গেলো। পণ্ডিতেরা প্রথমে ভেবেছিলেন এই শব্দগুলো নিশ্চয়ই কোন মন্ত্র হবে, কিন্তু ঠিক তার পরই সরোবরের জলে পরিষ্কার ভেসে উঠল, একটা ছবি, পরিষ্কার একটা গুম্ফার ছবি,গুম্ফার চূড়াটা উজ্জ্বল সোনালি ও সবুজ রঙের, আর তারই পাশে একটা সবুজ টালির ছাদের খামার বাড়ী। পণ্ডিত ও লামারা সকলে অবাক হয়ে সেদিক তাকিয়ে রইলেন। তাদের চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে উঠে আবার যেন ডুবে গেল। এই অলৌকিক ঘটনার অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁরা সবাই ফিরে এলেন, তারপর লাসায় জ্যোতিষীরা বসলেন বিচারে। গণৎকারেরা ডুব দিলেন তাদের রেখাতত্ত্বে। একটা স্থির সিদ্ধান্ত নিতে তাঁদের সময় লাগল আরও একবছর। তারপর গঠন করা হল এক অনুসন্ধান পরিষদ। সেই পরিষদের সভ্যরা সবাই লাসার উচ্চ পর্যায়ের ও উচ্চ পদের লামা। পরিষদের সভ্যদের অধীনে গঠিত হল বিভিন্ন অনুসন্ধান দল। বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে তারা সবাই বেরিয়ে পড়ল দালাই লামার সন্ধানে। লামোয়-লাৎসো সরোবরের সেই অলৌকিক ঘটনাটা তাদের মধ্যে খুব সাবধানে গোপন রাখা হল।

এই ধরনের একটা অনুসন্ধান দল এসে পৌঁছল লাসার উত্তর-পূর্ব দিকের দোখাম (Dokham) জেলার তাক্স্তার (Takstar) গ্রামে। অনুসন্ধান দলের প্রধান লামা সেখানকার বিখ্যাত কুম্বুম্ গুম্ফাটাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। এই গুম্ফটা অবিকল সরোবরে ভেসে ওঠা ছবির মতো আর গুম্ফার পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা খামার বাড়ী, যার সবুজ ছাদটাও ঠিক যেমন তাঁরা দেখেছিলেন।

অনুসন্ধান দলের দলনেতা লামোয়-লাৎসোয়, পণ্ডিত ও গণৎকারদের সাথে ছিলেন। তিনি এ দৃশ্য দেখে মনে মনে খুবই আনন্দিত হলেন। তিনি তাঁর দলের একজন ছোট লামাকে পাঠালেন সেই খামার বাড়ীর উদ্দেশ্যে। ছোট লামা খোঁজ খবর নিয়ে ফিরে এসে জানালেন যে, সে বাড়ীতে অনেকগুলো ছেলে মেয়ে আছে, সব চেয়ে ছোট ছেলেটির বয়স বছরখানেক। দলনেতা তাঁর কথা শুনে মনে মনে হিসেব করে দেখলেন, তারপর মুখে কিছু না বলে সে রাতের মতো সেখানকার গুম্ফায় আশ্রয় নিলেন। কুম্বুম্ গুম্ফা বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের কাছে খুব পবিত্র। এখানকার অনেক লামা সাধনার উচ্চ মার্গে উঠে নির্বাণ লাভ করেছেন আর তপস্যা ও শিক্ষার জন্যও এর খুব সুনাম আছে। কুম্বুম্ গুম্ফাটি মৌন ব্রতের জন্যও খুব বিখ্যাত। প্রাচীন কালে এখানকার কয়েকজন লামা সিদ্ধিমার্গের উচ্চে উঠে দেশের সর্বত্র তাঁদের বাণী প্রাচার করেছেন। ভূত-সিদ্ধ ও নির্বাণ এই দুই সাধনার জন্য আজও বহু লামা এখানে আসেন। কুম্বুম্ গুম্ফার লামারা অনুসন্ধান দলটিকে সাদর আহ্বান জানালেন। সেই গুম্ফাতেই

পাওয়া গেল সেই খামার বাড়ীর বড় ছেলেকে। ছোট ভাইয়ের বয়স প্রায় দু'বছর। এর বেশী আর কোন কথাবার্তা হল না।

পরের দিন অনুসন্ধান দলের নেতা নিজে এক সাধারণ চাকরের মতো ছেঁড়া পোশাক পরলেন আর দলের অন্য সকলকে খুব দামী পোশাকে সুসজ্জিত করে সকলে মিলে এসে উঠলেন সেই খামার বাড়ীতে। বাড়ীর মালিক খুব বড়লোক নয় মধ্যবিত্ত ঘরের। ইয়াক্ মুরগী আর কিছু জমি চাষ করে জীবন যাপন করেন। সকাল বেলায় তিনি একদল লামাকে বাড়ীতে আসতে দেখে, খুবই অবাক হলেন এবং সেই সাথে সাথে অতিথি সেবা করতে পারবেন ভেবে আনন্দিতও হলেন। সেদিন অনুসন্ধান দলের এক ভৃত্যকে দলনেতার পোশাকে সাজানো হয়েছে, গৃহকর্তা তাদের সসম্মানে প্রণাম করে ঘরে এনে বসালেন। দু'একটা কথার পর লামারা তার ছোট ছেলেকে দেখতে চাইলেন। পিতার বুক গর্বে ভরে উঠল। ভাবলেন আশীর্বাদ করার জন্যই তার শিশুকে ডাকা হচ্ছে। তার স্ত্রী দু'বছরের শিশুপুত্রকে কোলে করে সেখানে এসে হাজির হলেন।

দলের আসল নেতা সকলের পিছনে চাকরের মতো চুপচাপ ছিলেন। শিশুটি সকলের দিকে একবার তাকিয়েই সোজা চলে গেল সেই চাকরের পোশাক পরা আসল দল নেতার কাছে। সে তার হাত ধরে বলে উঠল আমাকে কোলে নাও। শিশুর সেই ভাব দেখে পিতা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন, দলনেতার কাছে হাত জোর করে বললেন—প্রভু অপরাধ নেবেন না, শিশুপুত্রকে আপনিই কোলে নিয়ে আশীর্বাদ করুন। তার কথা শুনে সকলেই নীরব রইলেন, কিন্তু শিশুটি এগিয়ে এসে তার পিতাকে বললেন—

—না বাবা আমি ঠিক বলছি—আমি ওর কোলে উঠব। লোকটা সেরা-গুম্ফার বড় সাধু।

শিশু পুত্রের আধো আধো স্বরে এই কথা শুনে সকলেই অবাক হলেন। তখন চাকরের বেশে আসল দলনেতা এগিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে শিশুটি আবার আব্দার করে উঠল—

—তোমার গলার ওই মালাটা আমাকে দাও।

—কেন এটা দিয়ে কি করবে। বড় লামা প্রশ্ন করলেন।

—আমি গলায় পরবো ওটা আমার।

শিশুর কথা শুনে এবার চাকরবেশী দলনেতা আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি মহানন্দে শিশুকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর তিনি সব খুলে বললেন—শিশুর কথাই ঠিক ; তিনিই দলনেতা; সেরা গুম্ফার প্রধান লামা ও কেওৎ-সাং-রিম্-পো-চে। আর তাঁর গলার মালাটা বহুদিন আগে দালাই লামারই দেওয়া। সাধারণ পোশাক পরিধান সত্ত্বেও শিশুকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হয়নি কারণ এই শিশুই হচ্ছে আসল দালাই লামা। এই ভাবেই আবিষ্কৃত হল বর্তমান দালাই লামা অর্থাৎ চতুর্দশ লামা যাঁর আসল নাম তেন্‌জিং গীয়াৎসো।

অনুসন্ধান দল পোতালায় ফিরে সে সংবাদ সকলকে দিল। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে শিশু

লামাকে লাসায় নিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত হলেন, কিন্তু চীনাদের সাথে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে তার আসার প্রায় তিন বছর দেরী হল। শিশু দালাই লামার সাথে তার বাবা-মা ভাই বোন সকলেই এলেন লাসায় তাঁর পরিবারের সকলকেই মহা সম্মানে ভূষিত করা হল। পোতালায় তার আগমন উপলক্ষে সম্পূর্ণ তিব্বতে শুরু হল আনন্দ উৎসব।

পাঁচ বছরের শিশু দালাই লামা, পোতালা প্রাসাদে ঢুকেই তার নিকট পারিষদদের চিনতে পারলেন, এমনকি তাদের নাম পর্যন্ত। তারপর সেই শিশুটি যেখানকার আসবাবপত্রগুলো ইতিমধ্যে সরানো হয়েছে তা বলে দিতে লাগল। লামাদের লাঠির সাথে তার লাঠিটাকে রাখা হয়েছিল সেটাকে পর্যন্ত তার চিনতে অসুবিধা হয়নি। তিব্বতের প্রত্যেকটি লোকের মুখে দালাই লামার এই গল্প মুখস্ত। তারা অপরকে বলতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করে।

ৎসেওয়াং পরিবারে আমি মাত্র তিনবার এসেছিলাম। তারপর একদিন আমি নিজেই যাওয়া বন্ধ করলাম। এদের মুখ থেকেই শুনলাম যে চীনা গুপ্তচরেরা নাকি খুব সাংঘাতিক। যদি একবার ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে যে আমি ভারতীয় তাহলে এই পরিবারের মধ্যেও দেখা দেবে দারুণ অশান্তি, আর এই অশান্তির ঝামেলা তিব্বতের প্রধানমন্ত্রীরও এড়াবার সাধ্য নেই।

তাই আমি তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে যে রকম হঠাৎ আলাপ হয়েছিল সেরকম হঠাৎই সম্পর্ক ছিন্ন করলাম।

তারপরের কয়েকটা দিন আমি মহামন্দিরে ধ্যান ও বিগ্রহ দেখেই সময় কাটাতাম। গুরুজী কখনো কখনো নাগার্জুন ও চন্দ্রকীর্তির বুদ্ধ দর্শন বুঝিয়ে শোনাতেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি তার দু'এক বর্ণ হয়তো বুঝতে পারতাম আর অধিকাংশ সময়েই হ্যাঁ হ্যাঁ বলে কাটাতাম। আমার মনটা সব সময়ই আবার চলার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠল।

লাসায় শেষের কয়েকদিন

লাসা থেকে আমরা যাবো যাবো করছি এমন সময় কাশাগ্ সচিবালয় থেকে এক নির্দেশ এল, সেটা আমাদের আবেদনেরই উত্তর। সেই নির্দেশনামতে তীর্থযাত্রীদের পোতালা পরিদর্শনের পারমিশন দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ সকলেই পোতালায় যেতে পারবে। আমাদের কাছে এটা একটা মহানন্দের সংবাদ। আমি গুরুজীর সাথে পোতালায় গেছি বটে, কিন্তু একসাথে যাওয়ার যে আনন্দ সেটা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম। মনে মনে নিজেকে খানিকটা স্বার্থপর বলে মনে করেছিলাম। লাসায় এসে তীর্থযাত্রীরা পোতালা প্রাসাদে ঢুকতে পারবে না সেটা চিন্তা করাও যায় না। কাজেই কাশাগের এই সংবাদে আমরা সকলেই খুব খুশী, লাসায় আসা সার্থক হল। এই সংবাদে আমরা যদিও খুশী হলাম কিন্তু পরের সংবাদে হতভম্ব হতে হল।সেই নির্দেশপত্রের দ্বিতীয় সংবাদে লেখা আছে যে, স্থানীয় হান্ বা চীনা কর্তৃপক্ষ আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যাবার আদেশ দিয়েছে। সেই আদেশপত্রে পরীষ্কার ভাবে উল্লিখিত আছে যে তীর্থযাত্রীদের বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে যেতে হবে, অর্থাৎ দলবদ্ধভাবে তাদের চলাফেরা করা চলবে না। শেষের সংবাদটা আমাদের কাছে মাথায় বাজ পড়ার মতো মনে হল। আমরা একসাথে এসেছি এবং একসাথেই যাবো—গুরুজীকে ছাড়া এই অজানা দেশে চলবো কি করে, না জানি রাস্তা না জানি ভাষা কিন্তু আদেশ মানতেই হবে। এখানকার চীনা কর্তৃপক্ষ জেনারেল তান্‌কুয়ান-এর খুব দাপট। লোকে বলে যে সর্বত্যাগী রিপুজয়ী লামাদের বুকেও তার হুকুমে রক্তস্রোত পালটায়। হুকুম অনুযায়ী আমাদের বিশদ পরিকল্পনাও তৈরী করতে হল। ঠিক হল যে আমরা সেইদিনই পোতালা দেখতে যাবো। তার পরের দিন নরবুলিংকায় যাবো চেন্-রে-জি দর্শনে। তারপর দ্রেপুং গুম্ফায় দু'দিন থেকে আবার ধরবো সিকিমের পথ।

পোতালা ঃ পোতালা প্রাসাদে ঢোকবার অনেক ছোট খাটো পথও আছে। আর তাদের নাম বিভিন্ন। পোতালা পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে সাধারণত তীর্থযাত্রীরা দণ্ডি কেটে উপরে উঠে সেই পথটা খুব প্রশস্ত। হৃষিকেষের ঘাট থেকে রামমন্দিরে উঠার রাস্তার সিঁড়ির মতো অনেকটা। বিদেশীদের কাছে এই রাস্তাটাই বেশী পরিচিত । রাস্তাটার নাম তীর্থের পথ। আরেকটা প্রধান রাস্তা মহান দালাই লামা-বা চেন্-রে-জি যে পথে পোতালায় ওঠা-নামা করেন সে পথের নাম দালাই লামার পথ। আর অসংখ্য ছোট-খাটো পথ রয়েছে সেগুলো একমাত্র পোতালার স্থানীয় বাসিন্দা না হলে ব্যবহার করা অসম্ভব ! তবে পোতালায় উঠবার সব পথই সিঁড়িপথ বড় বড় পাথরের সিঁড়ি।

আমাদের এই সফরটি খুবই সংক্ষেপ শুধু বিশেষ বিশেষ স্থানগুলো দেখানো হচ্ছে। গাইডের নাম ওগীয়ান দোরজে। সে পোতালার একজন সরকারী কর্মী। ওগীয়ানকে মনে হল খুব সিরিয়াস ধরনের লোক। প্রয়োজন ছাড়া সে কথা বলে না । ওগীয়ান পোতালার বিভিন্নি ঘরবাড়ীগুলোকে উপেক্ষা করে সরাসরি আরম্ভ করল সমাধি দেবীর প্রসঙ্গ।

পোতালায় অনেক দালাই লামারই সমাধি রয়েছে বটে কিন্তু তার মধ্যে আসল হচ্ছে পঞ্চম ও ত্রয়োদশ দালাই লামার সমাধি। পোতালার লাল প্রাসাদ ও সাদা প্রাসাদের মাঝখান থেকে গম্বুজ আকারের এই দুটো সমাধি উপরের দিকে উঠে গেছে। তিব্বতীদের কাছে এই দুই দালাই লামা বিশেষভাবে পূজ্য। আমি আগেই পোতালা ঘুরেছি কাজেই গাইডের কথায় খুব বেশী মন না দিয়ে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতে লাগলাম।

আমরা এলাম দালাই লামার অভিষেক ঘরে সেখান থেকে পোতালা প্রাসাদের বিভিন্ন অংশ খুব ভালোভাবে দেখা যায়। এখান থেকে দালাই লামা যে ঘরে থাকেন সে ঘরটিও দেখা যায়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইয়ং হাসব্যাণ্ড নামে যে ইংরেজ অভিযাত্রী ও ইংরেজী প্রতিনিধি লাসায় আসেন তিনি এই অভিষেক ঘরে বসেই দালাই লামার সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন। সরাসরি সেই সময় থেকেই তিব্বতের সাথে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার সরাসরি যোগাযোগ ঘটে।

পোতালার গম্বুজের পাশ দিয়ে আমরা ছাদে এসে হাজির হলাম। সেখান থেকে চার দিকে দৃশ্যটা অতি মনোরম। লাসার সমতল ভূমিটার চারদিকেই পাহাড়-পাঁচিলে ঘেরা। প্রকৃতিদেবী যেন লাসাকে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে সমস্ত দুনিয়া থেকে তাকে আলাদা করে রেখেছে। সে কারণেই বুঝি বৌদ্ধ-তন্ত্র আজও পৃথিবী থেকে অনেক দূরে। পোতালা প্রাসাদের অভ্যন্তরের প্রত্যেকটি ঘর উজ্জ্বলরঙের কারুকার্যে ঢাকা। খোদাই করাই হোক বা দেয়ালে চিত্রিত করাই হোক প্রত্যেকটি কাজকেই সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মাথার উপর দেয়ালের কোণ অথবা অন্ধকার এ সবের অজুহাতে শিল্পী তার প্রতিভার স্ফুরণে এতটুকু দূরে সরে যান নি। লাল-সোনালী-হলদে প্রভৃতি উজ্জ্বল রঙের বিভিন্ন তাংখা, মণ্ডলা, বৌদ্ধ বাণী ও জীবনীতে ভরে উঠেছে পোতালা প্রাসাদের প্রত্যেকটি কোণ। আর সেই সাথে সাথে গম্বুজের রত্নভাণ্ডার তো বটেই। পঞ্চম ও ত্রয়োদশ দালাই লামার গম্বুজের আভ্যন্তরীণ প্রত্যেকটি আসবাবপত্রই সম্পূর্ণ সোনার তৈরী। আর গম্বুজের ছাদটাও নাকি সোনার পাতে মোড়া, যেমন দেখেছিলাম চিদাম্বরনাথম্ মন্দিরের ছাদ।

গাইড ওগীয়ান দোরজে আমাদের এক ঘন্টার মধ্যে সমস্ত পোতালার উপরের অংশটা দেখিয়ে ছেড়ে দিল। তার দ্রুত তিব্বতী ভাষা ও প্রাসাদের আভ্যন্তরিক অন্ধকার এই দুটো কারণে আমরা সকলেই প্রায় অন্ধকারেই থেকে গেলাম। সে গোঁজামিল দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে আমাদের ছেড়ে দিল।

গুরুজী অবশ্য যতটা সম্ভব তর্জমা করে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। আমরা স্পষ্টই বুঝলাম যে ওগীয়ান দোরজে মোটেই এই কাজটা পছন্দ করে না—গাইডের দায়িত্ব তার উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমরা যে ধর্মশালায় আছি সেখান থেকে পোতালার প্রাসাদে উঠতে লাগে প্রায় দেড়ঘন্টা। নামবার সময় কোন অসুবিধাই নেই। আমরা দুপুরে ঘরে ফিরে কিছু শুকনো সবজি ও বার্লি সেদ্ধ করে মধ্যাহ্ন আহার শেষ করলাম। বয়স্ক ব্যক্তিরা সবাই একটু শ্রান্ত বলে মনে হল। বেলা আড়াইটা নাগাদ আমরা বসে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করছি এমন সময় হঠাৎ ওগীয়ান দোরজে এসে হাজির। কোনরকম ভূমিকা না করেই সে জিজ্ঞাসা করল—আপনাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে— হ্যাঁ, আমরা উত্তর দিলাম। আমাদের উত্তর শুনেই ওগীয়ান বলল—তাহলে উঠুন চলুন আমরা যাবো নরবুলিংকা প্রাসাদে। কালকে আমার সময় হবে না, এখনই চলুন আমি আপনাদের চেন্‌-রে-জি দর্শন করিয়ে দেবো। সন্ধ্যের সময় তিনি কিছুক্ষণের জন্য দর্শন দিয়ে থাকেন আমি সব বন্দোবস্ত করে দেবো।

আমাদের কথা ছিল কালকে যাবার কিন্তু ওগীয়ান আমাদের কথা শুনতে রাজি নয়। অর্থাৎ ওর কথামতো আজকেই যদি যাই তাহলে ভালো নয়তো কাল ওর সময় হবে না। তিব্বতীদের যে সময় জ্ঞান আছে বা সময়ের দাম আছে সেটা এই প্রথম শুনলাম। আমরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবার রওনা হতে বাধ্য হলাম। কেন জানি না প্রথম থেকেই ওগীয়ান লোকটিকে আমার ভালো লাগেনি। ওর রুক্ষ ভাবটা যেন তিব্বতী চরিত্রের বিপরীত। তীর্থযাত্রীদের অন্যান্য সকলেই আমার বয়োজ্যেষ্ঠ মনে হয় এ সব ছোট-খাটো ব্যাপারে তাঁদের কিছু যায় আসে না। তাদের আদর্শ মনে করে আমিও চুপ করে গেলাম।

নরবুলিংকা প্রাসাদে দালাই লামা দর্শন ঃ আমরা সবাই জোখাং মন্দিরের কাছে দোকান থেকে প্রত্যেকে একটা করে সাদা কাঁথা (কাপড়ের টুকরো) কিনে নিলাম। আমাদের দেশের ফুলের মালা দেবার রীতি। এদের দেশে মহাত্মা দর্শনে গেলে ফুলের পরিবর্তে এই সাদা কাপড়ের টুকরো বিনিময় করা হয়। মন্দিরের প্রবেশের সময়ও সেই একই রীতি। সন্ধ্যের একটু আগে আমরা নরবুলিংকা প্রাসাদের সামনে উপস্থিত হলাম। প্রাসাদটা, আমি আগেই লিখেছি, অনেকটা বর্ধিষ্ণু বাংলো বাড়ীর মতো। সাদা পাঁচিলের ধারে অনেক তিব্বতীরা বসে রয়েছে। গরীব সাধারণ তিব্বতীদের দালাই লামা দর্শন দেয় না। কাজেই পাঁচিল ছুঁয়ে ও প্রদক্ষিণ করেই তারা সন্তুষ্ট। বিভিন্ন উৎসবের সময় মাননীয় দালাই লামা বা চেন্‌-রে-জি যখন মঞ্চে যান একমাত্র সেই সময়েই গরীব ও পথের লোকেরা তাঁর দর্শন পেয়ে ধন্য হয়।

আমাদের এই ছোট্ট তীর্থযাত্রীর দল আসছে সুদূর নেপাল থেকে,কাজেই অমাদের কথা আলাদা। ওগীয়ানের সঙ্গে আমরা প্রাসাদের মূল দরজায় এসে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম

করলাম। তারপর সে দরজা দিয়ে না ঢুকে এগিয়ে গেলাম পিছনের দিকে। প্রাসাদের পিছন দিকে আসতেই নজরে পড়ল, পাঁচিল-কাটা, আর একটি দরজা। দরজার সামনেই দাঁড়িয়েছিল একটি চৌকিদার, ওগীয়ান তাকে আগে থেকেই চিনতো, কাজেই কোনো অসুবিধা হল না। চৌকিদার আমাদের একে একে ভেতরে ঢুকিয়েই আবার দরজাটা বন্ধ করে খিল দিয়ে দিল। আমরা একটা ছোট্ট বাংলোর দিকে এগিয়ে চললাম। সেখানে পৌঁছবার আগেই তিনজন তিব্বতী আমাদের দিকে ছুটে এল, ওগীয়ানকে দেখে তারা থামলো। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর, তারা আমাদের সেখানে অপেক্ষা করতে বলে বাংলোর দিকে এগিয়ে গেল। এই বাংলোটাই হচ্ছে মহামান্য দালাই লামার নিজস্ব মন্দির। পোতালার মত নরবুলিংকাতেও দালাই লামার নিজস্ব মন্দির রয়েছে। প্রায় সাত আটজনের মাধ্যমে আমাদের সংবাদ মহামান্য দালাই লামার কানে গিয়ে পৌঁছল। আমাদের ডাক পড়ল দর্শনের। সিকিমের রাজবাড়ীর বৌদ্ধ মন্দিরের মতোই এই মন্দিরটা। পাথর ও সিমেন্টের দেয়াল, কাঠের দরজা জানালা আর টিনের চাল। কাঠের উপরে চমৎকার খোদাই কাজ কার, আর সব কিছুতেই ব্যবহার করা হয়েছে উজ্জ্বল রং। বারান্দায় উঠতেই দালাই লামার একজন পার্শ্বচর আমাদের হাসিমুখে আহ্বান জানালেন। এই ভদ্রলোককে আমি ও গুরুজী আগেই বাগানে দেখেছিলাম সে কথাটা আমরা গোপন করে গেলাম। দরজার ভেতরে ঢুকতেই সামনে নজরে পড়ল বিরাট বুদ্ধমূর্তি, তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়াতেই স্ট্যাচুটির নীচে নজরে পড়ল একটা বিরাট ইজি-চেয়ারে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। বুঝতে অসুবিধা হল না ইনিই চেন্-রে-জি। অল্প বয়স্ক তরুন তিব্বতরাজ চেন্-রি-জি। তাঁর আশপাশে আরও চারজন দাঁড়িয়ে। প্রথমে গুরুজী তারপর একে-একে আমরা সবাই তাঁকে কাঁথা অর্পণ করে সামনের গদীতে বসালাম। তিনি হাসিমুখে একে-একে আমাদের প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে আপ্যায়ন করলেন। আমরা সকলে বসার পর তিনি শুরু করলেন সমবেত প্রার্থনা। দু-মিনিট প্রার্থনার পর তিনি আমাদের আশীর্বাদ করলেন। তারপর আমাদের উৎসাহ ও ভক্তির প্রশংসা করে তিনি চার পাঁচ মিনিট প্রশংসা বাণী দিলেন। তারপর তাঁর সেই দীর্ঘদেহী পার্শ্বচর ইসারায়আমাদের উঠতে বললেন। আমরা আবার প্রণাম করে বিদায় জানালাম। সবশুদ্ধ মিলিয়ে তাঁর কাছে আমরা পাঁচ মিনিট মাত্র ছিলাম। সেই অল্পক্ষণেই দালাই লামার পবিত্র ও উজ্জ্বল মুখটি আমাদের হৃদয় স্পর্শ করল। ওগীয়ান তার দায়িত্ব সম্পন্ন করেই বিদায় জানাল, তাকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে সে উত্তরে বলল—আপনাদের যাত্রা সফল হোক ভগবান আপনাদের রক্ষা করুন। ওগীয়ানের সাথে ইচ্ছে থাকলেও এর বেশী আলাপ করা সম্ভব হল না। নরবুলিংকা প্রাসাদের বাইরে এসেই সে বিদায় নিল। আমরা দালাই লামার পবিত্র স্মৃতি নিয়ে ফিরে এলাম ধর্মশালায়।

লাসায় আমাদের কর্তব্য সম্পন্ন হয়েছে, জোখাং মন্দিরে আমরা ধর্ণা দিয়েছি প্রদক্ষিণ করেছি প্রার্থনা করেছি। পোতালা প্রাসাদ দেখলাম, দালাই লামা দর্শন পেলাম, তীর্থযাত্রীদের পক্ষে এর বেশী আর কিছু কাম্য নয়। এবারে ড্রেপুং মন্যাষ্ট্রিতে দু'দিন

থেকে তারপর ফিরতে হবে। পরের দিনই আমরা খুব ভোর বেলা জোখাং মন্দিরে মহাকালীকে প্রণাম করে লাসা ছাড়লাম।

দ্রেপুং গুম্ফা ঃ সেইদিনই রাত্রিতে আমরা এসে পৌঁছলাম দ্রেপুং-এ। পূর্ব পরিচয়ের জন্য আর কোন অসুবিধাই হল না। এর আগের বারে যে ঘরে আমরা ছিলাম, সে ঘরটাতেই আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হল। চীনা কর্তৃপক্ষের হুকুম অনুসারে এখান থেকেই আমাদের বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে যাত্রা করতে হবে। এটা তীর্থযাত্রীদের কাছে একটি বিরাট তপস্যা। তবে সমস্যাটা যত জটিলই হোক না কেন তা মীমাংসা করতেই হবে। দ্রেপুং গুম্ফার বর্ণনা আগেই দিয়েছি— তাই নতুন করে আর সে কথা লিখছি না। লাসা ও দ্রেপুং গুম্ফার বেশ কিছুদিন থাকার পর আরও কয়েকটি বিষয়ে বিশদ ভাবে জানতে পারলাম, যেমন—আমরা দালাই লামাকে তিব্বতের শাসন বিভাগীয় সর্বেসর্বা ভেবেছিলাম আমাদের ধারণাটা ভুল। তিব্বতের আভ্যন্তরিক বিষয়েও চীনাদের প্রভাব অস্বাভাবিক ভাবে দিন দিন বেড়ে চলেছে । দ্রেপুং গুম্ফার একটু দূরেই চীনাদের বিরাট মিলিটারী ঘাঁটি বসেছে। লাসার বাজারে চীনা পণ্য সম্ভারের অভাব নেই, অবশ্য আগেও ছিল তবে আজকাল তা আরও দশগুণ মাত্রায় বেড়েছে। তিব্বতীদের রক্ষা করবার অজুহাতে চীনা পিপ্‌ল্‌স্‌-লিবারেশন আর্মি (P. L. A.) লাসাকে অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে ধরেছে। আর শিক্ষা ও বন্ধুত্ব বিনিময়ের নামে ঢুকেছে সেখানকার রাজনীতি।

দ্রেপুং-এর ছাত্রদের মতে চীনারা যে ভাবে এদেশের চারদিকে প্রবেশ করছে তাতে তিব্বতী ধর্ম ও লামাপ্রথাকে টিকিয়ে রাখা মুশকিল। চীনা ড্রাগন মনে হয় শীগগীরই তিব্বতকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করবেই।

লাসার বিদেশীরা ইতিমধ্যেই তাদের পাততাড়ি গুটিয়েছে। দ্রেপুং সেরা ও গান্‌দেন গুম্ফার ছাত্র সংখ্যা আজকাল অর্ধেকের কমে এসে পৌঁছেছে। দ্রেপুং-এর ভুটানী ও সিকিমি ছাত্ররা ইতিমধ্যেই যে যার দেশে চলে গেছে। অল্প সংখ্যক নেপালী ছাত্র বছরের শেষের দিকে তাদের শিক্ষা শেষ করে বাড়ী ফিরে যাবে। আমরা আসার পথেই দেখেছি যে অনেক মঠের সাথে লাসার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তরুন দালাই লামা ও তার পরিষদ আভ্যন্তরিক ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে অন্যদিকে নজর দিতে পারছেন না। দ্রেপুং গুম্ফায় কয়েকদিন থাকলেই এ বিষয়ে পরিষ্কার জানা যায়। চীনাদের জন্যই আমাদের সমস্যা দেখা দিয়েছে । গীয়াৎসে থেকে আসার সময়েও এই রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যাই হোক, সেদিন রাতেই গুরুজীর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করলাম। গুরুজীর মতে এতদূর এসে কৈলাস ও মানসসরোবরকে দর্শন না করে ফিরে যাওয়া মানে এক বিরাট সুযোগের অপচয় করা।

গুরুজীর মুখ থেকে কৈলাস কথাটা শুনেই আমার বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। কৈলাসের এক চিন্তা বিদ্যুতের মতো যেন আমার মাথায় ঢুকে গেলো। তাঁকে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করতেই তিনি বললেন—

পথ খুব দুর্গম কিন্তু যাওয়ার পথ-নির্দেশ খুব সোজা। ব্রহ্মপুত্র সামনেই তার ধার

ধরে সরাসরি উৎসের দিকে গেলেই পাওয়া যাবে মানস সরোবর আর তার পাশেই রয়েছে কৈলাস পর্বত, হিন্দুদের সেটাই শিবভূমি মহাতীর্থ কৈলাসনাথ।

আমার মনে গাঁথা হয়ে রইল সেই কথাগুলো।

তীর্থযাত্রীদের সাথে গুরুজীকে ফিরতেই হবে। সুস্থ দেহে তাদের ঘরে ফিরিয়ে নেবার গুরু দায়িত্ব নিয়েছেন গুরুজী।

কৈলাস যাত্রার প্রস্তুতি

দ্রেপুং মন্যাস্ট্রি থেকে আস্তে আস্তে তীর্থযাত্রীরা বিদায় নিতে লাগল। প্রথম বিদায় নিলেন গুরুজী, তার সাথে গেলেন তিনজন লামা। যাবার পথটা আরও কঠিন। বিশেষ করে এখান থেকে গীয়াৎসে পর্যন্ত, এবার শুধু উঠবার পথ। আসার পথে অর্থাৎ গ্যাংটক থেকে এ পর্যন্ত গুরুজীর মোটা কম্বলটা সব সময় আমার পীঠেই ছিল—অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেটাকে গুরুজীর সাথে দিতে বাধ্য হলাম। গুরুজী সংযমী ও অনাসক্ত পুরুষ। কোনো বিষয়েই তাঁর আসক্তি নেই তিনি তাঁর কর্তব্য করেন মাত্র। তাঁকে বিদায় জানাতে আমার অন্তরটা যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতে লাগল, অতি কষ্টে তা গোপন করে গেলাম। তাঁকে প্রণাম করে আমি কোন প্রকারে চোখের জল সংবরণ করলাম। হঠাৎ মনটা এমনভাবে কেন যে কেঁদে উঠল কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। গুরুজী আমর মাথায় আলতোভাবে স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলেন মাত্র সেই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে আর কোনরকম কথা হল না।

তারপর আরও চারদিন কেটে গেল একে-একে দু'তিন জন করে তীর্থযাত্রীরা সবাই বিদায় নিলেন। শেষ দলে আমার যাবার কথা ছিল। কিন্তু আমি না গিয়ে তাদের বললাম—আপনারা চলে যান আমি পরে যাচ্ছি। গুরুজীর কাছ থেকে কৈলাসের কথা শোনা অবধি আমর মনের মধ্যে সেই একই চিন্তা অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে; কৈলাসনাথ শিবতীর্থ মহাতীর্থ। সেই কথাগুলোকে ঘিরে মনে মনে এক কৈলাস লোকের সৃষ্টি করেছি। আর মনের অজ্ঞাতে নিজেই সেই সৃষ্টিজালে আটকে পড়েছি। যে রকম করে হোক যেতেই হবে। গুরুজীর কথাটা বার বার কানে বাজতে লাগল—পথ দুর্গম কিন্তু কৈলাসনাথের পথ নির্দেশ খুব সোজা। ব্রহ্মপুত্র সামনেই তার ধার ধরে সরাসরি উৎসের দিকে গেলেই পাওয়া যাবে মানস সরোবর আর তারই পাশে রয়েছে মহাতীর্থ কৈলাসনাথ। গুরুজী ঠিকই বলেছেন যে এতদূর এসে কৈলাসনাথ না দেখে ফিরে যাওয়া মানে বিরাট সুযোগের অপচয় করা। মনটাকে বেঁধে নিলাম, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যেতেই হবে কৈলাসনাথ।

ইতিমধ্যে আমি তিব্বতী হরফ প্রায় আয়ত্তের মধ্যে এনেছি। সংস্কৃতই তিব্বতী ভাষার উৎস। তবে সংস্কৃত থেকে এ ভাষা আরও সোজা। স্বরবর্ণ তিরিশটি আর ব্যঞ্জনবর্ণ মাত্র চারটি, ই, উ, এ আর ও। তিব্বতী ভাষায় বলে গিন্ড, শাব্‌কু, দ্রেংবু আর নারো। এখন আর আমি মৌনী বাবা নই। জোখাং মন্দিরে ধর্ণা দেওয়া পর্যন্ত আমি মৌনী ছিলাম। কয়েকটি নেপালী ত্রাপা'র সাথে আমার ইতিমধ্যেই বন্ধুত্ব হয়েছে,

তাদের কাছ থেকে অনেক নতুন বিষয় জানতে পারলাম। গুম্ফার ছাত্রদের মণ্ডলা-রহস্য খুব ভালোভাবে জানতে হয়। মণ্ডলা'র জ্ঞান থাকলেই পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য জানা যায়। মণ্ডলার গণিত ও রঙের ব্যাখ্যার জন্য ছাত্রদের প্রায় দু'বছর বিশেষ শিক্ষা নিতে হয়। আর মুদ্রার মাধ্যমে জানতে হয় মনের বিচার আর বিকাশের কৌশল। লামাদের যেকোন পরীক্ষা বা বিতর্কের সময় মুদ্রার বিশেষ প্রয়োজন। মুদ্রা মনের ভাবকে প্রকাশ করে। ধ্যানের সময় বিশেষ মুদ্রা ধারণ করলে ধ্যানের পথ সুগম হয়। দ্রেপুং গুম্ফাতেই আমি প্রথম মুদ্রার বিষয়ে অবগত হই।

শাসন ব্যবস্থা ঃ দালাই লামা ও পাঞ্চেন লামা তিব্বতের দুই মহাপুরুষ। পাঞ্চেন লামা থাকেন সীগাৎসে। তিনি বলতে গেলে প্রায় স্বাধীনভাবেই প্রতিষ্ঠিত। তিনি সীগাৎসে ছাড়া তিব্বতের অন্য কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না। কার্যতঃ দালাই লামাই তিব্বতের শাসক। চীনা কর্তৃপক্ষ অবশ্য আজকাল সে ক্ষমতাটাকে রক্ষা করার অজুহাতে দুর্বল করে দিচ্ছে। আমি সে বিষয়ে উপেক্ষা করে সরাসরি দালাই লামার শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে দু'এক কথা লিখছি।

দালাই লামার শাসন পরিষদ দুই ভাগে বিভক্ত। উচ্চ পর্যায়ের লামাদের নিয়ে গঠিত 'ইক্সাং' বা ধর্ম পরিষদ। রাজ্যের বিভিন্ন গুম্ফা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের এরাই মালিক। দ্বিতীয় পরিষদকে বলা হয় 'কাশাগ্'। কাশাগই রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলার মালিক। তিব্বতের বনেদি পরিবারকে বলা হয় গীয়েরপা সাধারণতঃ লামাদের পরেই এই শ্রেণীর স্থান। এই সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবকেরা পাঁচ ছ'বছর লাসার স্কুল থেকে উপযুক্ত শিক্ষা নিয়ে সরাসরি শাসন ব্যবস্থায় ঢুকে পড়ে। কাশাগ্ পরিষদের সর্বোচ্চ স্থান হচ্ছে প্রধান মন্ত্রী বা চিকাপ্। অন্যান্য মন্ত্রীদের বলা হয় শা-পে, দে-পোং ইত্যাদি। সমস্ত তিব্বতকে পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছে। লাসা ও সীগাৎসে এই দুটো প্রধান শহর নিয়ে প্রথম প্রদেশ নাম উ-সাং, গারটক দ্বিতীয়,খাম্ তৃতীয়, উত্তর তিব্বত বা চাং চতুর্থ, দক্ষিণ তিব্বত বা লোকা পঞ্চম। যদিও খাম্ প্রদেশ অর্থাৎ চাম্‌দো এলাকা এখন সম্পূর্ণ চীনাদের অধীনে তবুও সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী অর্থাৎ চি-কিয়াপ্ এখনও তার ঘাঁটি আগলে বসে আছেন। প্রত্যেকটি প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তার দুর্গ-প্রধানের মাধ্যমে শাসন চালিয়ে থাকেন। দুর্গ-প্রধানই প্রাদেশিক সামরিক বাহিনীর সর্বেসর্বা তাকে বলা হয় জোং-পো।

যুদ্ধ-বিগ্রহ ঃ অন্যান্য দেশের মতো তিব্বতকেও বহিঃশত্রুর আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছে। তিব্বতের পুরো ইতিহাস পাওয়া মুশকিল। সপ্তদশ শতাব্দী অর্থাৎ রাজা স্রোং-সান্-গাম্পোর সময় থেকেই ধারাবাহিকভাবে তিব্বতের ইতিহাস লেখা শুরু হয়। হিমালয়ের এই গহন কোণে লুকিয়ে থাকা সত্ত্বেও বার বার তাকে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতে হয়েছে। স্রোং-সান্-গাম্পো চীনা সম্রাট তাই-সুং' এর কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। চীনা সম্রাট তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাতে শুরু হয় প্রথম তিব্বত-চীন

যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে রাজা স্রোং-সান্ জয়ী হন। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে তিনি চীনাদের বেশ কিছু অঞ্চল অধিকার করে বসেন আর সেই সাথে সাথে রাজকন্যাকেও।

কুবলাই খানের আমলে তিব্বত চীনাদের সাথে সন্ধি চুক্তি করতে বাধ্য হয় ফলে তিব্বত চীনদেশের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। তারই আনুকুল্যে তিব্বতের বৌদ্ধ-তন্ত্র সমস্ত চীনে ছড়িয়ে পড়ে। পনেরোশ' শতাব্দীতে চীনের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশের রাজকীয় ধর্ম হিসেবে তিব্বতের গেলুক্-পা সম্প্রদায়কেই গ্রহণ করা হয়। তিব্বতের কাছে এটা একটা বিরাট সম্মান। সেই সময় থেকেই তিব্বত চীনা-শাসনভুক্ত হয়ে পড়ে। চীনা-শাসনভুক্ত হলেও তিব্বতের ধর্মপ্রভাবের ফলে সে একটি স্বতন্ত্র দেশের মতোই স্বাধীনতা উপভোগ করে। সেই সময় থেকে শুরু হয় তিব্বতের দালাই লামা পুনর্জন্ম প্রথা। তিব্বতের প্রথম দালাই লামা ছিলেন গেন্-তুং-দ্রি-পা, তিনি তাশী লুম্‌পো গুম্ফায় (সীগাৎসে) তাঁর প্রথম ধর্মচক্র স্থাপন করেন। তিনি গেলুক্-পা সম্প্রদায়ের। কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে বৌদ্ধ তন্ত্র বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৫৮৭ খৃস্টাব্দে মোগল সম্রাট আল্‌দান গেলুক্-পা সম্প্রদায়ের ধর্মনেতাকে বজ্রধারা দালাই লামা নামে অভিষিক্ত করেন।

১৬৫২ খৃস্টাব্দে পঞ্চম দালাই লামা পিকিং-এ যান এবং সেই সময় থেকেই লাসা পিকিং সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেই সম্পর্কে আস্তে আস্তে ভাঁটা পড়ে। এই সময় চীন তার আভ্যন্তরিক বিষয়ে জড়িত হয়ে পড়ে। কাজেই তিব্বত আস্তে আস্তে তাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। ভারত তখন ব্রিটিশ রাজ্যের অধীনে, কাজেই তিব্বত ব্রিটিশ-রাজের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে বাধ্য হয়।

এই সময় তিব্বতকে বেশ কয়েকবার যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। ১৭৮৮ খৃস্টাব্দে গুর্খা সেনারা তিব্বত আক্রমণ করে, কিন্তু চীনা সৈন্যের সাহায্যে তিব্বতীরা গুর্খা সৈন্যদের পরাস্ত করে। ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে নেপাল তিব্বতের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে নেপালী সৈন্যরা চীনাদের কাছ থেকে তিব্বতে অভিযান করার সন্ধি চুক্তি-পত্রে স্বাক্ষর করে।

১৯০৪ সালে ব্রিটিশ কম্যাণ্ডার ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যাণ্ড (Francis Yonghusband) লাসায় তার অভিযান চালায়। দালাই লামা বিদেশী আক্রমণ ভেবে পালিয়ে যান চীনে। মহামান্য দালাই লামার অবর্তমানে পাঞ্চেন লামা তিব্বতীদের জনপ্রিয় অধিনায়ক হয়ে উঠেন। তিনি স্বদেশ ও প্রজারক্ষার গুরু দায়িত্ব বহন করেন। বলাই বাহুল্য, দলাই লামা, যিনি বজ্রপাণী ভুবনবিজয়ী, তিনি কি করে তাঁর দেশবাসীকে বিদেশী আক্রমণের মুখে ফেলে দিয়ে নিজ জীবন-রক্ষার্থে পলায়ন করলেন তা দেশবাসীর ভেবে উঠতে পারলেন না। মহামান্য চেন্-রে-জী'র সমালোচনা করা সাধারণ মানুষের শোভা পায় না। তাই তারা চুপ করে গেলো কিন্তু সেটাই ছিল পাঞ্চেন লামার প্রধান হাতিয়ার। সেই সময়েই পাঞ্চেন লামাতাশী লুম্পে প্রজারক্ষার্থে তাঁর অভয়বাণী প্রচার করলেন, তিনি হয়ে উঠলেন সীগাৎসের প্রজাবৎসল ভক্তাধীন জনপ্রিয় তাশী লামা।

১৯১১ সালে চীন দেশে শুরু হয় বিপ্লব (Chinese Revolution) । ত্রয়োদশ দালাই লামা ভাবলেন তিব্বতকে চীনা কবল থেকে মুক্ত করার এটাই সুবর্ণ-সুযোগ, কারণ পিকিং তখন আভ্যন্তরীণ গোলযোগে লিপ্ত। তিনি ঘোষণা করলেন "তিব্বত একটা স্বাধীন স্বাতন্ত্র্য রাজ্য।" দালাই লামার এই ঘোষণায় বিপরীত ফল দেখা দিল, তাঁর নিজ দলের অনেক উচ্চপদস্থ চীন-প্রিয় লামা দালাই লামার এই চীন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার বিরোধী হয়ে দাঁড়ালেন, কাজেই শুরু হল বিশৃঙ্খলা, শেষ পর্যন্ত দালাই লামার জীবন নিয়ে খেলা শুরু হল, দালাই লামা বাধ্য হলেন পালিয়ে যেতে। তিনি দার্জিলিং গিয়ে ইংরেজদের আশ্রয় ও সাহায্য চাইলেন। ১৯১২ খৃস্টাব্দে ইংরেজদের সহায়তায় তিনি স্বাধীন তিব্বত ঘোষণা করলেন।

শক্তিশালী ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে শক্তি ক্ষয় না করে পিকিং মেনে নিল ১৯১৩ সালের সিমলা কন্‌ফারেন্স। চীনারা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলেন বটে, কিন্তু আন্তরিকভাবে স্বাধীন তিব্বতকে কিছুতেই স্বীকার করতে চাইলেন না, পিকিং-এর মতে তিব্বত চীনদেশেরই এক অংশ। তিব্বতের ইতিহাসে মনে হয় এটাই সুবর্ণযুগ। ১৯১১-১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ত্রয়োদশ দালাই লামার অধীনে তিব্বতের শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। পঞ্চম ও ত্রয়োদশ দালাই লামা তিব্বতের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছেন। পোতালায় তাঁদের স্মৃতি-সৌধমন্দির দেখলেই তা স্পষ্ট বুঝা যায়। দালাই লামার এই স্বাধীন তিব্বত মতবাদ সবাই মেনে নিতে পারলেন না, চীনাপন্থী অনেক লামা ও বর্ধিষ্ণু পরিবারের কিছু লোক ১৯২৪ সাল নাগাদ লাসার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করলেন, পাঞ্চেন, লামা তাদের নেতা। চতুর (ত্রয়োদশ) দালাই লামা সেই বিক্ষোভকে বাড়তে না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। পাঞ্চেন লামা তাঁর ভক্তদের নিয়ে পালিয়ে গেলেন চীনে। পাঞ্চেন লামা (নবম) তারপর আর দেশে ফিরে আসেননি। ১৯৩৭ সালে তিনি চীনেই দেহত্যাগ করেন, লোকে বলে যে সেই থেকে পাঞ্চেন লামা চীন ঘেঁষা। নবম পাঞ্চেন লামার মৃত্যুর পর, চীনা কর্তৃপক্ষের সহায়তায় দশম পাঞ্চেন লামাকে নিযুক্ত করা হয়। তিনিই বর্তমান পাঞ্চেন লামা (১৯৫৬)। চীনা কর্তৃপক্ষ এই পাঞ্চেন লামাকে নানা বিষয়ে সক্রিয় সাহায্য করে থাকেন। নবম পাঞ্চেন লামার মৃত্যুর পর, চীনা কর্তৃপক্ষই নবম পাঞ্চেন লামার পুনর্জন্মরূপ দশম পাঞ্চেন্ লামাকে লামা ঐতিহ্য অনুযায়ী সীগাৎসে আনিয়ে তার ধর্মপদে অধিষ্ঠিত করেন। সেই সময় থেকেই পাঞ্চেন লামা ও দালাই লামার মতগত পার্থক্য দেখা দিয়েছে। ত্রয়োদশ দালাই লামার মৃত্যুর পর, চীনা কর্তৃপক্ষই আস্তে আস্তে আবার তিব্বতকে চীনের মধ্যে ফিরিয়ে আনবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন।

চিয়াং-কাই-সেকের জাতীয় সরকার ত্রয়োদশ দালাই লামার মৃত্যুর পর (১৯৩৪) পিকিং থেকে শোকবার্তা নিয়ে এক সরকারী মিশন লাসায় পাঠান। ত্রয়োদশ দালাই লামার মৃত্যুর পর তার পুনর্জন্ম নিতে প্রায় বছর খানেক সময় লাগে। তারপর সেই নতুন দালাই লামাকে দেশের হাজার হাজার শিশুদের মধ্য থেকে খুঁজে বার করতে লাগে আরও বছরখানেক সময়। সবশুদ্ধ মিলিয়ে চতুর্দশ দালাই লামাকে (বর্তমান) সিংহাসনে

বসাতে লাগল ছ'বছর, অর্থাৎ ১৯৪০ সালে চতুর্দশ দালাই লামার রাজ্যাভিষেক হল। তার বয়স ছিল তখন মাত্র পাঁচ বছর। শিশু দালাই লামার হয়ে তার অভিভাবক পরিষদই তিব্বতের শাসনকার্য চালিয়ে থাকে। শিশু দালাই লামা ১৯৪০ সালে নবীশ মাত্র, :শাসন দণ্ড হাতে নিতে তার লাগবে আরও বারো বছর। চীনাদের কাছে এটাই উপযুক্ত সময়। ত্রয়োদশ দালাই লামার বিরাট ব্যক্তিত্ব, অন্যদিকে ভারতবর্ষের ইংরেজশক্তির কাছে সেই সময় হান্‌রা তিব্বতে হস্তক্ষেপ করতে সাহস পায়নি। ১৯৪২ সালের পর থেকে ভারতবর্ষে ইংরেজরা স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণে অত্যধিক ব্যস্ত হয়ে পড়ে, ভারতবর্ষের সমস্যা সামলানো মুশকিল সেক্ষেত্রে তিব্বতের চিন্তা করা কল্পনার বাইরে। ব্রিটিশ রাজ দুর্বল হয়েছে আর অন্যদিকে চীনারা ঐক্য ও জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত হয়েছে। সেই স্রোতের মুখে পড়তে হল তিববতকে। চীনাদের অগ্রসর কেউ থামাতে পারল না।

চীনাদের বিরুদ্ধে তিব্বতকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র ভারতবর্ষ, ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করল। কিন্তু ভারতবর্ষ তখন নবীন। ইংরেজরা ভারতবর্ষের ধন রত্ন নিয়ে গিয়ে খালি বাক্সটা শুধু ফেলে রেখে গেছে, কাজেই এমতাবস্থায় ভারতবর্ষ তিব্বতকে শুধু মৌখিক সহানুভূতি দেখাতে পারে মাত্র, সুসজ্জিত চীনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হবার মতো অবস্থা তার নেই। ১৯৫০ সালে পিকিং থেকে চৌ-এন-লাই তিব্বত-মুক্তি আন্দোলন ঘোষণা করলেন।

এখন ১৯৫৬ সাল, তিব্বতের বহু এলাকাই এখন চীনাদের দখলে। বর্তমান দালাই লামার পিতৃভূমি চাম্‌দো এলাকাটা সম্পূর্ণ চীনাদের দখলে। বিভিন্ন রকমের সাহায্যের নামে চীনা সৈন্যরা তিব্বতের গ্রামে গ্রামে ঢুকে পড়েছে। পি এল এ (Peoples Liberation Army) মুক্তি যোদ্ধাদের নাম করে চীনের লাল জাতীয় পতাকা চারদিকে উড়ছে। স্বীকার করতেই হবে যে চীনাদের দৌলতেই তৈরী হয়েছে তিব্বতের প্রধান চারটি জাতীয় সড়ক। একতা ও বন্ধুত্বের নামে সেই রাস্তা দিয়ে ঢুকছে চীনা সৈন্যবাহিনীর ট্রাক। বিদেশী দূতাবাসগুলো আস্তে আস্তে খালি হয়ে গিয়েছে, ভারতীয় দূতাবাসটি দ্রেপুং গুম্ফার খুবই কাছে তার দরজায় ঝুলছে বিরাট তালা আর বাহারী ফুলের বাগানে চড়ছে ভেড়ার দল। সেদিকে তাকিয়ে বার বারই নিজেকে জিজ্ঞেস করেছি ফিরে আসবে কি তিব্বতের সেই হারানো দিনগুলো!

ধর্মরাজ্য এই তিব্বত, এখানকার বৌদ্ধ তান্ত্রিকরা জগৎ বিখ্যাত, তিব্বতের সাধারণ সরল এই পবিত্র মানুষগুলোর প্রার্থনায় কি ত্রাণকর্তা ভগবান বুদ্ধের ধ্যান ভঙ্গ হবে না! হয়তো এটাই কর্ম, সমষ্টিগত ফলতো ভোগ করতেই হবে। হয়তো এটাই তথাগতের ইচ্ছা!

কৈলাসের পথ-সন্ধানে

দ্রেপুং গুম্ফার বিরাট পাঠাগার ভবন। সেখানে কম করেও ছত্রিশ হাজার বই আছে। তাছাড়া মন্দিরে রয়েছে তাংগীউর ও কাংগীউরের হাজার কপি। ভারতবর্ষের বহু মনীষীর অমূল্য গ্রন্থ ও বেদান্তে ভর্তি। গুম্ফার সুচিত্রিত তাংখাগুলোকে এক সঙ্গে করলে কম করেও চল্লিশটি ঘর বোঝাই হয়ে যাবে। এ ছাড়া রয়েছে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহশালা। আমি ত্রাপা বা লামাদের সাথে ঘুরে ঘুরে সব দেখেছি। অবশ্য সে সব দুর্মূল্য গ্রন্থ পাঠ করা আমার স্বপ্নেরও বাইরে, সেই সব গণিততত্ত্ব আর দর্শনতত্ত্ব চর্চা করতে হলে আমাকে তিব্বতে জন্মগ্রহণ করতে হবে আর শুধু এক জন্মই নয়, জন্মজন্মান্তর ধরে থাকতে হবে তিব্বতে। খুব দুঃখের বিষয় এই যে, এই গ্রন্থ-সমুদ্রের মধ্যে থেকেও লাসা থেকে কৈলাস যাবার উপযুক্ত কোন মানচিত্র সেখানে পেলাম না। আমি কৈলাস যাবো সে কথা সরাসরি তাদের জানানো অসম্ভব। মহাতীর্থ কৈলাসের সম্পর্কে আমি জানতে চাই সেটাই ছিল আমার প্রশ্ন।

তীর্থযাত্রীদের মধ্যে আমিই ছিলাম শেষ যাত্রী। শেষের তিন জনের সাথে আমার যাওয়ার কথা ছিল, আমি তাদের বললাম, আমি পরে আসছি, ভবিষ্যতে যদি আমাকে না দেখেন তার জন্য চিন্তা করবেন না, ভগবানের যা ইচ্ছা সেটাই পূর্ণ হবে, আমার জন্য আপনারা অপেক্ষা করবেন না। তীর্থযাত্রীদের সাথে সেটাই ছিল আমার শেষ সাক্ষাৎ। তারও তিন দিন পর ১৯৫৬ সালের মে মাসের ২য় সপ্তাহ। খুব ভোরবেলায় দ্রেপুং গুম্ফার ছোট দরজা দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। তখন সবেমাত্র ভোরের আলো উঁকি দেবার চেষ্টা করছে। রাস্তার কুকুরগুলো এক তরুণ ত্রাপাকে গুম্ফা থেকে বেরুতে দেখে তারস্বরে চীৎকার করে এগিয়ে এল, তারপর মনে হয় সন্ন্যাসী বসন দেখে লজ্জায় থেমে দাঁড়ালো। ভোরের অস্পষ্ট আলোকে দ্রেপুং গুম্ফাটাকে স্বপ্নে দেখা মায়াপুরীর মতো মনে হতে লাগল। তার প্যাগোডা ধরনের ছাদ আর আবছা সোনালী রঙ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমি ফিরে দাঁড়ালাম, সেদিকে তাকিয়ে শেষ বারের মতো তাকে দেখে নিলাম—শেষ বারের মতো দর্শন করলাম পৃথিবীর বৃহত্তম মঠ ও বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ক্ষেত্রকে। মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানালাম সেখানকার লামাদের। সেই মন্দিরের বুদ্ধ মূর্তিকে কল্পনা করে প্রার্থনা করলাম—

তুমি জ্ঞান ও পবিত্রতার অধীশ্বরস্বরূপ আমাকে পথ দেখাও, আমাকে তোমার পথে চালিত কর, আমি তোমাকে আশ্রয় করি—তোমার আলোকে আমাকে আলোকিত কর।

ড্রেপুং ও লাসা ছাড়লাম, উদ্দেশ্য সাংপো, প্রধান রাস্তা একটাই, রাস্তা চিনতে কোন অসুবিধাই নেই। সপ্তাহখানেক আগে এই রাস্তা দিয়েই আমরা লাসায় প্রবেশ করেছিলাম। আমার সাথে এবার রয়েছে একটা কম্বল। গুম্ফা থেকে দিয়েছে দু'সের আটা, কিছু শুকনো সব্জি আর একটা অ্যালুমিনিয়ামের মগ, জুতো, মোজা, একটা ভারী চাদর। দু'দিন আগে গুম্ফার নাপিত নতুন করে তীর্থযাত্রীদের মাথার চুল ফেলে দিয়েছে। মাথার ঠাণ্ডাটা এখন প্রায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। গুরুজী নাসা পান ভালোভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন, দৈনিক নাসা-পানের ফলে সর্দিকাশিটা মনে হয় শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না।

লাসায় যাবার পথে যে সব জায়গায় রাত কাটিয়েছিলাম সেই গুম্ফাগুলো থেকে কী-চু নদীর ধারের রাস্তা দিয়ে তৃতীয় দিনের দিন আমি সাংপোর ধারে এসে পৌঁছলাম। গুরুজী চার টাকার খুচরো পয়সা আমাকে দিয়ে দিয়েছিলেন, কাজেই নদী পার হবার কোন অসুবিধাই নেই। তৃতীয় দিনের দিন দুপুর বেলায় আমি সাংপো পার হলাম। ইয়াকের চামড়ায় তৈরী নৌকাতে পার হতে লাগলো দুটো ফুটো পয়সা মাত্র। তিব্বতে ভারতীয় এই ফুটো পয়সার খুব কদর, কারণ গরীব লোকেরা সেই পয়সার মালা গেঁথে গলায় অথবা কোমরে বেঁধে রাখে তাতে হারাবার সম্ভাবনা কম। মাসখানেক হল আমি তিব্বতে এসেছি একটা জিনিস আমি বার বার লক্ষ্য করেছি যে, এদের মধ্যে কেউ চুরি করে না, যত গরীবই হোক না কেন পরের দ্রব্য এরা কিছুতেই হরণ করে না।

এখন থেকে আমার নতুন পথ, এখান থেকে একটা রাস্তা গীয়াৎসে হয়ে গ্যাংটকের দিকে চলে গেছে। ঘোড়া বা গাধার পিঠে করে যারা গীয়াৎসে যায়, তাদেরও ওইটাই প্রধান রাস্তা। আমি সেই রাস্তায় না গিয়ে সাংপোর ধার ধরে যে ছোট চলার পথ সরাসরি পশ্চিমের দিকে গেছে সে পথটা ধরলাম। এই রাস্তায় গেলে পথ হারাবার ভয় নেই। সাংপো বা ব্রহ্মপুত্র তিব্বতের বরফ গলা জল নিয়ে আসামের দিকে বয়ে চলেছে—আমি ধরলাম স্রোতের উল্টোদিকের পথ, সেই পথের শেষেই পাওয়া যাবে উৎস।

সাধুবাবাই আমার গুরুজী আমার পথ প্রদর্শক। গয়া থেকে গ্যাংটক, আর গ্যাংটক থেকে লাসায় এসেছি তাঁরই কৃপায়। এখন ধরেছি কৈলাসের পথ। নিজেকে প্রস্তুত করে নিলাম এখন থেকে আমিই আমার একমাত্র সাথী। সব রকম বাধা বিপত্তিকে অতি সাবধানে এড়িয়ে যেতে হবে।

সাধুবাবাকে বার বার মনে পড়ল তাঁর এই বৃদ্ধ বয়সে কি দারুণ উৎসাহ, কি সহজ পদক্ষেপ, শরীরের উপর তাঁর অদ্ভূত সংযম। তিনি বার বার বলেছেন শরীরটা মনের চাকর মাত্র কাজেই মনটাকে ঠিক রাখ। মনের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। পথের ক্লান্তিতে শরীর ভাঙ্গলে মনটাকে ভাঙ্গতে দিও না। তাঁর এই উপদেশগুলোকে শিরোধার্য করে আমি পা বাড়ালাম সামনের দিকে। মনে মনে ভাবলাম আমার ডানদিকের সাংপো আমার সখা, আকাশ আমার দেবতা আর তুষারশুভ্র পর্বত পথপ্রদর্শক।

সাংপার ওঝা

সাংপো পার হয়ে চুসুলকে ফেলে এসেছি দু'দিন আগে, এর মধ্যে মাত্র দু'টি ছোট গ্রাম পেয়েছি। সাংপোর জল দিয়ে তৈরী করেছি রুটি, আর শুকনো ঘাসের আগুন জ্বালিয়ে তা সেঁকে পরমানন্দে খেয়েছি। প্রথম রাত কাটিয়েছি একটা পরিত্যক্ত বাড়ীতে। এরকম করে যদি এগুনো যায় তাহলে আমার অগ্রসর অনিবার্য।

সাংপোর ধারের রাস্তাটা মোটেই সমতল নয়। বড় বড় পাথরের পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলেছে, চলায় মজা আছে একঘেয়েমী মোটেই নেই। দ্বিতীয় দিন বিকেলে হঠাৎ একটা ছোট আস্তানা পেয়ে গেলাম। চলতে চলতে হঠাৎ নজরে পড়ল একটা কুঁড়ে ঘর। নদীর ধারের পাথর কুড়িয়ে, বালি মাটি দিয়ে কোন রকমে তৈরী করা হয়েছে চারটে দেয়াল আর তারই উপরে কয়েকটা গাছের গুঁড়ি ও ঘাস দিয়ে তৈরী করা হয়েছে ছাউনি। আমি ঘরটির চারদিকে ভালোভাবে পরীক্ষা করলাম কিন্তু কারও সাড়া শব্দ না পেয়ে ভাবলাম যে এটা নেহাৎই পরিত্যক্ত কারও আস্তানা হবে। রাতে শীত আছে বটে কিন্তু আগের মতো কন্‌কনে ঠাণ্ডাটা আর নেই। ভাবলাম এখানেই আজকের মতো রাতটা কাটানো যাবে।

ঘরের ভেতর ঢুকে দেখি যে বেশ কয়েকটি পোড়া কাঠের গুঁড়ি রয়েছে, কাজেই আগুন জ্বালাবার কোন অসুবিধা হবে না, শুকনো ঘাসেরও অভাব নেই। আকাশ আস্তে আস্তে রঙিন হতে শুরু করেছে, আমি দিনের আলো থাকতে থাকতে সাংপোর ধারে বসে আমার প্রার্থনা ও ধ্যান সেরে নিলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর আমি সেই কুঁড়ে ঘরটার দিকে এগুচ্ছি হঠাৎ সামনে একটা মনুষ্য মূর্তি দেখে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হলাম। আমার সামনেই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একজন তিব্বতী। মাথা নীচু করে একটু হেসে, তারপর জিভ বার করে তাকে নমস্কার করে এড়িয়ে যেতে চাইলাম, কিন্তু সম্ভব হল না; তিনি আমার পথ রুখে দাঁড়িয়ে কি যেন জিজ্ঞেস করলেন। তিব্বতী ভাষা হলেও তার উচ্চারণের সাথে আমি পরিচিত নই, কাজেই কিছু না বুঝতে পেরে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম।

ভদ্রলোককে ভালোভাবে দেখতে লাগলাম। পরনে লামাদের মত লাল সন্ন্যাসী বস্ত্র। তবে মনে হয় তাকে কোনদিন কাচা হয়নি, রঙটা এখন উঠে গিয়ে কালোয় পরিণত হতে চলেছে তার উপর অজস্র পট্টি দেওয়া। মাথায় বিরাট লম্বা চুলের খোঁপা, দাড়ি গোঁফ প্রায় নেই বললেই চলে, চেহারা দেখেই মনে হয় খাঁটি তিব্বতী সম্ভবত

উত্তরাঞ্চলের, পায়ে পুরু উলের মোজা আর তার উপর বহুদিনের পুরানো মিলিটারী বুট। দেখেই মনে হয় ভিখারী।

আমার হাতে মগটা ছিল, নদীর জল নিয়ে যাচ্ছিলাম রুটি করার জন্য। কোন কথা খুঁজে না পেয়ে তাকে মগের জল দেখিয়ে কোন রকমে বুঝিয়ে বললাম, আমি সাম্পা তৈরী করতে যাচ্ছি ইচ্ছা করলে তিনি আমার সাথে খেতে পারেন। মনে হয় তিনি আমার কথা বুঝলেন—তিনি একটু হেসে আমাকে অনুসরণ করলেন। আস্তানায় ঢুকে দেখি আমার কম্বলের পাশে আর একটি কম্বল পাতা হয়েছে আর তার উপরে রাখা একটি ঝুলি। বুঝলাম এটা ভদ্রলোকেরই ঝুলি। ঘরে ঢুকতেই তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর ঝোলা থেকে একটা দেশলাই বার করে আগুন ধরাতে লাগলেন। আমাদের মধ্যে কোন রকম কথাবার্তা হল না। তিনিই আগুন ধরালেন, তারপর পাশের একটা গর্ত থেকে কয়েকটা অ্যালুমনিয়মের বাটি বার করে দেখালেন। এবার স্পষ্টই বুঝলাম ইনিই ঘরের মালিক। আমি তাকে বিভিন্ন ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলাম আমি একজন পথিক—ছোট লামা—যাবার পথে এখানে একরাত কাটাতে চাই মাত্র। তিনি বুঝলেন কি না জানি না কিন্তু মনে হল আমার কথায় খুশী হলেন। আমার আটার সাথে তিনি কিছুটা বার্লি ও শুকনো মাংসের টুকরো মিশিয়ে দিলেন, তারপর রান্না হলে আমরা দু'জনে পরম তৃপ্তি সহকারে খেলাম। খাওয়ার পর আমি নদীতে গিয়ে আমার মগটা ধুয়ে আনলাম, কিন্তু তাঁর বাটিটা ধুতে দিলেন না, বাটিটার শেষ কণা পর্যন্ত চেটে খেয়ে তারপর রেখে দিলেন ঝোলার মধ্যে।

রাত ঘনিয়ে এল আগুনের ধারে আমরা চুপচাপ বসে বসে এ ওর দিকে তাকাতে লাগলাম। ঘরের কোন দরজা জানলা নেই, ভেতরে থেকে সাংপোর ওপারের ধূ ধূ করা পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম সেই মনোরম দৃশ্য। আমাদের ঠিক নীচেই ব্রহ্মপুত্র তার পূর্ণ সত্তা নিয়ে বয়ে চলেছে। শীতের সময়ে উত্তর প্রদেশের শীতের মতোই এখানকার ঠাণ্ডা। অর্থাৎ তাপমাত্রা সহ্যের সীমা পার হয়নি। কলকাতায় এখন বসন্তের হাওয়া দেখা দিয়েছে, এখানে মনে হয় বসন্ত কথাটার কোনো অর্থ নেই। শীত আর গ্রীষ্ম, শীতের শেষ আর গরমের শেষ এই ভাবেই ঋতুকে বর্ণনা করা হয়। মুখোমুখি এক অজ্ঞাত ব্যক্তি সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে সময় কাটাচ্ছি। প্রথমে ভেবেছিলাম তিনি হয়তো স্থানীয় এক অতি গরীব লোক, তারপর মনে হল এক হতভাগ্য ভিখারী, কিন্তু লোকটার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বুঝলাম যে এর মধ্যে একটা সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে, বয়স প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি হবে। আমরা প্রায় ঘন্টাখানেক চুপচাপ বসে আগুন পোহাচ্ছিলাম এমন সময় বাইরে আর একজনের ছায়া দেখা দিল। লোকটা ভেতরে ঢুকল, লোকটি আমাকে দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে গেলো। আমি তার ভাবটা বুঝতে পেরে, তাকে আমার কাঁচা ও ভাঙ্গা তিব্বতী ভাষায় আমার পরিচয় দিলাম। পূর্ব-পরিচিত ভদ্রলোক এবার তাকে বুঝিয়ে দিলেন আমার বিষয়, আমরা পরিচিত হলাম।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক আগন্তুককে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর কার্যকলাপ দেখে আমি

আশ্চর্য হয়ে গেলাম, তিনি তাঁর ঝুলি থেকে প্রথমেই বার করলেন একটি হাড়। দেখেই বুঝলাম যে এটা মানুষের জানুর হাড়, তারপর বার করলেন একটি মাথার খুলি, এরপর একটি শুকনো ছাগলের চামড়া। এগুলো বার করে পাশে রাখলেন। তারপর তিনি আগন্তুকের সঙ্গে কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলাপ শুরু করলেন। কথাবার্তার ধরন ও সরঞ্জাম দেখে মনে হল ইনি হয় কোন তান্ত্রিক অথবা ওঝা বৈ আর কেউ নন। তাঁরা দু'জনে খুব ভালোভাবে ঝুলির জিনিসপত্রগুলো পরীক্ষা করে তারপর সেগুলো আবার ঝুলিতে রেখে দিলেন। কিছুক্ষণ পর দু'জনেই উঠে পড়লেন। আমাকে ইসারায় বলে দিলেন কোন ভয় নেই আমি সেখানে ইচ্ছে করলে শুয়ে পড়তে পারি। আমাকে বিদায় জানিয়ে তাঁরা চলে গেলেন। আমি সারাদিন হাঁটার ফলে অত্যধিক ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, অন্য কোন বিষয়ে চিন্তা না করে শুয়ে পড়লাম। আমার পাশেই কাঠের আগুন ; উত্তাপে আমার চোখ বুজে এল।

পরের দিন খুব ভোরবেলায় আমার ঘুম ভাঙ্গলো, আমার ঘুমটা খুব ভালোই হয়েছিল। ভোরের শীতে ঘুমটা ভাঙ্গতেই দেখি কম্বলটা কখন গা থেকে পাশে পড়ে গেছে, আগুনও নিভে গেছে, আমি তাড়াতাড়ি উঠে প্রাতঃপ্রণাম ও প্রার্থনা সেরে যাবার জন্য তৈরী হয়ে নিলাম। বাইরে বেরোতেই নজরে পড়ল ওঝার ঝুলি দেয়ালের একটা খুঁটির সাথে ঝুলছে। তাহলে উনি নিশ্চয়ই ফিরে এসেছেন, তাকে বলে যাওয়া দরকার এই ভেবে তাকে খুঁজতে লাগলাম। তাকে খুঁজে পেতে দেরী হল না। একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে তিনি বসে আছেন। কাছে যেতেই দেখলাম তিনি ধ্যানমগ্ন, চোখ বুজে বসে আছেন। তাঁর সামনে একটা চারকোণাচে ঘর কাটা, অনেকটা বাঘবন্দী খেলার মতো। তাঁর শান্ত ও সৌম্য মুখের দিকে তাকিয়ে সত্যি ভক্তি হয়। তাঁর শতচ্ছিন্ন পোশাকের মধ্যে যেন লুকিয়ে আছে পরম বুদ্ধ। চারিদিক নিস্তব্ধ, সামনেই মনোরম দৃশ্য-সূর্যোদয়ের এখনও অনেক দেরী। তাঁর দেখাদেখি আমিও ধ্যানে বসলাম। আমার যখন ধ্যান ভাঙ্গলো তখন দূরে পাহাড়ের উপর সূর্যের আলো দেখা দিয়েছে। আমার পাশেই বসে আছেন ওঝা। তিনি আমার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—ত্রাপা ? আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। তিনি এবার তাঁর বাঁ হাতে ঘণ্টা আর ডান হাতে বজ্র নিয়ে আরতির ভঙ্গিতে তা নাড়িয়ে শব্দ করে তারপর উঠলেন। রাত্রিবেলা আমাদের কোনো কথাবার্তা হয়নি, আমরা কেউই কারুর ঠিক পরিচয় জানি না। কৈলাস আমার লক্ষ্য কাজেই এই ধরনের লোকের কাছ থেকেই আসল পথ নির্দেশ পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। তাই আমি এবার তাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম—

আমি তীর্থযাত্রী গ্যাংটক থেকে আসছি, লাসায় গিয়েছিলাম, এখন যাচ্ছি কৈলাসনাথের দিকে, এই যে নদীটা দেখছেন এরই উৎসে যাবো। আমার অঙ্গভঙ্গি ও বার বার সিকিম দার্জিলিং কথাগুলো মনে হয় কার্যকরী হল। আমি যাবার উদ্‌যোগ করতেই তিনি আমাকে বাধা দিলেন, বললেন থেকে যেতে, অন্ততঃ তাঁর হাব ভাবে

তাই মনে হল। আমার হাতে অফুরন্ত সময় তার উপর এই ওঝা সম্পর্কে জানার বিরাট কৌতূহলটা দমন করতে পারলাম না। আমি তাঁর এক কথাতেই রাজি হয়ে গেলাম।

ভাষা শিক্ষার এই মহা সুযোগ, মনের ভাবকে প্রকাশ করার জন্যই ভাষার সৃষ্টি। তাঁর এখানে থেকে আমি সে কথা বিশেষভাবে অনুভব করলাম। তাঁকে ভদ্রলোক বললে ভুল হবে, সাধুও বলা যায় না, পোশাকে ঠিক তান্ত্রিক নন। তাঁর ব্যবহারে আর সঙ্গের জিনিসপত্র দেখে তাঁকে ওঝা বলেই ধরে নিলাম। আমার ধারণাটা ভুল হলেও হতে পারে। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা খুব কমই হয় কাজেই তাঁকে খুব ভালোভাবে দেখতে লাগলাম।

আমার চোখে প্রথমে ধরা পড়েছে তাঁর ঝুলিটা, মাথার খুলি ও জানুর হাড় দেখে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় বক্রেশ্বরের তান্ত্রিক সাধুদের। সারারাত তিনি কোথায় ছিলেন জানি না। কিন্তু ভোরবেলা তাকে যখন আবিষ্কার করলাম, তখন তিনি গণ্ডির মধ্যে বসেছিলেন। তিনি যখন বসেন, তখন তাঁর চারদিকে মন্ত্র পড়ে দাগ কেটে দেন, সেই সীমার মধ্যে যাতে দুষ্ট আত্মারা প্রবেশ করতে না পারে। যাযাবর যাদুকরদের মতো তিনি মাঝে মাঝে হাতের ঘণ্টা বাজান আর আকাশের দিকে তাকিয়ে কার সাথে যেন কথা বলেন। তাঁর মুখের অত্যধিক দুর্গন্ধ সত্ত্বেও তাঁর এই অদ্ভুত রকমের চরিত্র আমাকে আকৃষ্ট করল। শুনেছি যে তিব্বতে এখনও খাঁটি তান্ত্রিকদের অভাব নেই। মনে হল এই এক সুবর্ণ সুযোগ। এই ধরনের সুযোগ হয়তো জীবনে দু'বার আসবে না।

বেলা একটু বাড়তেই আমি ওঝার সাথে নেমে এলাম সাংপো নদীতে সেখানে দু'জনে কাপড় দিয়ে কিছু মাছ ধরলাম। ওঝা বাবাজী নদী থেকে একটা সরু নালা কেটে সেই জলটাকে একটা বিরাট গর্তের মধ্যে এনে ফেলেছেন। মাঝে মাঝে সেই নালা দিয়ে ভুল করে কিছু মাছ চলে আসে এই গর্তের দিকে তারপর তাকে ধরার কোন অসুবিধা নেই। আমি না থাকলে ওঝা বাবাজীকে সেই গর্তের জল ফেলে শুকিয়ে তারপর মাছ ধরতে হত। মাছ বলতে ছোট ছোট মরুলা মাছের মতো। ওঝা বাবাজী এই শিকারে অত্যন্ত খুশী হয়ে ছোট্ট শিশুর মতোই খিল খিল করে হেসে উঠলেন। মনে হল বহুদিন যাবৎ তিনি এই ধরনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। ইছাপুরের গঙ্গার জলে যে রকম গামছায় মাছ ধরে আনন্দ পেতাম ঠিক সেই রকমই দুই শিশুর মতো আমরা আনন্দে নেচে উঠলাম। প্রায় এক পোয়ার মতো মাছ ধরা হল। তার পর উঠে এলাম আমাদের ডেরায়। তিনি কি ভাবে মাছ রান্না করেন তা জানবার খুব ইচ্ছা ছিল কিন্তু শেষে নিরাশ হতে হল। তিনি মাছগুলোকে কাঁচাই খেতে শুরু করলেন, সকালবেলা খালি পেটে আমার তা সহ্য হবে না, তাই তাঁকেই বললাম সব খেতে। তিনি কোন রকম দ্বিধা না করে সেগুলো একে-একে খেয়ে ফেললেন একটু নুনও মেশালেন না। অভ্যাসে কি না হয়, কথায় বলে শরীর ঠিক থাকলে লোহাও হজম হয়ে যায়। ইতিমধ্যেই আমাদের আন্তরিকতা গড়ে উঠেছে। বাইরের কেউ দেখলে মনে করবে ওর সাথেই আমি বরাবর থাকি।

সূর্য দেখেই ওঝা বাবাজী তার সময় নির্ধারণ করেন। সূর্যদেব একটু প্রখর হতেই

বাবাজী তাঁর ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে আমার হাত ধরে বললেন চল। হঠাৎ তাঁর এই ডাকে যাবো কি না ভাববার সময় পেলাম না। তিনি আমাকে প্রায় জোর করেই তাঁর সঙ্গে উঠিয়ে নিলেন।

আমরা রওনা হলাম দক্ষিণ দিকে, এদিক থেকেই আসলে হিমালয়ের শুরু অর্থাৎ এই পাহাড় ধরে সরাসরি দক্ষিণে গেলেই হিমালয় ডিঙ্গিয়ে পাওয়া যাবে ভারত। মাথার উপর সূর্যের তাপ এ সময় খুবই উপভোগ্য, চলায় এতটুকুও ক্লান্তি নেই। ছোট ছোট গাছগুলোতে এখন সবুজের স্পর্শ লেগেছে, শুকনো ঘাসগুলোর মধ্য থেকে ছোট ছোট নতুন ঘাস দেখা দিয়েছে। চলার মতো কোন পথ নেই শুধু পাথরের এদিক-ওদিক দিয়ে লাফিয়ে ডিঙিয়ে চলা। ওঝা বাবাজীর খালি পা, এ রকম পাহাড়ি রাস্তায় তিনি হেঁটে অভ্যস্ত, তাকে অনুসরণ করছি মাত্র। সাংপোর এদিকের দৃশ্যটা মোটেই সুবিধার নয় পাহাড়ের পাঁচিল মাত্র, উত্তর দিকে বিশাল সমতল ভূমি, দূরে ধূ ধূ করছে পাহাড়। প্রায় দু'তিন ঘণ্টা চলার পর আমরা ছোট একটা পাহাড়ি গ্রাম পেলাম। মাটি ও পাথরের দেয়াল, আর টিনের ছাদ। গ্রামটা পাহাড়ের কোলে যেন ঢাকা ছিল, হঠাৎ নজরে পড়ে ছ'টা বাড়ী। একটা বিরাট মাঠকে কেন্দ্র করে তার চারদিকে এই বাড়ীগুলো গড়ে উঠেছে। দেখেই বোঝা যায় যে এরা গরীব চাষী বা মজুর মাত্র। আশপাশের জমিতে সিঁড়ি কেটে চাষ করা হয়, এখন সবেমাত্র বীজ পড়েছে।

দু'একজন আমাদের গ্রামে ঢুকতে দেখে চারদিকে সেই খবর ছড়িয়ে দিল। আমরা বাড়ীগুলোর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওঝা বাবাজী সেখানে গিয়েই তার ঝুলি থেকে একটা ঠ্যাং-এর হাড় বার করে তা দিয়ে একটা বিরাট গণ্ডী কাটলেন, আমরা তার ভেতরে গিয়ে বসলাম। তিনি এবারে আস্তে আস্তে তাঁর ঝুলি থেকে মাথার খুলি, শুকনো চামড়া, বিভিন্ন ধরনের হাড় বার করে যাদুকরের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে রাখলেন। মনে হল সেগুলোই তাঁর প্রচার ও কাজের সরঞ্জাম। তিনি কি করবেন আমি কিছুই জানি না। তাঁর দাগ দেওয়া গণ্ডীর মধ্যে আমি বন্দী হয়ে বসে রইলাম। আস্তে আস্তে লোকজন জড়ো হতে লাগলো। প্রথমেই এল ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দল, তারপর বুড়ো-বুড়িরা, একদম শেষে যুবক-যুবতী ও ঘরের বৌ-রা। ঘরের বৌ অবশ্য নামেই। তিব্বতে ঘরের বৌ-রাই আসলে মালিক। তাদের মতো এমন কর্মঠ নারী পৃথিবীতে আছে কি না সন্দেহ। ভিড়ের মধ্যে যুবকদের সংখ্যা খুব কম। ভেবেছিলাম যে ওঝা বাবাজী কয়েকটা ভেল্কিবাজি দেখাবেন। কিন্তু না তিনি তার থেকেও বেশী প্রয়োজনীয় ব্যক্তি। ওঝা বাবাজীর কাছে এগিয়ে আসতে লাগল বিভিন্ন ধরনের রুগী। অধিকাংশই ঠাণ্ডা কাশিতে ভুগছে। ওঝা বাবাজী তাদের নাড়ী ও চোখের রঙ দেখে কার কি রোগ হয়েছে বলে দিতে লাগলেন। আর ওষুধ হিসেবে তিনি ঘণ্টা বাজিয়ে বিড় বিড় করে মন্ত্র পাঠ করতে লাগলেন। রুগীর মাথায় হাত দিয়ে তিনি উচ্চস্বরে মন্ত্র পাঠ করেন আর মাঝে মাঝে হাতের ঘণ্টা বাজিয়ে তিনি রুগীর চারদিকে ঘুরতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর তিনি রুগীকে নানা প্রশ্ন করতে থাকেন, তারপর দেখা যায় একসময় রুগীর মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে অনেকটা ঝিমিয়ে পড়ার মতো, তার মানে

বুঝতে হবে যে তার রোগ সেরে গেছে। এই ধরনের ছোট-খাটো সাতটা রুগীকে নিরাময় করার পর এল নতুন ধরনের আর এক রুগী।

চার-পাঁচজন মহিলা প্রায় জোর করে ধরাধরি করে এক যুবতীকে ওঝা বাবাজীর সামনে এনে হাজির করল। যুবতীটি উন্মত্তের মতো চীৎকার করতে লাগল। তার ঠিক কি রোগ বুঝতে পারলাম না। মেয়েটিকে দেখেই ওঝা বাবাজী প্রথমে মাথার খুলিটাকে পশ্চিমমুখী করে রেখে আমাকে ডেকে তার পাশে একটা গণ্ডী কেটে বসিয়ে দিলেন। আমার কানে কানে বলে দিলেন—ওম্ মণি পদ্মে হুম্—ওম্ মণি পদ্মে হুম্। তার কথা শুনে আমিও মনে মনে ওম্ মণি পদ্মে হুম্ মন্ত্রটা আওড়াতে লাগলাম। এবার তিনি উঠোনের মাঝখানে তিনটে প্রায় তিনফুট সমান কাঠি তিন কোণা করে পুঁতে দিলেন। সেই কাঠিগুলোর মাথা একসাথে করে বেঁধে দিলেন। মাথার খুলিটাকে তিনি নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়ে দিলেন সেই কাঠিগুলোর মাথায়। তিনি যুবতীটির হাত ও পা বেঁধে পাশে একটি গণ্ডি কেটে তাতে বসিয়ে দিলেন। মেয়েটি আগের মতোই সমানভাবে পাগলের মতো চীৎকার করে চলেছে। দেখেই বোঝা যায় যে মেয়েটি সম্ভবতঃ পাগল। আমি ও আশপাশের জনতা অবাক হয়ে ওঝা বাবাজীর কেরামতি দেখতে লাগলাম। সবশেষে ওঝা বাবাজী তাঁর ঝুলি থেকে বার করলেন শেষ অস্ত্র, একটি জানুর হাড়। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে এই অস্ত্রটিই তাঁর কাছে সবচেয়ে দামী আর শক্তিশালী। তিনি এবার চীৎকার করে মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করলেন তার বিন্দু বিসর্গ আমি কিছুই বুঝলাম না। আমার কাছে এবার ঘণ্টাটা দিয়ে বাজাতে বললেন। আমিও কথামত ঘণ্টাটা বাজিয়ে চললাম—তিনি এবার নাটকীয় ভঙ্গীতে আরও চীৎকার করে কোন এক অজ্ঞাত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁর সেই নাচটা সত্যি দেখবার মতো। তাঁর ভঙ্গী আর ক্ষিপ্র গতিতে পা বদলানো দেখার মতো। শরীরের জোর যোগ-ব্যায়ামের কৌশল আর তাল এই তিনের এক সুন্দর মিলন দেখতে পেলাম তাঁর এই নাচের ভেতর। নাচের প্রথম দিকটা আহ্বান ও প্রার্থনার ভঙ্গি আর শেষের দিকটায় ভয়ংকর তাণ্ডব মূর্তি। নাচতে নাচতে তিনি ঘেমে নেয়ে উঠলেন। আমরা সেখানে পৌঁছেছিলাম দুপুর নাগাদ আর এখন প্রায় বিকেল গড়িয়ে পড়েছে। ওঝা বাবাজীর নাচের সাথে সাথে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে আমার হাত ব্যথা হয়ে উঠল—কখন যে এই নাচ শেষ হবে কে জানে। ভিড়ের মধ্যে থেকে এক মহিলা একটা বাটিতে করে কিছু পানীয় নিয়ে এসে ওঝা বাবাজীর সামনে রাখলেন। নাচের মধ্যেই তিনি থেমে গিয়ে সেই বাটিটায় চুমুক দিলেন—তারপর বাকিটা আমাকে খেতে বললেন। তার কথামত আমিও তাতে চুমুক দিলাম। মুখে দিয়েই বুঝলাম যে এটি সুস্বাদু বার্লির বিয়ার। তিব্বতে এর আগেও আমি এই জিনিস খেয়েছি। আজকে এই প্রথম আমার পেটে কিছু পড়ল। আলাদা একটা বাটিতে করে এনে মেয়েটাকে কিছু খাওয়ানো হল। দিনের আলো প্রায় নিভে আসতে লাগল। কিন্তু তবুও ওঝা বাবাজীর নাচ থামল না। তার দ্রুত তালটা এখন ঢিমেতালে এসেছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে দুপুর থেকে এই পর্যন্ত দর্শকদের কেউই স্থান ত্যাগ করেনি। সবাই বসে বসে ওঝার কৃতিত্ব দেখতে লাগল।

সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে শীত আরম্ভ হল, দর্শকরা বাড়ী থেকে কম্বল নিয়ে আসতে লাগল আর যারা যাই যাই করেও যাচ্ছে না তারা দুই হাঁটুর মধ্যে আস্তে আস্তে মুখ গুঁজতে লাগল। তখনও ঠিক অন্ধকার হয়নি। আমার হাতের অবস্থা কাহিল, ঘণ্টাটা হাত বদল করতে করতে প্রায় অবশ হওয়ার অবস্থা। এমন সময় সকলকে অবাক করে দিয়ে তিন কাঠির উপর রাখা মড়ার মাথার খুলিটা জোর করে দুলে উঠল। মনে হল কেউ যেন সেটাকে নাড়া দিচ্ছে। সে অবস্থা দেখে হঠাৎ আমার হাতের ঘণ্টা থেমে গেল। ওঝা আমাকে এক ধমক দিয়ে সাবধান করিয়ে দিলেন 'বাজিয়ে যা'। দর্শকদের মধ্যে অনেকেই চীৎকার করে পালাতে শুরু করেছে। মাথার খুলিটা থেকে ওঝার দূরত্ব অনেক, বাতাসের নামমাত্র গন্ধ নেই সেখানে অথচ মাঝে মাঝে থেমে মাথার খুলিটা সমানে দুলে চলেছে। আমি মণি মন্ত্রটা এবারে জোরে জোরে বলতে শুরু করলাম।

চারদিকের অবস্থা দেখে মনে হয় যে, দর্শকরা এই দৃশ্য দেখবার জন্যই দুপুর থেকে বসেছিল। দর্শকরা আগে গোল হয়ে বসেছিল। মাথার খুলিটা নড়ার পর থেকে তারা সবাই একজন আর একজনকে ধরে এক জায়গায় জটলা হয়ে পড়েছে। ভয় ও উৎকণ্ঠা দুইই ফুটে উঠেছে তাদের মুখে-চোখে। একবার খুব দুলে উঠে মাথার খুলিটা এবার মাটিতে পড়ে গেলো, সেই সাথে সাথে রুগ্ন মেয়েটিও একটা ভয়ার্ত চীৎকার দিয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ল। ওঝা এবার মেয়েটির কাছে এসে তার নাকে-কানে ও মুখে ফুঁ দিয়ে আরও কয়েকবার তাঁর মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। তারপর তাঁর পা ও হাতের দড়ি খুলে দিলেন। মেয়েটি এবার মুক্তি পেয়ে উঠে বসল। তারপর মনে হয় তার হুস্ ফিরে এল। সেই অবস্থায় নিজেকে দেখে লজ্জায় হাত দিয়ে মুখ ঢেকে দিল। পাশেই একজন বয়স্কা ভদ্রমহিলা নিজের গায়ের কম্বলটা তার গায়ে চাপিয়ে দিলেন। তারপর একে-একে সবাই বিদায় নিল। ওঝা তার জিনিসপত্র গুটিয়ে নিয়ে আমাকে ইসারায় উঠতে বললেন। ছোট্ট একটা গণ্ডীর মধ্যে প্রায় পাঁচ ছ'ঘণ্টা বসার পর আমি মুক্তি পেলাম। মাথার খুলিটাকে একবার হাতে নিয়ে দেখবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তার আগেই তিনি সেটাকে ঝুলির মধ্যে রেখে দিয়েছেন।

এই ঘটনাটা স্বচক্ষে না দেখলে আমার পক্ষে বিশ্বাস করা অসম্ভব ছিল। মনের মধ্যে অজস্র প্রশ্ন জেগে উঠেছিল, এটা কি পাগলের চিকিৎসা না দুষ্ট আত্মার চিকিৎসা তার কিছুই বুঝতে পারলাম না, তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে ওঝা বাবাজীর অসাধারণ ক্ষমতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। মেয়েটির অভিভাবক মনে হয় খুবই খুশী হয়েছেন, তাঁরা আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন খাবার জন্য। মাটির মেঝের উপর ঠাণ্ডা বোধ করায় তক্তা পাতা, তারই উপর বিচুলি বিছিয়ে গদি তৈরী দেখলেই বোঝা যায় যে সেটা বৈঠকখানা ঘর। ঘরের ভেতর দিয়ে অন্দরমহলে যাবার জন্য আরও একটি দরজা রয়েছে কিন্তু কোন জানালা নেই। ঘরটা প্রায় অন্ধকার, আধঘণ্টা সেই অন্ধকার ঘরে বসে থাকার পর আমাদের পরিচিত সেই মেয়েটি একটি হ্যারিকেন হাতে নিয়ে এসে সলজ্জভাবে জিভ বার করে সম্মান প্রদর্শন করল—আমরা তাকে আশীর্বাদ করলাম। সম্ভবতঃ মেয়েটির মা আমাদের দু'জনকে দুই বাটি করে গরম বার্লির ঝোল

দিয়ে গেলেন। মেয়েটি নিয়ে এল একটা বাটিতে করে শুকনো মাংস। আমরা অতি তৃপ্তিসহকারে তা খেলাম, ওঝার সাথেও কিছুটা বিয়ার খেয়েছিলাম কিন্তু সেটা ছিল খুবই সামান্য।

আমাদের খাওয়ার পর হ্যারিকেন ও বাসনপত্র নিয়ে মহিলারা চলে গেলেন, আমরা আবার অন্ধকারেই রইলাম। সেই অন্ধকারে কি করব বা কতক্ষণ বসে থাকতে হবে তার কিছুই আমার জানা নেই। ওই অন্ধকারের মধ্যে বার বার মনে হতে লাগল সেই দোদুল্যমান মড়ার খুলিটা। খুলিটা আমার পাশেই ওঝার ঝুলিতে রয়েছে, একবার মনে হল এটা যদি প্রাণ পেয়ে এখন আমাদের সামনে এসে দুলতে থাকে তাহলে··· তাহলে কি হবে, সেই কথাটা ভাবতেই শরীর যেন শির শির করে উঠল। হঠাৎ কানে এল এক শব্দ, ভালোভাবে সেই শব্দটাকে কান পেতে শুনতে লাগলাম। শব্দটা মনে হয় ঠিক আমার পাশের থেকেই, একটু মন দিয়ে শুনতেই তা পরিষ্কার হল, আসলে ওটা ওঝা বাবাজীর নাক ডাকার শব্দ। ডান দিকে হাত দিয়ে ওঝা বাবাজীর দেহটাকে অনুভব করলাম। তিনি পাশ থেকে বোঝাই করা বিচুলি গায়ের উপর কম্বলের মতো করে ছড়িয়ে দিয়েছেন। বুঝলাম আমাদের এখানেই রাত কাটাতে হবে। অবশ্য তা ছাড়া উপায় কি ? এই রাতের অন্ধকারে চলার উপায় নেই।

ওঝা বাবাজীর মতো আমিও অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে পেলাম ঘরের কোণে জমানো বিচুলির গাদা—সেখানেই আমি ঢুকে পড়লাম। আমি আগেই জানতাম যে গরীবদের বিচুলিই হচ্ছে লেপতোষক, গদি ও গরম, সস্তায় উত্তম ব্যবস্থা। শরীর যখন সত্যি ক্লান্ত ভূতের ভয়ও তাকে মনে হয় জাগাতে পারে না। কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম তা জানি না। পরের দিন ওঝা বাবাজী আমাকে ডেকে তুললেন। মাথার বিচুলি সরিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি দিনের আলো ফুটে উঠেছে তিনি ঝুলি নিয়ে তৈরী, সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে পড়লাম। বলাই বাহুল্য, রাত্রিবেলা এই তুষারের দেশে বেশ শীত পড়েছিল কিন্তু আমার একদম শীত মনে হয়নি, সকালবেলা চলতে চলতে দাঁত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। আমার কাঁপুনি দেখে বাবাজী একটু হাসলেন তারপর চলতে চলতেই তিনি তাঁর ঝুলির ভেতর থেকে ছোট ছোট কিছু শুকনো পাতা বের করে দিয়ে বললেন চিবুতে থাক, অনেকটা নিসুন্দি পাতার মতো সেই পাতাগুলো চিবোতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই গা গরম হয়ে উঠল। এবার আস্তে আস্তে আমরা পাহাড়ের উপর উঠতে লাগলাম, পাহাড়ের উপর থেকে সাংপো উপত্যকার এক নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখতে পেলাম, সেখানেই আমরা থামলাম। মাঠের চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম যে এটা একটা শ্মশান, তবে পোড়া কাঠের একটু চিহ্নও নেই—চারদিকে ছড়িয়ে আছে মানুষের হাড়, মাথার খুলি, হাত, পা মেরুদণ্ড ইত্যাদি। তিব্বতের এই অঞ্চলে জ্বালানি কাঠের অভাব তাই এখানকার নিয়ম আলাদা। শবদেহকে এই উঁচু জায়গায় এনে ফেলে দেওয়া হয়, শকুনি, শৃগাল ও কুকুররাই তার সৎকার করে। এই অঞ্চলে বিশেষ শ্রেণীর চণ্ডালও আছে, যাদের কাজ শবদেহগুলোকে পাঁঠার মাংসের মতো কুচি কুচি করে কেটে ফেলা। লোকের বিশ্বাস যে শবদেহকে সরাসরি ফেলে রাখলে, তাতে দুষ্ট আত্মা

ভর করতে পারে, কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো বিচ্ছিন্ন করে দিলে তাতে অন্য আত্মার অধিকারের কোন ভয় নেই। ওঝা এখানে এসেছেন হাড়ের সন্ধানে। বিভিন্ন শ্মশানে ঘুরে তিনি কোন কোন সময় কাজের উপযোগী হাড় পেয়ে থাকেন। এ বিষয়ে আমার কোন অভিজ্ঞতাই নেই। তারাপীঠ ও বক্রেশ্বরের কিছু সাধুদের সাথে আমার জানাশুনা ছিল কিন্তু তাঁদের অস্থি সংগ্রহ অনেকটা আস্তানার আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্যই। ওঝা বাবাজী একটার পর একটা হাড় পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। কয়েকটা হাড় দেখিয়ে তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন—এটি বয়স্ক ব্যক্তির চোয়াল, এটা বয়স্ক ব্যক্তির নিতম্ব। এই যে হাড়টার ডানদিকের অংশটা দেখছো এটা কুকুরে খেয়েছে, তার মানে খুব নরম, অল্প বয়স্ক কোন মেয়ে হবে। তন্ত্র সাধনার জন্য কঙ্কালের দুটো অংশ খুব প্রয়োজনীয়, প্রথম হচ্ছে মাথার খুলি, দ্বিতীয়ত জানুর হাড়। জানুর হাড়টি যদি কোনো কুমারীর হয় তাহলে তো কথাই নেই। আর সবচেয়ে ভালো হয় সেটা যদি কোন ভারতীয় ব্রাহ্মণ কুমারের হয়। তার কথা শুনে আমি একটু হেসে বুঝিয়ে দিলাম যে আমি মোটেই ব্রাহ্মণ কুমার নই, আমি একটি অতি সাধারণ ত্রাপা মাত্র। মনে হয় তিনি আমার ভয়টা বুঝতে পারলেন—একটু হেসে আশ্বাস দিয়ে বললেন—ভয় নেই।

সেই শ্মশানভূমিতে অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও কাজের উপযোগী কোন হাড় পাওয়া গেল না। মনে হয় তিনি একটু হতাশই হলেন। আমরা আর একটি পথ ধরে এগিয়ে চললাম। কিছুদূর গিয়ে আর একটি ছোট গ্রাম পেলাম। ওঝাকে দেখেই গ্রামের সবাই ছুটে এল—অনেকটা তামাসা দেখার জন্য। গ্রামের সবাই ওঝাকে চেনে, তার সাথে ত্রাপাকে দেখে অনেকে একটু কি যেন সন্দেহ করছে বলে মনে হয়। তাতে আমার কিছু যায় আসে না। পরন্তু ওঝা বাবাজীর সাথে থেকে আমার লাভই হয়েছে। কারণ এই ধরনের ব্যক্তির সাক্ষাৎ একান্তই দুর্লভ, আর ভাগ্যচক্রে যখন যোগাযোগ হয়ে গেছে তখন এ সুযোগ কিছুতেই ছাড়ছি না। সবচেয়ে আনন্দের এই ওঝা বাবাজীকে দেখা অবধি তাঁর প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়েছি। ঐ নোংরা দেহ, স্যাওলা পড়া দাঁত, জটার মতো চুল, শুকনো নাক, দাগ কাটা কপাল আর দুর্গন্ধ ভরা মুখ সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে লুকিয়ে আছে একটা বিরাট ব্যক্তিত্ব। সে কাপালিকই হোক, ভণ্ড বাজীকর অথবা যোগীপুরুষ যেই হোক না কেন তা জানার দরকার নেই। তাঁর মুখের মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি এক মহান আত্মার ছাপ। সেটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। নিঃসন্দেহে তিনি পরোপকারী।

অন্য গ্রামের মতো এই গ্রামটিও ছোট, তবে এখানে একটা চায়ের দোকান আছে আর রাস্তাটা আরও বড়। চায়ের দোকানে আমরা গিয়ে বসলাম। তাদের মধ্যে খবরাখবর বিনিময় হতে লাগল। গ্রামের পাশেই একপাল ভেড়া শুকনো মাঠের উপর খুঁজে বেড়াচ্ছে উঠতি ঘাসের শিষ।

দু' একজন করে আসতে লাগল রুগী। ওঝা বাবাজী তাদের পরীক্ষা করে উপদেশ দিতে লাগলেন। একটা মাত্র ক্ষেত্রে তিনি মাথার খুলি, মুদ্রা ও ঘণ্টা ব্যবহার করলেন। একটি শিশু মনে হয় জ্বরে ভুগছে। বুঝতে পারলাম যে এই গ্রামে কঠিন রুগী কেউ

নেই। সেখানে আমরা দু'বাটি চ্যাং খেয়ে আবার রাস্তা ধরলাম। চ্যাং এর জন্য কোন পয়সা দিতে হল না, ওঝা বাবাজী মন্ত্র পড়ে আশীর্বাদ করেই দোকানদারকে সন্তুষ্ট করলেন।

সেখান থেকে আমরা এবার সরাসরি নদীর পথ ধরলাম। মনে হচ্ছে আমাদের আস্তানার পথ। বিকেলের দিকে আমরা আস্তানায় এসে পৌঁছলাম। সেখানে পৌঁছেই দেখি একজন গ্রামবাসী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। কারণটা সঙ্গে সঙ্গে জানা গেল। লোকটি তার পীঠের চাদরটা খুলতেই দেখা দিল একটা ঘা। অনেক দিনের পুরোনো মনে হয় সেপ্‌টিক হয়ে গেছে। ওঝা বাবাজী ভালোভাবে সেটা পরীক্ষা করে মনে হয় তাকে আশ্বাস দিলেন। এক্ষেত্রে ঠিক কি করতে হবে তা তিনি জানেন। কয়েকটা শুকনো কাঠি দিয়ে তিনি পোড়া কাঠ-কয়লার কিছুটা জ্বালালেন। সেগুলো যখন বেশ লাল হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই সময় তিনি রুগীকে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে বললেন। কথানুযায়ী লোকটি পীঠের চাদর খুলে শুয়ে পড়ল—ওঝা এবার লাল তপ্ত কাঠ-কয়লার খানিকটা একটা কাঠি দিয়ে তুলে সেই ক্ষতস্থানের উপর রেখে দিলেন। তার ফলটা, ঠিক যে রকম ভেবেছিলাম, আগুনটা পীঠে পড়া মাত্র লোকটি জ্বালায় চীৎকার করে উঠল। তার সেই চীৎকারটা সাংপোর জল ও পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। লোকটি চীৎকার করল বটে কিন্তু এতটুকু নড়াচড়া করল না, কি অদ্ভুত দেহ সংযম। তপ্ত কাঠ-কয়লাটা রেখে ওঝা বাবাজী বারো তেরো বার মণিমন্ত্র জপ করলেন। সেই কাঠকয়লাটাকে ক্ষতস্থান থেকে তুলে ফেলে সেখানে মাটির প্রলেপ দিয়ে দিলেন। মনে হয় তাতে ব্যথার কিছুটা উপশম হল। আধ ঘণ্টা শুয়ে থেকে তারপর সে উঠে পড়ল। খুব সাধারণ দেশী চিকিৎসা কিন্তু দারুন উপযোগী। ক্ষতস্থানের উপর মাটির প্রলেপ নিয়েই সে ফিরে গেল।

সন্ধ্যের সময় আমরা পশ্চিমদিকে মুখ করে কম্বল জড়িয়ে সন্ধ্যা ও ধ্যান করে আগুন ধরালাম। আমি রুটি তৈরী করতে লাগলাম। আর উনি নিজের মনে গুনগুন করে গান করতে লাগলেন ···। পরেরদিন ভোরবেলা আমি ওঝা বাবাজীকে প্রণাম করে বিদায় জানালাম। সেখান থেকে মানস সরোবর কতদূর, কতদিনের পথ, রাস্তার নির্দেশ ইত্যাদি বার বার জিজ্ঞেস করেও তাঁর কাছ থেকে সঠিক কোন উত্তর পেলাম না। মনে হয় তাঁকে আমি ঠিক মতো বোঝাতে পারিনি। তবে স্পষ্ট করে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে এই নদীর পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে, লাসার মতো বিরাট যে শহরটা পাবে সেটাই সীগাৎসে। সাধারণ তিব্বতীদের কাছে সময়ের কোন মূল্য নেই, সাতদিন বা দশদিন তাদের কাছে প্রায় একই। প্রণাম করে উঠতেই ওঝা বাবাজী আমাকে জড়িয়ে ধরলেন—আনন্দে ও গর্বে তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিব্বতীরা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে জিভ বের করেই তাদের প্রণাম বিনিময় করে। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম সাধারণতঃ বড় মন্দির বা সম্ভ্রান্ত লামাদের মধ্যে বিনিময় হয়ে থাকে। কাজেই আমার এই প্রণাম ওঝা বাবাজীর প্রতি অতিরিক্ত সম্মানসূচক হয়ে গেছে। তিনি আমাকে বার বার মাথায় হাত

দিয়ে বিভিন্ন রকমের মন্ত্র পড়ে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। আমি আমার ঝুলি আর কম্বল নিয়ে পথ ধরলাম।

নদীটা এ অঞ্চলে শান্ত ও গভীর, তার পাশ দিয়ে চললেও এতটুকু শব্দ কানে আসে না। বিরাট একটা শক্তি যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। শুকনো পাথরের সাথে আজকে কিছু কিছু ঘাস ও ছোট ছোট গাছের নমুনা পাচ্ছি। অনেকটা পেয়ারা গাছের মতো, কয়েকটা গাছও নজরে পড়ল, তাতে সবে নতুন পাতা দেখা দিয়েছে। নদীর এই তীরে অর্থাৎ দক্ষিণের দৃশ্যটা পাহাড়ের জন্য আটকা পড়ে গেছে—উত্তরদিকের দৃশ্যটা বেশ ভালো। সকালের দিকে ঠাণ্ডা থাকে তারপর সূর্য উঠার সাথে সাথে আবহাওয়া গরম হয়ে উঠে। নদীর ধার ধরে চলেছি—রাস্তা নয়, এমন কি মানুষ চলার মতোও কোন চিহ্ন মাত্র নেই। কাজেই আমার চলার গতি অত্যন্ত মন্থর। কিছুক্ষণ চলি তারপর থামি আবার চলি, মাঝে মাঝে ঝুলি আর কম্বলটাকে কাঁধ বদল করি মাত্র। দুপুরের দিকে চলতে চলতে হঠাৎ কানে এল হাসির শব্দ। কান সজাগ করে রাখলাম—তারপর আবার কানে এল সেই শব্দ। মনে হয় গ্রামীণ মেয়েরা একসাথে খেলা করছে। দু'পা এগুতেই দেখি আমার অনুমানটা সত্য, প্রায় দশ-বারোজন লোক একসাথে নদীতে স্নান করছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন যুবতীও রয়েছে, এই ঠাণ্ডা জলে কোনরকমে কয়েকটা ডুব দেওয়া যেতে পারে কিন্তু সাঁতার কেটে জল ছিটিয়ে খেলা করা মোটেই সম্ভব না। যুবতীদের কোমরে যদিও কাপড়ের পটি কিন্তু বুকটা সম্পূর্ণ খোলা। সাধারণ তিব্বতীদের এর আগেও দেখেছি, অত্যধিক গরমে বা স্নানের সময় যুবতীরা বুক খোলা রাখতে মোটেই দ্বিধা করে না। গ্রামীন তিব্বতীদের এই সহজ ও সরলভাবকে প্রশংসা করতেই হবে। আমাকে তাদের পাশ দিয়ে যেতে দেখে তারা সবাই নমস্কার জানালো। আমিও তাদের যথারীতি হাত তুলে সম্ভাষণ জানিয়ে চলতে লাগলাম। সকাল থেকে ওঝা বাবাজীকে ছাড়ার পর এই প্রথম মানুষের দেখা পেলাম। পথের শ্রান্তি তাতেই বুঝি খানিকটা লাঘব হল।

হঠাৎ পেলাম একটা পায়ে চলা পথ ; অনেকক্ষণ জঙ্গলের মধ্যে চলতে চলতে হঠাৎ যেন পেলাম মাঠ। এই পথটা আমাকে ধরতেই হবে কারণ সামনেই নদীটা বাঁক নিয়েছে, নদী থেকে শুরু হয়েছে বিরাট পাহাড়ের পাঁচিল। ইচ্ছে থাকলেও এগুনোর উপায় নেই। কাজেই সেই পথটা ধরে দক্ষিণ দিকে নামতে লাগলাম। ডানদিকে পাহাড়ের পাঁচিলের জন্য সূর্যালোকও এখানে আসতে পারে না। রাস্তা মানে পাহাড়ের উপর দিয়ে চলতে চলতে পায়ের চাপে যে পথ হয়েছে। পাহাড়ের পাঁচিলটা পেরুতেই নজরে পড়ল কয়েকটি বাড়ী। চাষের উপযোগী কিছুটা জমি, দুটো গাধা, কয়েকটা মুরগী আমাকে দেখেই যেন অবাক হয়ে গেল। ভাবটা "তুমি কোথাকার লোক হে" এই ধরনের।

আমি নদীটাকে নিশানা রেখে এগিয়ে চলেছি। পাহাড়টা ডিঙ্গিয়ে আবার ডানদিকে এসে নদীর ধার ধরতে হবে। সাংপোই আমার একমাত্র পথ নির্দেশ। চলতে চলতে হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে দেখি এরই মধ্যে কয়েকটি শিশু আমার পিছন পিছন নিঃশব্দে

এগিয়ে এসেছে। তাদের দিকে তাকাতেই তারা থমকে দাঁড়ালো। আমিও দাঁড়ালাম। একটু বিশ্রাম নিতে হবে। রাস্তার উপরই কম্বল ও ঝুলিটাকে রেখে বসে পড়লাম। দেখতে দেখতে আমার চারদিকে ভিড় জমতে শুরু হয়েছে। আমার পেছনের শিশুদের উপেক্ষা করে আমি কিছু শুকনো ঘাস পাতা কুড়িয়ে একটু আগুন ধরাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। এক ভদ্রলোক এমন সময় আমার দিকে এগিয়ে এলেন—তিনি আমাকে ওখানে আগুন ধরাতে নিষেধ করলেন—তারপর হাসিমুখে তাঁর সাথে যাবার জন্য বললেন। আমি বিনা দ্বিধায় তাঁকে অনুসরণ করলাম। বাড়ীর উঠোনে আসতেই আরও দু'একজন আমার চারিদিকে এসে হাজির হল। তিনি চলে গেলেন বাড়ীর ভিতরে। কিছুক্ষণ পর ভদ্রলোক ফিরে এলেন তাঁর হাতে কয়েকটা ছাতুর বড় বড় লাড্ডু, হাসিমুখে তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি পরমানন্দে সেই লাড্ডু খেতে লাগলাম। সকলে আনন্দ সহকারে আমার খাওয়া দেখতে লাগলো। লাড্ডুটা যবের আর তার সাথে মনে হয় সামান্য গুড় মেশানো। আমার খাওয়ার শেষে ভদ্রলোক আরও পাঁচটি লাড্ডু আমার হাতে গুঁজে দিলেন। আমি দু'তিনবার না না করেও শেষে নিতে বাধ্য হলাম। রাস্তার জন্য আরও একদিনের খোরাক মজুত হয়ে গেল।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে এবারে তাঁদের উদ্দেশ্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালাম, তারপর আবার পথ ধরলাম। তিব্বতে চলার একটা সুবিধা হচ্ছে এখানে মূল পথ ধরবার জন্য কোন অসুবিধা নেই। গ্রাম থেকে বেরোবার জন্য সাধারণতঃ একটা মাত্রই পথ, আর তিন বা চৌরাস্তার কোন সমস্যাই নেই, সেগুলো একমাত্র বড় বড় শহরের সমস্যা। পাহাড়টাকে ডানদিকে রেখে আমি প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি আবার পেলাম সাংপোর উপত্যকা।

ভয়ংকর রাত

নদীর কাছাকাছি আসতে আরও ঘণ্টাখানেক লাগল। নদীর ঠিক ধারে যখন এসে পৌঁছলাম তখন দিনের আলো নিভে গিয়ে রাতের তারা দেখা দিয়েছে। এখন অবশ্য আর আগের মতো পাহাড়ি পথ নয়, পথ অনেকটা সমতল কিন্তু প্রতি পদক্ষেপেই অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে চলতে হচ্ছে, একমাত্র আকাশের তারা ছাড়া কোন আলোই চোখে পড়ছে না। পৃথিবী থেকে গ্রামগুলো যেন সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে যে কোন মানুষের দেখা পেলেই তার পিছনে পথ ধরতাম। দুপুরের সেই গ্রামটার পর আর কোন মানুষই চোখে পড়েনি।

শুধু যে নিঃসঙ্গতা তাইই নয় নতুন সমস্যা দেখা দিল শীত। মাথা ঢাকা, ভালভাবে কম্বলটা দিয়ে দেহটাকে জড়িয়েও মনে হচ্ছে তার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া মুশকিল। একনাগাড়ে চলতে চলতে আমি এখন খুবই ক্লান্ত, গ্রামের সেই ভদ্রলোকের দেওয়া লাড্ডু আমি ইতিমধ্যে খেয়েছি। কিছুক্ষণ পর এমন অবস্থায় এসে পৌঁছলাম যে, আমার আর চলবার মতো এতটুকু শক্তিও যেন নেই। বাইরের শীত আর মনের ক্লান্তি দুইয়ের চাপ সহ্য করতে না পেরে আমি বসে পড়তে বাধ্য হলাম। কম্বলটাকে আরও ভালভাবে জড়িয়ে নিজেকে এবার বস্তা বন্দী করে কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম; স্বপ্ন দেখলাম—আমি এক অজ্ঞাত রাজ্যে এসে পড়েছি। সে রাজ্যে রাজা নেই, প্রজা নেই, কোন শব্দ নেই, মাঝে মাঝে শুধু আকাশ থেকে ফুলঝুরির মতো ঝরে পড়ছে তুষার ঠাণ্ডা, ভীষণ ঠাণ্ডা সেই ঠাণ্ডায় কেউ টিঁকে থাকতে পারে না। সেখানে তান্ত্রিকেরা মড়ার খুলির জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমি সেই রাজ্যে এসে হারিয়ে গিয়েছি। শীতে আমার সর্বশরীর কাঁপছে, শরীরের হাড়গুলো একের সঙ্গে আর এক ঠোকাঠুকি করছে, পাশের শুকনো ঘাসের লেপ জড়িয়েও যেন সুবিধা হচ্ছে না। আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে এক কাপালিক, শকুনির মতো সে অপেক্ষা করছে—আমার মৃত্যুর জন্য। আমার মাথার খুলিটা তার চাই, তার গলায় নরমুণ্ডের মালা, হাতে ত্রিশুল, মাথায় বিরাট চুলের জটা, তার দিকে তাকিয়ে আমি আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলাম.....ঘুম ভাঙলো, বুকের হৃৎপিণ্ডটা জোরে জোরে শব্দ করে রক্তের গতি সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কামাখ্যায় দেখা বলির পাঁঠার মতো আমার সর্বশরীর ভয়ে ও শীতে কাঁপছে।

কেন এরকম স্বপ্ন দেখলাম! ভয় আমার নেই এমন কথা বলতে পারবো না তবে ভয়টাকে মোটেই পাত্তা দিইনি। মৃত্যুর গ্যারান্টি নিয়েই যখন জন্ম তখন মৃত্যুকে আমি

ভয় করি না। কাপালিকের সাথে এই আমার প্রথম রাত কাটানো নয়, কাপালিক কেষ্ট সাধুর সাথে মৃত্যুর মুখোমুখি আমি অনেকদিনই হয়েছি কিন্তু কোনদিনই আমি ভয়ে তার সঙ্গ ছাড়িনি। কিন্তু আজকের এই স্বপ্ন হঠাৎ যেন আমাকে দুর্বল করে দিচ্ছে। নিজেকে সংযত করে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলাম কিন্তু অসম্ভব। রাতের বেলা বাইরে এত শীত করবে আমার জানা ছিল না, ভেবেছিলাম তিব্বতে এখন বরফ গলতে শুরু করেছে, কাজেই এখন গরম কাল। আমার অনুমান সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমার জামা-কাপড় ও কম্বলের ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা আমাকে আক্রমণ করতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ গড়াগড়ি দিয়েও শেষে উঠতে বাধ্য হলাম। শরীরের অবস্থা খুবই কাহিল,মনে হয় সম্পূর্ণ উত্তাপ আমি হারিয়ে ফেলেছি। মনে পড়ল কপাল-ভাতির কথা, এই প্রাণায়ামটি করলে নাকি ইড়া ও পিঙ্গলার উত্তাপ ফিরিয়ে আনা যায়। কাজেই শুরু করলাম প্রাণায়াম। বেশ কিছুক্ষণ প্রাণায়াম করার পর দেহের উত্তাপ স্বাভাবিক হয়ে এল—তারপর সেই অবস্থাতেই শুরু করলাম শুদ্ধ জপ, সোঅহম্ সোঅহম্ সোঅহম্ ···, জপ করতে করতে আমি ফিরে পেলাম শূন্যাবস্থা। মন্ত্র নিরুদ্দেশ হয়ে মন খুঁজে পেল তার স্তব্ধতা। এই অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম জানি না। মনের মধ্যে উদয় হল শান্ত ধ্যানী বুদ্ধের রূপ—তারই পাশে দেখলাম সেই স্বপ্নে দেখা কাপালিককে। তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন। এবার আবিষ্কার করলাম কাপালিকের বেশে তিনি আমার সাধুবাবা লম্বা দোহারা চেহারা। তাঁকে চিনতে পেরেই আমি স্থান-কাল ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম সাধুবাবা! ব্যস্ সঙ্গে সঙ্গে আবার জেগে উঠলাম। মন্ত্রের পরিবর্তে চিন্তাস্রোতের এক জাগ্রত রূপ আমার মনে বাসা বেঁধে উঠেছিল। আমি এবারে ভালোভাবে জেগে উঠলাম। এই চিন্তাস্রোতকে কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারছি না। কি করবো ঠিক করতে না পেরে ঝুলি নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম—চলাই ভালো।

আকাশের তারা থেকে যে সামান্য আলো এসে পৃথিবীর এই অঞ্চলে পড়েছে তাতেই এখন পথটা দেখা যাচ্ছে। নদীর সাথে সমান্তরাল রেখে আকাশের একটি তারা বেছে নিলাম ও হাঁটতে শুরু করলাম। শীতটা আস্তে আস্তে আবার বাড়তে আরম্ভ করেছে। চলার ছন্দটা কিছুতেই যেন ফিরিয়ে আনতে পারছি না। মণি মন্ত্রটাকে এবারে গুনগুন করে গাইতে লাগলাম। ওম্ মণি পদ্মে হুম্, আর তারই সাথে মেলাতে লাগলাম আমার চলার গতি—নিশ্বাস আর প্রশ্বাস। রাত এখন কটা হবে কে জানে, দূরে পাহাড়ের উপর হঠাৎ নজরে পড়ল এক ফালি চাঁদ। কোনরকমে সে নিজেকে প্রকাশ করেছে মাত্র। আমার চারদিকের সেই মহা নিস্তব্ধতার মধ্যে মনে হচ্ছে আমিই একমাত্র প্রাণী। আমার কাছে মনে হচ্ছে হঠাৎ আমি যেন পড়ছি এক অনন্ত রাত্রির মধ্যে। পৃথিবীর পথে চলছিলাম সেই পথের একঘেয়েমীপনাকে সইতে না পেরে আমি ধরেছিলাম অন্য পথ। সেই পথের মধ্যে ছিল এই অজানা অনন্ত রাত্রির ফাঁদ, আমি সেই ফাঁদেই পড়েছি জানি না এ রাত্রির শেষ আছে কি না। রাত্রি যে এত দীর্ঘ হয় তা এই প্রথম জানলাম। মনকে যতই সজাগ করি না কেন তা যেন কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না।

হঠাৎ সামনের একটা দৃশ্য দেখে আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল প্রত্যেকটা রোমকূপ যেন দাঁড়িয়ে উঠল—আমার ঠিক সামনে দিয়ে কে যেন হেঁটে চলেছে, আকাশ থেকে ছিটকে পড়া আলোকে চেষ্টা করলাম তাকে দেখতে, মনে হল ঠিক যেন কাপালিক। মনকে আরও সজাগ করলাম চলতে চলতে নিশ্চয়ই কেউ স্বপ্ন দেখে না। আমি নিজেকে বিশ্লেষণ করতে লাগলাম আমার এই অবস্থাকে আর যাইই বলি না কেন, কিছুতেই বলবো না যে আমি জেগে-জেগেই স্বপ্ন দেখছি। মনে হল এই অনন্ত রাত্রি থেকে মুক্তি পেতে হলে এই মুহূর্তে এই মানুষটিকে আমার একান্তই দরকার। সব দ্বিধা দূর করে মনের শক্তি ফিরিয়ে এনে তাকে ডাকলাম—কিন্তু আমার সেই ডাক কিছুতেই গলার স্বর হয়ে প্রকাশিত হল না। তা হোক তবুও তাকে অনুসরণ করা ছাড়া উপায় নেই—এই বিরাট অন্ধকারের তিনিই একমাত্র আলোক। অনেকক্ষণ চলার পর থামতে বাধ্য হলাম, আমি এবার সেই অজানা রহস্যময় মানুষটির ঠিক ডান দিকে এসে দাঁড়িয়েছি।

সরাসরি তার মুখের দিকে তাকালাম। সেই রাতের অস্পষ্ট আলোকে কিছুতেই তার মুখটা দেখতে পেলাম না। তিব্বতে প্রবেশের পর থেকে এই পর্যন্ত শুধু বিভিন্ন ধরনের লামাই দেখে এসেছি। ভারতীয় মতে যাদের যোগী বা তান্ত্রিক বলে সে রকম কাউকে দেখিনি। সেই অন্ধকারের অস্পষ্ট আলোয় তার দিকে তাকালাম কিন্তু কিছুতেই তাকে চিনতে পারলাম না তার সাথে বলবার মতো কোন ভাষাও পেলাম না, আরও অবাক হলাম তিনি সম্পূর্ণ উলঙ্গ। পরনে কাপড়ের চিহ্নমাত্র নেই। মাথার চুল জটাকারে পেছনে নেমে পড়েছে, তার হাতে কিছু নেই। সম্পূর্ণ এক উলঙ্গ সন্ন্যাসী। আমি সামনের দিকে তাকালাম পথের এখানেই শেষ। আমাদের বাঁদিক থেকে ছোট নদী সাংপোতে মিশে গিয়ে এক সঙ্গমের সৃষ্টি করেছে। সন্ন্যাসী সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারপর নদীর উৎসের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। নদীটা একসময় একটু সরু হয়ে এল। মাঝখানে অসংখ্য বড় বড় পাথরে ধাক্কা খেয়ে সে এখানে প্রায় ঝরনার আকার ধারণ করেছে। আমরা সেখানে নদীর ভিতরের বড় বড় পাথরের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে কোনরকমে জল বাঁচিয়ে পার হলাম। নদীটা পার হতে সন্ন্যাসী আমার জন্য অপেক্ষা না করেই দক্ষিণদিকে রওনা হয়ে গেলেন। তাঁকে অনুসরণ করতে গিয়েও পারলাম না।

পায়ের থেকে হঠাৎ যেন আবার ঠাণ্ডাটা শির শির করে উপর দিকে উঠতে শুরু করেছে। নদীর ধারেই বসতে বাধ্য হলাম। প্রায় অচল হওয়া পা থেকে জুতোটা খুলতে গিয়ে দেখি সেটা সম্পূর্ণ জলে ভিজে গিয়েছে। নদী পার হবার সময় কখন যে জুতো দুটোয় জল ঢুকে গেছে তার টেরও পাইনি। কোন রকমে জুতো খুলে চাদরে পা দুটো মুছে নিয়ে মালিশ করতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই পা দুটো গরম হয়ে উঠল। কিন্তু আবার জুতো পরার প্রশ্নই উঠে না, অথচ খালি পায়েও এই শীতে চলা মুশকিল। সন্ন্যাসী এখন সম্পূর্ণ উধাও হয়েছেন। তাঁর পরিচয়, রূপ আর আমাকে যেভাবে তিনি এতখানি পথ নিয়ে এসে নদী পার করিয়ে দিয়েছেন সেটা আমার কাছে রহস্যই থেকে

গেল। ভেজা জুতো নিয়ে আমি পড়লাম এক নতুন সমস্যায়। সেখানে এইভাবে বসে থাকলে শীতে মারা যাবো আর চলতে গেলেও খালি পায়ে ঠাণ্ডা লেগে সেই একই অবস্থা হবে। কি করবো ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না।

এমন সময় আমার সব সমস্যার সমাধান করে দিয়ে তারস্বরে ডেকে উঠল একটা মুরগী। কু-কু-রু-কু ..... । তাল ও ছন্দের এক অপূর্ব মিশ্রণ আমার কানে এসে বাজলো। সেই শব্দ নিয়ে এল আশা আর আনন্দের সংবাদ—আমার অনন্ত রাত্রির সেখানেই শেষ। শুধু একটা মুরগীর ডাক আমার কাছে নিয়ে এল নবজীবনের স্রোত। ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম, দূরের তারাগুলো একটু নিষ্প্রভ হতে শুরু করেছে, ভোরের সূচনা।

আমি আশার আলো দেখলাম, জুতো দুটোকে হাতে করে যে দিক থেকে মুরগীর ডাক এসেছিল সেইদিকেই হাঁটতে শুরু করলাম। সেদিকে নিশ্চয়ই কোন গ্রাম পাওয়া যাবে। কিছুদূর আসতেই নজরে পড়ল হাল চষা জমি, আমাকে আর কষ্ট করে গ্রাম খুঁজতে হল না মনে হল গ্রামই আমার দিকে ছুটে এল। নতুন-দার মতো আমি জুতো হাতে নিয়ে কুকুর বেষ্টিত হয়ে পড়লাম। মহা বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলাম। এক ভদ্রলোক হ্যারিকেন হাতে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। তিনিই আমার রক্ষাকর্তা, তিনি কাছে আসতেই আমি তাকে কোন প্রকারে বললাম—একটু আগুন। একটা ত্রাপার এই দুরবস্থা দেখে তিনি আমাকে সরাসরি তাঁর বাড়ীতে নিয়ে এলেন। ভদ্রলোককে বিশেষ কিছু বুঝিয়ে বলতে হল না, তিনি আমার অবস্থা দেখেই সব অনুমান করে নিলেন। তিনি আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে সরাসরি একটা বিছানা দেখিয়ে দিয়ে বললেন শুয়ে পড়। আমার এই অবস্থায় চেয়ে এর মধুর কথা আর হতে পারে না। বিছানায় আরও কয়েকজন শুয়ে ছিল আমি বিনা দ্বিধায় তাদের সাথে যোগ দিলাম। আহ! কি আনন্দ! মনে হয় এই অবস্থাকেই বলে চরম আনন্দ, লেপটাকে তুলে দিলাম মাথার উপর।

অচেনা আপনজন

আমার ঘুম ভাঙ্গলো। বিছানায় সূর্যের আলো এসে পড়েছে। একটা হাই তুলে বিছানার উপর উঠে বসলাম, উঠে বসতেই রাতের সমস্ত ঘটনাটা মনে পড়ল। আমি চারপাশে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম আমি কি স্বপ্ন দেখলাম, সমস্ত ঘটনাটাকে আমি ভালোভাবে সাজাতে চেষ্টা করলাম ভুলে যাবার আগেই সেটাকে লিখে রাখা দরকার। ঝুলি থেকে খাতা পেন্সিল বার করে তাই এখন লিখতে শুরু করেছি। সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে ভোর বেলার ঘটনাটা, রাতের গভীর অন্ধকারে পথ হারিয়ে শীতে প্রায় মরতে বসেছিলাম এমন সময় এল সেই রহস্যময় নাংগা সন্ন্যাসী তিনিই আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়েছেন। কি ভাগ্য। একমাত্র গুরুকৃপা ছাড়া এ ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করা অসম্ভব। আমার নিজের কাছেই এই ঘটনাকে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। রাতের অন্ধকারে জনমানব শূন্য পৃথিবীর এক অজ্ঞাত দেশে কেউ জানে না আমার ঠিকানা সেখানে হঠাৎ উদয় হলেন এক রহস্যময় সন্ন্যাসী। মনের মধ্যে এখন একমাত্র প্রশ্ন জাগছে, কে এই সন্ন্যাসী? কে এই সিদ্ধ পুরুষ? তিব্বতের এই শীতের রাতে পথ হারাদের পথ দেখাবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন কে এই নাংগা ভৈরব? জানি না কেউ আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন কি না। তাঁর উদ্দেশ্যে বার বার আমি আমার আন্তরিক ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা সমর্পণ করতে লাগলাম। বিচুলির গদি করা বিছানায় আরও কিছুক্ষণ বসে থাকার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সম্ভব হল না। দুটো কুকুরের বাচ্চা খেলা করতে করতে প্রায় আমার কোলের উপর এসে পড়ল। আর তাদের ঠিক সাথে সাথে ছুটে এল একদল ছেলেমেয়ে, আমাকে দেখেই তারা থেমে পড়ল। আমি হেসে তাদের স্নেহ জানালাম, তারপর তাদের সাথে উঠে এলাম বাইরে।

উঠোনে আসতেই সূর্যালোকে আমার দেহটা যেন স্নান করে উঠল। আমি চাঙ্গা হয়ে উঠলাম, উঠোনের মধ্যে একটা চটের উপর আরও কয়েকটি শিশু বসে আছে। কিছু যব সূর্যের আলোতে শুকোচ্ছে আর দূরে এক বৃদ্ধা মহিলা তুলো থেকে লাটিমে করে সূতো তৈরী করছেন কয়েকটা কুকুর নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে, কুকুরছানাগুলো চারদিকে ছোটাছুটি করছে। উঠোনের চারকোণে চারটে বাড়ী, মাটির গাঁথুনীতে পাথরের চাঁই বসিয়ে তৈরী করা হয়েছে শক্ত দেয়াল। জানালা দরজাগুলো কাঠের আর ঘরের চালগুলো টিনের। তিব্বতের একটা মধ্যবিত্ত গ্রাম। আমি চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম তাদের বৈশিষ্ট্য। আমার চারপাশের শিশুরা এখন অনেকটা সহজ হয়ে তাদের মধ্যে খেলাধূলা আরম্ভ করে দিয়েছে। এমন সময় আমার সামনে হাজির হলেন একজন

লোক—তাঁকে দেখেই বুঝলাম যে তিনিই আমার রক্ষাকর্তা। ভোরবেলা তিনিই আমাকে সস্নেহে এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছেন। সাধারণ পরিস্থিতি হলে আমি তার পায়ে পড়ে গড় হয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রণাম করতাম কিন্তু এই অবস্থায় সেটা অসম্ভব। আমি লামা, কাজেই তাঁকে প্রণাম করলে তিনি নিজেকে খুবই অপরাধী ভাববেন, তাই সবদিক বিচার করে আমি আমার মালাটা বের করে তার উদ্দেশ্যে ইষ্টমন্ত্র জপ করে আশীর্বাদ জানালাম। তিনি কৃতার্থ হয়ে মাথা নীচু করলেন, তারপর আমাকে তিনি অনুসরণ করতে বললেন। তাঁর পেছন পেছন আমি ও ছেলেমেয়েরা সবাই চলতে লাগলাম, এমন কি কুকুরগুলো পর্যন্ত।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা হাজির হলাম একটা চৈত্যের সামনে, ইতিমধ্যে গ্রামের অন্যান্য লোকজনেরাও এখানে এসে জড়ো হয়েছেন। অবস্থাটা দেখেই বুঝলাম যে, আমাকে সেখানে পূজো করতে হবে। গ্রামে নিশ্চয়ই কোনো গুম্ফা ও অন্য কোনো লামা নেই। আমি যখন এসেই পড়েছি কাজেই সে সুযোগটা ছাড়া চলবে না। অবশ্য আমার সম্পর্কে তাদের কি ধারণা সেটা সম্পূর্ণ আমার অজ্ঞাত। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামশুদ্ধ সবাই এসে সেখানে জড়ো হল। ভদ্রলোক ও আমি চৈত্যের চারপাশের প্রার্থনা চক্র ঘুরিয়ে প্রার্থনা করে দাঁড়ালাম। চৈত্যটি ছোট, প্রায় দু'মানুষ সমান উঁচু আর চারদিকে আটকানো ষোলটি চক্র। আট দশজন হাত ধরে গোল করে অনায়াসে সেটাকে ঘিরে ফেলা যায়। তার সামনে বিরাট একটা খাদের ওপর অসংখ্য প্রার্থনা পতাকা উড়ছে।

সবাই চারিদিকে ঘিরে বসল। চৈত্যটি ছোট বটে কিন্তু পঞ্চতত্ত্বের ও মণ্ডলার পূর্ণ রূপ প্রকাশ পেয়েছে। চৈত্যের পাশে একটি আসন পাতা হয়েছে, আসনের সামনে একটা বাটিতে কিছু চাল, ছোট্ট একটি বজ্র আর ঘণ্টা। চারপাশের অবস্থা দেখেই বুঝতে পারলাম যে আমাকে পূজো করতে হবে। গ্রামবাসীরা সবাই তাঁরই অপেক্ষায় আছেন। আমি একে একে সবাইকে গুনতে লাগলাম সবশুদ্ধ একচল্লিশ জন।

ভদ্রলোক এবার আমাকে অতি বিনীত হয়ে পূজো আরম্ভ করতে বললেন। মনের মধ্যে দ্বিধা দেখা দিল; কার পূজো করবো কি ভাবে কি করবো মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানা নেই। মনের সংশয়টাকে প্রকাশ না করে আমি এগিয়ে গিয়ে বসলাম আসনের উপর। এর আগে এই ধরনের পরিস্থিতিতে পড়িনি। কি করবো ঠিক করবার জন্য আমি চোখ বুজে নিজেকে সংযত করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর ভাবলাম যে পূজো মানেই তো সেই মহান আত্মার সাথে আমাদের এই ক্ষুদ্র আত্মার যোগসাধন। সেই অজানা আনন্দলোকের দেবতাদের এই মর্ত্যে আনার পদ্ধতি, দেবতাদের তুষ্ট করে প্রার্থনা করা হয় মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য। ভগবান অন্তর্যামী তিনি জানেন যে আমি পূজো-আর্চা কিছুই জানি না তা সত্ত্বেও আমাকে তিনি এই পরিস্থিতিতে ফেলেছেন। মনে মনে স্মরণ করলাম সেই রাতের দেখা সন্ন্যাসীর মূর্তিকে। হঠাৎ যেন আলো দেখতে পেলাম, তার পূর্ণাবয়ব মনের মধ্যে ভেসে উঠল, তিনিই তো আমার উদ্ধারকর্তা। তিনিইতো আসলে এই অঞ্চলের গুরু—সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ। তার কথা চিন্তা করতেই আমার মন

আনন্দে ভরে উঠল। সেই পরমপুরুষের উদ্দেশ্যেই আমার অন্তর থেকে উচ্চারিত হল প্রার্থনা। সেই প্রার্থনার ভাষা আমার মাতৃভাষা, আমি আন্তরিক ভক্তি দিয়ে তাঁকে জানালাম আমার অর্ঘ্য—

তুমি যেখানেই থাক তোমার দর্শন আমি পেয়েছি, তুমি আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছো, আমাকে রক্ষা করেছো। তুমি যেই হও না কেন ; রহস্যঘন রাতের অন্ধকারে সেই দর্শনের সত্য-মিথ্যা যাচাই করে তোমার অস্তিত্বকে আমি হারাইতে চাই না। আমি জাগ্রত অবস্থায়ই তোমার যে রূপ দেখেছি তাতেই আমি ধন্য, আমার তিব্বতে আসা পূর্ণ হয়েছে যা পেয়েছি তাতেই আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়েছে। তোমাকে আমার অন্তরের সম্পূর্ণ ভক্তি উজাড় করে দিয়ে আমি আত্মসমর্পণ করছি ...

প্রার্থনার শেষে আমি কয়েকটি মুদ্রা করলাম তারপর বজ্র ও ঘণ্টার ধ্বনি দিয়ে আরতি করে তাকে চাল সমর্পণ করলাম—অক্ষতং সমর্পয়ামী শ্রীগুরু চরণ কমলেভ্যঃ নমঃ।

প্রণাম করে বললাম—

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব,
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বম্ মম দেব দেব ॥

উপস্থিত গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্য করে বললাম—

ওম্ ত্রয়ম্বকম্ ইজামহে সুগন্ধিং পুষ্টি বর্ধনং
উর্ভরুকমিভ বন্ধনন্ মৃত্যুঃ মুক্ষি মামৃতৎ।
ওম্ সহন ভবতু সহনৌ ভূনক্ত সহ বির্যম করবাবহৈ
ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

পূজোর শেষে কিছুক্ষণ নীরব থেকে তারপর আমি উঠলাম। এবার শুরু হল গ্রামবাসীদের তরফ থেকে ভক্তি অর্ঘ্য দেবার পালা। গ্রামের একজন ভদ্রমহিলা আমাকে সাদা গামছা নিবেদন করে গ্রামের সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করলেন। আনন্দে আর কৃতজ্ঞতায় আমার চোখে প্রায় আনন্দাশ্রু এসে গেল। চোখ বুজে ঠাকুরকে স্মরণ করে মনের ভাবাবেগকে সম্বরন করতে হল। গ্রামবাসীদের সাথে চৈত্য পরিক্রমা করে আবার আমরা গ্রামের পথ ধরলাম। আমাকে নিয়েই শুরু হল সেই গ্রামের শোভাযাত্রা।

রাস্তায় চলতে চলতে ভদ্রলোক বললেন—তুমি ভারতীয় সাধু? তাঁর কাছ থেকে হঠাৎ এই কথাটা আশা করিনি, তাঁর কথার কোনো জবাব দিলাম না। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার শুরু করলেন—আমাদের গ্রামে এরকম একজন হিন্দু সাধু পেয়ে আমরা খুব খুশী হয়েছি। তাঁর কথাটাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা আমার নেই, মনের ভক্তি যখন প্রকাশ পায় তখন একমাত্র মাতৃভাষাই তার মাধ্যম। গ্রামবাসীদের এই প্রাণখোলা পরিবেশের মধ্যে আমার হৃদয় দ্বার খুলে গিয়েছে। আমি পরিবেশ আর নিজের

সাবধানতার কথা ভুলে গিয়ে ব্যবহার করেছি আমার মাতৃভাষা বাংলা আর আমার প্রিয় স্তোত্র সংস্কৃত। তাই এদের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছি।

গ্যাংটক ছাড়ার পর থেকে এ পর্যন্ত সব সময়ই সচেতন ছিলাম। নেপালী তীর্থযাত্রী আর মৌনীবাবা বলে নিজেকে সব সময় তিব্বতীদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতাম। সাধুবাবা কাছে থাকা কালীন আমার সে চিন্তা ছিল না; কিন্তু লাসা থেকে কৈলাসে চলার পথে আমিই আমার অভিভাবক খুব সাবধানেই ছিলাম, প্রচণ্ড ইচ্ছা সত্ত্বেও লাসায় নিজেকে জনসাধারণ থেকে দূরে দূরে রেখেছিলাম। কিন্তু আজ হঠাৎ কেন জানি না সেই সব বাধা, চীনাদের ভয় আর জড়তা সবকিছু যেন মন থেকে উধাও হয়ে গেছে। মনটাকে এত হালকা কোনদিনই লাগেনি। আমার এই ত্রাপার আভ্যন্তরীণ বিমল'টা হঠাৎ যেন প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। মনের সেই বাধাটা আনন্দের জোয়ারে উধাও হয়ে গেছে। মুণ্ডিত মস্তক, খয়েরি রঙের লামা পোশাকে তিব্বতে ভ্রমণরত এই দেহটাকে হঠাৎ যেন মনে হল এক অজানা মানুষ। আমি এর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইছাপুরের সেই বিমলকে হঠাৎ যেন খুঁজে পেলাম।

ভদ্রলোককে আমি উজার করে দিলাম আমার প্রাণের কথা। ভাঙ্গা তিব্বতী কথা জোড়া দিয়ে তাঁকে বললাম—হ্যাঁ আপনি ঠিকই ধরেছেন আমি ভারতীয়, তীর্থযাত্রীদের সাথে আমি তিব্বতে এসেছি তাঁরা সবাই নেপালী লামা, আমি দীক্ষা নিয়ে তাঁদের সাথেই লাসায় গিয়েছিলাম। তাঁরা সবাই ফিরে গেছেন—আমি কৈলাসে যাবার জন্যই এ পথ ধরেছি।

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক আনন্দে যেন লাফিয়ে উঠলেন, তিনি হঠাৎ যেন হীরের টুকরো খুঁজে পেয়েছেন। আমার আর কোন কথা না শুনেই তিনি সকলকে জানাতে লাগলেন আমার বিষয়।

পরে জানতে পারলাম যে ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের দর্শন পাওয়া তিব্বতীদের কাছে এক মহাপুণ্যের ফল। আজকাল তীর্থযাত্রীদের যাতায়াত নেই কিন্তু বছর দশেক আগেও তিব্বতীরা দলবেঁধে বড় রাস্তার ধারে যেতো ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের দেখার জন্য। এই গ্রামের তিনিই মোড়ল, দুই ছেলে ইয়াটুং-এ থাকে। ভদ্রলোক দু'বার গ্যাংটকে গেছেন কাজেই এই গ্রামের তিনি একজন সম্মানীয় ব্যক্তি। তিনিও ইয়াংটু-এ পশমের কারবার করতেন এখন ছেলেরাই তার দেখাশুনা করে। তিনি এখন ভেড়া ও খেত-খামার নিয়ে ব্যস্ত। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি সেই পরিবারেই শুধু নয় সমস্ত গ্রামের সম্মানীয় অতিথি হয়ে পড়লাম।

গ্রামটির নাম দিংবো আর ভদ্রলোকের নাম ইইগী। ইইগী আর তার ভাই গীবিত দু'জনের একই স্ত্রী, অর্থাৎ ভদ্রমহিলার দু'জন স্বামী, আর ছোট ছেলে মেয়েগুলো যাদের দেখছি তারা সবাই গীবিতের ছেলেমেয়ে। ইইগীর ঔরসে যাদের জন্ম তারা এখন সবাই বড়। গীবিতের ছেলেমেয়েরা এখন ছোট। ভদ্রমহিলাকে বাহবা দিতেই হবে, একই সাথে দুই স্বামীর মন যোগানো কি কম কথা। ভদ্রমহিলার বয়স এখন প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি তো বটেই, এটা আমার অনুমান মাত্র। ইইগী মশাই উপযাচক

হয়েই আমাকে তার হাঁড়ির খবর দিলেন, তিব্বতে এটা খুবই চল্‌তি নীতি। হবেই বা না কেন? এতে দোষেরই বা কি আছে? দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামী থাকা সত্ত্বেও তো তাকে আমরা পরমা ভাগ্যবতী লক্ষ্মীর মর্যাদা দিয়ে থাকি। এই পরিবারকে দেখেই মনে হচ্ছে যে এমন সুন্দর ও সুখী পরিবার বুঝি জগতে বিরল।

ইইগীকে আমি কথায় কথায় রাতের সেই সন্ন্যাসীর কথা জিজ্ঞাসা করলাম—তিনি আমার কথা কিছুই বুঝতে পারলেন না। কাজেই আমি সে বিষয়ে নীরব থেকে গেলাম। সেদিনটা খুব তাড়াতাড়ি কেটে গেল। এরা সন্ধ্যের আগেই রাত্রির খাওয়া খেয়ে নেন তাতে আলোর খরচা বাঁচে আর শরীরের পক্ষেও খুব ভালো। ভদ্রমহিলা আমাকে তাঁর ছেলেমেয়েদের সাথেই শোবার বন্দোবস্ত করে দিলেন, তাঁর এই সহজ আর সরলতার কথা কোনদিনই ভুলবো না।

দিংবো গ্রামে দু'দিন পুরো বিশ্রাম করে তারপর আবার রওনা দিলাম, উদ্দেশ্য সীগাৎসে। সাংপো ধরে আবার চললাম পশ্চিমের পথে। এখান থেকে সীগাৎসের পথ নির্দেশ খুব সোজা।

গ্রামের লোকেরা এই পথেই সীগাৎসে যান। সাংপোর দক্ষিণ ধার ধরে সরাসরি যেতে হবে উৎসের দিকে কয়েকদিন চলার পর পাওয়া যাবে একটা নদী—সেটাই নীয়াং নদী। নদী পার হবার জন্য ফেরী নৌকা পাওয়া যাবে—নদীর ওপারেই সীগাৎসে। অর্থাৎ এখান থেকে নীয়াং নদী ছাড়া আর কোন নদী আমাকে পার হতে হবে না। আমার কাছে এটা একটা বিশেষ সান্ত্বনা।

সীগাৎসে

গ্যাংটক থেকে লাসায় যাবার পথে প্রায় প্রত্যেক রাতেই আমরা একটা না একটা গ্রাম পেয়েছি, গ্রাম মাত্রেই আছে গুম্ফা কাজেই থাকবার কোনরকম অসুবিধা হয়নি, গুম্ফাগুলোই তীর্থযাত্রীদের ধর্মশালা। তিব্বতের এই অঞ্চলে অর্থাৎ চুসুল থেকে কেউ যদি সাংপো ধরে সীগাৎসের দিকে আসেন তাহলে হতাশ হতে হবে। জনবসতি প্রায় নেই বললেই চলে, একচল্লিশ মাথার সেই ছোট্ট দিংবো গ্রাম ছাড়ার পর গত পাঁচদিনের মধ্যে পেয়েছি মাত্র ছটি বাড়ী খুবই গরীব চাষী, তাদের আন্তরিক ভক্তির কথা আমার ডায়রীর পাতায় লিখে বোঝানো অসম্ভব। সেই প্রাণের স্পন্দনটাকে কি আর ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব! অতিথি সেবার জন্য তারা জীবন দিতে পারে, বিশেষ করে অতিথি যদি লামা বা সন্ন্যাসী হয় তাহলে তো কথাই নেই। এরা বিশ্বাসী আর সরল। সাধনার উচ্চমার্গে এদের কষ্ট করে উঠতে হবে না এরা উঠেই আছে। কোনো রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করেই এরা ছুটে আসে সাহায্য করতে। এদের ঋণ আমি কোনোদিনই পরিশোধ করতে পারবো না।

লাসা থেকে সীগাৎসের দূরত্ব প্রায় একশ তিরিশ মাইল। প্রধান রাস্তা দিয়ে এলে সময় লাগে প্রায় দশ এগারো দিন। আমি সাংপোকে বরাবর অনুসরণ করেছি—আমার কাছে এটাই ছিল সহজ উপায়। রাস্তাতো নয় শুধু পাথর ডিঙ্গিয়ে চলা—খুবই কষ্টকর। নীয়াং নদীর তীর পর্যন্ত আমার আসতে লাগলো প্রায় তেরোদিন।

তেরোদিনের দিন দুপুর বেলা সাংপোর উপত্যকা দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ বাঁ-দিকে নজরে পড়ল আর একটি উপত্যকা। সাংপোর দক্ষিণে হিমালয়ের যে বিরাট পাঁচিলটা ধরে এগুচ্ছিলাম সেটা হঠাৎ যেন শেষ হয়ে গেল। আমার সামনে এখন আর একটা বিরাট সমতল ভূমি, এখানে হঠাৎ যেন গ্রামের সৃষ্টি হয়েছে। বুঝলাম যে সীগাৎসের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি। সাংপোর ঠিক ধারেই পেলাম এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম, গ্রামের ভেতর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। গ্রামটা শেষ হয়েছে একটা নদীর সংগমে। এটাই তাহলে নীয়াং নদী। মনটা আনন্দে নেচে উঠল, তিব্বতীরা একান্ত প্রয়োজন না হলে যেচে কারও সাথে আলাপ করে না, কাজেই সেদিক থেকে কোনো ভয় নেই—চায়ের দোকান একটা দেখে সেখানে বসলাম। দোকানের সামনে একটি মেয়ে বিরাট চোঙার মধ্যে করে চায়ের সাথে মাখন মেশাচ্ছে আমাকে দেখেই তারা জিভ বার করে সম্মান দেখাল। দোকানের ভেতরে বসবার কোনো ব্যবস্থা নেই—বাইরে একটা বেঞ্চি পাতা, সেখানে দু'জন বসে গল্প করছে আমাকে দেখেই তারা উঠে দাঁড়াল, তারপর জামার হাতা দিয়ে বেঞ্চিটার ধূলো পরিষ্কার করে দিয়ে আমাকে সেখানে বসতে বলল। আমি

সেখানে বসে একগ্লাস চা বানাতে বললাম। তিব্বতের সর্বত্র চা প্রায় একইভাবে তৈরী হয়। এখানেও তাই চা-এর পাতা জলে ভেজানোই ছিল দু'দিন যাবৎ তারা একই পাতা ব্যবহার করে, চা চাইতে তার সাথে মাখন ও নুন মিশিয়ে দেওয়া হয়। লম্বা চোঙগুলো সেই কাজেই ব্যবহার হয়। আমি প্রথম যেদিন এ দৃশ্য দেখেছিলাম সেদিন ভেবেছিলাম যে লম্বা হামাল দিস্তেতে করে মশলা বাটছে।

তারপর কথায় কথায় জানতে পারলাম যে এখানে দুটো ফেরীঘাট আছে। একটা ফেরী ব্রহ্মপুত্র পার হবার জন্য আর একটি নীয়াং নদী পার হবার জন্য। ব্রহ্মপুত্রের ফেরী ধরতে হলে নীয়াং নদী পার হয়ে সীগাৎসে যেতে হবে, দিনে দু'তিন বার নৌকো চলাচল করে। আর এখান থেকে নীয়াং নদী পার হবার জন্য ঘাটে গিয়ে মাঝি বলে চেঁচাতে হয়—নৌকোটা আসে ওপার থেকে, দিনে একবার বা দু'বার নৌকো চলাচল করে। একজনের জন্য হলে মাঝি আসতে চায় না।

আমি ঘাটের কাছে দেখলাম যে ফেরীঘাট বলে কিছু নেই। আর এদিক ওদিক তাকিয়েও কোনো নৌকো চোখে পড়ল না। নীয়াং নদী খুব চওড়া নয় তবে সংগমের কাছাকাছি বলে তার দুধারে বালির বিরাট চড়া। এই নদীটারই উৎস দেখেছি সামাদর কাছাকাছি। সেখান থেকে গীয়াৎসে পর্যন্ত এই নদীর ধার ধরেই আমরা গিয়েছিলাম। গীয়াৎসের কাছাকাছি আর একটি উপনদীর সাথে মিশে এখানে বিরাট নদীতে পরিণত হয়েছে।

আমাদের দেশে এই অবস্থায় পড়লে আমি কিছুতেই থমকে দাঁড়াতাম না সাঁতার কেটে পার হয়ে যেতাম, এখানে তা অসম্ভব। এখন যদিও তিব্বতের গরমকাল কিন্তু এই গরমকাল দার্জিলিং-এর গরমকাল থেকে অনেক বেশী ঠাণ্ডা। এই বরফ গলা জলে সাঁতার কাটার আগেই ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট হয়ে তলিয়ে যেতে হবে।

পার হবার জন্য অন্য কোনো উপায় না খুঁজে পেয়ে আমি সেই চায়ের দোকানে ফিরে আসতে বাধ্য হলাম। দোকানের ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করতেই সে ঘাটের কাছে ছুটে গেল; তারপর ফিরে এসে হতাশের সুরে বলল—আজকে আর পার হওয়া সম্ভব নয় ওরা নৌকো তুলে ফেলেছে। আমাকে হতাশ হতে দেখে সে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল যে, চিন্তার কোনো কারণ নেই আমি ইচ্ছে করলে তার দোকানে রাত কাটাতে পারি। আগুন আছে কাজেই অসুবিধা হবে না। এর চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা আর হতে পারে না, আমি রাজি হয়ে গেলাম।

সন্ধ্যের কাছাকাছি অর্থাৎ দিনের আলো থাকতেই তারা দোকান গুটিয়ে ফেলল। আমি ছেলেটিকে রাতে থাকার জন্য আগাম হিসেবে একটা সিকি দিলাম। সিকিটা পেয়ে সে কি আনন্দ পেল তা বলার নয়। তিব্বতী দু'চার পয়সা পেলেই এরা খুশী সেখানে ভারতীয় সিকি মনে হল আমি যেন চার গুণ দাম দিয়েছি। সে আনন্দের আতিশয্যে তার সাথে খাবার জন্য অনুরোধ করল,আমি তো প্রায় পা বাড়িয়েই ছিলাম সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। দোকানেই একটা ছোট ঘরে সে থাকে। ছেলেটির সাথে সেই ঘরে এসে ঢুকলাম প্রায় অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, ভেতরে ঢুকে দেখি সেই মেয়েটি

একটা হাঁড়িতে করে রান্না করছে। আমাদের ঘরে ঢুকতে দেখেই সে হাসিমুখে আমাকে সম্বর্ধনা জানালো। কোনো রকম ভূমিকা না করেই সে একটা গামলায় করে আমাকে গরম খিচুরীর মতো একটা জিনিস খেতে দিল। ছেলেটি আমার পাশেই বসল। একটা বাটিতে করে সেও খেতে লাগল, আমি আরম্ভ করার আগে হাঁড়িটার মধ্যে একবার নজর দিলাম, হাঁড়িটা প্রায় খালি। আমি গামলা থেকে অর্ধেক খাবার তাকে দিয়ে বললাম—ভাগাভাগি করে খাওয়া যাক, সে প্রথমটায় কিছুতেই রাজি হল না কিন্তু শেষে রাজি হয়ে গেল। দু'জনের রান্না আমরা তিনজনে ভাগ করে খেলাম। দেখে মনে হল এরা ভাই বোন। রাতের অন্ধকার হওয়ার আগেই আমি দোকানে ফিরে এলাম। দোকানের কোন ঝাঁপ নেই আমার মতো আরও দু'জন ওখানে এসে হাজির হয়েছেন। মনে হয় তারাও কালকের ফেরীর জন্য এসে উপস্থিত হয়েছেন। উনোনের ঠিক ধারেই আমি অতিথির মর্যাদায় স্থান পেলাম। ছেলেটি উনোনে একটা বিরাট আধপোড়া কাঠ গুঁজে দিয়ে চলে গেল। আমিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম কাজেই একটু গরম পরিবেশ পেতেই চোখ দুটো বুজে এল।

পরের দিন ভোরবেলা আমরা উঠলাম। উঠলাম মানে আমাদের ডেকে উঠানো হল; মেয়েটি আমাদের ঘুম ভাঙালো। বলার আগেই চা তৈরী ছিল তাড়াতাড়ি চা খেয়ে মেয়েটির হাতে আরও চার পয়সা গুঁজে দিয়ে আমি ফেরীর পথ ধরলাম। এখানে এক গ্লাস চা-এর দাম দু' পয়সা। আরও যে দু'জন নদী পার হবার জন্য আগের দিন এসেছিল তাদের সাথে আমি ফেরীঘাটে এসে পৌঁছলাম।

নৌকাটা দেখে অবাক হয়ে গেলাম, এই ধরনের নৌকা এই প্রথম দেখছি। বিরাট একটা চামড়ার গামলা বলা যেতে পারে। তারই মধ্যে আমরা ঠাসাঠাসি করে ভেতরে বসলাম, দাঁড়িয়ে থাকলে উল্টে পড়ার সম্ভাবনা আছে। একটা তক্তা দিয়ে কোন রকমে বৈঠার কাজ চালানো হচ্ছে হালের কোনো নাম গন্ধই নেই। নদীর স্রোতের উপর ভরসা করেই চলা হয়। কোন রকমে পার হওয়া যায় মাত্র।

একবার ওপারে এলে তাকে মাথায় করে আবার নিয়ে আসা হয় ঘাটে নয়তো স্রোতের টানে সাংপোতে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা। অবশেষে এসে পৌঁছলাম সীগাৎসে।

সীগাৎসে তিব্বতের অন্যতম বৃহৎ শহর, লাসা প্রথম দ্বিতীয় সীগাৎসে। তৃতীয় গীয়াৎসে আর ইয়াটুং চতুর্থ, একমাত্র এই শহরটি ছাড়া বাকি শহরগুলো এর আগেই দেখেছি। নীয়াং আর সাংপোর সঙ্গমে গড়ে উঠেছে এই শহর, মহামান্য পাঞ্চেন লামার পুণ্য ক্ষেত্র। ঐতিহ্য অনুযায়ী পাঞ্চেন লামা হচ্ছেন দালাই লামার ধর্ম ভাই। সম্পূর্ণ তিব্বতের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও প্রচারের মূল দায়িত্ব ছিল এই পাঞ্চেন লামার উপর আর দালাই লামার দায়িত্ব ছিল শাসন ও রাজনীতির। কিন্তু কার্যতঃ দালাই লামাই তিব্বতের সর্বেসর্বা আর পাঞ্চেন লামা সাং প্রদেশের শাসক, সাং প্রদেশের তিনটি প্রধান শহর সীগাৎসে, গীয়াৎসে আর ফারী, এই তিন শহরের তিনিই সর্বেসর্বা। পাঞ্চেন লামার স্থানীয় চলতি নাম তাশী লামা ও পাঞ্চেন রিম্‌পোচে।

সীগাৎসে লাসার মতোই তিব্বতের অন্যতম মহাপুণ্যক্ষেত্র। সীগাৎসে শহরকে পরিষ্কার তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম হচ্ছে এখানকার দুর্গ, বহু বছর আগে চীনারা এই দুর্গে তাদের প্রধান ঘাঁটি বসিয়েছিল। আজকালও তারা তাশীলামাকে রক্ষা করা ও আইন-শৃঙ্খলায় সাহায্য করার জন্য এখানে তাদের হেড় কোয়ার্টাস স্থাপন করেছে। দুর্গের নীচেই হচ্ছে শহর ও বাণিজ্যক্ষেত্র এই অঞ্চলের মূল বাজার, আর কয়েকমাইল দূরে আছে তাশীলুম্পো নামে এখানকার মূল গুম্ফা। লাসায় যেমন পোতালা এখানে তেমনি তাশীলুম্পো, এখানেই পাঞ্চেন লামা থাকেন। দালাই লামার গ্রীষ্মবাসের মতো তাশীলামারও একটা গ্রীষ্মাবাস রয়েছে, সেটা শহর থেকে প্রায় বারো মাইল দূরে; তার নাম কুন-কীয়াপ্লিং। সাধুবাবার কাছ থেকে সীগাৎসে বিষয়ে অনেক সংবাদ আমি আগেই জেনেছি।

নীয়াং নদীর চড়া থেকে উপরে উঠতেই চোখের সামনে ফুটে উঠল বিরাট একটা শহর। ঘরবাড়ীগুলো সেখানে খুব ঘন হয়ে উঠেছে, সেদিকেই আমি পা বাড়ালাম। সাংপোর উপত্যকায় একটা বিরাট সমতল ভূমির উপর এই শহরটি ছড়িয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে আমি বাজারের দিকে এগিয়ে চললাম। শহরের প্রত্যেকটা রাস্তাই বাজারে এসে মিশেছে। অনেকটা গীয়াৎসের বাজারের মতো, গাধা, ইয়াক, ভেড়া, মুরগী, কুকুরগুলো রাস্তাটাকে রিজার্ভ করে রেখেছে। দু'দিকে কালিম্পং-এর বাজারের মতো দোকান ও শেরপাতে ঠাসা। তারই মধ্যে আমি এগিয়ে চললাম। হঠাৎ একটা সাইন বোর্ড দেখে থামতে বাধ্য হলাম। হিন্দী ও ইংরেজীতে লেখা রয়েছে 'হোটেল'। হিন্দীতে যখন লেখা রয়েছে তখন নিশ্চয়ই হিন্দী জানা কাউকে পাওয়া যাবে সেই আশায় সেদিকে এগিয়ে গেলাম। কৈলাসে যাবার পূর্ণ বিবরণ এখান থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। হোটেলটা একতলা সাদা বাড়ী। হিন্দীতে হোটেল লেখাটা প্রায় অস্পষ্ট হয়ে আছে। নীচের তলায় একটা মুদীখানার দোকান। দোকানে হিন্দী জানা কাউকে পাওয়া গেল না, তাই আমি বাড়ীর ভেতরে ঢুকলাম। একজন বয়স্ক ভদ্রলোক আমাকে দেখেই অবাক হয়ে তাকালেন। আমি হেসে হিন্দীতে জিজ্ঞেস করলাম—আপনার বাড়ীর দেয়ালে দেখলাম হিন্দীতে লেখা রয়েছে 'হোটেল', আপনি কি হিন্দী বোঝেন। আমার কথাটা তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। আমার কথায় সরাসরি উত্তর না দিয়ে তার অতি অল্প চুলের বাহার করা গোঁফের উপর আঙ্গুল বুলিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।

তারপর কোনো কথা না বলে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, আমাকে ইসারায় অনুসরণ করতে বলে তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন, আমি তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। রাস্তার ওপারে এসে দাঁড়ালাম প্যাগোডা ধরনের সুন্দর একটা বাড়ীর সামনে। আমাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে তিনি বাড়ীর ভেতরে ঢুকে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর সাথে আর একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বাড়ী থেকে বেড়িয়ে এসে আমাকে হাসিমুখে আপ্যায়ন জানালেন। এই বয়স্ক ভদ্রলোকের মুখটা দেখলেই ভক্তি করতে ইচ্ছা হয়। তিনি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি গ্যাংটক থেকে আসছো? তার মুখ থেকে সুন্দর হিন্দী শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমি বললাম-হ্যাঁ। তিনি

আমার উত্তর শুনে অবাক হয়ে গেলেন, তারপর বিস্ময়ে সুর টেনে বললেন—বল কি! আজকালতো শুনেছি যাতায়াত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই পবিত্র আত্মার সামনে কিছুতেই মিথ্যে কথা বলা সম্ভব নয়। আমি গ্যাংটক থেকে লাসা আর লাসা থেকে এখানে আসা পর্যন্ত সব তাকে খুলে বললাম। আমি তাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে বললাম যে আমি কৈলাসে যেতে চাই মানস-সরোবরে একটা ডুব দিতে চাই, আমাকে আপনি দয়া করে সেখানে কি করে কোথা দিয়ে যেতে হবে তা বলে দিন, আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।

ভদ্রলোক আমর কথা শুনে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁর হাল্কা দাড়িটা হাতড়াতে হাতড়াতে তিনি "হুম্" করে একটা শব্দ করলেন মাত্র। যে ভদ্রলোক আমাকে সেখানে নিয়ে এসেছেন তাঁকে চলে যেতে বলে তিনি আমাকে ভেতরের একটা ঘরে নিয়ে এলেন।

কাঠের থাম আর সিমেন্টের দেয়াল। ঘরটা দেখলেই বোঝা যায় যে এটি একটি সম্ভ্রান্ত পরিবার। একটা ছোট ভারী গদীর উপর আমাকে বসিয়ে তিনি উঁচু গলায় কাকে যেন ডাকলেন। ভেতর থেকে এক ভদ্রমহিলা এসে উপস্থিত হলেন। আমাকে দেখেই তিনি থমকে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে মাথা নীচু করলেন। ভদ্রলোক তাঁকে কিছু খাবার আনতে বললেন, তিনি আবার চলে গেলেন। এই সৌম্যমূর্তি দর্শন অবধি আমার মনে যেন আবার নতুন করে জোয়ার এসেছে। তাঁকে দাদু বলেই সম্বোধন করবার অধিকার পেলাম। তিনি আমার সামনে পা গুটিয়ে বসে খুব গোপনীয়তার ভাব করে একটু ভর্ৎসনার সুরে বললেন—তুমি তোমাদের দল ছেড়ে মোটেই ভাল করনি। এসেই যখন পড়েছো তখন কি আর করা যাবে।

তুমি কৈলাসে যাবে খুব ভালো কথা ভগবান বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব তোমাকে রক্ষা করুন। কিন্তু তুমি নেহাতই ছেলেমানুষ কৈলাস এখান থেকে অনেক দূর তাছাড়া পথও অতি দুর্গম, আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে দিতে পারি সেখানে পৌছবার মতো মনোবল থাকলে নিশ্চয়ই পৌছতে পারবে।

আমাদের কথার মাঝেই ভেতর থেকে সেই ভদ্রমহিলা একটা বিরাট কাঠের থালায় করে চা ও নিমকি জাতীয় খাবার এনে আমাদের পাশে রাখলেন। চা খেতে খেতে আরও কথাবার্তা হতে লাগল তারপর হঠাৎ পেলাম অতি প্রয়োজনীয় তথ্য। আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই কথা আবার বলবার জন্য দাদুকে অনুরোধ করলাম, তিনি হেসে আবার বললেন—

মানস সরোবর বললে লোকেরা চিনবে না। ভারতীয় তীর্থযাত্রীরা ঐ নামেই ডাকে বটে কিন্তু আমাদের কাছে তার নাম সম্পূর্ণ অন্য। মানস সরোবরকে আমরা বলি মাফাম্ ৎসো, অনেকে মাভাং ৎসো নামেও তাকে চেনে। ৎসো মানে সরোবর। মানস সরোবরের পাশেই আছে লাংগাক্ ৎসো তাকে ভারতীয় সাধুরা বলে রাক্ষসতাল। এই দুটো সরোবর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তিব্বতীদের কাছে কৈলাস খুব বড় তীর্থ নয়, বড় তীর্থক্ষেত্র হচ্ছে সেখানকার গুম্ফা। সবাইকে বলবে দিরাফুক গুম্ফা তাহলেই তারা

তোমাকে পথ দেখিয়ে দেবে। দাদু একটা কাগজে এই নামগুলো তিব্বতী ভাষায় পরিষ্কার করে লিখে দিলেন।

আমি সঙ্গে নামগুলো প্রায় মুখস্ত করে ফেললাম মাফাম্ ৎসো (Mapham Tso), মাভাং ৎসো, লাংগাক্ ৎসো, দিরাফুক গুম্ফা দিরাফুক গুম্ফা। আমি ইষ্টমন্ত্রের মতোই সেই নামগুলো মনে মনে উচ্চারণ করতে লাগলাম। যদি আমার কাগজ-পত্র বা ডায়রীটা হারিয়ে যায় তাহলেও অন্ততঃ কৈলাসের পথ নির্দেশ আমার মন থেকে হারাবে না। দুপুরে দাদুর সাথেই খাওয়ার আমন্ত্রণ পেলাম। অন্যদিন হলে আমি এই আমন্ত্রণে নিশ্চয়ই লাফিয়ে উঠতাম কিন্তু এই মুহূর্তে কৈলাসের এক স্বপ্নচিত্র মনে উদিত হওয়ায় বারবার মনে হতে লাগল যে এই মুহূর্তেই রওনা হওয়া দরকার। আমার মন আনন্দে লাফাতে লাগলো—পেয়েছি পেয়েছি কৈলাসের পথ-নির্দেশ আমি পেয়েছি।

দাদু আমাকে এটা-ওটা জোর করে খাওয়ালেন, অনেকদিন পর ভাত ও সব্জি খেলাম আর তার সাথে ছিল মাংস। খেয়ে-দেয়ে উঠে আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় জানাতেই তিনি প্রায় লাফিয়ে উঠলেন—তিনি আমার হাতটা ধরে বললেন—পাগল নাকি! এখন যাবে কোথায়! বস বস বিশ্রাম কর। তার সেই স্নেহপূর্ণ আপ্যায়ন উপেক্ষা করার ধৃষ্টতা আমার নেই অতএব আমি রাজি হয়ে গেলাম।

পরে জানলাম যে দাদুই এই বাড়ীর মালিক—ভদ্রমহিলা রান্না বান্নার কাজ করেন। তার ছেলেমেয়েরা সবাই কয়েকদিন হল এক আত্মীয়ের বিয়েতে গেছেন। দাদু দার্জিলিং-এ ছোটবেলায় পড়াশুনা করেছেন, কয়েকটি বাংলা শব্দ এখনও তার মনে আছে। কার্শিয়াং, কালিম্পং, শিলিগুড়িতে অনেকদিন থেকেছেন, দু'বার তিনি কলকাতায়ও গিয়েছেন। তাঁর মতে বাঙালীদের মতো এত চালাক জাতি পৃথিবীতে আর নেই। তিনি তাঁর ফোকলা দাঁত বের করে মাঝে মাঝে হেসে উঠেন, আর প্রায়ই বহুদিনের কথা স্মরণ করতে গিয়ে তন্ময় হয়ে যান। তাঁর স্মৃতিশক্তির পরিচয় পেয়ে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, তিনি হিন্দী এখনও ভোলেননি। পরে জানলাম দাদু সেই রাস্তার ধারের হোটেলের মালিক, তবে আজকাল আর সেই ব্যবসা নেই। ভারতের সঙ্গে যখন ভাল যোগাযোগ ছিল সেই সময়টা ছিল এর সুবর্ণ যুগ।

পাঞ্চেন লামা

বিকেলের দিকে দাদু আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন,

—তুমি লাসায় দালাই লামাকে দেখেছো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ দেখেছি তবে তাঁর সাথে কথা বলার সৌভাগ্য হয়নি। আমি জবাব দিলাম।

— তাঁর সাথে অবশ্য কথা বলে লাভ নেই। সে এখনও ছেলেমানুষ, আর সব সময় লোকজনেরা তাকে ঘিরে রাখে। কিন্তু পাঞ্চেন লামার কথা আলাদা, কোথায় কি করতে হবে তা তিনি ভালোভাবেই জানেন।

দাদুর কথায় আমি অবাক হয়ে গেলাম, তাঁর সুরে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে তিনি দালাই লামার থেকে পাঞ্চেন লামাকেই বেশী শ্রদ্ধা করেন। দালাই লামা তাঁর কাছে নাবালক মাত্র। কথায় কথায় দাদুর কাছে আরও অনেক কথা জানতে পারলাম। তিনি বলতে লাগলেন—

এককালে পাঞ্চেন লামাই ছিলেন তিব্বতের ধর্মগুরু। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে আস্তে আস্তে দালাই লামা সে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন। এরজন্য অবশ্য দালাই লামাকে দোষ দেওয়া যায় না আসল দোষী হচ্ছে তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা। দালাই লামাকে কেন্দ্র করে তারাই আসলে তিব্বতের বড় বড় পদ দখল করে বসে আছে। এমন এক সময় ছিল যখন ছোট দালাই লামা বড় হয়ে রাজ্যশাসনের ক্ষমতা পাওয়ার আগেই তার মৃত্যু হত। এই মৃত্যুর মূলেই ছিল মন্ত্রীমহলের কারসাজি। তিব্বতের এই যে লামা ধর্ম সেই ধর্মের মূল রহস্য আসলে পাঞ্চেন লামারাই ভালোভাবে জানেন। অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষের যেসব তীর্থযাত্রী এই পথে মানস প্রদক্ষিণে যেতেন তারা সবারই পাঞ্চেন লামার আশীর্বাদ নিতেই এ পথ দিয়ে যেতেন। অনেকের মুখে তুমি শুনবে যে পাঞ্চেন লামা চীনাপন্থী, কথাটা ঠিক নয়। আসলে তিনি দূরদর্শী। আমাদের তিব্বত ছোট্ট একটা দেশ। তুমি লাসা দেখেছো কলকাতার সাথে তুলনা করলে তা একটা ছোট্ট শহর মাত্র। চীন আর ভারতের তুলনায় এটা নিতান্তই ছোট, আমাদের না আছে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র না আছে সামর্থ্য, হঠাৎ যদি বাইরের কোনো শত্রু আমাদের আক্রমণ করে তাহলে কে রক্ষা করবে ? কাজেই আমাদের চাই একটা শক্তি যে আমাদের রক্ষা করবে। তিব্বত বরাবরই চীনের অধীনে ছিল, তিব্বতের দুর্দিনে চীনারাই এগিয়ে এসেছে রক্ষা করতে। তিব্বতের সৃষ্টির মুলেই ছিল চীন। চীনা সম্রাটরাই পঞ্চম দালাই লামাকে চেন্-রে-জি করে রাজার সিংহাসনে বসিয়েছিলেন।

এসো, এই ঘরে এসো, দ্যাখো, ভালো করে তাকিয়ে দ্যাখো, সামনের এই যে বিরাট ফটোটা দেখছো, জানো, এই ছবিটা কার? এটা হচ্ছে এখনকার ঠিক আগের পাঞ্চেন লামা (১৯২৩), তিনি ইংরেজদের কাছে নিজেকে বিলিয়ে না দিয়ে আত্মরক্ষার জন্য চলে গিয়েছিলেন চিংঘাইতে, সেখানেই তিনি দেহত্যাগ করেন। কয়েক বছর পর সেই প্রদেশেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন (১৯৫২)। সেই শিশু পাঞ্চেন লামা চীনাদের সাহায্যে আবার ফিরে আসেন এখানে। চীনারা সাহায্য না করলে তিনি কোনোদিনই সীগাৎসে তাঁর প্রভাব ফিরিয়ে আনতে পারতেন না। চিংঘাই-এর সেই শিশু পাঞ্চেন লামাই বর্তমান মহান পাঞ্চেন এরডেনি (Panchen Erdeny)। শুধু কি তাই এই দ্যাখোনা চীনাদের সাথে আমাদের কত মিল স্বভাবচরিত্র ও চেহারায় আমরা তাদেরই মতো।

দাদু মনে হয় অনেকদিন পর তার মনের কথা শোনাবার জন্য লোক পেয়েছেন—তাই তিনি মহা উৎসাহে তিব্বতের ইতিকথা আমাকে শোনাতে লাগলেন। তাঁর কথাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি হান্ বা চীনা দরদী। দাদুর কাছ থেকে আরও যা জানতে পারলাম তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি— হান্‌রা সমস্ত তিব্বতেই এখন ছড়িয়ে পড়েছে। একমাত্র লাসাতেই তারা এখনও সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কারণ সেখানে লামা ও গুম্ফাগুলো খুব শক্তিশালী। তিব্বতের কালুন (Kaloon) শ্রেণীর বনেদি সম্প্রদায়েরাই দালাইলামার কাশাগ্ মন্ত্রীসভার সর্বেসর্বা। তারা কিছুতেই হান্‌দের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করছে না। চীনারা এখন তাদের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তিব্বত আর চীনদেশের মধ্যে আজকাল আর কোনো বর্ডার নেই। তিব্বতীরা হামেশাই চীনদেশে যাতায়াত করছে।

লামাদের মধ্যে পাঞ্চেন লামাই হচ্ছেন সবচেয়ে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আর হবেনই বা না কেন শত হলেও পাঞ্চেন লামাই দালাই লামা ও সমস্ত তিব্বতের ধর্মগুরু। হান্‌দের সাথে দালাই লামা যে চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন তা পাঞ্চেন লামা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছেন। কাজেই চীনারা এখন এই সীগাৎসে অঞ্চলের উন্নতির জন্য সবরকম বন্দোবস্ত করছেন। তিব্বতে আগে যানবাহনের রাস্তা ছিল না, আজকাল চীনা সৈন্যরা পাঁচটা রাস্তা তৈরী করেছে। সীগাৎসে থেকে কাঠমাণ্ডু এখন সরাসরি জীপ গাড়ী করে যাওয়া যায়।

চীনা সৈন্যবাহিনী তিব্বতের উন্নতির জন্য উঠে পরে লেগেছে, ইতিমধ্যে সীগাৎসের অনতিদূরে একটা বিমান বন্দর তৈরী হচ্ছে। তিব্বতের যুবক যুবতীরা দলে দলে শিক্ষার জন্য পিকিং যাচ্ছে। ভিখিরি সম্প্রদায় যারা না খেতে পেয়ে রাস্তার ধারে পড়ে থাকতো তারা এখন চীনা সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবার সুযোগ পাচ্ছে। চারিদিকের মিলিটারী ব্যারাকে সহজেই কাজ পাওয়া যাচ্ছে।

দাদুর ভাষায় বলতে গেলে হান্‌দের আগমনকে স্বাগতম্ জানানোই বুদ্ধিমানের কাজ। বর্তমানে সীগাৎসে এলাকায় যে সব উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে তার মূলেই আছেন পাঞ্চেন লামা। দাদুর কথাগুলো স্পষ্ট আর যুক্তি ভরা। মনে মনে ভাবতে লাগলাম তাঁকে আমার বিষয়ে সব জানিয়ে ভালো করেছি কী? যাক যা হবার হবেই, যা বলেছি

তা এখন ফিরিয়ে নিতে আর পারবো না। তিনি চীনা পন্থীই হোন আর দালাই পন্থীই হোন তাতে আমার কিছু যায় আসে না। দাদুর কথাতেই জানলাম যে সীগাৎসে এখন চীনা সামরিক বাহিনীতে ভর্তি। তাই অতি সাবধানে তাদের ভেতর থেকে এখন আমাকে বেরোতে হবে। দাদুর বাড়ীতে সেই আপন করা পরিবেশ, আপ্যায়ন আর তাঁর সহজ পবিত্র স্বভাবের মায়া ত্যাগ করে আমাকে বেছে নিতে হবে কৈলাসের পথ। দাদুর সাথে বিকেলে শহরের দিকে বেড়াতে গেলাম, প্রায় লাসার মতোই সীগাৎসে একটা বিরাট শহর। পাকা বাড়ী আর রাস্তাঘাটের অভাব নেই, তবে পোতালার মতো সেই স্বতন্ত্র পাহাড়ের উপর রাজবাড়ী এখানে নেই।

সাংপোর উপত্যকায় সীগাৎসে একটি সুন্দর শহর। সমতল ভূমির উপর প্যাগোডা ধরনের বাড়ীগুলো অতি চমৎকার। বিভিন্ন বাড়ীর দেয়ালে চীনা সরকারের শ্লোগান চোখে পড়বেই। পাঞ্চেন লামার রাজপ্রাসাদ দূরে পাহাড়ের গায়ে। পাঁচটি বিরাট বিরাট সৌধকে দেখিয়ে দাদু বললেন যে সেগুলো বিভিন্ন পাঞ্চেন লামার স্মৃতিসৌধ। পাঞ্চেন লামা বা পাঞ্চেন এরদেনি'র রাজপ্রাসাদ ও গুম্ফা একই সাথে, তার নাম তাশী লুম্পো। তাশী লুম্পো গুম্ফা তিব্বতের একটি অন্যতম প্রসিদ্ধ গুম্ফা। এখানে প্রায় চার হাজার লামা থাকেন। গুম্ফার প্রত্যেকটি দেয়ালেরকারুকার্য তাংখা আর পাঠাগার বিভাগ পৃথিবী বিখ্যাত। মন্দিরের পুজাসামগ্রী ও আসবাব পত্র সব খাঁটি সোনার। এই তাশী লুম্পো লামাদের এক পবিত্র মন্দির।

দাদু না বললেও সীগাৎসের রাস্তায় সামরিক পোশাকে সজ্জিত চীনা সৈন্যদের যাতায়াত আমার চোখ এড়াল না। কথায় কথায় জানতে পারলাম যে ভারত তিব্বত সীমান্ত রক্ষার জন্য সীগাৎসে ও গীয়াৎসের দুর্গগুলো এখন চীনা সামরিক বাহিনীতে ভর্তি।

একটা চৌরাস্তার কাছে আসতেই দাদু আমাকে একটা পাকা রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে বললেন—তুমি এই রাস্তাটা ধরবে এই রাস্তাটা সরাসরি কাঠমান্ডু গিয়ে পৌছেছে। কৈলাসে একা একা গিয়ে কি করবে? সে অনেক দূরের পথ তুমি পারবে না। তিনি সস্নেহে আমাকে সাবধান করে দিলেন।

দাদুর কাছ থেকে পাঞ্চেন লামা ও সীগাৎসের চীনা কর্তৃত্বের কথা শোনা অবধি আমি সেই শহর থেকে বিদায় নেবার জন্য ছট্‌ফট্ করতে লাগলাম। আমার শরীরের যে অবস্থা তাতে এমন একজন শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ ও তাঁর আশ্রয় কিছুতেই আমি ছাড়তাম না। এ ধরনের আশ্রয় যে কোন একজন তীর্থযাত্রীর কাছে অত্যন্ত লোভনীয় ব্যাপার। কিন্তু দেহ আমার যতই কাহিল হোক না মন বলছে এগিয়ে চল এগিয়ে চল। সেই আশ্রয় ছাড়ার জন্য আমার মন অতি চঞ্চল হয়ে উঠল। খাওয়া দাওয়া দাদুর সাথেই করলাম।

অনেকদিন পর সেদিন রাতে একটা বিছানা পেলাম, তিব্বতী শীতে সত্যিকারের একটা লেপ পাওয়া স্বপ্নের ব্যাপার। স্বপ্ন হলেও সত্যি। ভেবেছিলাম খুব ভোরবেলা উঠব কিন্তু ঘুমটা এত পাকা হয়েছিল যে উঠতে উঠতে প্রায় সাড়ে আটটা বেজে গেল।

দাদুই আমাকে ডেকে তুললেন। অনেকদিন পর ভদ্রলোকের মতো প্রাতঃকৃত্য সারলাম। তারপর বৈঠকখানা ঘরের টেবিলে বসতেই পেলাম নোনতা সুজি আর একগ্লাস গরম চা। দাদুর ঋণ শোধ করার ক্ষমতা আমার নেই তাঁকে বার বার আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগলাম।

দাদুর কাছ থেকে ডায়রী লেখার মতো কিছু কাগজ আর একটা পেন্সিল পেলাম। কিছু খুচরো তিব্বতী পয়সাও তিনি আমার হাতে গুঁজে দিলেন আর পথের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ শুকনো খাবার। দাদুকে বিদায় দিলাম। রাস্তায় নেমে হঠাৎ খেয়াল হল তাইতো! একদিন একরাত দাদুর সাথে কাটালাম অথচ তাঁর নাম জানা হয়নি। তাঁর আপন করা স্বভাব ও স্নেহে আমি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম যে তিনি আমার অপরিচিত।

রাস্তায় যখন নেমেই পড়েছি তখন ফিরে গিয়ে আর লাভ নেই। নাই বা জানলাম তাঁর নাম, তিনি চিরদিনই আমার হৃদয়ে দাদুর স্থান দখল করে থাকবেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে তাঁকে আমি সব খুলেই বলেছিলাম। আর তিনি ভেবেছিলেন অন্য রকম, দাদুর মতে আমি একটি নেপালী ছেলে কৈলাসনাথে যাবার জন্য আমি তীর্থযাত্রীদের দল থেকে পালিয়ে এসেছি। আমি যে একটি ভারতীয় ছেলে সে কথাটা তিনি কিছুতেই বুঝতে পারেননি। তাঁর সহজ আর মহানুভবতার এই হল আর এক পরিচয়। সেই জন্যই তিনি বার বার আমাকে কাঠমাণ্ডুর পথই দেখিয়ে দিচ্ছিলেন।

শুরু হল কৈলাসের পথ

সীগাৎসে একরাত কাটিয়ে আমি নতুন উদ্যমে চলতে শুরু করলাম। পথের নির্দেশ পেলাম, রসদ পেলাম আর মনোবলকে দ্বিগুণ করে ফিরে পেলাম। কৈলাসের স্বপ্ন এখন বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে—মনে মনে অদৃষ্ট দেবতাকে ভক্তিভরে প্রণাম জানালাম—তুমি আমাকে তোমার পথে নিয়ে চল।

ব্রহ্মপুত্র ডানদিকে রেখে পাহাড়ের গায়ে তাশী লুম্‌পোর বিরাট প্রাসাদগুলো দেখেই আমি সন্তুষ্ট হলাম। ইয়াটুং, গীয়াৎসে থেকে শুরু করে জোখাং, পোতালা পর্যন্ত অনেক গুম্ফা দেখেছি কাজেই তাশী লুম্‌পো আমার না দেখলেও চলবে। গীয়াৎসের চীনা সামরিক বাহিনীর নমুনা দেখে মনে হয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো। বিশেষ করে ওদের জেরায় পড়তে আমি রাজি নই।

সাংপোর উপত্যকা এখানে সমতল রাস্তাটাও লরী জিপ চলাচলের পক্ষে খুবই ভালো, তারই ধার ধরে আমি এগিয়ে যেতে শুরু করলাম। আবহাওয়াটা এখন মোটামুটি ভালোই, সূর্যের তাপটাও খুবই উপভোগ্য। বাঁদিকে দুর্ভেদ্য হিমালয়ের পাঁচিলকে সমান্তরাল রেখে আমি চলতে লাগলাম।

সন্ধ্যের দিকে আমি পেলাম আমার আকাঙিক্ষত রাস্তার মোড়। দুটোই যানবাহন যোগ্য একটা বাঁদিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে কাঠমাণ্ডুর দিকে গেছে, আর একটি সাংপো পার হয়ে উত্তর ও পশ্চিম দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। দাদু আমাকে বার বার সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন কৈলাসের পথ অতি দুর্গম, কাজেই কাঠমাণ্ডুতে ফিরে যাওয়াই ভালো। মনে মনে তাঁর উদ্দেশ্যে বললাম—আমাকে ক্ষমা করুন আপনার কথা রাখতে পারলাম না, কৈলাস আমাকে ডাকছে, আমাকে যেতেই হবে। আমি ফেরীঘাটের দিকে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এগিয়ে চললাম।

ব্রহ্মপুত্র এখানে বেশ চওড়া, এই শীতে সাঁতার কেটে পার হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। ঘাটের কাছে একটা ছোট চায়ের দোকান। সেখানে কয়েকটা মিলিটারী লরী দাঁড়িয়ে আছে। আমি কোন রকম দ্বিধা না করে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। নদীতে কোনো নৌকো চোখে পড়ল না তার পরিবর্তে রয়েছে একটা বিরাট গাধা বোট।

দোকানে কয়েকজন চীনা চায়ের গ্লাস হাতে করে উপুড় হয়ে বসে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে, আমি তাদের কাছেই এগিয়ে এলাম। চা চাইতে হল না দোকানে ঢুকতেই দোকানদার একটা বিরাট বাঁশের চোঙ্গায় করে এক গ্লাস চা ধরিয়ে দিলেন। সেই চোঙ্গার মধ্যে কম করেও আট-ন' কাপ চা তো হবেই। চীনাদের সাথে মুখোমুখি

এই প্রথম। আমি তাদের মতোই উপুড় হয়ে বসে চায়ের চোঙ্গাটা দু'হাতে ধরে তার গরম উপভোগ করতে লাগলাম।

সবাই বসে আছি তো বসেই আছি, কখন নৌকা আসবে কে জানে, সন্ধ্যে হয়ে যখন রাত হয়ে আসছে সেই সময় চীনা লোকগুলো সবাই উঠে দাঁড়ালো। ঘন্টাখানেক বসে থাকার পর হঠাৎ যেন তাদের মধ্যে প্রাণ এল। তাদের ব্যস্ততা ও কর্মতৎপরতা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। তারা তাড়াতাড়ি করে নদীর ধারেই সেই গাধা বোটটার দিকে এগিয়ে গেল তারপর তার উপর থেকে বড় বড় এ্যালুমনিয়মের পাত ফেলে নদীর চড়া থেকে বোট পর্যন্ত গাড়ীগুলোকে চালিয়ে আনবার জন্য রাস্তা করে ফেলল। আধঘন্টার মধ্যেই সব তৈরী হয়ে গেল, তারা আস্তে আস্তে এবার তিনটে লরী ও দুটো জীপকে চালিয়ে এনে তুলে ফেলল সেই বোটের উপর। তারপর আমার অবাক হওয়ার পালা। হঠাৎ সেই গাধা বোটটা জল কাঁপিয়ে তার ইঞ্জিনটি চালু করে দিল। এই বোটটা যে যন্ত্রচালিত তা মোটেই লক্ষ্য করিনি। আমি অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে দেখছি এমন সময় দু'জন চীনা আমার দিকে তাকিয়ে ইসারায় আসতে বললো বোটের উপরে। সাংপো পার হওয়ার জন্যই বসে ছিলাম, কাজেই তাদের আহ্বানের সাথে সাথে আমি উঠে পড়লাম সেই বোটে। চায়ের দোকানের আরও দু'জন তিব্বতী ভদ্রলোক পার হবার জন্য বসে ছিলেন তারাও উঠে এলেন। এবার একটি বিরাট শব্দ করে সেই তরণীটি তীর ছাড়ল। প্রায় পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমরা ওপারে এসে পৌঁছলাম। তারা আগের মতোই সেতু তৈরী করে সবাইকে নামাবার বন্দোবস্ত করে ফেলল। আমি হাতের মালা তুলে তাদের "ওম্ মণি পদ্মে হুম্" বলে আশীর্বাদ জানিয়ে বিদায় জানালাম। পার হবার জন্য কোনো পয়সাই দিতে হল না। লাসাজোং-এর ফেরী পেরোলাম।

সাংপো পার হলাম। এখান থেকেই পেলাম কৈলাসের মূল সড়ক। এখন আর রাস্তার নির্দেশের প্রয়োজন নেই। এই রাস্তাটা ধরে সোজা পশ্চিমের দিকে এগিয়ে গেলেই পাওয়া যাবে আমার স্বপ্নের কৈলাস ধাম। এই পর্যন্ত যখন ভালোভাবে কেটেছে তখন বাকিটাও নিশ্চয়ই ভালোভাবে কাটবে। আনন্দে আমার অন্তরাত্মা লাফিয়ে উঠল—মনকে বললাম আর ভয় নেই—এগিয়ে চল।

রাস্তার ধারের একটা ভাঙ্গা-বাড়ীতে সেদিন রাত কাটালাম, রাস্তাটা সরাসরি পশ্চিমের দিকে এগিয়ে চলেছে—সাংপোর ঠিক সমান্তরাল। আমি চলেছি সাংপোর স্রোতের বিপরীত দিকে সেটাই আমার মূল প্রেরণা—আমি যাচ্ছি উৎসের দিকে। রাস্তাটা প্রায় একঘেয়ে বলা যায়, গীয়াৎসের মতো মোটেই কষ্টকর নয়। শীত এখানে খুবই শুকনো, রাতের ঠাণ্ডা কন্‌কনে। দিনের প্রখর সূর্যতাপ রাতের ঠাণ্ডাটাকে দূর করে। আকাশ যদি মেঘলা থাকতো তাহলে শীতের প্রকোপে হয়তো এগিয়ে চলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতো। তিব্বতের আকাশে মেঘ প্রায় নেই বললেই চলে। দিনের সূর্য আর রাতের উজ্জ্বল তারা দুইই চলার পথে প্রেরণাদায়ক।

সাংপো পার হবার তৃতীয় দিনের দিন দুপুর বেলা পেলাম ছোট্ট একটি গ্রাম।

গ্রামটির নাম লাকা। গ্রামে ঢুকতেই চোখে পড়ল একটা চোরতেন। সেখানে বসতেই গ্রামবাসীরা আমাকে ঘিরে ধরল। মনে হল অনেক দিন পর তারা যেন একজন লামা পেয়েছে। তিব্বতে এখন গরমকাল গ্রামবাসীরা অধিকাংশই চাষের কাজে ব্যস্ত। এই অঞ্চলে বার্লি ও যবের চাষ খুব ভালো। আমার চারপাশে অধিকাংশই শিশু আর বৃদ্ধের দল তারা গ্রামেই থাকে। চোরতেনে বসার কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন বৃদ্ধা একটি শিশুকে কোলে করে আমার সামনে এসে হাজির হলেন, কিছু বলার আগেই তিনি আমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন, তারপর ফোকলা দাঁত বার করে কি যেন বললেন, আমি খুব মনোযোগ সহকারে শুনলাম বটে কিন্তু কিছুই বললাম না কারণ এই অবস্থায় আমার বলার কিছুই নেই। তিব্বতী ভাষা যদিও কিছুটা বুঝি কিন্তু এই ভদ্রমহিলার কথার বিন্দু বিসর্গও বুঝলাম না। মহিলাও ছাড়বার পাত্রী নন, শেষে আমি তার মাথায় হাত দিয়ে মনে মনে মন্ত্র পাঠ করতে লাগলাম—তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতটাকে ধরে শিশুর মাথায় রাখলেন। আমি শিশুটিকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলাম। মহিলাটি এবার খুশী হলেন।

গ্রামবাসীরা আমাকে চারপাশে ঘিরে ধরেছে কাজেই ছাড়া পাবার উপায় নেই। দুপুরবেলা তাদের মধ্য থেকে একজন সাম্পা এনে অতিথি সৎকার করলেন। তাদের মাঝখানেই আমি খাওয়ার পর সটান হয়ে শুয়ে পড়লাম বিশ্রামের জন্য। বিকেলের দিকে খেতের কাজকর্ম সেরে যুবক-যুবতীরা ঘরে ফিরতে লাগল, সেই সময় গ্রামে যেন প্রাণ ফিরে এল। বিকেলবেলা তাদের সাথেই রাতের খাওয়া খেলাম। তিব্বতীরা সূর্যাস্তের আগেই রাতের খাওয়া শেষ করে। আমাকে তারা একটি বিরাট খেতি বাড়ীতে এনে তুলল। মণ্ডপের মতো সেই বাড়ীতেই রাত্রিবেলা গ্রামবাসীরা এসে আবার একে একে উপস্থিত হল। কিছুক্ষণ পর আকাশে দেখা দিল পূর্ণচন্দ্র, কাজেই এই জমায়েতে আলাদা আলোর আর প্রয়োজন নেই। কয়েকদিন যাবৎই রাস্তায় চাঁদের আলোয় আমি হেঁটেছি। তিব্বতের নিষ্কলঙ্ক আকাশে চাঁদের আলো যেন দ্বিগুণভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে। সেই আলোয় একটু চেষ্টা করলেই মনে হয় আমি ডায়েরী লিখতে পারবো।

সকলে সেখানে জমায়েত হওয়ার পর তাদের সামনে ধরাধরি করে একটা বিরাট হাঁড়ি এনে রাখা হল, সকলে তার চারপাশে বিচুলি পেতে বসল। তারপর সমবেত কণ্ঠে শুরু হল গান। কি চমৎকার তাদের সুর, গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই গলা ছেড়ে তাতে অংশ গ্রহণ করতে লাগল। রাতের শীত ক্রমশঃ বাড়তে লাগল, সকলে কম্বল ছড়িয়ে জড়াজড়ি করে বসল। কিছুক্ষণ পর গান থামলো তাদের মধ্য থেকে দু'জন মহিলা উঠে গিয়ে হাঁড়ি থেকে একরকমের পানীয় তুলে সবাইকে বাটিতে করে দিতে লাগল। একটা বাটিতে করে আমার কাছেও মেয়েটি নিয়ে এল। মাত্র তিনটে বাটিতে করে একজন একজন সেই পানীয় পান করতে লাগল। মেয়েটি হাসিমুখে আমার মুখের কাছে বাটিটা তুলে ধরল, আমাকে পান করতেই হবে; অথচ কোন উপায় নেই—তাছাড়া এটা কোন ধরনের পানীয় সেটাও আমার জানার ভীষণ ইচ্ছে। তাই সাগ্রহে মেয়েটির কাছ থেকে দু'হাতে বাটিটা ধরে ঠান্ডা পানীয়ের সবটাই পান

করে ফেললাম। মেয়েটি হেসে কৃতার্থ হয়ে আমাকে সম্মান জানিয়ে বাটিতে যে সামান্য তলানী পড়ে ছিল সেটা চেটে খেয়ে নিল। আগে এরকম জানলে কিছুটা রেখে দিতাম। এখন কোনো উপায় নেই, অনেকটা তাড়ির মতো স্বাদ মনে হল তিব্বতী বিয়ার। এ অঞ্চলে বার্লির তো অভাব নেই। পানীয়ের পর গান আরও জমে উঠল, তারপর শুরু হল তাদের নাচ। সেই নাচকে আমি অনেকটা বীরভূম জেলার সাঁওতালি নাচের সাথেই তুলনা করতে পারি।

মণ্ডপটার ওপরে কাঠের ফ্রেম আর টিনের ছাদ। চারপাশে কোনো রকম দেয়াল নেই। বেশ শীত করতে লাগল। কিন্তু নাচ গান শেষ হবার আগে কিছুতেই শোবার উপায় নেই। চাঁদের আলো এখানে যেন উজাড় করে দিয়েছে তার কিরণ। নাচ আর সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি মিলিয়ে সেটা স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। তার মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে ভেসে উঠছে হি-হি শব্দে হাসি। নারী ও পুরুষেরা অবাধ ভাবে মিশে সৃষ্টি করেছে এক অপূর্ব পরিবেশ। সহজ সরল আসর সমাজের সব বাঁধনের বাইরে প্রাণখুলে দিয়েছে একজন আর একজনের কাছে। এমন পরিবেশ বুঝি জগতের এই পবিত্র ভূমিতেই সম্ভব। গরমকালে মনে হয় সব চাঁদনি রাতেই জমে ওঠে তাদের এই বাঁধন ছাড়া মহোৎসব। শেষে এক সময় তারা থামলো, তারপর একে-একে সবাই যে যার বাড়ীর পথ ধরল। মণ্ডপ ঘরে রইল একটা শূন্য হাঁড়ি আর একজন বহুদূরের তীর্থযাত্রী। তারা চলে যাবার পর বিচুলিগুলো একজায়গায় একত্র করে আমি তারই ভেতরে ঢুকে পড়লাম—এখানেই আমাকে রাত কাটাতে হবে। তিব্বতে আগুন, বিচুলি, কম্বল এই তিনটিকে বলা হয় মানুষের তিন বন্ধু। ঘুমের জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হলো না—একটু গরম পেলেই ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে আসে।

সেই রাতটা স্বপ্নের মতোই কেটে গেল। পরের দিন ভোরবেলা গ্রামবাসীরা উঠবার আগেই কয়েকটি কুকুরকে সাক্ষী রেখে আমি লাকা গ্রাম ছাড়লাম। গ্রামবাসীরা উঠে পড়লে নিশ্চয়ই আমাকে সহজে ছাড়বে না। আর সেই সাথে সাথে অন্য কোন অসুবিধারও সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাজেই রাতের সেই নাচ গানের মধুর স্মৃতি নিয়েই আমি আবার পথে এসে পড়লাম।

রাস্তাটা এখন ভালোই বলতে হবে সাংপোর এই উপত্যকায়। হিমালয়ের পাঁচিল সাংপোর সাথে সমান্তরালভাবেই চলেছে। চলায় কোন অসুবিধাই নেই, এই অঞ্চলের একমাত্র অসুবিধা হচ্ছে একঘেয়েমি। এখানকার দৃশ্যটাও যেন একঘেঁয়ে। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে চলতে থাকলেও আশপাশের দৃশ্যের কোনরকম পরিবর্তন নেই। নদীর উত্তর দিকের পাহাড় টা মাইলখানেক দূরে সরে গিয়েছে। গাছ-গাছড়া এ অঞ্চলে খুব একটা চোখে পড়ে না, নদীর চড়া আর বালি। দিনের বেলা সূর্যের প্রখর আলো সেই বালিতে ঠিকরে পরে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। লোক বসতি খুবই কম, গ্যাংটক থেকে লাসা যাবার পথে প্রায় রোজই একটা না একটা গ্রাম পেয়েছি। এ অঞ্চলের তুলনায় সেদিকেই ঘন বসতি পেয়েছি।

গীয়াৎসে ছাড়ার পর এই পথে যেসব বসতি পেয়েছি তা খুব নগণ্য। মাঝে মাঝে

চোখে পড়ে তিব্বতী যাযাবরদের তাঁবু আর চীনা সামরিক বাহিনীর শিবির। সাংপোর এই পথে চতুর্থ দিনের দিন প্রথমে চোখে পড়ল কয়েকটা লরী। প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি তারপর মেঘের মতো ধুলো উড়তে দেখে আমার ধারণা পরিষ্কার হল, গাড়ীগুলোকে গোঙাতে গোঙাতে এগিয়ে আসতে দেখে আমি রাস্তা থেকে নীচে গিয়ে সরে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখে ট্রাকের ভেতর থেকে সবাই হাত নাড়িয়ে অভিবাদন জানাল। আমার দূরত্বটা ছিল বেশ ব্যবধানে তাই তাদের মুখগুলো ভালোভাবে দেখতে পারলাম না। পর পর চারটে গাড়ী নিজেদের মধ্যে বেশ ব্যবধান রেখে চলে গেল। শুকনো ধূলোর মেঘটা উড়ে যেতে লাগলো আরও প্রায় কুড়ি মিনিট।

তীর্থযাত্রীদের সাথে থাকাকালীন আমার কোন রকম অসুবিধাই হয়নি। সাধুবাবাই ছিলেন আমার গুরু আর গাইড। চলার পথে কোথায় থাকতে হবে কোথায় যেতে হবে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। তাছাড়া প্রত্যেকটি গ্রামের বৈশিষ্ট্যও তিনি আমাদের বলে দিতেন। গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ীর দেয়াল ছিল তাঁর জানা। আর এখানে আমার অবস্থা ঠিক বিপরীত। কোথায় রাত কাটাবো, বসতি পাওয়া যাবে কি না তার কোন ঠিক নেই।—আমাকে চলতে হচ্ছে সম্পূর্ণ ভগবান ভরসা করে। সূর্যদেবকে একটু হেলতে দেখলেই আমি খুঁজতে থাকি রাতের আস্তানা। দু'দিন তো আস্তানা খুঁজতে রাত ভোর হয়ে গিয়েছিল। কোনরকমে একটা ঘর একটা পাঁচিলভাঙ্গা বাড়ী, মাথার উপর একটা ছাদ পেলেই আমি সন্তুষ্ট।

তিব্বতের এই অংশটা কিছুতেই যেন এগুচ্ছে না। দূরের পাহাড়গুলো যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সাংপোর স্রোতের উল্টোদিকে আমি যেন সাঁতার কাটছি।

চারিদিকের এই একঘেয়েমির মধ্যেও ভগবান যেন আমাকে হাত ধরে তাঁর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। দিনের সূর্য আর রাতের চাঁদ আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। সূর্যদেব দিচ্ছেন উত্তাপ আর চন্দ্র দিচ্ছেন ভরসা ও আলো। সেই নিঃসঙ্গতার মধ্যেই আমি আমার সাথে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ করার সুযোগ পেলাম।

আমার প্রাণময় সত্তাকে দেহ থেকে আলাদা করে উপভোগ করার আনন্দ পেলাম। এই চলার মাধ্যমেই আমি উপলব্ধি করলাম আমি আর আমার দেহ এক নয়। আমরা আসলে সবাই পথিক, এই ক্ষুদ্রলোক থেকে আমরা সবাই চলেছি অনন্তলোকের দিকে। পরমেশ্বরের ক্ষুদ্ররূপে আমার আত্মা যেমন দেহকে টেনে দিয়ে যাচ্ছে কৈলাসের দিকে, ঠিক সেই রকমই; এই বিশ্বপ্রাণ সমস্ত বিশ্বকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অমৃতের সন্ধানে, কাজেই আমরা সবাই পথিক।

এই ভাবেই আমার পথ এগুতে লাগল। গেবুক গ্রামের ছোট্ট একটি গুম্ফার মধ্যে দু'রাত বিশ্রাম করে ও মঞ্জুশ্রীর উদ্দেশ্যে সহস্র নাম জপ করে একঘেয়েমির হাত থেকে একটু নিষ্কৃতি পেলাম। গেবুক জমে গিয়ে ইঁট হয়ে গেছে। বোধিসত্ত্বের কাঁধের চাদরগুলো ইঁদুরে কেটে কুচোকুচো করে তার কোলের উপর জড়ো করেছে। ঘরের সর্বত্রই ইঁদুরের অবাধ যাতায়াত, প্রার্থনা গদিটায় শুয়ে রাত কাটানো মানে ইঁদুরের রাজত্বে মানুষের অনধিকার প্রবেশ মাত্র। এতৎসত্ত্বেও ঘর ও দেয়ালের ডেকরেশন

আগের মতোই আছে। তাংখা ও ভারী ভারী বইগুলো খোপগুলো থেকে এতটুকু স্থান পরিবর্তন করেনি। দরজার উপরের কাঠের আল্‌গা মুখোসটাকেও কেউ ছোঁয় না। গুম্ফাগুলোই তিব্বতের প্রাণ। সেক্ষেত্রে এই ছোট সুন্দর গুম্ফাটাকে পরিত্যক্ত দেখে খুবই খারাপ লাগল। প্রার্থনা চক্রগুলোতে এখন মরচে পড়তে শুরু করেছে, তত্ত্বাবধানের একান্তই অভাব।

দ্বিতীয় দিন ভোরবেলা তেরোজন গ্রামবাসীর এক ছোট্ট জমায়েৎ হল—তাদের অনুরোধেই আমি অনেকদিনের অব্যবহৃত ঘন্টা ও বজ্রের ব্যবহার করে পুজা করলাম। অনেকদিন পর প্রার্থনা চক্রগুলোয় স্থানীয় ভক্তদের হাত পড়ল। গ্রামবাসীদের কাছ থেকেই জানতে পারলাম এখানকার লামা প্রায় একবছর হল সীগাৎসে গেছেন তারপর আর ফিরে আসেন নি, তাশী লুম্‌পো তার পরিবর্তেও কাউকে পাঠাননি।

গ্রামের লোকরাও আজকাল চীনা শিবিরে কাজ পেয়ে চলে গেছে, তারা মাঝে মাঝে আসে। গ্রামের সবাই তাতে খুশী। এই অঞ্চলে শুকনো আবহাওয়ায় চাষবাস মোটেই হয় না ফলে গ্রামবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ, এমতাবস্থায় চীনা শিবিরে কাজ পাওয়া সত্যি ভাগ্যের কথা।

গেবুক গ্রাম থেকে চলার তিনদিন পর পেলাম সাকা নামে আর একটি গ্রাম। তারপর আবার একঘেয়ে রাস্তা। এবার রাস্তাটাকে মনে হল আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠছে। সাংপোর স্রোতের দিকে তাকিয়ে দেখলাম আমার অনুমানটা মিথ্যে নয়। জলের স্রোত এখন মনে হয় আগের চেয়ে অনেক বেশী।

সাকার পরের গ্রামটি পেলাম তারও চারদিন পর। লাৎসে জোং-এর পর এটাই বড় গ্রাম। দুপুরবেলায় আমি এই গ্রামে এসে হাজির হলাম। দেখেশুনে মনে হল যে এই গ্রামে কম করেও হাজারখানেক লোকের বাস হবে, অর্থাৎ এক একটা বাড়ীতে যদি পাঁচজন থাকে তাহলে আমার হিসেবে তাহাই দাঁড়ায়।

গ্রামটির নাম পাসাগুক্।

পাসাগুকের জ্ঞানীগুরু

পাসাগুক্ সাংপোর তীরের একটি শান্ত গ্রাম। গ্রামের মধ্যে কোনরকম চঞ্চলতা নেই। বাড়ীঘরগুলো যেন শূন্য। তিব্বতের সেই ভয়ংকর গ্রামরক্ষী কুকুরগুলোও যেন এখানে ঘুমিয়ে সময় কাটায়। গ্রামে ঢুকতেই নজরে পড়ল একপাল চমরী গাই। শুকনো বিচুলির সাথে মুখের লালা মিশিয়ে চুইনগামের মতো চুষছে। আমার মতো তীর্থযাত্রী তারা অনেক দেখেছে তাই ভ্রূক্ষেপও করল না। কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ে আমাকে দেখে জিভ বার করে থমকে দাঁড়াল। গ্রামের মাঝামাঝি আসতেই নজরে পড়ল খুঁটির উপরে বাঁধা সারি সারি সাদা পতাকা। তারপরেই চোখে পড়ল একটা গুম্ফা। মনটা আনন্দে লাফিয়ে উঠল। মরুভূমির মধ্যে হঠাৎ পেলাম জল। সাধারণতঃ গুম্ফাগুলোর চূড়া অনেক দূর থেকেই দেখা যায়। গুম্ফাগুলোর ছাদ মন্দিরের মতোই গ্রামের মধ্য থেকে মাথা উঁচু করে জেগে উঠে। এই গুম্ফার চূড়াটাকে কেন যে আগে চোখে পড়েনি বুঝতে পারলাম না। মাঝারী গোছের একটা গুম্ফা, দার্জিলিং-এর কাছে ঘুমের গুম্ফার মত অনেকটা। দেয়ালের চারদিকে ঘুরে মণি-চক্র স্পর্শ করে আমি মন্দিরে ঢুকলাম।

বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকতেই চোখে অন্ধকার দেখলাম। চোখটা অন্ধকারে অভ্যস্ত হতেই সামনে নজরে পড়ল অবলোকিতেশ্বরের এক বিরাট মূর্তি। তারই সামনে নীচের বেদীতে সারি সারি বাটিতে জল। বাটির উপর চাল আর বিরাট ঘিয়ের প্রদীপটি সেই মন্দিরের প্রাণস্বরূপ হয়ে বুদ্ধের চরণে আত্মনিবেদন করছে। আমি প্রণাম করে সামনের বেদীতে গিয়ে বসলাম। তারপর শরীর ও মনকে শান্ত করবার জন্য ধ্যানে বসলাম। অনেকদিন পর আমি একটা আস্তানা পেয়ে তথাগতকে আমার ভক্তিঅর্ঘ্য জানাতে লাগলাম।

প্রায় ঘন্টাখানেক পর মন্দিরের শুকনো চাল চিবিয়ে কোন রকমে ক্ষুধা নিবারণ করলাম। মন যখন আনন্দ ও তৃপ্তিতে ভরপুর তখন আমার না খেলেও চলে, আবার দেখেছি ঠিক ক্ষুধার সময় শত চেষ্টা করেও মনকে সংযত করা সম্ভব হয়নি। মনকে পর্যবেক্ষণ করার উপযুক্ত ক্ষেত্রই হচ্ছে পথ। পৃথিবীর উপর পড়ে রয়েছে মহা-পথ, সেই পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে আমার এই স্থূল শরীর আর সেই শরীরের উপর ভর করে চলেছে মনরূপী সূক্ষ্মশরীর। দেহ যখন সুস্থাবস্থায় থাকে মন পায় তার সহজ পথ, দেহই মনের পথ, দেহ আছে বলেই তো তার প্রকাশ। সাধুরা বলেন যে, মনের গতি ঊর্ধ্বে কিন্তু সে কথা আমি বুঝি না। সে মহাবিদ্যা আমার আয়ত্তের বাইরে, আমার সাধারণ যুক্তিতে আমি বুঝি মনের স্বাভাবিক গতি যদি ঊর্ধ্বেই হয় তবে সে ফিরে আসে কেন

এই দেহের গণ্ডীর দিকে। আমি বসে বসে এইসব নানাকথা ভাবতে লাগলাম। আজকাল ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকলেও আমার অসুবিধা হয় না। নিঃশব্দের সেই অগাধ সমুদ্রে আমি খুঁজে পাই সুর।

আজ এই গুম্ফাতেই রাত কাটাবো বলে ঠিক করলাম। বিশ্রামের এমন উপযুক্ত স্থান আর হতে পারে না। বিকেলের দিকে গ্রামের বিভিন্ন পথ ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলাম। তিব্বতের এই অঞ্চলটা প্রায় মরুভূমির মতো। বাতাস শুকনো আর ঠান্ডা, আকাশের গায়ে একখণ্ড মেঘও নেই, দিনেরবেলা পরিষ্কার নীল, দূরের পাহাড়গুলোর সীমারেখা অতি স্পষ্টভাবে চোখে ধরা দেয়, আর রাতের তারায় ভরা আকাশে চলে আলোর ছোটাছুটি। রাতের আকাশটাকে মনে হয় একটু উঁচুতেই রয়েছে একটা আলোকিত মণ্ডপ।

সন্ধ্যের পর মনে হল পাসাগুক্ গ্রামে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। গ্রামের সবাই মনে হয় দিনেরবেলায় অন্যত্র কোথাও কাজ করতে যায় ফিরে আসে রাত্রিবেলা। আমি এদিক ওদিক একটু ঘুরে ফিরে এলাম গুম্ফাতে। গ্রামের লোকেরা আমাকে কোনরকম জিজ্ঞাসা না করাতে আমি যেন বেঁচে গেলাম।

গুম্ফার চারিদিকে কোন পাঁচিল নেই, ছোট্ট একটা বাড়ী, একটা চৈত্য আর খোলা মাঠ এই নিয়েই তার রাজত্ব। ছোট্ট বাড়ীটা মনে হয় লামাদের জন্য কিন্তু এখন কেউ নেই। আমি তার রান্না ঘরটা খুঁজে বার করলাম। তিব্বতের গুম্ফাগুলো সাধারণতঃ খোলাই থাকে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া তিব্বতীরা তালা-চাবি ব্যবহার করে না। আর গ্রামবাসীদের কথাই আলাদা, তাদের মধ্যে অনেকে তালা-চাবি জীবনে দেখেনি। সততার এমন নিদর্শন জগতে আর আছে কি না সন্দেহ। তিব্বতে গুম্ফার রান্না ঘরগুলো দেখেছি প্রায় বারোয়ারীর মত, সকলের সেখানে অবাধ গতি। আমার প্রয়োজন উনোন আর সামান্য কিছু কাঠ, কয়েকটা রুটি করবো মাত্র। রান্নাঘরটা কাঠের আর ভেতরটা ও বেশ গোছানো। উনোনের ভেতরেই পেলাম কয়েকটা আধপোড়া কাঠ, তাতেই আমার কাজ চলে যাবে। রান্নাঘরের আগুনে ঘরটা বেশী গরম হয়ে উঠেছে। কাঠকয়লার লাল রঙ তীর্থযাত্রীদের অতি প্রিয় বস্তু। ঠিক করলাম এই রান্নাঘরেই রাত কাটিয়ে দেবো।

ভোরবেলা কার ডাকে যেন আমার ঘুম ভাঙ্গলো, কোনরকমে গড়াগড়ি দিয়ে, চোখ রগড়িয়ে উঠে বসলাম। হাই তুলে সামনের দিকে তাকালাম। আমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন সৌম্যমূর্তি একজন লামা। তাকে প্রণাম করে আমি উঠে দাঁড়ালাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কোথা থেকে আসছো?

আমি ভারতীয়, নেপালী তীর্থযাত্রীদের সাথে দ্রেপুং ও লাসায় গিয়েছিলাম, তাদের দল ছেড়ে এখন আমি যাচ্ছি কৈলাসের দিকে।

ভোরবেলা এই দেবতুল্য পুরুষটির সামনে সরাসরি বেরিয়ে এল আমার মনের কথা।

আমার কথা শুনে তিনি একটু হাসলেন, তারপর বললেন—চল আমার ঘরে

সেখানে বসে কথা বলা যাবে। তাকে অনুসরণ করে পাশের ঘরে উঠে এলাম। পরিপাটি করে সাজানো একটি সুন্দর ঘরের কোণে একটা বিছানা পাতা, তার পাশে একটা ডেস্ক, খাতা, কলম, আর একটা অনেক পাতার পুঁথি। দেয়ালের উপর ঝোলানো রয়েছে কয়েকটা তাংখা আর ছোট্ট একটা কুলুংগীর মধ্যে ভগবান তথাগতের একটা কাঠের মূর্তি। তিনি সব কিছু উপেক্ষা করে সরাসরি সেই মূর্তিটার দিকে এগিয়ে গেলেন তারপর সেটাকে হাতে নিয়ে আমাকে দেখিয়ে বললেন—এই দেখো, কলকাতার মহাবোধী সোসাইটি এটা আমাকে উপহার দিয়েছেন; কি সুন্দর হাতের কাজ তাই না? তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কলকাতায় গিয়েছিলেন?

—না, আমি দার্জিলিং ও কালিম্পং-এ অনেক বছর ছিলাম। তিনি আমাকে তার বিছানার পাশে বসতে বললেন তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—

—তুমি যে কলকাতার ছেলে তা লাসা ও সীগাৎসের লোকেরা জানে কি?

—আজ্ঞে না, আমি নেপালী মৌনীবাবা বলেই তাদের কাছে পরিচিত।

তিনি আমার কথা শুনে হাসিতে ফেটে পড়লেন তারপর অনেকটা আশ্বাসের সুরে বললেন—এতদূর যখন এসেই পড়েছো তখন আর ভয় নেই মনে হচ্ছে ভগবান স্বয়ং তোমার ভার নিয়েছেন।

তার ঘরের কোণে রাখা কড়াইয়ের আগুনটাতে কিছুটা কাঠ-কয়লা গুঁজে দিয়ে বললেন—তোমার সাহস আছে বটে। কষ্ট করে যখন এতদূর এসেছো বাকি পথটা আর অসুবিধা হবে না।

লামার বিনয় ও প্রীতি আমাকে স্পর্শ করল। তাঁর স্নেহের স্পর্শে আমি আশ্বস্ত হলাম, আমার ভাঙ্গা তিব্বতী শব্দ আর তাঁর ভাঙ্গা হিন্দী বাংলা মিশিয়ে আমাদের আন্তরিকতার সেতু তৈরী হল। তিনিই এই গুম্ফার সর্বেসর্বা, তাঁর নাম গেশে রেপ্‌তেন, তিব্বতী লামার এক অতি উচ্চ পদবী। গেশে রেপ্‌তেনের বয়স ষাটের কাছাকাছি, এখানে তিনি আছেন পাঁচ বছর যাবৎ। আমি বিনা বাধায় এতদূর কি করে যে এসেছি তাতে তিনি বারবার বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগলেন।

তিনি আমাকে বুঝিয়ে বললেন যে, গুম্ফাগুলোই হচ্ছে তিব্বতের প্রাণ, শিক্ষা ও ধর্মের মূল প্রতিষ্ঠান। আজকাল তারমধ্যে বিভিন্ন রকম রাজনৈতিক জটিলতা এসে গিয়েছে। তাশী লুম্পো থেকে আজকাল রসদ আসা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। গ্রামবাসীদের উপর ভরসা রেখে ও গুম্ফার নিজস্ব মূলধন বিক্রি করে লামাদের চালাতে হচ্ছে। সরকারী আইন দিনদিন পাল্টে যাচ্ছে, চীনা কর্তৃপক্ষ দেশের উন্নতির জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। দেশের যুবকেরা রাস্তাঘাট সেতু নির্মাণের জন্য পাচ্ছে নগদ টাকা, তাই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ছাড়া গুম্ফার দিকে আজকাল কেউ আসতে চায় না। লাসার দিকের গুম্ফাগুলো সে তুলনায় এখনও খুব সজাগ। গেশে রেপ্‌তেনের মতে এদেশে চীনারা ভালোই কাজ করছেন, তাঁরা সমাজের উচ্চস্তরকে এড়িয়ে গিয়ে সরাসরি দেশের জনসাধারণের সাথে হাত মেলাচ্ছেন। নিরক্ষর দেশবাসীরা আজকাল লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করেছে।

সবই ভালো তবে গেশে রেপ্‌তেনের মতে—প্রাণকে বাদ দিয়ে দেহকে নিয়েই এদের কারবার। তিনি সবশেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—ভগবান তথাগতের এটাই হয়তো ইচ্ছা, পৃথিবীর চক্র ঘোরাবার জন্যই তিনি ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি ধর্মরক্ষার জন্য বার বার জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনিও হয়তো পরিবর্তনই চান। সবই তাঁর ইচ্ছে। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—দেশে গিয়েও কি তুমি এই ত্রাবা ব্রত পালন করবে?

—দেশে ফিরে গিয়ে···? আমি আমতা আমতা করে তাঁকে জবাবে বললাম—আজ্ঞে দেশে ফিরে গিয়ে মনে হয় আমি আমার অন্যান্য বাঙালীর মতোই ভালো ছেলে হয়ে ইস্কুলে যাবার চেষ্টা করবো, আমাকে ম্যাট্রিক পাস করতেই হবে।

তিনি আমার কথায় বাধা দিয়ে বললেন—না, আমি সে কথা বলছি না। আমি জিজ্ঞেস করছি—তুমি এখন বৌদ্ধতন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছো—ফিরে গিয়ে এটা কি বজায় রাখবে? তাঁর কথা শুনে আমি একটু চুপ করে গেলাম। একটু চিন্তা করে বললাম—আমি হিন্দুঘরে জন্মেছি, এ পথে আসার জন্যই আমি এ বেশ ধারণ করেছি, ভবিষ্যতের কথা কি করে বলি বলুন। তবে এটা ঠিক যে এ বেশে আমি আমার বাড়ীতে ফিরে গেলে অকারণে অসুবিধায় পড়ব। তিনি বেদীর জলপাত্রগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করতে বললেন। আমি তাঁর কথামত কাজ করতে লাগলাম। হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি হিন্দু তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, জবাব দিলাম।

—হিন্দুধর্মের তুমি কি জান?

তাঁর প্রশ্ন শুনে আমি থেমে গেলাম, কি উত্তর দেবো জানি না। তিনি এবার জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কোন মন্ত্র জান?

—আজ্ঞে হ্যাঁ অনেক মন্ত্র আমি জানি, এমন কি ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র ও ত্রি-সন্ধ্যা জপ আমার মুখস্থ। শুনুন—ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ভার্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওম।

তিনি এবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—শুধু মুখস্থ করলেই তো চলে না তাকে বুঝতে হয় অনুভব করতে হয়। অনুভব আর উপলব্ধি করার জন্যই আমাদের এই মানব-জন্ম, তাকে কাজে লাগাতে হবে।

মন্দিরের কাজ সেরে আমরা এলাম গেশে রেপ্‌তেনের ঘরে। বাড়ীর সামনেই দু'জন অপেক্ষা করছিলেন। তারাই গেশে রেপ্‌তেনের জন্য বাজার-হাট ও রান্না-বান্না করেন। তাদের যথাযথ উপদেশ দিয়ে তিনি আমাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ঘরের মধ্যেও ছিল একটা গুপ্তঘর সেই ঘরটার কোন জানালা দরজা নেই, সেখানে তিনি আমাকে নিয়ে ঢুকলেন। একটি প্রদীপ জ্বেলে তিনি আমাকে বললেন—তুমি এখানে থাক ভালো করে চারিদিকের ছবিগুলো দেখো। আমি আসছি—পরে কথা হবে। তিনি আমাকে প্রদীপটা হাতে দিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা টেনে দিলেন। তাঁর ওপর আমার আস্থা না থাকলে

নিশ্চয়ই আমি নিজেকে বন্দী বলে ধরে নিতাম। মনে অবশ্য সামান্য সন্দেহ দেখা দিয়েছিল কিন্তু যুক্তি দিয়ে তাকে দূরে সরিয়ে দিলাম।

ঘরটা অদ্ভুত, দিনের আলো এতটুকুও প্রবেশ করতে পারে না। প্রদীপের আলোয় প্রথমেই চোখে পড়ল যমন্তকের একটি বিরাট স্ট্যাচু, মানুষ সমান এই স্ট্যাচুটার ভয়ংকর মূর্তিটা মনে হচ্ছে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। যমন্তকের ন'টা মাথা, চৌত্রিশটা হাত, ষোলটা পা, মাথাটা অনেকটা মহিষাসুরের মত, উগ্র লাল নীল আর সাদার উপর অদ্ভুত এই মূর্তি। প্রথম দৃষ্টিতে যে কেউ ভয়ে চীৎকার করে উঠবে। সেই স্ট্যাচুটার পেছনের চালে চিত্রিত করা রয়েছে আরও পঞ্চাশটি নরমুণ্ড। গোলাকার চালচিত্রটির চারদিকে লাল রঙের আগুনের শিখা। আমাদের শ্মশানকালী এর তুলনায় সত্যি শান্ত। যমরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করে যমন্তক হয়েছে মৃত্যুর রাজা। মনকে বার বার সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—ভয় পাসনি এটা নেহাৎই মাটি ও কাঠের একটা মূর্তি—এর মধ্যে প্রাণ থাকলে কিছুতেই তিব্বতের এই অজানা গুম্ফার একটা ঘরের কোণে ইনি বন্দী হয়ে থাকতেন না। ঘরের মধ্যে এই একটাই স্ট্যাচু, বাকিগুলো সব কাপড়ের উপর জলরঙা বিরাট বিরাট ছবি স্থানীয় কথায় যাকে বলে তাংখা।

ল্হাসা থেকে এ পর্যন্ত আমি একা একাই চলছি, আগের চেয়ে এখন মন আমার আরও বেশী শক্ত হয়ে পড়েছে, রাত্রির অন্ধকারে আমি এখন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। তাই এই হঠাৎ অন্ধ-কুঠিতে ঢুকেও আমার হার্টফেল হয়নি। আমার এখন মরলে চলবে না, যেতে হবে আরও অনেক দূর, কৈলাসে পৌঁছবার আগে আমার মরা চলবে না। রাতের অন্ধকারে আসে ভয়, অন্ধকারে নিজেকে হারানোর ভয় থাকে, আর দিনের আলোয় নিজের সত্তা দিয়ে সে ভয় করি দূর। আমি জানি যে গা ছমছম্ করা এই ঘরটির বাইরে আছে বিরাট এক আলোর দুনিয়া, আমি সে দুনিয়ার মানুষ কাজেই ভয় কিসের?

প্রদীপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি দেখতে লাগলাম—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভয়ংকর আর শান্তরূপের চিত্রগুলো। হঠাৎ মনে হল কে যেন আমার কাঁধে হাত বুলিয়ে দিল বুকটা অকারণেই ধক্ করে উঠল, প্রদীপটা হঠাৎ যেন কেঁপে উঠল। কে যেন মনে হল আমার পায়ের উপর দিয়ে আলগোছে হেঁটে চলে গেল—চেষ্টা সত্ত্বেও মনে হচ্ছে ভয় আমার শরীরকে অবশ করে দিতে চাইছে। মনকে আরও সংযত করার চেষ্টা করলাম। প্রদীপটা মাটিতে রেখে বসে পড়লাম সেখানে—মনে মনে স্মরণ করলাম—মুক্তিদায়িণী মা কালীর রূপকে আর মুখে আপনা থেকেই যেন উচ্চারিত হয়ে উঠল—ওম্ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ··· ।

গায়ত্রীর মন্ত্রে ঘরটা মনে হয় ঝংকারিত হয়ে উঠল। আমি বারবার আবৃত্তি করতে লাগলাম অভয়মন্ত্র, তারপর ধীরে ধীরে সেই বর্হিমন্ত্রকে অন্তর্মুখী করলাম। বাতাসের পরিবর্তে সেই মন্ত্র ধ্বনিত হতে লাগল আমার হৃদয়চক্রে··· । তারপর এক সময় সব শব্দ আর প্রতিধ্বনি সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেল—আমি পড়ে রইলাম এক নিঃশব্দ জগতে।

অনেকক্ষণ পর আমি চোখ খুললাম। সুখ নিদ্রার পর আমার যেন ঘুম ভাঙল, সামনে তাংখাটা চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠল। ঘরটা আলোয় যেন ভরে উঠেছে, সামনে প্রদীপের উপর নজর পড়তেই দেখি সেটা নিভে গিয়েছে। আমার অবাক হবার পালা, না অবাক হবার কোন কারণ নেই, ঘরের দরজাটা খোলা তারই ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়েছে পড়ন্ত সূর্যের আলো। আমি ঘর থেকে উঠে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। সূর্যের রাঙা আলোয় সমস্ত দেহটা যেন স্নান করে উঠল। শরীরটা খুব হালকা ও ঝরঝরে হয়ে উঠেছে। আমার পাশেই নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছেন সেই আগের দেখা লোকটি, আমাকে বিনীতভাবে নিবেদন করলেন—আপনার খাবার তৈরী।

সময়টা এত তাড়াতাড়ি কি করে যে কেটে গেল বুঝতে পারলাম না, আমি প্রায় রোজই ধ্যানে ঘণ্টাখানেক বসে থাকি, কিন্তু আজকে মনে হয় ছ'থেকে আট ঘণ্টার মতো আমি একাসনে বসে ছিলাম। সময়টা যে কিভাবে কেটে গেল আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। সকালে ঘরে ঢুকেছিলাম ধ্যানভঙ্গে দেখি বিকেল। অনেকক্ষণ বসে থাকলে সাধারণতঃ আমার পাদু'ট আড়ষ্ট হয়ে যায়, আজকে সেটাও হয়নি। শরীরটা এত হালকা হয়ে উঠেছে যে নিজের কাছেই সেটা আশ্চর্য লাগছে। এটা যেন এক অবিশ্বাস্য সত্য। মনের মধ্যে হঠাৎ যেন এক আনন্দের জোয়ার বইছে। সেই জোয়ারে নেই কোন ঢেউ—নেই স্রোত, শুধু পরিপূর্ণতা। আহা! একি আনন্দ। এরই নাম কি উপলব্ধি!

সন্ধ্যের কাছাকাছি আমি লামার ঘরে এসে বসলাম। তিনি আমাকে দেখে একটু মৃদু হাসলেন। তাঁর সেই হাসির সাথে আমি পেলাম আশীর্বাদ। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর আমিই প্রথম কথা বললাম—আমি এতক্ষণ একাসনে বসেছিলাম সেটা নিজেরই ভাবতে আশ্চর্য লাগছে, এটা কি স্থান মাহাত্ম্যের জন্য সম্ভব হয়েছে?

—স্থান মাহাত্ম্য! তিনি কথাটা উচ্চারণ করলেন তারপর একটু থেমে বললেন—গুরু কৃপা আর অভ্যাস। তারপর তিনি থামলেন, অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর তিনি অনেকটা স্বগোক্তি করে বললেন—ভয় পেয়েছিলে! যমন্তকের সামনে শুধু তুমি কেন জগতের সবাই থরথর করে কাঁপে। এই জগৎ যমন্তকের করাল গ্রাসে আচ্ছাদিত শুধু তথাগতই একমাত্র ত্রাণকর্তা। ভয়ের সাথে যুদ্ধ না করে তুমি আত্মসমর্পণ করেছো মহামায়ার শ্রীচরণে, তোমাকে তিনি রক্ষা করেছেন।

অন্য সময় হলে হয়তো আমার মনের মধ্যে হাজার প্রশ্ন এসে ভিড় করতো কিন্তু আজ আমার সামনে মনে হয় কোনো প্রশ্নই নেই। লামা উঠলেন, কড়াইয়ের আগুনে কিছু কাঠকয়লা যোগ করে তার উপর কয়েকটা ছোট গন্ধ কাঠ দিয়ে আবার এসে বসলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত ঘরটা সুন্দর গন্ধে ভরে উঠল। বিছানায় বসে তিনি একটা ভারী বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললেন—তুমি দীক্ষা নিয়েছো, চেন্-রে-জি দর্শন করেছো, জোখাং মন্দিরে পূজো দিয়েছো, তুমি এখন সত্যিকারের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।

—সত্যি কথা কিন্তু বিশ্বাস করুন লামা তন্ত্রের আমি কিছুই জানি না। তিব্বতে আসার জন্যই আমি এই ব্রত ধারণ করেছি আমার প্রস্তুতি একদম ছিল না।

আমার কথা শুনে তিনি 'হুম্' করে একটা শব্দ করলেন মাত্র। তারপর আবার চুপচাপ। ইতিমধ্যে দিনের আলো প্রায় নিভে এসেছে। কুলঙ্গির প্রদীপের আলো আস্তে আস্তে তার প্রভাব বিস্তার করে সম্পূর্ণ ঘরটাকে অধিকার করে বসেছে। সেই আলোকে আমি দেখতে লাগলাম লামার অর্ধালোকিত মুখ। ভাবটা পরিপূর্ণ। মুখের উপর শান্তি ও পবিত্রতার রূপ ফুটে উঠেছে। আমরা অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম। তিনিই নীরবতা ভঙ্গ করলেন—

বৌদ্ধতন্ত্র বা লামা ধর্ম সম্পর্কে যাঁরা পড়াশুনা করেন, তাঁদের বহু বছর লাগে এই ধর্মটাকে হৃদয়ঙ্গম করতে, তার পরেও বহু বছর লাগে তপস্যা ও সাধনার মাধ্যমে তাকে উপলব্ধি করতে। পূর্বজন্মের সাধনা বা গুরু কৃপা না হলে একই জন্মে বৌদ্ধ ধর্ম ও তন্ত্রের বিষয় অবগত হওয়া অসম্ভব। এ পথ বড় দুর্গম পথ। হিন্দুধর্মে ভক্তি বলে একটা মার্গ আছে যেখানে মনপ্রাণ সঁপে দিলেই ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভব। কিন্তু আমাদের এখানে তার কোন অস্তিত্ব নেই—এখানে সবই সাধনালব্ধ। ধ্যান-ধারণা, যোগ, তপস্যার বিরাট সাধনা করে তারপর লাভ করতে হয় নির্বাণের পথ সে পথ সত্যই কঠিন।

আমি ভাবতে লাগলাম এই তিব্বতের কঠিন পথ যে পথে আমি চলেছি। তিনি বলছেন সাধনার কঠিন পথ আর আমি ভাবছি তিব্বতের পার্বত্যসংকুল ও ঠাণ্ডা বাতাসের পথ।

লামা আবার শুরু করলেন—তিব্বতের ধর্মটাই এসেছে মূলতঃ ভারত থেকে। মহাযোগী গুরু পদ্ম সম্ভবা আর মহা দার্শনিক শান্ত রক্ষিত তাঁরাই আমাদের আদিগুরু। তিব্বতের বৌদ্ধ তন্ত্রের মূল উৎস হচ্ছে মহাযান, বজ্রযান আর প্রাচীন তন্ত্রযান।

আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগতেই আমি সরাসরি তা ব্যক্ত করলাম—মণ্ডলা জিনিসটা কি ? তিব্বতের সব জায়গায়ই তার ছড়াছড়ি এর সম্পর্কে কিছু বলবেন কি ?

তিনি মাথাটা অনেকক্ষণ ধরে ঝুঁকিয়ে নিয়ে বললেন—ঠিক্-ঠিক্ তাহলে শোনো—

মণ্ডলা সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান না থাকলে সেটাকে মনে হবে নেহাৎ জ্যামিতির চিত্র ও বিভিন্ন আকারের ছবি ; কিন্তু একটু গভীরে গেলেই বোঝা যাবে এর প্রকৃত অর্থ। মণ্ডলা হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। পঞ্চভূতের প্রতিভূ হিসেবে তিব্বতে ছড়িয়ে আছে হাজার হাজার বিভিন্ন আকারের স্তূপ। পঞ্চভূতের মূর্তিস্বরূপ হচ্ছে এই মণ্ডলা। মণ্ডলা হচ্ছে মানুষের চিন্তার প্রথম রূপ, তারপর সেই রূপকেই কেন্দ্র গড়ে তোলা হয় সাধনার মন্দির।

লামা কিছুক্ষণ থামলেন তারপর আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে বারান্দার দিকে এগিয়ে গেলেন, সেখান থেকে তিনি আমাকে ইসারায় ডাকলেন। তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। তিনি বহুদূরের একটা পাহাড় দেখিয়ে বললেন—ওটা কি দেখছো। সূর্যাস্তের পর অতি অল্প রাঙা আলোয় আমি দেখতে পেলাম অস্পষ্ট একটা পাহাড়, মনে হয়

তিনি সেদিকেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম—একটা পাহাড়।

—হ্যাঁ ঠিক পাহাড়ই বটে। একটা বাড়ী করতে হলে চাই শক্ত ভিত, তার উপর গড়ে উঠে সুন্দর বাড়ী। ভিতই হচ্ছে বাড়ীর মণ্ডলা। আর পাহাড়টার মূলেও আছে একটা বিরাট অচিন্তনীয় ভিত্তি—সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে এই বিশাল প্রস্তরভূমি। পাহাড়ের যে আদি ভূমি যার উপর সে দাঁড়িয়ে আছে সেটাই হচ্ছে পাহাড়ের মণ্ডলা। মণ্ডলা যত শক্ত হবে তার উপর গড়ে উঠবে তত শক্ত জিনিস। চিন্তা—ইচ্ছাশক্তিরই এক রূপ। চিন্তাশক্তির উপর নির্ভর করে যাবতীয় কার্য অর্থাৎ ক্রিয়া। পরিকল্পনা ঠিকভাবে না হলে ভবিষ্যতে বিরাট কিছু করা সম্ভব নয়।

তিনি এবার বারান্দা থেকে একটু ঝুঁকে নীচের দিকে মুখ করে ডাকলেন—মু-ম্-বু। তাঁর ডাকের সাথে সাথেই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এল মু-ম্-বু। সেই আগের পরিচিত ভদ্রলোক, মু-ম্-বু'কে তিনি একটু চা করতে বললেন। তারপর আবার আমরা ফিরে এলাম ঘরে। রাতের ঠাণ্ডা ইতিমধ্যেই হাড় কাঁপাতে শুরু করেছে। আগুনের কড়াইটাকে বিছানার উপর তুলে নিয়ে তিনি আমাকে তারই পাশে বসতে বললেন। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—মণ্ডলা সম্পর্কে আরও কিছু শুনতে চাও ?

—অবশ্যই, আপনি এত সহজভাবে কঠিন তত্ত্বটাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন—সত্যি আমি ভাবতেই পারছি না। আমি তো ভেবেছিলাম মণ্ডলা কথাটার অর্থ জানতে হলে আমাকে অন্ততঃ বছরখানেক পড়াশুনা করতে হবে। আপনি আরও বলুন আমি শুনবো, আপনার মত জ্ঞানীগুরুর সাক্ষাৎ পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়।

তিনি আমার কথার উপর কোনরকম মন্তব্য না করে আবার শুরু করলেন—মণ্ডলা সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞানলাভ করতে হলে তন্ত্র সাধনার প্রয়োজন। মণ্ডলার আদি উৎস হচ্ছে তন্ত্র। তন্ত্র সাধনার সাথে সাথে মন গড়ে উঠে। মন ঠিকমতো গঠিত হলে চিন্তাধারা ঠিকপথে গতি নেয়। সেই গতির সাথে খাপ খাইয়ে মণ্ডলার জ্ঞান আসে।

—তন্ত্র বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন, আমি এর কিছুই বুঝি না।

—তিব্বতে তন্ত্রর মানে হচ্ছে জগৎ-রহস্য জানা, দেহের রহস্য জানা, জন্ম-মৃত্যুর রহস্য জানা। তন্ত্র-মন্ত্র যারা গ্রহণ করে তাদের চার অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে সাধনা করতে হয়।

প্রথম অধ্যায়কে বলে (১) বিয়ার্ গীউদ্ বা ক্রিয়াতন্ত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়কে বলে (২) পীয়র্ গীউদ্ বা কার্যতন্ত্র

তৃতীয় অধ্যায়কে বলে (৩) নাল-বীয়র্ গীউদ্ বা যোগতন্ত্র

চতুর্থ অধ্যায়কে বলে (৪) লা-না মেদ্ গীউদ্ বা অনুত্তরা যোগতন্ত্র।

ক্রিয়াতন্ত্রে বিভিন্ন ধরনের বাহ্য অনুষ্ঠান-পূজা ও দীক্ষার প্রয়োজন।

কার্যতন্ত্রে আরও বেশী পূজা অর্চনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজন এবং ধারণা ও ধ্যানের সাধনা করতে হয়, সেই সাথে সাথে শিখতে হয় মন্ত্র ও তার ব্যাখ্যা।

যোগতন্ত্রের পথ আরও কঠিন। এই সময় যোগ তপস্যা ও বিভিন্ন সংস্কারের উর্ধ্বে যাবার সাধনা করতে হয়। নির্বাণ লাভের উপায় ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়।

অনুত্তরা যোগতন্ত্র হচ্ছে সাধকের চরম ও শেষ পরীক্ষা। মন শুদ্ধ ও মুক্ত হয়ে এই অধ্যায়ে সাধক নির্বাণ লাভের যোগ্যতা অর্জন করেন।

চিত্তের সর্বপ্রকার চাঞ্চল্য দূরে সরে গিয়ে সাধক শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হন।

সাধক যখন ক্রিয়া, কার্য, যোগ ও অনুত্তরার সব পরীক্ষায় সফল হয়ে সাধনার শীর্ষে উত্তীর্ণ হন সেই সময় মণ্ডলার সব রকম ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য তার কাছে সহজ হয়ে উঠে এবং তন্ত্র রহস্যের সব দ্বারও যায় খুলে।

কাজেই বুঝতে পারছো যে, মণ্ডলা হচ্ছে তন্ত্রের রহস্য জাল, তন্ত্রের চাবিকাঠি এই মণ্ডলার রঙ ও ছকের মধ্যে বদ্ধ থাকে।

মণ্ডলার অঙ্কন বা চিত্র করার সাথে সাথে সন্ন্যাসীর মন নিবিষ্ট হয় সেই কেন্দ্রে, দিনের-পর দিন সে ছক রঙ ও মুদ্রার মধ্যে তার মনকে নিবিষ্ট চিত্তে আকৃষ্ট করে রাখে।

শুরু হয় মণ্ডলার আকৃতি দিয়ে, পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর দক্ষিণ এই চারদিকের চার দরজা। প্রত্যেক দরজায় চিত্রিত করা হয় তার উপযুক্ত রক্ষী। গুণ ও দিক বিশেষে আরোপ করা হয় রঙ, যেমন—পূর্বদিকে সাদা, পশ্চিমে লাল, উত্তরে সবুজ আর দক্ষিণে হলুদ। পূর্বের রক্ষী বিজয়া, পশ্চিমে হয়গ্রীবা, উত্তরে অমৃতধারা আর দক্ষিণের যমন্তক।

চার দরজা আমাদের জীবনের চার সীমা। পূর্বে জন্ম ও মৃত্যু, পশ্চিমে হাওয়া, উত্তরে আবির্ভাব ও শূন্যতা, দক্ষিণে অমৃত ও চিরনির্বাণ। বিজয়ার হাতে অঙ্কুশ, হয়গ্রীবার হাতে বজ্রশৃঙ্খল, অমৃতধারা কিঙ্কিণীধারি আর যমন্তকের হাতে পাশা।

সাদা—অচিন্ত্যনীয়র প্রতীক; লাল—ডিম্বজাতকের প্রতীক; সবুজ—শ্যামল ও উত্তাপের প্রতীক; হলুদ—জননীর প্রতীক।

লামা এবারে থামলেন। আমি খুব মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথাগুলো শুনতে লাগলাম। এবারে তিনি অনেকক্ষণ মৌন রইলেন। তাঁর কথাগুলোকে আমি নিজের মনে গুছিয়ে নেবার সময় পেলাম। অদূরে রক্ষিত হ্যারিকেনের চিমনিটা মনে হয় অনেকদিন যাবৎ পরিষ্কার করা হয়নি। কোন রকমে আত্মপ্রকাশ করে আছে মাত্র। প্রদীপের আলোতেই আমাদের কাজ চলছে। জানালা দরজা বন্ধ চারদিক নিঃশব্দ। পৃথিবীর এক অজানা কোণে মুখোমুখি বসে আছি এক বিরাট জ্ঞানী গুরুর সামনে। তিনি উজাড় করে দিচ্ছেন তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার আমি নিতে পারছি কৈ?

তিনি এইবার উঠে গিয়ে একটা সুন্দর কাঠের কাজ করা বাক্স খুললেন তার ভেতর থেকে একটা ফুলস্কেপ কাগজ আর একটা পেন্সিল বার করে আমাকে দিয়ে বললেন—তোমার হয়তো সব মনে থাকবে না লিখে রাখো।

তিনি তারপর দরজাটা খুলে দিলেন পরে মুম্বু ভেতরে ঢুকে আমাদের সামনে দুটো বাটিতে করে সুজি আর মাখন চা রেখে যেমন এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

হাজার রকমের মণ্ডলা আছে, প্রত্যেক জ্ঞানী লামা তার মনের গতি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অনুসারে মণ্ডলা অঙ্কন করতে পারেন। তবে যে যে রকম মণ্ডলাই তৈরী করুক না কেন তাকে পাঁচটা বিষয়ে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে, সেই পাঁচটা বিষয়ই হচ্ছে মণ্ডলার মূল শিক্ষা।

প্রত্যেকটি মণ্ডলার নিজস্ব নাম ও বৈশিষ্ট্য আছে—ঐতিহ্যকে স্বীকৃতি দিতেই হবে। মণ্ডলার পাঁচ বৈশিষ্ট্য—বৈরচনা, বজ্রসত্ব অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভবা, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি। মণ্ডলার মধ্যে বৈরচনার স্থান মধ্যে, বজ্রসত্ব অক্ষোভ্যর স্থান পূর্বে, রত্নসম্ভার স্থান দক্ষিণে, অমিতাভের স্থান পশ্চিমে আর অমোঘসিদ্ধির স্থান উত্তরে।

বীজমন্ত্র চিত্রণের সময় মন-প্রাণ সঁপে দিত হবে মন্ত্রের উপর। শুদ্ধচিত্তে প্রথমে উচ্চারণ করতে হবে বীজমন্ত্র তারপর মণ্ডলার উপর তাকে স্থাপন করতে হবে। গুরু এই সময় বার বার করে সন্ন্যাসীকে চিত্রণের উপর নজর রাখতে নির্দেশ দেন। বৈরচনার বীজমন্ত্র ওম্; বজ্রসত্ব অক্ষোভ্যের হুম্; রত্নসম্ভবার ত্রম্; অমিতাভের হ্রীঃ; অমোঘসিদ্ধির আঃ। তাদের পরিবার যথাক্রমে মোহ, দ্বেষ, চিন্তামণি, রাগ ও সময়, তাদের রং যথাক্রমে সাদা, নীল, হলুদ, লাল আর সবুজ।

বৈরচনার মুদ্রা ধর্মচক্র, বজ্রসত্ব অক্ষোভ্যের মুদ্রা ভূমিস্পর্শ, রত্নসম্ভবার মুদ্রা বরদা, অমিতাভের মুদ্রা ধ্যান, আর অমোঘসিদ্ধির মুদ্রা অভয়।

বৈরচনার বাহন সিংহ, বজ্রসত্ব অক্ষোভ্যের বাহন হস্তী, রত্নসম্ভবার ঘোড়া, অমিতাভের ময়ূর আর অমোঘসিদ্ধির গরুড়।

বৈরচনার ভূত আকাশ, বজ্রসত্ব অক্ষোভ্যের ভূত জল, রত্নসম্ভবার ভূত মাটি, অমিতাভের ভূত অগ্নি, অমোঘসিদ্ধির ভূত বাতাস।

মণ্ডলা তৈরীর সময় তাদের স্থান কাল পাত্র জাতি বালী স্কন্ধ ধাতু বর্ণ নক্ষত্র সব কিছুকে বিচার করতে হয়। কোন গুম্ফা নির্মাণের পূর্বে তার ভিত্তি তৈরী হয় মণ্ডলাকারে আর সেই ভিত্তির মূলেও থাকে আর এক পরম ভিত্তি। পণ্ডিত লামারা প্রত্যেকটি বিষয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে তারপর আকার ও প্রকৃতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মণ্ডলা বিচার ও তার স্বরূপ জানা জ্ঞানীগুরু ছাড়া সম্ভব নয়। গুম্ফা ও স্তূপ থেকে আরম্ভ করে পাহাড় নদী পৃথিবী চন্দ্র সূর্য সব কিছুর মূলেই রয়েছে মণ্ডলা। মণ্ডলা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা মানে এই পৃথিবীর মূল রহস্য জানা।

আমরা চায়ের বাটিতে চুমুক দিলাম। চায়ের সাথে মাখনের সুমিষ্ট গন্ধে ঘরটা যেন ভরে গেছে। জ্ঞানীগুরু লামা বাটিতে বিরাট শব্দ করে চুমুক দিলেন তারপর ঠোঁটের উপর মাখনের প্রলেপটাকে জিভ দিয়ে চেটে পরিষ্কার করতে করতে হঠাৎ থেমে পড়লেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—

পুষ্প-ধূপ-দীপ অর্পণ করেই আমাদের কাজ শেষ করলে চলবে না এর মানে বুঝতে হবে। পুষ্প আসলে আমাদের অতীত চিন্তার ফল স্বরূপ, অতীত চিন্তার ফল স্বরূপ কথাটা ভেবে দেখো, বুঝবার চেষ্টা কর।

ধূপ হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ চিন্তার প্রতীক, ধূপ পুড়ে গন্ধ দিচ্ছে। আমাদের চিন্তা যেন কাজে লাগে এমন ভাবে চিন্তা করতে হবে। গন্ধ ভবিষ্যৎ চিন্তার প্রতীক।

দীপ হচ্ছে অনন্ত চিন্তার অনন্ত স্রোত।

এসব যদি আর্য তারা অথবা শ্রীদেবীর চরণে সঁপে দেওয়া যায় তাহলে রইলটা কি? আনন্দ আর নির্বাণ লাভের পথ কে বন্ধ করবে?

তিনি আমার দিকে প্রশ্নটা যেন ছুঁড়ে দিলেন। তারপর অনেকক্ষণ ধরে আমরা বসে রইলাম, আমি তাঁর কথাগুলোর যতটা সম্ভব তাৎপর্য অনুভব করার চেষ্টা করতে লাগলাম। আমি নিজেকে একটু সংযত করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আমার তো কোনো তপস্যাই নেই সাধনাও কিছু করিনি তবুও তো সব পাচ্ছি এর কারণ কি বলতে পারেন?

খুব সোজা, অনেকে গাছ পোঁতে ফলের আশায় আবার অনেকে গাছ না পুঁতেই ফল পায়। কর্ম আমরা করি আর কর্মফলেই জন্মগ্রহণ করি। এ জীবন গত জীবনের ফল স্বরূপ আর এ জীবনে যা করছি সেটাই পাব ভবিষ্যতে।

এরপর তিনি হঠাৎ শুরু করলেন মণ্ডলার আরও গভীর তত্ত্ব তার কিছুটা বুঝতে পারলেও অধিকাংশই রইল আমার জ্ঞানের বাইরে। আমি যতদূর পারলাম লিখে নিলাম। ডাকিনী, রং, কোন্ হাতে কি ধারণ করে আছেন, মণ্ডলার কোথায় তার স্থান, কেন ও কি ইত্যাদি ইত্যাদি। ডাকিনীর অনেক নাম যেমন—গৌরী, বিতালী, ঘাসমরী, পুক্কশী, শবরী, চণ্ডালী, ডম্বী ইত্যাদি, তাদের রং যথাক্রমে কালো, লাল, সবুজ, নীল, সাদা, নীল ডম্বী সবুজ। মণ্ডলায় গৌরীর স্থান মধ্যে, বিতালীর স্থান পশ্চিমে, ঘাসমরীর স্থান উত্তরে, পুক্কশীর স্থান উত্তর-পূর্বে, শবরীর স্থান দক্ষিণ-পূর্বে, চণ্ডালীর স্থান দক্ষিণ-পশ্চিমে, এবং ডম্বীর স্থান উত্তর-পশ্চিমে।

জ্ঞানীগুরু এই লামার জ্ঞানভাণ্ডার অফুরন্ত তিনি এরপর বলতে লাগলেন—শূন্য ও মহাশূন্য তত্ত্ব, তারপর চেন্-রে-জী। তার মুখ নিঃসৃত অমৃত বাণী বুঝতে হলে আমাকে লামা ও তন্ত্র শাস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। আমি বুঝতে পারছি কি না অথবা আমার সেদিকে ঝোঁক আছে কি না তার দিকে তিনি ভ্রুক্ষেপ না করে সমানে থেমে থেমে বলে যেতে লাগলেন তন্ত্র শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য।

আমি তাঁর কথা শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তার ঠিক নেই। ঘুম ভাঙ্গলো পরেরদিন খুব ভোরে, চোখ খুলতেই দেখি আমি লামার বিছানার অর্ধেক জুড়ে কম্বল জড়িয়ে শুয়ে আছি আর লামা বিছানার অর্ধেকাংশে পা গুটিয়ে দ' হয়ে শুয়ে আছেন। আমার গায়ের উপর কম্বলটা তিনিই মনে হয় ছড়িয়ে দিয়েছেন। আমি উঠে আস্তে আস্তে নীচে নেমে এলাম, তারপর মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা সেরে গুম্ফার প্রার্থনা চক্রগুলো ঘোরাতে লাগলাম। সেই সময়েই নজরে পড়ল গ্রামবাসীরা সবাই দল বেঁধে কোথায় যেন যাচ্ছে। ঠিক যেমন দেখেছি সাঁওতাল পল্লী থেকে সাঁওতালীরা যায় বর্ধিষ্ণু গ্রামের দিকে কাজের আশায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লামাজী উঠলেন। আমি তাঁকে প্রণাম করে বললাম—এবার আমাকে যেতে হবে। তিনি আমার মাথাটা তাঁর কাছে টেনে সস্নেহে বললেন—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। সাবধানে যেও।

তারপর তিনি আমাকে খুব মূল্যবান কয়েকটি উপদেশ দিলেন, তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, মানস সরোবরের স্থানীয় নাম ৎসো মাফাম্। থোক্‌চেন হচ্ছে কাছাকাছি সবচেয়ে বড় শহর। এই রাস্তাটাই সরাসরি আমাকে নিয়ে যাবে সেই মহাতীর্থে। সাধারণ তীর্থযাত্রীরা সবাই মানস সরোবর পরিক্রমা করেন তবে লামার মতে এই সময় পরিক্রমা না করাই ভালো, দর্শন ও স্পর্শেই তার পূর্ণ ফল পাওয়া যাবে।

বার বার সতর্ক করে দিয়ে তিনি আরও বললেন—তুমি মানস সরোবরের নাম একদম উচ্চারণ করবে না, ৎসো মাফাম্-এর আশপাশের যাযাবররা এই সরোবরকে ৎসো মাভাং বলে অভিহিত করে। ৎসো মাফাম্-এর দক্ষিণ দিকের গুম্ফাগুলোতে না গিয়ে উত্তরের গুম্ফাগুলোতেই থাকবে।

ইতিমধ্যে মুম্‌বু চা ও কিছু আলুসেদ্ধ নিয়ে এল। চা এখানকার জন্য আর আলুসেদ্ধটা রাস্তার জন্য। চা খাবার সময় লামা একটা চিঠি লিখে আমাকে দিলেন। ৎসো মাফাম-এর উত্তরে লাঙবোনা (Langbona) আর কৈলাসের উত্তরে দিরফুক্ (Diraphuk) নামে দুটো গুম্ফা আছে, গুম্ফার অধ্যক্ষকে এই চিঠিটা দিলেই তিনি আমার জন্য যা করণীয় সব করে দেবেন। আমার এই অজানা দেশে এরকম একটা চিঠি পরম সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করলাম। লামার এই উপকারের কথা আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না। শুধু আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েই তাঁর এই উপদেশ ও উপকারের শোধ দেওয়া সম্ভব নয়। সূর্যদেবকে পেছনে রেখে আমি বেরিয়ে পড়লাম। আবার পথ।

ত্রাদুম্

পাসাগুকের পর থেকে পথটা যেন হঠাৎ আমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো, পাসাগুকের মঠ ছাড়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দেখতে পেলাম সাংপোর ধারে জমায়েৎ হয়েছে অসংখ্য লোক, প্রায় শ'খানেক খাঁকি রঙের তাঁবু আর ডজনখানেক জীপ ও লরী ঠিক রাস্তার উপরই দাঁড় করানো রয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম এটা একটা মিলিটারী ক্যাম্প, অতএব এড়ানোই ভালো। বুঝতে পারলাম যে এখানেই পাসাগুকের লোকেরা আসছে কাজের চেষ্টায়, হয়তো রাস্তা মেরামত বা ঐ ধরনের কোন বিরাট সরকারি কাজের পরিকল্পনা চলছে।

যতটা সম্ভব মিলিটারী পোশাককে এড়িয়ে চলাই মঙ্গল। তাই রাস্তা ছেড়ে আমি নেমে পড়লাম ডানদিকের পাথুরে জমিতে। নদীকে পেছনে রেখে সরাসরি এগিয়ে চললাম উত্তর দিকে, উদ্দেশ্য নদীর সাথে প্রায় পঁয়ত্রিশ চল্লিশ ডিগ্রি কোণ রেখে আবার ফিরে আসা। পাথুরে মাটির উপর দিয়ে হাঁটা অনেকটা খালি পায়ে সদ্য কাটা ধান ক্ষেতের ওপর দিয়ে হাঁটার মতো—পায়ের অবস্থা সত্যিই সঙ্গীন হয়ে উঠছে তবুও হেঁটে চলেছিলাম কিন্তু এর পরের পদক্ষেপে আমি থামতে বাধ্য হলাম। ছোট্ট একটি খরস্রোতা নদী আমার সাথে খেলবার জন্য হঠাৎ যেন এসে হাজির হল। একটি পাহাড়ী ছোট্ট মেয়ের মতোই সে যেন খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

খরস্রোতা এই নদীটা দেখেই প্রথমে মনে হয়েছিল একটা বিরাট বাধা। নীচে রয়েছে চীনাদের শিবির, নদীপথের বুঝি এখানেই শেষ। মনকে একটু সংযত করতেই নদীর অন্য রূপ দেখতে পেলাম। খরস্রোতা নদীটির কলকল শব্দকে মনে হল ছোট একটি পাহাড়ী মেয়ের হাসির শব্দ। শুদ্ধ নির্মল জল মেয়েটির নিষ্কলঙ্ক পবিত্র চরিত্রের প্রতীক আর সেই স্বচ্ছ জলের তলায় আর তীরের ছোট ছোট গোল পাথরের সদাচঞ্চল নুড়িগুলো নিয়ে মেয়েটি যেন খেলা করছে। মেয়েটি আনন্দ উচ্ছ্বাসে তার এই অনন্ত খেলায় মত্ত হয়ে আছে। মনে হচ্ছে এটাই একটা জীবনের উৎস। ছোট্ট অবস্থায় সে সহজ ও সরল ভাব নিয়ে খেলায় মত্ত থাকে তারপর যতই এগিয়ে চলে জীবনের স্রোত ততই তার মধ্যে দেখা যায় জটিলতা। স্ফটিকস্বচ্ছ জল হয়ে উঠে ঘোলাটে আর তারই মধ্যে দেখা যায় যৌবনের লীলা। পাথরের নুড়িগুলো ছেড়ে নদী তখন রূপ নেয় গর্ভবতী মাতৃরূপে। কত জীব তাতে নেয় জন্ম আবার কত জীব তাকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে। পরিপূর্ণ নদী তখন জীব-কল্যাণে সদা ব্যস্ত। আবার তারই মধ্যে দেখি সংহারিণী করালমূর্তি। সর্বশেষে সেই মাতৃরূপা নদী তাঁর শেষ অবস্থায় সন্ন্যাসিনীর

বেশে ধ্যানমগ্ন হয়ে লাভ করেন নির্বাণ। মহাসাগরের সাথে মিলে গিয়ে তিনি ব্রহ্মলীন হন। তার পূর্ব মুহূর্তে অর্থাৎ মাতৃরূপা পরম কল্যাণময়ী নদী তাঁর সন্তানদের মাথায় হাত রেখে শেষ আশীর্বাদ দিয়ে যান। সাগরসঙ্গমের সেই করুণা বারি পেয়ে জীবলোক পায় উদ্ধার।

নদী জীবনের এক উজ্জ্বল প্রতীক। আমার সামনের ছোট্ট খরস্রোতা নদীটার মতো আরও অনেকগুলো নদী মিলিয়েই সৃষ্টি হয়েছে সাংপো। ভারতে প্রবেশ করে সে বদলেছে ব্রহ্মপুত্র নামে। এই ছোট্ট রূপটিই আসামে গিয়ে পরিণত হয়েছেন পরিপূর্ণা নদী হয়ে।

প্রথম দর্শনে এই ছোট্ট নাম না জানা খরস্রোতাটিকে ভেবেছিলাম আমার বাধাস্বরূপ কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তা হয়ে উঠল আমার সখা। সখাই বটে—এই মহা নির্জন প্রান্তে সে আমাকে বলে চলেছে জীবন রহস্যের কাহিনী। অনেকদিন পর আমি খেলার সাথী পেলাম, তার সাথে আমি কথা বলতে বলতে উত্তর দিকে হেঁটে চললাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর খরস্রোতার জলটা আরও পাতলা হয়ে এল, আমার ভাগ্য যেন আবার খুলে গেল। জামা কাপড় জুতো সব দু'হাতে তুলে ধরে অতি সন্তর্পণে নদীতে নামলাম। পরিষ্কার স্বচ্ছ জল দেখে ভেবেছিলাম খুব বেশী ঠাণ্ডা হবে না কিন্তু জলে পা দিতেই সর্বশরীর অবশ হয়ে এল, সেই সময় সাধুবাবার মূল্যবান উপদেশটি মনে পড়ল। তিনি বলেছেন—তিব্বতের জল অতি ঠাণ্ডা, সে জলে হঠাৎ নামলে ঠাণ্ডায় মরে যাবে। কোন নদী নালা পার হবার সময় সেই জল দিয়ে প্রথমে তেল মাখবার মতো করে সমস্ত গায়ে জল মালিস করে নেবে তারপর ঠাণ্ডাটা একটু সয়ে গেলে জলে নামবে। সাধুবাবার উপদেশ কাজে লাগালাম। এই ঠাণ্ডা নদী পার হবার জন্য সেই কৌশল না জানা থাকলে আমার এই ছোট্ট শরীরটাকে নিয়ে কিছুতেই ওপারে যেতে পারতাম না। খরস্রোতার গতি এখানে আরও ধীর কিন্তু সদা চঞ্চল, তাকে বিদায় জানিয়ে আবার সাংপোর পথ ধরলাম। পথ এখন আরও কঠিন হয়ে এসেছে, চারপাশে কোন গাছ-গাছড়া নেই। ওপাড়ে ধূ ধূ করছে পাহাড়, বিশাল হিমালয়ের পাঁচিল দিয়ে ভারতবর্ষ থেকে তিব্বতকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। ভাগ্য ভালো যে সঙ্গে খাবার ছিল, নয়তো আগুন ধরাবার মতো একটু তৃণও এখানে নেই, এই চির তুষারের দেশে বুঝি কোনদিন ঘাসও হয় না।

মহাতীর্থের অনন্ত পথ—পথ সত্যি কঠিন কিন্তু মনে আশা আছে এ রাস্তার শেষ হবেই—এই সাংপোর উৎসেই পাবো আমার স্বপ্নে দেখা কৈলাসনাথ। বিশ্রামের মতো কোন রকম আস্তানা পেলাম না কাজেই সারা রাত ধরে চলতে বাধ্য হলাম। পরের দিন সকালে একটা ছোট্ট গ্রাম পেলাম, গ্রামবাসীরা এক নবীন সন্ন্যাসী পেয়ে পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে আশ্রয় দিল। এক বাটি গরম দুধ নিয়ে এক ভদ্রমহিলা আমাকে আপ্যায়ন করলেন। চমরী গাইয়ের সেই দুধ আমার মুখে অমৃতস্বরূপ লাগল। তাঁদেরই একটা ঘরে আমাকে বিশ্রামের জন্য নিয়ে গেলেন। বিশ্রাম! বলাই বাহুল্য গত দু'দিন ধরে অনবরত হেঁটেছি। বিচুলির এই বিছানা পেয়ে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না।

কম্বলটাকে মাথার উপর জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। সেই গরীব ও ধর্মীয় ভদ্রলোকের বাড়ীতে একদিন ও একরাত্রি কাটিয়ে ওই পরিবারের মঙ্গল কামনা ও পূজা করে আবার পথে নামলাম।

তারপর প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পার হলাম দুটো নদী, এই নদী দুটোও সাংপোতে এসে মিশেছে। নদী পার হবার জন্য সেতুগুলোও খুব পুরান। দুটো সেতুই কাঁচা অর্থাৎ পাথর বসিয়ে কাঠ ও দড়ির সাহায্যে দোলার মতো করে তৈরী করা। দ্বিতীয় নদীটি পার হবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পেলাম একটা বাড়ী। কুকুরগুলোই যথারীতি অভ্যর্থনার পর্ব সারলো। অল্প বয়সী দুটো ছেলে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল—কোথায় যাবেন? তিব্বতী ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ খুব লাজুক যেচে কথা বলে না। এদের এই বন্ধুভাব দেখে আমার বেশ ভালো লাগল। আমি ছোট্ট উত্তর দিলাম 'ৎসো মাফাম্'। আমার উত্তর শুনে ছেলেগুলো দৌড়ে চলে গেল। 'ৎসো মাফাম্' কথাটার মধ্যে যেন যাদুমন্ত্র ছিল। বাড়ীটার পাশ দিয়ে যাচ্ছি এমন সময় তারা আমাকে ঘিরে আমার চলার পথ আগলে ধরল।

আমি ভিড় দেখে মৌনীবাবা হয়ে গেলাম। সকলেই তাদের সাথে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করতে লাগলো। তাদের অনুরোধ রক্ষা করতেই হল। মৌনীবাবা দর্শনেই তারা যেন ধন্য হয়ে গেছে। বলাই বাহুল্য, আমার বয়সও তাদেরই মতো। চা খাওয়ার পর চারদিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম, পরিবেশটা বুঝতে মোটেই অসুবিধা হল না। এরা নিশ্চয়ই পাশের কোন গ্রামে থাকে, এখানে এসেছে চড়ুইভাতি করতে। চা খেয়ে কিছুক্ষণ কাটিয়ে তারপর তাদের ইসারায় ডেকে একসাথে বসে মণি মন্ত্র পাঠ করে সকলে নীরব হলাম। প্রায় আধঘণ্টা পর আমরা প্রার্থনা করে নীরবতা ভঙ্গ করলাম। আমি অবশ্য মৌনই থেকে গেলাম। খিচুড়ির মতো করে গমের সাথে সব্জি সেদ্ধ করে রান্না করা হয়েছে, আর তার সাথে কিছু শুকনো ভেড়ার মাংস। চড়ুইভাতির এক উপাদেয় খাদ্য। সন্ধ্যার কাছাকাছি তাদের সাথে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। আমার ধারণাটা ঠিকই ছিল। এই বাড়ীটার পাশেই ছিল একটা উষ্ণ প্রস্রবণ, গ্রামের লোকেরা এখানে মাঝে মাঝে আসে স্নানের জন্য আর সেই সাথে সাথে বেড়ানোও হয়ে যায়। আগে জানলে আমিও সেখানে স্নান করে নিতে পারতাম—এখন আর আফসোস করে কি হবে।

যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে তাদের কাছেই শুনলাম মহানন্দ সংবাদ, সামনের বড় গ্রামটাই হচ্ছে ত্রাদুম্ (ত্রাদুম)। মাত্র ঘণ্টাখানেকের পথ। ত্রাদুম্ থেকে মানস সরোবর মাত্র এগারো বারো দিনের পথ। সংবাদটা শোনা অবধি আমার অন্তরাত্মা বার বার আনন্দে লাফাতে লাগল। আর মাত্র সপ্তাহখানেকের পথ তারপরই মহাতীর্থের দর্শন পাবো। আমার চারপাশে এই ছেলেগুলো না থাকলে আমি সত্যি নেচে উঠতাম। নিজেকে সংযত করলাম—উচ্ছ্বাস হচ্ছে আবেগের প্রতীক, আমাকে থাকতে হবে তার উর্ধ্বে—"যোগস্থ কুরু কর্মাণি।"

আমরা চলতে লাগলাম—সূর্যদেব অস্তমিত হয়েছেন, আর তার সাথে সাথেই নেমে

এল অন্ধকার। তিব্বতে দলবেঁধে অন্ধকারে চলাই একটা খেলা, অন্ধকারও একটা আলো, রাত যত অন্ধকারই হোক না কেন আকাশে তারা উঠলে রাস্তাকে দেখা যাবেই। চলতে চলতে হারিয়ে যাওয়া, একজনকে আর একজন বলে ধরা, হোঁচট খেয়ে সঙ্গীর উপর হুড়মুড় করে পড়া এসবই হচ্ছে মজার ব্যাপার। মনে হয় ঘণ্টাখানেক চলার পর আমরা প্রথম গ্রামের আলো দেখতে পেলাম। গ্রামটা কত বড়, কোথায় শুরু, জায়গাটা কি রকম তার কিছুই বুঝতে পারলাম না—তাদের কথায় জানলাম যে এটাই ত্রাদুম্। গ্রামে ঢুকে কিছুক্ষণ হাঁটার পর অস্পষ্ট আলোয় দেখতে পেলাম একটা মঠের ছায়া। তার কাছাকাছি আসতেই সকলে আমাকে বিদায় জানিয়ে চলে গেল। মঠের দরজার সামনে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ওদের মধ্যে থেকে একটি ছেলে বলল—ভেতরটা খুব সুন্দর, বাইরে থেকে লামারা এসে এখানেই থাকেন।

মন্দিরের ভারী দরজাটা ঠেলতেই ভেতর দিকে সেটা খুলে গেল, আমি ভেতরে ঢুকলাম। দেয়ালের কোণে একটা কুলুঙ্গীর মধ্যে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। আমি দরজাটাকে বন্ধ করে দিয়ে প্রদীপের দিকে এগিয়ে গেলাম। প্রদীপটা হাতে নিতে গিয়ে দেখি যে সেটা চারিদিকের ঘিয়ের আঠায় আটকে আছে, কয়েক শ' বছরের ঘি পড়ে পড়ে বিরাট প্রদীপটার প্রায় অর্ধেকটাই জমাট কালো কালির মতো ঘিয়ের মধ্যে ডুবে গেছে। তা হোক তবুতো সেটা আলো। আধার বিশ্লেষণে আমার কাজ কি? তার আলোটাই আমার দরকার। অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর প্রধান বেদীটা পেলাম আর তার সামনেই হাজার প্রদীপের বেদী, আন্দাজ করে আর একটু খোঁজাখুঁজির পর পেলাম প্রার্থনা বেদী। রাত কাটাবার এটাই উপযুক্ত বিছানা। কম্বলটা খুলে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে এলিয়ে পড়লাম গদিতে। অন্যান্য দিনের তুলনায় আজকের ক্লান্তি একদম নেই বললেই চলে, ছেলেদের সাথে হাসি খুশীর মধ্য দিয়েই দিন কেটে গেছে।

মঠের এই ঘরের মধ্যে শীতটা কিছুতেই রপ্ত করতে পারছি না। দু'বার উঠে গিয়ে প্রদীপের ঐ সামান্য তাপে হাতের তালু গরম করে নিয়েছি। উঠে, কুঁজো হয়ে, দ' হয়ে নানাভাবে চেষ্টা করবার পরও ঘুমোবার মতো অবস্থা খুঁজে পেলাম না। কনকনে ঠাণ্ডা আস্তে আস্তে বুকের ভেতর উঠে কাঁপুনি শুরু করল। অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পরও যখন শরীর গরম করতে পারলাম না তখন ভাবলাম—না, এইভাবে শুয়ে সময় নষ্ট না করাই ভালো। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলাম—এইভাবে শীতে কষ্ট পাবার চেয়ে কৈলাসের পথে এগুনোই ভাল, তাতে অন্ততঃ দূরত্বটা কমবে। প্রদীপের সেই আবছা আলোতে আমি মালপত্র গুছিয়ে কাঁধে তুলে নিলাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে যে ঘরের ভেতর ঢুকে প্রদীপটা ডানদিকে পেয়েছিলাম। তার মানে বেরোবার সময় ঠিক তার উল্টো হবে অর্থাৎ প্রদীপটা বাঁদিকে রেখে এগিয়ে গেলেই পাবো দরজা। মনে মনে হিসাব করে এগিয়ে গেলাম বটে কিন্তু দরজাটা খুঁজে পেলাম না। দরজার পরিবর্তে দেয়ালের গায়ে টাঙ্গানো বিভিন্ন তাংখার উপর হাত পড়তে লাগল। কয়েকবার চেষ্টার পরও যখন দরজাটাকে খুঁজে পেলাম না তখন মনে হল যে আমার নিশ্চয়ই দিক ভুল হয়েছে। বার বার আমি মনে করতে লাগলাম, প্রদীপটাই হচ্ছে একমাত্র নিশানা, আমার

স্পষ্ট মনে আছে ঘরে ঢুকেই প্রথমে প্রদীপের কাছে আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম। ঘরের মধ্যে ওই একটি মাত্রই আলো কাজেই ভুল হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। তবে মানুষ মাত্রেই ভুল করে সেই ভেবে আমি প্রদীপের অন্যদিকের দেয়ালগুলোও খুঁজতে লাগলাম। সেই দেয়াল হাতড়াতে গিয়ে বারবার হাত পড়তে লাগল বিভিন্ন স্ট্যাচুর উপর। অল্প আলোতে ভাল করে কিছু দেখাও সম্ভব নয়। অনেকক্ষণ এইভাবে চেষ্টা করার পরও আমি আশার আলো দেখতে পেলাম না। ঘরে ঢুকবার সময় নিশ্চয়ই কোথাও ভুল করে থাকবো অথবা দরজাটা হয়তো খুবই মসৃণ দেয়ালের মতো তাই ঠিক খুঁজে পাচ্ছি না। প্রদীপটা হাতে নেবার উপায় নেই, সেটাকে তুলতে গেলে আলোটা নিভে যাবার সম্ভাবনাই বেশী। অগত্যা সকাল হবার ভরসা করে আবার আশ্রয় নিলাম গদিতে। শরীর গরম করার জন্য এবারে কয়েকটা আসন শুরু করে দিলাম—বক্রাসন, ময়ূরাসন ও পশ্চিমোত্তাসন করে হাতে হাতে ফলও পেলাম।

শরীরের কাঁপুনি কমে এসেছে মনে হল ঘরটা গরম হয়ে উঠেছে। ঠাণ্ডাটা সাধারণতঃ ভোরের দিকে বেশী হয়, কাজেই নিজেকে সেইভাবে তৈরী করতে লাগলাম।আমার দিগ্‌ভ্রম হয়েছে ভোর হবার আগে দরজা খুঁজে পাবার কোন আশা রাখি না। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বিষয় ঠাণ্ডাটা হঠাৎ যেন কমে এসেছে তবে কি এরই মধ্যে ভোর হয়ে গিয়ে সূর্যের আলো ঘরে প্রবেশ করেছে? দুঃখের রাতগুলো সাধারণতঃ তাড়াতাড়ি ফুরতে চায় না,কষ্টের রাতগুলো সব সময়ই হয় দীর্ঘ। এই ঠাণ্ডায় রাতটা হঠাৎ যেন শেষ হয়ে গেল। কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না—চোখ খুলেই দেখি অবাক কাণ্ড! অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি,সূর্যের আলো নয় আমারই পাশে গদির কাছে বসে আছেন একজন সন্ন্যাসী, তার সামনে কড়াইতে লাল টকটক করছে কাঠ-কয়লার আগুন। আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলাম, তার পা ছুঁয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। আগুন! আঃ এই মুহূর্তে ঘরটাকে মনে হল স্বর্গ। আমি সন্ন্যাসীর পাশে বসে আগুন পোয়াতে লাগলাম। কাঠ-কয়লার আগুনে সন্ন্যাসীর দেবতুল্য মুখটা নজরে পড়ল। আমার মতো তিনিও নিশ্চয়ই মহাতীর্থের যাত্রী। আমি কোন কথাই বললাম না, তাকে হাসিমুখেই বিনীত হয়ে জানালাম আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।বেশ কিছুক্ষণ ধরে শরীরটাকে গরম করে নিলাম, শরীরের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতেই ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসতে লাগল। আমি বসে বসেই ঝিমোতে লাগলাম। আমার সেই অবস্থা দেখে তিনি আমাকে ইসারায় শুয়ে পড়তে বললেন। তিব্বতে ঢোকার পর এই প্রথম লম্বা চুলওয়ালা সন্ন্যাসী নজরে পড়ল। তাঁর সাথে আলাপ করার ইচ্ছেও ছিল কিন্তু ঘুমের কবল থেকে নিজেকে উদ্ধার করা সম্ভব হল না, আমি শুয়ে পড়লাম।

সকালবেলা গ্রামের ছেলেরাই এসে আমার ঘুম ভাঙালো, এদেরই সাথে গতকাল আমি এখানে এসেছিলাম। ছেলেদের সাথে দুটি মেয়েও এসেছে। আমার কাছে এসে প্রণাম করে পাশে দাঁড়াল, তাদের আশীর্বাদ করে আমি প্রার্থনা করলাম। মেয়েরা আমরা জন্য কিছু খাবার এনেছে। শক্ত মাখন, ভারী রুটি আর গুড়। অতিথি সৎকারের পক্ষে এর চেয়ে ভাল খাবার আর হতে পারে না বিশেষ করে পৃথিবীর বুকে হারিয়ে

যাওয়া এই দেশটায়। আমি কিছু খেলাম আর কিছু ওদের বিতরণ করলাম। তাদের সবাইকে ইসারায় পাশে বসতে বললাম তারপর তাদের মঙ্গল কামনা করে আমরা মণিমন্ত্র জপ করতে লাগলাম, আমাদের সমবেত কণ্ঠে মন্দিরের সেই ঘরটা ভরে উঠল।

রাতের সেই সন্ন্যাসীকে দেখতে পেলাম না মনে হয় তিনি খুব ভোরবেলা উঠে চলে গেছেন। খোলা দরজা দিয়ে দিনের আলো এসে পড়েছে। এত কাছে এই দরজাটা আর রাতে এটাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গিয়েছিলাম। রাতের রহস্যটা উদ্‌ঘাটন করবার জন্য আমি দরজার পাশে দেখা সেই প্রদীপটার দিকে এগিয়ে গেলাম। আবার আমার আশ্চর্য হবার পালা। ঘিয়ের চর্বিতে বসানো সেই প্রদীপটার চিহ্নমাত্র নেই, অনেকক্ষণ খোঁজার পরও সেই দেয়ালের খোপটা খুঁজে পেলাম না। রহস্যই বটে! ছেলেমেয়েরা দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিল কাজেই রাতের রহস্যটাকে আপাততঃ স্থগিত রাখতে হল। ওদের সাথে আমি একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিলাম। বাড়ীর উঠোনে কয়েকটা টাট্টুঘোড়া আর ইয়াক বাঁধা রয়েছে তাদের পাশ কাটিয়ে একটা কাঠের বারান্দায় এসে উঠলাম। কাঠের বাড়ী—অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম কাজে ভর্তি। কিছুক্ষণ পরই বাড়ীর ভেতর থেকে সবাই ছুটে এসে জিভ বার করে মাথা নীচু করে প্রণাম করে দাঁড়াতে লাগল। সবশেষে এলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রমহিলা মুখের শতভাঁজের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে তাঁর সহজ ও পবিত্র চরিত্রের অভিব্যক্তি। তিনি একটা নতুন কাঁথা দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। তিব্বতের এটাই নিয়ম। আমরা যেমন ফুলের মালা দিয়ে গুরু বা পূজ্য ব্যক্তিদের বরণ করি এখানে তেমনি আছে এই কাঁথা। তারও কিছুক্ষণ পর লাঠিতে ভর দিয়ে কোনরকমে এসে হাজির হলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। আমি তাকে প্রণাম করতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালাম। এই দেশে লামারা কখনই সাধারণত গৃহীদের প্রণাম করে না।

আমি তাদের কিছু বলার আগেই তারা বুঝতে পেরেছে যে আমি মৌনীবাবা। আজকাল তিব্বতী কথা চালাবার মত বুঝতে পারি বটে কিন্তু এখানকার লোকেদের কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। এদের টান এবং উচ্চারণের সাথে আমি পরিচিত নই। যাই হোক্ আমি হাব-ভাবে তাদের বুঝিয়ে দিলাম যে আমি তীর্থযাত্রী, যাচ্ছি মানস তীর্থে।

কিছুক্ষণ পর ঘরের ভিতরে একজন এক-কড়াই আগুন নিয়ে এসে মাঝখানে রাখলেন। মেয়েদের পোশাকগুলোর রঙ খুব উজ্জ্বল। গলায় পাথরের মালা, বয়স্ক ভদ্রমহিলাদের কোমর-পটিগুলো খুব কাজকরা। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এদের গাল, ছেলেমেয়েদের গালগুলো লাল টুক্‌টুক্ করছে ঠিক যেন আপেলের মতো। সকলে মিট মিট করে আমার দিকে চাইছে আর চোখে চোখ পড়তেই সরাসরি মাটিতে দৃষ্টি নামিয়ে রাখছে। আমি শুধু বসে রইলাম। মৌনীবাবার এখন কি কর্তব্য ভগবান জানেন। তিব্বতে ঢোকার প্রথম দিকে এমন অবস্থায় পড়লে আমি খুব অস্বস্তির মধ্যে পড়তাম। আজকাল তা সহ্য হয়ে গেছে। লজ্জা আর ভয়ের হাত থেকে অনেকটা নিষ্কৃতি পেয়েছি। আমি ধার্মিক বা জ্ঞানী নই, সবই ঠেকে শিখছি।

দুপুরের দিকে সাম্পা খেয়ে সবাইকে ধন্যবাদ আর আশীর্বাদ জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এইভাবে বেশীক্ষণ থাকলে আমি কুঁড়ে হয়ে যাবো শুধু তাই নয় কৈলাস আমাকে ডাকছে কাজেই বসে থাকা মানে সময় নষ্ট। গ্রামবাসী যারা আদর-যত্ন করে স্নেহ দিয়ে আমাকে নতুন জীবন দিল তাদের জন্য আমি বারবার ভগবান বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা জানালাম—ভগবান তুমি এদের শান্তি ও সুখের পথ দেখাও। এদের সহজ ও সরল মনে তোমার কৃপাবর্ষণ হোক। ত্রাদুম্ শহরটিতে বেড়িয়ে অবাক হয়ে গেলাম, অনেকটা ইয়াটুং-এর মতো বিরাট শহর। হাসিমারা হয়ে ভুটানে যাওয়ার পথে বর্ডারে যেরকম খোলা বাজার আছে এখানকার বাজারটা দেখে ঠিক সেইরকম মনে হল। এই বাজারের অধিকাংশ জায়গাই দখল করে আছে টাট্টু ঘোড়া, ভেড়া আর ইয়াক্। পাহাড়ি পশুমেলা বলা যেতে পারে। ব্রহ্মপুত্রের ঠিক ওপারেই নজরে পড়ল সারি সারি চীনা সৈন্যবাহিনীর শিবির। দুটো নৌকা ফেরীর কাজ করছে। কয়েক মিনিট চলার পরই ঠিক নদীর ধারে নজরে পড়ল একটা বিরাট গুম্ফা। রাস্তাটা গুম্ফার দিকে এগিয়ে গিয়েছে তাই তাকে এড়াবার উপায় নেই। অথচ গুম্ফায় যাওয়ার আমার ইচ্ছা নেই। কি করবো ভাবছি এমন সময় একদল ত্রাবা (ছোট লামা) প্রায় আমার সমান বয়সী বাজার থেকে গুম্ফায় যাবার পথে আমার পেছনে এসে হাজির। এড়াতে পারলাম না। এখানকার রীতি অনুযায়ী যাবার পথে তীর্থযাত্রী মাত্রেই গুম্ফার বড় লামাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে হয়। তা না জানালে তাদের অপমান করা হয়। আমাকে তারা যখন দেখেই ফেলেছে তখন কিছুতেই গুম্ফায় না গিয়ে উপায় নেই। রাস্তার দু'পাশে সারি সারি মঠের বাড়ী। তারই মধ্যে রয়েছে প্রধান মন্দির। গম্বুজটা সোনার জলে রঙ করা, নিশ্চয়ই অনেক দূর থেকে নজরে পড়বে। আমি রাত্রিতে ত্রাদুমে ঢোকার দরুণ মনে হয় দেখতে পাইনি।

মূল মন্দির বা জোখাং-এর চৈত্য স্পর্শ করে প্রার্থনা চক্র ঘুরিয়ে প্রদক্ষিণ করতে লাগলাম। প্রদক্ষিণ শেষে ভেতরে ঢুকলাম। সামনেই চোখে পড়ল মঞ্জুশ্রীর বিরাট একটা মূর্তি। সেখানে পৌঁছতেই দূরে নজরে পড়ল কয়েকজন লামা অধ্যয়ন করছেন। আমি তাদের উপেক্ষা করে মন্দিরের কারুকার্যগুলোকে দেখতে লাগলাম। আমার পাশে একজন লামা এসে দাঁড়ালেন, তারপর অতি স্নেহের স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন-তুমি কোথা থেকে আসছো? আমি ইসারায় তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে আমি মৌনী—কথা বলি না। আমাকে অনুসরণ করতে বলে তিনি আগে আগে চললেন। দুটো বাড়ীর পর তিনি দোতলা একটি কাঠের বাড়ীতে আমাকে নিয়ে এলেন, তারপর কানে কানে বললেন—আমাদের মহামান্য গেশে এখন এখানেই আছেন তাঁর দর্শন করে এস। তিনি তোমাকে আশীর্বাদ করবেন।

মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করলাম। মৌনব্রত অবলম্বন করলেও কোনো গেশে বা মঠাধ্যক্ষের সামনে কথা বলার কোন বাধা নেই তাতে বরঞ্চ পুণ্যার্জনই হয়। ঘরের ভেতর ঢুকতেই কানে এল অতি নীচু স্বরে মন্ত্র পাঠের আওয়াজ। ঘরের কোণে ছোট্ট একটা জানালার ধারে বসে আছেন একজন লামা, আমাকে ইসারায় বসতে বললেন। মনে হয় তিনি অন্যদের পড়াচ্ছেন। নিম্নস্বরে মন্ত্রপাঠের মাঝে মাঝে তাঁরা থামছেন

আর গেশে তাঁদের দু'একটি কথায় বুঝিয়ে দিচ্ছেন। সেই কথাগুলোর মধ্যে একমাত্র 'কালচক্র' কথাটা বারবার শুনতে পেলাম। সেই কথাগুলো ঠিক বোধগম্য হল না। বেশ কিছুক্ষণ পর পাঠের শেষে লামারা চলে গেলেন রইলেন শুধু গেশে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কে তুমি, কোথা থেকে আসছো ?

সেই পরম পূজ্যপাদ মঠাধ্যক্ষ গেশের সামনে মিথ্যা কথা বলা পাপ। কৈলাসের দরজায় এসে হয়তো সেই পাপেই আমাকে ফিরে যেতে হবে। আমি তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সাষ্টাঙ্গে তাঁকে প্রণাম করলাম তারপর উঠে বসলাম। সৌম্যদর্শন সেই গেশে আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—কোথা থেকে আসছো, তুমি কে ?

আমি অতি বিনীত স্বরে বললাম—আমি তীর্থযাত্রী, গ্যাংটক থেকে লাসায় এসেছিলাম একদল নেপালী লামার সাথে, সেখান থেকে তাদের সঙ্গ ছেড়ে আমি সীগাৎসে হয়ে এ পর্যন্ত এসেছি যাবো দিরাফুক্ (Diraphuk) গুম্ফায়।

তিনি আমার কথা শুনে একটু আশ্চর্য হবার ভান করলেন, তারপর একটু তিরস্কারের সুরে বললেন—তোমার সাহস আছে দেখছি, এই বিরাট ঝুঁকি নিয়ে তুমি ভাল করনি।

তার কথা শুনে আমি অনেকটা দমে গেলাম, আমার মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরোল না।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর তিনি বললেন—তোমার বাড়ী কোথায় ?

এই প্রশ্নটার জন্যই আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম, ভারতীয় মাত্রেই তিব্বতে প্রবেশ নিষেধ, আর ত্রাদুমে চীনা শিবির দেখা অবধি মনে মনে প্রমাদ গুনছি। আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে গেলাম, কিন্তু গেশে আমার জবাবের জন্য অপেক্ষা করছেন। আরও কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর আমি বললাম—আমার গুরুজী নেপালী তিনি এই দলেরও গুরু, তার জিনিসপত্র বইবার জন্যই আমি এসেছি।

আমার কাছ থেকে সরাসরি উত্তর না পেয়ে গেশে আমাকে ঘুরিয়ে প্রশ্নটা করলেন—তুমি ভারতীয় তাই না ?

আমার মনের ভেতরে যেন ছেঁকা লাগল—কিন্তু শান্তভাবে উত্তর দিলাম—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তোমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছি, আমিও মাঝে মাঝে ভারতে যাই তবে আজকাল বিভিন্ন কারণে হয়ে উঠে না।

মহামান্য গেশে এবারে ভাঙা হিন্দীতে আমার সাথে কথা আরম্ভ করলেন। আমি তাঁর আন্তরিককতার পরিচয় পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। গম্ভীর প্রকৃতির ও রাশভারি গেশে হঠাৎ যেন মুখর হয়ে উঠলেন। কথায় কথায় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—দিরাফুক্ গুম্ফায় যে যাবে তার জন্য অনুমতি পত্রের দরকার, তোমার তা আছে কি ?

—অজ্ঞে না ? আমি এ দেশের ভাষা জানি না, আর তা ছাড়া আমি যথাসম্ভব মৌনী থাকতে চাই কাজেই কোন কাগজপত্র আমার কাছে নেই।

তিনি আমার কথা শুনে মহা সমস্যার সম্মুখীন হবার ভান করে বললেন—বুঝলাম! তুমি এখানে কতদিন থাকতে চাও?

—একরাত্রি মাত্র কালকে খুব ভোরে উঠে আমি আবার যাত্রা শুরু করবো। আমি কিছুক্ষণ থামলাম তারপর গেশের কাছ থেকে কোন রকম উত্তর না পেয়ে, আমি সহজ হবার জন্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে ক্ষমা চাইছি।

—ঠিক আছে। তিনি গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন।

আমি আবার প্রশ্ন করলাম—এখান থেকে মানস সরোবর ও কৈলাসনাথ কতদিনের পথ বলতে পারেন?

—প্রায় আট দশ দিন লাগবে।

—পথ কি খুব দুর্গম?

—নিশ্চয়ই।

—আমাকে এ সম্পর্কে কিছু উপদেশ দেবেন কি?

গেশে এবার একটু থামলেন, তারপর বললেন—ত্রাদুম্ অর্থাৎ এই শহরটাই হচ্ছে কৈলাসের দিকে যাবার শেষ বড় শহর। এখান থেকে দেড়দিন বা দু'দিনের মাথায় পাবে গীয়াবুনাক্ তার পরদিন সাম্সাং। গীয়াবুনাক্ ও সাম্সাং এই দুটোই সাধারণ গ্রাম তারপর তুমি পাবে থোক্চেন। থোক্চেন হচ্ছে যাযাবরদের ব্যবসাক্ষেত্র। সেখান থেকে প্রত্যেক বছর শীতের সময় যাযাবররা দল বেঁধে ভারতের দিকে পাথর বিক্রি করতে যায়। সেখানে একটা গুম্ফা আছে রাতে থাকার কোন অসুবিধাই হবে না, প্রয়োজন হলে তুমি আমার নাম করতে পারো। খুব সস্তায় সেখানে উলের জামা কাপড় পাবে। গেশে এই কথা বলে হঠাৎ থামলেন। তারপর আমাকে কিছু না বলেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, কিছুক্ষণ পর তিনি ফিরে এসে আমার হাতে কিছু খুচরো পয়সা গুঁজে দিয়ে বললেন—ধর, রাস্তায় কাজে লাগবে।

আমি বিনা দ্বিধায় সে দান গ্রহণ করলাম। তিনি আমাকে আরও কয়েকটি মূল্যবান উপদেশ দিয়ে জানালেন যে ত্রাদুমের পর মানস ও কৈলাস পর্যন্ত কোন চীনা শিবির নেই। সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় আনন্দের সংবাদ, সেটাই আমার কাছে ছিল সবচেয়ে বড় বাধা। আমি গেশে লামার ঘর ছাড়ার আগে আর একটি অনুরোধ করলাম—

—গতকাল রাতে ত্রাদুমে ঢোকবার মুখে যে মন্দিরটা আছে সেখানে রাত কাটিয়েছি। রাতে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে যার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না—আপনাকে ঘটনাটা বলবো দয়া করে শুনবেন কি?

তিনি আমার কথা শুনেই চম্কে উঠে বললেন—বলো কি? তুমি সেখানে রাত কাটিয়েছো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ঘটনাটার বিশদ বিবরণ শুনিয়ে লাভ নেই। ওখানকার অনেক গল্প আমার জানি। ওই গুম্ফাটা এখন পরিত্যক্ত। অনেক অভিশপ্ত আত্মা ওখানে আনাগোনা করে।

আমি আর কয়েকটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তিনি হঠাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন, তিনি এ বিষয়ে মনে হয় কোন কথাই শুনতে চান না। আমি ভাবলাম যে, এই অশুভ প্রসঙ্গটি উত্থাপন না করলেই বুঝি ভালো হত, কিন্তু না জিজ্ঞেস করেই বা উপায় কি, মৌনীবাবার না বলা প্রশ্নের কেই বা জবাব দেবে।

গেশে বারান্দা থেকে দু'জন তরুণ লামাকে ডেকে তাদের ওপর আমার ভার ছেড়ে দিলেন। আমি তাঁকে আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতেই তিনি আশীর্বাদ করলেন—মঞ্জুশ্রী তোমার মঙ্গল করুন, তিনিই মাতা-পিতা ভাই ও বন্ধু। তিনিই সব বুদ্ধ-বোদ্ধার মালিক, মঞ্জুশ্রীর কৃপা ছাড়া সেই আলোর স্পর্শ পাওয়া অসম্ভব—তাঁর ধ্যান কর, তাঁর কৃপা লাভে নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। তোমার যাত্রা শুভ হোক।

আমি তরুণ লামাদের ঘরে স্থান পেলাম। দোতলার প্রায় অন্ধকার একটা ঘরে আরও দু'জন লামার সাথে আমার থাকার বন্দোবস্ত হল। দুটো বাক্স, দুটো ছোট্ট কম্বলের বিছানা, চারটে হাতে লেখা কাঠের বিরাট বিরাট বই, কিছু সন্ন্যাস বস্ত্র, দুটো এ্যালুমনিয়ামের থালা আর একটা গ্লাস। ঘরটিতে এ ছাড়া আর কিছু নেই। এই দারুন শীতেও সন্ন্যাসী লামাদের আর বেশী কিছু দেওয়া হয় না, এ জীবন সত্যি কঠিন। শরীরকে কোনরকমে বাঁচিয়ে মনকে সংযত করে এগিয়ে চলতে হয় এই আধ্যাত্মিক পথে। যাঁরা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকেন তাঁরাই নির্বাণ লাভে সমর্থ হন। কোন রকমে এই স্থূল শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে—উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অন্তরালের সেই সূক্ষ্ম শরীরকে নিয়ে। পরেরদিন মঠের ভেরী বাজার আগেই আমি ত্রাদুম্ ছাড়লাম—উদ্দেশ্য থোক্চেন। আর মাত্র আট দশ দিন আছে, মনে দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে চলতে আরম্ভ করলাম।

দুর্গম পথ

চীনা সৈন্যদের তাঁবু ও চলাচল এখন সাংপোর ওপারে অর্থাৎ নদীর দক্ষিণে। সেখান থেকেই শুরু হয়েছে হিমালয় পর্বতশ্রেণী। কাজেই তাদের ভয় আর এদিকে নেই। কিন্তু তাই বলে পথটা মোটেই সহজ নয়। গ্যাংটক থেকে যাবার পথে অনেক ওঠানামা করেছি অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও মনের জোর এতটুকু কমেনি। এখানেও মনের জোর আমার অটুট আছে কিন্তু গায়ের জোর যেন দিন দিন কমে যাচ্ছে। ভারত থেকে যাঁরা এই মহাতীর্থে আসেন তাঁরা সবাই আসেন আল্‌মোরা ও পাহাড়ি গাড়োয়াল হয়ে। ভারত থেকে সীগাৎসে হয়ে কেউ মানসে আসেন না। আমি যে পথটা ধরে চলেছি সেটা তিব্বতের আভ্যন্তরীণ পথ। লাসা বা রাজধানীর সাথে যোগাযোগের পথ।

গীয়াৎসে, সীগাৎসে ও লাসা সেই অঞ্চলগুলোই তিব্বতের আশীভাগ লোকের বসবাস। তিব্বতের এই অঞ্চলটা সত্যি মরুভূমি। জনবসতি প্রায় নেই বললেই চলে। এখন গরমকাল কিন্তু রুক্ষ ঠাণ্ডায় কে বলবে গরমকাল? বরফ পড়ে শূন্য ডিগ্রীতে এখানকার আবহাওয়া প্রায় অধিকাংশ সময়েই শূন্যের নীচে। আশপাশে কোন বিরাট পাহাড় নেই—উপত্যকার মত। আমার একদিকে সাংপো আর তার বালি কাঁকরে ভর্তি তীর আর অন্যদিকে পাথরে ভর্তি সমতল। বলাই বাহুল্য, রাস্তাটা কাঁচা, নদীর দক্ষিণে হিমালয়ের বিরাটউঁচু পাহাড় আর উত্তরে ধু ধু করছে কুন্‌লুন পাহাড়। আমি এখন চ্যাং-ত্যাং এর রুক্ষ মরুভূমির মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছি। মাঝে দু' একটি যাযাবরদের তাঁবু দেখতে পেয়েছি কিন্তু সেখানে যাবার ইচ্ছা একদম নেই। যাযাবররা আমাকে দেখতে পেয়েই ভিখিরীর মতো ছুটে আসে পয়সার জন্য। একবার তাদের দৃষ্টিগোচর হলে উদ্ধার পাওয়া মুশকিল।

আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে দুর্গম পথ অনেক দেখেছি, দুর্গম বলতে আমি বুঝতাম পাঁচিলের মতো খাড়া পাহাড়, বন-জঙ্গলে ভর্তি যেখানে হিংস্র জন্তুর অভাব নেই অথবা ঝড় জলে যখন পথ চলা মুশকিল। এখানে বাঘ ভালুকের ভয় নেই কিন্তু দারুণ শীতে শরীর আপনা থেকেই দিন রাত কাঁপছে। রাস্তায় চায়ের দোকানের নামগন্ধও নেই। রাতের পর রাত চলেছি, দিনের বেলা যখন সূর্যদেব মাথার উপর দেখা দেন তখন রাস্তার ধারেই কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ি—এইভাবে দিনের বেলা ঘুমোই আর রাতের বেলা চলি। গত দু'দিন দু'রাত্রির মধ্যে পেটে গরম কিছু পড়েনি। ভুট্টা, আটা আর শুকনো যবের সাথে সাংপোর জল মিশিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করছি। চারদিকের গভীর ও

অনন্ত নিঃশব্দ ভাঙ্গাবার জন্য মন্ত্র আর বীজমন্ত্র পাঠ করছি, চিন্তার সাথে কথা বলছি। আর মনের ভাব উজাড় করে দিয়ে গান ধরছি। আমার সুস্থাবস্থার সাথে তুলনা করলে মনে হবে এটা আমার মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ। আমার এক ব্রত, চলতে হবে। মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়েছি, পেছন দিকে তাকিয়ে ভেবেছি—কি হবে এগিয়ে—কি পাবো—এত কষ্ট করে এগিয়ে লাভ কি, আমার মতো লক্ষ মানুষ পেছনে রয়েছে। কই তারা তো এগুচ্ছে না, তাই বলে তাদের অগ্রসর কি ব্যর্থ হয়েছে? দু'একবার মনে হয়েছে দূর ছাই! ফিরে যাই এবার অনেক হয়েছে আর নয়। কিন্তু ফিরে যাওয়া কি এতই সহজ? এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে ফিরে যাওয়া আরও কঠিন। এ অবস্থায় আমি এগিয়ে যাওয়ার পথে বাঁধা পড়েছি।

মনের জোর আর দেহের ক্লান্তি দুই মিলিয়ে আমাকে প্রতি মুহূর্তে করে দিচ্ছে দুর্বল। সাধুবাবার উপদেশ লামাদের উৎসাহ আর আমার উদ্দীপনা সব কিছুকে এই অবস্থায় মনে হচ্ছে নিছক কথা। পুণ্যার্জন করে করবটা কি? পুণ্যার্জন স্বর্গবাস কৈলাস দর্শন সবই হয়তো বিরাট একটা ভাঁওতার দুনিয়া। সন্ন্যাস, গৈরিক বস্ত্র, ত্যাগ সবই মনে হচ্ছে বেঁচে থাকার আর এক অবলম্বন। আসলে মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে কি? কারও কপালে কি খড়ি দিয়ে লেখা আছে—এ জ্ঞানী আর ও অজ্ঞানী। বেঁচে থাকার জন্য কেউ বাদাম বিক্রি করে, কেউ ভিক্ষে করে, কেউ ছেলে পড়িয়ে খায় আর কেউ ধর্মকথার বুলি শুনিয়ে ভক্তের ঝুলি শূন্য করে। সবই জীবনকে চালাবার একটা অবলম্বন মাত্র। অতএব ধর্মের জন্য আর এগিয়ে লাভ কি? মোটকথা আমি হাঁপিয়ে গেছি। আমার শরীরটা শুকিয়ে আরও ছোট হয়ে গেছে। খাওয়া-দাওয়ার অভাবে দুর্বল হয়ে গেছি, ঠাণ্ডায় ঠোঁট ও গাল দুটো ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। এখন এগুবার বাধা অনেক। ঠাণ্ডা বাতাস, নিঃসঙ্গতা মাথা গুজবার স্থানাভাব—খাদ্যের অভাব তার উপর আছে বার বার ছোট ছোট নদী ডিঙ্গোবার সমস্যা। প্রায় প্রত্যেকদিনই সাংপোতে পাচ্ছি অন্যান্য নদীর সঙ্গম, তা পাড়ি দেবার জন্য আমাকে নদী ধরে উঠতে হচ্ছে উত্তরে যেখানে সে সরু হয়েছে বা জলের গভীরতা কমিয়েছে একমাত্র সেখান দিয়েই পার হওয়া সম্ভব। মাঝে মাঝে অবশ্য মান্ধাতা আমলের ভাঙা সেতু পাওয়া যায় কিন্তু সেই সেতু দিয়ে হাঁটতে গেলেই মনে হয় সবশুদ্ধ গড়িয়ে পড়বো নীচে।

এত সত্ত্বেও আমি এগিয়ে চলেছিলাম কিন্তু এখন হঠাৎ যেন আমার মনটা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। অন্তরাত্মার সঙ্গে সে কিছুতেই চলতে রাজি নয়। লাসা ছাড়ার পর আমার কাশি হচ্ছিল। সেই কাশিটা এখন আরও বুকের উপর জোর করে চেপে বসেছে। মনের এই অবস্থায় বার বার মনে হচ্ছে এখন যদি চীনারা আমাকে ধরে নিয়ে যায় তাহলে খুব ভালো হয় অন্ততঃ থাকবার জায়গাতো একটা পাওয়া যাবে। এ ঠাণ্ডা বাতাস সত্যি অসহ্য। চারিদি'কে ছোট ছোট ঘাস সবে জন্মাতে শুরু করেছে—আগুন জ্বালাবার মতো একটা শুকনো ঘাসও এখানে পাওয়া যাবে না। দেহটাকে চালায় মন সেই মনটাই এখন ভেঙে পড়েছে। বাড়ী থেকে পালিয়ে বেড়ানোর মজা এখন হাড়ে হাড়ে অনুভব করছি। হাজার মাইল দূরে আমার পোশাক পাল্টে নতুন রূপে যে খেলায় মত্ত হয়েছিলাম এখন

তারই ফল পাচ্ছি। যাকে বলে প্রায় সম্পূর্ণ নিরাশ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি, চব্বিশ ঘণ্টা আগেও আমার এ অবস্থার কথা আমি চিন্তা করতে পারিনি—দাঁড়ালে ঠাণ্ডা বাতাস কাজেই ইহা সত্ত্বেও আমি চলতে বাধ্য হচ্ছি। চলার আনন্দ যেন হঠাৎ ফুরিয়ে এসেছে। তিব্বতের এই দুর্গম পথেই হয়তো শেষ হবে এই জীবন।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এল। দূর হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম দূরে ছেড়ে আসা আমার দেশের কথা। নদীর তীর থেকে মনে হচ্ছে ধুঁয়ো উঠছে। ভাল করে চোখটা রগড়ে নিলাম—না, ভুল দেখার কোন কারণ নেই দূরে নদীর ধার থেকেই কুণ্ডলী পাকিয়ে ধুঁয়ো উঠছে আকাশের দিকে। কিন্তু এখন ভাববার সময় নেই, হোক চীনাদের ক্যাম্প ওরা মানুষ তো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই ধোঁয়ার দূরত্বটা কমে এল। কাছে আসতেই দেখি নদীর ধারে কয়েকজন তিব্বতী বসে আগুন পোহাচ্ছে। আগুন পেয়ে আমি যেন নব জীবন পেলাম। সেখানে একটি লোক আমাকে দেখে অনেক দিনের পুরান কেটলিটায় গরম জল বসালো। মৌনীবাবা তাদের সাথে কথা বলে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে এল। আমি তাদের সকলকে চা খাওয়াবার জন্য পয়সা দিলাম। দিনের শেষে খেয়াঘাটের মালিক এরকম দরাজ একজন লামা পেয়ে আনন্দে হি হি করে হেসে উঠল, তার সেই আনন্দে আমিও যোগ দিলাম। স্বীকার করতেই হবে যে সেদিনকার সেই মৌনীবাবাকে সেই মাঝি ওরফে চায়ের দোকানের মালিকই জীবন দিল।

তাদের মুখ থেকেই শুনলাম যে থোক্‌চেন এখান থেকে মাত্র একদিনের পথ। এইটা হচ্ছে সাম্‌সাং গ্রাম গীয়াবুনাক্ গ্রামটা মনে হয় রাতের অন্ধকারেই হারিয়ে ফেলেছি। সেই রাতে তাদের সহৃদয় আতিথেয়তা আমাকে পুনর্জন্ম দিল।

মহাতীর্থের দরজায়

শেষে এসে পৌঁছলাম মহাতীর্থের দরজায়। তিব্বতী যাযাবরদের মিলনক্ষেত্র এই থোক্‌চেন। থোক্‌চেন চ্যাং-ল্যাং মরুভূমির একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শহর। প্রত্যেক বছর কোন একটা নির্দিষ্ট দিনে তিব্বতী যাযাবররা এখানে এসে মিলিত হয়। তাদের পশমের পোশাক, পুরোনো তৈজসপত্র, ঐতিহাসিক তাংখা, স্ট্যাচু আর বিভিন্ন পাথর ও পুঁথির বিরাট সম্ভার দিয়ে রাস্তার দু'পাশে বসে হাট। ধনী যাযাবর ও ব্যবসায়ীরা সেইসব জিনিস অতি সস্তায় কিনে নিয়ে আসে ভারতের বিভিন্ন বাজারে। নেপাল, ভারত, সিকিম ও ভূটানের সীমান্তবর্তী বাজারে এইসব মালই পরে আমরা দেখতে পাই।

এখান থেকে আবার শুরু হয়েছে পাহাড়, অর্থাৎ হিমালয় পর্বতশ্রেণী ঘেঁষে এখন এই রাস্তাটা উঠে গেছে উত্তর-পশ্চিম দিকে। সাংপো এখন হারিয়ে গিয়ে ছোট্ট একটা পাহাড়ি ঝরনায় পরিণত হয়েছে। তবে তার স্রোত ও দাপট এখন আরও চঞ্চল। প্রতি মুহূর্তে সে অসংখ্য পাথরের গায়ে ধাক্কা মেরে সৃষ্টি করছে শুভ্র ফেনিল রহস্যঘন ভয়ঙ্কর মূর্তি। এখন এই নদীটি পার হতে মোটেই অসুবিধা নেই। একটু পরিশ্রম করে কোমর জলে নেমে ও বড় বড় পাথরের উপর দিয়ে হেঁটে অনায়াসেই পার হওয়া যায়। এখন নদী না বলে সাংপোকে একটা পাহাড়ি ঝরনাই বলবো। গৌহাটির কাছে এই সাংপো অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রর কথা এখন চিন্তাও করতে পারছি না। এই অঞ্চলে সাংপো বহুভাবে ভাগ হয়েছে অর্থাৎ ঠিকভাবে লিখতে হলে বলতে হবে যে এই অঞ্চলের ছোটখাটো কয়েকশ' ঝরনা সৃষ্টি করেছে সাংপো, তিব্বতের প্রধান নদী। এই ছোট ছোট ঝরনার সবগুলিই প্রায় স্বতন্ত্র ভাবে বয়ে চলেছে। থোক্‌চেন থেকে হিমালয়ের এক অনবদ্য দৃশ্য চোখের সামনে ফুটে উঠছে। ত্রাদুম্ থেকে আমি শুধু সামনের দিকে নজর রেখে এগিয়ে চলছিলাম তাই বুঝতে পারিনি যে এঁকেবেঁকে এই রাস্তাটা ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠে গেছে। সে কারণেই সম্ভবতঃ আমি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। রাস্তা উপরের দিকে উঠলে বিশ্রাম করে করে উঠতে হয়, তাতে শরীরের শক্তি বজায় থাকে আর পথও হয় সহজ। সাধুবাবার সাথে যাবার সময় এসব দিকে আমার ভাববার প্রয়োজন ছিল না, কারণ তিনিই তীর্থযাত্রীদের গতি নিয়ন্ত্রণ করতেন। সেটাই হয়েছিল আমার বিরাট ভুল। দুনিয়ার এই অজ্ঞাতকোণে নিজেকে সাবধানে না চালালে এখানে দেখবার কেউ নেই, ঠেকে শিখলাম—এবার হতে সে ভুল আর হবে না। আমি কখন যে এত উঁচুতে উঠে এসেছি বুঝতেই পারিনি। এখন বুঝলাম সাংপো হঠাৎ কেন ঝরনার আকার ধারণ করেছে। যে সব ঝরনা সাংপো সৃষ্টি করেছে তার নামগুলো আমি জানতে

পারিনি। সাংপোর প্রধান ঝরনাটা আসছে মানস সরোবর থেকে সেটার নাম সামো-সাংপো।

শাম্‌সাং-এর কাছেই দেখেছিলাম সাংপো সেখান থেকে পরিষ্কার দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। তার অপর অংশ আনছে হিমালয়ের বরফ গলা জল। সাংপোর এই দিকে থাকার দরুন আমি অন্যদিকের শাখাটার কথা একদম চিন্তা করিনি। সাংপো নদীর ওপারেই হচ্ছে নেপাল তিব্বত সীমান্ত। সামরিক বাহিনীর ভয়ে সেদিকে যাবার কোন প্রশ্নই নেই। পরে জেনেছি যে সেদিকটাই ছিল সাংপো অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক উৎস। সেদিকেই আংসি-ইয়ুংদুক, তাম্‌চাক্‌-খাম্‌বাব নামে ছোট্ট পাহাড়ি খরস্রোতগুলোই সৃষ্টি করেছে মাৎসাং সাংপো। দক্ষিণের এই মাৎসাং সাংপো আর উত্তরের মারিয়াম্‌ চু এই দুই নদী মিলেছে শাম্‌সাং-এর প্রয়াগে। তিব্বতী তীর্থযাত্রীদের কাছে শাম্‌সাং প্রয়াগ অন্যতম প্রধান প্রয়াগ তীর্থ। উপযুক্ত পথনির্দেশের অভাবে আমি প্রয়াগের সেই পবিত্র স্থানটি চিনতে পারিনি। সাংপো মনে করে আমি উত্তরের যে শাখা নদী ধরে এগিয়ে চলেছি সেটা আসলে মারিয়াম্‌ চু নদী।

থোক্‌চেনের কাছ থেকে যে স্রোতস্বিনীর ধার ধরে এগিয়ে চলেছি—সেটার নাম সামো অর্থাৎ মারিয়াম্‌ চু কখন পেরিয়ে এসেছি। এই নদীটাই এখন মারিয়াম্‌ চু'র উৎস। সামো এসেছে সরাসরি মানস সরোবর থেকে। নামগুলো সত্যি গোলকধাঁধার মতো।

থোক্‌চেনের উচ্চতা প্রায় পনেরো হাজার সাতশ' (১৫,৭০০) ফিট। থোক্‌চেনের স্থানীয় নাম তাসাম্‌। প্রকৃতি এখানে সজীব। ঝরনার মধ্যে পেয়েছে প্রাণ আর চারদিকের পর্বতশৃঙ্গের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে তার অসীম রূপের ছটা। অসংখ্য তুষার ধবল পর্বত চূড়ার মধ্যে ডানদিকে দেখা যাচ্ছে মাতৃতুল্যা নন্দাদেবী আর দূরে বাঁদিকে অন্নপূর্ণা। এই দুই চূড়া অনন্তকাল ধরে অনন্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে কৈলাসের দিকে। মহাতীর্থ এখান থেকে আর বেশী দূরে নয় সেইকথা ভেবে বার বার আমার হৃদয় নেচে উঠতে লাগল। হিমালয়ের সৌন্দর্য আমার সব ক্লান্তি দূর করে দিয়ে আমাকে জাগিয়ে তুলল প্রেরণায়। সৌন্দর্যের মধ্যে আছে প্রাণ, সেই প্রাণের স্পর্শে আছে অমৃত, আমি যেন তাই পান করলাম।

থোক্‌চেন গ্রামটা অনেকটা উচ্চ হিমালয়ের কোন ভুটিয়া পট্টির মতো। গরীব ধরনের কাঠের বাড়ী আর কাঠ পাথরের মেশানো সরাইখানায় ভর্তি। মাত্র দু' পয়সার পরিবর্তে পেয়ে গেলাম গরম জল, বিচুলির গদিঘর, আর আরও দু' আনার পরিবর্তে পেলাম সমস্ত রাতের উপযোগী আগুন, আমার কাছে আছে প্রায় চার টাকা, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী। আমার ঘরের দরজা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি পাহাড়ের এই অনন্ত সৌন্দর্যের লীলা। টাইগার হিল থেকে হিমালয়ের সৌন্দর্য দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, আর এখন বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেছি।

পাহাড় পরিব্রাজকদের আকর্ষণীয় বস্তু, দূর থেকে ধরা পড়ে তার রহস্যঘন সৌন্দর্য

আর কাছে এলেই সে রূপ নেয় শুকনো পাথরের। তবুও অনাদিকাল থেকে মানুষ ছুটে চলেছে তার পেছনে। কিসের আশায় ?

পাহাড় আমি অনেক দেখেছি—আর এখন পাহাড়কে নিত্যসঙ্গী করে চলছি। আমার এই নিঃসঙ্গ চলার পথে পাহাড় আমার সাক্ষী দেবতা। পাহাড় আমাকে পথ দেখিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে কোন এক অজানা অলৌকিক স্বপ্ন জগতের দিকে।

তিব্বতের এই প্রান্তে মাথা উঁচু করে পর্বতশৃঙ্গগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর জীবন দেবতা হয়ে। আকাশ থেকে তারা টেনে আনছে প্রাণ-বারি, আর মন্দাকিনী হয়ে সে বারি সৃষ্টি করেছে সহস্র প্রাণ, নিঃশব্দে করে যাচ্ছে তাদের অনন্ত কর্ম। পাহাড়কে যারা ডিঙিয়ে ধ্বজা উড়িয়ে অভিযাত্রীর নামে নাম কেনে তারা পাহাড়কে দুর্লঙ্ঘ পাথর বলেই চেনে। এই বিরাটত্বের সামনে মানুষের ক্ষুদ্রতার প্রতিবাদে তারা তোলে অহঙ্কারের ঝড়। তারা পাহাড়কে চেনে বিরাট পাঁচিল হিসেবে, মানুষের ক্ষুদ্র মনেরই প্রকাশ মাত্র।

পাহাড়কে যাঁরা চেনেন জীবন-দেবতা হিসেবে তাঁরাই মহৎ। পাহাড় বিশ্ব পিতার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। তার সেই দৃঢ় সংযত ব্যক্তিত্বের মধ্যেই স্নেহ-ধারার অনন্ত ঝরনা পৃথিবীর বুকে আনছে অভয় আর করুণার আশীর্বাণী। পাহাড়কে না জানলেই আমরা পাই ভয় আর জানলেই তাকে পাই। তাকে পেলেই সঙ্গে সঙ্গে আসে সুখানুভূতির এক আনন্দ। সেই আনন্দে নেচে উঠে আমার ভেতরকার ছোট্ট আত্মাটি—পরিণত হয় মহাত্মায়। কিন্তু সেই মুহূর্তটা পলক মাত্র দেখা দিয়েই উধাও হয়ে যায়। তারপর চলে তাকে ধরার চেষ্টা। পাহাড়ের প্রাণ আছে। পরিব্রাজক ও তীর্থযাত্রী মাত্রেই তা স্বীকার করবেন। দিনের মধ্যে তার ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনও ঘটে প্রচুর। এই পরিবর্তন জানতে হলে দিনের পর দিন পাহাড়কে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে পাহাড়ের ঘুম ভাঙে তারপর সূর্যদেবের গতির সাথে ছন্দ মিলিয়ে পাহাড়ের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটে। সকালের দিকটা বড় অদ্ভুত। প্রতি মুহূর্তের রঙের সাথে সাথে মনে হয় তার রূপের পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনটা দেখার জন্য কাউকে যোগী বা মহৎ হতে হবে না, শুধু ধৈর্য আর দৃষ্টি থাকলেই যথেষ্ট। দুপুরের দিকে পাহাড়ের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। আর বিকেলের দিকে দেখা যায় তার পরিবর্তনশীল ধ্যান-গম্ভীর রূপ।

বরফে ঢাকা পর্বত-চূড়াগুলোর তো তুলনাই চলে না। তাদের সাথে একটু চেষ্টা করলেই মনে হয় কথা বলা যায়। ধ্যানস্থ হয়ে তাদের রূপকে মনে ধরে তাদের আত্মার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব। এরজন্য চাই শুধু ভক্তি আর সমর্পণের ইচ্ছা। প্রত্যেকটি চূড়াই যেন বিভিন্ন দেবতাদের এক একটি মূর্তি। পৃথিবীর এই তীর্থক্ষেত্রে তাদের সাথে মানব-আত্মার মিলন ঘটাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দের অনন্ত সেতু। আমার ভাগ্যটা নাকি খুবই ভালো। তাসামের রাস্তার ধারেই একটা বাড়ীতে থাকতে পেয়েছি। কয়েকদিন যাবৎ স্রোতস্বিনীর জলের স্রোতটা কম এখন পার হওয়া খুবই সহজ। আর এখান থেকে সরাসরি ৎসোমাফাম্-এ যাবার উপযুক্ত সঙ্গী পাওয়া গেছে। এই তিন কারণে আমার মতো সামান্য তীর্থযাত্রীর ভাগ্য খুবই ভালো।

সকাল থেকে দোংগলদাদা আমাকে বার বার এই কথাগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। দোংগলদাদাই এই বাড়ীর মালিক। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের এক ভদ্রলোক। তিব্বতীরা সাধারণতঃ বেশ লম্বা-চওড়া কিন্তু এই ভদ্রলোকের চেহারাটি অনেকটা শক্ত শেরপা গোছের। সামনের দুটো দাঁত নেই। তার ভেতর দিয়েই ঝরছে হাসির ফোয়ারা। কথা বলার চেয়ে তিনি হাসেন বেশী। জগতের কোনো সমস্যাই মনে হয় তাঁকে এখনও স্পর্শ করতে পারেনি, সাক্ষাৎ আনন্দমূর্তি। এক গামলা গরম জল এনে আমাকে হাত মুখ ধুয়ে নিতে বললেন। অনেকদিন পর গরম জল পেয়ে আমি গলা মুখ কনুই ধুচ্ছি। দোংগালদাদা বসে বসে আমার সৌভাগ্যের প্রশংসা করতে লাগলেন, একই কথা তিনি বার বার বলতে লাগলেন। তাঁর উচ্চারণভঙ্গি আর হাসি আমার মনকে যেন ধুয়ে পরিষ্কার করে দিতে লাগল। তাঁর উপস্থিতিতেই আনন্দ। দোংগলদাদা থাকেন তাঁর বৃদ্ধা মায়ের সাথে। গরমের সময় তাঁরা এখানে থাকেন আর খুব শীতের সময় তাঁরা নেমে যান পুরাং উপত্যকার দিকে।

থোক্‌চেনের ছোট্ট খোলা বাজারটা বড় ভালো লাগল। বাজারটাকে আমাদের দেশের একটা বারোয়ারী মণ্ডপের সাথে তুলনা করবো। সবাই সবাইকে চেনে। হাসি-ঠাট্টা আর গানের আসর সেখানে লেগেই আছে।

দোংগালদাদার বাড়ীটা অনেকদিনের পুরান। গরমকালে তাঁদের বাড়ীটা ধর্মশালায় পরিণত হয়। তিব্বতের সমতল প্রদেশ থেকে দলে দলে তীর্থযাত্রীরা এই পথ দিয়ে যায় মহাতীর্থে। থোক্‌চেনের অধিবাসীরা সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে তীর্থযাত্রীদের নিয়ে। গাধা ইয়াকে ভর্তি হয়ে যায় এখানকার রাস্তা। বিভিন্নভাবে তীর্থযাত্রীদের রসদ জুগিয়েই এদের আনন্দ। পয়সার দিক থেকে কতখানি লাভ হয় বলা মুশকিল, তবে এই কাজে গ্রামবাসীদের ব্যস্ততা অধিক পরিমাণে বেড়ে যায়। এই গ্রাম থেকেই অনেকে দণ্ডি ও পরিক্রমার জন্য লোক ভাড়া করে নিয়ে যায়। কৈলাস তীর্থে যারা পরিক্রমা করতে অসমর্থ তাদের হয়ে তিব্বতীরাই পরিক্রমা করেন। এর জন্য তারা সামান্য পয়সা ও খাবার পেলেই যথেষ্ট মনে করেন।

কৈলাস ও মানস সরোবরে যাবার পথে এটাই হচ্ছে শেষ গ্রাম। কাজেই তীর্থযাত্রীরা এখানেই তাদের শেষ কেনা-কাটায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এখন গরমকাল সবেমাত্র শুরু হয়েছে, কাজেই ব্যস্ততা কম। দোংগলদাদার মতে আজকাল তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা খুব কম। তিব্বতের বড় বড় শহরগুলো সব পরিবর্তনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সেখানে সবাই ব্যস্ত। সুখের বিষয় যে, তিব্বতের এই অংশে পরিবর্তনের ধাক্কা এখনও আসেনি। এখানকার লোকেরা পরিবর্তনশীল জগতের কোন খবরই জানে না। তাই এখানে আমি মুক্ত। এখানে নেই চীনা সৈন্যদের তাঁবু আর সরকারী জেরা। তিব্বতে প্রবেশ করার পর এই বাজারেই প্রথম আমি স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারছি। আমি কে কোথা থেকে আসছি কেউ তা জিজ্ঞাসা করে না। আমার একমাত্র পরিচয় আমি মহাতীর্থের যাত্রী। এখানে আমি মৌনীবাবা নই।

তাসাম বাজারের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে এখানকার কবিরাজি আয়ুর্বেদ ও

টোট্‌কা ঔষধের কারবারীরা। নানা রকমের শিকড়, পাথর আর বিভিন্ন মরা জীবজন্তুর ছাল ও তেলের বিরাট সম্ভার। শরীরকে রক্ষা করার জন্য যা দরকার, একটা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য যা দরকার তা সবই এখানকার কয়েকটি ছোট্ট প্রায় অন্ধকার ঘরের মধ্যে পাওয়া যায়। যারা বিক্রী করছে তাদের দেখে মনে হবে এদের থেকে নোংরা ভিখিরী বোধ হয় জগতে আর নেই। দেখে মনে হবে একগাদা নোংরা আর কালো ছেঁড়া কাপড়ের উপর যেন একটা নরমুণ্ডকে বসানো হয়েছে। ঘরেরই এক কোণে এরা প্রস্রাব করে অন্য এক কোণে রান্নার বন্দোবস্ত। খক্‌খক্‌ করে কাশির পর ঘন পদার্থ যা মুখে আসছে তাকে মুখের জোর দিয়ে ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে কাঠের দেয়ালের উপর। দাবাখানার এমন দুরবস্থার কথা চিন্তাও করা যায় না। গ্রামে লামার পর এদের দ্বিতীয় সম্মানীয় পদ দেওয়া হয়েছে। গরম যত বাড়তে থাকে ততই এই বাজারের উন্নতি হতে থাকে। ডজনখানেক দোকান প্রায় সারা বছরই এখানে খোলা থাকে। রাস্তার ধারের খোলা বাজারগুলো শুধু গরমকালেই বসে। খোলা বাজারের প্রধান আকর্ষণ পশম। ভেড়ার পশমের তৈরী নানা রকমের পোশাকের বিরাট সম্ভার। সোয়েটার, টুপী, মোজা, চাদর সব কিছুই এখানে পাওয়া যায়।

আমি প্রথমেই বলেছি যে, তিব্বতের বাজারে প্রথম আমি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করছি। ধরা পড়ার ভয়ে অথবা হাঙ্গামার জন্য আমাকে সব সময়ই বাজার ও শহরের মূল কেন্দ্রগুলো এড়িয়ে চলতে হত। থোক্‌চেনের বাজার আমার কাছে তাই হঠাৎ অন্য জগৎ বলে মনে হতে লাগলো। পোশাকের জন্য লামা আমাকে কিছু পয়সা দিয়েছিলেন তাই একটা সোয়েটার কিনবার জন্য দোকানের সোয়েটার ও টুপীগুলো হাতড়ে দেখতে লাগলাম। খাঁটি উল বলতে কি বুঝায় তা এখানেই আমি প্রথম বুঝলাম। হাতে টানা মোটা সূতোয় তৈরী সোয়েটারগুলোর কাজ অতুলনীয়। আর তার মধ্যে আছে রঙের বাহার। দামী সোয়েটার ও চাদরের মধ্যে পুঁতি ও পাথর বসানো। আমার মতো এক গরীব খদ্দেরের জন্য এরা মোটেই উৎসুক নয়, আমাকে নেহাৎই একটা বাচ্চা ছেলে ভেবে কোন আমলই দিল না। অনেকক্ষণ বাছাবাছির পর এক টাকা তিন আনা দিয়ে আমি একটা সোয়েটার ও হাত-মোজা কিনলাম।

বাজারের অন্যান্য জিনিসের দামও কিছু কিছু জানতে পারলাম, যেমন—একটা পুরো ভেড়ার চামড়ার কোটের দাম দু'টাকা, ভেড়ার চামড়াকে এরা বলে চারু, একটা চারুর দাম মাত্র ন'দশ আনার মতো। তিব্বতী চুট্‌কি অর্থাৎ কম্বলের দাম প্রায় কুড়ি বাইশ টাকার মতো। এই চুট্‌কিকে তিব্বতীরা লেপের মতো ব্যাবহার করে আবার বেশী শীতের সময় সেটাই হয় গায়ের চাদর। সাধারণ হালকা উলের চাদরকে এরা বলে পাংঘি, দাম মাত্র বারো আনা তেরো আনার মতো। লাম বা জুতোর দাম দশ আনা মাত্র। পশম ছাড়া এখানে অনেক চীনা আসবাবপত্রের দোকান রয়েছে। ছোট ছোট চা খাবার টেবিল রংবেরঙের ছোট ছোট বাক্স, কাপ ডিস্‌ প্রদীপ আর বিভিন্ন ধরনের থালা বাটি খুব সস্তা দরে পাওয়া যায়।

এই বাজারেই আমি প্রথম লক্ষ্য করলাম যে এরা মোটেই দরাদরি পছন্দ করে না।

একদর এককথা, দরাদরিটাকে এরা অপমানকর বলে মনে করে। তিব্বতের অন্যান্য অংশেও এই একই নিয়ম কি না আমার জানা নেই। প্রায় প্রত্যেকটা দোকানেই কাপড়ের উপর জলরঙা তিব্বতী চিত্র পাওয়া যায়। এই চিত্রগুলোর অধিকাংশই মণ্ডলা ও ভগবান বুদ্ধের বিভিন্ন রূপে ভর্তি। কৈলাসনাথ, রাক্ষসতাল আর মানস সরোবরেরও অনেক কল্পিত চিত্র এখানে চোখে পড়ে, সেগুলো সবই তাংখা হিসেবে বিক্রি হয়। খাবার জিনিসের মধ্যে আটার কাঠি, শুকনো মাংস, চাল ডাল, ভুট্টা, গম, যব, বার্লি প্রচুর পাওয়া যায়। একসের চালের দাম দু'আনা, আর একসের বার্লির দাম চার পয়সা। শুকনো একটা ভেড়ার জানুর দাম তিন আনা। আমার মতে এটা সত্যি সস্তার বাজার।

বাজারের আড্ডাখানা হচ্ছে এখানকার চায়ের দোকান। দোকানের বাইরে দুটো মেয়ে লম্বা কাঠের চোঙার মধ্যে চা-এর সঙ্গে মাখন মেশাচ্ছে, আমাকে দেখেই তারা কাজ থামিয়ে জিভ বার করে সম্মান জানালো, আমিও হাসিমুখে তাদের হাত তুলে আশীর্বাদ করে মাথা নীচু করে দোকানে ঢুকলাম। দোকানের ভেতরটা খুবই ছোট্ট, কাঠের একটি খুপরী ঘর মাত্র। উচ্চতায় এক মানুষও হবে না, মাথা নীচু করে ঢুকেই বসে পড়তে হয়।

চা খেয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে একটু এগিয়েই পেলাম মরিয়াম নদী, নদীকে এরা বলে চু। নদীর স্বচ্ছ জল আর দূরের বরফে ঢাকা পাহাড়ের সৌন্দর্যকে সারাজীবন দেখেও যেন আশ মিটবে না। মনে মনে ভাগ্যদেবতাকে স্মরণ করে তাঁর অপার করুণার জন্য ভক্তিভরে প্রণাম জানালাম। এখানে দাঁড়িয়ে বাড়ীর কথা হঠাৎ মনে পড়ল। ইছাপুরের সেই গরম আবহাওয়ায় ছোট্ট পরিবেশের কথা, কোথা থেকে কোথায় চলে এসেছি, সেখান থেকে আমি যেন এক স্বপ্নের জগতে চলে এসেছি। কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর পায়ে ঠাণ্ডা অনুভব করলাম, কাজেই হাঁটতে বাধ্য হলাম।

বাড়ীতে ঢোকার পথেই দোংগলদাদার দেখা পেলাম। আমাকে দেখেই তিনি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—সোয়েটারটা কিনলেন?

—হ্যাঁ, এটা খুব গরম তাই না?

—ঠিক ঠিক। তারপরই ঘোষণা করলেন শুভ সংবাদ—কালকেই আমরা রওনা হব।

আনন্দে আমার বুকটা লাফিয়ে উঠল। মনকে বললাম—ধৈর্য ধর শান্ত হও, মহাতীর্থের দর্শন তোর হবেই। খুব ভোরে দোংগলদাদার মা আমার ঘুম ভাঙ্গালেন, পাশের ঘর থেকে দোংগলদাদা বেরিয়ে এসে আমাকে প্রণাম করে ভেতরে ঢুকতে বললেন। আমি তার ঘরে ঢুকে দেখি আরও তিনজন তিব্বতী সেই ঘরে আগুনের পাশে বসে আছেন। উনুনের পাশেই রয়েছে একটা বিরাট গামলায় গরম থুক্‌পা, গরম ঝোলের মত তাতে সবাই একে একে চুমুক দিচ্ছেন, আমিও তাদের দলে যোগ দিলাম। থুক্‌পা হচ্ছে বার্লি ও মাংসের ঝোল। দোংগলদাদা ছাড়া বাকি তিনজনের সাথে আমার ইতিপূর্বে পরিচয় হয়নি। রাত প্রায় অন্ধকার; দূরের আকাশে তারাগুলো এখনও তাদের পূর্ণ সত্তা নিয়ে সজাগ হয়ে রয়েছে। তারায় ভরা উজ্জ্বল আকাশটাকে মনে হচ্ছে ঠিক

মাথার উপরে, একটু উঁচুতে উঠলেই মনে হয় ধরা যাবে। দারুণ শীত আর অন্ধকার রাস্তা এই দুই বাধাকে তুচ্ছ করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

প্রথমে ভেবেছিলাম যে এই রাস্তাটাই যখন মহাতীর্থে গিয়ে পৌঁছেছে তখন আর দোংগলদাদার প্রয়োজন কি? কিন্তু চলার পথেই বুঝলাম যে এ পথে দোংগলদাদার একান্তই প্রয়োজন। প্রথম বাধা এখানকার ছোট-খাটো স্রোতস্বিনীগুলো—সেগুলো পার হবার জন্য সরাসরি কোন সেতু নেই। এখানকার অধিকাংশ সেতুগুলোই স্থানীয় পাথর সাজিয়ে তার উপরে কাঠ ও দড়ির কেরামতিতে তৈরী, সেগুলো সবই প্রায় মান্ধাতার আমলে তৈরী, পাথরগুলো সাজিয়ে বসানো হয়েছে মাত্র তার মধ্যে এতটুকু সিমেন্টের ছোঁয়া নেই। অধিকাংশ সেতুই তাদের আয়ুর শেষ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, তাতে পা দেবার আগে দোংগলদাদা ভালোভাবে সেগুলোকে পরীক্ষা করে দেখেন, আবার অনেক সেতু পার হবার বদলে নামতে হয় জলে। আবার অনেক সময় জল পার হবার জন্য উঠতে হয় তার উৎসের দিকে। কাজেই রাস্তা ছেড়ে আমাদের প্রায়ই যেতে হচ্ছে ডানদিকে তারপর আবার ফিরে আসি রাস্তায়। অনেক সময় ছোট্ট নদীগুলোকে দেখলে মনে হয় ডিঙিয়ে পার হওয়া যাবে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঠিক তার বিপরীত। পাথরের উপর পা দিয়ে ডিঙ্গোবার জন্যও চাই উপযুক্ত অভিজ্ঞতা। পাথরগুলোর চরিত্র জানা না থাকলে তারা গড়িয়ে গিয়ে আমাদের সাথে তামাসা করতে পারে। সেটা মোটেই সহনশীল নয়।

এই পথে শীতটাও অসহ্য, আবহাওয়া খুবই শুকনো, আকাশে একখণ্ড মেঘও নেই। বহুদূরের পাহাড়গুলোকে মনে হয় খুব কাছে, চলার সাথে শ্বাস প্রশ্বাসের ছন্দ না মিলিয়ে চললে সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় শ্বাসকষ্ট। কে বলবে যে তিব্বতের এটা অন্যতম প্রধান সড়ক। রাস্তায় জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। শব্দের মধ্যে আমাদের ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস, পা ফেলার শব্দ আর মাঝে মাঝে পাহাড়ি নদীর নুড়ি গড়ানো শব্দ। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা প্রায় নেই বললেই চলে। আমার কাঁধের কম্বল আর ছোট পোঁটলাটা আস্তে আস্তে ভারী হতে শুরু করেছে। ঠাণ্ডায় পা দুটো প্রায় অসাড় হয়ে গিয়েছে, নাকের ডগা আর কানগুলো শীতে কন্‌কন্ করছে, মনে হচ্ছে অনবরত শ'য়ে শ'য়ে ছুঁচ ফোটাচ্ছে তারই মধ্যে চলতে লাগলাম—মনের একমাত্র আশা কৈলাস দর্শন। সেই ঠাণ্ডায় মণিমন্ত্র সমেত অন্যান্য সব মন্ত্রগুলো যেন মগজের মধ্যে জমে গিয়েছে, কিছুতেই মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে না, আমার পা কান আর নাকটি আমার মনটাকে যেন আঁকড়ে ধরে আছে। আগুনে পুড়ে যাবার মতো তা যেন জ্বলছে। তবুও আমাকে চলতে হচ্ছে—সবাই চলছে আর আমিও তাদের অনুসরণ করতে বাধ্য হচ্ছি।

দোংগলদাদা মনে হয় আমার অবস্থা বুঝতে পেরেছেন। তিনি থামলেন, তার মুখের হাসিটাও মনে হয় এখন শুকনো। তিনি তার ফোকলা দাঁত বের করে হাসি টেনে বললেন—ঠিক আছে?

—না—ঠাণ্ডা—নাক কান জ্বলে যাচ্ছে। সেই সময় তিব্বতী ভাষা মুখে ফুটে বেরোলো না মাতৃভাষায় বার বার বলতে লাগলাম—ঠাণ্ডা জ্বলে

যাচ্ছে—ঠাণ্ডা—শীত···। দোংগলদাদা মহাতীর্থের অভিজ্ঞ পথিক, পথ দেখানোই তাঁর পেশা আমার অবস্থা দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর পীঠের থলি নামিয়ে তার মধ্য থেকে বার করলেন—কয়েকটি কাঠ আর দেশলাই—তারপর তাতে আগুন ধরিয়ে আমার কাছে ধরলেন আমিও হাতের দস্তানা খুলে হাত গরম করে নাক ও কানে গরম সেঁক দিতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর আমার ঠাণ্ডা ভাবটা কমে এল। তিনি আমাকে একটা পাথরের মত জিনিস হাতে দিয়ে বললেন—নাও এটা মুখে রাখ, আস্তে আস্তে চুষে খাবে, এতে শরীর গরম হবে।

—এটা কি ওষুধ ?

—এর নাম থুমা, এর থেকে বড় ওষুধ তিব্বতে আর নেই। দোংগলদাদা অনেকটা গর্বের সাথে জবাব দিলেন। অন্য তিনজনকে তিনি একটু একটু করে থুমা ভেঙ্গে দিলেন। অনেকটা শিলাজুতের মত দেখতে।

একটু সুস্থ হয়ে উঠার পর আমরা আবার পথ ধরলাম। সন্ধ্যের দিকে একটা ছোট্ট পরিত্যক্ত গুম্ফায় সেদিনকার মত আমরা থামলাম। দোংগলদাদা বললেন—আমরা অনেকখানি পথ পেরিয়েছি এইভাবে হাঁটলে আমরা কালকে দুপুরের দিকে ৎসো মাফামে পৌঁছতে পারবো। আনন্দ সংবাদ বটে কিন্তু আমার এখন যা দরকার তা হচ্ছে পূর্ণ বিশ্রাম।

মহাতীর্থ

আমার ধারণা ছিল যে মানস সরোবরই ব্রহ্মপুত্রের উৎস। থোক্‌চেনের পর থেকে আমার সে ধারণায় বার বার সন্দেহ দেখা দিচ্ছিল। কারণ হঠাৎ দেখলাম যে নদীর স্রোত উল্টো দিকে বইতে শুরু করেছে। তাহলে কি আমি দিগ্‌ভ্রান্ত হয়েছি। কিন্তু সকলেই আমাকে বার বার আশ্বাস দিয়ে বললেন যে আমি ঠিক পথেই চলেছি। আমার লক্ষ্যস্থল মানস তীর্থ আর স্বর্গভূমি কৈলাসের দিকে কাজেই এই প্রশ্নটাকে খুব জোর দিইনি। কিন্তু কয়েকদিন যাবৎ সেই প্রশ্নটাই বার বার মনে দেখা দিচ্ছে।

গুম্ফায় ভোরবেলা প্রার্থনার পর দোংগলদাদাকে সেই প্রশ্নটাই করছিলাম। তিনি হেসে আমার প্রশ্নের সহজ ব্যাখ্যায় উত্তর দিলেন। সাংপো তিব্বতের প্রধান নদী। এই অঞ্চল থেকেই সেই নদীটার উৎপত্তি হয়েছে, ভারতবর্ষে সেইটাই নাম নিয়েছে ব্রহ্মপুত্র। এই অঞ্চলের পাহাড়ের বরফগুলো গলে গিয়ে সৃষ্টি করেছে অসংখ্য নদী। সেই নদীগুলোর কয়েকটা শাম্‌সাং-এর প্রয়োগে মিলিত হয়ে নাম নিয়েছে সাংপো। আমি তাঁর কথায় স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে শাম্‌সা-এর পর এ পর্যন্ত যে সব নদী পেয়েছি সেগুলোর সবই প্রায় স্বতন্ত্র নদী। থোক্‌চেনের কোন নদীই সাংপোর সাথে মেশেনি। কতগুলো নদী একসাথে সৃষ্টি করেছে তামুলুং ৎসো অর্থাৎ তামুলুং হ্রদ; কতগুলো নদী একসাথে মিলে মিশে সৃষ্টি করেছে তাগ্ সাংপো; আর কতগুলা নদী সৃষ্টি করেছে সামো সাংপো। সাংপো নাম হলেও মহানদী সাংপোর সাথে এদের কোন যোগাযোগ নেই।

আমরা চলেছি সাংপোর ধার ধরে। তাগ্ সাংপো এবং সামো সাংপো দুইই পড়েছে ৎসো মাফাম্ বা মানস সরোবরে। সে কারণেই এখন দেখছি নদীর স্রোত উল্টোদিকে। আমরা এখন নদীর স্রোতের সাথেই চলেছি—লক্ষ্য মানস সরোবর। বলাই বাহুল্য যে আমাদের চারপাশে এখন বরফের রাজত্ব, বরফগুলো গলছে আর কল্‌কল্ করে তার শব্দ চারদিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এখানে দক্ষিণ হিমালয়ের গা থেকে শুরু হয়েছে ব্রহ্মপুত্র বা সাংপোর মূল উৎস—দূরত্ব প্রায় সত্তর মাইলের মতো। খুব ভোর বেলা আমরা রওনা দিয়েছি—আমাদের পথ এখন সহজ। রাস্তাটা এখন ক্রমশঃই নীচের দিকে নামছে, থোক্‌চেনের উচ্চতা প্রায় পনেরো হাজার সাতশ ফিট আমরা এখন নামছি। মানস সরোবরের উচ্চতা প্রায় চোদ্দহাজার ন'শ ফিট, প্রায় সাতশ পঞ্চাশ ফিট নীচে।

আমাদের মনের জোর এখন পুরোপুরি ফিরে পেয়েছি। শরীরে হঠাৎ যেন হাতীর জোর এসে পড়েছে। মনের দুর্বলতা, দেহের ক্লান্তি, সব যেন হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে।

দেহটাকে এত হাল্‌কা লাগছে যে মনে হচ্ছে এখান থেকে উড়ে যেতে পারবো। গতকাল শীতে অসার হয়ে যাওয়া নাকটাকে রগ্‌ড়ে যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছিলাম সেটাও মনে হয় কোন এক যাদুমন্ত্রে সেরে গেছে।

আমরা প্রায় ঘন্টাখানেক যাবৎ দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে চলছিলাম। আস্তে আস্তে আমাদের কাছ থেকে সেই পাহাড় দুটো দুরে সরে যেতে লাগল, আমাদের সামনের দৃশ্যপট ধীরে ধীরে পালটাতে লাগল। মনে হতে লাগল যেন আমাদের সামনের পর্দাটা সরে যাচ্ছে, প্রতিমুহূর্তেই সামনের মঞ্চটা ব্যাপক হতে লাগল। মনের কৌতূহল আর উৎকণ্ঠাকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না, কোন এক অজ্ঞাত আকর্ষণে আমাদের চলার গতি বেড়েই চলল, শেষে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়াল যে আমরা প্রায় দৌড়তে লাগলাম। দোংগলদাদা আমাদের পায়ের তালে ছন্দ মিলিয়ে ধরিয়ে দিলেন মণিমন্ত্র। ওম্ ম-ণি পদ্ মে-হুম্, ওম্ ম-ণি পদ্ যে-হুম, ওম্ ম-ণি পদ্-মে হুম ····

তারপর এল সেই পরম লগ্ন, একটা ছোট পাহাড়ের দেয়াল ডিঙোতেই হঠাৎ আমরা এসে পৌছলাম স্বর্গরাজ্যে····স্বর্গরাজ্যই বলব ···হঠাৎ আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। নয়ন ভরে দেখতে লাগলাম বিশ্ববিধাতার এই অনন্তরূপ! চক্ষু-কর্ণ ইত্যাদি সব ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ হয়ে গ্রহণ করতে লাগল সেই রূপের আস্বাদন। আমাদের মধ্যে কোন রকম কথাই হল না সবই যেন এখানে আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। মনকে ডিঙ্গিয়ে প্রকৃতি এখন আত্মার সাথে যোগাযোগ করছে সেই যোগাযোগের মধ্যে এতটুকু বাধা নেই। আমার ব্যক্তি-আত্মা সেখানে হঠাৎ যেন খুঁজে পেয়েছে তার উৎস বিশ্বাত্মাকে, সেই মহামুহূর্তের সাক্ষী হয়ে রইল এখানকার নীরবতা।

আমার সাথে প্রকৃতির সেই যোগাযোগকে যদি ভাষা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাই সেটা হবে তার বিকৃত রূপ। পিপাসার সময় যদি হাজার পাতা লিখে জলের বর্ণনা দেওয়া হয় সেটাকে বলবো জলের অপমান করা—জলকে পেয়ে তা পান করে উপলব্ধি করার মধ্যেই রয়েছে জলের যথার্থতা; বর্ণনা এক জিনিস আর উপলব্ধি অন্য জিনিস। বর্ণনা আনে বাহাদুরী, উপলব্ধি আনে মুক্তি। আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণ কিছুক্ষণের জন্য যেন চিরমুক্তির স্বাদ গ্রহণ করছে। প্রকৃতি আমাদের মা—তাই তার এই অপরূপ সৌন্দর্যে ছেলের মহানন্দ উপস্থিত হয়েছে। সেই আনন্দকে ব্যক্ত করবো কি করে! আমাদের তিষ্ঠাবস্থা কাটতেই দোংগলদাদা আমাদের বুঝিয়ে দিতে লাগলেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে।

অনেকক্ষণ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটার পর কেউ যদি সাগরতীরে এসে পৌছায় তার যেমন অবস্থা হয় আমাদের অবস্থাও তাই। দোংগলদাদা ছাড়া আমরা চারজনই এই প্রথম এ পথের পথিক। আমাদের সামনে এক বিরাট সমতলভূমি তারই মধ্যে দু'একটা ছোটখাটো টিপির মতো পাহাড়। সেই সমতলভূমির কেন্দ্রমণি হয়ে রয়েছে দুটো হ্রদ। সামনেরটিই মানস সরোবর পরেরটি রাক্ষসতাল হ্রদ। তারও দুরে পাঁচিলের মতো ধুধু করছে পর্বতশ্রেণী। দক্ষিণের তুষারশুভ্র পাহাড়টির নাম গুরলামান্ধাতা। আর উত্তরে দুটো পাহাড়ের পিছনে একটা সাদা ত্রিকোণাকৃতি বরফে ঢাকা পর্বতশৃঙ্গ আকাশের দিকে

উঠে গেছে সেটিই মহান কৈলাস। যাঁর কৃপায় আমার এই সাধারণ দেহটি এতদূর আসতে পেরেছে, যাঁর আশীর্বাদে আমার পথশ্রম এক নিমেষে দূর হয়ে গেছে, যাঁর প্রসাদে আমার এ জীবন সার্থক হল তাঁর উদ্দেশ্যে আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলাম। আনন্দাবেগে আনন্দাশ্রু বইতে লাগল—মাটিতে দেহ রেখে বারবার মাথা ঠুকে আমার ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করতে লাগলাম—

হে দয়াময়! এই দীন ভিখিরীকে তুমি যে অপার করুণা করেছো তার জন্য আমার ভক্তি অর্ঘ্য গ্রহণ কর। আমি পণ্ডিত নই আমি জ্ঞানী নই আমি যোগী নই, তবুও তোমার কৃপা আমি লাভ করেছি—আমার এ জীবন ধন্য! হে প্রভু করুণাসিন্ধু জগৎপতি! তুমি আমাকে তোমার পাদপদ্মে স্থান দাও।

আমার সামনের এই দৃশ্যই স্বর্গদৃশ্য। যুগ-যুগান্ত ধরে চেয়ে থাকলেও বুঝি তৃপ্তি মিটবে না। প্রণাম ও প্রার্থনা সেরে আমরা একটু এগিয়ে গেলাম। সামনেই নজরে পড়ল বিরাট একটা ধ্বজা তার নীচেই রয়েছে ছোট্ট একটা চোরতেন বা স্তূপ। সেখানে গিয়ে আমরা প্রদক্ষিণ করলাম তারপর এখানকার প্রথানুযায়ী পাশের থেকে কয়েকটি পাথর এনে সেই স্তূপে যোগ করলাম।

সামো সাংপোর এই জায়গা থেকে মানস সরোবরের দৃশ্য খুব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আশপাশের পাহাড়ের বরফগুলো গলে অসংখ্য ছোট ছোট পাহাড়ী নদীর সৃষ্টি হয়েছে। সেই নদীগুলো সবই মানস সরোবরে গিয়ে পড়েছে। দোংগলদাদা আমাদের উপদেশ দিয়ে বললেন, এই সময় মানস সরোবর পরিক্রমা বা প্রদক্ষিণ করা সম্ভব নয়, কারণ চারপাশের নদীগুলো পার হবার জন্য কোন রকম সেতু বা খেয়ার বন্দোবস্ত নেই। তবে শীতের সময় এই নদীগুলো জমে বরফ হয়ে যায় সেই সময় তিব্বতীরা মানস প্রদক্ষিণ করেন।

দোংগলদাদা ও অন্য তিনজন তিব্বতী ভদ্রলোক সমেত তাঁরা যাবেন পুরাঙের দিকে। দোংগলদাদা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—এখন আমাদের ছাড়াছাড়ি হবার সময় হয়েছে তুমি কি করবে বলো?

আমি কি করবো? আমি নিজেই প্রশ্ন করলাম। এখানে আসাই ছিল আমার স্বপ্ন এখন কি করবো কিছুই জানি না।

দোংগলদাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম—এখানে তীর্থযাত্রীরা এসে কি করেন?

দোংগলদাদা আমার কথায় হেসে ফেটে পড়লেন—ৎসো মাফামে এসেছো অথচ কি করবে জান না। শোনো এখানে সবাই আসেন পূজা করতে, পূজারী পাবে—তারা তোমার জন্য তোমার পূর্বপুরুষের জন্য পূজা ও প্রার্থনা করবেন। মানসে ডুব দিয়ে তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের উদ্ধার করতে পারবে আর সেই সাথে হবে পুণ্যার্জন। তুমি যদি চাও তাহলে আমার সঙ্গে এসো আমার জানাশুনা অনেক লোক আছে তারা তোমাকে সাহায্য করবেন।

মানস সরোবর রাক্ষসতাল আর কৈলাসনাথের সব তথ্য দোংগলদাদার নখদর্পণে। এখানে কোন হিন্দু মন্দির আছে কি না জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন—এই অঞ্চলে

কোন হিন্দু মন্দির নেই, তবে প্রত্যেক বছর ভারতবর্ষ ও নেপাল থেকে অনেক হিন্দু সাধুরা এখানে আসেন তীর্থ করতে। তাঁরা সবাই মানস সরোবরের চারপাশে যেসব গুম্ফা ও চৈত্য আছে সেখানে থাকেন। দোংগলদাদার মতে হিন্দু, সাক্য, চেন্-রে-জি এ সবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তীর্থ এই মানসখণ্ড, এখানে সব মানুষ সামান শুধু ভাষাটা আলাদা।

প্রসঙ্গক্রমে তাকে আমি জানালাম— আমার কাছে দিরাফুক্ ও লাংবোনা গুম্ফার লামা প্রধানের জন্য একটা চিঠি আছে কাজেই সেখানে যেতে হবে। দোংগলজী সোৎসাহে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন—তাহলে তো খুব ভাল—আমি তোমাকে প্রথম থেকেই বলছি যে তোমার ভাগ্য খুব ভাল। তিনি আমাকে পথ নির্দেশ দিয়ে বললেন যে, এখান থেকে লাংবোনা গুম্ফা মাত্র একদিনের পথ। এই রাস্তা ধরে সরাসরি এগিয়ে গেলেই আমি পাবো দিং ৎসো নামে একটা ছোট হ্রদ, সেখান থেকে মাত্র এক বেলার রাস্তা। সেখানে গেলে সেখানকার লামারাই করণীয় বিষয়ে উপদেশ দিয়ে দেবেন। দোংগলদাদার মতে এখন সরাসরি ৎসো মাফামে না যাওয়াই ভালো তাতে নদী নালার গোলক ধাঁধায় আটকে পড়ার সম্ভাবনা আছে। পথ খুব সোজা ৎসো-মাফামকে বাঁ দিকে রেখে কৈলাসনাথের দিকে মুখ করে এগিয়ে গেলেই হবে।

আমি তাঁর হাতে দু'টাকা দিয়ে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানালাম, তিনি ভারতীয় মুদ্রা পেয়ে খুবই খুশী হলেন—তারপর আমাকে আরও কয়েকটি মূল্যবান উপদেশ দিয়ে বিদায় নিলেন।

আমি এখন আবার একা। বিরাট আকাশের নীচে একটা হারিয়ে যাওয়া পাখীর মত। দোংগলদাদা যাচ্ছেন গুরলা মান্ধাতার দিকে আমি চললাম কৈলাসের দিকে। মানস সরোবরের সাথে মাইলখানেক দূরত্ব রেখে পায়ে চলা এই ছোট্ট রাস্তাটা প্রায় সমান্তরালভাবেই এগিয়ে চলেছে। তবে এই রাস্তাটা সরোবর হতে মনে হয় তিন-চারশো ফিট উঁচুতে।

দোংগলদাদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি হাঁটতে শুরু করলাম। মানস সরোবরের ওপারের দৃশ্যটা স্বপ্নের মত ধুধু করছে, পাহাড়ের চূড়াগুলোর কি অনবদ্য দৃশ্য। প্রায় দুপুরের দিকে হঠাৎ নজরে পড়ল একপাল ইয়াক্ আরও এগিয়ে যেতেই দেখি একপাল বললে ভুল হবে মাঠভর্তি। আশ্চর্য বটে! এই বরফের রাজত্বে ওরা খাচ্ছে কি? মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগল—এগুলো কি বন্য, এই অঞ্চলে হয়তো এটাই স্বাভাবিক। আরও কাছে যেতেই নজরে পড়ল সারি সারি তাঁবু, যাযাবর।

আমি এবার সমতলে নেমে এলাম—আস্তে আস্তে তাঁবুগুলোর মধ্যদিয়ে হাঁটতে লাগলাম। তাঁবুগুলো সবই শূন্য ভেতরে কেউ নেই। আমাকে দেখে ইয়াকগুলো মাথা তুলে তাকালো বটে কিন্তু কোন রকম শব্দ করল না। বরফ গলার পর ঘাসগুলো সবেমাত্র আত্মপ্রকাশ করছে— ইয়াকগুলো তাই পরমানন্দে খুঁজে খুঁজে খাচ্ছে।

ধীরে ধীরে সূর্যদেব মাথার উপরে উঠতে লাগলেন। তার সাথে সাথে কৈলাসের দৃশ্যও বদলাতে লাগল। সূর্যের কিরণটা এখন খুবই উপভোগ্য, হাঁটতে বেশ মজা

আছে। চলতে চলতে পেলাম ছোট্ট একটা যাযাবরের দল। একটা তাঁবুর ধারে বসে সবাই সূর্যকিরণ উপভোগ করছে। তাদের মধ্যে সবাই প্রায় শিশু আর মধ্য বয়সী। আমাকে দেখেই তারা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে জিভ বার করে সম্মান দেখাতে লাগল। আমি তাদের উদ্দেশ্যে হাত তুলে মণি মন্ত্র উচ্চারণ করে আশীর্বাদ করলাম। শিশুদের মাথায় হাত দিয়ে একটু আদর জানাতেই তাদের অভিভাবকরা কৃতজ্ঞতায় মাথা নীচু করে তাদের কৃতার্থতা জানাতে লাগল। আমি চলার পথেই দুধারে যাদের পেয়েছি তাদের সাথেই হেসে আন্তরিকতা বিনিময় করলাম মাত্র। আমার সেই সাধারণ ব্যবহারে এদের মধ্যে চমৎকার প্রতিক্রিয়া ঘটল আমি যার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। চারদিকে সাড়া পড়ে গেল আশপাশের সবাই চেঁচিয়ে অন্যান্য সবাইকে ডাকতে লাগল। সেই ডাকে শুধু যে তিব্বতী শিশুরাই ছুটে এল তাই নয় অনেকগুলো কুকুর ও ইয়াকও এসে আমার চারদিকে ভিড় করল। এরা সকলেই আমার স্পর্শ পেতে চায়—মৌনীবাবার আশীর্বাদ পেতে চায়।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র এই কৈলাসখণ্ড—এখানে যারা বাস করে তারা ধন্য। তারা পবিত্র তারা ভগবানের সাক্ষাৎ সন্তান আমি তাদের আশীর্বাদ করবো কি মন্ত্রে। আমিই তাদের আশীর্বাদপ্রার্থী। শিশুদের মুখগুলো সব দেবসুলভ পবিত্রতায় ভর্তি। আর প্রত্যেকের চোখের জ্যোতিতে দেখতে পাচ্ছি দেবত্মার প্রকাশ। তাদের আশীর্বাদ করবো কোন ভাষায়? প্রভূর এ কি লীলা? এ কি পরীক্ষা। মানস সরোবর আর কৈলাসনাথের প্রত্যেকটি পাথরে আছে শিবনাম—এখানকার বায়ুতে রয়েছে পরমাত্মার স্পর্শ, দৃশ্যে রয়েছে তার সাক্ষাৎস্বরূপ। স্বর্গীয় ছন্দ এখানে আশীর্বাদ হয়ে ঝরে পড়ছে অনবরত। এখানে যারা থাকে তারা সবাই দেব—তবু তারা চায় এই ভণ্ড মৌনীবাবার স্পর্শ। তারা নীরবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে আমার জন্য। আমার মনের অবস্থা এদের বুঝাই কি করে? কিছুই করার নেই। আমি অতটা না ভেবেই আরম্ভ যখন করেছিলাম কাজেই শেষ করতেই হবে। আমি কৈলাসের দিকে তাকিয়ে সৃষ্টিকর্তা ভগবান শিবের কছে প্রার্থনা করতে লাগলাম—

হে অন্তর্যামী! তুমি আমার মধ্য দিয়েই এদের আশীর্বাদ করো— আমার অপরাধ ক্ষমা করো—তুমি আমাকে তোমার পথে চালাও। তারপর আমি তাদের মাথা স্পর্শ করে আমার মাতৃভাষায় বললাম ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন তিনি তোমাদের সুখে রাখুন।

সবচেয়ে সুন্দর এখানকার শিশুদের মুখ। এই দারুণ শীতেও তাদের মধ্যে এতটুকু কষ্টের রেখা নেই, এক একটি যেন ফুটন্ত গোলাপ। তাদের আশীর্বাদ করে আমি আবার রাস্তা ধরলাম। আমার পিছু চলতে লাগল সেখানকার সবাই। তাদের সাথে আমার একটা কথাও বিনিময় হয়নি অথচ মনে হচ্ছে তারা আমার পিছন ছাড়েনি আমি গুণে গুণে দেখলাম তারা চৌত্রিশজন—আমাকে ছাড়তে যেন তাদের প্রাণে বাঁধছে। আমরা সবাই থামতে বাধ্য হলাম, সামনেই একটা নদী। নদী নামে মাত্র ছোট্ট একটা খাল বলাই ভালো। খুব গভীর নয় কিন্তু পার হওয়ার অসুবিধা। আমাকে নিরুপায় দেখে যাযাবররা

আমাকে আরও ডানদিকে উঠে আসতে বলল। তাদের কথানুযায়ী আরও উপরে উঠতেই দেখি যে বড় বড় পাথর সাজিয়ে সেখানে একটা সেতুর মত করা হয়েছে। এখানে পার হতে কোন অসুবিধা নেই। ভেবেছিলাম যে এখানেই তাদের সাথে আমার ছাড়াছাড়ি হবে। কিন্তু না, আমার অনুমান মিথ্যা আমার সাথে সাথে তারা সবাই নদী পার হয়ে এল। তারপর হঠাৎ এসে পৌঁছলাম মানস সরোবরের তীরে। আমার ডানদিকেও ছোট একটি হ্রদ আর বাঁদিকে মানস। নীল পরিষ্কার মানস সরোবরের উপরে ছোট ছোট ঢেউ উঠে তীরে আছড়ে পড়ছে। আমি তাড়াতাড়ি তার তীরে ছুটে গিয়ে জল স্পর্শ করে মাথায় ছিটিয়ে নিলাম। তারপর ভক্তিভরে মানস সরোবরের নাম না জানা অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের প্রতি ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করলাম। তারপর আপন মনেই মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল গায়ত্রী মন্ত্র—ওম্ ভূঃ র্ভূবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্ ভর্গো দেবস্য ধীমহী ধীয়ো ইয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ , ওম্ ভূঃ র্ভূবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্ ভর্গো দেবস্য ধীমহী ধিয়ো ইয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ, ওম্ ··· ।

সূর্যদেবের অবস্থান দেখে মনে হয় এখন মধ্যাহ্ন। পেছনে তাকিয়ে দেখি ছেলেমেয়ের দল আমার পেছন ছাড়েনি। তাদের দিকে তাকাতেই তারা আমাকে ইসারায় তাদের অনুসরণ করতে বলল, নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কারণ আছে নয়তো এতখানি পথ ওরা আমাকে অনুসরণ করবে কেন ? এই ভেবে আমি ওদের অনুসরণ করলাম, সরোবরের ধার ধরে যেতে যেতেই নজরে পড়ল দুটো রাজহাঁস। প্রথম প্রথম বিশ্বাস করতে পারিনি ভালোভাবে তাকিয়ে দেখলাম—ঠিকই তো। এই বরফের দেশে রাজহাঁস দেখবো কল্পনাও করতে পারিনি। দূরে সাদা পাহাড়ের চূড়া আর এখানে পরিষ্কার নীল জলের উপর ধবধবে সাদা রাজহাঁস সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে সত্যি স্বর্গরাজ্য। পরে দেখলাম যে মাত্র দুটো নয় আরও অনেক রাজহাঁস এখানে মনের আনন্দে বিচরণ করছে। মা সরস্বতীর এর চেয়ে পবিত্র প্রতিভূ আর কি হতে পারে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা হ্রদের ধারে আরও কয়েকজন তিব্বতীদের সাথে এসে মিলিত হলাম। তারা মাছ শুকোচ্ছে। প্রথমে ভেবেছিলাম এরা স্থানীয় জেলে কিন্তু পরিচয়ের পর বুঝতে পারলাম যে এরাও আমার পূর্বপরিচিত যাযাবরদেরই লোক। অভিবাদনের পর তারা আমাকে বার বার বুঝিয়ে দিতে লাগল যে এরা মাছগুলোকে মারেনি, প্রাণিহত্যা এখানে পাপ। মাছগুলো মরে ভাসছিল তারপর ঢেউয়ে ঢেউয়ে তীরে এসে পড়েছ—এরা সেই মরা মাছগুলো শুকিয়ে নিচ্ছে মাত্র। কাজেই খেতে দোষ কি ? তারা আমাকে কয়েকটি বিশেষ রকমের মাছ দিয়ে খেতে অনুরোধ করল। লামারা সাধারণতঃ প্রাণিহত্যা করেন না তবে অপরে হত্যা করলে তাদের খেতে বাধা নেই। আর আমারও সেই সময় খুব খিদে পেয়েছিল তাই মানস সরোবরের প্রসাদ মনে করে তাদের সাথে খেতে আরম্ভ করলাম। মাছের সঙ্গে পেলাম তন্দুরী ধরনের খুব মোটা একটা রুটি। এখন বুঝলাম যে যাযাবররা কেন আমার সাথে সাথে এতদূর এসেছে। আসলে এখন ওদের খাওয়ার সময়। আর সেই সাথে সাথে মৌনীবাবাকে খাইয়ে তারা পুণ্যার্জন করল। আমি যে মাছটা খেলাম সেটা অনেকটা আমাদের দেশের

চিল্কা হ্রদের বড় পুঁটির মতো। খেতে অনেকটা কাঁচা ভেট্‌কির মত স্বাদ। অনুমানে বুঝলাম যে যাযাবররাই ইয়াকগুলোর মালিক। ইয়াকগুলো নিজের ইচ্ছায় খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, এরা তার দেখাশুনা করে মাত্র। এদের মধ্যে কিছু লোক কুকুরগুলোর সাহায্যে ইয়াক দেখাশুনো করে আর বাকি সবাই চলে আসে হ্রদের ধারে মাছের আশায়। কোন এক অজ্ঞাত কারণে মাছগুলো মরে ভেসে উঠে জলের উপরে আর ঢেউয়ে ঢেউয়ে সেগুলো এসে পড়ে হ্রদের ধারে, সারাদিন ধরে এরা ঝিনুক কুড়োবার মত করে এই নানা ধরনের মাছগুলো কুড়িয়ে তোলে তারপর সেগুলো শুকিয়ে ঝলসিয়ে খায়। মাছ ছাড়া এরা নানা ধরনের পাথরও সংগ্রহ করে তারপর বাজারে বা তীর্থযাত্রীদের কাছে সেগুলো বিক্রি করে। এদের সাথে থাকলে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পারতাম কিন্তু আমাকে যেতে হবে গুম্ফায়, তাই তাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আবার পথ ধরলাম।

যাযাবররাই আমাকে লাংবোনা গুম্ফার পরিষ্কার রাস্তা বলে দিল। এই হ্রদ ধরেই আমাকে সরাসরি উত্তরের দিকে হাঁটতে হবে কিছুতেই হ্রদের তীর ছাড়া চলবে না। অনেকক্ষণ চলতে চলতে যখন একটা নদী পাবো, সেই নদী ধরে উপরের দিকে পাবো একটা সেতু, সেতুটা পার হলেই লাংবোনা গুম্ফা। তিব্বতীরা যখন কোন পথের নির্দেশ দেয় তখন সময়ের মাপ হিসেবে ব্যবহার করে কিছুক্ষণ, অনেকক্ষণ, একবেলা, দু'বেলা, একদিন-দুদিন ইত্যাদি। ঘন্টা বলে যে একটা শব্দ আছে তা তারা বোধহয় জানে না। আমি অবশ্য সাধারণ তিব্বতীদের কথা বলছি।

মানসতীর্থে প্রথম রাত্রি

যাযাবরদের সাথে আমার সাক্ষাৎ নিশ্চয়ই ভগবানের আশীর্বাদ, নয়তো এত তাড়াতাড়ি লাংবোনা গুম্ফায় আসা সম্ভব ছিল না। বিকেলের দিকে সম্পূর্ণ জগতের একটা নতুন রূপ; অস্তমিত সূর্যের আলোয় চারিদিকের পাহাড়-নদী-হ্রদ ও আকাশের রঙ পাল্টাতে লাগল। সবচেয়ে সুন্দর লাগছে ভারত সীমান্তের গুর্লা মান্ধাতার বিভিন্ন চূড়াগুলোকে। বরফের চূড়ায় রঙিন সূর্যের আলো পড়ে কখনও সোনালী কখনও রূপালী রঙের ঢেউ বইতে লাগল। আর কৈলাস শিখরকে দেখাচ্ছে ঠিক যেমন গ্যাংটকের গুম্ফা থেকে দেখেছিলাম কাঞ্চনজঙ্ঘাকে।

সূর্যাস্তের পরেই হঠাৎ রাত নেমে আসে তাই আমি পরে ভালো করে দেখবো ভেবে দ্রুত হাঁটতে শুরু করলাম। নদী পেতে অসুবিধা হল। পার হয়ে যাবার উপায় নেই। সঙ্গম থেকে এবার ধরলাম উত্তরের পথ। এটাকে মোটেই রাস্তা বলা যাবে না, পাথরের উপর দিয়ে ডিঙ্গিয়ে চলা মাত্র। এখানকার অপরূপ সৌন্দর্য দেখা সত্ত্বেও মনের মধ্যে একটা আপসোস বারবার উঁকি মারতে লাগলো, ভেবেছিলাম পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ তীর্থে এসে শুধু দেখবো মহাপুরুষদের ভিড়। মানস সরোবরের ধারে শুধু পাবো ধ্যানমগ্ন যোগীদের আস্তানা—কিন্তু কোথায় তাঁরা? রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসার একটু আগেই পেলাম একটা সেতু সেখান থেকেই দেখতে পেলাম আধো আলোয় আধো ছায়ায় একটা বিরাট দু-তলা বাড়ী। এই প্রথম কোন কুকুর আসেনি আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে, গ্রামের ছেলেমেয়েরা কেউ আসেনি মৌনীবাবাকে অনুসরণ করতে—আমাকেই খুঁজতে হল সেই বিরাট বাড়ীর প্রবেশ পথ।

রাতের আলো সবে মাত্র পৃথিবীকে গ্রাস করছে, অন্ধকার এখনও চোখে সহ্য হয়ে উঠেনি—ভাগ্য ভালো যে নির্বিঘ্নে এ পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পেরেছি। শীতেরপ্রকম্পশুরু হয়েছে—কম্বলটাকে চাদরের মতো জড়িয়েছি, মাথায় জড়িয়েছি চাদর, হাতে দস্তানা, পায়ে লাম অর্থাৎ তিব্বতী জুতো, তাতেও মনে হয় শীতের কবল থেকে রেহাই নেই। রাতের অন্ধকারটা চোখে সহ্য হয়ে এলে আবার শুরু করলাম খোঁজা। লাংবোনা গুম্ফার চারিদিকে ঘুরে দেখলাম প্রায় ধর্মশালার মতো একের পর এক অনেকগুলো দরজা, কোন্ দরজাটা প্রধান তা আবিষ্কার করা কঠিন। কোন ঘর থেকে এতটুকু সাড়া শব্দ পাচ্ছি না, আলোর চিহ্নমাত্র নেই। মনে হয় সবাই আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কোন উপায় না পেয়ে আমি একের পর এক দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলাম, কিন্তু উত্তর পেলাম না। দু'তিনবার বাড়ীটার চারদিকে ঘোরার পরও কোন দরজা খোলা পেলাম না। রাত্রির জন্য অন্ততঃ কোন রকম একটা ছাদ পেলেই আমার চলে যাবে সেই আশায়

আশপাশে খোঁজ করতে লাগলাম। রাত যতই গভীর হতে লাগল ততই মনে হল রাতের তারাগুলো থেকে যেন আলো ঠিকরে পড়ছে। সেই আলোতে হঠাৎ মনে হল বাইরে থেকে সিঁড়ি উপরের দিকে উঠে গেছে। কাঠের সিঁড়িই বটে, সিঁড়ি ধরে উপরে উঠেই পেলাম একটা বিরাট বারান্দা তারপর আবার সারি সারি ঘর।

আমি একটার পর একটা ঘরে আবার জোরে জোরে আঘাত করে যেতে লাগলাম। বলা যায় না যদি কেউ থাকে। আমার অনুমান মিথ্যা নয়, কোণার ঘরটায় আঘাত করতে হল না মনে হল ভেতরে কেউ শব্দে উঠে পড়েছেন। মনে মনে ভাবলাম—যেই হোক না কেন আমার একটা আস্তানার প্রয়োজন, অসময়ে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেবো, প্রয়োজন হলে পায়ে পড়তেও দ্বিধা করবো না—শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আমাকে একটা ঘর পেতেই হবে। আমি বেপরোয়া হয়ে সেখানে ধাক্কা মারতে যাবো, এমন সময় ভেতর থেকে দরজাটা খুলে গেল। আমার সামনেই আবির্ভূত হলেন এক মহাপুরুষ, তাঁর দর্শনে আমার সমস্ত লোমকূপগুলো খাড়া হয়ে উঠল, আমার বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেল, আমার শরীরের সব শক্তি যেন নিমেষে উধাও হয়ে গেল। আমি প্রায় চৈতন্য হারিয়ে দাঁড়িয়ে সেই মহাপুরুষটির দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। ঘরের ভেতর একটা কড়াইতে হোমাগ্নির মতো আগুন জ্বলছে, তার সামান্য আলোতে আর বাইরের উজ্জ্বল তারার আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেলাম তাঁর রূপ। সেই দিব্য পুরুষের দেহ থেকে যেন জ্যোতি ঠিক্‌রে পড়ছে—এই দিব্য পুরুষটিই আমাকে একবার শীতের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন তিনিই আমাকে তাঁর অলৌকিক শক্তিবলে নদী পার করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আমার জীবনদাতা আবার তিনি এসেছেন আমাকে রক্ষা করতে। কে বলবে ভগবান নেই? আমার সামনেই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। মাথায় বিরাট জটা, পরনে ছোট্ট একটা কৌপীন, বিরাট দেহ। আমাকে বাঁচাবার জন্য তিনি আবার এসেছেন, প্রথমবার তাঁকে চিনতে পারিনি। এবার তাঁকে ছাড়ছি না, কিন্তু এই মুহূর্তে আমার করণীয় কি? আমার সব বুদ্ধি আর চিন্তা হঠাৎ যেন উধাও হয়ে গেছে। কতক্ষণ যে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না—শিবরূপী সেই পরমপুরুষ নিশ্চয়ই অন্তর্যামী। তিনি আমার অবস্থা বুঝতে পেরে আমাকে তিব্বতী ভাষায় ভেতরে ঢুকতে বললেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁকে অনুসরণ করলাম। প্রণাম করতে গেলে যদি তিনি আবার উধাও হয়ে যান, কথা বলতে গেলে তিনি যদি অর্ন্তহিত হন যতক্ষণ তাঁর দর্শন পাওয়া যায় ততক্ষণই জীবন সার্থক। তাই অপলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি আমাকে ধরে আগুনের পাশে বসালেন তারপর ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। তাঁর এই মানুষিক আচরণে আমি অনেকটা ধাতস্থ হলাম। তারপর সেই পরমপুরুষ প্রায় নিজের মনেই বলে উঠলেন—

এ ঘরে কোন প্রদীপ নেই কাজেই শুয়ে পড় কাল সকালে তোমার সাথে কথা বলবো। তুমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছো এখন শুয়ে পড়, এই বলে তিনি আগুনের ধারে শুয়ে পড়লেন। তাঁকে ভালোভাবে দেখার জন্য কাঠকয়লার আগুনটাই যথেষ্ট। আমি কম্বলের উপর কম্বল চাপিয়ে শীতে কাঁপছি আর উনি খালি গায়ে একটি কম্বলের উপর

নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়লেন, ঠিক যেমন বেনারসের সাধুরা গঙ্গার ধারে শুয়ে রাত কাটান। মহাযোগী এই বাবাকে এবার আর আমি ছাড়ছি না। ঘরের তাপে আমার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলো। আমি আমার চিন্তাশক্তি ও যুক্তি আস্তে আস্তে ফিরে পেলাম। সেই পরমপুরুষটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম, সাক্ষাৎ শিব ঠাকুর নিশ্চয়ই তাঁর কৈলাস ছেড়ে আমার মতো একটা সাধারণ ছেলের সামনে থেকে ঘুমোবেন না। যোগী, মুনী ও ঋষিরা হাজার হাজার বছর তপস্যা করে যাঁকে পান না তাঁকে আমি কি করে পেলাম। আমার না আছে পুণ্য. না আছে ভক্তি, উপরন্তু আমি একটি পাপী মৌনীবাবা হয়ে এ পথে আসার সময় কত লোককেই না আশীর্বাদ করেছি—আজকের এই শীতের রাতে আমাকে বাইরে রাখলে অন্ততঃ কিছুটা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হত। কিন্তু এ যেন ঠিক তার বিপরীত। এতৎ সত্ত্বেও আমাকে তিনি বার বার তাঁর দু'হাত বাড়িয়ে রক্ষা করছেন। আর যাই হোক মানস সরোবরের এই পবিত্রভূমিতে যাঁকে আজ পেয়েছি তাঁকে আর ছাড়ছি না। মনে মনে তাঁকেই আমি জীবনদেবতা হিসেবে গ্রহণ করলাম।

আমি না শুয়ে নয়নভরে সেই মহাপুরুষকে দর্শন করতে লাগলাম। মনে হল তিনি যেন শিব হয়ে শুয়ে আছেন, আর অদৃশ্য মা-কালী তাঁর ওপর দাঁড়িয়ে আছেন—আমি দর্শক হয়ে তাই দেখছি। কৈলাসের দৃশ্য মনে পড়ল, কৈলাস শিখরই তো তাঁর উপযুক্ত স্থান যেখানে তিনি পার্বতীর সাথে বসে তাঁর সৃষ্টি-লীলায় ব্যস্ত। তবে তিনি কেন এখানে এলেন? হয়তো আসতে তিনি বাধ্য তাঁর সৃষ্টিকে বাঁচাবার দায়িত্ব তো তাঁরই। তিনিইতো বিষ্ণু হয়ে তাঁর সৃষ্টি রক্ষা করছেন আবার প্রয়োজন বোধে ধ্বংস করছেন। পর্বতচূড়া ও কৈলাস শিখরে যে জমাট বরফের পাথর, ব্রহ্মরূপে তিনিইতো তার সৃষ্টিকর্তা, আর নদীরূপে তিনিই বিষ্ণু আবার ধ্বংসের মালিকও তিনিই। আমি কল্পনাই করতে পারছি না যে সশরীরে আমি এখন কৈলাসের পাদপদ্মে বসে আছি—একি স্বপ্ন…একি সত্য—মন বার বার সংশয়ে ভরে উঠছে…। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, ভোরবেলা ঘুম ভাঙল। চোখ খুলতেই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল রাতের কথা, তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম সামনের দিকে তাকাতেই দেখি তিনি উধাও হয়েছেন—আপসোসে মনের ভেতরটা যেন জ্বলে উঠল, আবার হারালাম তাঁকে। এমন সময় কানে এল কার মৃদু কণ্ঠস্বর। কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলাম, আওয়াজটা আসছে পাশের ঘর থেকে—শুনে মনে হল সংস্কৃত শ্লোক, তিব্বতীদের প্রার্থনার শব্দটা অনেকটা নিম্নস্বরের নাভি নাদ। এটা নিশ্চয়ই কণ্ঠস্বর। তাহলে পাশের ঘরে নিশ্চয়ই কেউ আছেন। আওয়াজটা আসলে পাশের ঘরের নয় আসছে নীচের থেকে। কম্বল জড়িয়ে নীচে নেমে এলাম, কানে এবার স্পষ্ট শুনতে পেলাম সংস্কৃত শ্লোক—

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।
যথৈধাংসি …..

অনেকদিন পর যে মাতৃভাষা শুনছি—কৌতূহল দূর করতে না পেরে এগিয়ে গিয়ে

উঁকি দিলাম দরজা ফাঁক করে, আনন্দে আমার ভেতরটা নেচে উঠল ঠিক যেমন হয়েছিল গ্যাংটকের বাজারে সাধুবাবাকে দেখে। রাতের সেই মহাপুরুষই ভগবান বুদ্ধের সামনে বসে গীতা পাঠ করছেন। আনন্দের বেগ আমি সামলাতে পারলাম না, দরজা খুলে ঢুকে গিয়ে সরাসরি তাঁর পায়ে আত্ম-নিবেদন করলাম…। আবার তাঁকে পেলাম।

তিনি পাঠ থামিয়ে আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন—নারায়ণ নারায়ণ, তাঁর আশীর্বাদে আমি ধন্য হলাম। তারপর শুরু হল আমাদের আলাপ। মাথায় বড় বড় চুল, লম্বা দাড়ি, সর্বাঙ্গে ভস্মমাখা, পরনে একটি ছোট্ট কৌপীন, এই শীতের দেশে তিনি নিশ্চয়ই মহাযোগী। তাঁর পরিষ্কার হিন্দীতেই বুঝলাম তিনি ভারতীয় যোগী। তিনি এর আগেও একবার দেখা দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন সেই কথা জানাতেই তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে তিনি আমাকে এই প্রথম দেখছেন—তাঁরই মতো অন্য কাউকে হয়তো দেখেছি। এ বিষয়ে তিনি আর কথা বাড়াতে চাইলেন না। আমার পরিচয় জিজ্ঞাস করাতে, আমি তাঁকে সবিস্তারে আমার কথা জানালাম। তাঁকে স্পষ্ট বললাম যে, আমি বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছিলাম গয়ায়, তিব্বতে আসার কোন পরিকল্পনাই আমার ছিল না, সাধুবাবার প্রতি আমার আকর্ষণই আমাকে এই মহাতীর্থে পৌছে দিয়েছে।

তিনি আমার কথা অতি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন তারপর আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর সেই কঠোর চাউনির সামনে আমি মাথা নত করতে বাধ্য হলাম। তাঁর চোখের মধ্যে লক্ষ্য করলাম এক সম্মোহনী শক্তি লুকিয়ে আছে। অনেকক্ষণ ধরে তিনি আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন—তারপর আমাকে তাঁর বুকের মধ্যে টেনে ধরে বললেন—সব্ কুছ্ শংকরকা খেল্ হ্যায়। তিনি কেন এই কথাটা বললেন বুঝলাম না। তাঁর স্পর্শে আমি শান্তি আর একটা বিরাট আশ্রয় পেলাম, একমাত্র এই মহাপুরুষটিকে দেখার জন্য যদি আমাকে কৈলাসে আসতে হত তাহলেও মনে হয় আমার এই পরিশ্রম সার্থক। আমার জীবন ধন্য হল। কৈলাস থেকে মানসের এই পুণ্যভূমি শিবভূমি, আমাদের সামনেই রয়েছে অবলোকিতেশ্বরের এক বিরাট মূর্তি আর তিনি পাঠ করছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অমৃতবাণী। গীতা পাঠ করতে করতে তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে শিব কৃষ্ণ বুদ্ধ সবই সমান। আমরা যে ভাষায় যাকেই প্রার্থনা করি না কেন তা পৌছয় সেই একই পরমপুরুষের কাছে। শিব তুল্য সেই মহাপুরুষের কাছে বসে প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে গীতার অমৃতবাণী শুনতে লাগলাম। সংস্কৃত শ্লোকের চেয়ে সেই মহাপুরুষের উপরই নজর নিবদ্ধ ছিল। হঠাৎ যেন তিনি আমাকে বশীভূত করে ফেলেছেন।

তারপর একসময় আমরা উঠে ঘরের বাইরে এলাম। লাংবোনা গুম্ফাটা বিরাট নয়, সেটাকে মাঝারি ধরনের একটা ধর্মশালা বললেই ঠিক হবে। আমরা দু'জন ছাড়া সেখানে আর একটি প্রাণী ও নেই। বাইরে এসে আমরা সাতবার গুম্ফা পরিক্রমা

করলাম তারপর কৈলাস পর্বতের দিকে তাকিয়ে জোড়হাতে শুরু করলাম সূর্য প্রণাম—

ওম্ সূর্যং সুন্দর লোকনাথম্ অমৃতম্
বেদান্ত সারং শিবম্।
জ্ঞানং ব্রহ্মময়ং সুরেশরম্ অমলং
লোকৈক চিত্তম্ স্বয়ম্।।
ইন্দ্রাদিত্য নরাধিপং সুরগুরুং ত্রৈলোক্য চূড়ামণিং
ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবস্বরূপ হৃদয়ং
বন্দে সদা ভাস্করম্।
ওম্ হিরণ্যময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্
তত্ত্বং পুষণপাবৃণু সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে ... ।।

প্রার্থনা শেষে তিনি শুরু করলেন সূর্য প্রণাম ব্যায়াম। আমিও চেষ্টা করলাম তাঁকে অনুসরণ করতে। ব্যায়ামের পর তাঁর সাথে আরও অন্তরঙ্গ হওয়ার সুযোগ পেলাম।

ঘরের কোণে একটা ঝুলি টাঙ্গানো তাতে রয়েছে কিছু গম ও ছাতু। আর আসবাবপত্রের মধ্যে রয়েছে একটা অ্যালুমনিয়মের ভাঙা হাঁড়ি। কৈলাস থেকে বরফ গলা জল নিয়ে গীউমা (চু) নদীটা মানস সরোবরে গিয়ে পড়েছে। সেই নদীর জলেই তিনি একবেলা গম সেদ্ধ করে খান। খাওয়া বলতে সেটাই সব। একটু আপন হতেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—এই প্রবল শীতেও আপনি উলঙ্গ রয়েছেন এটা কি আপনার বহুদিনের তপস্যার ফল ?

তিনি হেসে জবাব দিলেন—না, ভস্মই হচ্ছে শীত থেকে রক্ষা পাবার মূল হাতিয়ার। সদাশিব তিনি ঐ চিরতুষারের উপর অনন্তকাল ধরে বসে আছেন সেটা তো ভস্মেরই কারণে। কিছুক্ষণ থেমে তিনি বললেন—আমাদের জীবনে সবই মায়া। এই জগতের সব পদার্থই অগ্নিদাহ্য—শেষে যা থাকে তাই ভস্ম। ভস্মই জীবনের সার। কাম-ক্রোধ-লোভ-মহ-মোদ-মাৎসর্য সব পুড়িয়ে দাও মনের আগুনে তারপর যা পড়ে থাকবে সেটাই তো ভস্ম, সেই ভস্মই তুমি জানবে আমাদের জীবনের অমৃত। সদাশিব তিনি আমাদের কাছে কিছুই চান না, তিনি নিজে ভস্মমেখে বসে আছেন। আমরাও যদি সেই ভস্ম মাখতে পারি তাহলেই আমাদের কোন পাপ স্পর্শ করতে পারবে না। আমি তাঁর কথাগুলো ভুলে যাবার আগেই তাড়াতাড়ি ঝোলার ভেতর থেকে পেন্সিল আর কাগজ বার করে লিখে নিতে লাগলাম। তিনি তা দেখে হেসে উঠলেন—মনে হল আমি ছেলেমানুষি করছি, তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন—বাবা জগতের সত্য জিনিসটাকে চিত্তের উপর লিখে রাখার চেষ্টা কর। তাঁর কথা শুনে আমি কাগজ পেন্সিলটাকে আবার ঝুলির মধ্যে রাখতে বাধ্য হলাম।

তিনি উপদেশ দিয়ে বললেন—বাবা তুমি অনেক পুণ্যের ফলে এখানে এসে পৌছেছ। ভারত হতে যারা কৈলাসনাথে আসেন আলমোড়া দিয়ে সেটা খুব সংক্ষেপ

পথ, দু'তিন সপ্তাহ মাত্র লাগে, আর তুমি এসেছ লাসা হয়ে সেটা তিব্বতীদের পথ, ভগবান শিবশংকর তোমাকে ডেকেছেন তুমি ভাগ্যবান। আমাকে তোমার সংকল্প খুলে বল আমি তোমাকে সাহায্য করবো।

তাঁর কথা শুনে আমি অবাক হলাম, জিজ্ঞাসা করলাম—বাবা সংকল্প জিনিসটা কি ?

এই মহাপুরুষকে দেখা অবধি বার বার আমার কৈলাস শিখরে শিবের কথাই মনে হচ্ছে তাই তাঁকে কৈলাস-বাবা বলেই গ্রহণ করেছি। তিনি সংকল্প কি সেটাই বুঝিয়ে বললেন—

সংকল্পকে কথায় বলা হয় তীর্থযাত্রীর ইচ্ছা। তীর্থস্থান বা যে কোন মন্দিরে দর্শনের সময় মনের ইচ্ছা বা বাসনার জন্য প্রার্থনা করতে হয়। মানুষ মাত্রেই এই ইচ্ছা বা সংকল্প নিয়েই তীর্থক্ষেত্রে আসে। অনেকদিনের সাধনা রাস্তার কষ্ট ও তপস্যার পর তারা ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করে। ভগবান তুষ্ট হয়ে তাদের মনোবাসনা পূরণ করেন।

বাবাকে জানালাম যে সে ধরনের কোন সংকল্পই আমার নেই। লাসায় জোখাং মন্দিরেও আমি কিছু চাইনি, আর এখানেও আমি কিছু চাইতে আসিনি। সংকল্পের বিষয় আমি এই প্রথম শুনছি। আমার এই অপরাধের জন্য বাবার কাছে ক্ষমা চাইলাম। তারপর আবার শুনালাম আমার ইতিহাস, তার মানে আমার এই কৈলাস পর্যন্ত আসাটাই হঠাৎ হয়ে গেল। বিনা মন্ত্রেই আমি ধ্যান করি, বিনা তন্ত্রেই আমি হয়েছি লামা। বিনা তপস্যাতেই আমি এসেছি এই স্বর্গভূমি কৈলাসে আর বিনা প্রার্থনাতেই পেয়েছি আপনার আশ্রয়। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না বার বার মনে হচ্ছে যে আমি স্বপ্ন দেখছি।

কৈলাসবাবা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—জগতে কোন কিছুই বিনা কারণে ঘটে না। কর্মফলেই আমরা জন্মেছি আর কর্মফলেই আমরা সুখ ও দুঃখ ভোগ করি। তোমার যদি কোনো রকম সংকল্প না থাকে তাহলে তো তুমি মহাত্মা। যোগীরা বলেন, বিনা সংকল্পে যারা কৈলাসনাথ দর্শন করেন তারাই পান মুক্তি।

বাবাকে আমি খুলে বললাম যে আমি এক মহাপাপী, সাধুবাবার সঙ্গ পাবার জন্য আমি তাঁর থেকে দীক্ষা নিয়ে হয়েছি লামা, চীনাদের হাতে ধরা পড়বার ভয়ে হয়েছি মৌনীবাবা। সাধু না হয়েও কত লোককে আশীর্বাদ করেছি—আমি মিথ্যাবাদী।

বাবা বললেন—তা সত্ত্বেও তুমি এসে পৌঁছেছ এই মহাতীর্থে, মানুষের লক্ষ্য যদি ঠিক থাকে তাহলেই হল, তুমি যদি কারুর অনিষ্ট না কর তাহলেই তো ঠিক পথ ধরা হল।

কথায় কথায় মনে পড়ল সেই লামার দেওয়া চিঠিটার কথা, সেটাকে বার করে বাবার হাতে দিলাম। তিনি চিঠিটা নিয়ে বার বার এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখে বললেন যে তিনি তিব্বতী ভাষা পড়তে পারেন না তবে বুঝতে পারেন আর বলতেও পারেন।

কৈলাসবাবার কাছ থেকে মানস সরোবর ও লাংবোনা গুম্ফা সম্পর্কে বিশদ জানতে পারলাম। থোক্‌চেনকে অনেকে বলে তাসাম, আমি ভেবেছিলাম সেটাই তার স্থানীয় নাম। আসলে তাসাম কথাটার মানে অনেকটা থানার মতো। এই অঞ্চলে যে জায়গায়

থানা বা সরকারী দপ্তর আছে তাকে বলা হয় তাসাম। তাসামেই বসে সে অঞ্চলের সেরা হাট। কৈলাসনাথ ও মানস সরোবরের তীর্থযাত্রীদের বাজার হাট করার জন্য তাসামে আসতেই হয়। মানস সরোবরের পূর্বদিকে যেমন আছে থোক্‌চেন তাসাম, তেমনি উত্তরে আছে তারচেন তাসাম। মানস সরোবরের দক্ষিণদিকে যারা আসেন তারা তাক্‌লাকোট থেকে বাজার হাট করেন। শাস্ত্রে আছে যে, কৈলাস দর্শনে সাতজন্মের পাপ দূর হয়, আর মানস সরোবরে ডুব দিলে হয় মুক্তি। পুণ্যাত্মা ও সাধু মহাপুরুষরা এখানেই তপস্যার ফলে বর লাভ করেন, আর তাঁর দর্শন পেয়ে নির্বাণ লাভ করেন। বৌদ্ধ ও হিন্দুদের এটা পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র, এরচেয়ে পুণ্যভূমি জগতে আর নেই। এখানে কোন হিন্দু মন্দির নেই। আগে ছিল কি না তাও কেউ বলতে পারবে না। প্রাচীন কোন হিন্দু মন্দিরের চিহ্নও এখানে নেই। তীর্থযাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই বৌদ্ধ-তান্ত্রিক। হিন্দু সাধু বা তীর্থযাত্রীরা এখানে আসেন দর্শন স্পর্শ ও স্নানের জন্য। মানস সরোবর ও রাবণ সরোবর যদিও বিরাট সমতলের উপর অবস্থিত তা হলেও একটু দূরে তার চারপাশে ছোট খাটো অনেক পাহাড় আছে। সে সব পাহাড়ের আছে অসংখ্য গুহা, অনেক সাধু মহাপুরুষরা তপস্যা করবার জন্য সেখানে আসেন।

মানস সরোবরের চারদিকে অনেকগুলো গুম্ফা আছে, শীতকালে যখন নদীর জল জমে বরফ হয়ে যায় তখন তিব্বতীরা এই গুম্ফাগুলোকে ধর্মশালা হিসেবে ব্যবহার করেন। গুম্ফাগুলো সাধারণ বাড়ীর মতোই। হিন্দু তীর্থযাত্রীদের অনেকে মানস সরোবরে পিতৃ-তর্পণ, শ্রাদ্ধ বা প্রায়শ্চিত্তের জন্য আসেন। এইসব গুম্ফাগুলোতে তার জন্য পাণ্ডা ও পুরোহিত পাওয়া যায়। এখানে কৈলাসবাবার দর্শন আমার পথে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করল। প্রথমে ভেবেছিলাম তিনিই স্বয়ং শিব। তারপর ভেবেছি তিনিই আমার ইষ্টদেবতা আমাকে ইনিই বার বার বিপদ থেকে রক্ষা করছেন। কিন্তু কৈলাসবাবার মতে তিনি নাকি আমার জন্য কিছুই করেননি,তাঁর দর্শন করুণাময়ের আর এক লীলা মাত্র। ভাবতেও আশ্চর্য লাগছে যে, তাঁকে এই লাংবোনা গুম্ফায় কি করে সম্পূর্ণ একা পেলাম। যোগাযোগের কথা যতই ভাবছি ততই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। করুণাময়ীর একি অসীম করুণা। কি জানি হয়তো একেই বলে স্থান মাহাত্ম্য।

কৈলাসবাবা আসলে পৌড়ি গাড়োয়ালের লোক। আলমোড়ায়ই তিনি বেশি থাকেন। তাঁর নিজস্ব কোন আশ্রম বা ডেরা নেই। তিনি এবার নিয়ে সাতবার কৈলাসখণ্ডে এলেন। প্রত্যেকবারই তিনি মাসখানেক থাকেন। দেখলে মনে হয় ষাট পঁয়ষট্টি বছরের কিন্তু আসলে তারও বেশী। প্রাণায়াম ও হঠযোগের ফলে শরীরটাকে মজবুত রেখেছেন আর ধ্যান ধারণার ফলে আধ্যাত্ম জগতের অতি উচ্চ পর্যায়ে তিনি উঠে আছেন। আমার মতো একটি সাধারণ ছেলের পক্ষে তাঁর শক্তি জানা অসাধ্য।

যদিও মানস সরোবর, রাক্ষস সরোবর ও কৈলাস পর্বত এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তীর্থ তবুও সেখানে আজকাল তীর্থযাত্রীদের ভাঁটা পড়েছে। বছর চারেক আগেও এই সময় এখানে তীর্থযাত্রীদের ভিড় হতো আর আজকাল লোকজন নেই—সেই ধর্মশালা বা গুম্ফাগুলো আজকাল প্রায় শ্মশানে পরিণত হয়েছে। আলমোড়া ও কাশ্মীর থেকে

তীর্থযাত্রীদের পথ এখন সম্পূর্ণ বন্ধ। সিকিমের পথতো আমি নিজের চোখেই দেখেছি। তীর্থযাত্রীদের মধ্যে যারা ছিল ধনী তার সবাই বলতে গেলে ভারতীয়। গরমকালে তাই চারদিক থেকে যাযাবররা মানস ও কৈলাসখণ্ডে এসে ভিড় করতো। পশম ও পাথর বিক্রি করাই ছিল তাদের প্রধান ব্যবসা। অপেক্ষাকৃত গরীব যাযাবররা তীর্থযাত্রীদের কাছে ভেড়ার দুধ বিক্রি করতো। আর যুবকরা পথক্লান্ত অথবা অসুস্থ তীর্থযাত্রীদের হয়ে পরিক্রমা করতো। গরমের সময় মানস পরিক্রমার কোন প্রশ্নই উঠে না কিন্তু শীতকালে কৈলাস পরিক্রমা খুব কঠিন। শীতকালে আট আনা ও গরমকালে মাত্র চার আনা পয়সা হলেই এরা তীর্থযাত্রীর নামে পরিক্রমা করে।

এই অঞ্চলে গুম্ফা ছাড়া যাযাবরদের কালো কালো তাঁবু নজরে পড়ে। এদের মতো সহজ ও শক্ত মানুষ পৃথিবীতে আর নেই। এই অঞ্চলটি অর্থাৎ কৈলাসখণ্ড যদিও তিব্বতের মধ্যে তবুও এখানে ভূটান রাজ্যের আধিপত্যই বেশী। এখানকার মূল মণ্ডি বা বাজার আর অনেকগুলো গুম্ফার মালিক ভূটান সরকার। রাজনৈতিক কারণে আজকাল ভূটানী ব্যবসায়ীরা এখানে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। অনেক লামা সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ভূটানে অথবা কাশ্মীরের দিকে চলে গেছেন। সে কারণেই অন্যান্য অনেক গুম্ফার মতো এই লাংবোনা গুম্ফাও পরিত্যক্ত হয়েছে। কৈলাসবাবা প্রায় দু'সপ্তাহ যাবৎ এখানে এসেছেন। কয়েকদিন মৌন থেকে পূজা ও প্রার্থনা করে, কৈলাস পরিক্রমার পর এখন বিশ্রাম করছেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি চলে যাবেন।

বাবা একটা ঘর দেখিয়ে বললেন যে এখানেই তিনি 'চাম্' তপস্যার জন্য প্রথম এসেছিলেন। 'চাম্' তপস্যার বিষয় আমি জানতাম না তাই বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম—এই তপস্যাটা কি রকম ?

তিনি উত্তরে বুঝিয়ে দিলেন চাম বা ছাম হচ্ছে তিব্বতী শব্দ অর্থ নির্জন। নির্জনে সম্পূর্ণ অন্ধকারে থেকে ভগবৎ চিন্তা করাকে বলে ছাম-তপস্যা। এটা তন্ত্র সাধনার এক প্রধান অঙ্গ। মহাকাল বা ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করে তাঁর পায়ে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিতে হবে। এই তপস্যা খুবই কঠিন মার্গ। তিনদিন, সাতদিন, এক বছর, দু'বছর, দশ বছর যার যেমন ক্ষমতা সে সেইরকম প্রতিজ্ঞা নিয়ে এই ঘরে প্রবেশ করে। ঘরটা সম্পূর্ণ অন্ধকার কোন জানালা দরজা নেই। ঘরের ভেতরে ঢুকতে হয় যে গুহা দিয়ে সেই গুহাটিও অতি ছোট, আঁকাবাঁকা পথ গুহাতে এসে পৌছেছে তাতে এতটুকু আলো প্রবেশ করে না । খাবার জন্য দিনের বেলা গুম্ফা থেকে একজন লামা এসে গুহার কাছে দাঁড়িয়ে হাত তালি দিয়ে খাবার রেখে যায়। বাইরের জগতের সাথে সেটাই একমাত্র সম্বন্ধ কোন রকম কথাবার্তাই হয় না। সাধককে গুহার কাছে এসে খাবার নিয়েই আবার প্রবেশ করতে হয় অন্ধকারে। খাওয়ার শেষে সে থালাটা গুহার মুখের কাছে রেখে আবার ঢুকে পড়ে বদ্ধ ঘরের মধ্যে। সম্বলের মধ্যে থাকে দুটো কম্বল আর জপের মালা। নিজের সাথে মুখোমুখি হবার এটাই নাকি চরম পন্থা। মনের উপর ভীষণ জোর আর ইদমের ওপর ঐকান্তিক ভক্তি না থাকলে এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব নয়। অন্ধকার ঘরে একের পর এক দুষ্টু আত্মারা এসে প্রথম প্রথম ভয় দেখাতে থাকে,

তারপর তারা তপস্যার ব্যাঘাতের জন্য আনে নানা রকমের প্ররোচনা। এইসব পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সাধক শব্দ স্পর্শ-রূপ-রস ও গন্ধকে জয় করেন। তারপর আসে অহংকার মন বুদ্ধি ও চিত্তের জয়।

মহাযোগী তান্ত্রিকরা বছরের পর বছর এখানে তপস্যা করে অলৌকিক বিদ্যার অধিকারী হন। এটা মুক্তির পথ নয় শক্তি সাধনার পথ। কৈলাসবাবা সেখানে ছিলেন তিন মাস। সেই সময়ে তাঁর চোখের জ্যোতি অনেকটা ক্ষীণ হয়ে পড়ে। তারপর আবার তিনি সূর্য সাধনা করে সেই জ্যোতি ফিরে পান। বিকেলের দিকে কৈলাসবাবা গায়ে কম্বল জড়ান কিন্তু সব সময়ই খালি পা। এই ঠাণ্ডায় যেখানে ভারী খাঁটি-উলের মোজা ও জুতো পরে আমি শীত আটকাতে পারছি না সেখানে তিনি খালি পায়ে স্বচ্ছন্দে হেঁটে বেড়াচ্ছেন—একেই বুঝি অলৌকিক বিদ্যা বলে। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় মানস সরোবরের অন্য রূপ চোখে পড়ল। জলের রঙটা আগে দেখেছিলাম গাঢ় সবুজ ও নীল রঙের মতো আর এখন দেখছি শুধু যেন নীল। সূর্যাস্তের দৃশ্যটা অনবদ্য।

বাবা বললেন যখন সাধারণ সৌন্দর্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তখন ইচ্ছা হয় সকলকে ডেকে তা দেখাই, সকলের সাথে ভাগ করে নিই সেই সৌন্দর্যের মহিমাকে—সেটাই মানুষের ধর্ম। কিন্তু এখানকার সৌন্দর্য অসাধারণ, এ সৌন্দর্য স্বর্গীয় সৌন্দর্য। এখানে উপলব্ধি করতে হয়, পরমেশ্বরের এই লীলাতে অবগাহন করতে হয়, মানস সরোবরের ঠাণ্ডা জলে ডুব দিলে এখন ঠাণ্ডায় ভুগতে হবে। কাজেই এই দৈব সৌন্দর্যেঅবগাহন কর, মন ভরে দেখো তারপর চেষ্টা কর সেই সৌন্দর্যকে অন্তরে নিয়ে নিজেকে সুন্দর করে গড়ে তোলো। যাঁহার কৃপায় এই ত্রিভুবন সৌন্দর্যে ভরে উঠছে তাঁর কৃপা থেকে আমরাই বা বাদ যাই কেমন করে আমরা তো আর এই ভুবনের বাইরে নই। মানস সরোবরই মন সরোবর। সাধনার দ্বারা গড়ে তুলতে হবে মানস সরোবরের মতো উদার আর গভীর ভাব। মানস সরোবরের উপর উঠছে ছোট ছোট ঢেউ সেগুলো হচ্ছে সংকল্প। সেই সংকল্পগুলো কৈলাস নাথের শ্রীচরণে সমর্পণ করছে তার প্রণতি। মানস তীর্থের মৃদু ঠান্ডা বাতাসে স্নান করে তীর্থযাত্রীরা পাচ্ছে মুক্তি। গঙ্গায় শীতের সময় পূর্ণ জোয়ারের পর যেরকম ভাব-গম্ভীর স্তব্ধতা দেখেছি দেখতে অনেকটা সেরকম। এপার ওপার অনেকটা কলকাতার কাছে গঙ্গার দেড়গুণের মতো। মানস সরোবরের চারদিকে ঘুরতে হলে প্রায় পঞ্চাশ বা পঞ্চান্ন মাইল অর্থাৎ পরিধি হাঁটতে হবে। আমি কৈলাস বাবার সাথে দাঁড়িয়ে আছি মানস সরোবরের উত্তরে, এখান থেকে দূরে গুরলা মান্ধাতা পাহাড়টা অদ্ভুত রকমের সুন্দর দেখাচ্ছে। আরও দূরে ধুধু করছে হিমালয়। চারদিকের স্তব্ধতা আর সৌন্দর্যে হৃদয় ভরে উঠে। এ কথা ভাষা দিয়ে লিখতে পারছি না। এই পরিবেশে থেকে চিন্তাই করা যায় না যে জগতে পাপ ও হীনবৃত্তি বলে কিছু আছে।

মানস সরোবর সম্পর্কে অনেক পৌরাণিক গল্প আছে। স্বামী প্রণবানন্দজীর লেখা Exploration in Tibet হইতে উদ্ধৃত হিন্দুশাস্ত্রে আছে যে মহানাগ এই মানস সরোবরেই বাস করে। মানস সরোবরের মাঝখানে আছে কল্পবৃক্ষ, সেই বৃক্ষের ফল

খেয়ে নাগরাজ জীবন ধারণ করেন, আর বাকি ফলগুলো জলের তলায় ডুবে গিয়ে হয়ে যায় সোনা। একমাত্র ধার্মিক ছাড়া মানস সরোবর কেউ পার হতে পারে না। মানস সরোবরে শিব ও পার্বতী আসেন স্নান করতে, সেই সময়ে এখানকার রাজহাঁসে চেপে সরস্বতী দেবী আসেন তাঁদের দর্শনে। রামায়ণ মহাভারত স্কন্দপুরাণ এই মানস সরোবরের গুণগাথায় ভরা। পুরাণে আছে মহারাজ মান্ধাতা এই মানস সরোবর প্রথম দর্শন করেন সেই থেকে এর নাম হয়েছে মানস। অনেকের মতে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মন-স্বরূপ এই সরোবর। ঐতিহাসিকরা বলেন আর্যদের আগমনের পর থেকেই এই সরোবরের কথা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতে প্রবেশের পথে তাঁরা এখানকার সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

স্থানীয় লামা ও তিব্বতীরা বিশ্বাস করেন যে ভগবান বুদ্ধ এই মানস সরোবরের মাঝখানে বসে আছেন। তাঁকে ছায়া দিচ্ছে একটি অনভতত্ত্ব বৃক্ষ। সেই বৃক্ষের ফুল ফল ও পাতায় আছে অমৃতত্ত্ব। তা খেলে আসে নির্বাণ। জরা ব্যাধি ও মৃত্যু থেকে পাওয়া যায় মুক্তি। শীতের দিনে দণ্ডিপ্রণাম করে কেউ যদি সরোবর পরিক্রমা করেন তাহলেও পাওয়া যায় নির্বাণ লাভ। তিব্বতীদের এই ধরনের পরিক্রমায় লাগে প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ দিন। অস্তমিত সূর্যের আলোতে সরোবর ও দূরের পাহাড় এক নয়নাভিরাম দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। তার উপর রাজহাঁসগুলোকে দেখে মনে হয় এ সত্যি স্বপ্নলোক। বাবা আমাকে ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্রের সুর ধরিয়ে দিলেন আমি তাঁর সাথে উচ্চারণ করতে লাগলাম—ওম্ ভূ-র্ভূবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্ ভর্গো দেবস্য ধীমহী ধীয়ো ইয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওম্। .....

সন্ধ্যের পরই আমরা ফিরে এলাম, সন্ধ্যের পর কৈলাস বাবার অন্য রূপ দেখলাম সেই সদাহাস্যময় বাবা হঠাৎ যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। গুম্ফায় ফিরে এসে আমি কাঠ জ্বালিয়ে কড়াই প্রস্তুত করে ঘরে নিলাম। ঘরে এসেই দেখি বাবা কম্বলের উপর বসে ধ্যানস্থ হয়েছেন। আমি কোন শব্দ না করে কম্বলটা বিছিয়ে তার উপর বসে পড়লাম জপমালা নিয়ে।

কৈলাসনাথ

পরেরদিন খুব ভোরে বাবা আমাকে ডেকে তুললেন। উঠেই দেখি গরম আটার ঝোল প্রস্তুত, অবাক হলাম কারণ তিনি দিনে একবার মাত্র আহার করেন। আমি উঠেই শুরু করলাম নাম জপ মাসখানেক যাবৎ এটাই আমার প্রভাত সঙ্কীর্তন, ওম্ মণি পদ্মে হুম্ ··· । বাবা আমাকে বললেন—গায়ত্রী মন্ত্র জপ কর অন্য কোন মন্ত্র নয়। আমি তাঁর কথা মতো শতবার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে আসন ছাড়লাম। তাঁর সাথে শুরু করলাম সূর্য প্রণাম ও ব্যায়াম। সব শেষ করে যখন উঠলাম তখনও বাইরে সম্পূর্ণ ভোর হয়নি।

তিনি আমাকে আটার ঝোল খাইয়ে দিয়ে বললেন—আমি রাস্তা বলে দিচ্ছি তুই এখনই রওনা হয়ে পড় কৈলাসনাথ দর্শনে। দিরাফুক্ গুম্ফায় চিঠিটা দেখাবি কোন অসুবিধা হবে না। দিরাফুক্ গুম্ফায় তিনদিন থাকবি তারপর চলে আসবি নীচে আমার সঙ্গে আবার দেখা হবে পারখায়, এই বলে তিনি আমাকে কৈলাস শৃঙ্গ প্রদক্ষিণের নির্দেশ দিয়ে দিলেন।

আমি তাঁকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম। কৈলাস বাবাকে এত তাড়াতাড়ি ছাড়তে হবে ভাবতে পারিনি, মনে হল তিনি আমাকে যেন ধাক্কা দিয়ে বাইরে বের করে দিলেন। এই ব্যবহারে কোন দয়া মায়া নেই। মহাত্মাদের আচরণ সাধারণ মানুষ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, জীবনটাকে তাঁরা দেখেন সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। তাঁদের মধ্যে উচ্ছ্বাস নেই আছে শুধু কর্তব্য। শীতের কথা আর লিখে কি হবে, শীতের গায়ে ধাক্কা মেরেই চলেছি—তার স্পর্শে বার বার শরীরের মধ্যে উঠছে হাড় কাঁপুনি। আমি গুম্ফা থেকে বেরিয়ে সরোবরকে বাঁ দিকে রেখে হাঁটতে লাগলাম। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর ধীরে ধীরে শরীরটা যেন জেগে উঠল।এতদিন যাবৎ মণিমন্ত্রটাকে আমার চলার সাথী করে তুলেছিলাম। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে একটা তাল এসে গিয়েছিল চলার পথে সেই মন্ত্রটাই এসে জুড়ে বসল আমার মনে, শুরু করলাম আবার ওম্ মণি পদ্মে হুম্ ওম্ মণি ··· । আস্তে আস্তে আমার সামনের পর্দাটা যেন উঠতে লাগল, ভোরের আলোর সাথে সাথে সামনের রঙ্গমঞ্চ আমার সামনে দৃশ্য হল। একি অপরূপ !

কৈলাসের আজ অন্য রূপ, আধো আলো আধো ছায়ায় তার রহস্যময় রূপটা যেন আমাদের মধ্যে ধরা দিয়েও দিচ্ছে না। তাকে পেতে হলে চাই আরো আলো। অজ্ঞানের কুয়াশাকে জ্ঞানের আলোকে দূরে সরিয়ে ফেলতে হবে। তার জন্য চাই সূর্যদেবের তপস্যা। আমি এবার শুরু করলাম প্রার্থনা ওম্ সূর্যং সুন্দর লোকনাথম্ অমৃতম্ ·····

অনেকক্ষণ চলার পর এবার পেলাম একটা চৌরাস্তা। চৌরাস্তা মানে দুটো হাঁটা

পথ। মানস সরোবরকে এবার ছাড়তে হল তাকে স্পর্শ করে জল মাথায় ছিটিয়ে—অপবিত্র পবিত্রবা সর্বাবস্থাং গতো পিবা যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্য অভ্যন্তরং সূচী—এই মন্ত্র বলে তাকে আপাততঃ ছাড়লাম এবার ধরলাম সরাসরি উত্তরের পথ। কৈলাসনাথ এখন জেগে উঠেছেন ধরা দিয়েছেন ভক্ত হৃদয়ে তাঁর আকর্ষণে আমি চলতে লাগলাম, তাতে নেই ক্লান্তি নেই কষ্ট। রাস্তাটা এখন উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে অথচ এতটুকু কষ্ট হচ্ছে না। থোক্‌চেনের ওদিক থেকে কোনো এক অজানা পাহাড়ের পেছনে শুরু হয়েছে সূর্যদেবের আগমন প্রস্তুতি। সমস্ত আকাশ নতুন রঙে সেজে উঠছে। তারই ছটা এসে পড়েছে কৈলাস নাথের চূড়ায়, দেমচোগ্ দেবের মাথার চূড়াতে সোনালী রঙ ছোঁয়ানো হচ্ছে সমস্ত জগৎ এখন নিঃশব্দে সেই দিকে তাকিয়ে আছে, শিল্পীর শেষ তুলির আঁচড় পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠবে জগৎ উৎসব, শিব মিশবে সূর্যের সাথে। এ এক অদ্ভুত পরিবেশ, অদ্ভুত আনন্দ, নিঃশব্দের ছন্দে হৃদয় বার বার নেচে উঠছে। প্রতিটি প্রাণী আর আকাশ-বাতাস-জল সবাই এক শুভ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছে।

তারপর এল সেই পরম লগ্ন। সূর্যদেব জগৎপিতা উদয় হলেন, চারিদিকের তুষার শুভ্র পাহাড়ের উপর অপ্‌সরীরা শুরু করল তাদের অনবদ্য নৃত্য—সেই নৃত্যের সাক্ষী আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। রূপের আনন্দ-রস আমার প্রতিটি রোমকূপের মধ্য দিয়ে শরীরে প্রবেশ করতে লাগল। এ-কি রূপ ! নিঃশব্দের এ-কি ছন্দ ! কৈলাসের এ-কি জ্যোতি ! তারপর চলল রঙের খেলা—তারই রঙে রঙ লাগিয়ে বিশ্ব সংসার যেন হোলি উৎসবে মেতে উঠল। এই স্বর্গরাজ্যে এই উৎসব চলে প্রতিদিন। দেবতা এখানে রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছেন ভক্ত হৃদয়ে। স্বর্গ থেকে আনন্দের ঝরনা ঝরে পড়ছে এই পৃথিবীর বুকে।

পরম পিতার প্রতি শ্রদ্ধায় আপনা থেকেই আমার মাথা নত হয়ে এল। এখন বুঝলাম যে কেন বাবা আমাকে শেষ রাতে তুলে এখানে পাঠিয়েছেন। বাবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সেই নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে আমার জীবন ধন্য হল। প্রচণ্ড শীত কাজেই এবার আমাকে আবার চলতে হল। রাস্তাটা দেখছি ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠতে আরম্ভ করেছে। শুরু হল এবার কৈলাস শিখরে আরোহণ।

মানস সরোবর ও রাক্ষস সরোবরের উত্তরের দিকে একটা পর্বতশ্রেণী, এই পর্বতশ্রেণী দুটো পাহাড় নিয়ে গঠিত। একটার নাম 'লা' আর একটার নাম 'ঝোং' তারই মধ্যে যে উচ্চতম শিখর সেটাই হচ্ছে কৈলাস শিখর। সেখানেই আমাকে যেতে হবে। লাংবোনা গুম্ফা থেকে দিরাফুক্ গুম্ফার দূরত্ব ষোল থেকে কুড়ি মাইলের মধ্যে। আমি এরই মধ্যে মনে হয় ছ'সাত মাইল পার হয়ে এসেছি। সূর্যদেব আস্তে আস্তে প্রখর হয়ে উঠছেন এই সময় হাঁটতে বেশ ভাল লাগে। পথের ক্লান্তি আগের মতো নেই। কৈলাস শিখরটা আসলে একটা পাহাড়ের উপর মন্দিরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কৈলাস শিখরে উঠবার কোন প্রশ্নই আসে না, সেটা হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে তারই উপর রয়েছে চির তুষারের গম্বুজ। কৈলাস পরিক্রমা করতে হলে 'লা' অথবা 'ঝোং' পাহাড়ে

উঠতেই হবে,এই দুই পাহাড়ের ঠিক সঙ্গমে গড়ে উঠেছে প্রকৃতি-মন্দির। এর গঠনটাও বড় চমৎকার। ঠিন যেন মন্দির আর তার নীচেই রয়েছে দুটো পবিত্র সরোবর। মানস সরোবরে আছে রজঃগুণ আর রাক্ষস সরোবরে আছে তমোগুণ, তাদের এই দুই গুণের সাথে কৈলাসনাথের সত্ত্বগুণ মিশে তৈরী হয়েছে অমৃতবারি, বিভিন্ন নদীর মাধ্যমে সেই অমৃতধারা গিয়ে পৌঁছচ্ছে মর্ত্যবাসীদের কাছে।

পাহাড়ের উঁচুতে উঠতেই পেলাম একটা গ্রাম। এই গ্রামটাকে অনেকটা থোক্‌চেনের সাথেই তুলনা করা যায়। এগারোটি একতলা বাড়ী রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরবাড়ীগুলো প্রায় ফাঁকা। লাসা থেকে যে রাস্তাটা গ্যাংটক, লাডাক ও কাশ্মীরের দিকে চলে গিয়েছে এইটাই সেই রাস্তা। থোক্‌চেনের পর এই রাস্তাটাকেই আমি ছেড়েছিলাম মানস সরোবরে যাবার জন্য। এখানকার উচ্চতা প্রায় ১৫০০০ (পনেরো হাজার) ফিট। কয়েকটা গাধা, ইয়াক ও কুকুর একটা বাড়ীর পেছনে নিশ্চিন্ত মনে সহাবস্থান করছিল—কুকুরগুলো আমাকে দেখেই ছুটে এল, কিন্তু আমার তরফ থেকে কোনরকম সাড়া শব্দ না পেয়ে অনেকটা ব্যর্থ মনে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের ধারণাটা এই রকম যে এই ক্লান্ত ছেলেটাকে আর খাটিয়ে লাভ কি ? চৌমাথাতে একটা চায়ের দোকান পেলাম। বলাই বাহুল্য, কৈলাসখণ্ডে এই প্রথম দেখছি চায়ের দোকান। কোনরকমে মাটি-পাথর-কঞ্চি-কাঠ দিয়ে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। দোকানের ভেতরে দু'জন চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আমিই তাদের উপযাচক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তারচেন কি এই পথে ?

তারা কোন রকম শব্দ না করে আঙুল দিয়ে সামনের পথ দেখিয়ে দিল। আমিও তাদের সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে আবার পথ ধরলাম। পারখা গ্রামের শেষে হঠাৎ নজরে পড়ল একটা বাজার। সেখানেই গ্রামবাসীরা সবাই জড়ো হয়েছে। কৈলাসখণ্ডে মনে হয় এইটাই একমাত্র গ্রাম। আমি তাদের পাশ কাটিয়ে অর্থাৎ কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে এগিয়ে চললাম সরাসরি উত্তরের দিকে। পারখা থেকে আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর পেলাম তারচেন নামে একটা জায়গা। অনেকদিনের পুরোনো একটা কাঠে অস্পষ্ট অক্ষরে হিন্দীতে লেখা রয়েছে 'কৈলাস নাথ'। তিব্বতে এই প্রথম চোখে পড়ল পথ নির্দেশ। মনে হয় আমারই মতো কোন ভারতীয় তীর্থযাত্রী রাস্তার এই নিশানাটা লিখে রেখেছিল। তার একটু দূরেই নজরে পড়ল তিব্বতী ভাষায় পাথরের উপর লেখা 'কাং-রিপোচে'। এই তারচেন থেকেই শুরু হয় কৈলাস প্রদক্ষিণ বা পরিক্রমা।

অবশেষে আমি এসে পৌঁছলাম দেবাদিদেব মহাদেবের শ্রীচরণে; মনের ভক্তি উজাড় করে দিয়ে বললাম—প্রভু তুমিই কৃপা করে এতদূর আমাকে নিয়ে এসেছো তুমিই বলে দাও আমার পথ—আমি তোমার শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করছি। এই বলে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডি প্রণাম জানালাম প্রভুর উদ্দেশ্যে তারপর মুখ থেকে আপনা হতেই উচ্চারিত হতে লাগলো—

ওম্ নমঃ শিবায় ওম্ নমঃ শিবায়

ওম্ নমঃ শিবায় ওম্ নমঃ শিবায়
ওম্ নমঃ শিবায় ওম্ নমঃ শিবায় ···

তারচেন স্থানটি কৈলাস শিখর প্রদক্ষিণের শুরু অর্থাৎ এখান থেকে পরিক্রমা শুরু করে সবাই আবার এখানেই আসে। পরিক্রমা তিরিশ-বত্রিশ মাইল, একদিনেই সাধারণ পরিক্রমা সমাপ্ত হয়। দণ্ডিপ্রণামে লাগে প্রায় ষোল থেকে কুড়ি দিনের মতো। পরিক্রমার সময় বিশ্রামের জন্য এবং ধ্যান ও পূজার্চনার জন্য তার চারদিকে পাঁচটা গুম্ফা আছে। দিরাফুক্ গুম্ফা তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। তারচেনে একটা মাত্র বাড়ী তার কোন দরজা নেই—আগে নিশ্চয়ই ছিল। যাযাবরদের কয়েকটি তাঁবুকে কেন্দ্র করেই এখানকার জীবন। ছেলে-বুড়ো মিলিয়ে গুণে দেখলাম তারা সংখ্যায় মাত্র ন'জন। সেখানেই জমাট দুধ মাখন আর চলবার মতো একান্ত প্রয়োজনীয় কিছু কিছু জিনিস কিনতে পাওয়া যায়। এরাই পরিক্রমার জন্য ভাড়া খাটে অথবা সামান্য পয়সার বিনিময়ে গাইড হিসেবে পরিক্রমায় সাহায্য করে।

আমার কেনাকাটার কিছুই নেই আর গাইড ভাড়া করার তো প্রশ্নই আসে না। যাযাবরদের দু'একটা ছেলে আমার কাছে এসে প্রণাম করেই দূরে সরে দাঁড়ালো, কৈলাসনাথের এই পুণ্যভূমিতে যারা বাস করেন তারাও নিশ্চয়ই পুণ্যবান, তাই তাদেরও আমি প্রথামত প্রতিনমস্কার বা আশীর্বাদ না জানিয়ে সরাসরি দণ্ডি প্রণাম বিনিময় করলাম।

তারচেন থেকে একটা রাস্তা সরাসরি উত্তরের দিকে উঠে গেছে, আর একটা রাস্তা প্রথমে উত্তর-পশ্চিমের দিকে গিয়ে তারপর উত্তর দিকে উঠে গেছে। বাবা এই দ্বিতীয় রাস্তাটি নেবার কথাই বলে দিয়েছেন। তারচেন মানস সরোবর থেকে প্রায় দু'শ ফিট উপরে অর্থাৎ মানস সরোবরের উচ্চতা প্রায় ১৪৯০০ ফিট আর তারচেনের উচ্চতা প্রায় ১৫১০০ ফিট।

তারচেন থেকে রাক্ষস সরোবর ও মানস সরোবর আর ইহার বিশাল সমতলভূমি অতি পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। মানস ও রাক্ষস সরোবরের আকৃতিটাও এখান থেকে সুন্দরভাবে দেখা যায়। মানস সরোবর গোলাকার আর রাক্ষস সরোবর প্রায় ভগ্ন ত্রিভুজাকৃতির। এখান থেকেই গুরলা মান্ধাতার পর্বতচূড়াগুলোর অনবদ্য রূপ পথিক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কিছুদূর যাবার পর পেলাম একটি ঝরনার মতো নদী। নদীর দু'ধারের বরফ তখনও সম্পূর্ণ গলেনি। এই পাহাড়ের নাম অনুসারেই নদীটির নাম লা-চু, চু অর্থাৎ নদী। পেমা ফুক নামক একটা জায়গায় হালকা কাঠের সেতু পার হতেই পেলাম একটা গুম্ফা। কৈলাস পরিক্রমার পথে এটাই প্রথম গুম্ফা। এই ধরনের আরও চারটে গুম্ফা কৈলাসের চারদিকে বৃত্তাকারে ঘিরে রয়েছে। একতলা একটা বাড়ী। বাড়ীটার কাছে যেতেই ভেতর থেকে দু'জন লামা বেরিয়ে এসে আমাকে শুভেচ্ছা জানালেন, আমিও হেসে তাদের নমস্কার জানালাম। তারা দু'জনেই আমাকে হেসে উৎসাহিত করে এগিয়ে যেতে বললেন, গুম্ফার নাম নীয়াংরি গুম্ফা।

লা-চু নদীকে আমার ডানদিকে রেখে আমি উপরে উঠতে লাগলাম। পাহাড়টা এবার আরও খাড়া হয়ে উঠেছে। মাথার উপর সূর্যদেবের উত্তপ্ত উপস্থিতির জন্য ঠাণ্ডার হাত থেকে আপাততঃ রেহাই পেয়েছি। এখন আমি কৈলাসনাথের পাদপীঠে এসে পৌঁছেছি। পাহাড়ের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে কাছে গেলেই তার ব্যক্তিত্ব যায় হারিয়ে। দূর থেকেই তার ব্যাপ্ত সুন্দর রূপটা চোখে পড়ে আর কাছে গেলে সেই বিরাটের এক কণামাত্র পড়ে ধরা। সেই বিরাট আরও হাজার হাজার গুণ বিরাট হয়ে আমাদের মত ছোট্ট মানুষকে করে ফেলে আরও ছোট্ট, আমরা যাই হারিয়ে। কৈলাসনাথের পাদপীঠ স্পর্শ করে আমি তাই হারিয়ে গেছি কৈলাস পাহাড়ের হাজার লক্ষ পাথরের মধ্যে।

ব্রহ্মপুত্র যেখানে রূপ নিয়েছে—গাছের গুড়ি ফেলে গ্রামবাসীরা এইভাবেই নদী পার হয়।

এখান থেকে কৈলাসনাথের চূড়া দেখতে পাচ্ছি না। ঠিক যেমন মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখা যায় না মন্দিরের চূড়া। আমার বাঁদিকেও নজরে পড়ল অনেকগুলো পাহাড়ের চূড়া—সেগুলো এখনও সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা। সেই বরফগুলো সবে মাত্র গলতে শুরু করেছে। ছোট ছোট অসংখ্য ঝিরঝিরে স্রোতস্বিনী মাঝে মাঝে একসাথে মিলে গিয়ে তৈরী করেছে ছোট ছোট খালের মতো জলধারা। ঝরনার আকারে সেগুলিই এদিক ওদিক থেকে বার বার উঁকি মেরে তীর্থযাত্রীকে উৎসাহিত করছে। দৃশ্যটা বড় চমৎকার। এ অঞ্চলে কোন গাছপালা নেই কিন্তু পাথর আর বরফের লুকোচুরিতে সৃষ্টি হয়েছে সম্পূর্ণ এক নতুন মায়াজগৎ। চলার কষ্ট আছে কিন্তু এক

স্বর্গীয় অনুভূতিতে সেই কষ্ট পরিণত হচ্ছে আনন্দে। নদীর ধার ধরে ধরে আমি এগিয়ে চলতে লাগলাম।

অনেকক্ষণ পর আরও একটা গাছের গুঁড়ি পাতা সেতু পার হবার পর নজরে পড়ল একটা বাড়ী। মনে মনে ভাবলাম—এটাই হবে পরিক্রমার দ্বিতীয় গুম্ফা অর্থাৎ দিরাফুক্ গুম্ফা। আমার অনুমান মিথ্যা নয়। আর একটু কাছে যেতেই চোখে পড়ল একটি চোরতেন আর প্রার্থনা পতাকা। উচ্চতা এখন প্রায় ষোল হাজার দু'শ ফিট (১৬২০০ ফিট সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে)। এখান থেকে ঠিক মাথার উপরেই দেখতে পেলাম রূপোলী রঙের গম্বুজ মহাতীর্থ কৈলাস শিখর, তাকে আবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানালাম। তারই ঠিক নীচে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে স্বয়ং মহাদেবের কোলে এসে আশ্রয় পেয়েছি। বিশ্ববিধাতার আশ্রয় পেয়েছি এখন আর ভয় কিসের! এ এক অদ্ভূত অনুভূতি! এটাই তো আসল স্বস্তি।

দিরাফুক্ গুম্ফার মূল মন্দিরটা খুঁজে পেতে কোন অসুবিধাই হল না। ভেতরে ঢুকেই প্রার্থনা করলাম ভগবান বুদ্ধের মূর্তির সামনে, তারই পাশে রয়েছে ভগবান দেমচোগ (দোমচেক্) আর ভগবতী দোরজে ফাগমোর মূর্তি। কৈলাস অধিপতি ত্রিভুবনেশ্বর ইনিই আমাদের হরপার্বতী। পুরুষ ও প্রকৃতির লিঙ্গাবস্থা—সৃষ্টির আদিকারণ। এই সৃষ্টিকর্তার কৃপা ভিন্ন সৃষ্টি রহস্য জানা অসম্ভব। তাই তিনি তান্ত্রিকদের পরমপূজ্য দেবতা। কাং রিংপোচের অধিশ্বর অধিশ্বরী মূল মন্ত্রস্বরূপ যবযুং। যুগলমিলনের এই রহস্যের মধ্যেই লুকিয়ে আছে কুলকুণ্ডলিনীর মূল স্রোত। শিবপার্বতী, হরগৌরী রূপী এই মূর্তিকে ইষ্টমন্ত্র হিসেবে নিয়ে জপ করতে হয়। আর মূর্তির কল্পনারূপ ধরতে হবে মানসপটে, লিঙ্গাবস্থার পরম কারণের উপর ধ্যান করে তারপর হয় সিদ্ধিলাভ। এই সিদ্ধিলাভই মূলাধার চক্রের সাথে সহস্রার মিলন। চার পাপড়ির মূল আধার সং-বং-শং-ষং মিলিত হয় লং মন্ত্রে তারপর আপন তেজে সেই প্রকৃতি শক্তি উঠে যায় শিবশক্তির দিকে, একের পর এক চক্র পার হয়ে সপ্তম চক্রে সে পরিণত হয় ভূমালোকে। এক মিশে যায় অমৃত সমুদ্রে। শক্তিরূপিণী জ্ঞান-প্রজ্ঞাদায়িনী করুণাময়ীকে বার বার আমার অন্তরের ভক্তি নিবেদন করতে লাগলাম।

হে দেবী, মা—তুমিই মন, তুমি চিদাকাশ, আগুন, জল আর পৃথিবী, তোমা ভিন্ন এ জগতে কিছুই নাই। সব কিছুই তোমার লীলা-সৃষ্টি সেই কারণেই তুমি শিবের আসনে বসে আছ। তুমিই চিত্তস্বরূপ চিদানন্দময়ী এ বিশ্ব সংসারে জ্ঞান শক্তিরূপিণী।

প্রার্থনা শেষে আমি বসলাম ধ্যানে। প্রদীপের মৃদু আলোয় মঞ্জুশ্রীর মূর্তিটাই আস্তে আস্তে আমার হৃদয় অধিকার করে বসল। ধ্যান ভাঙার পর আমি মন্দিরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বেলা তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। আমি কাউকে দেখতে না পেয়ে গুম্ফার চারিদিকে ঘুরতে আরম্ভ করলাম। গুম্ফাটাকে একটা বিরাট দোতলা বাড়ী বলা যেতে পারে। বাড়ীটার পেছন দিকে যেতেই শুনতে পেলাম কথাবার্তা। সেই শব্দ অনুসরণ করে আমি একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। তারপর দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি

কৈলাসপতি দোমচেক্ ও তাঁর অর্ধাঙ্গিনী দোরজে ফাগমো (শিব ও শক্তি)

মেরে দেখতে পেলাম কয়েকজন লামা একসাথে বসে কথাবার্তা বলছেন। দেখে মনে হল যে কোন বিতর্কের জন্য তারা প্রস্তুত হচ্ছেন।

আমাকে কিছু বলতে হল না, একজন আগন্তুক দেখে তারাই আমার সামনে এসে একে-একে হাজির হলেন। আমি তাদের প্রণাম করে ঝোলা থেকে জ্ঞানীগুরুর লেখা চিঠিটা বার করে দিলাম। চিঠিটা এহাত ওহাত করে শেষে বয়স্ক একজন লামার হাতে গিয়ে পড়ল। তার মাথার টুপী দেখেই বুঝলাম যে তিনিই সম্ভবতঃ দিরাফুক্ গুম্ফার অধ্যক্ষ। বেশ ঘি দুধ খাওয়া চেহারা, চর্বির চাপে মনে হয় শরীরটা আসনের মধ্যে থেঁতলে বসে গেছে। আমার চিঠিটা তিনি বারবার পড়লেন তারপর সেটাকে উল্টে পাল্টে দেখলেন। চিঠিটার মধ্যে কি লেখা ছিল আমি জানি না কিন্তু অধ্যক্ষ মহাশয়ের ভাবটা দেখে মনে হল যে তিনি চিঠিটার সারমর্ম বিশ্বাস করেও যেন করতে পারছেন না। আমি মৌনী-ত্রাবা হয়েই সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। ভেবেছিলাম তিনি হয়তো আমাকে আদর করে বহুদূরের এই গরীব তীর্থযাত্রীটাকে বসিয়ে খাইয়ে তারপর থাকতে বলবেন। তিনি চিঠিটা পড়ে আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করার ভান করলেন। তার ভাব দেখে আমি খানিকটা জব্দ হয়ে গেলাম, নিরুৎসাহিত তো বটেই। প্রভু কৈলাসনাথ দর্শনে মনে যে মহানন্দের বিপ্লব বইছিল সেটাও যেন হঠাৎ ধাক্কা খেল।

আমার চারিদিকে একুশজন লামা রয়েছেন তারা সকলেই দেখতে তরুণ ও যুবক। তাদের তরফ থেকে কোনরকম সাড়া না পেয়ে আমি নিজেই ইশারায় উপাযাচক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—খুব খিদে পেয়েছে কিছু ভিক্ষা পাওয়া যাবে কি? আর একটু বিশ্রামও দরকার। আমার কথাগুলো না বুঝার কোন কারণই নেই তবুও তারা যেন কোন এক অজ্ঞাত কারণে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। তাদের মনোভাবটা বুঝা মুশকিল। এই অসময়ে তাদের মধ্যে এসে আমি যেন খুব অপরাধ করে ফেলেছি। অগত্যা কোন উপায় না পেয়ে বিশ্রামের জন্য আবার ঢুকে পড়লাম মন্দিরে। মন্দিরের গদিতে বসে অন্ততঃ বিশ্রাম করা যেতে পারে। মনে মনে ভাবলাম, হয়তো উপোস করেই সবাই কৈলাস পরিক্রমা করেন তাই হয়তো আমাকে এঁরা ব্রতচ্যুত করতে চান না।

দিরাফুক্ গুম্ফার এই মন্দিরটাকে আমি মন্দির না বলে বলবো একটা পাঠাগার ও ছাপাখানা। একদিকে ঠাকুর-বেদী, শ'খানেক ঘিয়ের প্রদীপ, মূর্তি, আর পূজার আসবাব পত্রে ভর্তি, তারই সামনে পুরোহিত ও ভক্তদের গদি আর অন্যদিকে দেয়ালগুলো সারি সারি বই ও ছাপাখানার সরঞ্জামে ভর্তি। ছাপাখানা বলতে সবই হাতেরই ছাপার জন্য, কাঠ কালি ও ভারী কাগজে ভর্তি। দেয়ালগুলো সব ভারী কাঠের চারকোনাচে খোপে ভর্তি। সেগুলো সবই ভারী ভারী বইয়ে ভর্তি। প্রত্যেকটা বইয়ের সামনে নাম লেখা কাপড় ঝুলছে। অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী ও যবযুং-এর মূর্তিগুলোর কাঁধে অসংখ্য কাঁথার চাপে মুখগুলো প্রায় ঢাকা পড়েছে। প্রদীপটাকে দেখেই মনে হচ্ছে হাজার বছরের পুরনো। স্বর্গে যাবার সময় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মনে হয় এই প্রদীপের আলোতেই ধ্যানস্থ হয়েছিলেন। কেদারনাথের প্রদীপকে এর তুলনায় নতুনই বলবো। মন্দিরের প্রত্যেকটি থামের সাথে ঝুলছে অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য করা তাংখা। তার অধিকাংশই

কৈলাসনাথ মানস সরোবরের বিভিন্ন কল্পিত রূপ, মণ্ডলা আর দেমচোগ্-এর মহিমা গাঁথা। পরিবেশটা খুবই রহস্যময়। আমি ঘুরে ঘুরে এসব দেখছি এমন সময় দরজা দিয়ে এক-এক করে কয়েকজন লামা এসে আমার পাশে জড়ো হতে লাগলেন। তাদের এই নির্বাক ও নিঃশব্দ আগমনে একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। পরে বুঝলাম যে তাদের উদ্দেশ্য মহৎই, তারা সকলেই আমার সাথে পরিচিত হতে চান। নিঃশব্দেই আমরা দৃষ্টিবিনিময়ের মাধ্যমে মনের ভাব আদান-প্রদান করতে লাগলাম।

পরে তাদেরই ইশারায় আমি বাইরে এলাম। তারপর তাদের পিছন পিছন এসে হাজির হলাম রান্নাঘরে। সেখানে উনোনের সামনে আরও দু'জন লামা বসেছিলেন। আমাকে তারা অতি আদরে হাসিমুখে উনোনের ধারে বসিয়ে খেতে দিলেন। মনে হল তারা যেন আমার আপনজন, বেশভূষায়ই বুঝতে পারলাম যে তারা সাধারণ লামা। দিরাফুক গুম্ফায় একমাত্র এই দু'জন লামারই হাসিমুখ। বাকি সকলের মুখ মনে হয় তপস্যার আগুনে শুকিয়ে গিয়েছে। এখানেই আমি অনেকদিন পর পেলাম ভাত ও শুকনো মাংসের ঝোল। পেট ভরে খেলাম। সন্ধ্যার অনেক আগেই লামারা প্রার্থনা শেষে খেতে বসে গেলেন। আমি রান্নাঘরেরই এক কোণে বেশ গরম পেয়ে কম্বলটা বিছিয়ে বসে পড়লাম। একমাত্র মন্দির ছাড়া রাত্রিবেলা কেউ আলো জ্বালে না তাতে আলোর খরচ বাঁচে আর অন্যদিকে শরীরের পক্ষেও ভাল। আমি শেষ বেলায় খেয়েছি বলে দ্বিতীয়বার আর খেলাম না।

সন্ধ্যের পর দিনের আলো থাকতে থাকতেই যে যার ঘরে চলে গেলেন। অধ্যক্ষ লামাকে আর দেখতে পেলাম না। অবশ্য তাঁর দর্শনের জন্য আমিও কোনরকম চেষ্টা করিনি। একই দিনে আমি অনেকখানি দূরত্বে এসে পড়েছি, তাই আমিও খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আগুন আর আশ্রয় পেয়ে কম্বলটার মধ্যে নিজেকে আড়াইপাক জড়িয়ে শুয়ে পড়লাম।

উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে শোবার সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পরের দিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙল। ভোর বেলা লামাদের খক্খক্ করে কাশি সবে শুরু হয়েছে মাত্র। আমি তাড়াতাড়ি উঠে তৈরী হয়ে পড়লাম। মন্দিরে ঢুকে প্রার্থনা সেরে তারপর বেরিয়ে পড়লাম পরিক্রমার জন্য। বাবা আমাকে পথের নিশানা বলে দিয়েছিলেন কাজেই অসুবিধার কোন কারণই নেই, দিরাফুক্ গুম্ফা থেকে একটা রাস্তা লা নদীর ধার ধরে সরাসরি উত্তর দিকে সিন্ধুনদীর উৎসের দিকে চলে গিয়েছে। আর একটা রাস্তা নদী পার হয়ে কৈলাসনাথের চারদিকে ঘুরে আবার এসে পড়েছে তারচেনে। দিরাফুক্ গুম্ফা থেকে এই দুটো মাত্র রাস্তা আছে কাজেই হারাবার কোন সম্ভাবনা নেই। আমি নদী পার হয়ে পূর্বদিকে এগুতে লাগলাম। পাহাড়ী রাস্তা এখানে এখনও বরফ সম্পূর্ণ গলেনি, কাজেই পাথর আর বরফের মধ্য দিয়েই কোন রকমে পা ফেলে এগিয়ে চলেছি। শীত যে কত রুক্ষ হতে পারে তা এপথে যারা না এসেছেন তাদের বলে বা লিখে বুঝানো মুশকিল।

এবার রাস্তাটা ক্রমাগত উপরের দিকে উঠতে লাগল। এখন প্রায় চারদিকেই বরফের

রাজত্ব। সাদার উপর সাদা সাদা পেঁজা তুলোর মতো আর নুনের পাহাড়ের মতো বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। ভাগ্যিস তিব্বতীরা আমাকে তাদের একজোড়া জুতো দিয়েছিল নয়তো শীতে এখানেই আমার দেহটাকে রেখে যেতে হত। রাস্তা নামে মাত্র, এখন চারদিকেই বরফে ঢাকা। সাদায় সাদা, একটা গাছ বা তৃণখণ্ডও নেই। ভোরের আলো এখন বেশ পরিষ্কার হয়ে দেখা দিয়েছে, তবে সূর্যের আলো বা সূর্যোদয়ের কোন আভাস পাচ্ছি না। আমার সামনেই আর একটা ছোট পাহাড় সেটার ওপর দিয়েই রাস্তাটা এগিয়ে গিয়েছে। এই পাহাড়টাই সূর্যকে আড়াল করে রেখেছে। এখান থেকে কৈলাস শিখরও দেখা যাচ্ছে না কারণ এই রাস্তা আর কৈলাস শিখরের মাঝখানেও কয়েকটি পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

তিব্বতের পথে এই প্রথম বরফের উপর দিয়ে হাঁটছি। এই বরফগুলো পেঁজা তুলোর মতো নয়, পেঁজা তুলোর মতো আকাশ থেকে পড়ে ঠাণ্ডায় জমে গেছে। শূন্য ডিগ্রিতে বাতাস ঘনীভূত হয়ে তুষারাকারে মাটিতে পড়ে কিন্তু তার থেকেও বেশী ঠাণ্ডায় সেগুলো জমে গিয়ে শক্ত পাথরে পরিণত হয়েছে। আমাকে অতি সাবধানে হাঁটতে হচ্ছে। পাথরের উপর শেওলা জমে এমন পিচ্ছিল হয়েছে যে একটু বেকায়দায় পড়লেই এখান থেকে পড়ে গিয়ে জীবননাশের ভয়।

যেহেতু রাস্তা ক্রমশঃ উপরের দিকে গিয়েছে তাই আমি অতি সাবধানে হাঁটছি কিন্তু তা সত্ত্বেও হাঁপিয়ে উঠেছি। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর উপস্থিত হলাম পাহাড়ের সর্বোচ্চাংশে। উঠেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, এখান থেকে আবার পেলাম চারিদিকের মনোরম দৃশ্য। আমার ডানদিকে কৈলাস শিখর, সামনে মানস ও রাক্ষস সরোবর। কৈলাস শিখর আর সরোবরের মাঝামাঝি দূরত্বে নেতেন পাহাড়। এই ছোট্ট পাহাড়টাকেই শিবভক্তরা বলেন শিবের ষাঁড়, আবার কারও মতে নন্দী। তিব্বতীরা বলে ইয়েলাক্ জুং। সূর্যদেবের দেখা পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। সূর্যদেবের অবস্থান দেখেই বুঝতে পারলাম যে, অনেকক্ষণ আগেই তিনি উদয় হয়েছেন। কৈলাস পরিক্রমার এটাই সর্বোচ্চ অংশ। স্থানটির নাম দোলমা-লা ১৮,৬০০ (আঠার হাজার ছ'শ) ফুট উঁচু। এবার আর কষ্টের কোন কারণই নেই। দোলমা-লা থেকেই ডানদিকে দেখতে পেলাম গৌরীকুণ্ড। ছোট্ট একটা হ্রদ। দোলমা-লা থেকে যদিও এটাকে খুব কাছে মনে হয় কিন্তু এর দূরত্ব প্রায় মাইলখানেক। গৌরীকুণ্ডে কোন নদী এসে পড়েনি আর এখান থেকে কোন নদীও শুরু হয়নি। পাহাড়ের মাঝখানে বরফ পড়ে সেগুলোই জমে আছে।

আমি রাস্তা ছেড়ে অতি সন্তর্পণে গৌরীকুণ্ডে এগিয়ে এলাম। জলস্পর্শ করতে গিয়ে হাত ঠেকল বরফে। জলটা জমে কাঁচের মত স্বচ্ছ হয়ে আছে। আমার কাছে এটা সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। ঠাণ্ডায় জল জমে যায় শুনেছি কিন্তু শুনা বা বইয়ে পড়া আর নিজের চোখে দেখে ছুঁয়ে অনুভব করা সম্পূর্ণ আলাদা। আমার কাছে এটা একটা নতুন খেলা। প্রথমে ছুঁয়ে দেখলাম যে জলটা স্থির ও কঠিন, কয়েকটা পাথর কুড়িয়ে জলে ফেলে দেখলাম যে তাতেও ভাঙল না পাথরগুলো হ্রদের উপরেই গড়িয়ে পড়ল।

তারপর অনেক সন্তর্পণে তাতে পা দিয়ে দেখলাম আমার ভার সে সহ্য করতে পারে কি না, এইভাবে নানা পরীক্ষা করে শেষে হ্রদের উপরে এসে দাঁড়ালাম। এই নতুন অভিজ্ঞতায় মনটা আনন্দে নেচে উঠল। এবার শুরু করলাম তার উপর দিয়ে হাঁটা। কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমি একটা পরিপূর্ণ হ্রদের উপর দিয়ে হাঁটছি। প্রকৃতির লীলা কি অদ্ভুত ! এক অলৌকিক শক্তির পরিচয়।

মনের মধ্যে রয়েছে এক অদ্ভুত আনন্দ, আর তার সাথে সাথে সামান্য উৎকণ্ঠা। যে যাদুবলে জলটা হঠাৎ এমন জমে গিয়েছে সেই যাদুতেই যদি এখন হঠাৎ জলগুলো তার নিজ তরল রূপ ধারণ করে তাহলে আমার অবস্থা আর দেখতে হবে না। এই গৌরীকুণ্ডের মাঝখানেই হবে আমার শেষ অধ্যায়। যদি তাই হয় তাহলে ক্ষতি কি ? এই মহাতীর্থে মৃত্যু মানে নিশ্চয়ই অমরত্ব প্রাপ্তি। যুক্তি দিয়ে আমার সেই উৎকণ্ঠাকে দূর করে দিলাম। হ্রদের মাঝখান থেকেই দেখতে পেলাম আভ্যন্তরীণ দৃশ্য। জলের নীচে কিছু শেওলা জাতীয় গাছ আর পাথরের স্তর। মাঝে মাঝে রয়েছে আটকে যাওয়া বুদ্‌বুদ্, সেগুলো হীরকখণ্ডের মতো যেন শূন্যের উপর ভাসছে। হ্রদের উপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে কয়েকবার আছাড় খেতে হল। ভাগ্য ভালো যে কম্বল আর চাদরের জন্য দেহটা সরাসরি শক্ত বরফের উপর পড়েনি নয়তো হাত বা পা ভেঙে এখানেই পড়ে থাকতে হত। বরফের উপর দিয়ে এই চলাকে অনেকটা পুকুরের জলে শেওলা পড়া সিঁড়ির সাথে তুলনা করতে পারি। অতি সাবধানে আমাকে চলতে হচ্ছে, একটু অসাবধান হলেই পিছলে পড়ার ভয়। ভাগ্য ভালো এই হ্রদটা মোটেই মানস সরোবরের মতো বিরাট নয়—প্রায় আধঘণ্টার মধ্যেই আমি পার হয়ে গেলাম ওপারে। তীরে উঠে বার বার তাকিয়ে দেখতে লাগলাম এই গৌরীকুণ্ড। আমি একটা পূর্ণ সরোবরের উপর দিয়ে হেঁটে পার হলাম অথচ একবিন্দু জলও আমাকে স্পর্শ করল না ; কথাটা ভাবতেও আশ্চর্য লাগছে, অবিশ্বাস্য সত্য। এই অভিজ্ঞতাকে আরও স্থায়ী করবার জন্য আমি আবার হেঁটেই পার হয়ে এলাম তার উত্তর দিকে অর্থাৎ যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানেই আবার এসে হাজির হলাম। কৈলাস পরিক্রমায় এটাই বলবো আমার সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা। নতুন অভিজ্ঞতা যদি আনন্দের হয় তা আনে প্রেরণা আমি সেই প্রেরণাতেই আবার পরিক্রমার রাস্তা ধরলাম।

গৌরীকুণ্ডের পরই শুরু হল ছোট ছোট ঝরণার রাজত্ব, পাহাড় থেকে এখন অনেক নীচে নেমে এসেছি, উত্তাপে এখানকার বরফগুলো সবে গলতে শুরু করেছে। কানের কাছে এখন শুরু হল শব্দতরঙ্গের রাজত্ব। তারও অনেক পর পেলাম একটা পাহাড়ী নদী—এটাই 'ঝোং' নদী। এই ঝোং নদীটা কালীঘাটের আদিগঙ্গার থেকেও ছোট, কাজেই পারাপার হতে বিপদের ঝুঁকিটা কম। সেখানে একটা যাযাবরদের তাঁবু দেখতে পেলাম, দেখতে পেলাম বললে ভুল হবে ওরাই আমাকে দেখতে পেল। তিনটি ছেলেমেয়ে আমাকে দেখে ছুটে এসে জিভ বার করে রাস্তার উপর এসে দাঁড়ালো, আমি তাদের মাথা ছুঁয়ে একটু আদরের ভঙ্গিতে প্রত্যুত্তর দিলাম। তারাই আমাকে প্রায় জোর করে তাদের তাঁবুতে টেনে নিয়ে গেল। ছেলে দুটির বয়স দশ-বারো হবে, আর

মেয়েটির বয়স আরও কম। তাঁবুর কাছে আসতেই তাদের অভিভাবক আমার কাছে ছুটে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানালো। আমি একটু অবাক হলাম বটে কারণ তিব্বতীরা সাধারণতঃ জিভ বার করেই প্রণাম করে থাকে। মনে হয় এখানে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের জন্য তারা এই অভ্যাসটা গ্রহণ করেছে। তাঁবুর ভেতরে ঢুকলাম—তাঁবুটা ভারী ত্রিপলের টানা চাদর। বিচুলির কয়েকটা গদী আর প্রচুর পরিমাণে উল। উলগুলো দেখেই মনে হয় ভেড়া থেকে সদ্য কাটা হয়েছে।

আমাকে তারা প্রায় জলের দরে কয়েকটা জিনিস বিক্রী করতে চাইল আমি ইশারায় তাদের বুঝিয়ে দিলাম যে আমার কিছুই দরকার নেই। পশমের পোশাক বিক্রী করতে না পেরে কয়েকটা কৌটো খুলে দেখাতে লাগল সেই অঞ্চলের কিছু মূল্যবান পাথর। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে পাথরগুলো যত সস্তাই হোক না কেন তা কিনবার মতো পয়সা আমার নেই। কিন্তু তাতেও তারা নিরস্ত হল না। একটা পুরনো কাঠের বাক্স বের করে তার ভিতর থেকে বার করে দেখাতে লাগল সে অঞ্চলের কিছু কিছু ধন্বন্তরী ওষুধের নমুনা।

আমি ইশারায় তাদের থামিয়ে দিলাম, শেষে বুঝিয়ে বললাম যে তারা যদি আমাকে এক বাটি গরম দুধ, চা বা কিছু খাবার দিতে পারে তা হলেই আমি খুশী হব। এই বলে তাদের হাতে দু'আনা পয়সা দিলাম। ভদ্রমহিলা পয়সা পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর কোণে রাখা একটা বাটি থেকে জমাট দুধের কতগুলো টুকরো হাতে দিলেন, তারপর বুঝিয়ে দিলেন যে আমাকে দেবার মতো অন্য কিছু তাদের নেই। খিদের সময় এটাই যথেষ্ট। এখান থেকে মানস সরোবর ও রাক্ষসতাল মনে হচ্ছে খুবই কাছে। ঝোং চু'র ধার ধরেই এগিয়ে চলতে লাগলাম। সূর্য যখন ঠিক মাথার উপরে সেই সময় এসে পৌঁছলাম জুথুলফুক্ গুম্ফায়।

বাইরের চোরতেন ঘুরে প্রার্থনা চক্র ঘুরিয়ে দরজায় আঘাত করতে যাবো এমন সময় পাশের একটা ঘর খুলে একজন লামা বেরিয়ে এসে আমাকে হাসিমুখে বরণ করলেন। তিনি বয়স্ক ও বিজ্ঞ দেখেই মনে ভক্তির উদয় হয়। দিরাফুক্ গুম্ফার লামাকে দেখে আমার মোটেই ভালো লাগেনি কিন্তু এখানকার লামাকে দেখেই মনে হল তিনি দেবতুল্য। বয়স কম করেও পঞ্চাশোর্ধ্বে। হাসিমুখে তিনি আমাকে সরাসরি তাঁর পূজোর ঘরে নিয়ে গিয়ে তুললেন। সেখানে প্রার্থনা করে আমরা এসে হাজির হলাম রান্নাঘরে। সেখানে আরও দু'জন তিব্বতী লোক বসে আগুন পোয়াচ্ছিল—আমাকে দেখেই তারা উঠে দাঁড়ালেন। আমার হাব-ভাব দেখেই তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে আমি মৌনী, কোন রকম ভণিতা না করেই তাঁরা এক বাটি সাম্পা গরম করে আমাকে খেতে দিলেন—আমি তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বাটিতে চুমুক দিলাম। মানুষের মধ্যে যে দেবাত্মা আছে তাকে আমরা যাচাই না করেও জানতে পারি। জুথুলফুক্ গুম্ফার বড় লামার দর্শন মাত্রেই মনে হয় দেব দর্শন করলাম। তাঁর মিষ্টি মুখ আর ব্যক্তিত্বের মধ্যে ফুটে রয়েছে হিমালয়ের মহিমা। এই গুম্ফায় পদার্পণের সাথে সাথেই এই মহাপুরুষটি নিঃশব্দে আমাকে আশীর্বাদ করে ঘরে বসিয়েছেন, তারপর খাইয়ে আবার

আশীর্বাদ করে রাস্তার শুভযাত্রা কামনা করে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। না চাইতেই তিনি সব দিয়েছেন, আমি পেলাম সব কিন্তু তাঁকে আমি দিতে পারলাম কি আমার প্রাণ উজার করা ভক্তি ?

জুথুলফুক্ থেকে তীর্থযাত্রীরা যান তারচেনের ধর্মশালায়। সেখানেই কৈলাস পরিক্রমার সমাপ্তি-প্রার্থনা করে পূজা করেন। বাবা আমাকে যেতে বলেছেন সরাসরি পারখায় সেখানেই তাঁর সাথে দেখা হবে। তাই আমি ধরলাম পারখা বা তাসামের পথ, বিকেলের আগেই পৌঁছলাম পারখার চৌরাস্তায়। সেখান থেকে কৈলাস শিখরের দিকে চেয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে নদীর জল মাথায় ছিটিয়ে কৈলাস পরিক্রমার সমাপ্তি ঘোষণা করলাম।

কৈলাসবাবা

চৌরাস্তার চায়ের দোকানটা পার হতেই দু'তিনজন লোক আমার দিকে ছুটে এল—আমি অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকালাম। প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে তারা আমাকে বলল যে গুরুজী আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। গুরু! মনে মনেই বার বার উচ্চারণ করলাম—কোন গুরু? তিব্বতে লামা মাত্রেই আমার গুরু। আর এই কৈলাস খণ্ডে যাঁর দর্শনকে আমি ভগবৎ দর্শন বলে মনে করছি তিনিই হচ্ছেন কৈলাসবাবা—তাহলে কি তিনিই লাংবোনা গুম্ফা ছেড়ে এতদূর এসেছেন আমার জন্য! মনের প্রশ্ন মনেই রেখে আমি তাদের অনুসরণ করলাম। চৌ-মাথার পর একটু এগিয়ে চায়ের দোকানের পাশের একটা বাড়ীতে ঢুকতেই সামনে দর্শন পেলাম কৈলাসবাবার। তিনি আমাকে দেখেই বললেন—এস বস, আমি জানি দিরাফুক্ গুম্ফায় তুমি একরাতের বেশী থাকবে না। আমি তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালাম তারপর মনে মনে বললাম—আপনি তো অন্তর্যামী নয়তো এখানে এত তাড়াতাড়ি আপনার দর্শন পেলাম কি করে? তিব্বতী লোক দু'জন বাবাকে প্রণাম করে আবার ফিরে গেল। বাবা এ অঞ্চলের প্রায় সবাইকে মনে হয় আমার এ রাস্তা দিয়ে যাবার কথা বলে রেখেছিলেন। পারখায় এলে তিনি এ বাড়ীতেই থাকেন। বাড়ীর মালিক ও তার সহধর্মিণী মনে হয় বাবার ভক্তশিষ্য। বাবা বললেন যে পারখা গ্রামটা এ অঞ্চলের খুবই উল্লেখযোগ্য স্থান। এখানকার তাসাম থোক্চেনের থেকেও বিখ্যাত। কৈলাস মানসের সব তীর্থযাত্রীরাই এখানে আসেন তাদের বাজার হাট করতে। এখানকার যিনি শাসনকর্তা তিনি নিজেও ধার্মিক। পারখা গ্রামের সংলগ্নই রাক্ষসতাল বা লাংগাক ৎসো। বাবার কাছ থেকেই শুনতে পেলাম রাক্ষসতালের মাহাত্ম্য। রাক্ষসতাল ও মানস সরোবর দুটো যমজ সরোবর, একটা থেকে আর একটাকে পৃথক করা যায় না। কথিত আছে যে, রাবণ এই হ্রদের ধারেই শ্রীদেবীর তপস্যা করেছিলেন। রাক্ষসতাল থেকে মানসের দূরত্ব মাত্র মাইলখানেক। এই রাক্ষসতাল থেকেই শুরু হয়েছে বিখ্যাত সাতলেজ নদী। ধার্মিক তিব্বতীরা শীতের সময় রাক্ষসতাল ও মানস সরোবর একই সাথে প্রদক্ষিণ করেন। অনেকের মতে এই রাক্ষসতালেই লুকিয়ে আছে কুবেরের ভাণ্ডার, তাই এই দুই সরোবরের মাঝখানের অংশে এখনও ধূলোর মধ্যে রয়েছে স্বর্ণভস্ম। এখানকার বালিতে পাওয়া যায় সোনা। তিব্বতীদের কাছে এই স্থানটা কুবেরের স্থান। এখানকার এই স্বর্ণভস্ম তুলে নেয়া মহাপাপ। তিব্বতীরা কোনদিন তাতে হাত লাগায়নি। মহামান্য দালাই লামাকে একবার স্থানীয় লোকেরা এখানকার একটি বিরাট সোনার পাথর উপহার দিয়েছিলেন কিন্তু মহামান্য দালাই লামা তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন যে এ স্বর্গীয় সম্পদে মানুষের

অধিকার নেই। তারপর সেই সোনার পাথরটাকে রাক্ষসতালে ফিরিয়ে এনে মাটির নীচে রাখা হয়। আমাদের মনের দুই ভাব, একটি দেবভাব আর একটি অসুরভাব। একটি হ্যাঁ আর একটি না বাচক—এই দুই শক্তির টানাটানিতে মানুষের চিত্তবৃত্তি নিরোধ অসম্ভব হয়ে উঠে। সেইসময় তপস্যা করতে হয় কৈলাস অধিপতির। তাঁর কৃপায় এবং আশীর্বাদে অসুরশক্তি অস্তমিত হয়ে দেবশক্তির উদয় হয়। এই দেবশক্তিবলেই মানুষ অমৃত লাভ করে।

পরের দিন খুব ভোরবেলা উঠে আমরা রাক্ষসতালের কাছে এসে দাঁড়ালাম। ভোরবেলা শান্ত হ্রদের উপর কয়েকটি রাজহাঁস চরে বেড়াচ্ছে। দূরে গুরলা মান্ধাতার উপর সবেমাত্র ভোরের রঙ দেখা দিয়েছে। নদীর ধারে কয়েকটি ছেলে ঢেউয়ে ভেসে আসা মরা মাছ কুড়োচ্ছে। রাক্ষসতাল আর মানসের মধ্যে দৃশ্যত কোন পার্থক্য নেই। ঢেউ, রাজহাঁস আর জলের রঙ একই।

লা চু ও ঝোং চু নামে যে দুই নদী কৈলাসকে প্রায় পরিক্রমা করেছে তারা একসাথে মিলিত হয়ে এই রাক্ষসতালে এসে পড়েছে। সঙ্গমের ধারেই একটা ছোট্ট কাঠের ঘর। সেই ঘরের পাশেই আশপাশের পাথর কুড়িয়ে একটা চোরতেন তৈরী করা হয়েছে। আমরা কাঠের ঘরে এসে প্রবেশ করলাম। ঘরটার দারজাটা খোলাই ছিল, ভেতরে ঢুকেই দেখি সেখানে ইতিমধ্যে আরও পাঁচজন লোক বসে আছেন। তাদের মাঝখানে একটা কড়াইতে কাঠের আগুন। আমরাও তাদের সাথে আগুনের চারপাশে গিয়ে বসলাম। বাবা তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—দু'বাটি চ্যাং তৈরী কর। তাঁর কথা শোনা মাত্র একজন উঠে গিয়ে সরোবর থেকে জল এনে উনোনে চড়ালো। বাবা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে এই সরোবরের ধারে একরকম শেওলা জাতীয় ঘাস পাওয়া যায়। এরা প্রত্যেকদিন ভোরবেলা এসে সেই ঘাস সংগ্রহ করে সেগুলোকে বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে। এর থেকে সুন্দর রুটি হয় তা খেতে খুব ভালো। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা চ্যাং পেলাম। চ্যাং খেয়ে আমরা গা গরম করে সেখানে বেশ যুতসই করে বসলাম। আমার কম্বল আর ঝুলিটা সঙ্গে সঙ্গেই থাকে কাজেই সেটাকে পেতেই তার উপর দু'জনে মুখোমুখি বসলাম। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বাবা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—তোর বাবা-মা তো নেই বললি তাদের নাম মনে আছে কি ?

—নিশ্চয়ই !

—ঠাকুর্দার নাম মনে আছে কি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি জবাব দিলাম।

ঠিক আছে তাতেই হবে। এই বলে বাবা পদ্মাসনে বসলেন তারপর আমাকে বললেন—চোখ বুজে কৈলাস শিখরকে কল্পনা করতে। আমি তাঁর কথামতো কাজ করলাম।

অনেকক্ষণ পর তিনি বললেন—এইবার আমি যা বলছি তুই তা উচ্চারণ কর। তাঁর কথামতো আমি শুরু করলাম—

ওঁ পরমশি সুষুম্নাপথেন মূলসৃঙ্গাটমুল্লাসোল্লস জ্বল

প্রজ্জ্বল প্রজ্জ্বল হংসঃ সোহহং স্বাহা।
ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা ....
ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি, ওঁ ঋষিংস্তর্পয়ামি, ওঁ পিতৃংস্তর্পয়ামি।
ওঁ মনুষ্যাংস্তর্পয়ামি, ওঁ গুরুং স্তর্পয়ামি ...

আমি সেই মন্ত্রগুলোর কোন রকম ব্যাখ্যা বা তাৎপর্য না বুঝেই বাবার কথানুযায়ী তোতাপাখীর মতো বলে গেলাম। ঘরের সেই কাঠের উত্তাপে আর বাবার উদাত্ত কণ্ঠস্বরে সেখানে এক পবিত্রভাব ও আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর আমরা বাইরে এলাম, ইতিমধ্যে সূর্যোদয় হয়েছে। রাক্ষসতালের তীরে কুচো পাথরের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাবা বললেন—লামা ধর্মটা হচ্ছে বুদ্ধ তন্ত্র ; বুদ্ধদেবের বাণী আর তন্ত্রের সাধনা এই দুটোর সংমিশ্রণে হয়েছে লামা ধর্ম। বুদ্ধ বাণীর মূল কথা হচ্ছে শূন্য, এরা শূন্যবাদী আর আমরা হচ্ছি পূর্ণবাদী। পরমব্রহ্ম তো শূন্য নন তিনি পূর্ণ তাইতো আমরা বার বার বলি—

"ওম্ পূর্ণমাদাঃ পূর্ণমিদম্ পূর্ণৎ পূর্ণমুদচ্ছতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেব অবসিস্যতে।"

কৈলাসাধিপতি দেম্‌চোক, ধরমপাল আর পাবো তাকে লামারা যে নামেই ডাকুক না কেন তিনি আমাদের সেই আত্মভোলা শিবই। তার পরনে বাঘের চামড়া একহাতে ডমরু আর একহাতে ত্রিশূল। ডমরু বজ্রজ্ঞানের প্রতীক আর ত্রিশূল সংহারের প্রতীক।

কৈলাস শিখরের আশপাশের অন্যান্য পর্বতশিখরে থাকেন অজস্র দেব-দেবী। ভগবান বুদ্ধ তাঁর পাঁচশ ভক্ত শিষ্য নিয়েও এই পাহাড়েই বাস করেন। কৈলাসশিখরে হরপার্বতী লিঙ্গাবস্থায় আছেন—এই লিঙ্গাবস্থাই জগৎ সৃষ্টির মূল রহস্য। হরপার্বতী, যবযুং বা শিব ও শক্তি যে নামেই তাকে অভিহিত করা হোক না কেন আসলে তিনি একই।

কৈলাসের এই পুণ্যভূমিতে হিন্দুদের মূলমন্ত্র হচ্ছে ওম্ নমঃ শিবায়—এই মন্ত্রেই উদ্ধার পাওয়া সম্ভব। কৈলাস পর্বতের আর এক নাম মেরু-পর্বত। কৈলাস পর্বতই জগতের মেরুদণ্ড। এখানকার পবিত্র বায়ুই সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে। এখানকার আধ্যাত্মিক শক্তিই পৃথিবীর যাবতীয় পাপাচরণ খণ্ডন করে পৃথিবীকে প্রলয়ের হাত থেকে রক্ষা করছে। পৃথিবীর সমুদয় পাপের বোঝাকে এখানকার পুণ্যশক্তি দিয়ে ধুয়ে পরিচ্ছন্ন করে পবিত্রতায় পরিণত করা হচ্ছে। এই মেরু পর্বতই রক্ষা করছে পৃথিবীর ভারসাম্য। কৈলাসনাথের পবিত্রতা, রাক্ষসতালের শক্তি আর মানসতীর্থের শান্তভাব এই তিনের সংমিশ্রণে তৈরী হয়েছে এখানকার জলবায়ু আর আবহাওয়া। এখানে যে সব তীর্থযাত্রীরা আসেন তাঁরা বহন করে নিয়ে যান এখানকার দৈবাশীর্বাদ।

এই অঞ্চলের নদীগুলো মর্ত্যবাসীদের জন্য বয়ে নিয়ে যাচ্ছে শ্রীকৈলাসনাথের চরণামৃত। চার দিকের চার প্রধান নদী, যেমন কৈলাসনাথের পূর্বদিকে অশ্বমুখ বা তাম্‌চোগ্ খাম্‌বাব থেকে শুরু হয়েছে ব্রহ্মপুত্র ; পশ্চিমদিকের হস্তীমুখ বা লাংচেন খাম্‌বাব থেকে শুরু হয়েছে সাতলেজ ; উত্তরে সিংহমুখ বা সেংগে খাম্‌বাব থেকে শুরু

হয়েছে সিন্ধু ; আর দক্ষিণে ময়ূরমুখ বা মাগ্‌চা খাম্‌বাব থেকে শুরু হয়েছে কারনালি। এই চারটি নদীই পৃথিবীর অন্যতম পুণ্যবতী নদী। এর জলে স্নান করলে তর্পণ বিনাই মুক্তি লাভ হয়। এরাই তো ধ্যানী-বুদ্ধের চার বাহন।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গাচু নামে একটা নদীর সংগমে এসে থামলাম। এই গঙ্গানদীর সাথে ভারতের গঙ্গানদীর কোন মিলই নেই। গঙ্গাচু রাক্ষস সরোবর ও মানস সরোবরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে। মানস সরোবরের জল বেশী হয়ে গেলে এই গঙ্গাচু'র মাধ্যমেই তা এসে পড়ে রাক্ষস সরোবরে।

গঙ্গাচু'র ধারে এসে আমরা দাঁড়ালাম। বাবা এবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—জামা কাপড় সব খুলে নেমে পড় জলে, আমি অবাক হলাম মনে মনে ভাবলাম এই ঠাণ্ডা জলে যদি ডুব দিই তবে আর উঠতে হবে না। এই কথাটা মনে হতেই নিজেকে সাবধান করে দিলাম—সাক্ষাৎ শিবতুল্য বাবা সামনে থাকতে ভয় কিসের ? শুধু তাই নয় তিনিই আমাকে বলছেন জলে নামতে, তাঁর কথায় কোন রকম সংশয় আনাই পাপ। আমি তাঁর কথামতো এক-এক করে চাদর জামা খুলতে আরম্ভ করলাম। বাবা আমাকে অবাক করে দিয়ে নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই জলে—ঠাণ্ডা তো দূরের কথা মনে হয় তিনি গরম জলে পরমানন্দে স্নান করছেন। তাঁকে দেখে আমার ভরসা হল আমিও এক-পা দু'-পা করে জলে নেমে পড়লাম। আশ্চর্য বটে। ঠাণ্ডা তো নয়ই বরঞ্চ গরমই বলব। জলটা বেশ গরম। আমার চারদিকে সাদা বরফের রাজত্ব আর তারই মধ্যে গঙ্গাচু'র এই জায়গাটায় বইছে গরম জল। পথশ্রান্ত ও ক্লান্ত তীর্থযাত্রীদের জন্য এটা দৈব ব্যবস্থা। মহানন্দে আমি বার বার ডুব দিতে লাগলাম। আমার আনন্দোচ্ছ্বাস তখন আর দেখে কে ? বাবার কাছে শুনলাম যে কৈলাসখণ্ডের এই পুণ্যস্নানে নাস্তিকের মনেও ভগবৎভাব দেখা দেয়।

এই স্থানটা আসলে একটি কুণ্ড, এই কুণ্ডটা বহু প্রাচীনকাল থেকেই তীর্থযাত্রীদের জন্য সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছেন। গঙ্গাচু ধীরে ধীরে তার প্রস্থ বাড়িয়ে কুণ্ডটাকে প্রায় গ্রাস করেছে, কুণ্ডর জল অত্যধিক গরম গঙ্গাচু'র জল মিশে তা গায়ে সহ্য করার মতো তাপে ফিরিয়ে এনেছে। অনেকক্ষণ আমরা স্নান করে গঙ্গাচু'র অন্যদিকে উঠে এলাম, অর্থাৎ আরও দক্ষিণে। বাবা তাঁর ভিজে কৌপীনটাই পড়ে রইলেন। আমার ব্যাগের মধ্যে তিনি একটা কাগজে মুড়ে কিছু ভস্ম রেখে দিয়েছিলেন, সেটাকে নিয়ে তিনি সর্বাঙ্গে ভালো করে মেখে নিলেন।

আমরা এবার মানস ও রাক্ষস সরোবরের ঠিক মাঝখান দিয়ে দক্ষিণদিকে নামতে লাগলাম। চলতে চলতে তাঁকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার কথামতো আমি মন্ত্রপাঠ করলাম বটে কিন্তু তার বিন্দু বিসর্গ কিছুই বুঝলাম না। তিনি তাঁর জিভ দুটাকে একটু সামলে নিয়ে বললেন—তোকে নবজীবন দিলাম—প্রথমে প্রায়শ্চিত্ত তারপর মন্ত্র আর শেষে তর্পণ, কৈলাসে আসা তোর সার্থক হল।

বাবার কথাতে আমি কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করলাম। একেই বলে গুরু কৃপা, আমি কিছুই চাইনি—আমার কর্তব্য-অকর্তব্য কিছুই জানা নেই, বিনা প্রস্তুতিতে আমি এসে

পড়েছি। মানস সরোবর ও কৈলাসে এসে কি করতে হয় লোকে কি করে তার কিছুই আমার জানা ছিল না। স্বয়ং শিব নেমে এসেছেন কৈলাস বাবার রূপ ধরে, তিনিই অসীম করুণা আর কৃপা করে আমাকে অধর্মের থেকে হাত ধরে ধর্মের পথে টেনে তুলছেন।

কৈলাসবাবাকে যত দেখছি ততই অন্তর ভক্তিভরে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল। আমি দীন ভিখিরী; হাতে নেই কড়ি, আমি ব্রাবা, জানি না মন্ত্র, অন্তরে নেই প্রার্থনা। এই মহাপুরুষকে দেবার মত কোন কিছুই আমার নেই—হৃদয়ের ভক্তি উজার করে যে দেবো সে ভক্তিই বা কোথায়? তাই বার বার মনে হচ্ছে যে তিনি সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম জগৎ পিতা, সন্তানের চাহিদা তিনি জানেন—না চাইতেই তিনি দান করেন, চিরজীবন আমি তাঁকেই স্মরণ করে বেঁচে থাকবো সেটাই হবে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয়।

চলতে চলতে তিনি বললেন—ঐ যে দূরে দেখছিস বরফে ঢাকা পাহাড় তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে উঁচু সেটার নাম মেমোনানি তারই ডানদিকে আরও দু'টো উঁচু পাহাড়, ঠিক তার সামনেই আর একটা ছোট পাহাড়। আমি তাঁর কথামতো সেদিকে ভালো ভাবে লক্ষ্য করে দেখতে লাগলাম।

তারপর তিনি আবার শুরু করলেন—সেই পাহাড়ের পাশ দিয়েই রাস্তাটা এগিয়ে গিয়েছে সরাসরি ভারতের দিকে। এর এক নাম গুরলা মান্ধাতা, এবার আমাদের সামনের যে পাহাড়টা দেখছিস এটা গুরলা পাহাড়, মেমোনানির এই পাহাড়ের উপর দিয়ে যেতে হবে সেটাই ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের প্রধান পথ। তুই যে পথে এসেছিস সে পথে কোন ভারতীয় আসে না। আর ভয় নেই এখান থেকে ফেরার পথ খুব সোজা। কৈলাসবাবা তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমাকে বললেন—এবার কতগুলো নাম বলছি মুখস্ত করে রাখ। তার কথা শুনে আমি তাড়াতাড়ি কাগজ পেন্সিল বার করতে যাচ্ছি। তিনি আমাকে বাধা দিলেন—কাগজে নয় মনে, কাগজে যা লিখবে তা তো বেশীদিন থাকে না মনের লেখাই তো আসল। আমি নিরস্ত হলাম। আমি যা বলছি বার বার মনে মনে বল তাহলেই মুখস্ত হয়ে যাবে—তাক্‌লাকোট্ লিপুলেক্ ধরচুলা আল্‌মোড়া—আমি তাঁর কথামতো বার বার আবৃত্তি করতে লাগলাম—তাক্‌লাকোট্ লিপুলেক্ ধরচুলা আল্‌মোড়া, তাক্‌লাকোট্ লিপুলেক্ ধরচুলা আল্‌মোড়া ......।

আমরা সরাসরি একটা পাহাড়ের নীচে এসে দাঁড়ালাম। এই পাহাড়টা অনেকটা গম্বুজের মত দুই সরোবরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ডান দিকে রেখে আমরা এবার ধরলাম মানস সরোবরের তীর। সূর্য যখন মাথার উপর ঠিক সেই সময় আমরা এসে পৌঁছলাম মানস তীর্থের গোসুল গুম্ফায়।

গুম্ফাতে ঢুকবার সময় বাবা বললেন—আজকে এখানেই থাকবি তারপর কালকে গুরলা লা'র পথ ধরে ফিরে যাবি। হিন্দুস্থানে ফিরে যাবার কথা শুনেই আমার বুকটা ধুকধুক করে উঠল—তিনি হঠাৎ যেন একটা শোক সংবাদ ঘোষণা করলেন।

প্রত্যাবর্তন ঃ গোসুল গুম্ফায় পদার্পণ মাত্রেই সেখানে যেন বাবাকে নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গেলো, একজন বিরাট একটা কম্বলের জামা তাঁকে পরিয়ে দিলেন, আর একজন তাঁকে বসবার জন্য একটা ভারী আসন পেতে দিলেন। যেন একজন মহান জ্ঞানীগুরু সেখানে এসে উঠেছেন। বলাই বাহুল্য যে বাবার সাথে থাকায় আমার ভাগ্যেও আতিথেয়তা জুটে গেল। বাবা আসনে বসেই আরম্ভ করলেন মন্ত্রপাঠ—

হরি ওম্ তৎসৎ, হরি ওম্ তৎসৎ, হরি ওম্ তৎসৎ ॥
অউম্ সর্বসমোহিন্যে বিদ্মহে বিশ্বজনন্যৈ ধীমহি।
তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ ॥
অউম্ ভগবত্যৈ চ বিদ্মহে মহেশ্বরৈ চ ধীমহি।
তন্নঃ অন্নপূর্ণা প্রচোদয়াৎ ॥
অউম্ বেদাত্মনে বিদ্মহে হিরণ্যগর্ভায় ধীমহি।
তন্নো ব্রহ্মা প্রচোদয়াৎ ॥
অউম্ নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি।
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ॥
অউম্ তৎপুরুষায় বিদ্মহে সহস্রাকার মহাদেবায় ধীমহি।
তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥*

তারপর সকলে মিলে চারদিকে বসে ধ্যানমগ্ন হলেন। অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভঙ্গ হল, ওম্কার ধ্বনির মাধ্যমে। বাবা নিজেই প্রথমে শুরু করলেন ওম্কার ধ্বনি। সেই মুহূর্তে মনে হল কৈলাস শিখর থেকে একটা শব্দ আস্তে আস্তে রূপ নিল সেই রূপ যেন জ্যোতিতে পূর্ণ আর সেই জ্যোতির চারদিকে সহস্র ছোট ছোট আগুনের শিখা মুহুর্মুহুঃ জন্ম নিচ্ছে। সেই অনুভূতিতে আমরা সবাই আনন্দলোকে বিচরণ করতে লাগলাম।

ধ্যানভঙ্গের পর বাবার সাথে সকলে চলে এলাম সরোবরের ধারে সেখানে কোন রকম কথাবার্তা হল না নিঃশব্দে সবাই পায়চারী করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পর আমরা গুম্ফায় এসে খেতে বসলাম। আলু সেদ্ধ পাহাড়ী কফি সেদ্ধ আর তার সাথে নুনের মতো আটা ছড়ানো। বাবা ও এই গুম্ফার কেউ নুন খান না। খাওয়ার পর আবার মৌনাবস্থা।

গোসুল পৌঁছনোর পর থেকেই বাবার বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। আমার সেই মনখোলা আপনজনটি যেন হঠাৎ দূরে সরে গেছেন। যিনি আমাকে মানস সরোবর ও কৈলাসের কাহিনী বলতেন, যিনি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে আমাকে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত ও তর্পণ করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি যেন হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন। বাবা যখন চোখ বুজে থাকেন তখন তিনি ধ্যানমগ্ন আর যখন চোখ খোলেন তিনি মন্ত্র অথবা নামগান করেন। রাত্রিবেলা আমার থাকার বন্দোবস্ত হল অন্যান্য লামাদের সাথে। অন্যান্য লামাদের

* এই মন্ত্রগুলো পরে পূজ্যপাদ পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের কাছ থেকে শুদ্ধ করে লিখে নিয়েছিলাম।

সাথে এই গুম্ফার লামাদেরও বিরাট পার্থক্য নজরে পড়ল। লামা হলেও মণি মন্ত্রের সাথে এঁরা বৈদিক মন্ত্র পাঠ করেন। মনে হয় এর মূলে আছে কৈলাস বাবার প্রভাব। এখানেও সকলে একবেলাই খান। সন্ধ্যার পরই আমরা যে যার বিছানায় চলে গেলাম। বিছানায় বসে-বসেই চলল নাম জপ। বাবার সাথে দেখা হওয়ার পর থেকেই আমি মণি মন্ত্রের বদলে গ্রহণ করেছি শিব মন্ত্র। মণি মন্ত্রটাকে আমি আমার মনের সাথে যুক্ত করে নিয়েছিলাম, কিন্তু শিব মন্ত্রটাকে মনে হচ্ছে আমার হৃদয়ের সাথে যুক্ত। মাসখানেক যাবৎ তিব্বতী তাংখা, মণ্ডলা আর মহান্ ব্যক্তিদের কাছ থেকে অনবরত শুনছি বিভিন্ন মন্ত্র তার উচ্চারণ ও ধ্বনি, সেগুলো বুঝবার জন্য আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ করে রেখেছি কিন্তু তা সত্ত্বেও ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি না। প্রস্তুতির অভাবে এগুবার চেষ্টা করেও থেমে যেতে বাধ্য হয়েছি। অথচ বাবার ক্ষেত্রে অন্যরকম—তিনি আমাকে কয়েকবার মাত্র বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—কিভাবে মূলশক্তি শিবশক্তির সাথে এসে মিলিত হয়। তাঁর সেই উপদেশটা শোনামাত্রই মনের ঘর পেরিয়ে সরাসরি সে গিয়ে পৌঁছেছে হৃদয়ে। বাবার কথাগুলো সত্যি অমৃত। তিনি বলেছেন মন দিয়ে আমরা বুঝি আর হৃদয় দিয়ে অনুভব করি। জলকে দেখা আর জানা আর তা পান করা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।

বিছানার উপর সহজাসনে বসে আমি বাবাকে স্মরণ করে তাঁরই উপদেশানুযায়ী মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলাম—মূলাধারের লং; স্বধিষ্ঠানের বং; মণিপুরের রং; অনাহতের যং; বিশুদ্ধের হং; আজ্ঞার ওম্; সহস্রার বিন্দু; আর শেষে মনটাকে স্থির করবার চেষ্টা করলাম মহাশিবের শ্রীপাদপদ্মে ···· ।

গুম্ফার লামাদের মধ্যে রিদ্যাং লামাই সর্বাপেক্ষা পূজনীয় তাঁরই তত্ত্বাবধানে গুম্ফার সকলে কাজ করে। গোসুল গুম্ফার লামারা সব সময় এখানে থাকেন না। শীতের দিনে তাঁরা চলে যান দক্ষিণের বড় গুম্ফায়। মাসখানেক হল লামারা সবাই এসেছেন। তপস্যা ও পুণ্যার্জনের জন্য। ভারতবর্ষ থেকে সাধুরা এসে সাধারণতঃ এই গুম্ফায়ই থাকেন। এখান থেকেই তাঁরা কৈলাস পরিক্রমার মন্ত্র শুরু করেন। আর শত বাধা সত্ত্বেও যাঁরা মানস সরোবর পরিক্রমা করেন তাঁদেরও শুরু এখানেই। গোসুল গুম্ফার কাছেই মানস ও রাক্ষস সরোবরের দূরত্ব সবচেয়ে নিকটবর্তী। রিদ্যাং লামাই তীর্থযাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ ও উৎসাহ দিয়ে থাকেন। গুম্ফার অনতিদূরেই আছে যাযাবরদের তাঁবু সেই তাঁবুটাই এখানকার মুদীখানার দোকান। রাক্ষসতাল সরোবরটি যদিও খুব কাছে কিন্তু তীর্থযাত্রীদের মানস সরোবরই মূল কেন্দ্র। ধার্মিক লামা ও যোগীপুরুষদের কাছে দুই সরোবর আর কৈলাস এই তিনটিরই সমান প্রয়োজনীয়তা।

রাতের ঘুমটা ভালোই হয়েছিল কিন্তু ভোররাত থেকেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে। সকলেই খক্ খক্ করে কাশছেন—সকলেই ঠাণ্ডায় ভুগছেন—সে শব্দকে উপেক্ষা করে ঘুমানো অসম্ভব। মাঝখানে বিরাট লোহার কড়াইয়ের আগুনটা প্রায় নিভে আসছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে রান্নাঘর থেকে কিছু কাঠকয়লা এনে তাতে দিলাম, তারপর জুতো সোয়েটার কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাইরে। ভোরের তারা তখনও জ্বল জ্বল করছে—পূর্বাকাশে সামান্য আলোর আভাস দিয়েছে মাত্র। আমি হাঁটতে

হাঁটতে সরোবরের দক্ষিণের দিকে এগুতে লাগলাম। জলের উপর দুটো রাজহাঁস দেখতে পেলাম—তারপর হঠাৎ নজরে পড়ল নদীর ধারে আগুন। কাছে যেতেই দেখি তিনজন লোক চুপচাপ বসে আগুন পোহাচ্ছে। আমি তাদের সাথে যোগ দিলাম। তারা আমাকে প্রণাম করে তাদের উদ্দেশ্য জানাতে লাগল। সূর্যোদয়ের আগেই সরোবরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে যেসব মরা মাছগুলো ডাঙায় এসে পৌছেছে সেগুলোকে সংগ্রহ করা ভালো, নয়তো এখানকার মাছরাঙা পাখীগুলো জেগে উঠলেই মাছগুলোকে খেয়ে ফেলে। আর ভোরবেলা এলেই এখানকার শেওলা ভালো পাওয়া যায়। সেগুলো রাতের ঠাণ্ডায় জমে যায়, ভোরবেলা সেগুলোকে সংগ্রহ করার অনেক সুবিধে। ভোরবেলা একজন তীর্থযাত্রীকে দেখে তারা খুবই খুশী, আজকে তাদের ভাগ্যে নিশ্চয়ই বড় মাছ জুটবে। তাদের আশা পূর্ণ হোক ; মনে মনে তাদের জন্য প্রার্থনা করে আবার পথ ধরলাম।

আমার সামনেই মানস সরোবরের শান্ত শীতল জল, অগাধ পরিপূর্ণতা বোধ হয় একেই বলে। ঠিক উল্টোদিকেই এখন সূর্যোদয়ের সময় হয়েছে। এখান থেকে মনে হচ্ছে সরোবরের ওপার থেকেই যেন সূর্যোদয় হচ্ছে। আবার সেই ভুবনমোহিনী রূপ। গুরলা পাহাড়ের রূপোলী চূড়াগুলো আস্তে আস্তে জেগে উঠতে লাগল—উত্তরে মণ্ডপের মতো কৈলাস শিখর মাথা তুলে দাঁড়ালো। আর তারপরই চলল নিঃশব্দে সেই পরিবর্তনের উৎসব, আমি অতি সামান্য একটা ভিখিরী সেই উৎসবের বর্ণনা দেবার সাধ্য আমার নেই, তার চেষ্টা করতে গেলে সেই মহাসুন্দরের গায়ে কালির আঁচর ছোঁয়ানো হবে মাত্র। কাজেই নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলাম—কৈলাস খণ্ডের সূর্যোদয়। শুধু একদিনের জন্যও এই মহাসুন্দরের রূপ যদি কেউ দর্শন করে তাহলেই এ জীবন ধন্য। আমি তাকে প্রণাম করে বললাম—আমার এ জীবন সার্থক হল পূর্ণ হল। এই অসীম সৌন্দর্য আমার সত্তাকে ছুঁয়ে দিয়ে আমাকে মনের জগৎ থেকে অনুভূতির জগতে তুলে দিয়ে গেল। গুম্ফায় ফিরে এসে দেখি সবাই বাবাকে ঘিরে বসে জপ করছেন। আমিও তাদের সাথে যোগ দিলাম। জপের শেষে বাবা আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, আমি তাঁর সেই জ্যোতিকে সহ্য করতে না পেরে মাথা নত করলাম।

তিনি ইশারায় ঘরের একজন লামার দিকে তাকিয়ে আমার উদ্দেশ্যে বললেন—দুখাং লামা আজকে তাক্‌লাকোট যাবে তুমি ওর সাথে চলে যাও তোমার রাস্তায় কোন অসুবিধা হবে না।

বাবার কথাই আমার আশীর্বাদ তবুও এই স্বর্গলোক ছাড়তে হবে শুনেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভেবেছিলাম বাবার পায়ে কিছুদিন পড়ে থাকবো, তাঁর দর্শনে আমি পেয়েছি আলো তাঁর কথায় পেয়েছি অভয় আর আশীর্বাদ, তিনি আমাকে দিয়েছেন অমৃতের সন্ধান—জীবনে আর কি চাই। আমি বার বার ভাবতে লাগলাম, বাবার অসীম কৃপার কথা। আমাকে ফিরতে হবে, এই চিন্তাটা আমার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল—এত তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে ?

দুখাং লামা আমাকে বাইরে ডাকলেন। তাঁর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি-চেহারায় স্পষ্ট বনেদি ঘরের ছাপ। বাইরে আসতেই তিনি ভাঙা হিন্দীতে আমাকে বললেন—বুঝতেই পারছি যে গুরুকে ছাড়তে খুব কষ্ট হচ্ছে কিন্তু মন খারাপ করবে না। উনি সব দিক বিবেচনা করেই কথা বলেন, তাঁর কথাই গুরুবাক্য বলে মেনে নাও। আমি অতি ধীরে মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দিলাম তারপর জিজ্ঞাসা করলাম—কবে রওনা হবেন ?

এক্ষুণি, এখনই রওনা দিলে আমরা কালকে শিম্‌বিলিং গুম্ফাতে পৌঁছতে পারবো—আমাদের জন্য কিছু খাবার তৈরী হচ্ছে। সাংপা খেয়েই আমরা রওনা হবো। সাধু মহন্তদের কথাই আলাদা যাত্রার জন্য সব সময় তারা প্রস্তুত। তাদের সামনে বা পিছনে কোন বাধা নেই। সেদিন গুম্ফায় একমাত্র আমাদের জন্যই সকালের খাবার প্রস্তুত হল। বুঝলাম সারাদিনে সম্ভবতঃ আর খাবার জুটবে না।

কৈলাসখণ্ড থেকে বিদায় নিতে হবে কথাটা শোনার একঘণ্টার মধ্যেই আমরা খেয়ে দেয়ে তৈরী হয়ে নিলাম। বাবাকে প্রণাম করতেই তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে মনে মনে মন্ত্রোচ্চারণ করে আশীর্বাদ জানালেন। মুখে কিছুই বললেন না। যাবার আগে তাঁর সাথে কিছু কথা বলার ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু তিনি মৌনভাব অবলম্বন করাতে আমার আর কিছু বলার সাহস হল না। মনে মনেই তাঁর কাছে প্রার্থনা করলাম—তুমি আমাকে আলোকের সন্ধান দিয়েছো।—আশীর্বাদ কর তোমার নির্দেশিত পথেই যেন চলতে পারি।

তারপর বাবা আবার ধ্যানে বসলেন। আমি তাঁর সেই ধ্যানমগ্ন রূপকেই গ্রহণ করলাম আমার হৃদয়ে। তাঁর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে তাঁর রূপকে সামনে রেখে আমরা রওনা হলাম।

মানস সরোবরের ধার ধরে প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর আমরা পাথর সাজানো একটা চোরতেন পেলাম। এই চোরতেনের কাছে আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করলাম, তারপর মানস সরোবরের জল স্পর্শ করে মাথায় ছিটিয়ে দিলাম। সামান্য জলপান করে উচ্চারণ করলাম—অপবিত্র পবিত্রোবা সর্বাবস্থাংগতো পিবা যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সং বাহ্য অভ্যন্তরং সূচী। চোরতেন সাতবার প্রদক্ষিণ করে আমরা আবার রওনা দিলাম। কিছুক্ষণ পর মানস সরোবরের প্রায় লাগোয়া পেলাম আর একটি ছোট্ট হ্রদ। অনেকটা সেই গৌরীকুণ্ডের মতোই দেখতে, আয়তনেও প্রায় সেরকমই, তবে এর জল মানস সরোবরের থেকে বেশী ঠাণ্ডা। হ্রদের নাম শুসুপ্ত। শুশুপ্‌ৎসো কথাটা থেকেই মনে হয় এই কথাটা এসেছে।

দুখাং লামা আমাকে বললেন—এই ছোট্ট হ্রদটার তাৎপর্য আছে। আমাদের মন যখন অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে থাকে তখন সুখানুভূতি সম্ভব নয় সেই সুপ্ত মনটাকে ভগবান দেমচোকের আশীর্বাদে জাগিয়ে তুলে তাকে পরিণত করতে হয় মানস সরোবরে। মনের জাগরণ অবস্থাই হচ্ছে মানস সরোবর। মনের প্রসারতা মানেই মানস। মনকে গভীর ও উদার করতে হবে সেটাই তো আসল মুক্তি।

এবার শুরু হল পাহাড়ে উঠার পথ। এখান থেকে আমাদের উঠতে হবে প্রায় এক

হাজার দু'শ ফুট। ঠিক যেমন পেয়েছিলাম ইয়াংটু-এর কাছে, খুব আস্তে আস্তে আমরা উঠতে লাগলাম। কৈলাসনাথ এখন আমাদের ঠিক পিছনে, বারবার থামতে হচ্ছে কারণ পথটা প্রায় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ পথে কোন রকম মন্ত্র নেই, কোন রকম জপ নেই শুধু কৈলাসনাথের রূপটা কল্পনা করেই হাঁটতে হচ্ছে। পথটা খুবই কষ্টকর, এই শীতের মধ্যেও ঘামে আমার শরীর ভিজে গেছে। দুখাং লামার কথাই আলাদা, তিনি এ অঞ্চলের মানুষ এখানেই তার জন্ম, আর পাহাড়ে চলা তার কাছে সম্ভবতঃ আমাদের সমতলে চলার মতো। মাঝে মাঝে থেমে কৈলাসনাথের দিকে তাকিয়ে বাবাকে স্মরণ করে আবার চলতে লাগলাম। চলার পথে আমার নিশ্বাস প্রশ্বাসই মনে হচ্ছে আমার একমাত্র সাথী। প্রকৃতির সেই মনোহরা রূপ যেন আস্তে আস্তে মন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

কথায় বলে যার কেউ নেই তার ভগবান আছেন, কাজেই তিনিই একমাত্র ভরসা। পথ যত দীর্ঘই হোক না কেন তার শেষ আছে। আর মঙ্গলময়ের কৃপায় শেষ পর্যন্ত আমরা এসে পৌঁছলাম সেই পাহাড়ের উপরে। স্থানটির নাম গুরলা-লা, উচ্চতা প্রায় ষোল হাজার দু'শ (১৬,২০০) ফুট। উঠেই পেলাম একটি চোরতেন, কয়েকটা সাদা পতাকা উড়ছে, তীর্থযাত্রীদের মনকে হালকা করবার জন্যই পাশে রয়েছে প্রার্থনা চক্র। সেখানে প্রায় বরফে ঢাকা পাথরের উপর চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম। দুখাং লামা ঠিক যেন পাহাড়ী ইঁদুর এতখানি উঁচুতে উঠতে তার কষ্ট হয়েছে বলে মনে হয় না। একটু বিশ্রাম নেবার পরই সেখান থেকে দেখতে পেলাম মানস সরোবর, রাক্ষসতাল আর কৈলাস শিখরের সুন্দর দৃশ্য। আর দক্ষিণে রাস্তাটা নেমে গিয়েছে নীচের সমতলে। এই সমতলের পর আবার শুরু হয়েছে পাহাড়।

দক্ষিণেই আমাদের চোখে পড়ল বরফে ঢাকা পর পর তিনটি চূড়া, সেটাই গুরলা মান্ধাতা বা মেমোনানি। গুরলা পাহাড়ের এই তিনটিই সর্বোচ্চ শৃঙ্গ, সর্বোচ্চ শৃঙ্গ পঁচিশ হাজার তিনশ' পঞ্চান্ন ফুট। আর তার বাঁদিকে ও ডানদিকে রয়েছে অপেক্ষাকৃত ছোট দুটো শৃঙ্গ। সেখান থেকে বরফ গলে যে নদীটির সৃষ্টি হয়েছে তার নাম গারু। এই অঞ্চলের ছোট বড় সব পাহাড়ী নদীগুলো একত্র মিলিত হয়ে সৃষ্টি করেছে বিখ্যাত করনালী নদী। আলমোড়া থেকে তীর্থযাত্রীরা কৈলাসে যাবার পথে এখানেই কৈলাসনাথ ও মানস সরোবর প্রথম দর্শন করেন। সে কারণে এখানকার স্থান মাহাত্ম্যও অনেক।

আমরা এখন একটা পাহাড়ের সর্বোচ্চ অংশে দাঁড়িয়ে আছি, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে দুই লোক। একটি কৈলাসখণ্ড বা মহাতীর্থভূমি আর একটি মর্ত্যলোক বা মহাভারতভূমি। এখান থেকেই আমাদের কৈলাসখণ্ডকে বিদায় জানাতে হবে। সূর্যদেব এখন হেলে পড়েছেন কিন্তু সন্ধ্যা হতে এখনও অনেক দেরী। কৈলাসনাথ-মানস-সরোবর-রাক্ষসতাল সকলের উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে প্রণাম জানালাম আর বাবাকে স্মরণ করে জানালাম আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বিদায় জানালাম আমার বহু কষ্টার্জিত স্বর্গলোককে। প্রার্থনা জানালাম স্বর্গের দেবতাদের উদ্দেশ্যে। এবার পথ

অনেক সোজা, শুধুই নীচে নামার পথ। গুরলার এই পর্বত কন্দরটির চারদিক এখনও বরফে প্রায় ঢাকা। বরফ গলতে এখনও মাসখানেক সময় লাগবে। নীচে নামতে নামতে দুখাং লামা বললেন—তোমার কর্মফল সত্যি খুব ভালো। লামা বা সাধুরা অনেক চেষ্টা করেও বাবার সাথে কথা বলতে পারেন না আর তুমি তাঁর সাথেই ছিলে।

আমি তার কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তিনি কোথায় থাকেন ?

—তাঁর থাকার কোন ঠিক নেই, তিনি যখন আসেন তখন চারদিকে ঘুরে বেড়ান , সকলেই তাঁকে ভক্তি করেন, সকলেই তাঁকে চান। তিনি সূর্যের তপস্যা করেন, লোকে বলে যে, তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা আছে।

—তিনি কি প্রত্যেক বছর গরমের সময় এখানে আসেন ?

—তিনি যোগীপুরুষ ঠাণ্ডা গরমের কোন প্রশ্নই আসে না। তাঁর যখন খুশী তিনি তখনই আসেন। এই দেখ না আজকাল মানে বছর খানেক যাবৎ ভারতের পথ একদম বন্ধ হয়ে গেছে অথচ বাবার পথতো কেউ বন্ধ করতে পারেনি।

—বন্ধ কেন ? হঠাৎ প্রশ্নটা করলাম।

তিনি জবাব দিলেন—আজকাল লাসায় খুব গণ্ডগোল চলছে। ভারতের সাথে চীনাদের সম্পর্ক ভালো নেই, তাই তারা আটকে দিয়েছে সব পথ। তোমার তো এই সব পথ জানা নেই, তা ছাড়া চীনা সৈন্যদের হাতে পড়লে ওরা অনেক ঝামেলা করে সেইজন্যই তো বাবা তোমাকে আমার সাথে পাঠিয়ে দিলেন। আমি তোমাকে সব পথ বলে দেবো।

দুখাং লামার কাছ থেকে সে অঞ্চলের আরও অনেক তথ্য জানতে পারলাম। এই সমতল ভূমিটাকে বলে পুরাং। এই সমতলেরই শেষ অংশে অবস্থিত শিম্‌বিলিং গুম্ফা। সেটাই এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় গুম্ফা। শিম্‌বিলিং কথাটা মনে হয় শিবলিঙ্গ থেকে এসেছে। লামা ধর্মের আগে হয়তো এখানে শিবলিঙ্গের কোন মন্দির থেকে থাকবে। শিম্‌বিলিং গুম্ফার কাছেই যে শহর তার নাম 'তাক্‌লাকোট'। তাক্‌লাকোট এ অঞ্চলের সেরা গ্রাম। প্রত্যেক মাসে তিন দিন সেখানে হাট বসে আর অনেক দোকানও আছে। আগে এই গ্রামে হিন্দু তীর্থযাত্রীরা থাকতেন আর এখান থেকেই গাধা, ঘোড়া, ইয়াক ভাড়া করে কৈলাসের দিকে রওনা হতেন। এই গ্রামে গাইড, পুরোহিত, দণ্ডি, কুলি, পীঠের ঝোলা সব কিছুই পাওয়া যেতো, আজকাল সেই ব্যবসা উঠে গেছে। সেসব দিনগুলো ছিল খুব আনন্দের। এই অঞ্চলে চোর ডাকাতও খুব ছিল, কোন তীর্থযাত্রীদের একলা পেলেই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। কাজেই তীর্থযাত্রীরা সবাই তাক্‌লাকোট থেকে দলবেঁধে কৈলাসের পথ ধরতেন। বলাই বাহুল্য যে দুখাং লামা ভারত দরদী, তার কথা শুনতে শুনতে এগুতে লাগলাম। সন্ধ্যের সময় আমরা কারদুং নামে একটা গ্রামে এসে উপস্থিত হলাম। গ্রাম না বলে বস্তী বলাই ভালো। পাথর ও মাটির দেয়ালের উপর কোন রকমে একটা ছাদ তোলা হয়েছে মাত্র। একটা চায়ের দোকানে আমরা এসে উঠলাম। রাত্রিতে মাথা গুঁজবার মতো একটা স্থানের দরকার। দোকানের মালিকের অনুমতি নিয়ে সেখানেই আমরা রাতের আশ্রয় নিলাম।

পরের দিন আবার ধরলাম পথ, দোকানের মালিক ভোরবেলা আমাদের জন্য চা তৈরী করে দিয়েছিলেন। চার বাটি চা মাত্র দু' পয়সা। আর শোবার জন্য চার পয়সা পেয়েই মালিক খুশী হয়েছেন। এখন পথটা নীচের দিকে নামছে—পাশেই খাদের মধ্যে নদী। পথটা খুব বিপদজ্জনক। স্থানীয় কুচো পাথর দিয়ে এই রাস্তাটা তৈরী। সব সময়ই মনে হচ্ছে পায়ের তলার পাথর সরে যাচ্ছে। একটু অসাবধান হলেই খাদে পড়ার সম্ভাবনা। নদীটা মনে হয় পাহাড়ের মধ্য দিয়ে কেটে এগিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে সুড়ঙ্গের পথ, আবার কখনও কখনও দুদিক খেয়ে প্রশস্ত হয়ে পড়েছে। চলায় বেশ বৈচিত্র্য আছে। তবে যারা এই পথে কৈলাসের দিকে যান তাদের জীবনটা হাতে নিয়ে এগুতে হয়। আলমোড়া থেকে কৈলাসের পথে এটাই সবচেয়ে দুর্গম। সকাল থেকে অনবরত না থেমে চলতে লাগলাম। মানস সরোবর থেকে যে পথটি আমরা একদিনে নেমে এসেছি সেই পথে সাধারণ তীর্থযাত্রীদের উঠতে লাগে প্রায় তিন দিন। রাস্তার অবস্থা সত্যি ভয়ংকর।

সেদিন সন্ধ্যের সময় আমরা এসে পৌছলাম শিম্‌বিলিং গুম্ফায়। গুম্ফাটি বড় চমৎকার। দূর থেকে দেখে মনে হয় একটা ছোট গ্রাম। কাছে এসে দেখি যে সেটা আসলে একটা বিরাট বাড়ী। পাহাড় কেটে সেটাকে তৈরী করা হয়েছে। অনেকটা উড়িষ্যার উদয়গিরির গুহার মতো। একটা বিরাট রাস্তা হঠাৎ যেন পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। পাহাড়ের কোলে পাহাড় কেটেই তৈরী হয়েছে তার ঘরগুলো। তারই নীচে বয়ে চলেছে করনালি নদী। স্বপ্নের মতো। দুখাং লামা এই গুম্ফার লোক, তিনি তীর্থ করতে কৈলাসখন্ডে গিয়েছিলেন মাত্র। আমরা সরাসরি এসে দুখাং লামার ঘরে ঢুকে পড়লাম। হিমালয়ের কোলে হারিয়ে যাওয়া এই গুম্ফাটির কথা আমি কোনদিন ভুলবো না। ইচ্ছা ছিল একটু বাইরে গিয়ে ঘুরে ফিরে দেখি। কিন্তু পায়ের যে অবস্থা তাতে কোন রকমে কম্বলাশ্রয় পেলেই সে সুখী হবে। অন্যান্য ঘরের মতো দুখাং লামার ঘরটাও খুব ছোট্ট আর অন্ধকার মানে কোন জানালা নেই। মনে হয় এটা পাহাড়ের ভেতরের দিকের ঘর। আমি লামাকে জানিয়ে দিলাম আজকে আর কিছু খাবো না। আমাকে কোন রকমে একটু শোবার বন্দোবস্ত করে দিলেই খুশী হব।

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন—ঠিক আছে এখানেই শুয়ে পড় আমি আরও দুটো কম্বলের বন্দোবস্ত করছি—আগুনের খুব অভাব। কথামাত্র কাজ; আমি আর কোনরকম কথা না বাড়িয়ে বিচুলির একটা গদীর উপর নিজেকে ছেড়ে দিয়ে কম্বল চাপা দিলাম। ভোরবেলা লামাদের প্রার্থনায় আমার ঘুম ভাঙলো। আমি সরাসরি প্রার্থনাঘরে না গিয়ে বিছানার উপর বসেই প্রার্থনা আরম্ভ করলাম।

অনেকক্ষণ পর দুখাং লামা এলেন, তিনি সহাস্যে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন—গতকাল তো কিছুই খাওয়া হয়নি খিদে পেয়েছে নিশ্চয়। তার দিকে তাকিয়ে একটু শুকনো হাসি হাসলাম। তিনি আমাকে নিয়ে একটা হলঘর পেরিয়ে ছোট্ট একটা কুঠুরী ঘরের ভিতরে নিয়ে এলেন। সেই ঘরের জানালা দিয়ে তিনি আমাকে বাইরের দৃশ্য দেখতে বললেন। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। গ্রামটা অনতিদূরেই, এখান

থেকে গ্রামের ঘরবাড়ীগুলো খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে। এই গ্রামটাই তাক্‌লাকোট, একনজরে দেখলেই বোঝা যায় যে এটা একটা বর্ধিষ্ণু গ্রাম। দোতলার ছাদ পেরিয়ে একটা কাঠের ঘরে এসে ঢুকলাম। এটাই রান্নাঘর। রান্নাঘরে ঢুকতেই সেখানকার লামা ও তিনজন দাবা (ত্রাপা) আমাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন। একটা বড় বাটিতে করে মাখন চা আর ছাতুর লাড্‌ডু আমার হাতে দিয়ে প্রাতঃরাশ করতে বললেন। আমরা ছাদে এসে রৌদ্রে দাঁড়ালাম, শিম্‌বিলিং গুম্ফাটা খুব আশ্চর্যজনক। এর গঠনটাও বিশেষ আকর্ষণীয়। পাহাড়ের গা কেটে এটাকে অতি নিপুণতার সাথে তৈরী করতে হয়েছে। এই গুম্ফাটা দ্রেপুং গুম্ফারই একটি প্রধান শাখা। কাজেই এর গঠনটাও অনেকটা সেরকম। এর অনেকগুলো ছাদ। আমার মনে হয় যে বহুকাল আগে এখানে অনেকগুলো গুহা ছিল, সেই গুহার মধ্যে ঋষিরা আসতেন তপস্যা করতে। এখানকার জলবায়ু আর চারদিকের নিঃস্তব্ধতা ধ্যান ও তপস্যার উপযোগী। সেইসব গুহাগুলোর মধ্যে কোনটা নিশ্চয়ই শিবলিঙ্গ মন্দির হিসেবে ব্যবহৃত হতো। পরবর্তী যুগে তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল এখানকার ছোট্ট পরিবেশ। বৌদ্ধ তান্ত্রিকরা সেই পুণ্যক্ষেত্রেই তৈরী করেন এই বিরাট প্রতিষ্ঠান। এটা আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব কল্পনামাত্র অর্থাৎ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাটাই লিখলাম।

লাসার দ্রেপুং আসলে এই গুম্ফার মালিক। তবে এই সংস্থাটাকে সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য একটা স্থানীয় সমিতি রয়েছে। গুম্ফায় থাকেন চারজন বড় লামা আর তেত্রিশজন ছোট লামা, যাদের বলা হয় দাবা বা ত্রাপা। গুম্ফার কম্বল-ঘি আর খাবার দাবারের সম্পূর্ণ খরচা আসে দ্রেপুং গুম্ফা থেকে। রান্নাঘরের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য রয়েছে বাজার সরকার।

গুম্ফার অধ্যক্ষকে বলা হয় খেংপো, মহামান্য খেংপো আর বাজার সমিতির প্রধান, এই দুজনের উপরই গুম্ফার পুরো দায়িত্ব। মহামান্য খেংপো এসেছেন সরাসরি দ্রেপুং গুম্ফা থেকে। তিনি দ্রেপুং-এর প্রতিনিধি। এই গুম্ফার অধীনে আরও ছোট-বড় ছ'টি গুম্ফা আছে।

আমাদের খাওয়ার পর তাদের প্রণাম ও ধন্যবাদ দিলাম। দুখাং লামা তারপর আমাকে নিয়ে এলেন খেংপো লামার সাথে দেখা করিয়ে দেবার জন্য। গুম্ফার নিয়মানুসারে আগন্তুকমাত্রেই অধ্যক্ষের সাথে দেখা করা দরকার। তিনিই এখানে থাকবার অনুমতি দিয়ে থাকেন। আমরা এবার নেমে এলাম একতলার প্রধান দরজার কাছে। সেখান থেকে কয়েকটা সিঁড়ি পেরিয়েই কাঠের একটা সুসজ্জিত ঘরে এসে উঠলাম। সেই ঘরের ভেতরে ঢুকে আমাকে অপেক্ষা করতে বলে দুখাং লামা একটা দরজা খুলে অন্দরমহলে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি এসে আমাকে বললেন—চল তিনি তোমাকে দর্শন দেবেন বলেছেন।

ঘরের ভেতর ঘর, অতি চমৎকার কাঠের কারুকার্যে ভরা একটা বড় ঘরে এসে আমরা দাঁড়ালাম। ঘরের দুটো ছোট জানালা তারই ভেতর দিয়ে দিনের আলো এসে ঘর উজ্জ্বল করে তুলেছে। ঘরের দেয়ালগুলোও ঠিক পোতালার দেয়ালগুলোর মতোই

সূক্ষ্ম কারুকার্যে ভরা। এমন কি মাথার উপরের দেয়ালেও ভগবান বুদ্ধের সোনালী রঙের এক বিরাট চিত্র।

প্রত্যেকটি থামের সাথে ঝুলছে বিরাট বিরাট তাংখা। তাতে রয়েছে মণ্ডলা আর জীবনচক্রের বিভিন্ন চিত্র। জানালার কাছেই একটা বিছানার উপর বসে আছেন গুম্ফার মাহামান্য অধ্যক্ষ। মাথায় ত্রিকোণাকৃতির টুপী, গায়ে ঢিলে হাতার জামা আর জানু ঢাকা রয়েছে বিরাট একটা কারুকার্য করা চাদরে। তাঁর সামনেই অতি সুন্দর খোদাই কারুকার্য করা একটা হাত বাক্স। তাঁকে দেখেই আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। তিনি হাত তুলে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। তারপর তিনি দুখাং লামার সাথেই কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। প্রথম প্রথম খুব ছন্দোময় মনে হল তারপর তাঁদের কথাবার্তার সুরে একটু ছন্দোপতন লক্ষ্য করলাম। তারপর আমাকে তারা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পরামর্শ শুরু করলেন। তাঁদের কথাবার্তার কিছুটা বুঝলাম বটে কিন্তু অধিকাংশই রইল আমার ধারণার বাইরে। তবে আমি স্পষ্টই বুঝলাম যে আমাকে নিয়েই তাদের মূল সমস্যা।

অনেকক্ষণ পরামর্শ করার পর আমরা অধ্যক্ষকে প্রণাম করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। দুখাং লামাকে একটু চিন্তান্বিত দেখলাম। সেখান থেকে আমরা কয়েকটা বিরাট হলঘর পেরিয়ে এসে পৌঁছলাম গুম্ফার মূল মন্দিরে। মন্দিরে ঢুকতেই সামনে ভগবান বুদ্ধের মূর্তি চোখে পড়ল। মূর্তিটা উজ্জ্বল সোনালী রঙের। তার দু'পাশে আরও দুটো তথাগতের মূর্তি। তার ঠিক সামনে একটি ছোট মূর্তি, ধ্যানী বুদ্ধের রূপ। বড় মূর্তিটা কম করেও প্রায় ছ'ফুটের মতো হবে। মূর্তিটার দু'পাশে দুটো থাম। থামটাকে জড়িয়ে আছে দুটো ড্রাগন, তার মুখ দুটো হেলে পড়েছে ভগবান বুদ্ধের দিকে সম্ভবতঃ শয়তানের প্রতীক। বেদীর সামনেই জ্বলছে জ্ঞানালোক ঘিয়ের প্রদীপ। আমরা প্রণাম করে সামনের গদীতে বসলাম।

তিব্বতে বুদ্ধ মন্দির মাত্রেই ছোটখাটো একটা যাদুঘর। চারিদিকে বহু পুরান ও দামী আসবাবে পরিপূর্ণ। বিশেষ করে তাংখার বাহার কিছুতেই চোখ এড়াবে না।

দেয়ালের গায়ে খুপড়ির মধ্যে রয়েছে অসংখ্য বই। প্রত্যেকটি বইয়ের খাপ অতি সুন্দরভাবে কাপড়ের পর্দা দিয়ে ঢাকা। আমাকে বইয়ের দিকে অবাক হয়ে তাকাতে দেখে দুখাং লামা বললেন—এ আর কি দেখছো আমাদের পুস্তকাগারের বইগুলো দেখলে তুমি আবাক হয়ে যাবে। এই অঞ্চলে একমাত্র আমাদের গুম্ফাতেই তান্‌জুর ও কান্‌জুর-এর পুরো সংকলন আছে। এই বলে তিনি একটু নড়ে চড়ে বসলেন তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—এবার আসা যাক আমাদের কথায়—একটু সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমার ইচ্ছে ছিল যে তোমাকে এই গ্রামের চারদিকে ঘুরিয়ে দেখাই আর এ গ্রামের অনেকে ভালো হিন্দী জানে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। কিন্তু অধ্যক্ষ মশায় আমার সাথে একমত নন। প্রথমতঃ হিন্দুদের (এস্থলে ভারতীয়দের) এখানে প্রবেশ নিষেধ। কাজেই প্রশ্ন উঠবে যে আমি কিভাবে এলাম, কে অনুমতি দিল, আমাদের সাথে কিভাবে যোগাযোগ হয়েছে ইত্যাদি। দ্বিতীয় সমস্যা হল যে, কোন ভারতীয়দের সাথে যোগাযোগ করতে হলে স্থানীয় লাসা কর্তৃপক্ষের অনুমতি

চাই। তিব্বতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এখানেও জাতীয় মুক্তিবাহিনীর লোকেরা সর্বত্র নজর রেখেছে। পুরাং জেলা কর্তৃপক্ষ এখন নামে মাত্র শাসক। অধ্যক্ষের মতে আমাকে এখান থেকে বের না করানোই মঙ্গল। "ওরা" দেখতে পেলে অকারণে ঝামেলা বাড়বে। এ ঘটনা আমার কাছে নতুন নয়। দুখাং লামাকে আর কিছু ব্যাখ্যা করতে হল না আমি বুঝে ফেললাম আমার অবস্থা। অর্থাৎ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব "ওদের" হাতে ধরা পড়ার আগেই আমাকে স্থান ত্যাগ করতে হবে।

দুখাং লামা বা এখানকার কর্তৃপক্ষ আমাকে নিয়ে মুশকিলে পড়ুক সেটা আমি মোটেই চাই না। তাকে আমি বুঝিয়ে বললাম যে, দুঃখ করার কিছু নেই। তাক্‌লাকোটের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে এই গুম্ফা, সেটা তো দেখা হলই। আর তিব্বতের বহু গ্রাম আমি দেখেছি কাজেই নতুন করে আর কিছু যদি নাও দেখি তাহলেও আপসোসের কোন কারণ নেই।

দুখাং লামা আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে ভারতে যাওয়ার এটাই মূল রাস্তা, কিন্তু পাহাড় ডিঙিয়েও যাওয়া যায়, এ অঞ্চলের যারা রিফিউজি হয়ে ভার তের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে সেই রাস্তায় এখনও সৈন্যবাহিনী বসেনি। মনে মনে ভাবলাম যে এইসব কারণেই হয়তো বাবা আমাকে এই দুখাং লামার সাথে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি দূরদ্রষ্টা কৃপাসিন্ধু। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আবার আমার মাথা নীচু হয়ে এল। অগত্যা আমাকে বাধ্য হয়ে গুম্ফার মধ্যেই সারাদিন এঘর ওঘর করে কাটাতে হল। দুখাং লামাই আমাকে সব রকমের আশ্বাস দিয়ে সান্ত্বনা দিলেন। সন্ধ্যার সময় তিনি আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, আমরা নদী পার হয়ে তাক্‌লাকোট গ্রামটাকে বাঁদিকে রেখে এগিয়ে গেলাম আরও নীচের দিকে। তারপর দূরের পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে বললেন—ওই যে পাহাড়ের চূড়াটা 'দেখছো তার বাঁদিক দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে ভারত যাবার প্রধান রাস্তা—লিপু-লেক তিব্বত, নেপাল আর ভারতের সীমান্ত শহর। সেখানে অজস্র চীনা সৈন্য মোতায়েন আছে কাজেই সেদিকে যাবে না। লিপু লেকের উচ্চতা প্রায় ষোল হাজার সাতশ' পঞ্চাশ ফুট, আমরা গুরলা লা পেরিয়েছি ষোল হাজার দু'শ ফুটে, কাজেই বুঝতে পারছো তোমাকে বেশ কষ্ট করতে হবে। তোমার ভাগ্য ভালো আকাশে চাঁদ পাবে, কাজেই রাতের বেলা চলতে অসুবিধা হবে না। ওই পাহাড়ের ঠিক নীচ দিয়েই একটা সরু রাস্তা পাবে। তুমি সর্বোচ্চে উঠেই দেখতে পাবে অন্যদিকে ঢালু হয়ে-পাহাড়টা সমতলে গিয়ে মিশেছে। পাহাড় থেকে তুমি যখনই সমতল দেখতে পাবে তখনই বুঝবে যে তুমি ভারতে প্রবেশ করেছো আর ভয় নেই। তুমি এখন থেকে যদি হাঁটতে আরম্ভ কর তাহলে ভোর হবার আগেই পাহাড় ডিঙ্গিয়ে যাবে। তবে খুব সাবধান রাস্তায় বরফ পাবে—বাবাকে স্মরণ করবে তিনিই তোমার দায়িত্ব নেবেন।

দুখাং লামা আমাকে শুধু যে সীমান্তের আটঘাট বলে দিলেন তাই নয় সেই সাথে সাথে কাঁধে একটা ছোট থলে ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন—দু'দিনের খাবার এর মধ্যে আছে কাজেই তোমার অসুবিধা হবে না তবে খুব সাবধান গলা শুকিয়ে গেলেও বরফ তুলে খেও না। দুখাং লামা সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী আর ভারতদরদী, প্রণাম আর ধন্যবাদ

দিয়ে তাঁর সেই ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়। আমি মনে মনে ভাবলাম যে চীরজীবন এই মানুষটির কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো। তিব্বতে তিনিই আমার শেষ মানুষ আর শিম্‌বিলিং গুম্ফাই আমার শেষ আশ্রয়।

তারপর শুরু হল চলা, করনালি নদীকে বাঁদিকে রেখে সরাসরি হাঁটতে লাগলাম লিপু লেকের দিকে। আধঘণ্টার মধ্যেই আবার শুরু হল পাহাড়। আমি পাহাড়ের চূড়া লক্ষ্য করে চলতে লাগলাম, তারপর রাত ঘনিয়ে এল। আমি জানি আমাকে চলতে হবে, কারণ দিনের আলোকে আমি ওদের হাতে ধরা পড়ে যাবো। তাতে শুধু যে আমার হয়রানি হবে তাই নয়—আমাকে কেন্দ্র করে দুখাং লামা ও গুম্ফার সকলকেই নাজেহাল হতে হবে কাজেই আমাকে এখন চলতে হবে। গুরলা-লা অতিক্রমের সময় এই ধরনের পথই পেয়েছিলাম, কাজেই কিভাবে চলতে হবে তা আমার জানা ছিল নয়তো আমাকে এখানেই থেমে পড়তে হত। দুখাং লামার কথাই ঠিক মাথার উপর দেখা দিল চাঁদ, সেই চাঁদের আলোতে আবার দেখতে পেলাম লিপু লেকের তুষারশুভ্র শিখর।

মনে পড়ল বাবার কথা, তিনিই তো আমাকে বলে দিয়েছেন পথের সন্ধান, তাঁর পথেই তো আমি যাচ্ছি কাজেই তিনিই রয়েছেন আমার পিছনে। আমি যে পথ ধরে চলছি সেটা পথ নয়, শুকনো ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে চাঁদের আলোয় যে রকম পায়ে চলার পথ পাওয়া যায় সেটা মনে হয় এর থেকেও অনেক ভালো। আমাকে চলতে হচ্ছে কোথাও বরফের মধ্য দিয়ে আবার কখনও পাথরের উপর দিয়ে হোঁচট খেয়ে। এই ধরনের পথে রাত্রিবেলা কিছুতেই নামা সম্ভব নয়—হোঁচট খেয়ে কোন পাহাড়ের নীচে গড়িয়ে পড়ে প্রাণ হারানোর সম্ভাবনাই বেশী।

চলতে চলতে দেখতে পালাম বাঁদিকে কয়েকটি আলো—তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করে নিলাম—ওগুলো নিশ্চয়ই চীনা সৈন্যদের তাঁবু। তাড়াতাড়ি সেদিক ছেড়ে আবার ধরলাম ডানদিকের পথ। খুব জোর বেঁচে গেছি। চারদিক নিঃশব্দ, সেই নিস্তব্ধতাই আমায় প্রেরণা জোগাচ্ছে। তারমধ্যে একমাত্র শব্দ আমার ঘনঘন শ্বাস। সাধুবাবার কাছ থেকে শেখা শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে ছন্দ মিলিয়ে চলার কৌশলটাকে এবার কাজে লাগালাম। তার সাথে সাথে মনে পড়ল—ওম্‌-মণি-প-দ্‌-মে-হুম্‌, ওম্‌-মণি-প-দ্‌-মে-হুম্‌, ওম্‌-মণি-প-দ্‌-মে-হুম ···

এইভাবে সারারাত ধরে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি চলতে লাগলাম, এইভাবে কতক্ষণ ধরে চলেছিলাম জানি না। হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি সেই শিখরটি আর নেই। ডানদিকে বেশ কিছু দূরে অন্য একটি শিখর চোখের সামনে ধরা পড়েছে। বুঝতে পারলাম প্রায় উপরে উঠে এসেছি। চলতে চলতে দারুণ পরিশ্রমের জন্য আমাকে বার বার থামতে হচ্ছিল—এখন মনে হচ্ছে না থামলেও চলে। বুঝতে পারলাম যে সর্বোচ্চে উঠে পড়েছি। পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম বহু দূরে চাঁদের আলোয় কৈলাস শিখরটি আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। মন্দিরের মতো সেই চূড়াটিকে চিনতে এতটুকু

অসুবিধা হল না। তাঁকে প্রণাম করলাম। ওম্ নমঃ শিবায়্, ওম্ নমঃ শিবায় , ওম্ নমঃ শিবায়।

ভোরের তারাগুলো এখন নিষ্প্রভ হতে শুরু করেছে বুঝলাম যে আমি এখন সীমান্তে এসে পৌছেছি। আর হাতে আছে মাত্র ঘন্টাখানেক সময়। এর মধ্যেই আমাকে পাহাড়ের ঢাল ধরতে হবে। এ পর্যন্ত রাস্তায় এতটুকু ঘাসের চিহ্নমাত্রও দেখিনি শুধু পাথর আর পাথুরে বালির ধূলো—এখানে হঠাৎ মনে হল ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটছি। অসম্ভব, নীচে ঘাস পাইনি কাজেই এত উঁচুতে ঘাস পাওয়ার কথা নয়। তাই ভালো করে হাত দিয়ে সেগুলোকে পরীক্ষা করতে চাইলাম। ছুঁয়ে আশ্চর্য হলাম। ঘাস নয় কিন্তু ঘাসেরই মতো এক রকম পুরু শেওলা। মনে হচ্ছে যেন কার্পেট বিছিয়ে রাখা হয়েছে। ভোরের আলোর সাথে সাথে আমি পেলাম ঢাল। আমার আনন্দ দেখে কে? আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। কৈলাস থেকে ফিরে আমি আবার ভারতের মাটি স্পর্শ করেছি। সীমান্তে "ওদের" চোখ ফাঁকি দিয়ে আমি প্রবেশ করেছি আমার দেশে। কি আনন্দ! এই আনন্দের যেন আর শেষ নেই। আমি প্রায় লাফাতে লাফাতে এবার নামতে শুরু করলাম। এত তাড়াতাড়ি বিনা পরিশ্রমেই যেন ফিরে পেলাম আমার মাতৃভূমিকে—গুরু কৃপাহি কেবলম্। গুরু কৃপাহি কেবলম্। গুরু কৃপা ছাড়া এটা কিছুতেই সম্ভব ছিল না।

ভোরের আকাশ তার নতুন সাজে সাজতে লাগল। এখন আর অসুবিধা নেই। আকাশ যখন পরিষ্কার হল তখন দেখতে পেলাম নীচে পাইন গাছের সারি। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা হয়তো এরই নাম স্বাধীনতার আনন্দ! আমি আস্তে আস্তে এবার নামতে লাগলাম। প্রায় দুপুরের কাছাকাছি প্রথম পাইনের সারি পেরোতেই চারদিক থেকে শুনতে পেলাম হল্ট! হল্ট! থমমত খেয়ে আমি থামতে বাধ্য হলাম। মুহূর্তের মধ্যেই আমাকে ঘিরে ধরল একদল সৈন্য। থতমতর ভাবটা কাটতেই ভালো করে তাদের দিকে তাকিয়ে একটা বিরাট হাঁফ ছাড়লাম—তারা সবাই ভারতীয় সৈন্য।

বলাই বাহুল্য, তারা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে এল নিকটবর্তী শিবিরে। সেখানে আমাকে ঘিরে চলল তাদের কৌতূহলী প্রশ্ন। আমি বললাম যে আমি কৈলাসে গিয়েছিলাম—গুরুজী সেখানেই আছেন পরে সুবিধামত আসবেন আর আমি চলে এসেছি রাতারাতি সীমান্ত পেরিয়ে। ভাগ্য আর কাকে বলে সেই শিবিরেই পাওয়া গেল একজন বাঙালী, আমি কলকাতার ছেলে শুনে তিনি সরাসরি আরম্ভ করলেন বাংলা কথা। আমার সত্যতা প্রমাণিত হল। পরে আমার কৃতিত্বের প্রশংসা করে তাঁরা আমাকে ভারী বান্ রুটি আর চা খাইয়ে ছাড়লেন। লিপু লেকের চীনা সৈন্যদের সম্পর্কে অনেক প্রশ্নই এদের ছিল কিন্তু তাদের এড়িয়ে আসার জন্য কোন রকম তথ্যই এদের দিতে পারলাম না। এদের কাছ থেকেই শুনলাম যে আমি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদে পৌছেছি। এই প্রায় সমতল ভূমিটাকেই বলে 'ভ্যালী অফ ফ্লাওয়ার', অনেকে বলেন নন্দন কানন।

এ এক নতুন জগৎ, পুরাং ভ্যালীর সাথে এর তুলনাই চলে না। লিপু লেকের ওপারে শুধুই পাথর আর বরফের রাজত্ব। ঠাণ্ডার জন্য একটা গাছও জন্মাতে পারে না,

আর এখানে যতদূরে দৃষ্টি যায় শুধু সবুজের বন আর মাটিতে বড় বড় ঘাসের সাথে মিশে রয়েছে রঙ বেরঙের হাজারো ফুল, পাতা থেকে ফুলের সংখ্যাই বেশী।

আহা! এটাই বুঝি মানুষের স্বর্গ! দেখে এলাম অনন্ত সৌন্দর্যের জগৎ, সেটা দেবতাদের স্বর্গ, দারুণ শীত আর রুক্ষ আবহাওয়ায় মানুষের সেখানে বোধ হয় প্রবেশ নিষেধ। মানুষ সেখানে যায় তীর্থের জন্য, দর্শনের জন্য। জীবন নদীর উৎস সন্ধানে—সেখানে সবাই তীর্থযাত্রী—সবাই আসে আর যায় আর এখানে রয়েছে মানুষের স্বর্গ, মানুষের রাজত্ব, মানুষ এখানে পরিপূর্ণতা লাভ করে অবস্থান। তাই এর নাম মহাভারত, এখানে বসেই করতে হয় সাধনা, জীবন-নদী এখানেই পরিপূর্ণতা লাভ করে। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী। চারদিকের অজস্র ফুলগুলো এখন আমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে—এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে যে তারা আমার জন্যই যেন ফুটে রয়েছে।

এই পথে আমি কয়েকটি গ্রাম এড়িয়ে চলে এসেছি। আমার সামনেই ধবলী-গঙ্গা, তারপর ধরচুলা, তারপর বেরিনাগ হয়ে আলমোড়া। আলমোড়া থেকে নৈনীতাল হয়ে যেতে হবে কাঠগুদামে সেখান থেকেই ধরতে হবে ট্রেন। এখন আর কোন বাধা নেই। বড় পাহাড়, স্রোতস্বিনী, বরফ এ সব বাধা এখানে বাধাই নয়। মুক্তিদাতা কৈলাস দর্শন করে এখন যাচ্ছি বাড়ীর দিকে সেখানে কি পাবো—মুক্তি !না বন্ধন !

তিব্বতের প্রাণ পুরুষ

মিলারেপা

মিলারেপা

মহাতীর্থের শেষ যাত্রী বইটি লেখার সময়ে ও পরে বার বার অবতার মিলারেপার কথা লিখতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু আমার সেই তীর্থ ভ্রমণের সময় মিলারেপার অনেক ছবি ও তাংখা দেখা সত্ত্বেও তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতাম না—হয়তো আমার তখনকার পাপী মনটিতে সেই পবিত্র পরমপুরুষের রেখাপাত না হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া যে পরিপ্রেক্ষিতে আমার যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই সময় তিব্বতের কোনরকম পটভূমিকাই আমার জানা ছিল না। সাধুবেশে আমি যে একটি ঘর-পালানো ছেলে ভিন্ন আর কিছুই ছিলাম না এটাই তার প্রমাণ। মহাতীর্থের শেষ যাত্রী বইটিতে আমার সেই সময়কার অভিজ্ঞতাটাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলাম।.

বইটি প্রকাশের পর আমার শুভাকাঙ্ক্ষী এবং প্রিয় পাঠকদের তরফ থেকে মিলারেপা সম্পর্কে আরও দু'চার কথা লিখবার জন্য অনুরোধ এসেছে। পরিশিষ্টে তাই এই অংশটি জুড়ে দিতে বাধ্য হলাম।

হিমালয়ের গগনভেদী চূড়া দেখলেই যেমন মনে পড়ে স্বয়ম্ভু শিবের কথা, তিব্বতীদের কাছেও তেমনি বুদ্ধাবতার মানেই মিলারেপার নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তিব্বত অতীতকাল থেকেই একটি রহস্যঘন দেশ হিসেবে জগতে খ্যাত। সেখানকার সাধনপদ্ধতিও তাই রহস্যে ঘেরা। তিব্বতে তন্ত্রসাধকদের চূড়ামণি হচ্ছেন এই মিলারেপা। একাদশ শতকের এই তন্ত্রসাধক আজও তিব্বতের তন্ত্রসাধকদের মূখ্য গুরু এবং লামাদের বরণীয়।

১০৫২ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের গুন্ থাং প্রদেশের কিয়াং সা উপত্যকায় মহাতান্ত্রিক মিলারেপার জন্ম। পিতার নাম সেরাব গিয়ালৎসেন, মাতার নাম কারমো কিয়েন্ ছোট বোনের নাম পেতা। আর বাগ্‌দত্তা স্ত্রীর নাম জেসে। জন্মের পূর্বেই পিতা, তাঁর বন্ধুকন্যার সাথে মিলারেপার বিয়ে দেবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁর ছেলে হলে এবং তাঁর বন্ধুর মেয়ে হলে বিবাহসূত্রে তাঁরা আবদ্ধ হবেন। অবশ্য পরে মিলারেপা তাঁর পিতার বন্ধুকন্যা জেসেকে নিজ পত্নীরূপে মানসিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন বটে কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোনদিন শারীরিক মিলন ঘটেনি। এবং একসঙ্গে বসবাসও করেননি।

মিলারেপার জীবনী এক অবিশ্বাস্য কাহিনী, সাধারণ মানুষের পক্ষে তা খুবই অত্যাশ্চর্য কাহিনী। যাঁরা মিলারেপার জীবন নিয়ে গবেষণা ও সাধনা করেন তাঁরা বলেন সে কাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি নেই। তাই রহস্যঘন মিলারেপার জীবন সম্পর্কে সবকিছু আজও জানা যায়নি। খুব সংক্ষেপে তার কিছুটা লিখলাম মাত্র।

মিলারেপার বয়স যখন মাত্র সাত বছর তখন তাঁর পিতা এক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হলেন—তিব্বতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক আনিয়েও কিছু করা সম্ভব হল না। তাঁদের আনন্দের সংসারে হঠাৎ নেমে এল অন্ধকার। সেরাব গিয়ালৎসেন তাঁর পত্নী কারমোকিয়েন্-কে দিয়ে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে মৃত্যুশয্যার পাশে ডেকে আনালেন। তারপর তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন—"তোমরা আমার অতি নিকট বন্ধু। আর তুমি আমার ভাই, তোমাদের সকলের কাছে আমর শেষ মিনতি, ভগবানের দোহাই, নিশ্চয়ই রাখবে। আমার প্রচুর ধন-সম্পত্তি, জমি-জমা, সোনা, অলংকার সবই রেখে যাচ্ছি আমার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার ভরণ-পোষণের জন্য। আমার স্ত্রী বিষয় সম্পত্তির কিছুই জানেন না, কাজেই তোমাদের কাছে বার বার ভগবানের দোহাই দিয়ে অনুরোধ করছি তোমরা এদের দেখো। আমার নাবালক পুত্রের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করো, তার বয়স হলে তাকে সব বুঝিয়ে দিও।" তারপরই তিনি পরলোক গরম করেন।

সেরাব গিয়ালৎসেনের মৃত্যুর কয়েকদিন পরই তার ভাই সেরাব গিয়ালৎসেনের বিধবা পত্নীর কাছ থেকে সব কেড়ে নিলেন, শুধু তাই নয়, এমন কি তাদের সেই প্রাসাদোপম বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। বিধবা কারমোকিয়েন একে তার প্রিয় স্বামীর শোকে কাতরা তার উপর দেবরের এই নিষ্ঠুর আচরণ; কিন্তু নিরীহ কুলবধূ কিই বা করেন! মেয়েকে কোলে নিয়ে শিশুপুত্রের হাত ধরে চোখের জল ফেলতে ফেলতে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব যাঁরা এককালে তার স্বামীর ছত্রতলে বাস করতেন তাঁরা এ দৃশ্য দেখেও দেখলেন না। সেরাব গিয়ালৎসেনের দুষ্ট ভাইয়ের বিরুদ্ধে কথা কয় এমন সাধ্য কার।

কারমোকিয়েন তাঁদের পুরানো এক জমির ওপর, গ্রামের কোণে এসে কোন রকমে মাথা গুঁজবার মত স্থান করে নিলেন। তাঁর স্বামীর যেসব সৎ বন্ধু ছিলেন তাঁরাই মাঝে মাঝে তাদের জন্য চুপি চুপি খাবার দিয়ে আসতেন।

একে স্বামীহারা তার ওপর এই দুরবস্থা, সব থাকতেও তারা সর্বহারা। দু'দিন আগে যে ছিল ধনী, আজ সে পথের ভিখিরী। শিশুকন্যা আর ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে সে শুধু বার বার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলতে লাগল, "হায় ভগবান, এ তুমি আমাদের কি করলে?"

আস্তে আস্তে দেবরের অত্যাচার আরও চরমে উঠল। কারমোকিয়েন আর স্থির থাকতে না পেরে একদিন পুত্র মিলারেপার হাত ধরে বাইরে এসে দাঁড়ালেন—তারপর অশ্রুরুদ্ধ স্বরে মিলাকে বললেন—"তুই যদিও ছোট তবুও তোকে শুনতে হবে কারণ তুইই আমার একমাত্র ভরসা, আমার আশার আলো। এই অত্যাচার আর সইতে পরছি না। আমাদের এই দুরবস্থার জন্য দায়ীতোর কাকা। যেমন করেই হোক এর প্রতিশোধ নিতেই হবে। তুই আমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর যে এর চরম প্রতিশোধ তুই নিবি। তুই যদি আজ আমাকে কথা না দিস্ তাহলে আমি ওই পাহাড়ের উপর উঠে ঝাঁপ দিয়ে মরবো। আমার এখনো একটু জমি আছে সেটা বিক্রি করে যা পাই তাই দিয়ে তোকে পাঠাবো তিব্বতের সেরা তন্ত্রগুরুর কাছে। তুই কথা দে—তোর বাবার কথাকে যারা অশ্রদ্ধা করেছে, তোর মাকে যারা ঘরছাড়া করেছে, শিশুদের মুখ থেকে যারা দুধের

বাটি কেড়ে নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধেই হবে তোর সাধনা। তোকে মাতৃ আজ্ঞা পালন করতেই হবে।" শিশু মিলারেপা বয়সে যদিও শিশু কিন্তু পূর্বসংস্কারবশে তিনি জ্ঞানী। চুপ করে মায়ের কথা সব শুনলেন। তারপর নীরবেই মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য করলেন। কয়েক দিন পর শিশু মিলারেপা আদরের বোন পেতা আর দুঃখী মাতাকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে পড়লেন উপযুক্ত তন্ত্রগুরুর সন্ধানে।

একাদশ শতাব্দীর তিব্বত। সেই সময় তিব্বতের পথেঘাটে তান্ত্রিকদের আড্ডা, তাদের মধ্যে থেকে উপযুক্ত গুরু খুঁজে পাওয়া একমাত্র পূর্বজন্মের কর্মফল ভিন্ন অসম্ভব। মিলারেপার কর্মফল ছিল অতি অসাধারণ, মায়ের চোখের জল তাঁর অন্তরে কাঁটা হয়ে বিঁধতে লাগল। মনের জোর এবং জিজ্ঞাসু মন নিয়ে তিনি কুড়োতে লাগলেন—মারণ-উচাটন ইত্যাদি গুপ্ত বিদ্যা। মিলারেপা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তান্ত্রিকদের সাথে সাথে হয়ে উঠলেন তান্ত্রিক। শিশুর পবিত্র ও সরল মন গুপ্তবিদ্যার সিদ্ধস্থান। বালক মিলারেপা কয়েক বছরের মধ্যেই হয়ে উঠলেন—তন্ত্রসিদ্ধ সিদ্ধিরাজ।

এদিকে মিলারেপার গ্রামে, তার পিতার ধনসম্পত্তিতে ধনী হয়ে তার কাকা হয়ে উঠেছে সত্যিকারের অর্থপিশাচ। তার ভিতরকার মায়া দয়া সম্পূর্ণ ভাবে তিরোহিত হয়েছে। তাদের পরিবারের এই সময় এক বিবাহ উপলক্ষে পাড়ার সবাই নিমন্ত্রিত হয়েছে, বিশেষ করে তার কাকার আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধব সবাই সেখানে উৎসবে মত্ত। বলাই বাহুল্য, মিলারেপার মা ও বোন তখন গ্রামের কোণে অন্নাভাবে দিন গুনছেন। বিবাহ উৎসব যখন পূর্ণ মাত্রায় জমে উঠেছে ঠিক সেই সময় হল এক অবাক্ কাণ্ড! বিরাট শব্দ করে সেই বাড়ীটার ওপর হঠাৎ যেন বজ্রপাত হ'ল আর তার ফলে সেই বাড়ীটা ধ্বসে পড়ল। চাপা পড়ল বিয়ের বর কনে আর নিমন্ত্রিতের দল, চারদিকে থেকে সবাই প্রাণভয়ে আর্তনাদ করে উঠল। দুঃখিনী মা কারমোকিয়েন সেই শব্দ শুনে তাঁর শিশু কন্যাকে কোলে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর গ্রামের চীৎকার শুনে তিনি কুড়ে ঘরের বাইরে এলেন ঘটনাটা কি তা দেখবার জন্য। তিনি যখন আবিষ্কার করলেন যে তাঁর সেই প্রাসাদোপম বাড়ীটা ভোজ বাড়ীর সবাই'র ওপর ধ্বসে পড়েছে তখন কিছুতেই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেননি, তারপর একটু ধাতস্থ হবার পরই উল্লাসে নেচে উঠলেন—তিনি হঠাৎ উন্মাদের মতো আনন্দে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন—তারপর চেঁচিয়ে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে নেচে নেচে বলতে লাগলেন—"হয়েছে, বেশ মজা হয়েছে—আমার ছেলে তার কাকার ওপর প্রতিহিংসা নিচ্ছে, এই বজ্রপাত মিলারেপা পাঠিয়েছে, সে-ই গুপ্তবিদ্যা রপ্ত করে এই মারণ অস্ত্র পাঠিয়েছে—বাণ মেরে বাড়ীটা ধ্বংস করেছে। তোমরা সবাই শুনে রাখো এ আমার মিলার কাজ, সে আজ সব অত্যাচারের শোধ নিচ্ছে।" দুঃখিনী মা যেন স্বর্গানন্দ ভোগ করছেন। এতদিনে তাঁর আশা পূর্ণ হচ্ছে। বাড়ীর মধ্যে সকলে চাপা পড়লেও তাঁর কাকা আর কাকিমা কিন্তু কোন রকমে ঘরের কোণে থেকে প্রাণে রক্ষা পেয়ে গেল—তাদের কৃতকর্মের সব জরিমানা তখনও বুঝি দেওয়া হয়নি। সকলে

কারমোকিয়েনের সব কথা শুনলো। প্রথম প্রথম বিশ্বাস না করলেও শেষে তারা বিশ্বাস করতে শুরু করল। সকলেই ভাবলো অসম্ভব হলেও সম্ভব হতে পারে, অধিকাংশ লোকে বিশ্বাস করলো ভয়ে। জিঘাংসার আনন্দে মা তখন প্রায় দিশাহারা। ব্যাপারটা অতি দ্রুত ঘটে যাওয়ায় গ্রামবাসীদের মনে দাগ কাটতে কয়েকদিন সময় নিল, তারপর তারা যখন কারমোকিয়েনের কথায় বিশ্বাস করলো তখন তারা কারমোকিয়েনকে ঘৃণার চোখে দেখতে লাগল। তার প্রতি গ্রামের অত্যাচার আরও ভয়ংকর হয়ে উঠল। ভিক্ষান্নও প্রায় বন্ধ হল।

সেই অত্যাচারে স্থির থাকতে না পেরে, কারমোকিয়েন দূত মারফৎ একটা চিঠি লিখে তার ছেলের কাছে পাঠালেন। তাতে তিনি লিখলেন যে অত্যাচার এখন চরমে উঠেছে, কাজেই আরও প্রতিশোধ নিতে হবে, প্রয়োজন হলে ঘর-দোর সব জ্বালিয়ে দিতে হবে—এটাও মায়ের আদেশ। পিতৃঋণ এইভাবে মিলারেপাকে শোধ দিতে হবে। চিঠি পাঠিয়ে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন—আর এক প্রলয়ের জন্য।

এরপর আবার একদিন শুরু হল প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্য, গ্রামে এবং আশে-পাশের ক্ষেতে যখন শাক-সব্জীর প্রাচুর্য, নতুন ফসল ঘরে উঠাবার জন্য যখন সবাই প্রস্তুত, সেই সময় শুরু হল শিলা বৃষ্টি। পরিষ্কার নীলাকাশ, এতটুকু মেঘের চিহ্ন নেই অথচ কোথা থেকে যে এই শিলাবৃষ্টি শুরু হয়েছে কেউ বুঝতে পারছেন না। আশ্চর্য বটে! কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঠ ঘাট শিলাবৃষ্টিতে সাদা হয়ে উঠল। সব ফসল নষ্ট হয়ে গেল, এই দেখে গ্রামবাসীরা হায় হায় করে উঠল।

আর ওদিকে মিলারেপার মা আর একবার আনন্দে নেচে উঠলেন। যারা তাঁদের সব বিষয়-সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে তাদের ঘরছাড়া করেছে তাদের প্রতি এটা হল চরম বজ্রাঘাত। সে বছর ফসলের অভাবে গ্রামে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। অনেকে মরল আর যারা বেঁচে রইল তারা এই অরাজকতার জন্য দায়ী করল কারমোকিয়েনকে। তাকে সবাই ধিক্কার দিতে লাগল। কারমোকিয়েনের তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ যে দুঃখে তিনি কালাতিপাত করছেন তার থেকে বেশী দুঃখ আর পৃথিবীতে কি আছে। তার ছেলে মিলারেপা শক্তিশালী তান্ত্রিক হয়েছে, এটাই তাঁর সবচেয়ে গর্বের বস্তু হয়ে উঠল।

এই ঘটনার পরে মিলারেপার মা যত খুশীই হোন না কেন, মিলারেপার মনে এল এক বিরাট পরিবর্তন। তার গুপ্তবিদ্যার ফলে যে গ্রামের বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল তার জন্য মিলারেপার মনে দেখা দিল অনুশোচনা। হিংসা দিয়ে তিনি হিংসাকে জয় করতে চাইলেন। মার্গে উঠার এটাই কি সত্যিকারের সোপান, ইত্যাদি বহু প্রশ্নে তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। তিনি নির্জনে বসে বার বার নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—ধ্বংস নয়, মৃত্যু নয়, চাই আনন্দ, চাই মুক্তি। মারণ উচাটন বশীকরণ ধ্বংস বজ্রপাত এ সবই তো এ জগতের বিষয়। জগতের বাইরে আনন্দলোকে যাবার আসল পথ কি? সেটাই এখন আমাকে খুঁজে পেতে হবে। মিলারেপা হঠাৎ যেন নিজেকে নূতন করে আবিষ্কার করলেন। গুপ্তবিদ্যায় সিদ্ধি লাভ করে নিজেই ধ্বংসের জালে

জড়িয়ে গেছেন, মুক্তির বদলে হয়েছেন সিদ্ধিবন্দী। তাঁর অন্তর-আত্মা এবার কেঁদে উঠল। চাই মুক্তি, চাই আনন্দ, সে এখন খুঁজতে হবে—এর জন্য চাই শুদ্ধগুরু। সে গুরু কোথায় পাওয়া যাবে? কে দেবে তার সন্ধান। মিলারেপার জীবনে এল বিরাট পরিবর্তন। জীবনমুক্তির জন্য তিনি খুঁজতে লাগলেন উপযুক্ত গুরু।

মিলারেপা তিব্বতের প্রত্যেকটি পাহাড়ে পর্বতকন্দরে উপত্যকায় দিনের পর দিন পর্যটন করতে লাগলেন আর খুঁজতে লাগলেন ইষ্টগুরু। তার সেই চেষ্টা বিফল হল না। আলো কোনদিন গাছের পাতায় ঢাকা পড়ে না, সূর্যকে মেঘ দিয়েও চিরকাল ঢেকে রাখা যায় না। মিলারেপা খুঁজে পেলেন গুরু। জ্ঞানিগুরু বিক্রমশীলের অধ্যক্ষ অতীশ দীপংকরের প্রভাবে সেইসময় যে সব যোগীরা তাঁর দর্শন তিব্বতে ছড়িয়ে দেন তারমধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গুরু নারোপা। গুরু নারোপার শিষ্য মার্পা ভারতবর্ষ থেকে তার জ্ঞান ভাণ্ডার ও পুঁথি তিব্বতে নিয়ে আসেন। ভাগ্যদেবতা মিলারেপাকে নিয়ে এলেন সেই গুরুর পদতলে।

গুরু হল মিলারেপার মুক্তিস্নান। সে স্নান তো সহজ নয়, হাবু ডুবু খেতে খেতে বেঁচে থাকার মতো।

গুরু মার্পা প্রথমেই আদেশ দিলেন—"এখানে আমি একটা দশতলা বাড়ী করতে চাই, দূরে ওইখানে অনেক পাথর আছে সেগুলিকে একে একে এনে সাজাতে হবে। বাড়ীটা সুন্দর হওয়া চাই আর আমি চাই যে সেটা গোলাকৃতি হবে। তোমাকে একাই সব করতে হবে। তুমি তো যাদুকর কাজেই দেখা যাক তোমার কেরামতি। বাড়ী হয়ে গেলে তোমাকে দীক্ষা দেবো।" দীক্ষার কথা শুনেই মিলারেপার প্রাণে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। শুরু হল কাজ। কাজটা খুবই কঠিন। প্রথমে ভিত কাটা, তারপর পাথর কাটা, এরপর সেগুলোকে একটা একটা করে এনে সাজিয়ে দেয়াল তোলা। সাধারণ লোকের পক্ষে এ কাজ খুবই কঠিন। মিলারেপার পক্ষেও কাজটা খুব কঠিন কারণ এ কাজটা সম্পূর্ণ করতে হবে তার যাদুবিদ্যার কৌশল না খাটিয়ে। কয়েকদিনের মধ্যে তার হাত ও পায়ের চামড়া ফাটতে আরম্ভ করল, তারপর পিঠে পাথর বইতে বইতে চামড়ায় দেখা দিল ক্ষতচিহ্ন। তবুও তিনি হাসিমুখে চালিয়ে যেতে লাগলেন তার কাজ। তাঁর মনে একমাত্র ভরসা যে জীবনমুক্তির জন্য তিনি দীক্ষা পাবেন। বাড়ীর নীচের তলাটা সবে মাত্র সম্পন্ন হয়েছে এমন সময় গুরু মার্পা এলেন—তারপর কোনরকম ভূমিকা না করেই চেঁচিয়ে উঠলেন—"এরকম করে কে করতে বলেছে—এরকম হবে না, সব ভেঙ্গে ফেলে দাও।" গুরুবাক্যের এতটুকু প্রতিবাদ না করে নিজের তৈরী ঘরগুলোকে ভেঙে দিলেন। তারপর গুরুর আদেশে আবার শুরু হল নূতন করে ঘর তোলা। একে শীত তার উপর তিব্বতের এই খস খসে পাথর। কোনরকম যাদুবিদ্যার প্রয়োগ না করে আস্তে আস্তে তিনি আবার গড়ে তুলতে লাগলেন গুরু নির্দেশিত গৃহ।

এবারে অনেক চেষ্টায় প্রায় দোতলা পর্যন্ত তুলেছেন আবার এলেন গুরু, তিরস্কার করে বললেন এরকম বাড়ী আমি চাই না অন্য রকম হবে, শুধু তাই নয়,

স্থানও পরিবর্তন করতে হবে। গুরুর কথায় এতটুকু প্রতিবাদ না করে আবার তিনি নিজের হাতে এত কষ্ট করে গড়া বাড়ীটা ভাঙতে বাধ্য হলেন। আগের বারের মতো এবারেও তিনি গুরুকে কিছুই বললেন না। আবার নূতন নির্দেশে শুরু হল গৃহনির্মাণ। তাঁর হাত দুটো পাথরের জন্য ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে—হাতে ন্যাকড়া বেঁধে তাঁকে কাজ করতে হয়, পিঠের ঘা-টা বিরাট, সম্পূর্ণ পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে। রক্তে ক্ষত-বিক্ষত দেহ, তবুও তাঁর এতটুকু প্রতিবাদ নেই।

এরপর আরও কয়েকবার চলল এই ভাঙা-গড়ার খেলা। কিন্তু শেষবারে মিলারেপার দেহ সত্যি ভেঙে পড়ল। গুরুপত্নী দামেমা মাঝে মাঝে খাবার নিয়ে আসেন, আর ক্ষত-বিক্ষত দেহে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেন আর নীরবে মিলারেপার এই অবস্থা দেখে অশ্রুপাত করেন। দামেমাই আজকাল মিলারেপার মায়ের স্থান অধিকার করেছেন, তাঁর এই স্নেহই মিলারেপার দুঃখে ভরসা। এত দুঃখেও মিলারেপা গুরুর বিরুদ্ধে এতটুকু প্রতিবাদ করেননি। তারপর এমন একদিন এল যখন মিলারেপার ক্ষত-বিক্ষত দেহ নিয়ে আর কাজ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। করুণাময়ী দামেমা মৃত্যু পথযাত্রী মিলারেপার কথা স্বামীকে জানালেন—আর সেই সাথে সাথে প্রার্থনা করলেন—মিলারেপার প্রতি সদয় হতে। মার্পার চরিত্র দামেমার ঠিক বিপরীত । এত জ্ঞানী হয়েও মিলারেপার প্রতি তার এতটুকু করুণা হ'ল না, উপরন্তু দামেমাকে ভর্ৎসনা করে বললেন—"ও সব ন্যাকামি করছে, ওই ভণ্ডামী আমার কাছে খাটবে না। দশতলা বাড়ী হয়ে যাওয়ার পর আমি তাকে দীক্ষা দেবো সে কথা তো আগেই বলেছি।" দামেমার কথায় মার্পারপাষাণ হৃদয় গলল না। দেহের অবস্থা আরও কঠিন হয়ে উঠল, মিলারেপা কুষ্ঠ ব্যাধির মতো চলচ্ছক্তি রহিত হলেন—এতদিনে তিনি মুখ ফুটে কথা বললেন—তিনি অতি বিনীতভাবে বললেন—"আমি যখন আপনার আদেশ বহন করতে পারছি না তখন আর এখানে থেকে কি হবে, আমাকে চলে যেতে আজ্ঞা দিন।" গুরু আগের মতোই তিরস্কারের স্বরে বললেন—"তুমি কেথায় যাবে? তোমার দেহ মন ও প্রাণ আমাকে সমর্পণ করেছো। তোমার দেহ তো আর তোমার নয়, ও সবই আমার। কাজেই তোমার যাওয়া চলবে না।"

গুরুর এই বাক্যের পর আর কথা চলে না—মিলারেপা ভেবে দেখলেন কথাটা সত্য। গুরুর চরণে একবার যা নিবেদন করা হয়েছে তার ওপর আর তাঁর অধিকার নেই। দামেমা ঘরের ভেতর থেকে সব কথাই শুনলেন—তারপর স্বামীর কাছে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই মিলারেপার সেবায় গেলেন। মা হয়ে এ দুরবস্থা তিনি কি করে চোখে দেখবেন। গুরু মার্পা আর গুরুপত্নী দামেমা দু'জনের চরিত্র ঠিক বিপরীত। একজনের বজ্রাদপি কঠোরাণি, আর একজনের মৃদুনি কুসুমাদপি। মিলারেপা দেখলেন যে তাঁকে নিয়েই গুরুমার যত চিন্তা ভাবনা। গুরুমার কষ্ট মিলারেপার জন্যই—কাজেই এমতাবস্থায় সেখানে না থাকাই উচিত। একটু সুস্থ হতেই একদিন ভোরবেলা তিনি বেরিয়ে পড়লেন নিরুদ্দেশের পথে।

সকালবেলা মিলারেপাকে ডাকতে গিয়ে দামেমা দেখলেন যে মিলারেপা ঘরে নেই,

সে চলে গেছে, সঙ্গে নিয়ে গেছে শুধু কয়েকটি বই যেগুলো ছিল মিলারেপারই পৈতৃক সম্পত্তি। দামেমার মাতৃহৃদয় কেঁদে উঠল। স্বামীকে গিয়ে সে কথা জানাতে সেই বজ্রকঠিন গুরুও চোখের জল সম্বরণ করতে পারলেন না। গুরুমা এই প্রথম বুঝলেন যে তার স্বামীর হৃদয়েও মিলারেপার স্থান ছিল। তাদের একটি নিজস্ব শিশুপুত্রও ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হয় মিলারেপার অবর্তমানে ঘর হয়ে গেল শূন্য। দামেমা কিছুতেই বুঝতে পারলেন না কেন তার স্বামী মিলারেপাকে এত কষ্ট দিতেন। মার্পা জ্ঞানী গুরু, মনে মনে ভাবতেন যে নিশ্চয়ই একদিন দামেমা সব বুঝতে পারবেন। মিলারেপা সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পর আবার ফিরে এলেন। গুরুর পায়ে অর্পিত ধন নিয়ে তিনি কিছুতেই চলে যেতে পারেন না। তাকে পেয়ে দামেমা বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মার্পাও মনে হয় খুশীই হলেন, তবে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটল না। এইবারে মিলারেপার দীক্ষার প্রশ্ন করা হলে মার্পা বললেন— গুরুদক্ষিণা ছাড়া কিছুতেই দীক্ষা দেওয়া চলবে না। মিলারেপাকে নিয়ে গুরু মার্পার চলল নতুন খেলা। দামেমা মিলারেপাকে একটা বহুমূল্য মণি দিয়ে বল্লেন—"এইটা গুরু-প্রণামী দিয়ে তুমি দীক্ষা নিতে পারো", কিন্তু গুরু অতি কঠিন। দামেমা তার ধর্মপত্নী অতএব দামেমার সম্পত্তি মানেই গুরু মার্পার সম্পত্তি, অতএব অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। দীক্ষা ও গুরুদক্ষিণা নিয়ে আরও কিছু সময় অতিবাহিত হয়। মা দামেমা মিলারেপাকে নিয়ে গুরুর এই খেলাকে আর সহ্য করতে পারলেন না। কারণ তিনি ভাবলেন যে এইভাবে আশার আলোর পিছনে ঘুরে ঘুরে ছেলেটা একদিন মারা পড়বে। তাই তিনি গুরু মার্পার প্রধান শিষ্য এবং দর্শন শাস্ত্রের অধিকারী নোংডুন-এর কাছে একটা চিঠি ও কয়েকটি অতুলনীয় সামগ্রী সমেত মিলারেপাকে পাঠিয়ে দিলেন দীক্ষার জন্য। নোংডুন মিলারেপার মারফৎ গুরুমার চিঠি ও বস্তু সামগ্রী পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করলেন এবং বিশেষ যত্ন ও পবিত্রতার সঙ্গে মিলারেপাকে প্রাথমিক দীক্ষিত করলেন। আনন্দলোকের পথে মিলারেপা আর এক সোপান আরোহণ করলেন। মিলারেপা শুরু করলেন তপস্যা। এরপর এল সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনটি। যেই দিনটির জন্য মিলারেপা ধৈর্য ধরে এত দৈহিক এবং মানসিক কষ্ট স্বীকার করেও অধীর আগ্রহে দিন গুনছিলেন।

গুরু মার্পা ধূমধাম করে মিলারেপাকে পূর্ণ দীক্ষা দিলেন, স্বার্থক হল মিলারেপার মানব জীবন। সেইদিনই গুরু মার্পা মিলারেপাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—"তুমি তোমার আরদ্ধ কর্ম সম্পন্ন করেছো, দৈহিক ও মানসিক কষ্টের মাধ্যমে তোমার কৃতকর্মের ফল পুড়িয়ে দিয়েছো। তোমাকে তোমার গুপ্তবিদ্যার কর্মফল থেকে উদ্ধার করবার জন্যই আমি তোমার ওপর এত বোঝা চাপিয়েছিলাম, আমি জানতাম যে তুমি পারবে। দামেমা যদি তার স্নেহ দিয়ে তোমার পথ আটকে না রাখতো তাহলে আরও আগেই তুমি মুক্তি পেতে।" স্নেহময়ী দামেমা গুরু ও শিষ্যের এই মিলন দৃশ্য দেখে আনন্দের আবেগে অশ্রু সম্বরণ করতে পারলেন না। পুত্রের আনন্দে মাতার আনন্দ। গুরু মার্পা, মাতা দামেমা আর মিলারেপার সেই আনন্দের দিনটি ইতিহাসের পাতায়

রইল অমর হয়ে। এবার আর কোন প্রতিবন্ধক নেই। এখন থেকেই মিলারেপার শুরু হবে শুধু তপস্যা, তপস্যা আর তপস্যা।

তবে মূল সিদ্ধাসনে বসবার আগে মিলারেপার একটা কর্তব্য বাকী ছিল—সেটা হচ্ছে তার দুঃখিনী মাতা ও স্নেহের ছোট বোনটির খোঁজ নেওয়া। তারা কোথায় আছে, কি করছে, কিভাবে তাদের চলছে সে বিষয়ে খোঁজ নেওয়া তাঁর কর্তব্য। তাই মিলারেপা রওনা হলেন তাঁর গ্রামের দিকে। নিজের কীর্তি সম্পর্কে মিলারেপা সচেতন ছিলেন, তাই সরাসরি গ্রামের কাছে এসেও তিনি গ্রামে ঢুকলেন না, গ্রামের বাইরে থেকেই তিনি খোঁজ খবর নিতে লাগলেন। অপরের মুখ থেকে তিনি নিজের কাহিনী শুনলেন—কাকার বাড়ী ধ্বসে পড়া থেকে আরম্ভ করে গ্রামে কিভাবে শিলাবৃষ্টি পড়ে মহামারীর সৃষ্টি হয়েছিল ইত্যাদি সব কাহিনী। কাকা কাকিমা এখনও বেঁচে আছেন। বাগ্‌দত্তা বধূ জেসে এখন পূর্ণ যুবতী, তিনি সব সময়ই মিলারেপার প্রত্যাবর্তনের আশায় দিন গুণছেন। মাতা কারমোকিয়েন দেহত্যাগ করেছেন আর বোন পেতা ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব কাহিনী শুনে মিলারেপার মনটি দুঃখে ডুকরে কেঁদে উঠল। সন্ধ্যার পর মিলারেপা আস্তে আস্তে তাঁর গ্রামে ঢুকলেন। দীর্ঘদিনের তপস্যার ফলে আর গুহায় গুহায় রাত কাটাবার দরুণ অন্ধকার তাঁর কাছে আর অন্ধকার নয়। রাতের তারাই তাঁর কাছে প্রদীপের আলো। তিনি দেখলেন তার কাকার বাড়ীর ধ্বংসস্তূপ, তারপর এলেন তাঁদের সেই পরিত্যক্ত কুটীর ঘরে। ঘরের চালা ধ্বসে পড়েছে, জানালা দরজা তো নেই। কোনরকমে চারটি দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে মাত্র। ভগ্ন কুটিরের সেই মেজেতে ছেঁড়া কাঁথা ও তক্তার মধ্য থেকে মিলারেপা কোন রকমে উদ্ধার করলেন তাঁর দুঃখিনী মায়ের শবদেহ। একমাত্র কিছু হাড় ছাড়া সেই দেহের আর কোন চিহ্নই নেই। বনের পশুরাই তার সৎকারের বন্দোবস্ত করেছে। মায়ের পরিত্যক্ত হাড়গুলো নিয়ে মিলারেপা দুঃখের বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে বসে পড়লেন। ছোটবেলা থেকেই মিলারেপা গান গাইতে ভালবাসতেন, দুঃখে বা সুখে সব সময়ই তিনি গান গাইতেন। এই সময়ে, তার শিশুকাল থেকে এই পর্যন্ত যে সব ঘটনা ঘটেছে সব মনের ওপর ভেসে উঠল। পিতার মৃত্যু, মায়ের প্রতি তার কাকার লাঞ্ছনা, মায়ের আদেশে গুপ্তবিদ্যার জন্য গৃহত্যাগ, তারপর বিদ্যালাভ ও বশীকরণ, শুদ্ধ সাধনার পথ অন্বেষণ, দীক্ষালাভ, সব শেষে এখন মিলারেপার জীবনে এসেছে স্থিতি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে যাদের জন্য জীবনের এই বিরাট পরিবর্তন, যারা ছিল কাছে তারা এখন দূরে। কার কাছেই বা মিলারেপা তাঁর আত্মকথা শুনাবেন, এই চিন্তাস্রোতগুলো মিলারেপার মধুর কণ্ঠ দিয়ে সংগীতের আকারে প্রকাশ হতে লাগল। মনে হল তাঁর পিতা ও মাতা পরলোক থেকে মিলারেপাকে আশীর্বাদ করতে লাগলেন।

পরদিন মিলারেপা মাতার অবশিষ্ট অস্থিগুলো সংগ্রহ করে গ্রামের কাছেই একটি স্থানে সমাধিস্থ করে তার ওপর তৈরী করলেন এক সুন্দর সমাধিস্তূপ। সেই সমাধিস্তূপের পাশে বসে তিনি আবার গাইলেন জীবন মরণের চির বন্ধন থেকে চিরমুক্তির গান।

এরপর মিলারেপা গ্রামের অনতিদূরের একটি গুহাতে তপস্যা করতে লাগলেন। কয়েকদিন পর তিনি ভিক্ষার জন্য আবার এলেন গ্রামে। ভোলানাথ মিলারেপা ভেবেছিলেন যে গ্রামের মানুষ এতদিন পর তাঁকে ভুলে গিয়েছে, কিন্তু নিয়তির পরিহাস আর গুপ্তবিদ্যার কর্মফল এখনও খণ্ডাতে কিছু বাকি ছিল। ভিক্ষার জন্য প্রথম যে বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ালেন সেটাই ছিল তাঁর কাকীর বাড়ী। মিলাকে দেখেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলেন, ক্রুদ্ধস্বরে বাঘিনীর মতো তিনি সকলকে জড়ো করে চেলাকাঠ নিয়ে গুহাবাসী রুগ্ন মিলারেপার ওপর এতটুকু দ্বিধা না করে প্রহার করতে লাগলেন। তাতেই কাকী ক্ষান্ত হলেন না, তিনি তাদের কুকুরগুলোকে লেলিয়ে দিলেন। মিলারেপা কোনপ্রকারে পাশের একটি পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোন রকমে প্রাণরক্ষা করলেন। অবস্থা একটু শান্ত হলে তিনি পুকুর থেকে উঠে এলেন—তারপর কাকার দিকে তাকিয়ে আবার একটা গান ধরলেন— গানের আসল কথাটা এইরূপ—"ঠিক কথা যে আমি তোমাদের বাড়ী ধ্বসিয়েছি, তোমাদের জমিতে মহামারী এনেছি—তোমার ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়স্বজনদের মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী, কিন্তু তার আগের কথাগুলো কি তুমি ভুলে গিয়েছো? আমার পিতার জমিজমা সর্বস্ব অপহরণ করে তুমি কি একটি বিধবাকে ঘরছাড়া করনি? নিঃসম্বল অবস্থায় সেই বিধবা দুটি শিশুকে নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে অন্নের জন্য কি ঘুরে বেড়ায়নি, তোমার অত্যাচারে সেই বিধবার চোখের জলে দুটি শিশুর ভবিষ্যৎ কি তোমরা করুণার চোখে দেখেছো, দুঃখিনী মা এখন অন্নাভাবে ঘরের মধ্যে পড়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল আর তার মেয়েটি পেটের দায়ে কোথায় চলে গেল তার জন্য কি তুমি দায়ী নও? আর এখন বলছে তোমাদের অমঙ্গলের জন্য আমিই দায়ী। আমি এখন চিরানন্দের জন্য দীক্ষা নিয়েছি, আমার পথ এখন আর হিংসার নয়, আমার পথ মুক্তির পথ—ক্ষমার পথ। তোমাদের আমি ক্ষমা করলাম। আর তোমাদের মুক্তির জন্য আমি প্রার্থনা করবো। তোমরা আমাকে যে যাতনা দিলে তার জন্য আমি এতটুকু দুঃখিত নই, ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। আসলে তোমাদের জন্যই তো আমার এই পথ অবলম্বন করা।' মিলারেপার এই গান শুনে সেই পাষাণহৃদয়া কাকীও অশ্রু সম্বরণ করতে পারলেন না। এরপর মিলা গ্রামের যেখানে যান সেখান থেকেই পেলেন রক্তচক্ষু আর ভর্ৎসনা!

এরপর মিলারেপা দেখা করলেন তার বাগ্‌দত্তা বধূ জেসের সাথে। জেসের তখন ভরা যৌবন—মিলারেপার জন্যই তিনি বসেছিলেন। মিলারেপা তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর পথ অতি কঠিন পথ, সে পথে কাউকে জড়াতে তিনি চান না। বস্তুতঃ সেটা সন্ন্যাসের পথ—ত্যাগের পথ। সব কিছু ত্যাগ না করলে পরিপূর্ণতা আসে না। তাইতো তিনি এ পথ বেছে নিয়েছেন। মিলারেপা জেসেকে জীবনের পথে চলবার জন্য যথাযথ উপদেশ দিলেন আর জেসেও তা মেনে নিলেন—। তবে জেসে ইচ্ছে করলে মিলারেপাকে মাঝে মাঝে দেখতে যেতে পারেন, তাতে কোনো বাধা নেই।

জেসের মাধ্যমে মিলারেপা তার বোন পেতাকেও খুঁজে পেলেন। পেতা এখন

রাস্তার ভিখিরী। সে মিলারেপার এত কৃচ্ছ্রসাধনের কিছুই বুঝল না। ভিখিরী পেতার কাছে মিলারেপার যত অলৌকিক ক্ষমতাই থাক না কেন—আসলে সেও ভিখিরী বই আর কিছু নয়। অলৌকিক শক্তিবলে সে যদি বড়লোক না হতে পারল তাহলে তার স্বার্থকতা কোথায়! পেতাকেও মিলারেপা সাধনগুহায় আসবার অধিকার দিলেন।

মিলারেপার লৌকিকাচার ও কর্তব্য এবার শেষ হ'ল, আবার শুরু হ'ল তাঁর তপস্যা। পাহাড়ের নির্জন গুহাই তার একমাত্র স্থান। গুরু মার্পা, তাঁর গুরু নারোপার কাছ থেকে অর্থাৎ ভারতবর্ষ থেকে যে সব দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সংগ্রহ করে এনেছিলেন তারই মাধ্যমে চলল মিলারেপার শাস্ত্র সাধনা। মহাগুরু নারোপা ছিলেন পূর্ণসিদ্ধ, মৃত্যুর পরও তিনি বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে বেঁচে ছিলেন। তিনিই মার্পাকে স্বপ্নে বলে দিলেন যে মিলারেপাই হচ্ছে তাঁর উপযুক্ত প্র-শিষ্য; এই মিলারেপার মাধ্যমেই তিব্বতে প্রকাশিত হবে সিদ্ধ সাধনার প্রকৃতরূপ। মহাগুরুর দর্শনে ও মিলারেপার সাধন প্রসঙ্গ আলোচনা করার জন্য গুরু মার্পা আবার এলেন ভারতবর্ষে। মহাগুরু তাঁকে দর্শন দিয়ে আবার দর্শন-শাস্ত্রে ভরিয়ে দিলেন তাঁর ঝুলি। এইভাবে মিলারেপা পরোক্ষভাবে ভারতীয় দর্শন সাধনা সমাপ্ত করলেন।

মিলারেপা জন্মেছিলেন সাধনার ব্রত নিয়ে। সাধনার যে মার্গেই যান সেই মার্গের উচ্চ শিখরে না উঠে ছাড়েন না। সিদ্ধ সাধনার পর শুরু করলেন বদ্ধ সাধনা, অর্থাৎ গুহার মধ্যে ভেতর থেকে পাথরের পর পাথর সাজিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বাইরের জগৎ থেকে আলাদা করে নেওয়া। মিলারেপার এই বদ্ধ সাধনার সময় গুরুমা দামেমা গুহার একটা ফুটো দিয়ে মিলারেপাকে দিনে একবার খাবার দিয়ে আসতেন। মিলারেপা কোনদিন খেতেন, কোনদিন খেতেন না। একবার ধ্যানে বসলে আর ধ্যান ভাঙতো না, ধ্যানের মধ্যেই তিনি খুঁজে পেতেন আনন্দলোক। ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে তিনি অতি ছোটবেলা থেকেই জয় করেছিলেন। দিনের পর দিন তাঁর না খেলেও চলতো।

গুরু মার্পা মিলারেপার একাগ্রতায় ও তপস্যায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করলেন। সদ্‌গুরু মার্পা মিলারেপাকে এই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা দিয়ে বললেন—"তুমি আমার প্রাণাধিক, আমার যথাসর্বস্ব তোমাকে দিয়ে আমি এখন মুক্তি পেলাম। আমার গুরুর কাছে কৃত ঋণ সমাপ্ত হল। তুমিই হবে আমার উত্তরাধিকারী।"

পরবর্তীকালে মিলারেপাই হয়েছিলেন গুরু মার্পার আশ্রমের প্রধান গুরু। সর্ব তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে মিলারেপা তাঁর গানের মাধ্যমে সকলকে উপদেশ দিতে লাগলেন। জগতের যাবতীয় বাসনার পরিণতি দুঃখে, দুঃখ দিয়ে দুঃখ জয় করা যায় না, হিংসার দ্বারাও নয়। জগতেই যারা আনন্দ খোঁজে সে আনন্দ জগতেই শেষ হয়, আসল আনন্দ রয়েছে মহাজগতে—সেটা চিরানন্দ—তার শেষ নেই।

ধ্যানের মাধ্যমে মন শান্ত হয়; সেই শান্ত মনে আত্মজিজ্ঞাসা করলে উপযুক্ত পথের সন্ধান পাওয়া যায়। সর্বজীবে সমভাব মানবজীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। চিন্তাশূন্যতার একটা মহাসমুদ্র আছে, সেই সমুদ্রে অবগাহন করলে পাওয়া যায় অমৃতলোকের

সন্ধান। এই শূন্যতা রিক্ততা নয়—দেহবোধশূন্য অবস্থাই বুদ্ধাবস্থা এটাইতো বজ্রযানের চরম পরিণতি।

মিলারেপা তপস্যার জন্য একটি গুহায় কোনদিন বসে থাকেননি। একটু বাধা বা বিরক্তি এলেই তিনি গুহা পালটাতেন, এইভাবে তিনি হিমালয়ের গুহায় গুহায় বছরের পর বছর ঘুরে সাধনা করলেন। এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে যেতেও তাঁর কোনরকম বাধা ছিল না। দেহ তাঁর কাছে প্রধান নয়, সে মনের দাসমাত্র; মন যেখানে যাবে দেহ তাকে অনুসরণ করতে বাধ্য। শেষের দিকে মহাযোগী মিলারেপা গতিসিদ্ধি লাভ করলেন। বিনা পরিশ্রমেই তিনি স্থান পরিবর্তন করতেন। তারপর মহাযোগীর কথা আর গোপন রইল না, তিব্বতের গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হয়ে গেল এই সিদ্ধ পুরুষের বাণী। দলে দলে লোক এসে জড়ো হতে লাগল তাঁর গুহার কাছে।

মিলারেপার বোন পেতা মিলারেপার সাথে আবার যোগাযোগ করে চলে আসে দাদাকে সাহায্য করতে, বিশেষ করে তার গুহায় খাদ্য-সামগ্রী পৌঁছে দেবার দায়িত্ব সেই গ্রহণ করে। তবে দাদার এই কঠোর তপস্যার কারণ তার কাছে চিরদিনই অজ্ঞাত থেকে গেছে। পেতার সেই একই কথা—মহাগুরু হয়েও যদি ন্যাংটা থাকতে হয় তাহলে এত কষ্ট করে সাধনার কি প্রয়োজন আছে? জেসেও মিলারেপার সাথে মাঝে মাঝে দেখাশুনো করেছেনে বটে, কিন্তু সারাটা জীবন তাকে নিঃসঙ্গই থাকতে হয়েছে। কারণ মিলারেপার কাছে দেহের কোন মূল্য নেই—মূল্য আছে মনের। সেই মহামূল্য মন কে যদি বুদ্ধের চরণে না সমর্পণ করা যায় তাহলে তার স্বার্থকতা কোথায়? তাই তিনি বারবার গাইতেন—"সব ছাড়ো, সব ছাড়ো, সব না ছাড়লে কিছুই পাবে না।"

মিলারেপার উপদেশ আর গান আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র তিব্বতে। মিলারেপা হয়ে উঠলেন তিব্বতের মহাগুরু ও জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। সম্মান ও খ্যাতি মিলারেপাকে তাঁর সিদ্ধাসন থেকে নামাতে পারেনি। গুহাবাসী থেকেই মিলারেপা প্রচার করতে লাগলেন তাঁর অমর আনন্দবাণী—আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনের জন্য ক্ষুদ্র আনন্দের পিছনে না ছুটে চিরজীবনের জন্য মহানন্দের সন্ধান খুঁজতে হবে। গৃহ-জমি-সোনা-শিষ্য এ সবই এই সাধারণ জীবনের জন্য, যে কোন অজ্ঞান লোকই এর অধিকারী হতে পারে। কিন্তু যারা প্রজ্ঞাবান তারা চান চিরন্তন সত্যকে জয় করতে। দেহে বল থাকতে সেই সাধনায় অগ্রসর হতে হবে, পরে নয়। মিলারেপা প্রথমবার তাঁর গ্রামে ফিরে গিয়ে একটি গানের মাধ্যমেই এই কথাটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছিলেন—'যখন উর্বর ছিল জমি, জমির মালিক ছাড়ল ভূমি। যখন মালিক এল ফিরে তখন আগাছায় জমি গিয়েছে ঢেকে।' অর্থাৎ মন ও দেহে যখন শান্তি ও সামর্থ্য থাকবে সেই সময়ই সাধন মার্গে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। পরে হবে বলে সাধন মার্গকে যারা দূরে সরিয়ে রাখে তাদের অবস্থা, উর্বর জমি ছেড়ে মালিকের অন্যত্র গমনের সাথেই তুলনা করা যেতে পারে।

এই দেহ নশ্বরই, কাজেই এর পেছনে ছুটে লাভ নেই। সেই দেহ যত বড় মহাপুরুষেরই হোক না কেন, দেহের কোন মূল্য নেই, মুল্য আছে আত্মার। তাই

মিলারেপা তাঁর শিষ্যদের বলে গিয়েছেন—"আমার মৃত্যুর জন্য কেউ শোক করবে না—আমার মর-দেহ নিয়ে কোনরকম অনুষ্ঠান করবে না—এই দেহটা কোন এক অজানা গুহায় যদি পড়ে থাকে এবং তা যদি পশু ও কীটের ভক্ষ্যবস্তু হয় তাহলেও তোমরা তারজন্য কোনরকম চিন্তা করবে না। মৃত্যুর পর আমি কোথায় যাবো কোথায় থাকবো সে চিন্তাও তোমরা করবে না, কারণ মুক্ত আত্মার কোন নির্দিষ্ট গন্তব্য নেই, সেটাই হচ্ছে পরম মুক্তি।"

মহামুনি, তিব্বতের বাউল ঋষি মিলারেপা তাঁর সব বাণীই গানের মাধ্যমে সকলকে বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সুকণ্ঠে যিনিই তাঁর বাণী পেয়েছেন তিনিই ধন্য হয়েছেন। প্রকৃতিদেবী ছন্দের আকারে মিলারেপার দেহে প্রবেশ করেছিলেন—আর তারা দেবী জুগিয়েছেন তাঁর ভাষা। মিলারেপার কঠোর জীবন পরবর্তীকালে ভরে উঠেছিল পূর্ণ আনন্দ ও ছন্দে।

মহাযোগী ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মিলারেপার মৃত্যুটিও ছিল বড় অদ্ভূত ও বেদনাদায়ক। মিলারেপা ছিলেন পরম পবিত্রতার প্রতীক। গরীব জনসাধারণের তিনি ছিলেন পিতৃস্বরূপ। ধর্মের ব্যাপারে তাঁর শিক্ষা ছিল অতি সহজ। তিনি কত কষ্ট ও তপস্যার ফলে আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চ শিখরে উঠেছেন, অথচ অন্যের জন্য তিনি সব সময়ই সহজ ও সরল পথ বলে দিতেন। শাস্ত্রপাঠ ও আড়ম্বর অনুষ্ঠান পূজাপদ্ধতির মাধ্যমে সময় নষ্ট না করে সরাসরি ধ্যানের মাধ্যমে সমাধিস্থ হওয়ার কথাই তিনি উপদেশ দিতেন।

মিলারেপার এই সহজ ও সরল পথের উপদেশ সেই সময়কার লামা মহলে খুব বেশী মর্যাদা পায়নি। কারণ সেই সময়কার অধিকাংশ লামাই সাধারণ মানুষদের বিশ্বাস ও সরলতার সুযোগ নিয়ে গুরু-ব্যবসা বেশ জমিয়ে বসেছিলেন। এই শ্রেণীর লামারা ছিলেন খুব ধনী আর সমাজে প্রভাবশীল।

লামা সাফুয়া তাঁদেরই একজন। মিলারেপার সুনাম ও অত্যাশ্চর্য অলৌকিক ক্ষমতা ও তপস্যার কথা তখন তিব্বতের ঘরে ঘরে প্রচারিত। লামা সাফুয়ার অনেক ভক্তও মিলারেপার আদর্শে ঝুঁকে পড়েছে দেখে সাফুয়া হিংসায় জ্বলে উঠল। মনে মনে ভাবল মিলারেপা যদি এইভাবে আর কয়েক বছর তাঁর উদার বাণী প্রচার করতে থাকেন তাহলে শুধু লামা সাফুয়া নয়, তিব্বতের সমস্ত লামা ব্যবসায়ে ভাঙন ধরবে। লামা সাফুয়া ছিল লামার ছদ্মবেশে সত্যিকারের ভণ্ড।

মিলারেপাকে সে লামা মহলে তর্কে আহ্বান জানালো। মিলারেপা তার সেই অভিপ্রায় বুঝতে পেরে লামা সাফুয়াকে নিরস্ত্র করলেন। লামা সাফুয়া তারপর বিভিন্ন কারণে ও অকারণে মিলারেপাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করতে লাগল। মহাযোগী মিলারেপা হাসিমুখে লামা সাফুয়ার সব চেষ্টাই ব্যর্থ করে দিলেন। এবার লামা সাফুয়া মরিয়া হয়ে উঠল—যে কোন প্রকারে হোক মিলারেপাকে জগৎ থেকে সরিয়ে দিতে হবে, নয়তো লামাকুলের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

অনেক চিন্তা-ভাবনা করে কপট লামা সাফুয়া এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। লামা সাফুয়ার চরিত্র বলতেই কিছু ছিল না—তার কয়েকটি উপপত্নী ছিল। তাদেরই একজনকে ডেকে সে তার ষড়যন্ত্রের কথা জানালো। মহিলাটি প্রথমে রাজি হতে চাইল না। কিন্তু লামা সাফুয়া তাকে বুঝিয়ে দিল যে মিলারেপা আসলে একটি ভণ্ড, তার ভিতরে সত্যিকারের জ্ঞান বলতে কিছু নেই, কাজেই এমন লোকের প্রাণহানিতে জগতের কল্যাণ বই অকল্যাণ হবে না। মহিলাটি এবারে রাজি হল। লামা সাফুয়া তার হাতে একবাটি দই দিয়ে বলল যে, এই দইটা মিলারেপাকে খাইয়ে দিতে হবে। এই দইয়ের মধ্যে আছে মরণ বিষ যা খেলে কোন মানুষই আর বেঁচে থাকতে পারে না। ভক্তাধীন মিলারেপা ভক্তের হাতের এই খাদ্য গ্রহণ করবেই। যে রকম করেই হোক, মিলারেপাকে এটা খাইয়ে দিতে হবে। লামা সাফুয়ার প্ররোচনায় এবং আশ্বাসে মেয়েলোকটি দইয়ের বাটি নিয়ে মিলারেপার গুহার কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। মিলারেপার দর্শনের জন্য রোজই কেউ না কেউ কিছু না কিছু হাতে করে নিয়ে আসে, কাজেই মিলারেপার শিষ্যদের মধ্যে কেউ বিষপূর্ণ দধিপাত্র হাতে নিয়ে মেয়েলোকটিকে দেখে সন্দেহ করেননি। অন্তর্যামী মিলারেপা মেয়েলোকটিকে দেখেই হেসে স্বাগত জানালেন, তারপর বললেন, যে, "আমি জানি তুমি কি এনেছো, তবে আজ নয় কাল এস।" মিলারেপার কথা শুনে মহিলাটির বুক কেঁপে উঠল এবং ভয়ে সর্বশরীর কেঁপে উঠল। কোন রকমে মিলারেপাকে প্রণাম করেই দৌড়ে পালিয়ে গেল। লামা সাফুয়া তার ষড়যন্ত্র ভেস্তে যাচ্ছে দেখে মরিয়া হয়ে উঠল। সে মেয়েলোকটিকে আশ্বাস দিয়ে বলল যে, ভয়ের কোন কারণ নেই, দইএর মধ্যে কি আছে তা মিলারেপা কিছুই জানেন না। তাঁর হেঁয়ালিপূর্ণ কথায় ভেঙে পড়লে চলবে না। সাফুয়ার কথায় মেয়েটি আরও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, সৌম্যমূর্তি মিলারেপাকে দর্শনের পর তাঁকে হত্যার কথা কিছুতেই মহিলাটি চিন্তা করতে পারছে না। লামা সাফুয়া কিন্তু তার কান্নায় এতটুকু বিভ্রান্ত না হয়ে তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল যে মিলারেপাকে সে যদি এই বিষাক্ত দই খাওয়াতে পারে তাহলে সে তাকে তার প্রবীণ স্ত্রীর পদে স্বীকৃতি দেবে, শুধু তাই নয় মহিলাটিকে একটি সুন্দর ও মহামূল্য রত্ন উপহার দেবার অঙ্গীকার করল। নারীজাতি সাধারণতঃ এই ধরনের প্রলোভনে নিজেকে সংযত রাখতে পারে না।এক্ষেত্রেওহল তাই—ভবিষ্যতের কথা ভেবে সে রাজি হয়ে গেল। পরেরদিন মিলারেপার ওখানে আবার বিষাক্ত দই নিয়ে যেতেই মিলারেপা তাকে সস্নেহে পাশে বসালেন, তারপর আগের মতই অভয় দিয়ে বললেন—"আমি জানি তুমি কার জন্য কি করছ। অবলা নারী, ভগবান তথাগত তোমাকে রক্ষা করুন। কিন্তু আমি যদি এক্ষুনি তোমার এই খাদ্য খেয়ে প্রাণত্যাগ করি তাহলে তুমি তোমার প্রতিশ্রুত রত্নখন্ড পাবে না; তার চেয়ে ভাল হয় যদি তুমি আগে তা সংগ্রহ কর, তারপর তোমার কাজ কর।" মিলারেপার কথা শুনে মহিলাটির অন্তঃকরণ ভয়ে কেঁপে উঠল, কিন্তু রত্নখন্ডের প্রলোভন সামলানোর মতো মনের অবস্থা তার ছিল না। তাই এবারেও সে ফিরে গেল। লামা সাফুয়া তার কাজ হাসিল করবার জন্য এখন যে কোন রকম পুরস্কার দিতে প্রস্তুত। সে মহিলাটিকে একটি দামী

রত্নখণ্ড দিয়ে বলল—"যাও, এবারে আর কোন কথা নয়, তোমার কাজ তোমাকে করতেই হবে।"

রত্নখন্ড নিয়ে সে মিলারেপার গুহায় আসতেই মিলারেপা বললেন, "পৃথিবীতে যারা জীবন ধারণ করে আসে, একদিন না একদিন তাদের আবার সে জীবন ত্যাগ করতেই হবে। আমারও এখন সময় এসেছে যাবার ; তুমি বা লামা সাফুয়া উপলক্ষ মাত্র। আমার জীবনের মূলমন্ত্র হচ্ছে ক্ষমা। তোমাদের আমি ক্ষমা করলাম। ক্রোধ হিংসা এসব আমি বহুদিনই বর্জন করেছি। আমি যে তোমার বিষাক্ত খাদ্য গ্রহণ করছি সে কথা আমি গোপন রাখলাম তোমার মঙ্গলের জন্য। কাউকেই বলব না।" এই কথা বলে মহামুনি মিলারেপা সেই বিষাক্ত দই ভক্ষণ করলেন। মহিলাটি আর স্থির থাকতে পারল না—উচ্চস্বরে কেঁদে মিলারেপার পায়ে লুটিয়ে পড়ল, তার জানতে আর বাকি রইল না যে মিলারেপাই হচ্ছে সত্যিকারের বুদ্ধাবতার, লামা সাফুয়া হচ্ছে আসল ভণ্ড ও পাপী।

এই ধরনের বিষক্রিয়ায় সাধারণলোক বিষাক্ত কেউটে সাপের দংশনের মতোই সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। কিন্তু মিলারেপার এটা ইচ্ছামৃত্যু, মৃত্যুটাও তাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে। তাঁর আরও কিছুদিন দরকার ভক্ত শিষ্যদের মন তৈরী করবার জন্য। তাই শরীরে বিষের ক্রিয়া দেখা দিলেও তাঁর মন রইল সম্পূর্ণ তাঁর অধিকারে। দেহের যাতনা থেকে মনটাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই ভক্ত শিষ্যেরা জানতে পারল যে গুরুদেব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, কিন্তু কারণটা সকলেরই রইল অজানা। মিলারেপা অতি বিষাক্ত দধি খেয়েও কয়েকদিন বেঁচে আছেন সেই সংবাদে সবচেয়ে বেশী অস্বস্তিতে পড়ল লামা সাফুয়া। দুষ্টাত্মা সাফুয়া মনে মনে প্রমাদ গুণ্‌ল। মিলারেপা তার ষড়যন্ত্র সব জেনে ফেলল কিনা জানবার জন্য আর স্থির থাকতে না পেরে নিজেই চলে এল মিলারেপার কাছে। তারপর সহানুভূতির ভান করে সকলের সামনেই মিলারেপাকে জিজ্ঞাসা করল—"আহা! আপনার এই অবস্থা কে করল—আপনার মতো বিজ্ঞ লোকের সমাজে বেঁচে থাকার খুব প্রয়োজন—আপনিতো অলৌকিক বিদ্যার অধিকারী, কাজেই আমার ওপর এই রোগের বোঝা চাপিয়ে দিন, আমি আপনার হয়ে মরব।" লামা সাফুয়ার এই চরম কপটতা দেখেও তিনি স্থির রইলেন, সস্নেহে বললেন—"কারও মনে দানব এসে ভর করেছিল তাই সে এমন কাজ করেছে। এ রোগের জ্বালা অসহ্য ; কোন মানুষই তা সহ্য করতে পারবে না। কাজেই তোমাকে এ রোগের ভার দেওয়া অসম্ভব তোমার দেহ তা সহ্য করতে পারবে না।"

দুষ্টাত্মা পাপাচারী লামা সাফুয়ার মন তখন অস্থির। মিলারেপা তার ষড়যন্ত্র জানতে পেরেছেন কিনা তা জানবার জন্য সে যেন পাগল হয়ে উঠেছে, তাছাড়া মিলারেপার শক্তি যাচাই করবার এই তো চরম মুহূর্ত। কাজেই সে সকলের সামনে বারংবার মিলারেপার ব্যাধি বহন করবার জন্য পীড়াপিড়ি করতে লাগল। অবশেষে বাধ্য হয়ে দয়াবতার মিলারেপা বললেন—"আমার এ ব্যাধি তুমি কিছুতেই বহন করতে পারবে না—তবে তুমি যখন চাইছ আমি তোমাকে দেখাচ্ছি—গুহার বাইরে যে দরজার

কাঠগুলো দেখছো তার উপর আমার যন্ত্রণা আরোপ করছি, ভালোভাবে চেয়ে দেখো।” তার কথামতো সকলেই সেই কাঠগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল—কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই শক্ত কাঠগুলো মনে হল আগুনে পুড়ে উঠে বিকৃত হয়ে গেল। চোখের সামনে সেই দৃশ্য দেখে সকলে শিউরে উঠল। কারো বুঝতে বাকী রইল না যে মিলারেপা কি সাংঘাতিক ব্যাধিতে ভুগছেন। এ দৃশ্য দেখার পরও লামা সাফুয়া মিলারেপাকে উদ্দেশ্য করে বলল—“ওটা তো কাঠ, কাজেই ওকে নিয়ে এ রকম অলৌকিক বিদ্যা দেখানো সম্ভব, কিন্তু আমি হচ্ছি রক্ত-মাংসে গড়া শক্ত লামা সাফুয়া। আমার উপর এই রোগটা চালনা করে দিন, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি।”

এবার মিলারেপা বললেন—“ঠিক আছে, তাই হবে, আমি আমার যন্ত্রণার অতি সামান্য অংশমাত্র তোমার দেহে সঞ্চারণ করে দিচ্ছি, তবে তোমার অসহ্য লাগলে আমাকে বলতে দ্বিধা করবে না।” এই বলে মিলারেপা তার যন্ত্রণার কণামাত্র লামা সাফুয়াকে দিলেন। লামা সাফুয়া চোখের পলকে সেই যন্ত্রণায় আহত হয়ে ভূমির উপর চীৎকার করে লুটিয়ে পড়ল। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সে বুঝতে পারল যে, মিলারেপা সত্যিই মহাযোগী ও পরম অবতার। যন্ত্রণার সামান্যমাত্র অংশেই মনে হল সেই দারুণ মৃত্যুযন্ত্রণা সে আর সহ্য করতে পারবে না, মিলারেপা সে রোগ ফিরিয়ে না নিলে সে এক্ষুনি মারা পড়বে। ভূমির উপর আছাড় খেয়ে শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, মুখ দিয়ে লালা পড়তে আরম্ভ করেছে—এই সর্বনাশা খেলা সে নিজেই তো ডেকে এনেছে—আর স্থির থাকতে না পেরে কোন রকমে মিলারেপার পায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কাতর স্বরে বলল— “আমাকে বাঁচান, আমাকে রক্ষা করুন, আমার যোগ্য শাস্তি আমি পেয়েছি।” সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাধি আবার ফিরিয়ে নিলেন। লামা সাফুয়া প্রাণে রক্ষা পেয়ে সেই করুণাবতার মিলারেপার চরণে সর্বস্ব সমর্পণ করে মুক্তির জন্য দীক্ষা চাইলেন। মিলারেপার মৃত্যুর জন্য যে দায়ী তাকেও তিনি ক্ষমা করে জীবে দয়ার এক সুন্দর উদাহরণ স্থাপন করলেন। মিলারেপাকে যারা আঘাত হেনেছেন তাদের সবাইকেই তিনি বুকে জড়িয়ে ধরেছেন, মিলারেপার সেই কাকীও মিলারেপার কাছে দীক্ষা নিয়ে মুক্তিস্নান করেছিলেন।

শরীরের এই বিষক্রিয়ার পরও মিলারেপা বেশ কয়েকদিন বেঁচে ছিলেন এবং সেই সময় তিনি তাঁর ভক্ত শিষ্যদের তাঁর জীবনের শেষ উপদেশাবলী দিয়ে যান। তারপর এক শুভ মুহূর্তে তিনি ব্রহ্মলীন হলেন।

গুহাবাসী—উলঙ্গগুরু—লতাগুল্ম খেয়ে যিনি সকলের অজ্ঞাতে সাধনা করেছিলেন, পরবর্তী যুগে তিনিই হলেন তিব্বতের মহাগুরু লামাপূজ্য সাধকশ্রেষ্ঠ কবিবর মিলারেপা।

মিলেনিয়ামে লাসা

সময় নিজের গতিতে নিজে এগিয়ে চলেছে। ১৯৫৬ সালের সেই গৃহপলাতক কিশোর আজ দুহাজার চার সালে পৌঁছেছে। কৈলাসেশ্বরের কৃপাধন্য সেই বালকটি ভ্রমণের যে বীজমন্ত্র পেয়েছিল, সেই নাম জপ করে করে সে ঘুরে বেড়াল দিক্ দিগন্তের এই বিচিত্র পৃথিবীর বুকে। শুধু নয়ন ভরে নয়, শরীরের প্রত্যেকটি কোষকে সজাগ রেখে সে উপলব্ধি করেছে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধে ভরা পৃথিবীর বিভিন্ন তরঙ্গকে। হাতে খড়ি হয়েছিল কোলকাতা থেকে কৈলাস। পরবর্তী জীবনে সেই মৌনীবাবাই হ'ল পরিব্রাজক ভূপর্যটক। আশীর্বাদ মানুষকে বড় করে, আত্মাকে তুলে আনে আধ্যাত্মিক মার্গে।

অদৃষ্ট, কর্মফল, গুরুকৃপা সব কিছুই নির্ভর করে ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তির ওপর। সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ এই তিনগুণের মত ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি যুগে যুগে মানুষকে আলোর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের জীবনে এই শক্তিই তো আশীর্বাদের তরঙ্গ দৈনন্দিন জীবনের অলৌকিক সম্পদ। এই পঞ্চভূত[১] ও মহাভূতে[২] তৈরী মানবদেহে নিশ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে প্রতি মুহূর্তে আসছে প্রাণ-শক্তি। এই প্রাণ-শক্তিই আমাদের জীবিত করে রাখছে, এটাই সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে আমাদের সরাসরি যোগাযোগ, যেমন মায়ের সাথে মাতৃগর্ভে শিশুর নাড়ীর যোগ। আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী, তাতে ঈশ্বরের কিছু যায় আসে না, লাভ ক্ষতি সেটা আমাদের। বাতাস, আলো, আগুন, জল, মাটি, আকাশ সবই তো তার দান তার আশীর্বাদ বৃষ্টির মত পড়ছে, প্রয়োজন মত ধরে রাখো। আর না ধরলেও সেই আনন্দধারা নিত্য বহমান।

আমি তারই দেওয়া দেহ মন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, নয়নভরে দেখছি তাকেই। সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, সমুদ্র, নদী, হ্রদ, ঝর্ণা, পাহাড়-বন-জঙ্গল, সুড়ঙ্গ, পাতাল, শহর সমাজ, জন্তু, জানোয়ার, মানুষ, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি সব কিছু তো তারই প্রকাশ, কোথাও স্থায়ী, কোথাও অস্থায়ী, আনন্দদায়ক, ভয়ানক—সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা সব কিছুতো সেই অব্যক্তের ব্যক্ত রূপ। শুধু দেখি আর দেখি—সেই দেখার মধ্যেই দর্শন[৩], আত্মোপলব্ধি আপনা থেকেই আসে। লাসা, কৈলাসনাথ, মানস সরোবর ঘুরে আসার পর আমি নিজেকেই বার বার জিজ্ঞেস করেছি, "কি করে হ'ল?" উত্তর পাইনি। "কি পেলাম?" উত্তর; "প্রয়োজনের চেয়ে অনেক অনেক বেশী পেয়েছি।" প্রয়োজনের থেকে যেটা বেশী জমা পড়েছিল কপালে, সেটাই ছিল আমার ভবিষ্যতের মূলধন। ভূ-প্রদক্ষিণ করার সময় আর আজও সেই মূলধন ভাঙ্গিয়েই চলছি। সেই মূলধন হচ্ছে আশীর্বাদ আর অভিজ্ঞতার ঝুলি।

১৯৫৬ সাল থেকেই আমি শুরু করি ভারত ভ্রমণ ভারতের তীর্থে তীর্থে। ১৯৫৯সালে যখন মাননীয় দালাই লামা ভারতে রিফিউজি হয়ে আসেন, তখন আমি তিব্বতের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। আমি ভেবেছিলাম, রাজা সে উদ্বাস্তু হলেও রাজাই থাকে, কাজেই তিব্বত তথা দালাই লামার সমস্যাটা আমার সমস্যা নয়। তা সত্ত্বেও কেন জানি না একবার ১৯৬৩ সালে, আমি দিল্লী হয়ে ধরমশালায় যাই, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় দালাই লামা ধরমশালায় ছিলেন না, দেখা হল না। ১৯৬৭ সালে আমি বেরিয়ে পড়ি ভূ-পর্যটনে। চলার পথে কথাপ্রসঙ্গে অনেকবার মাননীয় দালাই লামার কথা হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় মূলপ্রসঙ্গ ছিল, কি করে তিব্বত-প্রধান ধার্ম্মীক দালাই লামা ও তাঁর লক্ষাধিক উদ্বাস্তু শিষ্যদের আবার লাসায় ফিরিয়ে আনা যায়। কি করে হেগ্-এর আন্তর্জাতিক আইনের আশ্রয় নিয়ে এবং বিশ্বমানব অধিকারের অজুহাতে চীন সরকারের সাথে একটা শান্তিমূলক আলোচনার মাধ্যমে মাননীয় দালাই লামাকে তাঁর পোতালা রাজপ্রাসাদে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়। মাননীয় দালাই লামা পৃথিবীর এক নম্বর লীডারদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সাহায্যের জন্য দরজায় দরজায় ধর্ণা দিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য কোন ফল হয় নি। পৃথিবীর বুকে তখনও তৃতীয় মহাযুদ্ধের ভবিষ্যৎ ভূত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। চীন- রাশিয়া-আমেরিকা-ফ্রান্স সবাই ভিয়েৎনাম নিয়ে ব্যস্ত। আর ওদিকে ভেতরে ভেতরে ঠাণ্ডাযুদ্ধের জন্য— দুই মহাশক্তি রাশিয়া ও আমেরিকা প্রস্তুত। কাজেই রাজ্যচ্যুত-উদ্বাস্তু দালাই লামা বাধ্য হয়ে গ্রহণ করলেন ধর্ম্মীয় পথ। অনাসক্ত, ত্যাগ আর অহিংসা ব্রত নিয়ে তিনি হাসিমুখেই রইলেন পরবাসী। ভারততীর্থে দালাই লামা হলেন বিশ্ববাসী। ভগবান বুদ্ধের দেশ ভারতই তখন তাঁর দেশ।

১৯৭২ সালে আমার সাইকেলে ভূ-পর্যটন[৪] শেষ হল। সাইকেল সাঁতার জানে না, উড়তেও পারে না। তাই সব দেশে যাওয়া হয় নি, তাই আবার শুরু হল চলা। চাক্‌রী করে পয়সা রোজগার— তারপর আবার চলা— । তবে আর্থিক অবস্থা আগের থেকে স্বচ্ছল তাই পরিব্রাজকের থেকে পর্যটক। বহু দ্বীপ, চির তুষারাবৃত পর্ব্বত, দক্ষিণ মেরু, উত্তর মেরু ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লাম। অনুরোধ আসতে লাগ্‌ল "বল যা দেখেছো বল"— শুরু করলাম ভ্রমণ কাহিনী লিখ্‌তে। নেহাৎই বলার জন্য লেখা, কারণ আমি লেখক নই। এই সময়ই প্রেরণা পেলাম— চারিদিক থেকে ইঙ্গিত এল— আমার শৈশবের সেই না বলা কাহিনীকে বল্‌তে হবে, লিখ্‌তে হবে, কে যেন আমার হাতে কলম ধরিয়ে দিয়ে বল্‌ল— "লেখ্", লিখ্‌লাম, মানে আমাকে দিয়ে লেখানো হল আমারই কাহিনী মহাতীর্থের শেষ যাত্রী। কারণ ভারত থেকে লাসায় আমাদের দলটিই ছিল শেষ তীর্থযাত্রী। লিখ্‌তে গিয়ে আবার প্রবেশ করলাম স্মৃতির পটে। সেই থেকে ঘুমন্ত স্মৃতি মাঝে মাঝে জেগে ওঠে বিদ্রোহ করে বলে— চল্ আবার তিব্বত চল্। স্মৃতির বাহনকে শান্ত করার জন্য বলি— "দাঁড়া সময় মতো সুযোগ আস্‌বেই।"

মহাতীর্থের শেষ যাত্রী লিখ্‌তে গিয়ে বহুবার অন্যমনস্ক হয়ে গেছি, বার বার ভেবেছি, তিব্বত বিশ্ব তীর্থ, জোখাং মানস সরোবর আর কৈলাসনাথের দরজা একদিন না একদিন

খুল্‌বেই। কোনো দেশের ইতিহাসই স্থায়ী নয়। আমাদের ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। মহাতীর্থের শেষ যাত্রীর পাণ্ডুলিপিতে অনেকবার চোখের জল পড়ে লেখাটাকে ঝাপসা করে দিয়েছিল— করুণাময়ীর কাছে হয়তো সেটাই ছিল আমার আবেদন-পত্র। তারপর হঠাৎ সুযোগ এল।

সান্‌ফ্রান্সিসকো, সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা ও লজানে পরপর তিনবার মাননীয় দালাই লামার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, তিব্বতে ফিরে যাবার কি হল—

উত্তরে তিনি বললেন— "চীন সরকারের কোন সহযোগীতা পাচ্ছিনা, কোনো সিকিউরিটি নেই, অবস্থার কোনো উন্নতি হয় নি", তাঁর উত্তর শুনে মনে ভীষণ আঘাত পেয়েছিলাম। যিনি তথাগতের চরণাশ্রিত, কালচক্র যার বীজমন্ত্র, মহাকাল যার নগর রক্ষক, তার জীবন নির্ভর করছে সামান্য চীন-সরকারের ওপর। আমি জ্ঞানী নই, তাই সেদিন তাঁর কথা বুঝতে পারিনি। পরে বুঝেছি যে, ধ্যানী দালাই লামা আর মিডিয়ার সামনে দালাই লামা একই লোক হলেও সময় ও লোক বুঝে উত্তর দিতে হয়। যেমন হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ নীতি "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" স্থান কাল পাত্র ভেদে বিচার ও ব্যবহার।

আমার এক সাংবাদিক বন্ধু ক্লোদ্ লোভেঁসঁ (Claude Levenson) চতুর্দশ দালাই লামা শ্রী তেনজিং গিয়াৎসোকে সরাসরি প্রশ্ন করল— আপনি আগে ছিলেন লাসায় বিশ্ববিখ্যাত পোতালা প্রাসাদে আর আজ আপনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেশ বিদেশে, কোন্‌টা ভাল লাগে এ বিষয়ে কিছু বলবেন?

উঃ- অবশ্যই বলবো, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ, পোতালা প্রাসাদে আমি ছিলাম পর্দ্দায় ঢাকা, বাইরের জগৎ সম্পর্কে আমার কিছু জানা ছিল না। তখন বয়সও ছিল কম। দালাই লামার প্রতিটি পদক্ষেপ ও আচরণ ছিল সীমিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। রিফিউজি হয়ে আসার পর আমার চোখের সামনে থেকে একের পর এক সেই পর্দ্দাগুলো উঠে গেছে। নিজের চোখে দেখছি জগৎটাকে, কত শত মানুষের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে, বন্ধুত্ব হচ্ছে। আমি রাজ্য হারিয়েছি কিন্তু নিত্যনতুন বন্ধু পাচ্ছি। আমার বন্ধুরাই আমাকে আগলে রাখছে, তারাই আমাকে রক্ষা করছে এটা একটা অন্য বিরাট জগৎ। আমি অনেক দেশ ঘুরছি ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, প্রথম প্রথম লোক দেখলেই মনে হত— কি জানি কি জিজ্ঞেস করবে, কি উত্তর দেবো— এখন আর সেই ভয় নেই।

এই ধরনের বহু প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পোতালার শাক্যমুনীকে পেলাম সাধারণ মানুষের মতো। দালাই লামা আমার থেকে পাঁচ বছরের বড়, কিন্তু জ্ঞান পদমর্যাদায় তিনি অনেক অনেক উর্দ্ধে, পরপর তিনবার সাক্ষাৎকারের পর তাঁকে পেলাম নিজের কাছে। অনেক অবলা প্রশ্নের উত্তর আপনা থেকেই পেয়ে গেছি। আমার এই কাহিনী বলার আগে আসা যাক এক নজরে; তিব্বতের কয়েকটা উল্লেখযোগ্য দিন ও ঘটনায়:

১৯৫৯ সালে হিজ্ হোলিনেস্ দালাই লামা পার্শ্বচর লক্ষাধিক ভক্ত ও অনুচর নিয়ে প্রাণ হাতে করে পালিয়ে এলেন আসাম হয়ে শিলিগুড়ি। নেহরুজী স্বয়ং এবং সরকার

তাঁকে স্বাগত জানালেন— ধর্মশালায় তাঁর জন্য তৈরী হল একটা উপনগরী। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতের সঙ্গে চীন সরকারের সব সম্পর্ক ছিন্ন হল। তারপর "হিন্দী চীনি ভাই ভাই" নাম করে চীন সরকার আক্রমণ করল ভারত সীমান্ত— নেপাল, সিকিম, ভূটান ও আসামে দেখা দিল দু'দলের সৈন্যবাহিনী। তিব্বতি শহীদরা হাজারে হাজারে প্রাণ বলি দিল। ১৯৬৫ সালে চীন সরকারের অধীনে স্বাধীন তিব্বত ঘোষিত হল। আর তার এক বছর পর অর্থাৎ ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত কালচারাল রেভোল্যুশানের নাম করে চল্‌ল তিব্বতিদের ওপর জঘন্য অত্যাচার। অমানুষিক নির্যাতন আর নিরীহ সাধারণ তিব্বতি নিধন যজ্ঞ। এক কলঙ্কময় অধ্যায় তিব্বতের ইতিহাসে রক্তাক্ষরে লেখা হ'ল। চীন কর্তৃপক্ষের এই দানবীয় ঘটনা পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিগুলো দেখেও চোখ বুজে রইল। অসহায় নারী, শিশু, বৃদ্ধ আর স্বাধীনতাকামী তিব্বতিদের রক্তে রাঙা হয়ে উঠল লাসা ও তিব্বতের প্রত্যেকটি শহর। কালচারাল রেভোল্যুশনের নামে হত্যা করা হল প্রত্যেকটি গোম্ফা, মন্দির ও আশ্রমের নিরীহ সন্ন্যাসীদের। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নাম করে বিরাট তিব্বতে রাজ্যব্যাপী লুণ্ঠন, ধ্বংস আর হত্যাকাণ্ড চল্‌ল প্রায় দশ বছর যাবৎ। চীনা সৈন্যের কামানের গোলায় ধ্বংস হল প্রায় পাঁচ হাজার চৈত বিহার ও মন্দির। নিহতের সংখ্যা পনেরো লক্ষেরও বেশী। সেই সময় তিব্বতের জনসংখ্যা ছিল মোট ষাট লক্ষের মত। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবরটা জানাজানি হয়ে গেল আন্তর্জাতিক মহলে।

১৯৭৮ সালে চীন সরকার আন্তর্জাতিক মহল ও উন্নত দেশগুলোর সহানুভূতি পাওয়ার জন্য তিব্বতে পুনঃ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা ও ধর্ম্মস্বাধীনতা ঘোষণা করল। এই সময় এবং এই প্রথম তিব্বতি যুবকরা চীনা কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।

১৯৭৯ সালে, অর্থাৎ তিব্বতের ধর্ম্মগুরু দালাই লামার লাসা থেকে পালাবার কুড়ি বছর পরে, এই প্রথম তিব্বত-নেতা দালাই লামার প্রতিনিধিদের সঙ্গে চীন সরকার বসল স্বাধীন তিব্বতের বিষয়ে আলোচনা চক্রে। পরপর তিন দফায় তারা আলোচনা করল, কিন্তু কোন লাভ হল না শুধুই কথা। মোদ্দা কথা তিব্বত চীন দেশেরই অংশ।

১৯৮৭ সালে তিব্বতী যুবক-যুবতীরা বেপরোয়া হয়ে চীনা সৈন্যদের বেড়া ডিঙিয়ে লাসায় আগত ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান ট্যুরিস্টদের সামনে গিয়ে জানাল দেশের দুরবস্থার কথা। মানব অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত আর সাধারণ নাগরিক অধিকারও তাদের নেই। তিব্বতি যুবকদের এই আস্পর্দ্ধা দেখে সঙ্গে সঙ্গে চীনা সৈন্যবাহিনী তাদের ওপর গুলি চালায়, যারা বাঁচল তাদের বন্দী করা হল কারাগারে। চীনা সরকারের প্রচুর চেষ্টা সত্ত্বেও এই ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়া গেল না, কারণ ট্যুরিস্টদের ক্যামেরায় ধরা পড়ে গেছে চীনা বাহিনীর অত্যাচারের কাহিনী। এই প্রথম ইউরোপ ও আমেরিকার খবরে বিরাট করে ছাপানো হল চীনা সৈন্যের বর্বর কাহিনী। ছদ্মবেশী চীনা ভাইদের মুখোস খুলে গেল।

১৯৮৮-১৯৮৯ তিব্বতের নববর্ষ উৎসবের সময় আবার চীনা বিদ্রোহ আন্দোলন শুরু হয়। চীন সরকার সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনকারীদের হত্যা ও কারাদণ্ড দেয়। এই সময়েই

পাঞ্চেন লামা দেহত্যাগ করেন। পাঞ্চেন লামার শহর শিগাৎসের তিব্বতিরা মৃত্যু শোককে কেন্দ্র করে গড়ে তুলল চীনা হঠাও আন্দোলন। প্রচুর লোক ডাকে সাড়া দিল। এইবার চীনা সরকার আন্দোলন আয়ত্ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে সম্পূর্ণ তিব্বতে জমায়েৎ নিষিদ্ধ করে কারফিউ জারি করল। আর ওদিকে চীনের রাজধানী বেইজিং-এ এই সময়েই চীনা সামরিক বাহিনী আন্দোলনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর দিয়ে ট্যাংক চালিয়ে পিষে মারল নিরীহ ছাত্রছাত্রীদের। তবে এইবারে তিব্বতি নয়, তারা চালাল তাদের নিজস্ব নাগরিকদের ওপর। তাদের দাবী ছিল নাগরিক অধিকার। তিয়েন্-আন্-মেন্-এর সেই বর্বরতা কলংকময় ইতিহাস চীনা কর্তৃপক্ষের এক জঘন্য অধ্যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এক রক্তাক্ত কাহিনী। চাইনিজ্ টর্চার প্রবাদটা আর একবার প্রমাণিত হল।

তারই প্রতিবাদে ইউরোপ বেছে নিল চীন কর্তৃপক্ষের বিরোধীপক্ষ মাননীয় দালাই লামাকে, দেওয়া হল (নোবেল) শান্তি পুরস্কার। চীনা কর্তৃপক্ষ তীব্র প্রতিবাদ জানাল নোবেল পুরস্কার কমিটিকে। কিন্তু ইতিমধ্যেই ডিসিসন নেওয়া হয়ে গেছে তাই একমাত্র হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরা ছাড়া চীনা সাংস্কৃতিক প্রগতিবাদীদের আর কিছু করার ছিল না।

আমার মহাতীর্থের শেষ যাত্রী ভ্রমণ কাহিনীর পর এই ঘটনাগুলো বার বার আমাকে আঘাত দিয়েছে। প্রথম প্রথম অন্য সকলের মতো আমি বয়কট করেছিলাম, ভেবেছিলাম যতদিন এই নৃশংস চীনা সরকার থাকবে ততদিন তিব্বতে যাব না। আবার দালাই লামার প্রতি সহানুভূতির কারণে ভেবেছিলাম, যে চীন সরকার ধার্ম্মিক দালাই লামা ও পাঞ্চেন লামার তিব্বতকে গায়ের জোরে দখল করে নিয়েছে, যে সরকার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অজুহাতে তিব্বতের ঐতিহ্যময় চৈত, বিহার, আশ্রম, মন্দিরগুলোকে কামানের গোলায় ধ্বংস করে দিয়েছে, যারা তিব্বতের সাধারণ মানুষের রক্তে ব্রহ্মপুত্রের পবিত্র নদীকে কলুষিত করেছে, তাদের দেখাও পাপ। এই ধরনের আরও আরও অনেক কারণ, আমাকে বার বার বাধা দিয়েছে। ভেবেছিলাম এই সরকার থাকতে আমি আর তিব্বতে যাবো না।

আমার বহু যুক্তির বাধা সত্ত্বেও আমার ভেতরকার মন বার বার বলছে— "যুক্তি দিয়ে মনকে ঠকিও না, মন যেখানে যেতে চাইছে সেখানে নিয়ে যাও মুক্তির পথে কোন যুক্তি নেই। পথিকের ব্রত পথ চলা, তর্ক বিচারের ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে পড়ে পথভ্রষ্ট হয়ো না।" শুনলাম, বুঝলাম আমাকে টানছে আবার আমাকে যেতে হবে। বুঝলাম তিব্বত বিধাতার সৃষ্টি, পপুলার চীন সরকারের নয়। আমরা সামাজিক জীব, সমাজে বাঁচতে হলে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই চলতে হবে। পথিকের ব্রত পথ চলা, অনাসক্তি ভাব নিয়ে সবকিছুর মধ্য দিয়েই চলতে হবে সেটাই তো অভিজ্ঞতা। তারই জন্য চলা, জঙ্গলে কাঁটা আছে বলে তাকে এড়ানো ঠিক নয়— সমুদ্রে ভয়াবহ ঢেউ আছে বলে সমুদ্র লঙঘন করতে দ্বিধা করি নি।

তিব্বতের চীনা সরকার যতই অবিচার করুক না কেন, তাই বলে সম্পূর্ণ তিব্বতবাসীকে উপেক্ষা করি কি করে। তিব্বতকে বয়কট করলে মহান হিমালয়ের সন্তান সহজ ও সরল এক বিরাট মানবগোষ্ঠীকে বয়কট করা হবে। তাই মনে মনে ঠিক করলাম, মনের কথাই

শুনলাম, যতই বাধা আসুক না কেন আবার যাবো তিব্বতে। তিব্বতের সৌন্দর্য, তার আধ্যাত্মিকতা, তার মানুষ আর জলবায়ুর মধ্যে আবার অবগাহন করতে হবে, যেমন করেছিলাম— কৈলাস প্রদক্ষিণ আর মানস সরোবরে।

একদিকে তিব্বতি সংস্কৃতি উচ্ছেদ পরিকল্পনা আর অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মহলের চাপ। নিষিদ্ধ কথাটার একটা রহস্য আছে। ঘরের দরজা বন্ধ থাক্‌লে ঐ ঘরে যাবার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে ওঠে। বিদেশীরা বার বার ধাক্কা মারতে লাগল চীন সরকারের দরজায়, ভিসা দাও, যাবার অনুমতি দাও। পপুলার চীন সরকার বুঝল যে, দরজা না খুললে দরজা ভেঙে যাবার সম্ভাবনা, আর চীন সরকারও চায় বহির্বিশ্বে বাণিজ্য করতে। ইউরোপ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ভাণ্ডারকে উপেক্ষা করলে দেশেরই ক্ষতি। তাই অতি সাবধানে, অতি সন্তর্পণে ভিসা দিতে শুরু করল। পপুলার চীন সরকার আরও দেখল যে আজ তৃতীয় বিশ্বে এক বিরাট বাণিজ্য ভাণ্ডার নিয়ে তৈরি হয়েছে ভারত। শুধু বাণিজ্য নয়, ভারতবর্ষ আজ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পারমাণবিক শক্তি। ১৯৫৯ সালে ভারতের সৈন্যবাহিনীকে অগ্রাহ্য করেছিল কিন্তু আজ তার রাজনৈতিক ভূমিকা পাল্‌টেছে, ভারত আজ বৃটিশ পরিত্যক্ত দুর্বল জাতি নয়, নতুন ভারত তার বিরাট প্রতিরক্ষা বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত। হিমালয়ের ওপর তাদের সজাগ দৃষ্টি, তিব্বতের মত অবিচার সে আজ বরদাস্ত করবে না। তাই শুরু হল পপুলার চীন সরকারের শান্তি আয়োজন নীতি। খুলে গেল হিমালয়ের একটি দরজা। পবিত্র কৈলাশনাথ আর মানস সরোবরে তীর্থযাত্রীদের আবার প্রবেশ অধিকার দেওয়া হল।

মৌনীবাবার সেই মহাতীর্থের শেষ যাত্রী কথাটাকে আজ নতুন করে সাজিয়ে লিখতে হবে— আসল কথা দালাই লামার লাসা ত্যাগের আগে এবং তদানীন্তন পপুলার চীন সরকারের কালচারাল রেভোল্যুশনের আগে আমরাই ছিলাম— মহাতীর্থের শেষ যাত্রী।

পরিব্রাজককে কিন্তু অতদিন বসে থাকতে হয় নি। কৈলাসনাথের ডাকে ১৯৯০ সালের আগেই দুবার নতুন পথে সে কৈলাস পরিক্রমা করেছে। উদ্দেশ্য ছিল কৈলাস পরিক্রমা আর মানস সরোবরে অবগাহন। পথ ছিল নেপালগঞ্জ থেকে সিমিকোট ছোট প্লেনে। সেখান থেকে নারা পর্যন্ত পায়ে হাঁটা পথ। পাঁচ দিনে সর্বোচ্চ পাস নারা-লা পার হলাম উচ্চতা ৪৬২০ মিঃ। তার পরই প্রথম তিব্বতি গ্রাম শের (উচ্চতা ৩৫৬০ মিটার) কার্নালি নদীর ধার ধরেই রাস্তা। নেপাল থেকে তিব্বতে ট্রেকিং করার এটাই সরকারী রাস্তা। নেপালের হুম্‌লা জেলা বিপজ্জনক পাহাড়ি এলাকা পরিবর্ত্তন চোখে পড়ে না। শের থেকে আজকাল দারচেন পর্যন্ত জীপ, মিনিবাস ও ট্রাক হামেশাই যাতায়াত করে। শের, পুরাং, গুর্লা-লা হয়ে বাঁ দিকে রাক্ষসতাল আর ডানদিকে মানস সরোবর রেখে জীপ সরাসরি যাত্রী নিয়ে আসে দারচেন শহরে। সেখানে ছোট বড় ধরমশালার অভাব নেই। সেখান থেকেই শুরু হয় কৈলাস পরিক্রমা।

নিঃসন্দেহে স্বীকার করতেই হবে যে, পৃথিবীর এই দুর্গম অঞ্চলে রাস্তা ও যানবাহনের অনেক সুবিধা হয়েছে। স্থানীয় যাযাবরদের স্থায়ী আস্তানা হয়েছে, আর বলাই বাহুল্য

চোখে সবচেয়ে বেশী পড়ে সামরিক বাহিনীর জীপ ট্রাক শিবির আর যাতায়াত। তীর্থযাত্রীদের উদ্দেশ্য কৈলাসনাথ দর্শন আর পরিক্রমা। ভাবঘোরে তীর্থযাত্রীরা চেয়ে থাকে দূরের কৈলাস শিখরে। গত দুবার কৈলাসে গিয়ে কি করলাম সে বিষয়ে লিখে আমার এই অধ্যায় ভরাবো না, মহাতীর্থের শেষ যাত্রীতে আমার সব কথা বলা হয়ে গেছে। বেনারস-হরিদ্বারে বা কৈলাসতীর্থে হাজার বছর যাবৎ হিন্দুদের সেই একই পদ্ধতি— বেদান্তের সেই একই পথ, চির পুরাতনই চির নতুন পূজা, পরিক্রমা, প্রার্থনা, ধ্যান আর নীরবতা— সব ধর্ম্মের একই নীতি।

পর পর দুবার কৈলাসখণ্ডে গিয়ে বুঝলাম যে, তীর্থযাত্রীদের জন্য তিব্বতের যে দরজা খোলা হয়েছে তা আসলে ট্রেকার্স ও অ্যাডভেঞ্চারাস যুবক যুবতীদের জন্য। হিমালয়ের এই নিষিদ্ধ দেশে তারা আসে পাহাড়ি রাস্তায় নিজেদের সাহস-বীরত্ব আর মানসিক ও শারীরিক সহনশীলতা যাচাই করতে। কত কম সময়ে কত দূর গেলাম, কত উঁচুতে উঠলাম, কোথায় কোথায় ক্যাম্প করলাম, আর প্রতি মুহূর্তে সময়, তাপ ও উচ্চতার কথায় ডায়ারীর পাতা ভরালাম। সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্ তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে গেল। ভারতের তীর্থযাত্রীরা যায় আল্মোরা হয়ে ভাব্ ভক্তি দিয়ে তারা রাস্তার পরিশ্রমকে স্বাগত জানায় পুণ্যার্জন আর আধ্যাত্মিক মার্গের আশায়। অবশ্য সব দলেই বিশেষ প্রকৃতির লোক থাকেই সব মানুষ তো আর সমান না।

কৈলাসনাথ আর মানস সরোবরে তীর্থের জন্য যেতে হলে দিল্লী থেকে দলবদ্ধ হয়ে ভারত সরকারের মাধ্যমে যেতে হয়। আর পর্যটন করতে হলে চীন ভূ-খণ্ড হয়ে আসতে হয়। তিব্বতের একটিই এয়ারপোর্ট লাসা। এয়ারপোর্টের নাম গাংগার, এয়ারপোর্ট থেকে লাসায় যেতে প্রায় দুঘন্টা লাগে জীপ বা মিনিবাসে। অন্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগ চেংদু ও কাঠমাণ্ডু (Chengdu, Kathmandu)।

১৯৯০ সাল থেকেই বার বার চেষ্টা করছিলাম তিব্বতে স্বাধীনভাবে একা ঘোরার। ভিসার দরখাস্তে সে রকমই লিখেছিলাম। একবার না বললে দুবছরের মধ্যে আর আবেদন করা যাবে না, এরকমই নিয়ম। আমার ধৈর্য আছে, তাই নিরাশ না হয়ে আবার ভিসার জন্য আবেদন করি। দলের সঙ্গে সম্পূর্ণ তিব্বত আর লাসায় ব্যক্তিগতভাবে ঘোরার অসুবিধা নেই এটাই তাদের উত্তর। অবশ্য তাদের অজুহাত অস্বীকার করতে পারি না। ভাষা জানি না কাজেই অসুবিধা তো হবেই।

তারপরে আমি উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু যাওয়া ও তার প্রস্তুতির জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আমার দুই মেরু ভ্রমণকে ভ্রমণ না বলে অভিযানই বল্বো কারণ যাদের সঙ্গে গিয়েছি তারা সবাইই অভিযাত্রী এক্সপ্লোরার আর ভ্রমণসূচীর নাম আন্টার্কটিক্ এক্সপেডিসন। আমাদের ভ্রমণ-অভিযান খুবই সফল হয়েছে আর আনন্দ তো বটেই। একটু বিশ্রাম করে আবার আবেদন জানালাম— ভিসার জন্য, তিব্বতে একা একাই ঘুরতে চাই। এবারে আমার ভিসা ফর্মের সাথে আমি ভূ-পর্যটক ও তার প্রমাণপত্রগুলো গুছিয়ে দিলাম। অদ্ভূত ব্যাপার পরের দিনই ডাক এল, এ্যাম্বেসেডর মিঃ লিং আমাকে

হাসিমুখেই আপ্যায়ন জানালেন আর বুঝিয়ে বললেন— "আপনি চীনা সরকারী ভাষা জানেন না আর তিব্বতি ভাষাও জানেন না কাজেই আপনার ভ্রমণের সুবিধার জন্য একজন তিব্বতি দোভাষী নিন তারপর একমাত্র নিষিদ্ধ এলাকাগুলো ছাড়া যেখানে খুশী যান আমাদের আপত্তি নেই।"

—"অশেষ ধন্যবাদ"। আমি খুশী হলাম। কয়েক সপ্তাহ পরই ২০০০ সাল, মিলেনিয়ামের শ্রেষ্ঠ উপহার।

নির্দিষ্ট দিনে আমি রওনা দিলাম। জেনেভা-দিল্লী-কাঠমাণ্ডু-লাসা। দীর্ঘ চার দশক পর আবার লাসায়। লাসা এয়ারপোর্টের নাম গাংগার। মাটি স্পর্শ করেই কৈলাসনাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালাম। মনে অদ্ভুত একটা শিহরণ জাগল, আনন্দ আর অনুভূতি একই সঙ্গে মন ও দেহকে হাল্কা করে দিল। মনে পড়ে গেল সেই বহু বছর আগেকার কথা। ঘর থেকে পালিয়ে গ্যাংটক থেকে একটা ছেলে একদল সাধুর সাথে এখানে এসেছিল হেঁটে ......।

কাস্টমসের ওখানে একজন 'স্বাগত' জানাল— আপনিই মিঃ দে?

—"হ্যাঁ" —"আমি স্রোংশী দোভাষী ওয়েলকাম টু লাসা"।

লাসায় ঢোকার সাথে সাথে চারিদিকে তাকিয়ে দেখি— এ কি? কোথায় এলাম? আমার সেই স্বপ্নের লাসা কোথায় গেল? আমার শৈশবের সেই স্বপ্নটা হঠাৎ গয়ার সেই সাধুবাবার মাটির হাড়িটার মত সশব্দে ভেঙে পড়ল, হতবাক্ হয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগলাম। গাড়ী হোটোলের দরজায় আসতেই স্রোংশী আমার দরজা খুলে আবার স্বাগত জানাল। রিসেপ্শনের কাগজপত্র সই করে পাশপোর্ট জমা দিলাম। রিসেপ্শনের মেয়েটি ইংরেজিতে বলল—"ওয়েলকাম টু লাসা, আপনার রুম নং একশ আট দোতলায়। আপনি বিশ্রাম করুন চা পৌঁছে দিচ্ছি।"

আমার রুম নং একশ আট বেশ ভাল নম্বর তো ধন্যবাদ, আমার স্যুটকেস নেই সবই পিঠের ব্যাগে। ঘরে ঢুকেই অবাক হলাম— বেশ সাজানো গোছানো পরিষ্কার ডেকোরেশনে ফরাসী ডিজাইন। ব্যাগটা রেখেই জানলা দিয়ে উঁকি মারলাম, বাইরের দৃশ্য সম্পূর্ণ আলাদা, সম্পূর্ণ মডার্ন কাল্চারাল রেভোল্যুশানের নামে লাসায় এসেছে বিরাট পরিবর্ত্তন। আগেই শুনেছিলাম কিন্তু অনুভব করতে পারিনি— এখন স্বচক্ষে দেখছি হারিয়ে গেছে আমার সেই শৈশবের লাসা। হতাশায় ভেঙে পড়লাম এর জন্যই কি আমার লাসায় আসা? ধাক্কা খেলাম, সত্যি কাল্চারাল শক্!

চা এল, রিসেপ্শনিস্টই চা নিয়ে এল সঙ্গে বিস্কুট। বেশ ঠাণ্ডা। আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। তাড়াতাড়ি চা খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম। উত্তেজনাকে আর ধরে রাখতে পারছি না। হোটেল থেকে বেরোতেই স্রোংশী হাত রগড়াতে রগড়াতে এল

—"স্যার আমাদের বস্ আপনার সঙ্গে বসতে চান কোথায় কবে যাবেন, কোথায় থাকবেন, যানবাহন খরচা সব ব্যাপারেই তিনি আপনাকে পরামর্শ দেবেন।"

বুঝলাম এড়ানো যাবে না, আর উচিতও নয়— "ঠিক আছে চল"

ওখান থেকে দূরে নয়। একটা নতুন বাড়ীর একতলায় অনেকটা পুলিস স্টেশনের মত একটা অফিস। ঘরে ঢুকতেই অফিসার বললেন— "বসুন"। তারপর পা দিয়ে ইলেক্‌ট্রিক হিটারটাকে আমার দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন—ইংরেজিতেই— "দেখছেন তো ইলেক্‌ট্রিক এসে গেছে টেলিফোনও কাজ করছে আর ওই দেখুন আমাদের কম্‌পিউটর। এখানে বসেই বেইজিং-শাংহাই-চেংদু, গিলিন, কুনমিং, নানজিং, জিয়ান্ (Beijing, Shanghai, Chengdu, Kunming, Nanjing, Xian) সব জায়গার হোটেল রিজার্ভেশন করতে পারবেন। ভাল ভাল ফাইভ্‌স্টার হোটেল। প্রত্যেকটা হোটেলে রেস্টুরেন্ট, কফি শপ্, পিয়ানো বার, ড্যানসিং, পিসিন, টেনিস কোর্ট, জিম্, চেঞ্জ, গাইড্, প্রাইভেট কার সব পাবেন। আসুন আসুন এই দেখুন সুঝু (Suzou) ফাইভ্ স্টার, কিং ওয়ার্ল্ড, সাউথ্ প্যাসিফিক্, এই দেখুন আর একটা প্রয়োজনীয় জিনিস— এখানে টাইপ করলাম— বেইজিং এখন আট ডিগ্রী, শাংহাইতে দশ ডিগ্রী......" ভদ্রলোক তাঁর নতুন গেজেট দেখাবার জন্য ভীষণ উৎসাহী, আমি তাকে থামাতে বাধ্য হলাম—

—"সরি আমি আজ খুবই ক্লান্ত, কাল সকালে আসবো"

—"ঠিক আছে, ঠিক আছে দেখলেন তো সব খবরাখবর এখানে বসেই পেয়ে যাবেন। আপনি স্রোংশীকে আজকের জন্য পাঁচ ডলার দিয়ে দেবেন।"

—ঠিক আছে বলে আমি তার অফিস ছাড়লাম, উঃ হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলাম।

স্রোংশীকে বললাম—"আমি আজ এই শহরেই একলা একলা ঘুরতে চাই এই নাও পাঁচ ডলার, কাল সকালে হোটেলে দেখা করবে।" বললাম বটে রেহাই পেলাম না,

—"পাঁ-চ ডলারে অনেক কাজ আমি কোন কাজই করিনি, ঠিক আছে আমি আপনার সাথে সাথেই থাকবো, নয়তো বস্ ভাববে আমি ফাঁকি দিচ্ছি"

—"ঠিক আছে, তবে প্রশ্ন না করলে কথা বলবে না।" স্রোংশী রাজি হয়ে গেল।

লাসা শহর, হোটেলের নামও লাসা। পুরনো স্মৃতি সেটাই স্বপ্নের সাথে মিশে মনের মধ্যে একটা রহস্যলোকের সৃষ্টি করেছিল। দুটো রাস্তার ফাঁক দিয়ে দূরে দেখা দিল পোতালা প্রাসাদ, উঁকি মেরে বলল— এই দ্যাখ্ আমি এখনও দাঁড়িয়ে, নতুন লাসার মধ্যে হঠাৎ পেলাম পুরনো গন্ধ। আনন্দে নেচে উঠল মন, স্রোংশীকে বললাম— "পোতালায় চল।" সে হাতে ঘড়ি দেখে বলল— "স্যার, ওখানে রেস্টোরেন্ট নেই, এখানে খেয়ে তারপর চলুন"

—"ঠিক্ আছে, চল ভাল তিব্বতি রেস্টোরেন্টে"

—"তিব্বতি রেস্টোরেন্ট অন্যদিন আজকে চলুন ভাল চাইনিজ রেস্টোরেন্টে, তিব্বতি রেস্টোরেন্টে কোন ভ্যারাইটি পাবেন না স্যার।" তিব্বতে এসে খেতে হবে চাইনিজ রেস্টোরেন্টে। ঠিক্ আছে, মেনে নিলাম। তিব্বত তো এখন চীনদেশ কাজেই উপেক্ষা করি কি করে। কোলকাতা, দিল্লী থেকে শুরু করে জেনেভা-প্যারিস-লণ্ডন-নিউ ইয়র্ক ইত্যাদি সব জায়গায়ই চাইনিজ রেস্টোরেন্টে ভরা। সেখানে তো মন বিদ্রোহ করে নি কাজেই এখানে কেন করবে? রাজি হয়ে গেলাম।

খাওয়ার জন্য বসা নয় আসলে পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যই অর্ডার দিলাম, স্প্রিং রোল-নুড্ল-শপ্‌শুয়ে, স্রোংশী নিল বিয়ার আর রোস্টেড ডাক্।

অদ্ভুত ব্যাপার তিব্বতের এই রাজধানীতে আমার দেখা মানুষগুলো যেন উধাও হয়ে গেছে। রাস্তায় রেড-ইণ্ডিয়ান (আমেরিণ্ডিয়ান)-দের মত হ্যাট্, গায়ে জ্যাকেট লেদার ভারী প্লাস্টিক অথবা উইণ্ড-প্রুফ্, রেস্টোরেন্টের বাইরে একটু দূরে ফুটপাতের ওপর বিলিয়ার্ড টেব্ল খেলা ও দেখার ভিড়। চা এল চাইনিজ্ ব্ল্যাক টি; জিজ্ঞেস করলাম —"চ্যাং নেই?"—উত্তর আমরা রাখি না তবে বললে করে দেবো এই চায়ের সঙ্গে মাখম্ মিশিয়ে দেবো।" বুঝলাম রেস্টোরেন্টের মালিক চাইনিজ। রেস্টোরেন্টে বসে লাভই হল। স্রোংশীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা শুরু হল।

—"তুমি বিলিয়ার্ড খেলতে জানো?"

—"নিশ্চয়ই ভাল খেলি, আপনি খেলবেন?"

—"না, বিলিয়ার্ড সেটের খুব দাম তাই না?" আমার আবার প্রশ্ন।

—"না, খুব সস্তায় পাওয়া যায়। আর যে কোন ক্লাবে বা চায়ের দোকানে বিনা পয়সায় খেলা যায়। ক্লাব, স্কুল বা প্রতিষ্ঠানে আজকাল ভীষণ চালু। পাড়াগাঁয়ের লোকেরা, বুড়ো-বুড়ীরা চক্র ঘোরায় আর ইয়ংরা বিলিয়ার্ড খেলে। একটা কিছু করে তো সময় কাটাতে হবে"— বলেই স্রোংশী হো হো করে হেসে দিল।

—'তুমি ঠিকই বলেছো, মালা জপ করাটাও তাহলে সময় কাটানোর জন্য তাই না?'

—"ঠিক, আপনি ঠিকই বলেছেন, ওগুলো সব পুরনো অভ্যেস, ভালভাবে বাঁচতে হলে আমাদের আধুনিক হতে হবে।"

বুঝলাম ওর কথাগুলো অনেকটা শেখানো বুলি। খাবার এল।

—"আচ্ছা এই রাস্তাটাই তো বারখর তাই না?"

—"হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন, আপনি জানেন? আগে এসেছেন?"

—"ম্যাগাজিনে ও ডকুমেন্টারী ফিল্মে দেখেছি", আমি উত্তর দিলাম।

—"ওঃ তাই বলুন আমরা এই রাস্তাটা ধরে ঘুরবো, তারপর পোতালার দিকে যাবো, এটাই সোজা পথ।"

আমি খুব সাবধানে স্রোংশীর সঙ্গে আলাপ শুরু করলাম, খাওয়ার শেষে বিল হল, আমিই স্রোংশীকে খাওয়ালাম। ডলারে দিলে খুব খুশী, এক আমেরিকান ডলার সমান দশ ইউয়ান। পাঁচ ডলার ভাল খাবার স্রোংশীকে ডবল্ বিয়ার। রেস্টোরেন্ট থেকে বেরিয়ে কিছুদূর এগিয়েই হঠাৎ বুকের ভিতরটা লাফিয়ে উঠল— "পেয়েছি পেয়েছি, আমার হারিয়ে যাওয়া জোখাং মন্দিরকে পেয়েছি।" ভীষণ আনন্দে প্রায় দৌড়ে গেলাম, তীর্থযাত্রীদের মধ্যে গিয়ে জুতো খুলে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লাম জোখাং মন্দিরের দরজায়। কোনো প্রার্থনা নয়, কিছু পাবার জন্য নয়, শুধুই প্রণাম। শরীর, মন ও আত্মাকে লুটিয়ে দিলাম জোখাং-এর দেবতা জর রিম্‌পোচের শ্রীচরণে। প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়ালাম, তারপর তিব্বতি প্রথায় স্বস্থানে দণ্ডি কেটে উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকালাম।

জোখাং মন্দির যেমন ছিল তেমনই আছে— এতটুকু পরিবর্ত্তন হয় নি। চারদিকের নতুন বাড়ীঘরের মধ্যে লুকিয়ে ছিল এই মাত্র। মনের জোর আর আনন্দ ফিরে পেলাম। জোখাং-এর প্রবেশদ্বার পিলার দেয়ালের ডেকোরেশন, অগণ্য প্রার্থনা ও ধর্নার জন্য আগত তীর্থযাত্রী, ধূপের গন্ধ ঘিয়ের প্রদীপ সব মিলিয়ে আমাকে নিয়ে গেল বিগত সেই চার দশকে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমি ফিরে পেলাম আমার অন্তরের সেই মৌনীবাবাকে।

জোখাং-এর চারদিকে পরিক্রমা পথ স্থানীয় ভাষায় বলে বারখর। দোকান বাজারে ভর্ত্তি অধিকাংশই পুরনো জিনিসপত্র বা অ্যান্টিকের দোকান, চক্র-মালা, ঘন্টা করতাল, পুরনো পয়সা আর বহু জানা-অজানা পুরনো সামগ্রীতে ভর্ত্তি। বারখরের কোনো কোনো অংশ সম্পূর্ণ আধুনিক আর মন্দিরের আশে পাশে আগের মতোই পুরনো জোখাং আগের মতোই দাঁড়িয়ে আছে। আমি আনন্দে ভরপুর, তাই শ্রোংশীকে বললাম—

—"আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। কালকে খুব ভোরবেলা ব্রেকফাস্টের আগেই জোখাং-এ আসবো তোমাকে আসতে হবে না, আমি ঠিক চিনে আসতে পারবো। তুমি নটা নাগাদ আসবে তারপরে পোতালা যাবো, আমি এখন আবার জোখাং মন্দিরে যাবো ওখানকার আবহাওয়া খুব ভালো লেগেছে।"

—"বেশ আপনি ধূপকাঠি কিনবেন, আমার চেনাজানা দোকান আছে।"

—"চল ভালই, সস্তায় পাওয়া যাবে তো?" আমেরিকানদের মতো প্রশ্ন করলাম।

শ্রোংশী আমাকে ধূপকাঠির দোকান ধরিয়ে দিয়ে বিদায় নিল। ধূপকাঠি নিয়ে আমি আবার এলাম মন্দিরে। দেয়ালের গায়ে ধূপকাঠি ও ঘিয়ের মোমবাতি জ্বলে জ্বলে কালো আঠা হয়ে গেছে, সেই পুরনো দৃশ্য আমি খুঁজে পেলাম। দালানে চামড়ার আসন পেতে তার ওপর স্থায়ী দন্ডি কাটছে মানে প্রতিবার দাঁড়িয়ে, বসে ও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে বারখর ধরে দন্ডি পরিক্রমা। কেউ সামনে পুরু চামড়ার চাদর ঝুলিয়ে দিয়েছে যাতে হাঁটুতে ব্যথা না লাগে অথবা সিমেন্টের ঠাণ্ডাতে যাতে কষ্ট না পেতে হয়। ভালভাবে দেখতে লাগলাম— নিঃসন্দেহে এরা সবাই তিব্বতি। ইষ্টদেবতার প্রতি তাদের অভাব অভিযোগ প্রার্থনা সব কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আন্তরিক ভাব ও ভক্তি।

পরের দিন খুব ভোরে সাড়ে পাঁচটায় উঠে হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়লাম, ইচ্ছা ভোরের পূজো দেখা। ভীষণ শীত আর কুয়াশায় ঢাকা রাস্তা। কিন্তু দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে, নাটমন্দিরে ঢুকে দেখি সবাই নাক ডাক্‌ছে ভাবলাম ভোরের আরতির পর আবার সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, দু-তিনজনের কাশি হয়েছে, বসে বসে কাশছে, ভাষার অভাবে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। ভোরের আরতি ও পূজো দেখার জন্য আমিই একা ভক্ত প্রায় সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে হোটেলে ফিরলাম।

জ্যাম-বাটার-ব্রেড নিয়ে রিসেপ্‌শনিস্ট ঘরে ঢুকল আটটার সময়

—"গুড মর্নিং স্যার শুনলাম আপনি জগিং করতে বেরিয়েছিলেন, খুব ভোরে

উঠেছেন খুব সাবধান ঠাণ্ডা লাগাবেন না।” জগিং কথাটা শুনে অবাক হলাম। হিমালয়ের এই কোণায়ও আমেরিকান স্টাইল এসে গেছে। জবাবে বললাম—

—“হ্যাঁ বেরিয়েছিলাম, আচ্ছা জোখাং-এ কোন প্রোগ্রাম নেই?”

—“জোখাং সকাল আটটায় খোলে, প্রার্থনা ও পাঠ হয়।”

—“অনেককে দেখলাম শুয়ে আছে”

—“ওরা অনেক দূর থেকে এসেছে, ওদের মানত আছে সব সেরে তারপর ফিরে যাবে। লাসার লোককে রাত্রিবেলা থাকতে দেওয়া হয় না” বুঝলাম পূজোর রীতি পাল্‌টেছে, সরকারী নিয়ম মানতে সবাইই বাধ্য।

স্রোংশী ঠিক সময়েই এল। জোখাং-এ এলাম প্রণাম করতে দন্ডি কাটা ও স্বস্থান প্রণাম আরম্ভ হয়ে গেছে। পুরোহিত ও ভিক্ষুদের নিম্নস্বরে ভারীগলায় পাঠ আরম্ভ হয়েছে। ভেরী, বজ্র আর বাদ্যের শব্দে জোখাং-এর দেবতা জেগে উঠেছেন। সারি সারি হলদে টুপীর মাথা নাড়ানো দেহের দোলানীর মধ্যে রয়েছে হিমালয়ের ছন্দ। সেখানে একঘন্টা বসে পূজো দেখে উঠলাম।

উঠতেই স্রোংশী বলল— “এদের দেখছেন তো সবাই হলদে টুপীর দল আর অন্য মনেস্ট্রিতে দেখবেন লাল টুপী, তিব্বতে এই দুটো সম্প্রদায়ই প্রধান”।

আমি স্রোংশীর কথায় সায় দিয়ে বললাম— “টুপীর রঙ আলাদা হলেও এরা সবাই সেই একই বুদ্ধের শরণাগত। যে যানে করেই যাক না কেন গন্তব্যস্থলে পৌছলেই হল তাই না?”

—“হ্যাঁ আপনি ঠিক কথাই বলেছেন আমার বাবাও এই কথাই বলে” স্রোংশী এই প্রথম বাড়ীর কথা বলল।

বারখরের বাজার এলাকা ছাড়াতেই এবার স্পষ্ট দেখতে পেলাম মহিমান্বিত লাসার চূড়ামণি পোতালা প্রাসাদ। ঠিক যেমন দেখেছিলাম তেমনই আছে। উত্তেজনায় বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করে উঠল। হঠাৎ নজরে পড়ল দুজন মহিলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লম্বা কাঠের পাত্রে হামাল দিস্তের মত চা-এ মাখন মেশাচ্ছে, চুলের পরিপাটী বাহার, রঙিন জামা, ঘেরুয়া গলায় বিরাট পুঁথি পাথরের মালা। চোখাচোখি হতেই জিভ বার করে নমস্কার জানাল। একজন অল্পবয়সী আর একজনের মুখে বয়সের ভাঁজ পড়েছে। আমরা দাঁড়ালাম, আমাদের দাঁড়াতে দেখে ওরা উৎসাহিত হল। পাশের দোকানে গিয়ে বসলাম— চাইলাম চ্যাং। কৈলাসনাথ যাবার পথে আগের ছবিগুলো এখনও জীবন্ত কিন্তু লাসায় পুরনো ছবি খুঁজে বার করতে হয়। পুরনো কায়দায় নোন্‌তা মাখম চা লাসায় এখনও পাওয়া যায় তবে প্রাচীন পরিবেশের অভাব।

আমাদের সামনেই মারপোরি (MARPORI) পাহাড়ের ওপর তেরো তলা দালাই লামাদের রাজপ্রাসাদ। মনটা কেঁদে উঠল ১৯৫৯ থেকে রাজা ছাড়া রাজপ্রাসাদ। ১৯৫৯ সাল থেকে চীনা সৈন্যরা অধিকার করে বসে আছে গেলুক্‌পা (GELUGPA) সম্প্রদায়ের প্রাণকেন্দ্র।

পোতালা প্রাসাদ জাদুঘরের মতো জনসাধারণের জন্য খোলা, তবে টুরিস্টদের সব জায়গায় যাওয়া নিষেধ। বাইরের প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়ে গিয়ে ওপরের আলো অন্ধকারের বারান্দা ঘরগুলোর মধ্য দিয়ে সরাসরি ওপরের ছাতে এনে টুরিস্টদের ছেড়ে দেওয়া হল। অন্ধকারের পরই আলো আর স্যাতসেতে ছম্‌ছমে ঘরগুলোর পরই উন্মুক্ত আকাশ ছাতে এসে আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম আমি ও স্রোংশী এই দুজন মাত্র টুরিস্ট কিন্তু ছাতে এসে দেখি আরও আটজনের একটা দল। মিউজিয়ামের মতোই এখানে আসতে হলে টিকিট কাটতে হয় হোটেল বা ট্রাভেল এজেন্সীরাই সে দায়িত্ব নেয়। পোতালার এই ছাত থেকে সামনেই দেখছি জোখাং মন্দির ও চত্বর, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, আর সম্পূর্ণ লাসা শহরের এক অনবদ্য দৃশ্য।

পোতালা প্রাসাদের দুটো ভাগ, একটা সাদা প্রাসাদ আর একটা লাল প্রাসাদ। সাদা প্রাসাদেই দালাই লামারা একের পর এক পুনর্জন্ম নিয়ে বাস করেছেন, এখান থেকেই তারা সমগ্র তিব্বত শাসন করতেন। সংলগ্ন লাল প্রাসাদ হচ্ছে রাজকীয় বিভিন্ন মন্দির আর দালাই লামাদের মৃত্যুর পর তাদের স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত স্মৃতি সৌধ ও সমাধি বেদী এক বিরাট স্বর্ণভাণ্ডার। গাইডের একটা কথা কানে বাজল— কঠিন শোনাল— "...চতুর্দশ দালাই লামা তেনজিং গীয়াৎসো এই প্রাসাদেই তাঁর শৈশব কাটিয়েছেন। ১৯৫৯ সালে তাঁর পার্শ্বচর মন্ত্রী ও পরামর্শদাতারা তাঁকে নিয়ে ভারতে পালিয়ে যায়।" শুনলাম, এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বের করে দিলাম।

সাদা রাজবাড়ীর ছাত থেকে লাল রাজবাড়ীর ওপরকার সিংহ-ড্রাগনের প্যাগোডাগুলোর সোনালী রঙ চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিচ্ছে। এখানে শুধু অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকা তবে নিঃশব্দে নয়, টুরিস্টদের ক্যামেরার ক্লিক, বাজিং আর ফ্লাশ মনকে স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণ করতে দেয় না। ছাত থেকে নেমে এলাম ঢুকলাম পাশের লাল প্রাসাদে। দেয়ালের অতি সুন্দর সূক্ষ্ম কাজগুলো আলোর অভাবে ভালো করে দেখা যায় না। আর ভেতরকার প্রত্যেকটি মন্দিরের গায়ে মানে দেওয়ালে ও থামে কালো তেলের প্রলেপ। গাইড খুব গর্ব করে বলল— "এত সুন্দর সুন্দর কাজগুলো কাঠকয়লার ধোঁয়া আর তেল ও ঘি-এর প্রদীপ জ্বালিয়ে ওরা নষ্ট করে ফেলেছে। কালচারাল রেভোল্যুশনের পর আমরা সেইসব বুজরুকি বন্ধ করে দিয়ে চীনদেশের এই অমূল্য সম্পদগুলো রক্ষা করেছি। আমরা এখন চেষ্টা করছি দেওয়াল চিত্র ও তাংখাগুলোকে পরিষ্কার করে প্লাস্টিক প্রুফ করার। তাতে বহু বছর রাখা যাবে।"

প্রায় দেড়ঘন্টা ধরে পোতালার রহস্যময় ঘরগুলো ঘুরে বাইরে এলাম। কেন জানিনা এত সুন্দর সাজানো রাজপ্রাসাদ কিন্তু ভেতরে ঢুকলেই মনে হচ্ছে হানাবাড়ী, চারদিক থেকে বিদেহী আত্মারা এসে আমার চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে মনে হচ্ছে তারা বলছে মুক্তি দে ... মুক্তি দে ... মুক্তি দে ...। মনে হয় আমি খুব সেন্সিব্‌ল্ অথবা ভাবপ্রবণ— যাই হোক কিছু একটা হবে। এই পথেই আবার সিঁড়ি আর রাস্তা ধরে চলে এলাম জোখাং-এর দিকে। হঠাৎ মনে পড়ল জোখাং মন্দিরে ঢুকেই ডানদিকে ছিল এক অষ্টধাতুর

মহাকালের মূর্ত্তি তার পাশেই ছিল আর একটি নারীমূর্ত্তি সম্ভবতঃ মহাকালী। তিব্বতে বা নেপালে মন্দিরে যে কোন ভক্ত ঢুকতে পারে, চরণস্পর্শ করতে পারে, ভারতের মতো পূজারী পাণ্ডার বাণিজ্য বেড়া নেই, অত্যধিক শীতের দেশ তাই চান করতে হয় না, জুতো না খুললেও চলে। অনায়াসে ভেতরে এলাম ধূপ ও চালের পাশেই দেখলাম সেই পুরনো, প্রায় অবহেলিত মহাকালের মূর্ত্তি— প্রশ্ন এল মহাকালী কোথায় লুকোলেন? সারাদিন জোখাং-এ বারান্দায় বসে বার বার দর্শন করতে লাগলাম জয় শাক্যমুনী লাখাং, জয়ো শাক্যমুনী, জয়ো রিমপোচে, একই মূর্ত্তি বহু নাম। ধূপের গন্ধ নীচু ভারী গলায় প্রার্থনা আর অদৃশ্য ও সুক্ষ্ম একটা ভাব লহরী আমাকে আনন্দলোকে নিয়ে এল।

বলাই বাহুল্য স্রোংশী একটু বেকায়দায় পড়েছে। তিব্বতের ওপর বা লাসার ওপর আমার ইন্টারেস্ট কম দেখে ভাবছে খদ্দেরটা হারাবে। উপযাচক হয়ে জিজ্ঞেস করল— "আজকে চলুন তিব্বতি রেস্টোরেন্টে খাবেন?"

—"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।" আমি হেসে জবাব দিলাম, তারপর খুব আন্তরিকতার সুরে বললাম— "স্রোংশী তোমাকে কয়েকটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করবো তুমি ইচ্ছে হলে উত্তর দেবে আর যদি না দাও তাহলেও চলবে আমি কিছু মনে করবো না।" একটু দ্বিধা করে ছেলেটি উত্তর দিল

—"ঠিক আছে বলুন"

—"তুমি কি তিব্বতি মানে লাসার লোক?"

—"হ্যাঁ, আমরা সবাই তিব্বতি। আমরা কী চু নদীর ধারে উচু গ্রামের লোক, এখান থেকে প্রায় এক ঘন্টা লাগে মানে জীপে।"

—"তাহলে তোমাকে খুলেই বলি। আমি তিব্বতে এসেছি তিব্বত দেখবার জন্য, এখানকার মানুষদের সঙ্গে মেশার জন্য। আমি শাংহাই, বেইজিং, হংকং, জিয়াং, চেংদু গেছি, চীনদেশ ঘুরেছি— কিন্তু এখানে এসেছি তিব্বত দেখার জন্য। তুমি আমাকে যতটা সম্ভব তিব্বতের অরিজিনালিটী দেখাও এটা আমার অনুরোধ। অবশ্য যদি সম্ভব হয়।"

আমার কথা শুনে স্রোংশী বেশ কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর বলল—

—"আমাকে একটু সময় দিন আমি আধঘন্টার মধ্যেই আসছি, আপনি ওই ওপাশের দোকানটা দেখছেন যেখানে বাইরে গ্যাসের আগুনে রান্না হচ্ছে ওখানে খেতে চলে যান আমি ওদের বলে রেখেছি। ভাত-ভাজা শুকনো মাছ সব্জি সব পাবেন খাবার আগে ও পরে চা"

—"ঠিক আছে।" আমি রাজি, হোটেলটার মালিক তিব্বতি গ্যারান্টি।

আধঘন্টা নয় প্রায় এক ঘন্টা পর স্রোংশী (SRONGSHEE) এল সঙ্গে একজন বয়স্ক লোক। স্রোংশী পরিচয় করিয়ে দিল—শুরু হল ওর কথা :— "আমার বাবা, আমার বাবা খুব মাই ডিয়ার। আমরা গাইড্ আমাদের চলতে হয় বসের পরামর্শে, আমি সরকারি গাইড্ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো না, তবে আমার বাবা পারবে। আমরা

টুরিস্টদের লাসায় যেখানে খুশী নিয়ে যেতে পারি, এমনকি আমাদের বাড়ীতেও চা-এর জন্য ডাকতে পারি। তবে দালাই লামার লোক বা সাংবাদিক হলে আমাদের সাথে স্পেশাল অফিসার থাকে। বুঝতেই পারছেন আমরা মানুষ, আমাদের খেতে হবে, বাঁচতে হবে, আমাদের বাচ্চাদের একটা ভবিষ্যৎ আছে। সরকারের সঙ্গে সহযোগীতা না করলে আমাদেরই ক্ষতি। দালাই লামা চলে যাওয়ার পর থেকে আমরা শুধু আশায় আশায় পথ চেয়ে বসে আছি, স্বাধীন তিব্বতের স্বপ্ন দেখছি, দীর্ঘ পয়তাল্লিশ বছর হয়ে গেল— আমরা শুনছি দালাই লামা প্যারিস যাচ্ছেন, লণ্ডন যাচ্ছেন, নিউ ইয়র্ক যাচ্ছেন সবাই তাঁকে সহযোগীতা করছে স্বাধীন তিব্বতের জন্য তারা চীনা সরকারকে চাপ দিচ্ছে। লাসায় আবার ফিরে আসবেন দালাই লামা, পোতালার চারদিক ঢেকে যাবে স্বাধীন-তিব্বত পতাকায়। জানেন আমার বয়স এখন তিরিশ, আর কতোদিন বসে থাকবো। আমার বাবা-মা সেকালের মানুষ, তাদের ধৈর্য আছে, কিন্তু আমাদের নেই। আমাদের মধ্যে যারা দালাই লামার কথা বলছে তাদের হুশিয়ার করে দেওয়া হচ্ছে, যারা দেশের লীডার হতে চাইছে তারা রাতারাতি ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে, একটু বাড়াবাড়ি করলে সম্পূর্ণ উধাও হয়ে যাচ্ছে।

আপনি কি জানেন এই লাসায় আমাদের সংখ্যা অর্দ্ধেকেরও কম। বেশীর ভাগই পপুলার। ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য দলে দলে চীনের লোকেরা লাসায় এসে ঘাটী বসাচ্ছে চীনের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের অজুহাতে, চীনাদের আনা হচ্ছে। আমাদের কিন্তু অত সুযোগ দিচ্ছে না, বিভিন্ন অজুহাতে এড়িয়ে যায়।

স্যার, বিশ্বাস করুন আমরাও মানুষ, আমরাও চাই বাঁচতে। আমরা মাটি কামড়ে পড়ে আছি— আমরা তিব্বতি এটা আমাদের দেশ মরতে হলে এখানেই মরবো। রিফিউজি হয়ে আমরা বাঁচতে চাই না। বাঁচবার একমাত্র উপায় লেখাপড়া শিখে বড় হওয়া অন্ততঃ সে সুযোগটা এরা দিচ্ছে— দেখা যাক্ ভবিষ্যতে কি হয়।"

স্রোংশী থামল— খাবার এল হাল্কা খিচুড়ি মত আলু কপি ভাজা, ডাল আলু টমেটোর তরকারী। তিনজনের খাবার চোখের সামনেই রেঁধে দিল আলাদা বাটীতে এল শুয়োরের কষা মাংস। বাবা ইংরেজী জানে না, ছেলে দোভাষীর কাজ করছে। স্রোংশীকে বললাম— তোমাদের আমিই খাওয়াচ্ছি, লজ্জা করো না, যা খাবার খাও। আশ্বাস পাবার সাথে সাথেই স্রোংশী অর্ডার দিল "একটা বিয়ার"। বাবার নাম জানা নেই, খেতে খেতেই মুখ খুলল—

"জানেন শী কাল রাতে যখন আপনার কথা বলল আমার যে কি আনন্দ হয়েছে আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না। ভারতবর্ষ আছে বলেই তিব্বতের ধর্ম্ম টিকে আছে। আমাদের এখানে দিনের পর দিন ধর্ম্ম ভাষা লোপ পাচ্ছে। আর ভারতে তিব্বতি ভাষা ও ধর্ম্ম ভীষণ জাগ্রত ও উন্নত। মাননীয় দালাই লামা তো বটেই তিব্বতের জ্ঞানীগুণীরা সবাই এখন ভারতে। আপনি যা জানতে চান আমি সব জানাবো। জানেন আমার ওপরের চার দাদা ভারতে আছে, ছোটভাই কাঠমাণ্ডুতে থাকে। আমি কাঠমাণ্ডু তিনবার

গেছি।" বাবার কথার ফাঁকেই স্রোংশী একটা জরুরী কথা বলল,— "হ্যাঁ, আর একটা কথা বলে রাখি। আমার বস্ বা কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবেন আপনি তিব্বতি ভাষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করতে এসেছেন। খুব সাবধান ধর্ম্ম, সমাজ ও দালাই লামার প্রসঙ্গ সরকার পছন্দ করে না।"

স্রোংশীর ডাক নাম শী তবে ও চায় না যে আমি ওকে 'শী' বলে ডাকি, ওর সঙ্গে আমার অফিসিয়াল সম্পর্ক।

শুরু হল লাসার আর এক কাহিনী— বহুবার শুনেছি কিন্তু এখন চাক্ষুষ দেখছি, রেস্টোরেন্টে টুরিস্টদের খাওয়ার অসুবিধা নেই, বিশেষ করে তিব্বতি হোটেলে যখন খুশী ঢুকে খাবার চাইলেই ওরা হাসিমুখে করে দেয়। আজকাল মাংসটা খুব পাওয়া যায়। চীনারা শুয়োরের মাংস খুব পছন্দ করে, সব্জি এই সময় চীন থেকেই আসে। আমরা খাওয়া দাওয়া সেরে উঠে পড়লাম।

বাবা খাওয়াবার জন্য অনেক ধন্যবাদ দিল আর দূরের দোকানগুলোর দিকে তাকিয়ে শী-কে বলল—"এই ভাল মানুষটাকে লোবশাং তাশির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিবি।" —বাবা বিদায় নিল।

মহাতীর্থের শেষ যাত্রীর সেই মৌনীবালক বহু বছর পর আজ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তার স্বপ্নের লাসাকে। আজ আর ঘুরবো না। এখন বিকেল, সকাল থেকে যা দেখেছি তাকে মনে গেঁথে রাখতে হবে, আস্তে আস্তে দেখা ভাল, সেদিনকার মত হোটেলে ফিরলাম। ঘরে হিটিং-এর ভাল বন্দোবস্ত, বিছানা-গদি-চেয়ার-টেবিল আর বাথরুমটাও ভাল গরমজলের জন্য রয়েছে গীজার আর কলিং বেল টেপার সাথে সাথে ওয়েটার— ভারতের যে কোন স্ট্যাণ্ডার্ড হোটেলের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

আমি জানলার ধারে সোফার ওপর বসে বাইরের দিকে তাকালাম— মনে মনে ভাবলাম এখানে কি অবস্থায় এসেছিলাম আর এখন কি অবস্থায় আছি। আগে যখন এসেছিলাম দেহটা ছিল তুচ্ছ, রহস্যঘেরা এক অধ্যাত্মজগতে বিচরণ করছিল মন ও আত্মা। আর আজ এই হোটেলের বাইরের ভয়ানক ঠাণ্ডা থেকে বাঁচানো হয়েছে দেহটাকে, সব রকমের আরাম দিয়ে ঘেরাও করা হয়েছে এই শরীরকে কিন্তু মনটা যা চাইছিল, সেই রহস্যাবৃত লাসাকে— তাকে এখনও খুঁজে পাই নি।

পরদিন স্রোংশী আসার সাথে সাথে বেরিয়ে পড়লাম— বারখর দিয়ে আবার পৌঁছলাম জোখাং মন্দিরে। পূজো-পাঠ আরম্ভ হয়ে গেছে, আজ আমার ভাগ্য ভাল মন্দিরে পৌঁছবার সাথে সাথে একজন পুরোহিত আমাকে কাছে ডেকে বসতে বললেন—"এখানে গরম, পাশে কড়াইতে কাঠকয়লার আগুন এখানে বসেই তুমি ধ্যান কর", তার কথামত বসলাম আমার পাশে স্রোংশীও বসল। নীচু গম্ভীর গলায় পুঁথি পাঠ আর মাঝে মাঝে ঘন্টা ও ড্রামের আওয়াজে নিজেকে হারিয়ে দিলাম।

ঘন্টাখানেক পর পুরোহিতের অনুমতি নিয়ে উঠলাম, বাইরে এসে ধূপকাঠি ও মাখমের মোমবাতি কিনে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করলাম।

ইতিমধ্যে জোখাং-এর চারপাশে দোকানগুলো খুলে মেলার আবহাওয়া তৈরি করেছে। মালা-পাথর-ঘন্টা, বজ্র-চক্র পোষাক আর নতুন ও পুরনো দ্রব্যের এক বিরাট বাজার। সবচেয়ে বেশী হচ্ছে পুরনো পয়সা ও লামাদের ব্যবহৃত অনেক আসবাব পত্র। আমরা জোখাং মন্দিরের সামনে উত্তর দিকের ফুটপাথে এসে একটা সুন্দর বুটিকে (দোকান) ঢুকলাম। পরিচিত হলাম লোবশাং তাশির সাথে (Lobsang Tashi)। তিনি খুব আগ্রহ সহকারে দোকানের সব জিনিস দেখালেন, তাংখা-মালা, ব্যাগ, পোষাক বিশেষ করে টুপী-জুতো লামাদের বিশেষ ধরনের পোষাক।

আমি জিজ্ঞেস করলাম— "আমি তো লামা নই, কাজেই এই পোষাক আমার চলবে?" উত্তরে তাশিজী হেসে বললেন—

—"এগুলো সব তিব্বতি পোষাক, লামারাও পরে আর সাধারণ তিব্বতিরাও পরে। ট্যুরিস্টরা আজকাল অনেক কিনছে। বিদেশেও যায়।"

—"বিদেশেও যায়?" আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,

—"হ্যাঁ নিশ্চয়ই, চীনা সরকারের সাথে ইউরোপের অনেক ব্যবসাদার বাণিজ্য করে তারাই সব ব্যবস্থা করে। হবেই না বা কেন, আমাদের সব মাল হাতে তৈরি তিব্বতেই তৈরি, আমাদের দোকানের ইতিহাস শুনবেন?"

—"নিশ্চয়ই বলুন"— আমি আগ্রহ প্রকাশ করলাম, ভদ্রলোক পাশের চা-এর দোকানে তিনটে ভাল চায়ের অর্ডার দিয়ে আমাদের টুলে বসিয়ে দোকানের ইতিহাস বলতে শুরু করলেন।

—"আমাদের সবশুদ্ধ পাঁচটা দোকান। দোকানে সব জিনিসপত্র হান্ড্রেড পার্সেন্ট তৈরি হয় আমাদের মনেস্ট্রীতে। লামারাই সব তৈরি করে। আগের যুগে তারা ধ্যান ও প্রার্থনা করেই দিন কাটাতো কিন্তু সময় পাল্‌টেছে, আগে দালাই লামা ছিলেন, পাঞ্চেন লামা ছিলেন, তাঁরাই ছিলেন তিব্বতের শাসক ও সরকার। মনেস্ট্রীগুলোর খরচা তাঁরা সরকারি আয় থেকেই চালাতেন। পপুলার সরকার কোন কোন মনেস্ট্রীর রিপেয়ারিং খরচা দেয় কিন্তু খাবার আসে ভক্তদের কাছ থেকেই। কোন রকমে দিন কাটাচ্ছি, এভাবে কতদিন চলবে কে জানে। মাননীয় দালাই লামা এখন ভারতে আছেন, বেঁচে গেছেন আর মাননীয় পাঞ্চেন লামা বারো বছর চীনা কারাগারে থাকার পর দেহত্যাগ করেছেন।"

লোবশাং তাশিজীর কথাগুলো শুনে আশ্চর্য হলাম— এই চীন শাসিত রেস্ট্রিক্‌টেড লাসায় বসে তিনি জোর গলায় কথাগুলো বলছেন কি করে, আমি উৎকণ্ঠা দমন করতে পারলাম না, জিজ্ঞেস করলাম

—"আমি ট্যুরিস্ট, আমাকে এই সব কথাগুলো বলার জন্য আপনাকে বিপদে পড়তে হবে না তো?" স্রোংশী আমার কথাগুলো মনে হয় ভালভাবেই তর্জমা করেছে

—তিনি হো-হো করে হেসে বললেন—"শী আমার কথা বলে নি বোধহয়, আমি পাঞ্চেন লামার শিষ্য আমার নাম লোবসাং তাশি, আমি লামা, আমি দীর্ঘ কুড়ি বছর জেলে ছিলাম, ছাড়া পেয়েছি ১৯৭৯ সালে। মহামান্য পাঞ্চেন লামার দেহত্যাগের পর

চীনা সরকার ক্ষতিপূরণ হিসেবে, পাঞ্চেন লামার মূল মনেস্ট্রী তাশি লুমপোর লামাদের ভরণ পোষণ বাবদ একটা থোক টাকা ধরে দেয়। আমি কমিটিতে আছি ওই টাকা দিয়েই আমরা পাঁচটা বুটিক খুলেছি, বারখরে এই দোকানগুলো থেকে যা আয় হয় তার থেকেই আমরা মনেস্ট্রীর সব খরচা চালাই।"

—"আপনি কমিটির কথা বললেন, কমিটির ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবেন?"

চা এল মানে খাঁটি তিব্বতি চ্যাং নোন্‌তা মাখম দেওয়া স্বাদের জন্য নয় আসলে চা-টা খেলেই মনে হয় তিব্বতি গন্ধ শরীরে ঢুকল। পুরনো বাঁশের চোঙায়, এক একটা চোঙায় তিন চার কাপ তো বটেই। চা খেতে খেতেই তাশিজী আবার আরম্ভ করলেন—

—"কমিটি মানে আমরা আগে যারা বিভিন্ন মনেস্ট্রী মানে মঠ ও আশ্রমের পরিচালক মণ্ডলীতে ছিলাম, তাদের মধ্যে অনেককেই ভাল ব্যবহার ও ভাল চরিত্রের জন্য সরকার মুক্তি দিয়েছে। তাদের নিয়েই জন সরকার একটা নতুন মঠ পরিচালক মণ্ডলী তৈরি করেছে। আমাদের মধ্যে সরকারী প্রতিনিধি তো আছেই, আসলে তারাই সর্বেসর্বা, আমরা নিমিত্ত মাত্র। তবে আমাদের বিদ্যা আছে, শিক্ষা আছে, অভিজ্ঞতা আছে, সরকার আমাদের কথা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতে পারে না। আমরা যারা লামা সন্ন্যাসী, তারা সবাই বিনা মায়নায় কাজ করি, আমাদের খাওয়া দাওয়া পোষাক আর যাতায়াতের গাড়ীভাড়া ওই সরকারি ভাতার থেকেই আসে। আমি এই বুটিক (দোকান) গুলো দেখাশুনো করি, অন্যান্য অনেকে ভাষা শিক্ষা দেয়, পূজো উৎসবের জন্য অনেকে দায়িত্ব নিয়েছে, মঠের শিক্ষা ও ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্যও আমাদের মতো প্রবীণদের ডাকা হয়।"

—"তার মানে বুঝতেই হবে যে আগের মতোই সব কিছু চলছে তাই না?"

—"তিব্বতের দু'জন মহাজ্ঞানী গুরু, একজন পাঞ্চেন লামা, আর একজন দালাই লামা, একজন দেহত্যাগ করেছেন আর একজন ভারতে উদ্বাস্তু হয়ে আছেন, তিব্বত আজ গুরুহীন, কাজেই আগের মতো চলছে বলি কি করে, আমি এর বেশি কিছু বলতে পারবো না, বাকিটা নিজের চোখেই দেখুন।"

অজস্র অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে কিছু মালা-তাংখা ও সুভনির কিনে দোকান ছাড়লাম। তাশিজী আমার নামে একটা স্ট্যাম্প করে উপহার দিলেন।

লোবসাং তাশির কথাই মেনে নিলাম, শুরু করলাম নিজের চোখে দেখতে। বিচার নয় অনুযোগ নয় শুধু দেখা। হোটেলের অনতিদূরেই নতুন একটা ক্লিনিক হয়েছে। স্রোংশীর ইচ্ছা ওখানে যাই ওর মামা ওই হাসপাতালে কাজ করে। আর স্বাস্থ্য ও শিক্ষার দিকে যদি ট্যুরিস্টরা ইন্টারেস্টেড হয় তাহলে এই নতুন হাসপাতালটা পরিদর্শন করবার অনুমতি দেওয়া আছে। পরের দিন আগের মতোই আমরা এলাম জোখাং-এ পূজো দিতে। পূজারী যথারীতি আসনে বসতে বলল। দুঃখের বিষয় আমি তিব্বতি ভাষা জানি না, জানা থাকলে তাদের সাথে প্রার্থনায় যোগ দেওয়া যেত। প্রার্থনা শেষে আমরা আর একবার চা পান করলাম তারপর এলাম লাসার নতুন এলাকায়, মানে নতুন লাসায়। সত্যি নতুন। ঘর বাড়ী দোকান পশরা আর মাইক ও রেডিওর আওয়াজে রাস্তা জমজমাট। নতুন

লাসার সাথে পুরনো লাসার বিরাট তফাৎ। লাসায় চলতে চলতে মনে হচ্ছে তিব্বতের বাইরে কোন চায়না টাউনে এসে পড়েছি। পোষাক পরিচ্ছদে মডার্ন আর রাস্তাঘাটে চীনাদের সংখ্যা তিব্বতিদের থেকে অনেক বেশী বলে মনে হচ্ছে। শহরটা এলোমেলো ভাবে গড়ে উঠেছে। আমরা হাসপাতালে এলাম, আউটডোরের ভীড়ের মধ্য দিয়ে ভেতরের একটা অফিসে এসে ঢুকলাম

—মেডিকেল অফিসার আমাকে স্বাগতম্ জানালেন, ভদ্রলোক ইংরেজী জানেন সরাসরি কথা হল। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন

—"আজ ভীষণ কাজের চাপ, আপনার সঙ্গে থাকতে পারছি না, শুনেছি আপনি ভারতীয় বাইরে থাকেন, আমাদের সম্পর্কে অনেক শুনেছেন অধিকাংশই সাংবাদিকদের বাড়িয়ে লেখা সবই নেগেটিভ্। আমরা অনেক ভাল কাজও করেছি আরও করছি সেগুলোও আপনাদের জানা দরকার। ট্যুরিস্টরা মানে বিদেশী সাংবাদিকরা আমাদের ভাষা জানে না তাই বেসরকারী লোকদের থেকে আজে বাজে কথা টুকে খবর তৈরী করে ছাপায়। আমার আজকে সময় কম নয়তো আপনাকে সব ঘুরিয়ে দেখাতাম, সংক্ষেপে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি— আমাদের সরকার ভীষণভাবে উঠে পড়ে লেগেছে এদেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য। প্রত্যেকটা মহকুমা ও জেলায় নতুন নতুন স্কুল ও হাসপাতাল তৈরী হয়েছে— কিন্তু স্কুলে কেউ আসতে চায় না। চীন একটা বিরাট দেশ, জাতীয় ঐক্য আর যোগাযোগের জন্য চাই দেশীয় ভাষা। এরা চীনা ভাষা একদম শিখতে চায় না। শিক্ষিত না হলে তারা সরকারী চাকরী পাবে কি করে। আমরা জাতীয় সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রামবাসীদের আকুপাংচার শেখাবার জন্য 'বেয়ার ফুট ডক্টর' প্রোগ্রাম চালু করি কিন্তু কেউ আসে না। আমরা কি করবো বলুন। আমরা লাসাকে নতুন করে সাজাতে চাই। চীনের অন্যান্য প্রদেশের মতো অটোনোমাস তিব্বত ব্যবসা-বাণিজ্য করুক বড় হোক, সেটাই তো সরকারের কাম্য। দেশের লোক শিক্ষিত হয়ে সরকারী পদ গ্রহণ করুক সেটাই তো আমরা চাই। আর একটা কথা কি জানেন? আপনি লোবসাং তাশির দোকানগুলো দেখেছেন? ওই লামা ভদ্রলোক চোটসোক কমিটিতে আছে। চোটসোক সরকারের ধর্ম্মীয় সংস্থা। তিব্বতের যত মঠ-মন্দির-আশ্রম-পাঠকেন্দ্র আছে সেগুলো পরিচালনা করে এই কমিটি। কোন সংস্থার জন্য কত টাকা ব্যয় করা হবে বা বরাদ্দ করা হবে তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী এই কমিটি। বিদেশী লোকেরা বলে আমরা কম্যুনিস্ট পার্টী, তাই ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করছি। আসলে তা নয়, এই কমিটির মারফতেই আমরা তিব্বতের ঐতিহ্য বজায় রাখছি। আমি আপনাকে তিব্বতের উন্নতির বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা বিশদ্ জানাতে পারি কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ আমি খুবই ব্যস্ত তাই আর সময় দিতে পারছি না, আপনি আমাদের থার্ড অফিসারের সঙ্গে কথা বলুন সে আপনাকে হাসপাতাল ঘুরিয়ে দেখাবে।"

অফিসার আমাদের বিদায় জানালেন। আমি শুধু শুনে গেলাম, থার্ড অফিসারই স্রোংশীর মামা, দেখেই বুঝলাম তিনি তিব্বতি। এখানে মিঃ অমুক বা নামধরে সম্বোধনের

ধরণটা নেই সবই অফিসের পদ অনুযায়ী। হাসপাতালে ঢুকে অফিসারের তিব্বতের ওপর ব্রিফিং আশা করিনি। স্রোংশী বলল— এটাই সরকারী নীতি কে কোথায় বসে কি কাজ করছে বলা মুশ্‌কিল।

থার্ড অফিসারকে অর্থাৎ মামাকে বেশ ভাল লাগল, তিনি সহাস্যে বললেন—"আপনি প্রশ্ন করুন আমি উত্তর দেবো।"

প্র : শুনলাম তিব্বতে যত মঠ ও বিহার রয়েছে তার পরিচালনায় রয়েছে লোবসাং তাশির মত প্রবীন লামারা

উ : হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন তবে এসব লামাদের কোন ক্ষমতা নেই, আজকাল মঠগুলো রিপেয়ার করা হচ্ছে— ওগুলোই তিব্বতের প্রধান অ্যাট্রাক্‌সন।

প্র : উনি বললেন— অনেক প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী স্কুল খোলা সত্ত্বেও ছাত্রছাত্রী পাওয়া যাচ্ছে না— কথাটা কি ঠিক?

উ : ঠিক্— আসে না তার মূল কারণ হচ্ছে ভাষা। চীনা ভাষা কম্‌পাল্‌সারী, তিব্বতিরা ভাবে চীনা ভাষায় লেখাপড়া শিখলে ছেলেমেয়েরা তিব্বতের ঐতিহ্য হারাবে আর চলে যাবে চীন দেশে।

প্র : গ্রামের হাসপাতালগুলো ফাঁকা কেন?

উ : সাধারণ অসুখের জন্য লোকে হাসপাতালে আসে না, রোগ যখন কঠিন আকার হয় তখন তারা আসে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আকুপাংচারের বেয়ার ফুট ডাক্তাররা কঠিন রোগ সারাতে পারে না, কারণ তাদের শিক্ষা মাত্র বেজিং-এ তিনমাসের। আমিও বেজিং-এ ছিলাম, আমি সাতবছর অ্যানাটমী, ফিজিওলজি শিখে তারপর আকুপাংচার শিখেছি। আর একটা কথা কি জানেন, তিব্বতিরা চীনাদের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে।

প্র : কেন বিশ্বাস হারিয়েছে?

উ : দুটো কারণ— এক নম্বর হচ্ছে ১৯৫৯ সালে শিক্ষা ও সংস্কৃতির নামে এরা তিব্বতের অনেক সর্বনাশ করেছে, আর দ্বিতীয় কারণ ১৯৮৭ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত তিব্বতের স্বাধীনতা সংগ্রমীদের ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার করেছিল তা লোকে এখনও ভুলতে পারে নি।

ভদ্রলোক অনায়াসে কথাগুলো বললেন—সরাসরি তার অফিসারের কথার বিপরীত আমি অবাক হলাম— নিজের কৌতুহলকে দমন করতে না পেরে বললাম—

—"আচ্ছা আপনি যে এ ধরনের কথা বলছেন তাতে কোনো বিপদের ঝুঁকি নেই তো?"

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক একটু হাসলেন তারপর বললেন— বিপদের ঝুঁকি পদে পদে কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা বলি— অবশ্য ট্যুরিস্ট বুঝে। ১৯৫৯(1959) সাল থেকে শুরু হয়েছে চীনা কালচারাল রেভোল্যুশনের নামে তিব্বতি ধর্ম্ম ও ঐতিহ্য ধ্বংস লীলা। সেই সময়েই পুরনো ধর্ম্মনেতাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে ওরা চীনা নীতি জোর করে চাপিয়েছে। হাজার হাজার তিব্বতিরা চলে গেছে নেপালে ও ভারতে। প্রাচীন

জ্ঞানীগুণীদের আজকাল আর তিব্বতে পাবেন না। তাঁরা সবাই তিব্বতের বাইরে। ১৯৮৭ সালের অক্টোবরে শুরু হল নতুন জেনারেশনের বিক্ষোভ, স্বাধীন তিব্বত ও চীনা মুক্ত লাসা আন্দোলনে নিহত হল স্বাধীনতাকামী যুবক যুবতীরা। আর যারা মিছিলে যোগদান করেছিল তাদের দেওয়া হল হাজত বাস। এই অত্যাচার চলল ১৯৮৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত। আজ সমগ্র তিব্বত ও লাসায় নবীন নেতা আর কেউ নেই। যারা বাকি ছিল তাদের চাকরী ও উন্নত ধরনের জীবনযাপনের জন্য তিব্বতের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হ'ল। রাজধানী লাসা ও তিব্বতের আর্থিক উন্নতির অজুহাতে বাইরের থেকে চীনাদের আনা হয়েছে এবং আনা হচ্ছে। লাসায় আজ প্রায় সত্তর ভাগই চীনা। জোখাং-এর চত্বরে আর পোতালা প্রাসাদ পরিক্রমা পথে আপনি তিব্বতিদের পাবেন কিন্তু তারা সবাই লাসার বাইরের লোক, তারা এসেছে বিভিন্ন পার্বত্যাঞ্চল থেকে। নতুন লাসা এখন ভরে উঠেছে সিচুয়ান (Sichuan), কিংঘাই (Kinghai), ইউনান্ (Yunnan) ইত্যাদি অঞ্চল থেকে আগত চীনাদের দ্বারা। আর যারা চালাচ্ছে সামরিক বাহিনী থেকে আরম্ভ করে, এই হাসপাতালের পরিচালক পর্যন্ত তারা প্রায় সবাইই এসেছে রাজধানী বেইজিং থেকে। তারা ভালভাবেই জানে আজ আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে ট্যুরিস্টদের আমরা কি বলি না বলি তাতে সরকারের এতটুকু ক্ষতি হবে না। বরঞ্চ তারা বাইরের জগৎকে বলে বেড়াচ্ছে— এই দেখো এরা স্বাধীন, চীনা অধিকৃত স্বাধীন তিব্বত। ট্যুরিস্টরা যেখানে খুশী যেতে পারছে ফটো তুলছে তিব্বতিরা ভালই আছে। নতুন জেনারেশন চীন সরকারকে মেনে নিয়েছে। তবে হ্যাঁ, যাই বলি না কেন, সরকারের কানে সব যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা দালাই লামার সংস্থা, জনসভা, উস্কানী অথবা বেইজিং সরকারের প্রকাশ্য বিরোধিতা না করছি ততক্ষণ পর্যন্ত তিব্বতিদের ওপর সরকার কিছু করবে না।

হ্যাঁ, আপনাকে মনের কথা কিছু বলে ফেললাম, কারণ আপনি ভারতীয়, গান্ধীর দেশের লোক। আর অতীতে স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ থেকে শুরু করে নারূপা, মার্পা, মিলারেপা, পদ্মসম্ভবা পর্যন্ত সবাই মহান্ ভারতের দর্শন ও জ্ঞানে আলোকিত আপনাকে দেখাই তো একটা পুণ্যের ব্যাপার। হ্যাঁ, এইবার আসুন আপনাকে আমাদের এই হাসপাতালটা ভাল করে দেখাই।"

এই বলে তিনি হাসপাতালের বিভিন্ন ঘরগুলো দেখাতে লাগলেন— "দেখছেন বিরাট লাইন, এরা সবাই আউটডোরের রুগী, সকালবেলা লাইনের জন্য টিকিট দেওয়া হয়েছিল, অধিকাংশই পেটের অসুখ, মাথাধরা, কোমর ব্যথা। মেয়েদের ডিপার্টমেন্ট আলাদা। দেখুন, আমাদের অ্যাক্সিডেন্ট সার্জারীর যন্ত্রপাতিগুলো একবারে নতুন। চিলড্রেন ডিপার্টমেন্টটা দেখুন, নিউট্রিশন, ভ্যাক্সিনেসন-এর ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। ছোঁয়াচে রোগের জন্য ওই বিল্ডিংটা, ওখানে আমরা যাবো না, সাবধানের মার নেই। জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা আমাদের খুবই সাক্সেসফুল প্রজেক্ট। লাসাতে এই ধরনের হাসপাতাল এই প্রথম, মডার্ন আর অভিজ্ঞ ডাক্তারে ভর্তি। হাসপাতালের এই সব অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি দেখে রুগীরা ভয়ে পালায়। খুব শীগগীরই আমাদের স্ক্যানার আসবে।

প্রশংসা করতেই হবে সত্যি আধুনিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর দেখেই বুঝলাম এদের কাজও ভালই চলছে। সব শেষে আমার শেষ প্রশ্ন:

—"এই রোগীদের মধ্যে তিব্বতিদের সংখ্যা কত?"

আমার প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক তাঁর গাল চুলকে বললেন—

"খুবই কম, খুবই কম। তবে অ্যাক্সিডেন্ট হলে তিব্বতিরা কিন্তু এখানে আসতে বাধ্য হয় আর ডেলিভারী কেসও প্রচুর। তবে যাই বলুন না কেন, এটা আমাদের বিরাট লাভ।

অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে আমরা বিদায় নিলাম।

রাস্তায় বেরিয়ে স্রোংশীকে বললাম— অদ্ভুত তাই না? আমি দুটো দিকই পেয়ে গেলাম একজনের চীনা মন্তব্য আর একজনের স্বদেশী মন্তব্য। স্রোংশী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল— আমি দোভাষী আমি দুটো ভাষাই জানি। সেদিনকার মত আমি স্রোংশীকে ছেড়ে দিলাম।

পরের দিন বেরোলাম পোতালা পরিক্রমায়

পোতালা পরিক্রমার রাস্তাটাকে বলা হয়— লিংখোর (Linkhor)। পবিত্র পোতালা পরিক্রমা। আজ পূর্ণিমা তিথি পদ্মাসম্ভবার আবির্ভাব তিথি। জোখাং-এর বড় পূজো হবে আর দূরের তীর্থযাত্রী জোখাং মন্দিরে ধর্না দেবে আর লিংখোর ধরে পোতালা প্রাসাদ পরিক্রমা। জোখাং-এর মতো এখানে কেউ দণ্ডি কেটে প্রদক্ষিণ করে না, দেওয়াল স্পর্শ করে, মাথা ঠুকিয়ে, চক্র ঘুরিয়ে, বীজমন্ত্র জপে অথবা মণিমন্ত্র ধরেই এগিয়ে যায়। ভোরবেলা হোটেল ছেড়ে আমাদের আসতে আসতে বেলা ন'টা বেজে গেল। জোখাং-এ পূজো দিয়ে পোতালার পাদদেশে এসে দেখি ইতিমধ্যেই অনেকে পরিক্রমা শুরু করে দিয়েছে। নানা রঙের যাত্রী, অতি সুন্দর দৃশ্য। এই প্রথম দেখলাম শুধু তিব্বতি, মনটা হাল্কা হয়ে উঠল। স্রোংশী বলল—"এরা সবাই দূর থেকে এসেছে, এরা আসলে অশিক্ষিত, এরা হয়তো জানে না যে পোতালা রাজপ্রাসাদে রাজা নেই। কার জন্য এই প্রদক্ষিণ?" আমি স্রোংশীর পিঠে হাত দিয়ে অতি আপন ভাব করে বললাম— "এদের অশিক্ষিত না বলে বল সরল ও সহজ গ্রামবাসী, প্রাসাদে বর্তমান চতুর্দশ দালাই লামা নেই, কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী সব দালাই লামাদের স্মৃতি সৌধ রয়েছে আর প্রাসাদের অভ্যন্তরে রয়েছে মন্দির, তাদের উদ্দেশ্যেই এই ভক্তি নিবেদন। তোমার ঠাকুর্দা নেই বলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা কি পাপ?"

স্রোংশী আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল—"আপনি সত্যি জ্ঞানী, আপনার কথা মেনে নিতে বাধ্য, এটাই কি ভারতীয় দর্শন?"

ছোট্ট উত্তর দিলাম— "হ্যাঁ"

আমরা মানে আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে শুরু করলাম প্রদক্ষিণ, হাঁটতে হাঁটতেই স্রোংশী শুরু করল তার লেকচার :

—"আমাদের আশে পাশে যাদের দেখছেন তারা কেউ লাসার লোক নয় আমি দেখলেই ধরে ফেলব। লাসার চীনাদের মধ্যে অধিকাংশই হান, তারা তীর্থ করতে আসে

না। আর বহু আন্দোলন, অত্যাচার আর শাস্তি পাওয়ার পর লাসার লোকেরা প্রকাশ্যে ধর্ম্ম চর্চা করতে ভয় পায়। তবে মঠ ও আশ্রম আজকাল খুলছে, সরকারি প্রচেষ্টায় আবার শুরু হচ্ছে অতীতকে জাগাবার চেষ্টা।

আমাদের সামনে ওই দূরে লম্বা চুল মাথায় লাল ফিতে ছেলে ও মেয়েরা সমান উঁচু, ওরা এসেছে উত্তরের চাং তাং (Chang Tang) অঞ্চল থেকে, লাসার থেকে ওখানে আরও বেশী ঠাণ্ডা। ওদের পরণে সব সময়ই ভেড়ার চামড়ার পোষাক। তাদের পাশের দুই মহিলা সামনে চামড়ার পেটী পর্যন্ত ওরা সাং (Tsang) অঞ্চলের, চাষ বাস করেই ওদের জীবিকার্জ্জন হয়। ওদিকে দেখুন, কালো কোট কালো প্যান্ট অনেকটা আমেরিকার ওয়েস্টার্ন ফিল্মের কাউবয়দের মতো টুপী। ওরা ইয়াক ও ভেড়ার কারবার করে, বেশ ভাল লাভ করে ওরা এসেছে লিথাং (Lithang) থেকে। লিথাং অঞ্চলটা খাম (Kham)-এর পূর্বদিকে। একটা মজা দেখবেন চলুন একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে ওদের ছাড়িয়ে যাই।

স্রোংশীর কথামতো আমরা কয়েকজনকে ওভারটেক্ করতেই কানে এল কয়েকটা শব্দ "কুচি কুচি" স্রোংশী আমার দিকে তাকিয়েই হেসে দিল 'কুচি কুচি' মানে কি জানেন?

—"না।"

—কুচি মানে 'দিন দিন' 'কিছু দাও কিছু দাও' মানে ভিক্ষা চাইছে, পরিক্রমার সময় কেউ কাউকে ওভারটেক্ করে না, কিন্তু যারা করে তারা নিঃসন্দেহে ট্যুরিস্ট। ট্যুরিস্টদের কাছে ভিক্ষা চাওয়া নিষেধ নয়। আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন যে লাসায় আজকাল ভিখারীদের সংখ্যা কমে গেছে এটা কিন্তু চীনা সরকারের কৃতিত্ব। এই দেখুন আমাদের ডান দিকে একদল লোক সুন্দর দেখতে, খুব সরল এরা কারা জানেন? এরা হচ্ছে আমাদের মানে তিব্বতের বীর সন্তান খাম্পা। ওরাও থাকে খাম্ অঞ্চলে। খাম্পারা বীর যোদ্ধা সাহসী এমনকি চীন সরকারও ওদের ভয় করে। ১৯৫৯ (1959) সালে চতুর্দশ লামা যখন ভারতে পালিয়ে যান তখন এরাই পেছনকার চীনা সৈন্যদের আটকে রেখেছিল। এরা আসলে খাম প্রদেশের যাযাবর। বীর ও ধার্ম্মিক আমরা সবাই স্বীকার করি যে এই খাম্পারাই তিব্বতের বৈশিষ্ট্য আজও বজায় রেখেছে।

আমি স্রোংশীকে অন্যান্য যাত্রীদের আগে যেতে নিষেধ করলাম। ঐতিহ্যকে সম্মান দিতে হবে।

আমাদের আড়াই ঘন্টা লাগল পোতালা প্রাসাদ পরিক্রমা করতে, তারপর আবার এলাম বারখরের জম জমাট কেন্দ্রে। বারখরের মেলায় দুবার তিব্বতি নোন্‌তা চা খেয়ে হোটেলের পথ ধরলাম। হোটেলের কাছে আসতেই স্রোংশী অতি বিনীতভাবে বলল—"নতুন লাসায় আজকাল ভাল ভাল সুন্দরী চাইনিস্ মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে। লাসায় আর্মি হেড কোয়ার্টার আর প্রচুর সংখ্যায় ব্যবসায়ী আছে আসলে তাদের জন্যই একটা নতুন পাড়া বেশ জমে উঠেছে, আমরা গাইড্ সব ইনফরমেশনই আমরা দিই, তাই বললাম" আমি হেসে জবাব দিলাম— "ধন্যবাদ কাল আবার দেখা হবে।"

দেখতে দেখতে কয়েকদিন কেটে গেল। দেখছি আর বার বার থমকে দাঁড়াচ্ছি— সত্যি পরিবর্ত্তন— বিরাট পরিবর্ত্তন। পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল যে লাসার রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক আর ধর্ম্মীয় সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পপুলার বা পিপ্‌লস্ অব চাইনিস্ গভর্নমেন্ট-এর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। আসলে রাজধানী দেখলেও বোঝা যায় সম্পূর্ণ দেশের হালচাল।

কয়েকদিন ধরে পুরনো লাসা ও নতুন লাসা ভালভাবেই দেখলাম। তারপর বেরোলাম লাসার বাইরে।

লাসার বাইরে অনতিদূরেই দুটো বৌদ্ধবিহার সেরা আর দ্রেপুং। আর প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে তৃতীয়টি গানডেন। দালাই লামাদের যুগে এই তিনটি মঠই ছিল সমস্ত তিব্বতের দর্শন ও ধর্ম্মের মূল কেন্দ্র। পাঞ্চেন লামার ধর্ম্মীয় সংস্থা ছিল শীগাৎসে।

সেরা, অনেকের মতে সেরা বৌদ্ধবিহার হচ্ছে লামাদের মূল শিক্ষাকেন্দ্র। এখানকার তর্কবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র আর অতি উন্নত ধরনের জ্ঞান যোগ এককালে শীর্ষস্থানীয় ছিল। বিরাট এলাকা গেলুক্‌পা সম্প্রদায়ের পীঠস্থান। চলতি ভাষায় বলে ডপ্ ডপ্ (Dop Dop) কেন্দ্র পাঁচটা বিরাট মহাবিদ্যালয়। ১৯৫৯ সালে চতুর্থ দালাই লামা যখন প্রাণ বাঁচিয়ে ভারতে চলে যান, সেই সময় এই সেরা মঠে ছিল প্রায় ন হাজার সন্ন্যাসী। এই মঠে সন্ন্যাসী ছাড়াও ছিল তিব্বত রক্ষী বাহিনী। এই মঠেই ছিল তিব্বত সেনাবাহিনীর মূল শিক্ষাকেন্দ্র বিশেষ করে দালাই লামার বডি গার্ডরা এখান থেকেই তৈরি হয়েছিল। সে কারণে চতুর্দ্দশ দালাই লামার পোতালা ছাড়ার পরই সেরা মঠের ওপর চীনা পি-এল-এর আক্রমণ হয়। চীনা পিপ্‌লস্ লিবারেশন আর্মি ভেবেছিল এই মঠেই তিব্বতীদের সুরক্ষা বাহিনী আছে, তাই তারা সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে বিশেষ ধরনের কামান নিয়ে আক্রমণ করেছিল। সেই আক্রমণে মঠবাসী শিক্ষার্থী সন্ন্যাসী আর দেশপ্রেমিকরা অনেকেই প্রাণ দিল আর বাকীরা আহতদের নিয়ে পালাতে বাধ্য হয়। সেই ধ্বংসাবশেষ আর গোলাবারুদের চিহ্ন আজও বর্ত্তমান। চীনা আক্রমণের ফলে সেরা মঠ ও বৌদ্ধবিহারের সব রকম কাজকর্ম স্থগিত রাখা হয়। মানে আইন বলে নিষিদ্ধ ছিল। চীনা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নামে এই ধ্বংসাত্মক লীলা শুধু যে অমানুষিক তাই না— একটা প্রাচীন উন্নত ও আধ্যাত্মিক পদ্ধতিকে ধ্বংস করবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু কথায় বলে রাখে হরি মারে কে? তিব্বতের এই সেরা বিহারের কার্যকলাপ আইন করে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়াতে ভারতের লামা, তিব্বতী মহল, মাননীয় দালাই লামার দরদি মহল ও ভক্তরা ভারতের মাটিতেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করল 'নতুন সেরা বৌদ্ধবিহার'। ১৯৯৭ সালে সেই সেরা মঠের উদ্বোধন করলেন হিজ্ হোলিনেস্ ফোরটিনথ্ দালাই লামা। ডিসেম্বরের সেই বিরাট আর ভাবপ্রবণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বিশেষভাবে ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মাননীয় দালাই লামা, কর্ণাটকের বীলাকুপ উদ্বাস্তু শিবিরের তিব্বতী ও স্থানীয় জনসাধারণকে বার বার তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন।

২০০০ সালে জেনেভায় এক সম্বর্ধনা সভায় মাননীয় দালাই লামা আমাকে বলেছেন— "ভারতের বীলাকুপের সেরা বৌদ্ধবিহারের (Bylakuppe, Karnataka) ধর্ম্মশিক্ষা বিশেষ করে তর্কবিদ্যা তিব্বতের সেই ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে, কারণ সেরা বিহারের গুরু ও অধ্যাপকরা প্রায় সবাই চলে এসেছে ভারতে, দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই সব জ্ঞানীগুণী লামাদের মধ্যে অধিকাংশই আজ আর তাঁদের দেহে নেই। হয়তো তারাই আবার নবজন্ম নিয়ে ভারতের মাটিতে তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্ম্ম রক্ষা করছেন।"

তবে সব কিছুই যে খারাপ তা নয়। আজকাল চীনা সরকার সেরা বৌদ্ধ বিহারটিকে আবার সাজিয়ে গুছিয়ে তুলেছে। ভক্ত শিল্পী তিব্বতীরা দেওয়ালের কাজ, তাংখা আর পরিত্যক্ত মূর্ত্তিগুলোকে মেরামত করেছে ও করছে। গ্রামের লোকেরা শয়ে শয়ে আসছে ধ্বসে যাওয়া পাঁচিল আর ছাদগুলো মেরামত করতে। ট্যুরিস্টরা আসছে, তারাও সরকারকে চাপ দিচ্ছে আগের মত করে গড়ে তোলবার জন্য।

সবচেয়ে আনন্দ লাগল— যখন দেখলাম মূল মন্দিরটি অক্ষত অবস্থায়ই আছে। 'হায়গ্রীভা' অক্ষত অবস্থায় এখনও বিদ্যমান। এখানকার মূল কক্ষগুলোকে নতুন ভাবে সাজানো হয়েছে। পুরনোটির গন্ধ এখনও দেওয়ালে আঁচড় কাটলে পাওয়া যায়।

প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে স্রোংশী পরিচয় করিয়ে দিল। আমি বেঙ্গল থেকে আসছি শুনেই তিনি বললেন— "মিলারেপা-আর্পা-নারপা সবাই মহাজ্ঞানী অতীশ গুরু থেকেই জ্ঞান পেয়েছেন। কোলকাতায় নিশ্চয়ই তার বড় মন্দির আছে তাই না?"

আমি আফশোস করে বললাম—"না, কোলকাতায় বা তার আশে পাশে তার কোন মন্দির নেই, তাকে আপনারাই বাঁচিয়ে রেখেছেন। সম্প্রতি আমি তিব্বতগুরু মিলারেপার ওপর একটা নাটক লিখেছি কোলকাতার বিভিন্ন মঞ্চে তা অভিনীত হচ্ছে তার মাধ্যমেই আমরা চেষ্টা করছি মিলারেপা দর্শনকে প্রচার করার"

আমার কথা শুনে তিনি ভীষণ আনন্দিত হলেন আমাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বললেন— "রাত্তিরে আসুন, একসঙ্গে খাওয়া যাবে আর আপনার কথা শোনা হবে"

দুর্ভাগ্য বলতেই হবে আমি রাজি ছিলাম কিন্তু স্রোংশী বলল—"আমাদের গাড়ী ঠিক করা আছে দুটো মঠে যাবার জন্য এরপর যাবো দ্রেপুং মঠে আর রাত্তিরেই ফিরতে হবে হোটেলে না ফিরলে অসুবিধা; তবে আপনি যদি আসতে চান পরে প্রোগ্রাম করা যেতে পারে" মনে হল সন্ন্যাসীর কিছু বলার ছিল কিন্তু হল না।

বিরাট এলাকা, মন্দির মঠ আর চোরতেনে ভর্ত্তি। তবে লোকসংখ্যা আজ ন হাজারের পরিবর্ত্তে মাত্র দু'শ জন। আর মাঝে মাঝে ছাত্ররা বিভিন্ন কোর্সের জন্য আসে তখন প্রায় চারশর মত দাঁড়ায়। ছাত্ররা তিন মাস, ছ মাস বা এক বছরের উচ্চ শিক্ষার জন্য আসে, আর আগে ছাত্ররা থাকত দশ থেকে কুড়ি বছর পর্যন্ত। বুঝলাম সময় পাল্‌টেছে, হয়তো একেই বলে যুগধর্ম্ম। আমরা সেরা মঠে প্রায় ২ ঘন্টা কাটিয়ে আবার রাস্তায় পড়লাম।

আমাদের জীপের ড্রাইভার চীনা, বেশ হাসিখুশী চটপটে আর কথায় সবজান্তা। সুখের বিষয় ও ইংরাজি জানে না। কথায় কথায় বলল—"চীনা অধিকারের আগে এখানে শুনেছি হাজার হাজার ছাত্ররা পড়াশুনো করতে আসত, এটা একটা বিরাট ইউনিভার্সিটী ছিল কিন্তু আজকাল এদের করার কিছুই নেই, সারাদিন কি করে কাটায়?"

—স্রোংশী তর্জমা করে দিতেই আমি উত্তরটা দিলাম

—"আমি আপনাদের রাজধানী বেইজিং-এ গিয়েছি। আগে সম্রাট ছিল, এখন সম্রাট নেই রাজপ্রাসাদ আছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তার একটা বিরাট গুরুত্ব আর মূল্য আছে। রাজপ্রাসাদ আর ভেতরকার প্রতিটি আসবাব পত্রগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে গুছিয়ে রাখার জন্য রয়েছে হাজার হাজার সরকারী কর্ম্মচারী। তাদের কাজ বেইজিং-এর জাদুঘরগুলোকে ধূলো পরিষ্কার করে ট্যুরিস্টদের জন্য সাজিয়ে রাখা। এখানে এই সেরা মঠ ও পোতালা প্রাসাদ জাদুঘরের মতোই পুরনো স্মৃতিটাকে ধরে রেখেছে। লামাদের কাজ তাদের থেকে আর একটু বেশী। এরা চেষ্টা করছে পুরনো সেই শিক্ষা ও বিদ্যাকে এই মন্দির ও মঠগুলোর মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। চীনা সরকারও তাই চাইছে।

আমার কথা ড্রাইভার মেনে নিল।

পথে গাড়ীর জন্য দাঁড়াল, তেল নিতে হবে আর পাম্পের সঙ্গে একটা রেস্টোরেন্ট আছে মালিক নেপালী, সস্তায় খুব ভালো নেপালী খাবার তৈরি করে। ব্যাপারটা বুঝলাম। গাড়ীর তেল নেওয়াটা অনেকটা অজুহাত। গাড়ী থামতেই ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এল— দেখেই বুঝলাম নেপালী। খুব খুশী হয়ে জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে বলল—"নমস্তে।" স্রোংশা সরাসরি অর্ডার দিল—ভাত, ডাল, চিকেন, আলুভাজা।

ভদ্রলোক আমাকে দেখেই বলল—"নেপালী খদ্দের মাঝে মাঝে পাই তবে ইণ্ডিয়ান খদ্দের একদম পাই না— আমি আপনাকে খুব ভাল করে খাইয়ে দেবো, কোনোদিন ভুলতে পারবেন না।"

হাতে একঘন্টা সময় আছে, স্রোংশীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পাশের গ্রামে। পঞ্চাশ-ষাটটা বাড়ী নিয়ে একটা গ্রাম। সবই পুরনো পাথরের গাথনির ওপর নতুন মাটির দেওয়াল আর টালির ছাত। ছেলেমেয়েরা বাইরে খেলাধূলা করছে। সেই পুরনো দৃশ্য বেশ ভাল লাগল। আমাদের দেখে দুজন গ্রামবাসী জিভ বার করে নমস্কার জানাল।

—"এটা আসলে একটা নেপালী গ্রাম। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে লাসায় দুটো পুরনো সম্প্রদায় বেশ ভাল ব্যবসা করছে, তারা বেইজিং-এ যাচ্ছে আবার কাঠমাণ্ডু যাচ্ছে, আবার সুযোগ বুঝে চোরা কারবারীও করছে তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে ওরা খুব কষ্টসহিষ্ণু।"

—"এই দুটো সম্প্রদায় কারা?"

—নেপালী আর তিব্বতি মুসলমান। দেশের উত্থান পতনের জন্য এরা মনে কিছু করে না কারণ এদের উদ্দেশ্য ব্যবসা। দালাই লামার আমলে ছিল, এখনও আছে।

গ্রাম ঘুরে দেখি এরা নেপালী হলেও তিব্বতের হাওয়ায় নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে।

খাবার সময় হল তাই রেস্টোরেন্টে ফিরলাম। এসে দেখি সত্যিই বাহাদুরের রান্নায় হাত আছে, আমার দিকে তাকিয়ে বলল

—"আমার কাছে ভাল পুরনো আটা ছিল আপনার জন্য দুটো চাপাটি বানিয়েছি"

—"বেশ ধন্যবাদ"।

খাওয়া দাওয়ার পর আবার জীপ। কিছুক্ষণের মধ্যেই দূরে দেখা দিল দ্রেপুং বৌদ্ধবিহার। অতি সুন্দর পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা দুর্গ। ধূলো উড়িয়ে গাড়ী তোরণের কাছে পৌঁছতেই দেখি চারদিক থেকে লামারা ছুটে ছুটে আসছে। আমাদের দেখেই দুপাশে হাত জোড় করে দাঁড়াল, যেন ভি-আই-পি ঢুকছে। স্রোংশী, ড্রাইভার ও সরকারী জীপ এদের চেনা। একজন বয়স্ক লামা এসে নমস্কার জানিয়ে বললেন

—"আপনাদের জন্য খাবার তৈরি করবো?"

—"না, আমরা খেয়েই এসেছি, ঠিক আছে" "তাহলে যাবার আগে চা খাবেন। শুনলাম আপনি বাংগাল থেকে এসেছেন খুব ভাল— আপনি পালি ভাষা জানেন— আমি এক বছর শিখেছিলাম, আজকাল আর কোন শিক্ষক নেই।" ভদ্রলোক আনন্দে গদ গদ, তিনি লাসার থেকে টেলিফোন পেয়েছেন আমাকে দ্রেপুং-এর নতুন শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলার জন্য নির্দেশ এসেছে কাজেই শুরু হল তাঁর বক্তৃতা।

আমি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম—

—"আপনার পরিচয়টা জানা হয় নি"

—"আমি এখানকার সহকারী অধ্যক্ষ, আমাদের অধ্যক্ষ লাসায় থাকেন। এই দেখুন এই বিশাল জায়গা আর বিখ্যাত দ্রেপুং বৌদ্ধবিহার। তিব্বতের সবচেয়ে বড় আর পবিত্র। পোতালা প্রাসাদের থেকেও এর নাম বেশী। এখানে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দালাই লামা বাস করেছেন, তিব্বতের এই বিশাল দেশকে এখান থেকেই শাসন করতেন, পোতালা প্রাসাদ তৈরি হওয়ার অনেক আগেই। পোতালা প্রাসাদ শুরু হয় মাননীয় পঞ্চম লামার আমলে। পঞ্চম লামা এখানে থেকেই পোতালা নির্ম্মাণের পরিকল্পনা ও তদারকী করতেন। তাঁর সমাধি বেদী পোতালা প্রাসাদেই আর এখানে আছে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দালাই লামার সমাধি বেদী ও মন্দির। আসলে চতুর্থ দালাই লামা পর্যন্ত দ্রেপুংকেই বলা হত তিব্বতের রাজধানী। এই দেখুন মূল মন্দির প্রাসাদ আর বৌদ্ধ বিহার স্থাপিত হয়েছিল ১৪১৬ খৃস্টাব্দে। এই বৌদ্ধবিহারে ছিল চারটে মহাবিদ্যালয় আর রাজ্য শাসনের জন্য বিরাট বিরাট জমায়েৎ কক্ষ। এখানকার দালাই লামার প্রতিনিধি যেত খাম্, আমদো ও সুদূর ভারতের লাদাখ পর্যন্ত। লাদাখের বৌদ্ধবিহারটা দেখবেন, ঠিক এরকম ...

উনি বলে যেতে লাগলেন আর আমি নয়ন ভরে দেখতে লাগলাম তিব্বতের অদ্ভুত পাহাড়ী স্থাপত্য। ভেতরে সুন্দর করে সাজানো দেওয়াল চিত্র তাংখা মূর্ত্তি আর হাজার হাজার বইয়ের থাক। প্রচুর মন্দির, স্তূপ আর পত্ পত্ করে উড়ছে পতাকার মালা অবাক হয়ে দেখছি দূরে নজরে পড়ল দুটো ভাঙা মন্দির, আমার দৃষ্টি অন্যদিকে আকর্ষণ

করে সহকারী অধ্যক্ষ বলে যেতে লাগলেন তাঁর শেখানো বুলি—"আগে এখানেই ছিল সরকারী ভবন, চারপাশে ছিল জমিদার ও শাসনকর্তাদের বাড়ীঘর। প্রায় আট হাজার লোক স্থায়ীভাবেই এখানে থাকতো। কিন্তু সে সময়ে এখানে চিকিৎসার কোন সুব্যবস্থা ছিল না, শুধু বড়লোক বা বিশিষ্ট লামাদের জন্য একটা চিকিৎসা কেন্দ্র ছিল, গরীবদের কথা তারা ভাবতো না। এখন এখানে আকুপাংচারের জন্য বেয়ার ফুট সেন্টার খোলা হয়েছে। আকুপাংচার ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার দিকে সরকারের কড়া নজর দেশের সকলকে শিক্ষিত হতে হবে, দেশে কোনো ভিখিরি থাকবে না। ধর্ম্মকে কেন্দ্র করে বিরাট ফিউডাল সরকার গরীবদের অবজ্ঞা করে নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখতো। আজকাল সব পাল্‌টে গেছে। ১৯৫৯ সালের পর একটা বিরাট সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে গরীবদের বিনামূল্যে চাষযোগ্য জমি দেওয়া হয়েছে। আজ তিব্বত আর মরুভূমির দেশ নয়, মাঠে পাহাড়ে গম আর সব্‌জির বাগানে ভর্ত্তি ..."

—"ওই ভাঙা বিরাট বাড়ীটার কথা কিছু বললেন না তো?"

আমার প্রশ্নে তিনি একটু ঢোক গিলে উত্তর দিলেন—

—"তিব্বতের উন্নতির জন্য যখন চীনা সৈন্যবাহিনী গরীবদের উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসছিল তখন সুযোগবাদীরা আর ধনীরা বাধা দিয়েছিল। চীনা মুক্তিবাহিনীর কামানে তাদের ঠাণ্ডা করে দেওয়া হয় তারই চিহ্ন। বুঝতেই তো পারছেন যুদ্ধ তো একপক্ষে হয় না।"

ভদ্রলোক থামতেই আমি আবার প্রশ্ন করলাম—

—"এখানে তো আগে নিরস্ত্র শান্তিকামী লামা ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা থাকতেন তাদের বিরুদ্ধে কামান চালাতে হল কেন?"

—"লামারা শান্তিকামী ছিল, কিন্তু তাদের পিছনে ছিল ফেওদাল সরকারের হাত।"

আর একটা প্রশ্ন— "আপনি এই মঠ চালাবার জন্য কোত্থেকে ট্রেনিং ও শিক্ষা পেলেন?"

—"আমি তিন বছর বেইজিং-এ ছিলাম তারপর প্রথম পোস্টিং ছিল চেংদুতে ওখানে একবছর থাকার পর এখানে প্রমোশন পেয়ে এসেছি। আমার মাতৃভাষা তিব্বতি, সরকারি ভাষা চীনা।" আমাদের ভবিষ্যতে দুটো ভাষার পরিবর্ত্তে একটা ভাষাই হবে পুরনো বই ও ধর্ম্মশাস্ত্রের চীনা অনুবাদের কাজ চলছে, সাধারণ মানুষের পক্ষে সুবিধাই হবে। ... পরিদর্শন শেষে আমরা একসঙ্গে বসে চা খেয়ে বিদায় নিলাম। বলাই বাহুল্য যে সেরা ও দ্রেপুং দেখার পর আমার আর কিছু দেখার ইচ্ছাই রইল না। বৌদ্ধবিহারের ওপর কামানের গোলার দাগ আমার মনে ভীষণ ভাবে ব্যথা দিয়েছে। বৌদ্ধবিহারের বাড়ীঘর, মন্দির আর সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট গলি সব চোখের ওপর থেকে উধাও হয়ে ভেসে উঠল এক ধ্বংসাত্মক রণক্ষেত্রের চিত্র, যেখানে নিরীহ ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী আর ধর্ম্মীয় নেতাদের রক্তে নদী বয়ে গিয়েছিল। দ্রেপুং-এর পাহাড়ি সৌন্দর্যকে আর উপভোগ করতে পারলাম না। লাসার পথ ধরলাম। যাবার পথে রামচে মন্দিরে পনেরো মিনিটের

জন্য দাঁড়িয়ে প্রণাম করে পাশের তিব্বতি চায়ের দোকানে ঢুকলাম, বললাম বেশ ভাল করে খাঁটি তিব্বতি চা খাওয়াও।

লাসায় ফিরেই ড্রাইভার ও স্রোংশীকে ছেড়ে দিলাম। এখন মাত্র বিকেল চারটে। হোটেলে ঢুকে সরাসরি চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়, বিশাল দুটো বৌদ্ধ বিহারের অনেক কিছুই দেখার ছিল, দেখলামও অনেক কিন্তু বার বার কামানের গোলায় বিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপের ছবিটাই চোখের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনটাকে কিছুতেই স্থির করতে না পেরে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। অদ্ভুত ব্যাপার রাস্তা থেকে যেন তিব্বতীরা হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে। চোখের সামনে শুধুই দেখছি চীনা আর চীনা সেনাবাহিনী। রাস্তার নাম, দোকানের সাইনবোর্ড সবই চীনা ভাষায় লেখা। ট্রান্‌জিসটর বাজছে চীনা সুরে মেয়েলি গলায়, ফুটপাতের ওপর বিলিয়ার্ড খেলার কৌতুহলী জনতা। ভাবলাম আমি কি সত্যি তিব্বতের রাজধানী লাসায় আছি না চেংদুতে?

আরও দুদিন লাসায় থাকলাম। লাসার জোখাং মন্দির আর বারখারের বাজার, বাইরের ট্যুরিস্টদের কাছে এই দুটো স্থানই আকর্ষণীয়, বাকী সবটাই বলতে গেলে 'মেড্ ইন চায়না'। পোতালা প্রাসাদ এখন সম্পূর্ণ জাদুঘরে পরিণত হয়েছে। এথেন্স, রোম, প্যারিস, প্রাগ ইত্যাদি ইউরোপের শহর ও ভারতের দিল্লী, জয়পুর, হায়দ্রাবাদের প্রাসাদ ভ্রমণের মত অবস্থা। পোতালার গোল্ডেন-রুফ গলি আর খাঁটি তিব্বতি ধরনের অলি গলি ঘুরিয়ে গাইডেরা শিল্প ও ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করে কিন্তু ধর্ম্ম ও দর্শনের কোন উল্লেখই করে না। দালাই লামার প্রসঙ্গ উঠলেই সরাসরি বলে দালাই সেভেন্‌থ্, দালাই এইট্‌থ্ ইত্যাদি।

এবার ঠিক করলাম লাসা থেকে বেরিয়ে যাবো। মানস সরোবর ও কৈলাসনাথ কয়েকবার গেছি, ১৯৫৬ সালের পর এদিকে আসা হয় নি। রাস্তাঘাটের সব নাম চীনা ভাষায় লেখা আর বিশেষ বিশেষ জায়গায় ট্যুরিস্টদের জন্য ইংরেজিতেও লেখা আছে। তিব্বতি ভাষায় কেন লেখা নেই— এই প্রশ্নের উত্তরে খুব স্মার্ট আন্‌সার পেয়েছি— "তিব্বতিদের রাস্তাঘাট মুখস্থ তাদের ডিরেকসনের দরকার নেই।" স্রোংশী বলেছে— সাইনবোর্ডগুলো চীনা সৈন্যবাহিনী, চীনা ব্যবসায়ী, আর চীনা সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্যই লেখা।

লাসা থেকে বাইরে যাবার পরিকল্পনা করবার জন্য ট্যুরিস্ট অফিসে এলাম। বস্ খাতির করে বসাল, তারপর সরাসরি এলাম আমার ভ্রমণের জন্য একটা গাড়ী আর বিভিন্ন জায়গায় থাকার প্রসঙ্গে। আমাকে মাথা ঘামাতে হল না, ওদের সব কিছুই ছক বাঁধা। আমি তারই মধ্যে একটা আইটিনেরারী বেছে নিলাম। ওই অফিসে আরও চার জনের একটা জার্মান গ্রুপ এসেছে তাদের সঙ্গেই বসে ঠিক করলাম লাসার উত্তরে যাবো, পাহাড়ে ট্রেকিং করার ইচ্ছে। আমিই প্রস্তাব করলাম— নাম সরোবর পর্যন্ত যাওয়ার জন্য। সবাই রাজি ও খুশী, ট্যুরিস্ট অফিসার তো আরও খুশী, গাইড্ গাড়ী, ড্রাইভার, রেস্টোরেন্ট সব ক্ষেত্রেই লাভ। আর তার চেয়েও বেশী লাভ যে এই ধরনের ট্যুরিস্টরা

দালাই লামা, ধর্ম্ম ও রাজনীতির কোন প্রশ্ন করে না। সম্পূর্ণ খরচাকে পাঁচভাগে ভাগ করা হবে সবশুদ্ধ তিন রাত্রি ও চারদিন— প্রথম রাত গেস্ট হাউসে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাত্রি ক্যাম্পিং সবশুদ্ধ দিনে মাথাপিছু কুড়ি ডলার। ট্যুরিস্ট অফিসার জানালেন যে আমাদের লাভই হয়েছে, আর্দ্ধেক খরচায় সব হয়ে গেল। বাইরের থেকে এই ধরনের প্রস্তাবের জন্য আরও মাথাপিছু দশ ডলার করে দিতে হয়, আর আরও দশ ডলার সরকারি ঐতিহ্য রক্ষা তহবিলে দান করতে হয়। লাসা থেকে ব্যবস্থা করলেন বলে আপনাদের ঐ খরচটা বেঁচে গেল। মাথা পিছু কুড়ি ডলার বেঁচে গেল।

—"ধন্যবাদ— ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ।"

ট্যুরিস্ট অফিস থেকে বেরোতেই স্রোংশী বলল—

—"আপনি সত্যিই ভাগ্যবান, গানদেন বৌদ্ধবিহার আপনাকে একা যাবার পারমিশান দিতে চাইছিল না। জার্মান ও আমেরিকান ট্যুরিস্টরা ভাল ওরা খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে না।"

পরের দিন সকাল বেলা আমরা রওনা দিলাম। হোটেলে মালপত্রগুলো রেখে দিলাম কারণ চারদিন পর আবার এখানেই ফিরে আসছি। ফোর হুইল ড্রাইভ, বেশ বড় জীপে ড্রাইভার সমেত আমরা মোট সাতজন, সামনে তিনজন আর পেছনে চারজন আটজন ভালভাবে বসা যায়। ড্রাইভার বলল দশ এগারো জন হলেও চলে যায়। চারজন জার্মানীর দুই দম্পতি আসলে গার্ল ফ্রেন্ড আর বয় ফ্রেন্ড অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছে। বেশ হাসিখুশী, পরিচয় হল মার্ক-জুডিথ, হান্স-এলজা। ওরা অন্য হোটেলে ছিল ওদের নিয়েই গাড়ী এল। গাড়ীর ছাতে তাঁবু আর ওদের পিঠের ব্যাগ। পরস্পর পরস্পরকে সুপ্রভাত জানিয়ে বসলাম। গাড়ী ছাড়ল।

গাড়ী ছাড়ল আমাদের প্রোগ্রাম লাসার নরবুলিংকা প্রাসাদ, তারপর লাসার নতুন মডার্ন টাউন ঘুরে সরাসরি গানদেন, দুপুরে গানদেনেই খাওয়া হবে।

নরবুলিংকা মনের ছবিতে যেরকম ছিল সেরকমই আছে স্রোংশী আরম্ভ করল তার বক্তৃতা। জীপের ইঞ্জিনের শব্দে ওর গলা শুনতে পাচ্ছিল না তাই ট্যুরিস্টরা বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগল পুনরাবৃত্তির জন্য বাধ্য হয়ে গাইড মাইক নিল।

এই দেখুন লাসায় অতি আধুনিক ইন্টারনেট সাইট বিল্ডিং, তিব্বতে এই ধরনের বিল্ডিং এই প্রথম। এভেন্যুটাকে দেখুন, প্রশস্ত, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, বেইজিং-এর অনেক অফিস এই এভেন্যুতেই পাবেন। পুরনো লাসার সঙ্গে এর দিনরাত তফাৎ। সব চীনা জাতীয় উৎসবগুলো এখানেই হয় আর সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজের বাৎসরিক অনুষ্ঠান তো বটেই। দেখার মত। তিব্বতের নববর্ষের উৎসব শাক্যমুনী উৎসব আর অন্যান্য ঐতিহ্যমূলক অনুষ্ঠানগুলো জোখাং মন্দির ও পুরনো লাসাতেই হয় কোনটাকেই বাদ দেওয়া হয় নি। বার বার গাইডের কথা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে চীনা সরকার এখানে না এলে লাসাকে এখনও চারশ বছর পিছিয়ে থাকতে হত। একটা চাইনিজ্ রেস্টোরেন্টে গাড়ী দাঁড়াল চা খাওয়া ও নতুন লাসার ছবি তোলার জন্য...। অদ্ভুত সাইনবোর্ডগুলোর অধিকাংশই চীনাভাষায়। তারপর এলাম নরবুলিংকার পথে।

—"এই দেখুন, দালাইদের গ্রীষ্মাবাস-প্রাসাদ নরবুলিংকা। পোতালার তুলনায় কিছু না কিন্তু গঠন আর দরজাগুলোর কাজ দেখার মত।" দেখেই মনে হচ্ছে নতুন রঙ করা হয়েছে।

নরবুলিংকা দেখা মাত্রই মনটা চলে গেল অতীতে, অতীতের সেই ছবির সঙ্গে তুলনা করতে চাইল। তবে মৌনীবাবা যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিল তার আর সেই সময়কার মানসিক অবস্থার সাথে বর্ত্তমানের বিরাট তফাৎ— কালের তফাৎ, কিছুটা মিলেছে, দেখলাম বাগান ও নতুনত্ব অনেক কিছুই। মনের মধ্যে তুলনামূলক প্রশ্ন না এনে সরাসরি গ্রোংশীর বক্তৃতায় মন দিলাম।

—"লাসার পশ্চিম শহরতলীর এই জায়গায় প্রথমে ঘাস ও জংলী গাছে ঢাকা একটা ছোট জলাশয় ছিল আসলে একটি উষ্ণপ্রস্রবণ। জলের তাপমাত্রা ছিল স্নানের উপযোগী। সপ্তম দালাই পায়ের ব্যথায় ভুগছিল, এখানে এসে কয়েকবার স্নান করবার পর তার পায়ের ব্যথা অনেকটা কমে যায়। তারপর থেকে প্রতি বছর গরমকালে সে আসতো চান করতে। এই খবর শুনে তদানীন্তন চীনা প্রতিনিধি (দি রেসিডেন্ট কমিশনার ফ্রম দি কিং ডাইনাস্টি The Resident Commissioner from the Qing Dynasty) এখানে ছোট্ট একটা বাড়ী তৈরী করলেন, বাড়ীটার নাম দিলেন উয়ুনাওপোজ্জাং (Wunaopozhang), স্থানীয় লোকেরা বলত নাটমন্দির। মূল উদ্দেশ্য ছিল যখন দালাই এখানে স্নান করতে আসবেন, তার যেন কোন কষ্ট না হয়।

তারপর সপ্তম দালাই নিজেই দ্বিতীয় একটা বিরাট বাড়ী তৈরি করালেন, তার নাম দিলেন গেসাংপোজ্জাং (Gesangpozhang)। তারপর শুরু হলো অভ্যন্তরীণ মন্দির, ভক্তদের থাকবার বন্দোবস্ত আর সুন্দর বাগানবাড়ী। সেই পুরনো জলাশয়টাকে সুন্দরভাবে বাঁধিয়ে পবিত্র স্নান ক্ষেত্র করা হল। গরমকালে এখানকার আবহাওয়া উপভোগ্য। তারপর থেকে দালাইরা ছোট বেলা থেকে আঠারো বছর পর্যন্ত গরমকালে পড়াশোনা করার জন্য এখানেই থাকতেন।"

তার কথা শুনে হঠাৎ সিনেমার মত চোখের সামনে ভেসে উঠল ... এখানেই আমি দেখেছিলাম চতুর্থ দালাই লামা শ্রীমৎ তেনজিন গিয়াৎসোকে। বলিষ্ঠ দীপ্তবান এক নবীন সন্ন্যাসীকে। সেই প্রথম দর্শন। স্মৃতির পটে স্থায়ী চিত্র হয়ে আছে তার সেই চাউনির মধ্যে ছিল এক আকর্ষণীয় শক্তি। ষোল বছরের একটা ভারতীয় ভিখিরী তীর্থযাত্রীর সামনে উদিত হয়েছিল এক প্রশান্ত রহস্যজনক মূর্ত্তি— মাননীয় সর্বজন পূজিত দালাই লামা। সম্পূর্ণ তিব্বতের প্রতীক। মনটাকে আবার নিয়ে এলাম বর্ত্তমানে। গতবছর সুইজারল্যাণ্ডের লজান শহরে দেখা এই দালাই লামার সঙ্গে তার মিলটা কোথায়? মিল অবশ্যই আছে, সেই একই মন, একই আত্মা, নরবুলিংকায় যাকে দেখেছিলাম বাগানে চুরি করে রাজপুত্রকে দেখার মতো করে। তিব্বত-অধিপতি দালাই লামার গুণ-শক্তি তার বিরাটত্বকে জানার মত কোন বিদ্যা বা গল্পকাহিনীজানা ছিল না— সম্পূর্ণ এক অজানা মন দেখেছিল নরবুলিংকা আর পোতালা প্রাসাদের রাজাকে আর এখন তিব্বত-জানা

দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখেছি দালাই লামাকে। মনের কোঠায় সেই পুরনো রহস্যঘন নরবুলিংকার নবীন দালাই লামাই স্থায়ী আসন পেতে বসে আছে।

হঠাৎ যেন দেখতে পেলাম দূরে একটা ছোট্ট দল এদিকেই আসছে। সামনে দুজন লোক এগিয়ে চলেছে —বলছে নগরবাসী হুঁশিয়ার মহামান্য তিব্বতিধপতি দালাই লামা আসছেন— প্রশেসনটা এগিয়ে আসছে, প্রশেসনের মাঝখানে এক নবীন সন্ন্যাসী — আমাকে কে যেন কানে কানে ফিস্ফিস্ করে বলছে —"ইনিই তিনি, তুমি ভাগ্যবান তার দর্শন পেলে" তাঁকে দেখলাম, কিন্তু আমাকে দেখলেন কি? জানি না, আমি দেখলাম, আমারই লাভ।

—"চলুন আবার গাড়ীতে উঠি"—কার ডাকে যেন আমার স্বপ্ন ভাঙল, পাশে দাঁড়িয়ে স্রোংশী। গাড়ী আবার ছাড়ল। জানলা দিয়ে শেষবারের মত নরবুলিংকা দেখলাম। সেই নবীন সন্ন্যাসীকে মনে হল কারা যেন শত সহস্র শৃঙ্খলতার মধ্যে আটকে রেখেছিল। ধর্ম্ম ও তপস্যার বেড়াজালে জগৎ-দেখার স্বাধীনতা ওই নবীন সন্ন্যাসীর নেই। সেই নবীন সন্ন্যাসীকে আজ দেখছি ধর্ম্মশালায়, গয়ায়, ফ্রান্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে—সম্পূর্ণ এক আলাদা মানুষ। পোতালা আর নরবুলিংকা প্রাসাদের পাঁচিলের বাইরের এক মুক্ত পুরুষ। তিব্বতের তন্ত্র বৌদ্ধধর্ম্মের তন্ত্রধারা আর কালচক্রের দীক্ষাগুরু প্রচার প্রসাররত এক কর্ম্মযোগী।

গাড়ী এবার একটা উপত্যকার রাস্তা ধরল।

মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিল তাকে দমন করতে পারলাম না। স্রোংশীকে জিজ্ঞেস করলাম

—"তুমি দালাই দালাই বলছিলে কেন তিনি দালাই লামা, একটু সম্মান দেখানো উচিৎ, শত হলেও তুমি তো তিব্বতি"

—"ঠিকই আমি তিব্বতি বটে, কিন্তু চীনা সরকারের গাইড্ ও দোভাষী। আমাদের ট্রেনিং হয়েছে বেইজিং-এ। চীনা জাতীয় সরকারের ট্রেনিং ও শিক্ষা অনুযায়ী আমাদের পেশা। বেইজিং-এর ল্যাংগুয়েজ, গাইড্ ও আর্কিটেকচার স্কুল আমাদের যা শিখিয়েছে আমরা তা বলতে বাধ্য। আমাদের প্রধান সচিবের নাম হয়তো আপনি শুনে থাকবেন— মিঃ ঝাং হুইঝেন (Mr. Zhang Huizhen), চায়না ও টিবেটান হিস্ট্রির প্রফেসর, আমেরিকায় অনেকবার গেছেন।" —"বেশ, ধন্যবাদ, তোমার এত কোয়ালিফিকেশন, সত্যিই প্রশংসনীয়।"

লাসা থেকে বেরিয়ে আমি যেন মুক্তি পেলাম। একটা অনিন্দ্য সুন্দর উপত্যকার মধ্য দিয়ে একঘেয়েমী শব্দ করতে করতে জীপটা এগিয়ে চলেছে। ছোট ছোট গ্রাম। দূরে অজানা পাহাড়ি চূড়ায় সাদা বরফের খেলা।

দেখা দিল দূরে পাহাড়ের দেওয়ালে খোদাই করা কতগুলো বাড়ী। স্রোংশী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল—

—"ওই দেখুন দূরে গানডেন মনেস্ট্রী। অপূর্ব সুন্দর।"

গানডেন পাহাড়ি কন্যা, অভিনন্দন, প্রশংসনীয় বহু নামে পরিচিত। এই প্রথম দেখছি এক অবিস্মরণীয় ভাস্কর্য! এক অদ্ভুত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য! তিনটি পাহাড়ি দেওয়ালে তৈরি হয়েছে মানুষের তৈরি কতগুলো অবিশ্বাস্য অট্টালিকা। গাড়ী কাছে আসতেই আরও আশ্চর্য হলাম। মনে হয় কোন এক জাদুকর এই বাড়ীগুলোকে আলাদা জায়গায় তৈরি করে উড়ন্ত দৈত্যদের দিয়ে ওই পাহাড়ের দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে রেখেছে। পোতালার থেকে এখানকার স্থাপত্যের বাহাদুরী অনেক অনেক বেশী। ১৪০৯ সালে গেলুক্পা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ধর্ম্মবীর ৎসোংখাপা-র এক ঐতিহাসিক অবদান। চারহাজার তিনশ মিটার উচ্চতায় বৃত্তাকার পাহাড়ের দেওয়ালে তৈরি এই মনেস্ট্রীর আকর্ষণীয় সৌন্দর্য আমাদের স্তম্ভিত করে দিল।

স্রোংশীকে কিছু বলতেই হল না, সূর্যোদয়ের মত এই গানডেন বৌদ্ধবিহার নিজের সৌন্দর্যে নিজেই উদ্ভাসিত। ওরা ফটো তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, আর আমি ধরে রাখলাম মনের পর্দ্দায়, শরীরের প্রতিটি কোষকে সজাগ করে দিয়ে গ্রহণ করতে লাগলাম এর সৌন্দর্য। জার্মান সহযাত্রী জুডিথ জিজ্ঞেস করল— "তুমি ক্যামেরা আন নি? আপশোস করো না, আমি জার্মানে ফিরে গিয়ে তোমার জন্য একটা কপি পাঠিয়ে দেবো।"

—"ধন্যবাদ। তুমি ধরে রাখছো ক্যামেরায়, তোমার মৃত্যুর পর এখানকার ফটো এখানেই পড়ে থাকবে, সঙ্গে যাবে না, আমি ধরে রাখছি আমার মনের গহনে, প্রত্যেকটি কোষের স্মৃতিতে আটকে রাখছি এই সৌন্দর্য, পরজন্মে আবার দেখবো, এর স্পন্দন পুনর্জন্মেও আমার শরীর ও মনে ধ্বনিত হবে।"

—"আচ্ছা তুমি পুনর্জন্মে বিশ্বাসী"

—"হ্যাঁ"

—"সত্যি তুমি ভাগ্যবান, কারণ তুমি ভারতীয়, হিন্দু"

গাড়ী বিরাট তোরণ দিয়ে ভেতরে ঢুকল, পাশেই পার্কিং-এর জায়গা। হলুদ রঙের কম্বল জড়িয়ে পাঁচ ছ'জন তরুণ সন্ন্যাসী দাঁড়িয়েছিল। হাসিমুখে আমাদের স্বাগতম্ জানাল— আমরা বিরাট একটা হলঘরে ঢুকলাম, দূরে বিরাট অভয় মুদ্রায় ভগবান বুদ্ধ আমাদের আশীর্বাদ দিচ্ছেন। দেওয়ালে অসংখ্য তাংখা, আর পাশের একটা ঘরে পাঠাগার। সুসজ্জিত কুলুঙ্গি ভর্ত্তি শয়ে শয়ে ধর্ম্মীয় পুস্তক। সোনালী, হলুদ, নীল, লাল ইত্যাদি উজ্জ্বল রঙে দেওয়াল চিত্র বুদ্ধদেবেরে জীবনী, মারা আর মন্ডলার আকর্ষণীয় চিত্র। হলঘরের প্রত্যেকটি থামই অতি যত্ন সহকারে রঙ করা হয়েছে। পূজোর প্রত্যেকটি সামগ্রীই ঝক্ঝক্ করছে মনে হচ্ছে যেন একেবারে নতুন। এত সুন্দর ভাবে যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছে চিন্তা করলে আশ্চর্য হতে হয়। এর পেছনে রয়েছে প্রচুর পরিশ্রম আর শিল্পীসুলভ মনোভাব। এখানে দিনের আলো বেশ ভালভাবেই প্রবেশ করেছে, কাজেই সূক্ষ্ম কাজগুলো সহজেই চোখে ধরা পড়ছে।

একজন প্রৌঢ় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এগিয়ে এলেন, পরিচিত হলাম— এই মঠের প্রধান লামা। আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম, অন্যরা হ্যান্ডশেক করল।

ভদ্রলোক হাসিমুখে অতি বিনয় সহকারে জিজ্ঞেস করলেন—"আপনি কি ভারতীয়?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"আমাদের সকালের প্রার্থনা ও পাঠ হয়ে গেছে, এখন ছেলেরা সবাই খাবার ঘরে চলে গেছে, তবে আপনাদের ইচ্ছে হলে ওদের ডাকতে পারি, ওরা কাংগীওর পাঠ শোনাতে পারে।"

—"না, আপনাকে আর কষ্ট করে ওদের ডাকতে হবে না।"

—"তাহলে চলুন, একসাথে খাওয়া যাক"

—"আমার আপত্তি নেই, তবে নির্ভর করছে স্রোংশীর ওপর।"

—"আমার আপত্তি নেই" স্রোংশী জবাব দিল

খাওয়ার পর আপনাদের যদি ইচ্ছে হয় তাহলে এখানকার পুনর্নির্মাণ তহবিলে কিছু সাহায্য দিলে এই মঠের কাজে লাগবে।

আমরা রাজি হয়ে গেলাম। আমার মনে হয় এটাই আমাদের প্রোগ্রামের মধ্যে ধরা ছিল। চলে এলাম কলেজের হলঘরে। অদ্ভুত ব্যাপার কম করেও দু'শ (২০০)-র মত ছাত্র অথচ নিঃশব্দ। সত্যি, শৃঙ্খলাবদ্ধ। ছাত্রদের সঙ্গেই আমরা বসলাম, যবের ঝোলা ছাতু, আলু সেদ্ধ আর বাঁধাকপির ঝোল।

খাওয়া দাওয়ার পর মঠাধ্যক্ষ মঠ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানাতে লাগলেন। গানদেন মঠ তিব্বতের সবচেয়ে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৯ সালে এখানকার সন্ন্যাসীদের (ভিক্ষু) সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার (৫৫০০)। সেরা ও দ্রেপুং বৌদ্ধবিহারও এরকমই ছিল কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থায় এটাই ছিল সবচেয়ে উন্নত। মাননীয় দালাই লামার শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু এই বিহার থেকেই বাছাই করা হত। এখানকার আরও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এখানকার মঠাধ্যক্ষ বা প্রধান লামা পুনর্জন্ম প্রথা অনুসারে নির্বাচিত হতেন না। তিব্বতের যত মঠ আছে তার মধ্যে যিনি সেরা, তাকেই গানদেনের মঠাধ্যক্ষ করা হত। মানে সত্যিকারের যোগ্য ব্যক্তি।

মঠাধ্যক্ষের বক্তৃতা আমার বেশ ভালই লাগছিল, কিন্তু সঙ্গী ট্যুরিস্টরা চায় স্বচক্ষে দেখতে, ফটো তুলতে, ভিডিওতে এখানকার জীবনযাত্রাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চায়। দেশে গিয়ে গল্প শোনাবার থেকে ফটো দেখাবার প্রয়োজনটাই বেশী। তাদের মতে— "তিব্বতের ওপর বই আজকাল বাজারে উপচে পড়ছে, সব সবিশদ্ ভাবে পাওয়া যাচ্ছে, শুধু বাছাই করে পড়লেই হয়। আমরা এসেছি দেখতে— নিজের চোখে যতটা সম্ভব দেখতে হবে— তাদের উপেক্ষা করা ঠিক নয়। তাই স্রোংশী উঠতে বাধ্য হল মঠটা ঘুরে দেখা দরকার, ইতিহাস দরকার নেই। দুর্ভাগ্যের বিষয় মঠাধ্যক্ষ ইংরাজী বা নেপালী ভাষা জানেন না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—

—"একটা প্রশ্ন এখানে শিক্ষা ও দীক্ষা ছাড়া আমার মত সাধারণ তীর্থ যাত্রীরা বা তিব্বতের তীর্থযাত্রীরা কি করে?"

—"তারা সবাই আসে এই প্রধান মন্দিরের দেবতা অভয় ও আনন্দস্বরূপ ভগবান

বুদ্ধকে দর্শন করার জন্য, যেটা আপনারা করেছেন। আর দর্শন শেষে তারা লিংখোর (Linkhor) পথ পরিক্রমা করে, ঠিক যেমন কৈলাসনাথে সবাই যায় পরিক্রমা করতে।"

স্রোংশী তর্জমা করে দিয়েই বলল—

—"লিংকর ট্রেকিং-এর জন্যই আমাদের আসা, চলুন আমাদের সঙ্গে স্থানীয় পনেরো-কুড়ি জন যাবে, আমাদের ট্রেকিং হবে আর ওদের পুণ্য হবে।"

গানদেন সত্যিই বিরাট এলাকা, মঠ নয় তো, মঠ-গ্রাম। একের পর এক মন্দির তোরণ আর চোরতেন বা স্তূপে ভর্ত্তি। সব জায়গাই সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীতে ভর্ত্তি। বেশ ভালোই লাগছিল কিন্তু হঠাৎ ধাক্কা খেলাম।

কতগুলো নতুন বাড়ীর পরই ভূমিকম্পে ধ্বসে পড়ার মতো বিরাট ধ্বংসস্তূপ দেখে অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ালাম—

—স্রোংশী বিনা দ্বিধায় বলল—"১৯৫৯ সালে এখানে কোন চীনা সৈন্যর উপদ্রব হয় নি। কিন্তু ১৯৬৬ সালে হঠাৎ পিপ্‌লস্‌ লিবারেশান আর্মি এখানে আক্রমণ করে, হঠাৎ বোমাবর্ষণ, তার ফলে এই মঠের প্রধান মন্দির সংলগ্ন সব বাড়ীগুলোই পড়ে যায়। মঠের প্রায় অর্দ্ধেক ধূলিসাৎ হয়ে যায়। কিন্তু সুখের বিষয় যে এখানকার সন্ন্যাসী, গ্রামবাসী, লাসার তিব্বতি সম্প্রদায় সবাই নতুন উদ্যমে নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে শ্রমদান করে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত গানদেন মঠকে আবার দাঁড় করিয়েছে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও সেই পুরনো শিল্পকলাকে উদ্ধার করা যায় নি। আজকাল চীনা কালচারাল কমিটি অনেক লামা-শিল্পীকে উৎসাহিত করছে এখানকার দেওয়াল চিত্র, তাংখা আর মন্ডলাগুলোর পুনরুদ্ধারের জন্য। এই ধ্বংসস্তূপ না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। মনে মনে ভাবলাম, তিব্বত যদি সত্যি চীনাভূমি হয়ে থাকে, তাহলে তার ধ্বংস মানে তো চীনা-ঐতিহ্য ধ্বংস। এই ধ্বংসের মূলে কোন ধরনের কালচারাল রেভোল্যুশন আছে বুঝতে পারলাম না।

লাসা ছাড়ার পর মনটা একটু হাল্কা হয়েছিল, এখন আবার মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। লিংকর করে যদি হাল্কা হওয়া যায় তাই স্রোংশীকে বললাম—

—"চল তাড়াতাড়ি চল পরিক্রমায়"

লিংকর মানে গানদেন মঠ পরিক্রমার পাহাড়ি রাস্তা। একদিকে মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ আর অন্যদিকে অর্থাৎ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে শুধু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেই চোখে পড়ে অনিন্দ্য সুন্দর উপত্যকার দৃশ্য। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নামে চীনা সৈন্যরা যতই মানুষ ও মন্দির ধ্বংস করুক না কেন এখানকার আকাশ-বাতাস-উপত্যকা আর পাহাড়ি দৃশ্যের ওপর এরা এতটুকুও আঁচড় কাটতে পারে নি।

মঠধ্যক্ষ ও স্রোংশী নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে আমাদের বললেন যে— জার্মান গ্রুপ বেশী ট্রেকিং করতে চায় তাদের নিয়ে স্রোংশী সরাসরি এগিয়ে যাবে দূরের প্ল্যাটফর্ম থেকে ওরা ভিডিও তুলবে, তারপর সেখান থেকে নেমে ওরা গাড়ী নিয়ে চলে যাবে শা (Sha) অঞ্চলে, সেখানে ওরা ক্যাম্পিং করে রাত কাটাবে। সকাল বেলা ড্রাইভার ওখান থেকে গাড়ী নিয়ে আসবে। আমাকে নিয়ে আবার ওপরে যাবে দলের সাথে যোগ দিতে।

আর একটা অসুবিধা হচ্ছে যে আমি স্লিপিং ব্যাগ আনি নি, স্রোংশী একটা বাড়তি স্লিপিং ব্যাগ এনেছে, কিন্তু ড্রাইভার বলছে ওর দরকার হবে, কারণ সব সময়ই 'শা' অঞ্চলে কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া।

ভালই হল আমারও ইচ্ছা গানদেনে রাত কাটানো আনন্দেশ্বর আমার মনের কথাটা ধরে ফেলেছেন। মঠধ্যক্ষ জানেন যে আমি ভারতীয় তারও ইচ্ছা যে আমি ওনাদের সঙ্গে রাত কাটাই। স্রোংশীকে আশ্বাস দিয়ে বললাম—"চলে যাও আমার কোন অসুবিধা হবে না।" স্রোংশী ওদের সাথে চলে গেল, আর আমার সঙ্গে দেওয়া হল আটটি নবীন সন্ন্যাসী— ব্রহ্মচারীই বলবো— এদের ভাষায় 'ত্রাবা'।

গানদেনের মঠ ও উপত্যকার সাথে লাডাকের লামায়ারু মঠ ও উপত্যকার অনেক মিল আছে। সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা পরিক্রমা পথ ধরে এগোতে লাগলাম। ত্রাবার দল আমার আগে আগে লাফাতে লাফাতে চলল। দলের মধ্যে একটু নেতা গোছের একটা ছেলে আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে হাঁটতে লাগল— পরিচয়ে জানলাম, ওর বাবা লাসায় ব্যবসা করে, প্রায়ই বেচাকেনার জন্য কাঠমাণ্ডু যায়, বাবার সঙ্গে ও অনেকবার কাঠমাণ্ডু গেছে কিছু কিছু নেপালী শব্দ ওর জানা, তাতেই কোন রকমে আমাদের ভাব বিনিময় হতে লাগল। এটাই তীর্থযাত্রীদের পথ তাই প্রায়ই চোরতেন আর প্রার্থনার মালা পতাকা চারদিকে উড়ছে। প্রায় ঘন্টা খানেক হাঁটার পর আমরা বেশ উঁচুতে একটা সমতল ভূমি পেয়ে দাঁড়ালাম। ছেলেরা ওখানে একটা স্তূপের পাশে এসে দাঁড়াল। চারদিকে ইতস্তত ভাবে অনেক কংকাল ও হাড় ছড়ানো দেখেই বুঝলাম এটা শ্মশান মঞ্চ। এখানকার সবচেয়ে উঁচু এলাকা। এখানে শব্ দাহের কোন রীতি নেই। মড়া পোড়াবার জন্য যে কাঠের প্রয়োজন। এই শুকনো ঠাণ্ডা মরুভূমিতে একটা ঘাসও জন্মে না। পাথুরে জমিতে গর্ত খোঁড়ার শক্তি মানুষের নেই। এই জমিতে কবর দিতে হলে চাই বুলডোজারের মত শক্ত যন্ত্র। তাই স্থান কালের সঙ্গে খাপ খাইয়ে মৃতদেহ সৎকারের এক অদ্ভুত ব্যবস্থা। শবদেহকে টুকরো টুকরো করে কেটে শকুনি ও চিলের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেওয়া। এই স্থানটাকে বলা হয় স্বর্গ মঞ্চ। এখান থেকে দূরের দৃশ্য অতি চমৎকার, তবে দুঃখের বিষয় এখানে বসার উপায় নেই, ভীষণ কনকনে হাওয়া বইছে। তাই বাধ্য হয়ে আমরা ফেরার পথ ধরলাম। সেই একই রাস্তা, পাহাড়ী দেওয়াল ধরে এগিয়ে যাওয়া।

প্রায় তিন ঘন্টা হেঁটে আমরা ফিরে এলাম মঠে। মঠধ্যক্ষ আমাদের জন্য বাইরেই অপেক্ষা করছিলেন, তার সঙ্গে আর একজন বয়স্ক তিব্বতি ভদ্রলোক নেপালী ভাষা বলেন, হিন্দীও বলেন আর কোন রকমে কাজ চালাবার মত ইংরেজিও জানেন। এখানে সরকারী পোস্টে না থাকলে কেউ সহজে নাম বলে না, আমিও ভদ্রলোকের পরিচয় চাইলাম না। তবে বুঝলাম উনি আমার ও মঠধ্যক্ষের দোভাষীর ভূমিকা নিয়েছেন।

আমাকে ওনারা সরাসরি আনন্দময় শাক্যমুনীর মন্দিরে নিয়ে এলেন বিরাট মূর্ত্তির ডানদিকের একটা দরজা দিয়ে আমরা সংলগ্ন ছোট্ট একটা ঘরে এসে বসলাম। ছোট্ট একটা জানলা দিয়ে দিনের আলো যা আসছে মোটামুটি কাজ চলার মত। আমরা বসতেই

একটা ত্রাবা (Traba) কেটলিতে করে চা নিয়ে এল। ঘরে আমরা তিনজন, আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হল এ ঘরেই আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। শোবার জন্য ঘাসের গদি আর দুটো কম্বল। বাঁশের গ্লাসে চা-পরিবেশন করা হল— তারপর কোন ভূমিকা না করে মঠধ্যক্ষ সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন

—"আমাকে উপহার দেওয়ার জন্য মহামান্য দালাই লামার কোন ছবি এনেছেন?"

—"না, আমাকে দালাই লামার ছবি আনতে নিষেধ করেছে।"

—"ঠিক্ ঠিক্ ছবি যে নেয় সে অপরাধী আর যে দেয় সেও অপরাধী। তা সত্ত্বেও অনেকে আনে, আমরাও গোপনে গ্রহণ করি" তিনি হেসেই বললেন।

—"আপনি কি আমাদের তিব্বত-প্রধান দালাই লামাকে নিজে দেখেছেন?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁর সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎকারের সুযোগ হয়েছিল"

আমার কথা শুনে দুজনেই খুব উৎসাহিত হয়ে বার বার আমার হাত ছুঁয়ে নিজেদের বুকে সেই স্পর্শ দিতে লাগল যেন পরম প্রসাদ দিলাম। তারপর একের পর এক বহু প্রশ্ন। মাননীয় দালাই লামার শরীর কেমন আছে থেকে আরম্ভ করে পরের জন্মে তিনি কি ভারতেই থাকবেন না তিব্বতে ফিরে আসবেন— ইত্যাদি ইত্যাদি, যার উত্তর আমি দিতে অক্ষম। তবে বহু প্রশ্নের উত্তর না পেলেও তিনি আমাকে প্রশ্ন করেই যেন শান্তি পেলেন।

বিকেল বেলা সূর্য্যাস্তের আগেই রাতের খাওয়ার জন্য ভেরী বাজল, আমরা উঠলাম।

রাতের মেনু গম ভাঙা আর চাল মিশিয়ে খিচুড়ি আর তার সাথে মেশানো আলু ও কপির ঘ্যাট— অপূর্ব স্বাদ। খাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা যে যার ঘরে চলে গেল। ইলেকট্রিক এখনও আসেনি তাই পুরনো রীতিই এখনও চলে আসছে। খাওয়ার পর প্রার্থনা, তারপর বিছানা।

মঠধ্যক্ষ মহাশয় আমাকে ছাড়লেন না, অতিথির যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য নিজেই আমার ঘর পর্যন্ত এলেন, তারপর গদির পাশে একটা মোমবাতি ও একটা দেশলাই দিয়ে বললেন—

"আমার অফিস থেকে আপনার জন্য নিয়ে এসেছি। রাতবিরেতে যাতে কোন অসুবিধা না হয়। আর টয়লেটের জন্য মাঠে যাওয়াই ভাল কারণ ছেলেদের টয়লেটগুলো পরিষ্কারই তবে শীতে আর অন্ধকারে আপনার যেতে অসুবিধা হবে, আমরা কিন্তু দালাই লামার আরও অনেক গল্প শুনতে চাই।"

আমি এবার বললাম— "আপনাদের তো অনেক গল্প শোনালাম এবার আমার কিছু জানার আছে দয়া করে যদি উত্তর দেন তাহলে খুব আনন্দিত হব— তবে আমি জোর করবো না, আপনাদের কোন অসুবিধা হলে মৌন থাকলেই আমি বুঝবো আমার প্রশ্নটা ঠিক হয় নি।" আমার কথা শুনে বুঝলাম উভয়েই রাজি, সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলাম

—"গানদেনের এই মঠটা কি আগের মতোই আছে?"

—"না, সে যুগের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। দালাই লামা ও পাঞ্চেন লামার যুগে

এটা ছিল পৃথিবীর অন্যতম বিরাট ধর্ম্ম প্রচার শিক্ষা ও দীক্ষা কেন্দ্র। আগে ছিল পাঁচ-ছ হাজার স্থায়ী বাসিন্দা, আর আজকাল মাত্র চারশ।"

—"চারশ মঠবাসীরা কি আগের মতোই শিক্ষা পাচ্ছে? "

—"না, শিক্ষার পদ্ধতি পাল্‌টে গেছে, আজকাল তাংখা ও মন্ডলা শিল্পর ওপর বেশী জোর দেওয়া হচ্ছে। পুরনো পুস্তকের চীনা অনুবাদে হাত দেওয়া হয়েছে। তর্ক বিদ্যা াাগের মতোই আছে তবে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, আসল লোকেরা সবাই চলে গেছে ভারতে অথবা নেপালে।"

—"এই সব ধর্ম্মপুস্তকগুলো চীনা অনুবাদ হলে তো ভালই হবে, তাহলে চীন দেশের বিরাট সংখ্যক নাগরিকের কাছে তিব্বতের দর্শন বিলিয়ে দেওয়া হবে তাই না?"

আমার প্রশ্নটাকে অনেকক্ষণ ধরে বুঝিয়ে বলতে হল শেষে কাজ দিল। মঠধ্যক্ষ বিজ্ঞের মত মাথাটা নেড়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে বললেন

—"সম্ভব নয়, আমাদের গুহ্য তত্ত্ব অনুবাদ সম্ভব নয়। আমি চীনা ভাষা শিখেছি এই দেখুন কয়েকটা নমুনা দিচ্ছি, ধরুন—

(১) লো-চেন-অস্‌-দ্‌পাই বিজয় ধর্ম্মবীর

(২) ইরতা-ম্‌গ্রিন : পালি ভাষায় হায়গ্রিভা মানে ঘোড়ার গলা বিজয় ধর্ম্মকায়

(৩) আর্দো-আর্জে অস্‌, মহা বজ্র ধর্ম্ম, মহাসরস্বতীর পুরুষ অবতার

এই সব গুহ্য তান্ত্রিক দেব-দেবী আর মন্ত্রের চীনা অনুবাদ হলে ওর মন্ত্রধ্বনী নষ্ট হয়ে যাবে, শুধু তাই না— তিব্বতি ভাষায়, পালি ভাষায় আর সবচেয়ে আদি দেবভাষায় সংস্কৃত মন্ত্র চীনা ভাষায় অনুবাদ হলে তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যাবে।

এই দেখুন না এই মঠে বোমা ফেলার পর মন্দির ও মঠের বহু মূল্যবান তাংখা আর পবিত্র দেওয়াল চিত্র সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বেইজিং সরকার নাম করা বড় বড় শিল্পীদের নিয়ে এসেছে নতুন করে আবার দেওয়াল চিত্র আর তাংখা আঁকার জন্য কিন্তু কিছুতেই প্রাণ দিতে পারছে না, অনুবাদ হলে সেই একই সমস্যা... ।"

আমাদের আলোচনা ভালোই চলছিল কিন্তু দোভাষী ভদ্রলোক এই মঠে থাকেন না, তার বাড়ী পাশের গ্রামে। তার একটা শুয়োর ও মুরগির ফার্ম আছে, সরকারী আর্থিক সাহায্যে ভালই চলছে, অনেক দায়িত্ব, ফিরে যেতে হবে। কাজেই আমাদের আলোচনা থামাতে বাধ্য হলাম— আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে তাকে শুভরাত্রি জানালাম।

মোমবাতি নিভল। এক রহস্যময় স্তব্ধ রজনী আমাকে এনে দিল সেই বহু বছর আগের রিমপোচের সাথে দেখা তিব্বতকে।

পরের দিন সকালে ত্রাবারাই আমার ঘুম ভাঙালো, চা আর বান রুটি নিয়ে এসেছে ব্রেক ফাস্টের জন্য। মঠে এত সুন্দর প্রাতরাশ আশা করি নি— প্রাতঃপ্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করলাম। তারপর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় জানালাম। কথামত জীপ ঠিক সময়ই এল।

অতি সুন্দর পাহাড়ি রাস্তা। এখান থেকে কী-চু উপত্যকার সম্পূর্ণ দৃশ্য মনকে আনন্দে ভরিয়ে দিল। আমাদের বেশীক্ষণ ড্রাইভ করতে হল না পাহাড়ের গায়ে একটা গুহা বেছে নিয়ে ওরা শিবির খাটিয়েছিল আমাকে দেখেই ওরা লাফিয়ে উঠল ঠিক যেন পুরনো বন্ধু। ওরা তৈরি হয়েই ছিল, জীপে উঠল। আবার রাস্তা, আরও পঁয়তাল্লিশ মিনিট ড্রাইভ করার পর আমরা একটা পুরনো মঠে এসে পৌঁছলাম। ভারী আশ্চর্য! অবাক! আরো কাছে এগুতেই সন্দেহ ভাঙল, হ্যাঁ এরা সবাইই সন্ন্যাসিনী। মেয়েদের মঠ দেখবো আশা করিনি। এই অঞ্চলে একটা মেয়েদের বৃদ্ধাশ্রম আছে তাও জানতাম্ না। চীনা সৈন্যরা একাধারে যে ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল তাতে তো সব ঐতিহ্যই বিলুপ্তির কথা শুনেছিলাম— কিন্তু এখন দেখছি ব্যতিক্রম, মঠের নামটা শুনে আরও অবাক লাগল— নাগা মহিলা আশ্রম।

আমরা মঠের শাক্যমুনী মন্দিরে ঢোকবার অনুমতি পেলাম। সরকারী গাইড্ আর গাড়ীতে যারা আসে তাদের অনায়াসেই অনুমতি দেওয়া হয় আর যারা এই অঞ্চলে ট্রেকিং করতে আসে তাদের তো অনুমতি পত্র থাকেই। ব্যক্তিগত ভাবে এলে মঠ ও মন্দির দর্শনে অসুবিধা।

সবশুদ্ধ একাশিজন সন্ন্যাসিনী আছে। শুনে আরও আশ্চর্য লাগল যে এদের মধ্যে প্রায় কুড়ি জন চীনা মহিলাও আছে। তাদের মধ্যে দুজন শিক্ষিকা আর আঠারোজন তিব্বতি দর্শন ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য এসেছে। দুজন শিক্ষিকা কাঠমাণ্ডুতে তিন বছর ধর্ম্ম ও ঐতিহ্য নিয়ে পড়াশোনা করেছে। একটা মন্দিরে তন্ত্রসাধক, কর্ম পদ্ম (Lotus Karma) সিদ্ধপুরুষের মূর্ত্তির পাশেই বিরাট দেওয়াল ঢাকা কমরেড্ মাও-এর তাংখা রাখা হয়েছে। লাসাতে শুনেছি বুদ্ধ পূর্ণিমার পরেই মাও উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

একমাত্র মহিলাদের জন্য, মহিলাদের দ্বারা এই নাগা সন্ন্যাসিনী (কুম্ভ মেলায় নাংগা সন্যাসী, সন্ন্যাসী নয়) মঠ পরিচালিত হয়। তারা আমাদের মন্দির পরিদর্শন করে চা খাওয়ালেন তারপর বিদায়। পরিবেশটা ভাবগম্ভীর, মেয়েদের দেখেই মনে হল— 'হাসতে মানা।'

ওখান থেকে অনতিদূরে আর একটি মহিলাশ্রম নাম "শা" (Sha Nunnery) মহিলা মঠ। এখানে আরও বেশী, একশো তিরিশ জন। অধিকাংশ তিব্বতি কিন্তু পরিচালিকা চীনা। এদের কাজ তিব্বতের বিভিন্ন দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে গ্রাম বাসীদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতন মূলক সরকারী পরিকল্পনার প্রচার করা। যদিও আজকাল চীনা সরকার, চীনা ভাষা ও চীনা প্রধানের যুগ কিন্তু তিব্বতিরা মনে প্রাণে তিব্বতি ধর্ম্ম ও সংস্কারের পক্ষপাতী গ্রামবাসীদের মন থেকে, মঠ-মন্দির-বুদ্ধ দালাই লামা চোরতেন-প্রণাম-প্রদক্ষিণ, দণ্ডি, মন্ত্র ইত্যাদি ভাবধারাগুলোকে কিছুতেই সরাতে পারছে না। জোর, জুলুম, শাস্তি, প্রলোভন, কারাদণ্ড ইত্যাদি জুলুমের সাথে সাথে, নতুন শিক্ষা, সভ্যতা, খাদ্য, স্বাস্থ্য ইত্যাদি হাজারো সরকারী পরিকল্পনা লাসায় কাজ দিচ্ছে কিন্তু গ্রাম অঞ্চলে সরকার

কিছুতেই তাদের চীনাপন্থী করতে পারছে না। তাই আজকাল চীনা সরকার তাদের বাধ্যতামূলক কঠিন পথ ছেড়ে মিশনারী পথ ধরেছে। মঠ, বিহার, আশ্রম, মন্দির ইত্যাদি ধার্ম্মিক সংগঠনগুলোর মাধ্যমে ধীরে ধীরে তিব্বতিদের মধ্যে আরও সহজে চীনা ভাবধারা পৌঁছে দিচ্ছে। শহর থেকে দূরে, সবরকম রাজনৈতিক হাওয়ার বাইরে এই মহিলাশ্রমের বিভিন্ন কাজ আমরা দেখতে পারি নি তবে কথাবার্তায় যতটা বুঝতে পেরেছি তা হচ্ছে এই লামা সন্ন্যাসিনীরা সবাইই সন্ন্যাসী বেশে গ্রাম সেবিকা। স্বীকার করতেই হবে উত্তম পন্থা— বেয়ার ফুট ডক্টরদের কাজই হচ্ছে জীব সেবা। জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

আমাদের সাথে যে দুজন জার্মান মেয়ে ছিল তারা ইচ্ছা করলে ভেতরের কাজ দেখতে পারতো, কিন্তু দোভাষী পুরুষ, মহিলা মঠে তার প্রবেশ নিষেধ। আর দুঃখের বিষয় যে মঠের কোন মহিলাই ইংরাজী জানে না। কাজেই বিদেশিনীরা দল ছেড়ে যেতে রাজি হল না।

নাগা ও শা এই দুই আশ্রম ঘুরে আমরা আবার উত্তরের পথ ধরলাম। অনিন্দ্যসুন্দর শারাপা-চু (Sharapa-Chu) উপত্যকা থেকে আস্তে আস্তে পাহাড়ি রাস্তা ধরলাম। গাড়ী গোঙাতে লাগল, মনে হল আমাদের পিঠে বইতে ওর কষ্ট হচ্ছে। তারপর এক সময় গাড়ী থামল, রাস্তা খুব খারাপ, আমাদের ট্রেকিং করতে হবে। রাস্তাটা খারাপ, কিন্তু দৃশ্যটা অপূর্ব। আমরা যেখানে নামলাম তার নাম চেক্-লা (Chek-La)। চেক পাস উচ্চতায় পাঁচ হাজার মিটার। ট্রেকিং শুরু হল। চলার পথে শুধুই দেখা, কথা কম। ড্রাইভার গাড়ীতেই থেকে গেছে, স্রোংশী আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সে চারদিকের দৃশ্য ও পাহাড়ের বর্ণনা দিতে লাগল। আমরা আরও আধঘন্টা পাহাড়ি পাথুরে পথ পেরিয়ে একটা পাহাড়ি পাঁচিলের মোড় ফিরতেই আরও চমৎকার দৃশ্য দেখতে পেলাম, এই উপত্যকার নাম মিগ্গি (Miggi)। দূরে পাহাড়ের গায়ে আটকানো একটা বাড়ী দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কি অদ্ভুত, ওই উঁচুতে আর এই দুর্গম স্থলে কে, কারা, কিভাবে ওই বাড়ীটা তৈরি করল? স্রোংশী আমাদের প্রশ্নের জবাব দিল—

ওইটা হচ্ছে রেটিং গ্রাম (Reting), আর বড় বাড়ীটা হচ্ছে সামদ্রুপ মহিলা মঠ (Samdrup Nunnery)। সবাই বলে সামদ্রুপ লিং। এই অঞ্চলে এটি তিন নম্বর মহিলা মঠ। এই মঠটির চারদিকে চারটে পাহাড়, ওই পাহাড়গুলোই এই মঠের রক্ষক তার মানে চারজন পর্ব্বত দেব এই সামদ্রুপ লিং মঠকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে আজ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছে। এই অঞ্চলে পর পর তিনটি মহিলা আশ্রম বহু বছর যাবৎ তাদের প্রার্থনা, ধ্যান আর তাংখা শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

পাহাড়ে এটাই অদ্ভুত দেখে দূরত্ব বোঝা যায় না। আমরা আরও দেড়ঘন্টা হাঁটার পর ক্লান্ত হয়ে এসে পৌঁছলাম সামদ্রুপ লিং মহিলা আশ্রমে। তাদের হাসিমুখ, প্রার্থনার শব্দ আর 'নমস্তে' আমাদের ক্লান্তি দূর করে দিল। আশ্রমের মূল মন্দিরের সামনে আমাদের

জন্য বিছিয়ে দেওয়া হল একটা ভারী সতরঞ্চি। এখানকার পরিবেশ, আর মূল মন্দিরের গঠন আমাদের মুগ্ধ করে দিল। চোরতেন প্রদক্ষিণ আর অসংখ্য প্রার্থনা চক্র ঘুরিয়ে আমি মন্দিরে প্রবেশ করলাম। সামনে বিরাট শাক্যমুনীর 'বজ্রপাণি মূর্ত্তি'। জার্ম্মান অভিযাত্রীরা সবাই সতরঞ্চির ওপর বসে বিশ্রাম করছে আর আমি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম তিব্বতের এই রহস্যময় মহিলা আশ্রমের বিভিন্ন মন্দির আর তাদের বর্ণাঢ্য দেওয়াল চিত্রগুলো। দেখে মনে হয় এখানে চীনা সাংস্কৃতিক বাহিনীর বোমা বর্ষণ হয় নি। আমাদের বসিয়ে 'নমস্তে' বলেই ব্রহ্মচারিণীরা বিদায় নিল।

মঠের পাশেই গ্রাম। আমরা মঠে আধঘন্টা বসে ও মঠ প্রদক্ষিণ করে গ্রামের একটা চায়ের দোকানে বসলাম। আমাদের জন্য অর্ডার দেওয়া হল চা আর আলু-কপি ভাজা। হোটেলের মালিক খাঁটি তিব্বতি, চেহারায়, পোষাকে আর ব্যবহারেই বোঝা গেল যে লাসার থেকে খুব দূরে না থাকলেও এদের মধ্যে এখনও চীনা টুপী চালু হয় নি। এই হোটেলের রান্নাঘরেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে তবে অভিযাত্রী বন্ধুরা বাইরে শিবির খাটাবে।

এই প্রথম একটি মঠ ও একটি গ্রাম দেখছি যেখানে কোন চীনা নেই দেখে আনন্দ লাগল। পাহাড়ের ওপর আর অচেনা ও অনুন্নত মঠ বলেই সম্পূর্ণ চীনা হাল চাল থেকে এরা দূরে সরে আছে।

পরের দিন আবার হাঁটা। চেক্ লা পাসে (Chek-La Pass) এসে আবার গাড়ীতে উঠলাম। আমরা এখন নীয়েচেন তাংলা (Nyechen Tanglha) পর্ব্বত শ্রেণীর ওপর দিয়ে যাচ্ছি, এই সব পর্ব্বতশৃঙ্গের উচ্চতা সাত হাজার মিটারের (7000 m) বেশী, তবে আমাদের অত ওপরে ওঠার প্রয়োজন নেই রাস্তার অভাব। আমরা পার হলাম লাচেন (Lhachen La) পাস, উচ্চতা (৫১৫০)পাঁচ হাজার একশো পঞ্চাশ মিটার। রাস্তাটা সত্যিই খারাপ কিন্তু দৃশ্যটা মনকে তুলে দেয় উঁচুতে। লাসেন পাস্ পার হতেই সামনে চোখে পড়ল একটা বিরাট লেক স্বচ্ছ নীল জল নামৎসো লেক (Namtso Lake)। শান্ত পবিত্র আর সুন্দর। আমাদের সব কথাই বন্ধ হয়ে গেল, গাইড বা দোভাষীর কোন ভাষাই এই সুন্দরকে ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করতে পারবে না— অনেকক্ষণ নয়নভরে দেখলাম আমাদের প্রত্যেকটি দেহকোষ আনন্দে ভরে উঠল। তারপর আপনা থেকেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা কথা, এটাই তো তিব্বত, এর জন্যই তো আসা!

চীনা আক্রমণ, নীতির পরিবর্ত্তন, রাজনৈতিক ঝড় রক্তপাত— এ সবই জাগতিক, নামৎসোর এই দৃশ্য এই পবিত্র রূপ সব কিছুর উর্দ্ধে। তিব্বতের সামাজিক পরিবর্ত্তন মঠমন্দির ধ্বংস— সব কিছু ছাড়িয়ে এক উর্দ্ধ জগতের মহিমা নিয়ে ধ্যান মগ্ন হয়ে বসে আছেন প্রকৃতি দেবী, কোন মানুষ কোন দিনই এর পবিত্রতা হরণ করতে পারবে না।

"ওই যে দেখছেন লেকের মধ্যে ঢুকে গেছে ছোট্ট একটা ভূ-খণ্ড, দ্বীপের মত ওই

জায়গাটার নাম তাসি দোরজে দ্বীপ (Island of Tashi Dorje), চারপাশে ঘেরা পাহাড়গুলো নীয়েচেন তোংলা পর্ব্বতমালা (Chain of Nyechen Tonglha Mountain)।

—"লেকের ধারে কোন মঠ বা চোরতেন আছে কি?" প্রশ্ন করলাম

—"না, অন্ততঃত আমার জানা নেই তবে ওই দ্বীপে যাবার পথে ডান দিকে পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলো গুহা আছে, তারই কাছে একটা ছোট্ট মঠ আছে। শুনেছি আগে মুনী ঋষিরা এখানে এসে সাধনা করতো। এখন সব পরিত্যক্ত, তবে এখানকার রঙবেরঙের পাখী বিশেষ করে সাইবেরিয়ার হাঁসে লেক ভর্ত্তি, এত দূর থেকে দেখা যাবে না, কাছে গেলে দেখা যাবে। চলুন আমরা ওই তাসি দোরজে দ্বীপ পর্যন্ত ট্রেকিং করবো, যাতায়াতে সময় লাগবে প্রায় চারঘন্টা।"

সঙ্গীরা লাফিয়ে উঠল, এর জন্যেই তো আসা, হাঁটা হবে, দেখা হবে ফটো তোলা যাবে। সবাই মালপত্র নিয়ে তৈরি হয়ে পড়ল ট্রেকিং-এর জন্য। আমি এই সুন্দর দৃশ্যটাকে হারাতে চাই না। আবার কবে আসবো, অথবা আদৌ আসবো কি না কে জানে। তাই যতক্ষণ পারি এই দৃশ্যকে প্রতিটি অনুপরমাণু দিয়ে অনুভবের দরজা দিয়ে অন্তরে ধরে রাখবো।

জানিয়ে দিলাম —"আমি আর নীচে নামছি না।"

—"কেন এত সুন্দর ট্রেকিং"

—"ঠিক তবে নীচে নামলে ওপরের এই দৃশ্যপটকে হারাবো, আমি এখানে ঘোরাফেরা করবো, তারপর গাড়ীর কাছে চলে যাবো, চিন্তা করো না।"

সবাই রাজি, ওরা চলে গেল লেকের দিকে। আমি একটা সুন্দর জায়গা বেছে নিয়ে তাকিয়ে রইলাম সেই অনন্ত সুন্দরের দিকে। কৈলাসের মানস সরোবর, সাম্‌দিং-এর সরোবর ওদের থেকেও এর সৌন্দর্য্য অনেকগুণ বেশী।

এখানে কোন তীর্থযাত্রী চোখে পড়ে না, চীনা সৈন্যবাহিনীর ট্রাকের শব্দ নেই, আশে পাশে কোন লোক বসতিও চোখে পড়ে না, অখণ্ড নীরবতা। মাঝে মাঝে বাতাসের পাথর ঘেসা শব্দ তানপুরার মত নেপথ্যে সুর এনে দিচ্ছে। অদ্ভুত অনুভূতি। বুঝলাম তিব্বতের সেই রহস্য-দর্শন আজও বিদ্যমান, শুধু স্থান বদলেছে।

আনন্দময় মুহূর্তগুলো খুব তাড়াতাড়ি কেটে যায়— এই পরিবেশে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। সূর্যদেব মাথার ওপর দিয়ে একটু হেলে পড়েছেন এমন সময় লোকজনের কথাবার্তা কানে এল বুঝলাম ওরা ফিরে এসেছে।

হাঁফাতে হাঁফাতে ওরা আমার কাছে এসে বসে পড়ল— তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল—

—"তুমি একটা বিরাট জিনিস হারিয়েছো— এই ট্রেকিংটা অ্যাডভেঞ্চারে ভর্ত্তি, তার সঙ্গে রয়েছে প্রকৃতি শিক্ষা আর অজস্র বুনো হাঁসের চ্যাচামেচি, আমরা আবার আসবো কয়েকদিনের জন্য। উপযুক্ত খাবার থাকলে আমরা আজই থেকে যেতাম ..."

আবার গাড়ী— এবার এখান থেকে পশ্চিমের পাহাড় ধরে লাসার পথ, যাবার

পথেই একটা চটিতে খাওয়ার বন্দোবস্ত। ওখানকার শান্ত ও অনিন্দ্যসুন্দর পরিবেশ ছেড়ে কারোরই যেতে ইচ্ছা করছিল না, কিন্তু উপায় নেই।

গাড়ী ছাড়ল। পাহাড়ি দৃশ্য— এখানকার সবচেয়ে আকর্ষণীয় হচ্ছে দূরের বরফে ঢাকা পাহাড়ি দৃশ্য। এবার গাড়ী ঘুরল— পাহাড়ের দেওয়াল ধরে আস্তে আস্তে চলতে হচ্ছে, কোন কোন সময় পিছনের চাকায় ঘুর খেয়ে রাস্তার পাঁচিলের পাথর ধ্বসে পড়ছে নীচে— কয়েকশ মিটার নীচে, জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে চলছি। সন্ধ্যার আগেই আমরা একটা চটিতে এসে থামলাম। সাথেই একটা ছোট্ট গ্রাম। গাড়ীর আওয়াজে গ্রামের লোকেরা ছুটে এল। আমাদের চারদিকে ভীড় করে দাঁড়াল।

"কি চাই?" — "কিছু না, আপনাদের দেখছি।"

আমি আর ড্রাইভার মোটেই ক্লান্ত নই, কিন্তু সঙ্গীরা সবাইই কাবু। রাতের জন্য তৈরী হল— ছাতু ডালিয়া আলুসেদ্ধ আর মাংসের স্যুপ, শুয়োরের মাংস।

বহু বছর আগে তিব্বতের যে মানুষগুলোকে দেখেছিলাম তারাই যেন নতুন জন্ম নিয়ে এখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল, কোনো কথা নয় ওরা বসে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছে আর শুনছে আমাদের কথার শব্দ।

আমাদের জন্য দুটো ঘর, ওদের ক্যাম্পিং করার কথা ছিল কিন্তু আজকের এই উচ্চতায় ঠাণ্ডাটাও বেশী তাই ঘরেই থেকে গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্য সারা রাত্রি গ্রামের কুকুরগুলো গাড়ীটার চারপাশে ঘুরে ফিরে ঘেউ ঘেউ করছিল, কারুরই ভাল ঘুম হয় নি। ভোর বেলা চ্যাং খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম। পরের দিন আবার লাসার পথ। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আবার পাহাড়ি পথ।

আমরা দুপুরে আবার লাসায় ফিরে এলাম। মনে হল অনেকদিন পর শহরে এলাম। হোটেলে ঢুকে জানলার ধারে ইজি চেয়ারটায় বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম— শা রেইটিং, সাম্‌দ্রুপ লিং, নাম্‌ৎসো হ্রদ আর নীয়েচেন পর্ব্বতমালা দেখে এলাম। তিব্বতের ওপর রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় আসা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক দৃশ্য আর রহস্যময় পাহাড় উপত্যকা ধরে রেখেছে তিব্বতি ঐতিহ্য আর তিব্বতের বৈশিষ্ট্য। যারা আসতে চান তাদের বলবো—

"আসুন, চীনা সরকারের ওপর অভিমান করে তিব্বতিদের দূরে সরিয়ে রাখবেন না, বিদেশীদের যাতায়াতের ওপরই নির্ভর করছে তিব্বতি ধর্ম্ম সংস্কৃতি রক্ষা আর মঠ ও বৌদ্ধবিহারের পুনর্গঠন।"

আজ যদিও ট্যুরিস্টদের জন্য বহু মন্দির ও বিহার নতুন করে মেরামত করছে, কাল হয়তো সেই সব মন্দির ও মঠে ট্যুরিস্টরা দেখতে চাইবে সত্যিকারের ধর্ম্ম ও ঐতিহ্য। বর্তমানে বহির্জগতের সঙ্গে তিব্বতিদের যোগাযোগের মাধ্যম একমাত্র ট্যুরিস্ট— তিব্বতিরা চায় বাইরের সাহায্য প্রেরণা, তাদের জন্যই প্রয়োজন অসংখ্য তিব্বত যাত্রী। একবার যখন শুরু হয়েছে যাতায়াত সে পথেই আসবে হয়তো মুক্তির বাণী।

আমি লাসায় আরও দুদিন থেকে তারপর স্থল পথেই ফিরে এলাম কাঠমাণ্ডু। আসার পথ ছিল : লাসা, সামডিং, গীয়ান্‌ট্‌সে, শীগাৎসে, ফিনসোলিং, শেগার, রংবুক, টিংরি, কাসা কাঠমাণ্ডু। লাসা থেকে কাঠমাণ্ডু জীপে করে এবং কয়েকবার ট্রেকিং করে আমাদের লেগেছিল দশদিন।

⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘

বিভিন্ন পত্রিকায় বর্তমান তিব্বতের ওপর আমার বহু লেখা পাঠকমহলে পরিচিত, তা সত্ত্বেও পাঠকদের একান্ত অনুরোধে এই অংশটি মূল পুস্তক— মহাতীর্থের শেষ যাত্রীর শেষ অধ্যায়ে সংযোজিত হল।

অনুক্রমণী

আনচু	৬
এচেগুম্ফা	১৩
মানসিক গঠন প্রক্রিয়া ঃ	
প্রথম " " "	১৬
দ্বিতীয় " " "	১৯
তৃতীয় " " "	২০
ধ্যান	২২
দীক্ষা	২৩
তিব্বতী পোষাক	২৭
নাথু-লা	৩০
প্রথম তিব্বতী গ্রাম	৩৩
প্রথম তল্লাসী	৩২
তিব্বতী চা	৩৪
প্রথম তিব্বতী শহর	৩৬
দুষ্ট তিব্বতী	৩৯
ইদম্	৪৩
থুক্-মা	৪৫
তিব্বতে জাতিভেদ	৪৫
চোমলহরি	
চোরতেন-চৈত	৫০
কাংগীউর	৫২
তাংগীউর	৫৩
উপকারী বন্ধু	৫৯
শীতের কষ্ট	৬৩
তাং-লা	৬৫
সামাদা	৬৬
তিব্বতী বিবাহ উৎসবে অতিথি	৬৭
যবযুং	৭২
জিগ্-তেন্-বাং-ফিউগ-গসার্গ্-গ্রুব	৭২
বজ্রহুংকার মুদ্রা	৭২
পদ্মসম্ভবা	৯০
প্রথম অঞ্জলী	৯০
ত্রি-স্রোন-দে-সান্	৯১
বুদ্ধের তিন রূপ	৯১
প্রথম স্নান	৯৩
দ্বিতীয় তল্লাসী	৯৭
খাম্‌পো	৯৮
সূর্য প্রণাম	১০১
কুম-বুম	১০২
থেরেপা লামা	১০৯
সবুজ তারা ও সাদা তারা	১১১
সবুজ তারার রূপ	১১২
প্রার্থনা	১১৪
মহাকাল	১১৭
গোব্‌শি	১২০
রালুং	১২২
নোজিন-কাং-সাং	১২৫
কারো-লা	১২৮
আবার সাধুবাবা	১৩০
নাগারৎসে	১৩১
দোরজে-পামো	১৩২
যমদ্রোক সরোবর	১৩৩
খাম্‌বা-লা	১৩৯
দ্বিতীয় স্নান	১৪৪
সাংপো ফেরী	১৪৬
দ্বিতীয় অঞ্জলী	১৫২
তিব্বতী মহাবিদ্যালয়	১৫৬

অবলোকিতেশ্বর	১৫৭
স্রোং-স্রান্-গাম্পো	১৬৫
অকসোভ্যবুদ্ধ	১৬৫
লিপিদত্ত	১৬৬
কানজুর ও তানজুর	১৬৬
থ্রি-স্রোন-ইদে-সান	১৬৬
পদ্ম-সম্ভবা	১৬৭
ইয়ে-সেস্-অদ্	১৬৮
তিব্বতী সম্প্রদায়	১৬৮
হ্লা-সা	১৭৩
শাক্য-মুনি	১৭৩
মায়ের কোলে	১৭৯
চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়	১৯৩
নামগীয়েত্রাচাং	১৯৪
মন্-লাম্ উৎসব	১৯৫
লামা লামদুপের উপদেশ	২০১
রাতের দিশারী	২৪৩
সীগৎসের দাদু	২৫৪
গ্রামবাসীদের সাথে	২৬২
পথিকের উপলব্ধি	২৬৪
যমন্তক	২৭০
ধ্যান	২৭০
মণ্ডলা	২৭২
তিব্বতী তন্ত্রের রূপ ও.বিন্যাস	২৭৪
পুষ্প-ধূপ-দীপ	২৭৫
তিব্বতী তন্ত্রে ডাকিনী ও তাদের স্থান	২৭৬
সাগরমুখী প্রবাহিনী রূপ জীবন	২৭৮
রাতের সন্ন্যাসী	২৮২
ত্রাদুমের গেশে রেপতেন	২৮৫
চ্যাং-ত্যাং-মরুভূমি	২৮৮
খুঁজে ফিরি তারে	২৮৮
থোকচেন	২৯২
পাহাড়-দর্শণ	২৯৩
তাসামের বাজার ও দাবাখানা	২৯৪
পথের কষ্ট	২৯৭
প্রথম মানস দর্শন	৩০০
লাং-বোনা-গুম্ফা	৩০৬
অন্তর্যামী	৩০৭
ছাম তপস্যা	৩১৩
দিরাফুক গুম্ফার অধ্যক্ষ	৩২৩
ইয়েলাক্জুং	৩২৫
দোলমা লা	৩২৫
গৌরীকুণ্ডে অভিজ্ঞতা	৩২৬
জুথুলফুক গুম্ফা	৩২৭
পারখায় কৈলাসবাবা	৩২৯
গঙ্গা চুতে	৩৩২
গোসুল গুম্ফা	৩৩৩
বিদায় কৈলাসখণ্ড	৩৩৬
শুসুপ্ত	৩৩৭
গুরলা-লা	৩৩৮
পুরাং, শিমবিলিং গুম্ফা, তাকলাকোট	৩৩৯
লিপুলেক	৩৪৩

এক নজরে বিভিন্ন স্থানের উচ্চতা

কৈলাসনাথ	২২০২৮ ফিট
দোলমা-লা (পাস)	১৮৬০০ "
লিপু-লেক্	১৭৮৯০ "
গুরলা-লা (পাস)	১৬২০০ "
কারো-লা (পাস)	১৬০০০ "
থোক চেন	১৫৭০০ "
রাম ও কাল সরোবর	১৫৩০০ "
তারচেন	১৫১০০ "
কারিজোং	১৫০০০ "
মানস সরোবর	১৪৯৫০ "
শিম্‌বিলিং গুম্ফা ও তাক্‌লাকোট	১৩৯০০ "
লাসা	১২৩০০ "
নৈনিতাল	৫০০০ "
ইয়াটুং	৯৭০০ "
শাম্ সাং	১২২০০ "
নাথু-লা (পাস)	১৪০০০ "
ফারি	১৪৭০০ "
রাক্ষস সরোবর	১৪৯০০ "
যমদ্রোক সরোবর	১৫০০০ "
তাং-লা (পাস)	১৫৬০০ "
খাম্বা-লা (পাস)	১৫৮০০ "
দিরাফুক্ গুম্ফা	১৬২০০ "
চোমল হরি	২৩৯৯৩ "
নোজিন-কাং-সাং	২৪০০০ "
গুরলা মান্ধাতা	২৫৩৫৫ "

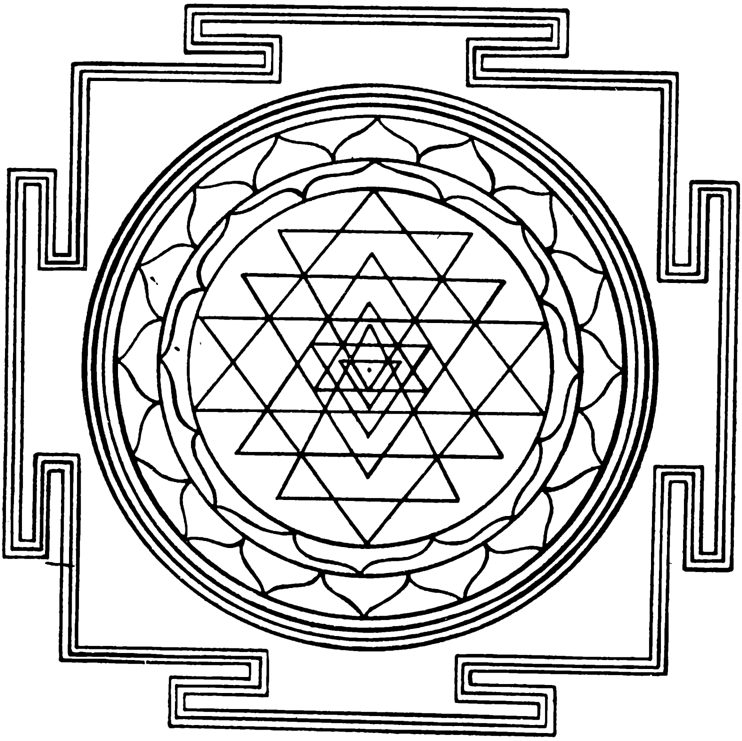

শ্রী যন্ত্র

ধ্যান ধারণার মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে যেতে হবে শুদ্ধ অনুভূতির পথে। জীবের সৃষ্টি রহস্য না জানলে সে পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। তাই তিব্বতের তন্ত্রশাস্ত্রে মনকে সংযত ও প্রস্তুত করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র। যন্ত্র হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের আল্পনার মত চিত্রাঙ্কন। ভূমিতে, দেয়ালে, চাদর বা কাপড়ের ওপর তার ছবি এঁকে তার মাধ্যমে বিক্ষিপ্ত মণকে একাগ্র অবস্থায় আনা হয়। তারপর সেই অবস্থার থেকেই শুরু হয় তপস্যা। যন্ত্র আবার মন্দির স্থাপন ও শান্তি সংস্থাপন এর জন্যও ব্যবহৃত হয়।

জগৎ সৃষ্টির মূলেই রয়েছে বিন্দু, এই বিন্দু থেকেই সৃষ্টি হয়েছে যোনী এবং যোনী থেকে জগৎ। বিন্দুই সর্ব শক্তির মূল কারণ। আবার এই রিন্দু থেকেই সৃষ্টি হয়েছে গতি।

শ্রী যন্ত্র লামাদের কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্র। শ্রী যন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে বিন্দু আর তাকে ত্রিভূজাকৃতিতে ঘিরে রয়েছে যোনী, বিন্দুর রং সাদা এবং যোনীর রং লাল।

থ-লা থেকে চোমলহরির দুটি দৃশ্য

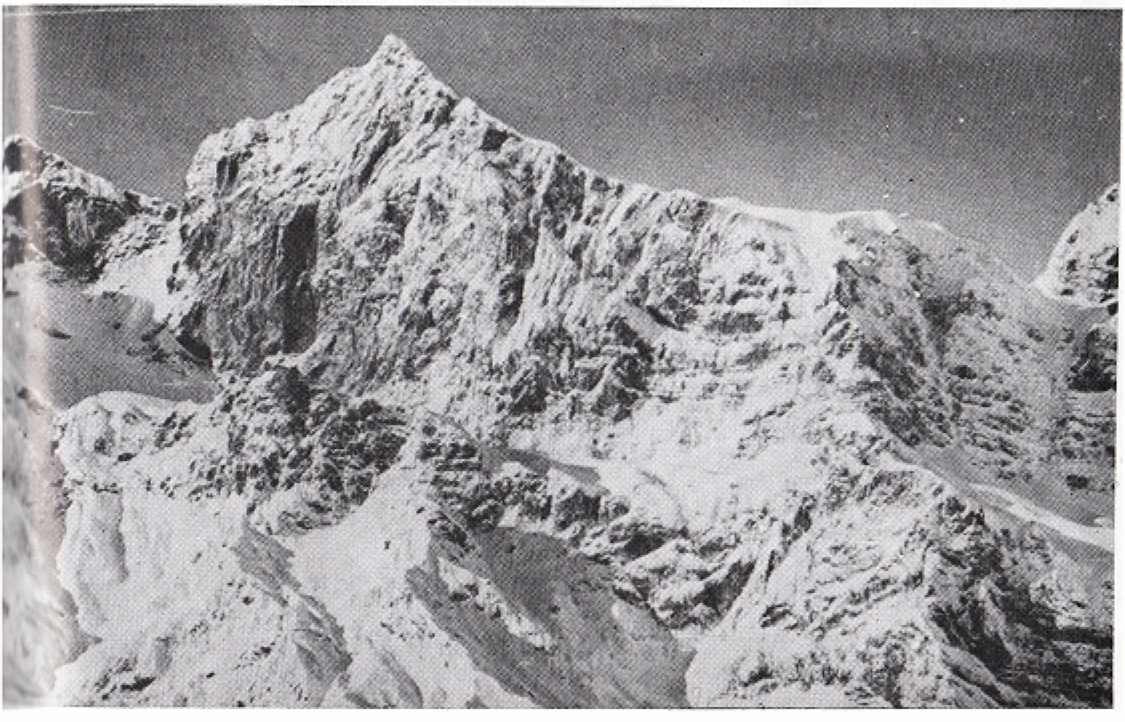

একটি প্রার্থনা চক্র

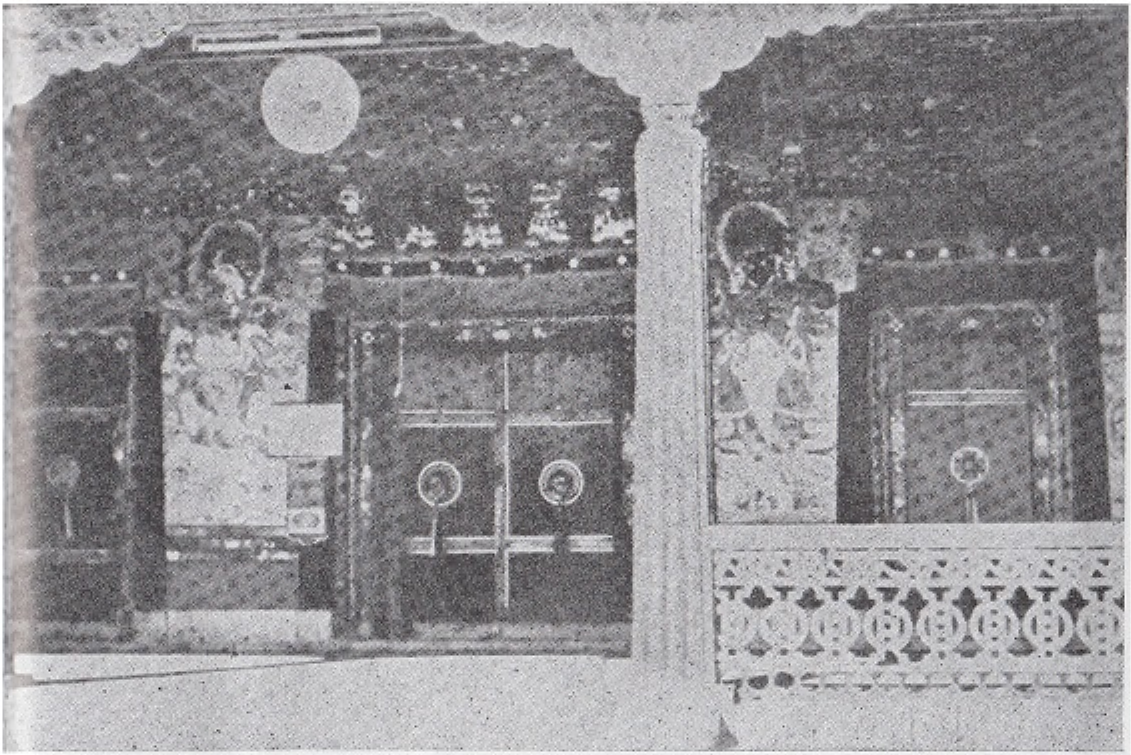

পোতালা প্রাসাদের একটি আভ্যন্তরীণ দৃশ্য

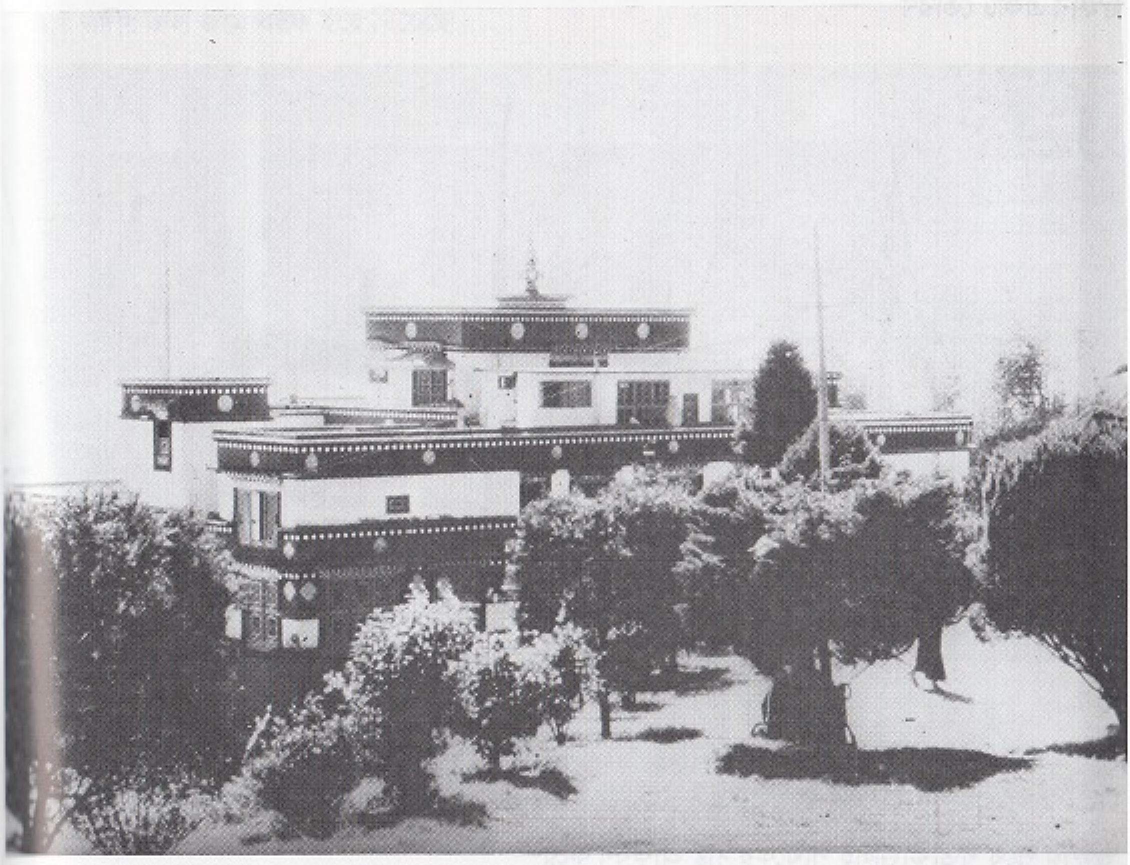

নরবুলিংকা—দালাই লামার গ্রীষ্মাবাস

গুম্ফার একটি তোরণ

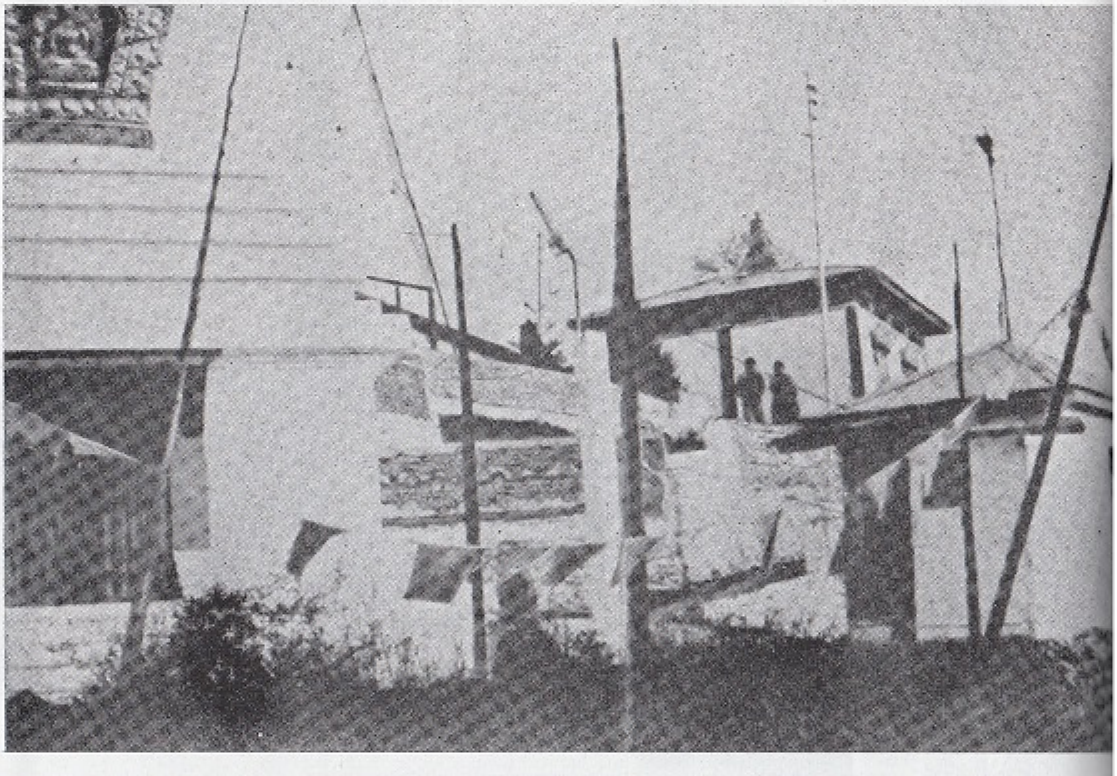

গুম্ফার পথে পতাকাগুলিই পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—
দেওয়ালে রয়েছে তিব্বতি হরফে মণিমন্ত্র

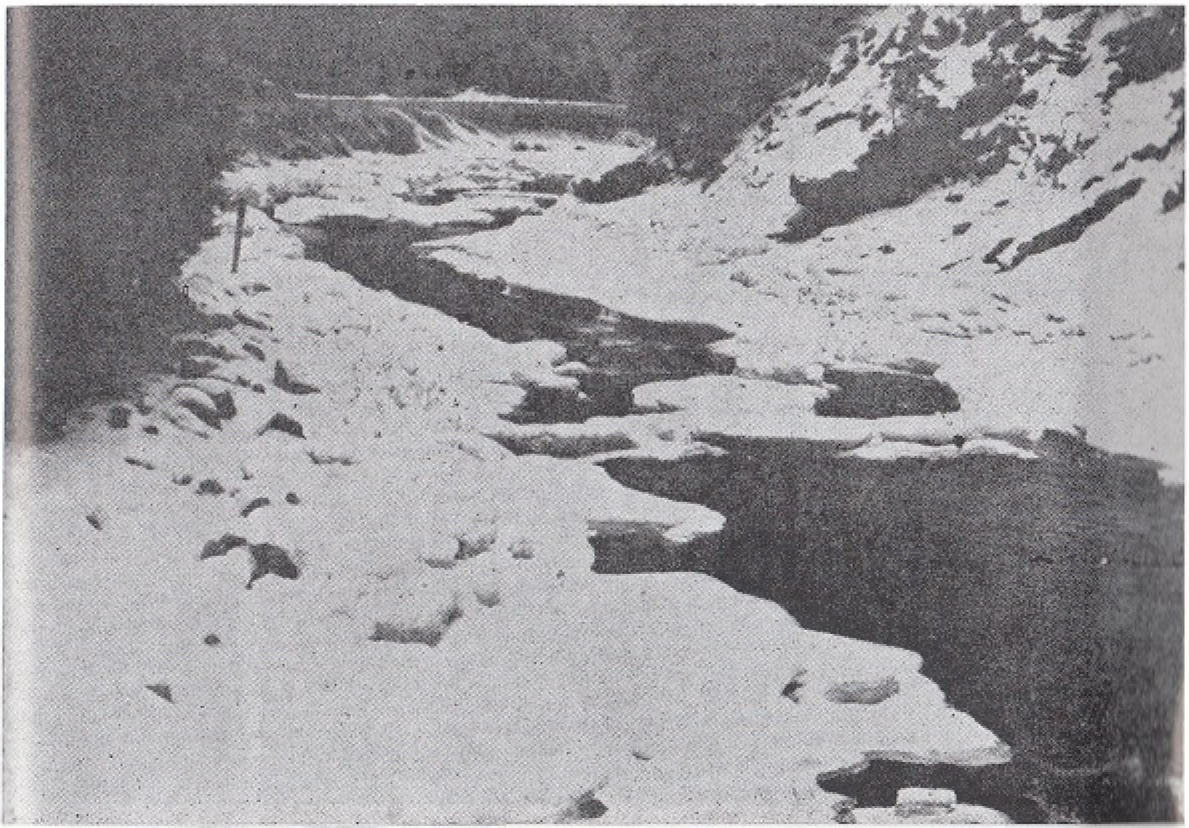

ঠান্ডায় নদীর জল জমে বরফ হয়ে গিয়েছে

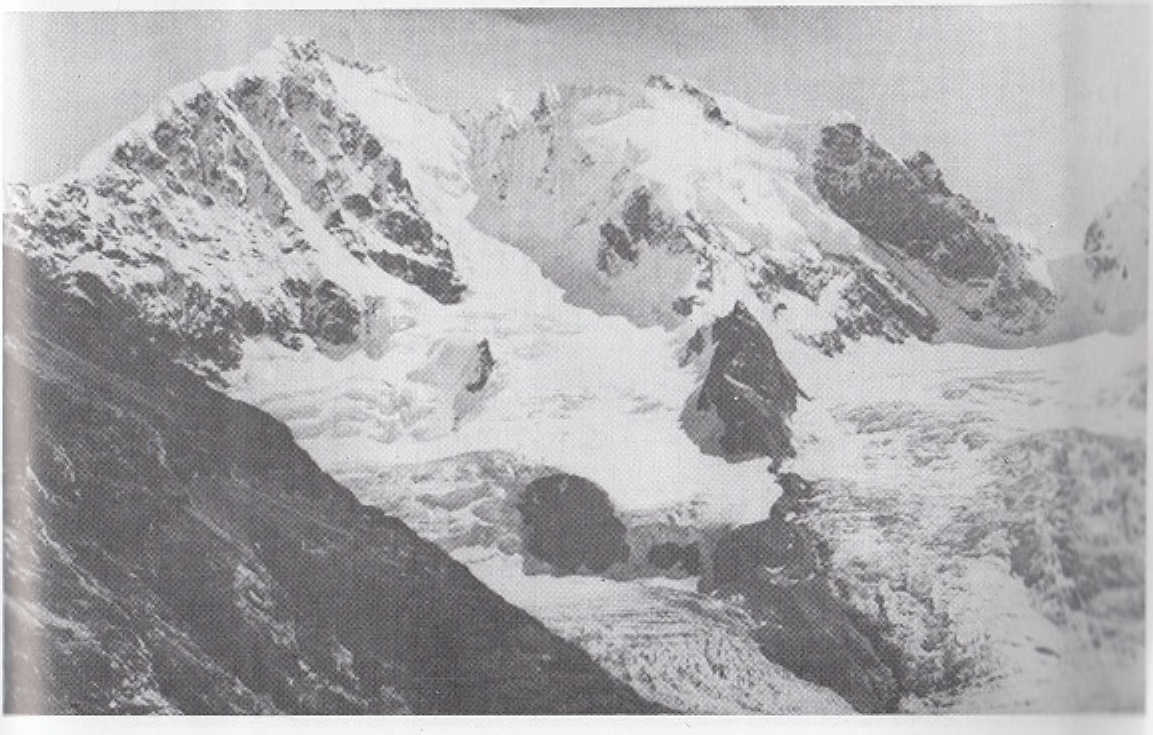

''সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্''—বরফে ঢাকা হিমালয়ের একটি দৃশ্য

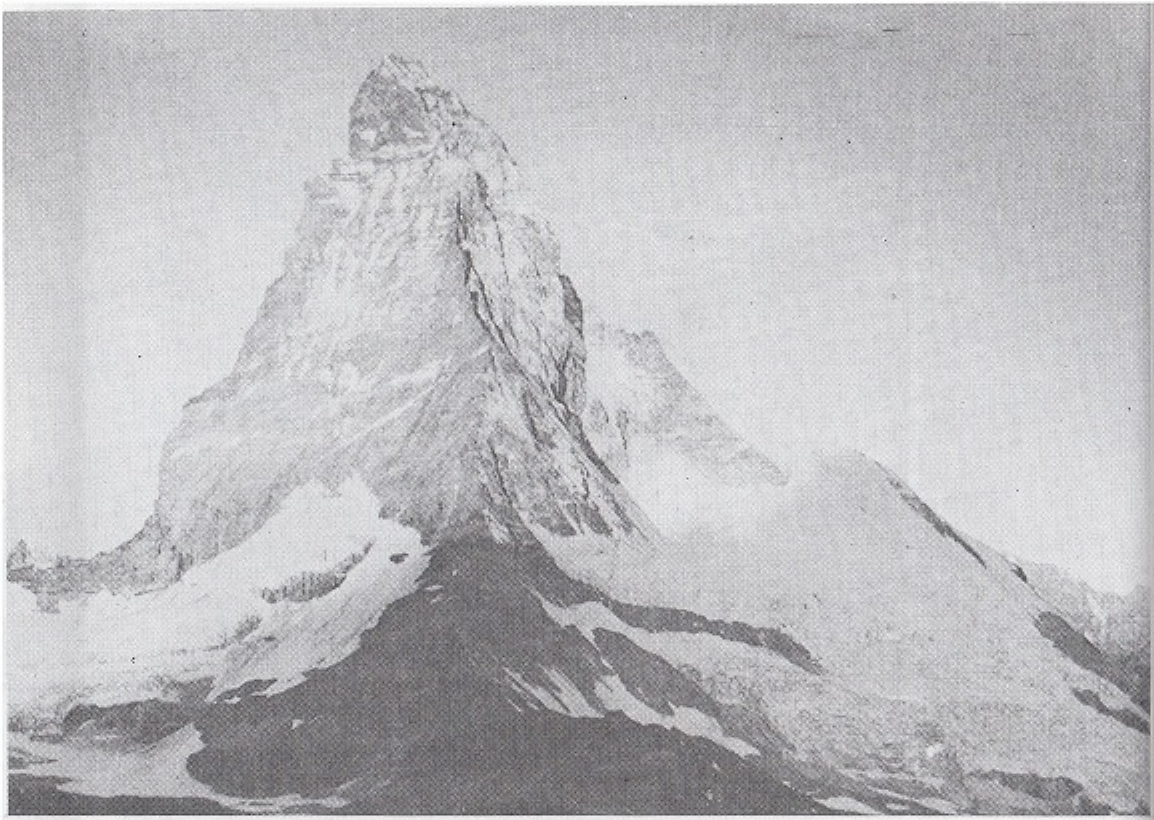

"অব্যক্ত যেখানে ব্যক্ত হয়েছে"—বরফে ঢাকা হিমালয়ের একটি দৃশ্য

দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর সেই ব্রহ্মপুত্রের ধারে দাঁড়িয়ে লেখক—কামাখ্যা শিবানন্দ আশ্রম

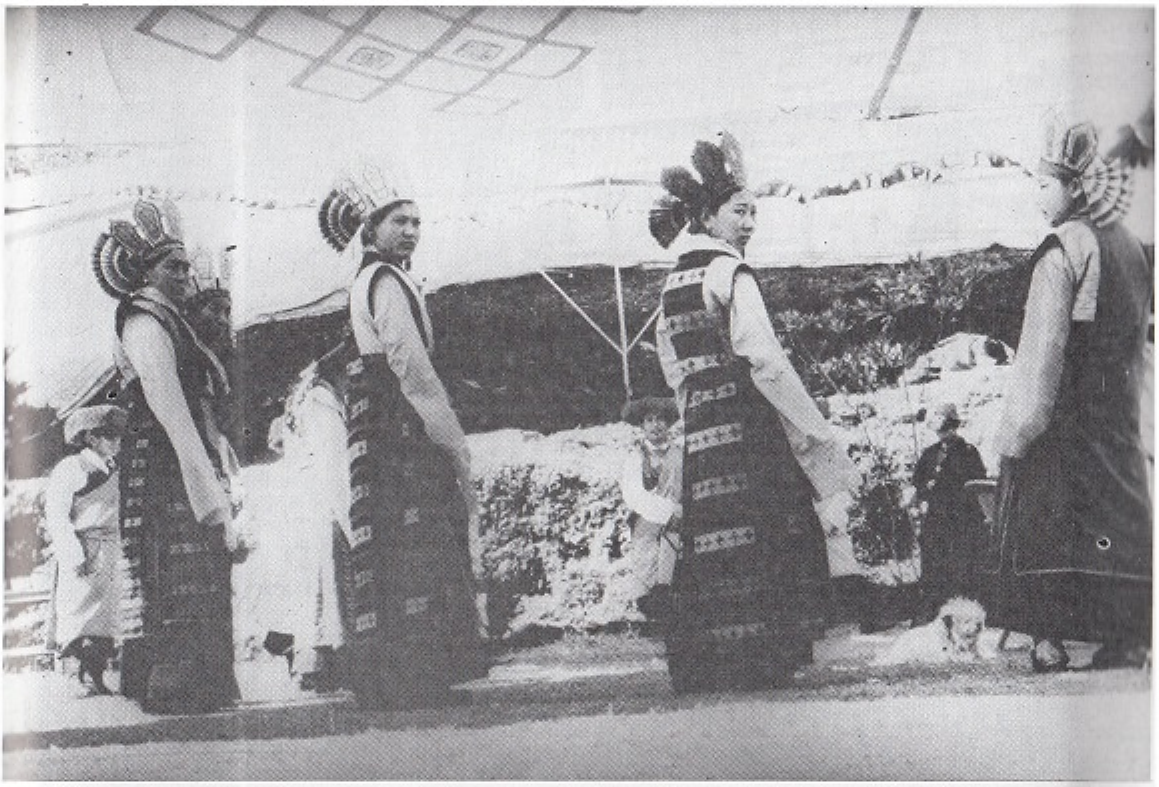

লোকনৃত্যের বেশে কয়েকটি তিব্বতী যুবতী

গ্রামবাসীরা রোদ পোয়াচ্ছে

একটি তিব্বতী গুম্ফা

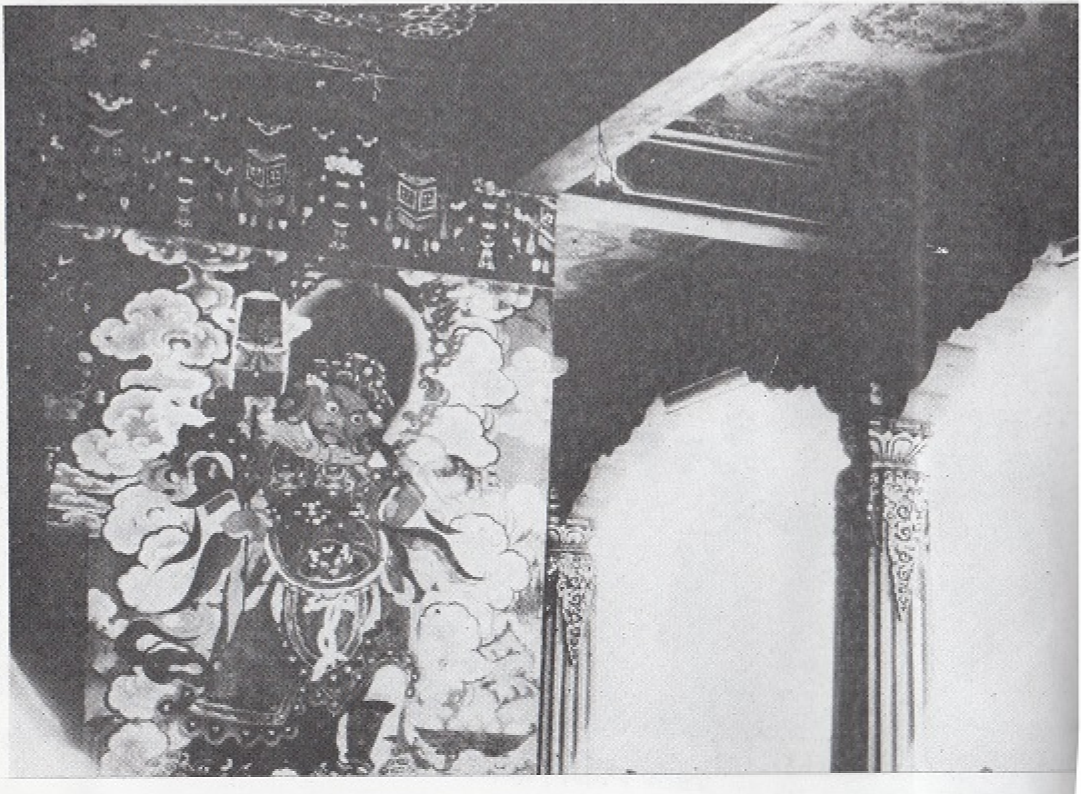

দেওয়ালে সূক্ষ্ম কাজের নমুনা

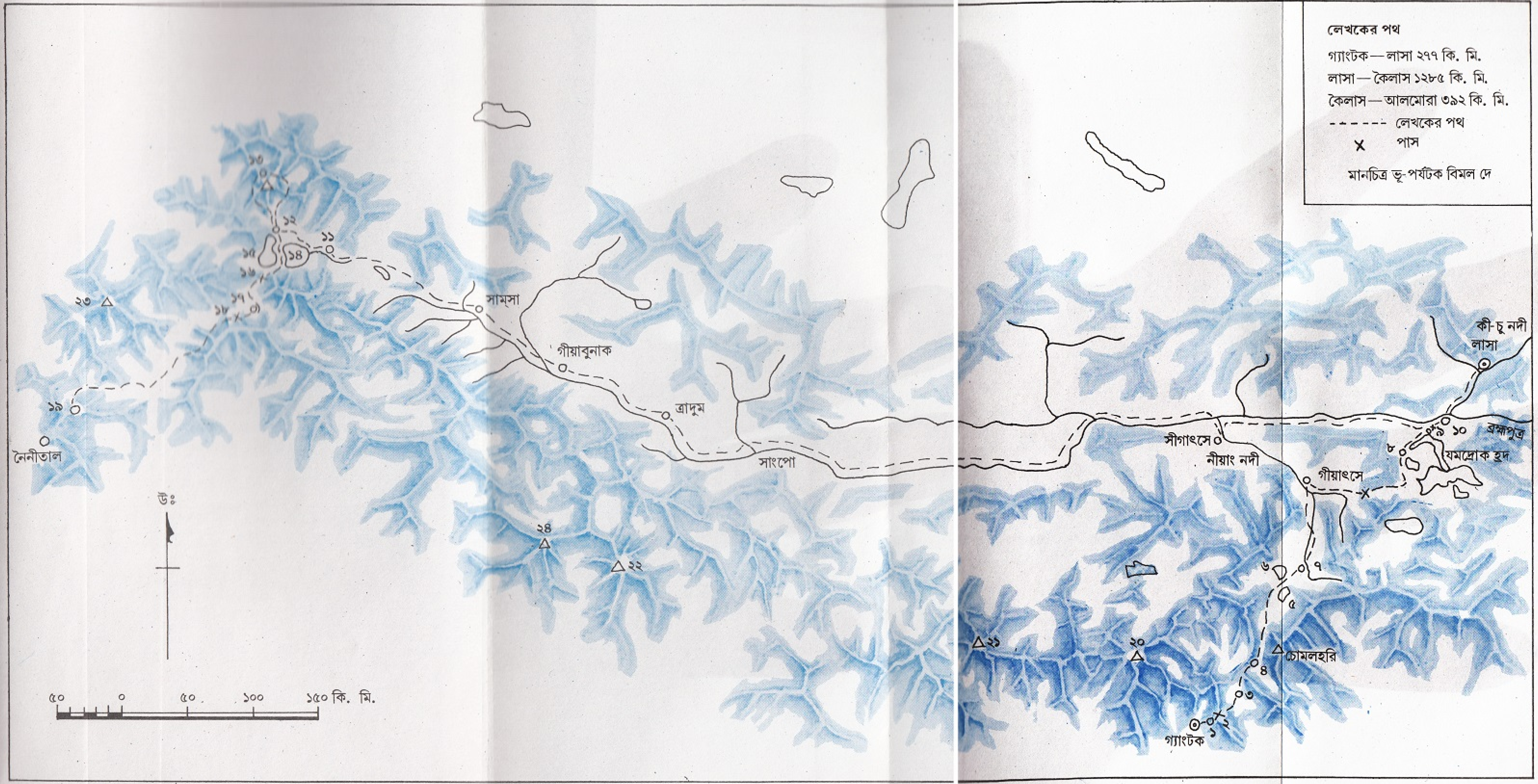

১. চেংগু, ২. নাথু-লা, ৩. ইয়াটুং, ৪. ফারি, ৫. রামহ্রদ, ৬. কালহ্রদ, ৭. সামাদা, ৮. নাগারৎসে, ৯. সামদিং, ১০. চুসুল, ১১. লাংবোনা গুম্ফা, ১২. পারখা, ১৩. দিরাফুক গুম্ফা, ১৪. মানস সরোবর,
১৫. রাক্ষসতাল, ১৬. গুরলা-লা ১৭. তাকলাকোট, ১৮. লিপুলেক, ১৯. আলমোড়া, ২০. কাঞ্চনজঙ্ঘা, ২১. এভারেষ্ট, ২২. অন্নপূর্ণা, ২৩. নন্দাদেবী, ২৪. ধৌলাগিরি

১৯৫৬ সালে, বিদেশীদের জন্য তিব্বতের দরজা তখন প্রায় বন্ধ, রাজনৈতিক কারণে ভারতের সঙ্গে তিব্বতের সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন, সেই সময় কোন রকম প্রস্তুতি না নিয়েই একদল নেপালী তীর্থযাত্রীর সাথে বিমল দে বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে যান সুদূর লাসায়। তাঁর বয়েস তখন মাত্র পনের। যাত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন নবীন মৌনী-বাবা, তারপর লাসা থেকে সেই দল ছেড়ে যান কৈলাসখণ্ডে ; তারই বিশদ বিবরণে ভরা এই 'মহাতীর্থের শেষ যাত্রী'। বিমল দে নিজেই বলেছেন যে এটা একটা ভিখিরীর ডায়েরী। কিন্তু এই বইটির মধ্যে পাওয়া যাবে তিব্বতের দৈনন্দিন জীবন আর মহাতীর্থের পূর্ণ বিবরণ।